

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা-অনুষদের অধীন বাংলা বিভাগে

পি-এইচ. ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ



প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : আধুনিক নাট্য পুনর্নির্মাণের
পরিচয় অন্বেষণ ও তার পর্যালোচনা

গবেষক

সাগর দাস

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ভৈরব গাঙ্গুলি কলেজ,

কলকাতা - ৫৬

পঞ্জীয়ন সংখ্যা - ১০০১৫৪০১১১০২০০০০১

পঞ্জীয়ন তারিখ - ৩০. ১০. ২০১৫

বাংলা বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বারাসাত, কলকাতা- ৭০০১২৬

২০২০



পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বেরুমানপুকুরিয়া, মালিকাপুর, বারাসাত, উত্তর চব্বিশ পরগণা, কলকাতা- ৭০০ ১২৬

বাংলা বিভাগ

স্মারক নং

তারিখ

Certificate from the Supervisor

This is to certify that the thesis entitled “প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যঃ আধুনিক নাট্য পুনর্নির্মাণের পরিচয় অন্বেষণ ও তার পর্যালোচনা” submitted by Sagar Das, who got his name registered on October 2015, for the award of Ph.D.(Arts.) degree of West Bengal State University is absolutely based upon his own work under the supervision of Professor Mohini Mohan Sardar, Professor & Head, Department of Bengali, West Bengal State University, Barasat, Kolkata- 700126 and that neither his thesis nor any part of the thesis has been submitted for any degree or any other academic award anywhere before.

Signature of the Supervisor
(MOHINI MOHAN SARDAR)
Professor & Head,
Department of Bengali
West Bengal State University
Barasat, Kolkata- 700126.

Declaration

I, Sagar Das, bearing Ph. D. registration no.10015401110200001, dated 30.10.2015, hereby declare that the work described in this thesis entitled “প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য: আধুনিক নাট্য পুনর্নির্মাণের পরিচয় অন্বেষণ ও তার পর্যালোচনা” is entirely my own work. No portion of the work referred to in this thesis has been submitted in support of an application for another degree or qualification of this or any other university or institute. Any help or source information, with has been availed in the thesis, has been duly acknowledged.

(Sagar Das)

Ph. D. Scholar,

Dept. of Bengali.

West Bengal State University

Barasat, kol-126.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

“প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য: আধুনিক নাট্য পুনর্নির্মাণের পরিচয় অন্বেষণ ও তার পর্যালোচনা” শীর্ষক গবেষণা কর্মের পরিকল্পনাটি একটি নতুন অন্বেষণ। আমরা গবেষণা কর্মটিতে মূলত আধুনিক নাট্য ভাবনায় পুরাতন বিষয়ের নবস্বাদ উপলব্ধি করানোর প্রয়াস করেছি।

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য এবং তার আধুনিক নাট্য পুনর্নির্মাণ নিয়ে প্রথম গবেষণার ভাবনা-চিন্তা আমার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মোহিনী মোহন সরদারের সঙ্গে আলোচনায় এবং তাঁর প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায়। পরবর্তী সময় তাঁরই নিরন্তর উৎসাহ, প্রেরণা এবং পথ নির্দেশে আমার গবেষণা কর্মটি ত্বরান্বিত এবং বাস্তবায়িত হয়েছে। তাঁর প্রতি আমার অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা চিরকাল বজায় থাকবে। তাঁকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

গবেষণার বিষয় হিসেবে প্রস্তাবিত প্রকল্পকে অনুমোদন করার জন্য ধন্যবাদ জানাই পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও আধিকারিকগণকে। এই কর্মের নানা পর্বের সঙ্গে যুক্ত যে সকল স্বনামধন্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকা গবেষণা কর্মটিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ দিয়েছেন, আমি তার প্রতিটি বিষয় গবেষণা কর্মে সংযুক্ত করেছি। এই অবসরে তাঁদের সেই ঋণ আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি ও তাঁদের প্রত্যেককে আমার শ্রদ্ধা এবং প্রণাম জানাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রাক্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি আমি আজীবন কৃতজ্ঞ; যিনি আমাকে ছাত্রজীবন থেকে সন্তানতুল্য স্নেহে সাহিত্যের নানাবিষয় আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে আমার মধ্যে সাহিত্যরস উপলব্ধি করার দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি আমার এই গবেষণা কর্মে নানা সময় তাঁর সুচিন্তিত মতামত দিয়ে আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। এই অবসরে সেই পরম পূজ্য, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বের প্রতি আমি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

ছাত্র জীবন থেকে শিক্ষক জীবন এবং শিক্ষক জীবন থেকে গবেষক জীবনের দীর্ঘ পথে যাঁরা নানা সময় আমার জীবনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন এবং সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন আমাকে এগিয়ে চলার জন্য, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি আমি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। কৃতজ্ঞতা জানাই অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়, অধ্যাপক সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী, অধ্যাপক শেখর সমাদ্দার এবং অধ্যাপিকা উর্মি রায়চৌধুরী মহাশয়াকে। এঁরা প্রত্যেকেই আমার গবেষণা কর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। শিক্ষক সুলভ উদারতায় আমাকে এঁরা প্রত্যেকেই পরামর্শ ও উপদেশ দান করে ঋদ্ধ করেছেন।

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রূপায়ণ করতে সহায়তা পেয়েছি সাহিত্য পরিষদ, জাতীয় গ্রন্থাগার, নাট্যশোধ সংস্থান, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী, বারাসাত সুভাষ লাইব্রেরী, মধ্যমগ্রাম সাংস্কৃতিক লাইব্রেরী, ভৈরব গাঙ্গুলি কলেজ লাইব্রেরী, অল ইণ্ডিয়া ডিজিটাল লাইব্রেরী থেকে এবং কয়েকজন ব্যক্তির নিজস্ব সংগ্রহ থেকে। সেই সকল গ্রন্থাগারের আধিকারিক, কর্মী এবং ব্যক্তিগত সাহায্যকারী প্রত্যেক মানুষকে, আমি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁদের উদারতা, সহৃদয় সহায়তা না পেলে এই গবেষণা কর্মটি কিছুতেই সম্পূর্ণ করা সম্ভব হতো না।

এই কর্ম সম্পাদনে আমার পরিবারের সদস্যগণ ও সহকর্মীদের সহযোগিতা ভোলার নয়। তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমার শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা রইল।

আজ এই পুণ্যলগ্নে ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং আমার স্বর্গগত পিতা-মাতার আশীর্বাদ করজোড়ে প্রার্থনা করছি। তাঁদের চরণে আমি শতকোটি প্রণাম জানাই।

সাগর দাস

সূচীপত্র

ভূমিকা :		১ - ৪
প্রথম অধ্যায় :	পুনর্নির্মাণ ও বিনির্মাণে বাংলা নাটক : সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয়	৫ - ১২
দ্বিতীয় অধ্যায় :	চর্যাপদ অবলম্বনে রচিত বাংলা নাটক : পরিচয় অন্বেষণ ও তার পর্যালোচনা	১৩ - ৫৩
তৃতীয় অধ্যায় :	রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক কাব্য ও পদাবলী সাহিত্য অবলম্বনে রচিত বাংলা নাটক : পরিচয় উদ্ধার এবং তার আলোচনা - ক) রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক কাব্য অবলম্বনে রচিত বাংলা নাটক। খ) রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী অবলম্বনে রচিত বাংলা নাটক।	৫৪ - ১১৫
চতুর্থ অধ্যায় :	নাট্য পুনর্নির্মাণে মঙ্গলকাব্যের বিষয় : অন্বেষণ ও তার সমীক্ষা - ক) মনসামঙ্গল কাব্য অবলম্বনে রচিত নাটক। খ) চণ্ডীমঙ্গল কাব্য অবলম্বনে রচিত নাটক। গ) ধর্মমঙ্গল কাব্য অবলম্বনে রচিত নাটক। ঘ) শিবায়ন কাব্য অবলম্বনে রচিত নাটক। ঙ) অন্নদামঙ্গল কাব্য অবলম্বনে রচিত নাটক।	১১৬ - ২৪৩
পঞ্চম অধ্যায় :	অনুবাদ সাহিত্যের বিষয় অবলম্বনে রচিত নাটক : অন্বেষণ ও তার বিশ্লেষণ - ক) রামায়ণের বিষয় অবলম্বনে রচিত নাটক। খ) মহাভারতের বিষয় অবলম্বনে রচিত নাটক। গ) ভাগবতের বিষয় অবলম্বনে রচিত নাটক।	২৪৪ - ৩৭০
ষষ্ঠ অধ্যায় :	চৈতন্য জীবনীসাহিত্য অবলম্বনে রচিত নাটক : অনুসন্ধান ও তার বিশ্লেষণ -	৩৭১ - ৪৫০
সপ্তম অধ্যায় :	একালে এই জাতীয় চর্চার প্রাসঙ্গিকতা বিচার -	৪৫১ - ৪৬৬
পরিশিষ্ট	(গবেষণা অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত তথ্যাদির চিত্র) -	৪৬৭ - ৫৬২
গ্রন্থপঞ্জী :		৫৬৩ - ৫৭০

ভূমিকা

নাটক একটি বহু প্রাচীন শিল্প-সংরূপ। ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম নাট্য নিদর্শন গ্রীক ভাষায় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত ভাষাতেও আছে প্রচুর নাটক। নাট্যসাহিত্যের এবং প্রযোজনার এই ধারা সাম্প্রতিক কালেও বহুমান। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যেও কম বেশি নাটকের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। চর্যাপদে ‘বুদ্ধনাটক বিসমা হোই’^১ এর উল্লেখ থেকে সেকালে যে বৌদ্ধনাটক রচিত এবং অভিনীত হত, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বড়ু চণ্ডীদাস রচিত ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ গ্রন্থটিও বাস্তবে ‘নাট্যগীতি-পাঞ্চালী’^২, আবার বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্য ভাগবত’ এ মহাপ্রভুর নাট্যাভিনয়ের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকের কথা আছে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’র মধ্যলীলার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর ‘গোপিকা নৃত্যের’^৩ প্রসঙ্গ থেকেই সেকালের নাট্যাভিনয় ও নাটক রচনার প্রত্যক্ষ সন্ধান পাওয়া যায়। এই সময়ের নাট্যাভিনয় প্রসঙ্গে সুকুমার সেন বলেছেন-

“একটি অভিনয়ের ঐতিহাসিক বিবরণ পাইতেছি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকে। শ্রীচৈতন্য তখনও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, নবদ্বীপে আছেন। একদা তিনি ভক্ত ও অনুচরগণ লইয়া তাঁহার মেসো চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে কৃষ্ণলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয়ের বস্তু ছিল তাঁহারই নির্বাচিত কৃষ্ণলীলার অংশ, মথুরায় রাধা ও কৃষ্ণের মিলন। নাট্যবস্তু ছিল ‘অঙ্ক’ শ্রেণীর, অনেকটা ছিল যেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লুপ্ত শেষ অংশ। কিন্তু অভিনয়কালে চৈতন্যের ভাবাবেশের ফলে অভিনয়ে সব গোলমাল ঘটয়া গিয়াছিল। চৈতন্য নিজে রুক্ষিণী সাজিয়াছিলেন, গদাধর রাধা, শ্রীবাস নারদ, ব্রহ্মানন্দ রাধার বড়াই, নিত্যানন্দ রুক্ষিণীর বড়াই, হরিদাস কোটাল, অদ্বৈত বিদূষক, শ্রীরাম ও গঙ্গাদাস নারদের দুই শিষ্য, মুরারি গুপ্ত কোটালের সঙ্গী। স্থান মথুরার উপকণ্ঠ।”^৪

মধ্যযুগে যাত্রা হিসেবে বিভিন্ন পালার অভিনয় হত, কিন্তু সেগুলির লিখিত কোনো রূপ আমরা সচরাচর দেখি না। এর বাইরে কথকতা এবং কীর্তনে কিছু নাট্যাঙ্গিকের ব্যবহার হতে দেখা যায়^৫। সেকালে লোকনাট্যের একটি ধারা অতি সাধারণ জনমানসে প্রবাহিত ছিল। চণ্ডীযাত্রা, রামযাত্রা, কালীদমন প্রভৃতি লোকনাট্যের অভিনয় বেশ জনপ্রিয় ছিল। সুকুমার সেন জানিয়েছেন- -

“বাঙ্গলা নাটকের উদ্ভব প্রাচীন যাত্রা হইতে হয় নাই, সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটকের মিলিত আদর্শেই বাঙ্গলা নাটকের উৎপত্তি। কিন্তু একটি বিষয়ে বাঙ্গলা নাটক প্রাচীন যাত্রার কাছে ঋণী। বাঙ্গলা নাটকে গানের অপরিহার্যতা পুরানো যাত্রা হইতেই আসিয়াছে।”^৬

কিন্তু আধুনিক যুগে নতুন আঙ্গিকে নতুন বিষয়ভাবনায় নাটকের নবজীবন ঘটেছে। বাংলা নাটক রচনা ও তার অভিনয়ের যে তথ্য উদ্ধার করা যায়, তাতে তারাচরণ শিকদার^৭, জি. সি. গুপ্ত^৮ প্রমুখের উল্লেখ আমরা বাংলা নাটকের প্রাথমিক পর্বে করতেই পারি। এঁদের হাতেই রচিত হয়েছে ‘কীর্তিবিলাস’(১৮৫২) ও ‘ভদ্রার্জুন’(১৮৫২) প্রভৃতি নাটক। এর পূর্বেই ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে রুশ দেশীয় নাট্য ব্যক্তিত্ব হেরাসিম^৯ লেবেডেফ ‘বেঙ্গলী থিয়েটার’ নামে একটি নাট্যমঞ্চে ‘The Disguise’^{১০} এবং ‘Love is the best Doctor’^{১১} নামের দুটি অনুবাদ নাটকের মধ্যে একটির অভিনয় করেছিলেন বলে জানা যায়। সেই অভিনয় দিয়েই বাংলা নাটকের অভিনয় ও রঙ্গমঞ্চের সূত্রপাত। এর পরপরেই এই ধারায় অনেক নাট্যব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ধারাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। তেমনই একজন হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বলা যায় বাংলা নাটকের রূপবদল ঘটে মধুসূদনের (১৮২৩-৭৩) ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণায়। বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে ‘রত্নাবলী’ (১৮৫৮) নাটকের অভিনয় দেখে তিনি যে নাটক লিখেছিলেন (শর্মিষ্ঠা, ১৮৫৯), সেই নাটকই সমালোচকদের মতে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সার্থক নাটক। তাঁরই হাতে শুধু সার্থক নাটক নয়; লিখিত হয়েছে পৌরানিক নাটক (শর্মিষ্ঠা- ১৮৫৯), ঐতিহাসিক-ট্রাজেডি নাটক (কৃষ্ণকুমারী -১৮৬১) এবং প্রহসনমূলক নাটকও (একেই কি বলে সভ্যতা?- ১৮৬০, বুড় শালিকের ঘারে রোঁ- ১৮৬০)। নাট্যকার মধুসূদন দত্তের পর এই ধারায় এলেন হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭-৮৪), রামায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-৮৬), উমেশচন্দ্র মিত্র (জন্ম- মৃত্যু সন পাওয়া যায়নি), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) প্রমুখ নাট্যকার। এঁরা সকলে সেকালের সমাজ বাস্তবতাসহ জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতকে নাটকের বিষয় হিসাবে নির্বাচন করে একাধিক নাটক রচনা করেছেন। রামায়ণ তর্করত্ন লিখেছেন ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’(১৮৫৪), ‘রুশ্মিণীহরণ’(১৮৭১), ‘কংস বধ’(১৮৭৫); হরচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন ‘ভানুমতী চিত্তবিলাস’ (১৮৫২), ‘কৌরব বিয়োগ’ (১৮৫৭); উমেশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন ‘বিধবা বিবাহ’(১৮৫৬); কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখেছেন ‘সবিত্রী সত্যবান’ (১৮৫৮) ইত্যাদি। এইভাবে জীবনের বিভিন্ন ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলা নাটক নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

যুগ বদলায়, জীবন বদলায়, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনীয়তায় নাটকের রূপও পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। আধুনিক নাট্যকারগণ ফেলে আসা অতীতের বিষয় নিয়ে লেখেন ঐতিহাসিক নাটক; তৈরি করেন যাত্রা বা থিয়েটারী পালাও। একদিকে নাটকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণ যেমন পঞ্চাঙ্গ নাটক, একাঙ্ক নাটক, প্রহসন; অন্যদিকে মানুষের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে তার অবয়বগত বা আকৃতিগত পরিবর্তনও করেছেন তাঁরা। এর ফলে নাটক অভিনয়, নাটক লেখা এবং নাটক দেখা সবই পেশাদারিত্বে পরিণতি লাভ করে। সেই প্রয়োজনের তাগিদে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিষয় অবলম্বন করে লেখা হয়েছে নাটক। আমাদের আগ্রহ মূলতঃ প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিষয় অবলম্বনে রচিত সেই আধুনিক নাট্য পুনর্নির্মাণ নিয়ে। গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ে আমরা প্রাগাধুনিক বিষয় নিয়ে রচিত সেই নাট্য পুনর্নির্মাণের বিস্তৃত পরিচয় উদ্ধার করার চেষ্টা করেছি।

প্রসঙ্গনির্দেশ ও মন্তব্য :-

- ১। দ্র. চর্যাপদ, পদসংখ্যা- ১৭, পুথিসংখ্যা- ২৬ (খ) বিনাপাদ।
- ২। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৪০, পৃ-১২০।
- ৩। গোপিকা নৃত্য বাস্তবে যাত্রাভিনয়, যা মহাপ্রভু ও তাঁর পার্শ্বদগণ করেছিলেন সাধারণ বৈষ্ণব ভক্তের মনোরঞ্জন করার জন্য।
- ৪। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৪০, পৃ-৪০৯।
- ৫। সংলাপ ও শরীরী মুদ্রার ব্যবহার হত।
- ৬। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৪০, পৃ-১৪২।
- ৭। জন্ম-মৃত্যু সন উদ্ধার করা যায় নি।
- ৮। জন্ম-মৃত্যু সন উদ্ধার করা যায় নি।
- ৯। মতান্তরে গেরাসিম; সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৪০, পৃ-৯২।

- ১০। কাপ্পলনিক সংবদন, ১৭৯৫, এই নাটকটির রচয়িতা হলেন ইংরেজ নাট্যকার রিচার্ড পল জড্ৰেল।
- ১১। ১৭৯৫; এর বাংলা নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

প্রথম অধ্যায়

পুনর্নির্মাণ ও বিনির্মাণে বাংলা নাটক : সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয়

‘পুনর্নির্মাণ’ শব্দের আভিধানিক অর্থ ‘পুনর্গঠন’। এর ইংরেজি শব্দ ‘reconstruction’; something which has been reconstructed. চিরপ্রচলিত ধারণাকে যখন মানুষ ভেঙে ফেলে এবং তার মধ্য থেকে একটি স্বতন্ত্র পাঠ গ্রহণ করে বা নির্মাণ করে, তখন তাকে পুনর্নির্মাণ বলা চলে। এই নির্মাণের সময় নির্মাণকারীর সমকাল চেতনা, ইতিহাসবোধ এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে থাকে। প্রচলিত বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন বিশ্বাস, রূপান্তরের নব ভাবনা। অর্থাৎ যা ছিল না অথচ তৈরী হয়েছে, তাকে বলে সৃষ্টি। যেমন কবিতা, নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস ইত্যাদি। আর যা ছিল বা সৃষ্টি হয়েছিল তাকে পুনরায় তৈরি করা হলে হয় পুনর্নির্মাণ। যেমন কবিতা, ছোটগল্প বা উপন্যাস অবলম্বনে লেখা নাটক অথবা নাটক থেকে কবিতা। কোথাও কোথাও সাহিত্যের প্রকরণগত পুনর্নির্মাণও দেখা যায়। যেমন নাটক বা উপন্যাস বা ছোটগল্পের বিষয় অবলম্বনে রচিত কবিতা (কবিতার পুনর্নির্মাণ)। তেমনি নাটকে, উপন্যাসে, ছোটগল্পে সংরূপগত পুনর্নির্মাণও দেখা যায়। যেমন, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিষয় অবলম্বনে রচিত নাটক অতুলকৃষ্ণ মিত্রের ‘মা’, সেলিনা হোসেন রচিত উপন্যাস ‘নীলময়ূরের যৌবন’, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত ছোটগল্প ‘চর্যাপদের হরিণী’ ইত্যাদি। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মনীষী সমালোচকরা সাহিত্য-শিল্পভাবনায় ‘নির্মাণ’, ‘পুনর্নির্মাণ’ এবং ‘বিনির্মাণ’ ভাবনাগুলিকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। কাল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩), ফার্দিনান্দ দ্য স্যসুর (১৮৫৭-১৯১৩), জাঁক লাঁকা (১৯০১-১৯৮১), রঁলা বার্ত (১৯১৫-১৯৮০), মিশেল ফুকো (১৯২৬-১৯৮৪), জাঁক দেরিদা (১৯৩০-২০০৪) প্রমুখ ব্যক্তিত্ব নানাভাবে ‘নির্মাণ’, ‘পুনর্নির্মাণ’ ভাবনার উপর আলোকপাত করেছেন। ফুকো তাঁর ‘The order of things’ (1970) গ্রন্থে বলেছেন- ‘The space of all spaces is empty at its core, impossible in so much as it is all encompassing’^১ “পাঠ থেকে পাঠান্তরে যাত্রার মধ্যে দিয়ে নতুন প্রতীতিকে অন্বেষণ করার প্রক্রিয়াই হল বিনির্মাণ। তাই ‘বিনির্মাণ’ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। নির্মাণ কেন্দ্রচ্যুতির মধ্য দিয়ে বিনির্মাণ ঘটে।”^২ পুরাতন নির্মাণ নতুন সংরূপের মধ্যে দিয়ে তৈরি করে আর একটি সংরূপ, তাকেই বিনির্মাণ বলা হয়। এই বিনির্মাণের মধ্যে দিয়ে নতুন পাঠকৃতি তৈরি হলে, তা হয় ‘পুনর্নির্মাণ’; রূপায়িত হয় নবনির্মিত সৃষ্টিতে। এইরূপ বক্তব্য সমালোচক

অধ্যাপক বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের। তিনি তাঁর ‘সাহিত্য বিচার: তত্ত্ব ও প্রয়োগ’ গ্রন্থে বলেছেন-

“আমরা সামনে তাকাই, পিছনে তাকাই; আমরা সিদ্ধান্ত নিই, সিদ্ধান্ত বদল করি, আমরা প্রত্যাশা করি, আমরা অতৃপ্তিতে কাতর হই, প্রশ্ন করি আমরা। চিন্তায় মগ্ন হই আমরা, প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ার জন্য কাতর হই আমরা, এইভাবে ক্রমে গ্রহণ বর্জনে এই নবসৃষ্টির গतिकে অব্যাহত রাখি।”^৩

আসলে রচয়িতা ‘সৃষ্টি’ অথবা ‘নির্মাণ’ করেন। সেই ‘নির্মাণ’কে পাঠক পাঠ ও বিশ্লেষণ করে তার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তৈরি করেন। এইভাবেই শুরু হয় অবনির্মাণ বা পুনর্নির্মাণের পালা। এখানে মূল ভাবনাকে পরিবর্তন না করে, সেই ভাবনার সত্যকে অবলম্বন করে নতুনভাবে যুক্তি-বুদ্ধির উপর রচনাটির পাঠ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ যেন কালকে অতিক্রম করে নতুন কালের নবভাবনার ফসল। ‘তাই পুনর্নির্মাণ পূর্ব-অভিজ্ঞতাকে পিছনে রেখে নতুন ঐতিহ্য নির্মাণের যাত্রা’। সাহিত্য রচয়িতা যখন সাহিত্য রচনা করেন, তখন সেই রচনার মধ্যে কোথাও কোথাও ‘gap’ থাকে। পাঠক সেই ‘gap’ বা ফাঁককে নিজ সৃজনশীল ক্ষমতায় পূরণ করেন এবং তখন সেই সাহিত্য অন্য পাঠকের কাছে আরো বেশী যুক্তিগ্রাহ্য ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে। ফলে জন্ম ঘটে সাহিত্যের পুনর্নির্মাণ। ‘মিশেল ফুকো, তাঁর তত্ত্ব বিশ্ব’ গ্রন্থে তপোধীর ভট্টাচার্য বলেছেন-

“At the very moment of completeness or perfection, a gap or void is revealed at the core of the space, a gap basic to the space and to the process of self-reflexivity itself.”^৪

লেখক যখন সাহিত্যের জন্ম দিলেন, তখন তাতে লেখকের অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর সৃজনশীলতা থেকে এগিয়ে চলে পাঠকের মনন, নির্মাণের ভেতর থেকে গড়ে ওঠে নব নির্মাণ। রবীন্দ্রনাথ যেমন ‘উৎসর্গ’ (১৯০১) কাব্যে বলেছিলেন- ‘কবিরে পাবে না তাঁর জীবন চরিতে।’ ঠিক তেমনি এক একজন পাঠকের কাছে একই ‘Text’ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে। সেখানে ‘Author’ এর দেওয়া অর্থ বা ভাবনার অস্তিত্ব টিকে নাও থাকতে পারে। মিশেল ফুকো ‘what is Author’ গ্রন্থে (১৯৬৯) বলেছেন- ‘The principal of a certain unity of writings’. এছাড়াও বার্থ তাঁর ‘Death of the Author’ (১৯৬৯) গ্রন্থে বলেছেন- ‘Death of the Author signifies the Birth of

the Reader’। এইভাবে লেখক ও পাঠকের মধ্যে এক সুতোয় দুটি ভিন্ন জগৎ গড়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথ যখন কালিদাসের ‘মেঘদূত’ কাব্য পাঠ করেন এবং পরবর্তী সময় ‘মেঘদূত’ কবিতা রচনা করেন, তখন সেই পুরাতন কাব্যভাবনা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিংশ শতকের ভাবনায় রূপান্তরিত হয়ে যায়, ফলে সেখানে কবিতার পুনর্নির্মাণ ঘটে। এটি ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণও বটে। ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে আলঙ্কারিকেরা ‘পুনর্নির্মাণ’ ভাবনার নানা যুক্তিপূর্ণ তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে এসেছে ধ্বনি-রসের কথা, এসেছে সহৃদয় হৃদয়সম্বাদী পাঠকের কথা। তাঁরা বলেছেন সহৃদয় কাব্য পাঠকের অন্তরেই একমাত্র রসের উৎপত্তি ঘটে। ‘ধ্বন্যালোক’ গ্রন্থে অভিনব গুপ্ত বলেছেন-

“শব্দ-সমর্প্যমান-হৃদয়-সংবাদ-সুন্দর-বিভানুভাব-সমুদিত-প্রাণ-নিবিষ্ট-রত্যাতি-
বসনানুরাগ-সুকুমার-স্বসংবিদানন্দ-চর্চণ-ব্যাপার-রসনীয়রূপো রসঃ।”^৫

এখানে অভিনব গুপ্ত চিত্তের আশ্বাদনের ব্যাপারটিকেই বেশি করে গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ সহৃদয় পাঠক কাব্য-সাহিত্যকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন এবং অন্তরের অস্বাদ্যময় আনন্দকে বহিঃপ্রকাশ করেন। যখন কোনো সহৃদয় পাঠক সেই সাহিত্যকে আপন ভাবনায় প্রকাশ করেন তখনই নতুনভাবে সৃষ্টি হয় সাহিত্য। অ্যারিস্টটল তাঁর ‘পোয়েটিক্স’ গ্রন্থে বলেছেন-

“Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude; in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play; in the form of action, not of narrative; through pity and fear effecting the proper purgation of this emotions.”^৬

অর্থাৎ ট্রাজেডি কোনো বিশেষ ঘটনার অনুকরণ। অ্যারিস্টটল ‘অনুকরণ’ শব্দটি প্রথম বার বললেন না, গুরু প্লেটো তাঁর আগেই ‘অনুকরণ’ শব্দ ও তার অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। প্লেটো ‘অনুকরণ’ বলতে ‘নকলকে’ বুঝিয়েছেন, কিন্তু অ্যারিস্টটল বুঝিয়েছেন ‘সৃষ্টিকে’। অর্থাৎ কবি বা লেখককে গড়তে হয়। পাশ্চাত্যর সমলোচক হেরোল্ড ওসবোর্গ প্রসঙ্গত বলেছেন-

‘In the context of general Theory of semantics it does then seem moderately sensible to say that both literary art and representational visual art are mimetic; both communicate

experienced situations real or imaginable by means of conventional symbols. Nor does it seem so completely nonsensical as before to say that literature imitate that which it describes”^৭

অর্থাৎ শিল্প আসলে বস্তু সংকেত ও কাল্পনিকতার অনুকরণ, এই অনুকরণের মধ্যে দিয়েই যে কোনো সাহিত্যের নবজন্ম বা পুনর্নির্মাণ ঘটে। মূলের বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে, মূলের সাদৃশ্য বজায় রেখে পুনরায় গড়া। তবে তার মধ্যে বাস্তব যুক্তি ও বিচারের মানদণ্ড বর্তমান থাকবে।

এবার জানা প্রয়োজন ‘বিনির্মাণ’ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ ও তাত্ত্বিক প্রসঙ্গটির কথা। ‘Deconstruction’ এর বাংলা রূপ ‘বি-নির্মাণ’ হওয়া সম্ভব। ‘অবিনির্মাণ’ও বলা চলে। পাশ্চাত্য জগতের সমালোচক দেরিদা ‘বিনির্মাণ’ তত্ত্বের ক্ষেত্রে আলোড়ন তুলেছেন। কিন্তু তাঁর আগেই শিক্ষাগুরু ফুকো ‘বিনির্মাণ’ তত্ত্বের ভাবনাটিকে প্রকাশ করেছেন। মিশেল ফুকো তাঁর ‘The Archaeology of knowledge’ গ্রন্থে বলেছেন–

“The author is not an indefinite source of signification which fill a work. The author does not precede the work. He is a certain functional principle by which, in our culture, our limits, excludes and chosen, in short, by which are impedes the free circulation, the free manipulation, the free composition decomposition and re-composition of fiction.”^৮

এই মন্তব্যে ‘Decomposition’ শব্দটি আসলে বিনির্মাণের অর্থ বহন করে। অর্থাৎ লেখকের ‘বয়ান’ বা ‘Text’ পাঠকের ভাবনায়, পঠনে এবং বহিঃপ্রকাশে নতুনভাবে বিশ্লেষিত হতে পারে। দেরিদার মতে, বিনির্মাণে একটি অনন্ত পাঠ-প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল থাকে। লেখক, পাঠক বা ব্যাখ্যাকারদের সমস্ত কর্তৃত্বের অবসান ঘটে পাঠ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। ‘বয়ান’ বা ‘Text’ নামক শব্দটি যখন সংশ্লেষিত হয়ে বিস্তৃত ক্ষেত্রে ছড়ায় অথবা বিভিন্ন ভাষা সত্তার সঙ্গে যুক্ত হয় তখন যিনি পড়বেন, তিনি হবেন নতুন অর্থকার। কারণ বিনির্মাণবাদীর পাঠ-প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত বিন্দু বলে কিছু নেই। ‘বয়ান’ এক পাঠ থেকে অন্য পাঠে ক্রমাগত বিবর্তিত হয়। যিনি পড়বেন তিনি নিজে থেকেই প্রথম পাঠকে দ্বিতীয় পাঠে বদলে দেবেন; তৃতীয় পাঠে দ্বিতীয়কে অস্বীকার করবেন, চতুর্থ পাঠে ভাঙবেন তৃতীয় পাঠকে। এইভাবে পূর্বের পাঠের স্মৃতিকে মুছে ফেলে পাঠক

‘Text’ এর অন্তর পাঠ-প্রক্রিয়া তৈরি করবেন। পাঠ থেকে পাঠান্তরে যাত্রার মধ্যে দিয়ে নতুন প্রতীতিকে অন্বেষণ করার প্রক্রিয়াই হল বিনির্মাণ। তাই ‘বিনির্মাণ’ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। ‘নির্মাণ’-এর কেন্দ্রচ্যুতির মধ্যে দিয়ে বিনির্মাণ ঘটায়। এই বিনির্মাণের মধ্যে দিয়ে যে নতুন পাঠকৃতি তৈরি হয় তা ‘পুনর্নির্মাণ’। তা পরিণত হয় ‘নবনির্মিত’ সৃষ্টিতে।^{১৮} তাই ‘বিনির্মাণ’ শব্দটির স্বরূপগত অর্থ ধরা যায় পাঠ-প্রতিক্রিয়া। কারণ পাঠের মধ্যে দিয়ে জন্ম ঘটে পাঠকের অন্তরে একটি নতুন ভাবনাজাত প্রতিক্রিয়া। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন রামায়ণ পাঠ করেছিলেন, তখন সেই রামায়ণের মূল ভাবনাকে ব্যাখ্যা করেন আপন আধুনিক জীবন-দৃষ্টিতে। ফলে পুরাতন ভাবনার মধ্যে থেকে আধুনিক প্রতিক্রিয়ার জন্ম ঘটে। ফলে ‘মেঘনাদবধ কাব্য’টি হয়ে উঠে বিনির্মিত নব্য পুরাণ। এই ‘পাঠন-প্রতিক্রিয়া’ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রুলা বার্ত বলেছেন-

“The reader is the spice on which all the quotations that make up a writing are inscribed without any of them being; a text’s unity lies not in its origin but in its destination. Yet this destination cannot any longer be personal; the reader is without history, biography, psychology; he is simply that someone wholes together in a single field all the traces by which the written text is constituted.”^{১৯}

এখানে লেখক ও পাঠক পাশাপাশি থাকলেও যেহেতু পাঠকের মধ্যে দিয়ে লেখকের পাঠ-প্রতিক্রিয়াজাত নূতন রূপ স্পষ্ট, তাই পাঠকের গুরুত্ব অনেকগুণ বেশি। পাঠক যেন নতুন ভাবনার জন্মদাতা। একথা সত্য যে ভিন্ন পাঠকের কাছে একই ‘Text’ এর অর্থ ও প্রতিক্রিয়া ভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। একমাত্র পাঠকের মাধ্যমেই পাঠ-প্রতিক্রিয়া সম্ভব; সম্ভব নতুন পাঠের; সম্ভব বিনির্মাণ করা। ‘বিনির্মাণ’ মনোভাবের সমর্থক প্রদীন ব্যানার্জী তাঁর ‘বিনির্মাণ অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে এক স্পষ্ট যুদ্ধ’ নামক আলোচনা চক্রে বলেছিলেন যে আপাত বিনির্মাণকে তছনছ করে গড়ে ওঠে আর এক নির্মাণ। ‘একের ভিতর আরো অন্য হয়ে ওঠার পদ্ধতিই হল বিনির্মাণ’। এ হলো আধুনিক সাহিত্যের একটি নব পথ। সহজ কথায় নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণ এর মধ্য দিয়ে যদি নতুন ভাবনা ও জীবনদর্শন অথবা মূল থেকে পৃথক অন্য কোনো আদর্শ প্রকাশিত হয়, তখন তাকে ‘বিনির্মাণ’ বলে। যা সবসময় ভেঙে বা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত কবি-সমালোচক শঙ্খ ঘোষের একটি উক্তি এখানে স্মরণযোগ্য-

“শিল্পসৃষ্টির অভিজ্ঞতাতেও আছে নির্মাণ আর সৃষ্টির এই যুগল খেলা। সচেতনভাবে নিজেকে ভাঙতে ভাঙতে, বিচিত্র আর জটিল নানা নির্মাণের মধ্য দিয়ে নিজেকে এগিয়ে নিতে নিতে, কীভাবে একজন স্রষ্টা প্রকাশ করেন তাঁর সৃষ্টির ভুবন, তার ইতিহাসও আমাদের কাছে হয়ে উঠতে পারে তাৎপর্যময়।”^{১১}

এছাড়াও নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ বা বিনির্মাণ অনেকাংশে নির্ভর করে নির্মাণ শৈলীর উপর। সেকথা ‘লোকাভরণ: আধুনিক কবিতার শৈলী গ্রন্থে সমালোচক বিপ্লব চক্রবর্তী বলেছেন। তিনি খুব সঙ্গত ভাবেই বলেছেন —

“শৈলী বা রীতির স্বরূপ বোঝাতে নানা সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সর্বত্রই দেখা যায়, রচনাশৈলী বা নির্মাণশৈলীর সঙ্গে নির্মাতার ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। কোনো কবি তাঁর রচনায় লোক-উপাদানকে কেমনভাবে ব্যবহার করেন তা তাঁর নিজস্ব প্রবণতার ওপর নির্ভরশীল। যখন এই প্রবণতা ক্রমাগত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং ভাষার ব্যবহারে তার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন লোকাভরণ শৈলীগত বিশিষ্টতা পায়।

“গ্রীক স্থাপত্য নির্মাণকর্মে স্তম্ভের ব্যবহার ছিল। এগুলিই ছিল নির্মাণকৌশলের মৌল দিক। কারণ, এই স্তম্ভগুলির ওপর নির্ভর করেই নির্মিত বস্তুর সামগ্রিক সৌন্দর্য ফুটে উঠত। এই স্তম্ভগুলিকে stylos বলা হত। কোনো শিল্পের আকার (form), প্রকাশভঙ্গি (expression), উপাদান ব্যবহারের শৃঙ্খলা (order), ভারসাম্য (balance) ও মাত্রাজ্ঞান (sense of proportion) এবং উপাদান ব্যবহারের ফলপ্রদ ঐক্যবোধও এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হত। সামগ্রিকভাবে তা হল নির্মাণ-কৌশল।

“লাতিন ভাষায় stylus stake-এর অর্থ হল সূচ্যগ্র কলম, বিশেষত মোমের ওপর লেখবার যন্ত্র। ইংরেজিতে stylus শব্দটি বহুদিন পর্যন্ত লেখার কলম অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। Style শব্দটি (বহুবচনে Styli) একবচন হলেও বহুবচন অর্থে প্রযুক্ত হয় এবং রচনার শৈলীগত বিভিন্ন রূপকেই ইঙ্গিত করে।

“শৈলী বিশ্লেষণে চারটি প্রধান বিষয় গুরুত্ব পায়—

১. শব্দ প্রয়োগ
২. বাক্য প্রয়োগ

৩. অর্থ প্রয়োগ

৪. ধ্বনি ও ভাব সংযোগ

“শব্দ বা বাক্য প্রয়োগের বিশেষত্ব কবির বাক্য নির্মাণ-শৈলীকে চিনিয়ে দেয়। বাক্য নির্মাণ বা বাক্য বিন্যাস পদ্ধতি সব কবির ক্ষেত্রে এক হয় না। অনেক সময় প্রচলিত রীতি না মেনে বা প্রচলিত বিন্যাসকে ভেঙে নতুনভাবে বাক্য বিন্যস্ত হয়। বাক্য বিয়োজন, প্রসারণ বা প্রতিস্থাপন প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় বাক্য প্রযুক্তি সম্ভব। বাক্য প্রয়োগের নানা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এক একজন কবির বাক্য নির্মাণ-শৈলীর সম্বন্ধ থাকে।”^{১২}

নির্মাণশৈলীর এই ভাবনা থেকে যেমন নানা সাহিত্য সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে, তেমনি গঠনশৈলীর পুনর্নির্মাণ বা বিনির্মাণও ঘটেছে। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যেও এই ‘পুনর্নির্মাণ’ বা ‘বিনির্মাণ’-এর পথ ধরেই আধুনিককালে নবনির্মাণের রূপ লাভ করেছে। আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে আমরা মূলত পুনর্নির্মাণ ও বিনির্মাণের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিয়ে প্রচলিত ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে নিজস্ব ধারণা সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করেছি। উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা খুব সহজে অনুমান করতে পারি যে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিষয় অবলম্বনে পুনর্নির্মিত বা বিনির্মিত বাংলা নাটক বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে আধুনিককালে। আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভের মূল অনুসন্ধান সেই সমস্ত নাটকের পরিচয় অন্বেষণ এবং তার পর্যালোচনা।

প্রসঙ্গনির্দেশ ও মন্তব্য :-

- ১। Michel Foucault, The Order Of Thing's, London, 1970, p- 56.
- ২। প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর, বাকপ্রতিম, ২০১২, পৃ-২০।
- ৩। বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য বিচার: তত্ত্ব ও প্রয়োগ, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬, পৃ- ১৩২।
- ৪। তপোধীর ভট্টাচার্য, মিশেল ফুকো, তাঁর তত্ত্ব বিশ্ব, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ২০০০, পৃ-৭৪।

- ৫। অভিনব গুপ্ত, ধন্যালোক (সম্পাদনা- সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৮, পৃ- ৬৪।
- ৬। S.H. Butcher, Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art, (Translated), Third Edition, 1902, p-240.
- ৭। Harold Osborne, Aesthetics and Criticism, London, 1971, p- 334.
- ৮। Michel Foucault, The Archaeology of knowledge, London-1969, p.69.
- ৯। প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর, বাকপ্রতিম, ২০১২, পৃ- ২০।
- ১০। বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য বিচার: তত্ত্ব ও প্রয়োগ, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬, পৃ- ১৩৯।
- ১১। শঙ্খ ঘোষ, নির্মাণ আর সৃষ্টি, প্যাপিরাস, ১৩৮৯, পৃ- ১২।
- ১২। বিপ্লব চক্রবর্তী, লোকাভরণ: আধুনিক কবিতার শৈলী, পুস্তক বিপণি, ২০০১,. পৃ- ১৮-১৯।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চর্যাপদ অবলম্বনে রচিত বাংলা নাটক: পরিচয় অন্বেষণ ও তার পর্যালোচনা

ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসকার এবং গবেষকদের মতে অষ্টম শতাব্দী থেকে বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে যে গ্রন্থটি আমাদের হস্তগত হয়েছে, সেটি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্যাপদ (১৯০৭)। গ্রন্থটির আবিষ্কার এবং ১৯১৬ সালে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ’ থেকে তার প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের একটি যুগান্তকারী ঘটনা। চর্যাপদ অদ্যাবধি বাংলা সাহিত্যের আদিতম নিদর্শনরূপে স্বীকৃত হয়ে আছে। ১৯১৬ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত গ্রন্থটির যে চর্চা, আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে, তাতে তৎকালীন সমাজ ইতিহাসের পরিচয় যেমন উঠে এসেছে, তেমনি বৌদ্ধ তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যদের সাধনমন্ত্রও যে গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে, সে কথার প্রমাণ পাওয়া গেছে। আধুনিক পাঠক গ্রন্থটির পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন নাটক, কবিতা। আবার চর্যাপদের বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে উপন্যাস, ছোটগল্প; এমনকি আঁকা হয়েছে ছবিও। একালের পাঠকের এই প্রতিক্রিয়া আসলে প্রাচীন ঐ গ্রন্থটির আধুনিক সাহিত্যিক পুনর্নির্মাণ; কখনো তা বিষয়গত, কখনো তা প্রকরণগত পুনর্নির্মাণ; আবার কখনোবা তা হয়ে উঠেছে ভাষা, চরিত্র, কাহিনির নতুন বিনির্মাণ। যেমন ‘চর্যাপদ’ অবলম্বনে সাইমন জাকারিয়া লিখেছেন ‘ন নৈরামণি’^১ (২০০০), ‘প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক’^২ (২০০৭), ‘বোধিধ্রু’^৩ (২০১৪) এবং শিবাশিস মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ‘অসম্ভব গোলটেবিল’^৪ (২০০২) নাটক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সেলিনা হোসেন ও শিবাশিস মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যথাক্রমে ‘বেনের মেয়ে’^৫ (২০১৩), ‘নীলময়ূরের যৌবন’^৬ (২০০৯), ‘কাহ্ন’^৭ (২০১০) নামের উপন্যাস। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ‘চর্যাপদের হরিণী’ (২০০৭)^৮ নামের ছোটগল্প এবং সুকুমার সেন, মণীন্দ্রমোহন বসু, গোপাল হালদার, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ একাধিক বিখ্যাত ব্যক্তি চর্যাপদ অবলম্বনে লিখেছেন কবিতা। গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে চর্যাপদ অবলম্বনে রচিত এই জাতীয় নাট্য নির্মাণের তথ্যনিষ্ঠ বিস্তৃত পরিচয় আমরা আলোচনা করতে আগ্রহী।

সাইমন জাকারিয়া : প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক (২০০৭);

আমরা আগেই স্বীকার করেছি চর্যাপদের কবিতাগুলির বিষয় ধারাবাহিক ভাবে সাজিয়ে সাইমন জাকারিয়া ছাত্রাবস্থাতেই ‘ন নৈরামণি’ নামের একটি নাটক রচনা করাছিলেন। নাটকটির অভিনয়ও হয়েছিল। সেই নাটকটির একটি বিস্তৃত রূপ হিসাবে সাইমন জাকারিয়া চর্যাপদের বিষয় অবলম্বনে লিখেছেন ‘প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক’। নাটকটি জুন ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে (জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৪) প্রথম প্রকাশিত হয়। ২২ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১৪ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটিতে প্রচ্ছদপত্র (২), লিপ পেজ (২), নাটকের নাম উল্লিখিত-পত্র (২), নামপত্র ও আভ্যন্তরীণ নামপত্র (২), উৎসর্গপত্র (২), মুখবন্ধ (২), সূচিপত্র (২), ভূমিকা (৩৮), প্রসঙ্গকথা (৩১), নাট্যকথা (৩), মূলনাটক (৪৯), শব্দার্থ (১), পরিশিষ্ট (১৬), গ্রন্থপঞ্জি (২), নির্ঘণ্ট (২), নাট্য প্রাসঙ্গিক চিত্রমালা (৮), লিপপেজ (২), পশ্চাৎ প্রচ্ছদপত্র (২) সহ মোট ১৬৮ টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ—

“প্রাচীন বাংলার/ বুদ্ধ নাটক/ সাইমন জাকারিয়া”^৯

মোট চার রঙের সংমিশ্রণে চমৎকারভাবে প্রচ্ছদপত্রটি তৈরী করেছেন প্রকাশক। প্রচ্ছদপত্রে পুথির ঢঙে টানা পদ্যে আধুনিক বাংলা হরফে প্রাচীন বাংলায় বুদ্ধ নাটক কথাটি পাঁচ লাইন করে মোট তিনবার লেখা হয়েছে। লেখার মধ্যে ছোট ছোট মোট চারটি চিত্র প্রচ্ছদপত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। নাটকের আভ্যন্তরীণ প্রচ্ছদপত্রে প্রকাশক লিখেছেন —

“চর্যাপদ শুধু এ যাবৎ প্রাপ্ত বাংলা ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্য-নিদর্শন নয়— প্রাচীন বাংলা নাটকেরও প্রামাণ্য দলিল। বর্তমান গ্রন্থটি রচিত হয়েছে মূলত চর্যাপদের উপর ভিত্তি করে। এছাড়া চর্যাপদকর্তাদের জীবনী, রেখাচিত্র এবং চর্যা রচনার সমসাময়িক কালে নির্মিত পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারে প্রাপ্ত নাট্য প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন টেরাকোটা চিত্র ও বিহারের ভূমি-পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ মতামতকে গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্লেষণে গ্রহণ করা হয়েছে এই গ্রন্থে। প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক বিষয়ে এটিই প্রথম প্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থ। এর প্রথম অধ্যায়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটকের স্বরূপ অন্বেষণ করা হয়েছে; দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাট্য প্রাসঙ্গিক চর্যাপদের উদ্ধৃতি ও পদে উল্লিখিত নাট্য প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা; তৃতীয় অধ্যায়ে চর্যাপদ অবলম্বনে রচিত একটি

নাটক বোধিদ্রুম এবং পরিশিষ্টে নাট্য প্রাসঙ্গিক চর্যাপদকর্তাদের জীবনী, নির্ঘণ্ট, গ্রন্থপঞ্জি ও নাট্য প্রাসঙ্গিক চিত্রমালা সংযুক্ত হয়েছে। গ্রন্থটির সর্বত্র গবেষকের প্রজ্ঞা ও পরিশ্রম স্পষ্ট। গবেষণাকর্ম কখনো যে সৃজনশীল এবং আবিষ্কার-আনন্দে একাকার হয়ে উঠতে পারে এই গ্রন্থপাঠে সেকথা নিশ্চিতভাবেই উপলব্ধি করা যাবে। যুক্তি ও আবেগ, বিচার ও বিস্তার, মনন ও হৃদয়ের দুর্লভ সমন্বয়ে সাইমন জাকারিয়া রচিত প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক গ্রন্থটি তথ্যে ও তত্ত্বে যেমন গভীর সরস ও মধুর তেমনি রচনাভঙ্গিতে প্রাজ্ঞ। গ্রন্থটি নাট্যকলার শিক্ষক-শিক্ষার্থী-গবেষক ছাড়াও বাংলা ভাষার সব ধরনের গবেষক-পাঠককে প্রাচীন বাংলার চর্যাপদ পাঠে নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করবে বলে আশা করা যায়।”^{১০}

প্রকাশকের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা যায় গ্রন্থটি মূলত গবেষণা গ্রন্থ। গ্রন্থে পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারে প্রাপ্ত টেরাকোটার চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে, যে চিত্রগুলিও তাদের চর্যাপদের বিষয়ের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। শুধু তাই নয়, এই গ্রন্থে প্রামাণ্য তথ্যসহ চর্যাপদকর্তাদের জীবনী রেখাচিত্রও ব্যবহৃত হয়েছে। নাটকের নামপত্রটি এইরূপ—

“প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক/ সাইমন জাকারিয়া/ বাংলা একাডেমী ঢাকা”^{১১}

নামপত্রে ঢাকা বাংলা একাডেমীর লোগো বা স্মারক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে।^{১২} অভ্যন্তরীণ নামপত্র থেকে জানা যায় গ্রন্থটির প্রকাশক আবদুল ওয়াহাব, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), পাঠ্যপুস্তক বিভাগ, বাংলা একাডেমী ঢাকা। মুদ্রক, মোবারক হোসেন, ব্যবস্থাপক বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ-পরিকল্পনায় ছিলেন আনওয়ার ফারুক। গ্রন্থটির মূল্য একশত টাকা মাত্র। পঞ্জীয়ন সংখ্যা- ৯৮৪-০৭-৪৫৮১-৬। গ্রন্থটির মুদ্রণ সংখ্যা- ১২৫০। গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রে নাট্যকার লিখেছেন—

“মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী/ অতীত কালকে যিনি ধন্য ক’রেছেন/
ভাবী কালকেও তিনি অলক্ষ্যভাবে চরিতার্থ ক’রবেন।/ চর্যাপদ
আবিষ্কারের একশ’ বছরপূর্তিতে/ সেই তাঁকে চেতনায় অনুভব করি।”^{১৩}

উৎসর্গপত্র থেকে জানা যায় চর্যাপদের আবিষ্কারের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে গ্রন্থটি প্রকাশিত। মুখবন্ধ থেকে জানা যায় উৎসর্গ পত্রটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাণীসুধা গ্রন্থের অনুকরণে রচিত। নাট্যকার জানিয়েছেন—

“উৎসর্গপত্র রচনায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাণীসুধা থেকে বাক্যঋণ
নিয়েছি।”^{১৪}

নাটকের ‘মুখবন্ধ’-এ সাইমন জাকারিয়া এই নাটক রচনার জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রয়াসের কথা বলেছেন। তাঁর মতে —

“শিল্প-সাহিত্যের প্রতি নিগূঢ় প্রেমে আজ থেকে প্রায় একযুগ আগে বিজ্ঞান শাখা হতে পিঠ টান দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ছাত্রত্ব গ্রহণ করি। স্নাতক প্রথম বর্ষেভর্তি হয়েই চোখের সামনে মেলে ধরি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, মেলে ধরি বাংলা ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্য নিদর্শন চর্যাপদ। সে সময়ে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত চর্যাপদের কোনো আধুনিক বাংলা রূপান্তর আমাকে তৃপ্ত করতে পারে নাই। অতৃপ্ত পিপাসায় মূল চর্যাপদের প্রাচীন বাংলা পাঠ পাঠ্যপুস্তক খুলে বারবার পড়তে থাকি। সহসা একসময় আমার চেতনার গভীর থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে প্রাচীন চর্যাপদের এক একটি নতুন বাংলা রূপান্তর। শ্রেণীকক্ষে চর্যাপদের পাঠ শুরু হবার আগে প্রায় আট-দশটি নতুন রূপান্তরে আমার ব্যক্তিগত নোটবই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এর মাঝে আমার শিক্ষক প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ক্লাসে চর্যাপদের পাঠ দান করতে আসেন। আমি তাঁর কাছে চর্যাপদ রূপান্তরের বিষয়টি গোপন রাখতে পারি নাই। সেদিন তিনি কোনো এক উদারতায় যেন আমার মতো অর্বাচীন ছাত্রর করা নতুন রূপান্তর হাতে প্রাচীন চর্যাপদের পাঠদান করেছিলেন। ক্লাসের পর আনন্দ-শিহরণ শেষ না হতেই আমাকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন—আমি যেনো সবগুলো চর্যাপদ রূপান্তর করি। সাক্ষাৎ গুরুর কথাকে শিরোধার্য মেনে চর্যাপদ রূপান্তরের দিকে আরও অধিক মনোযোগী হয়ে উঠি। কিছু দিনের মধ্যে বুঝতে পারি, চর্যাপদ শুধু বাংলা ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্য নিদর্শন বা কাব্যগীত নয়, প্রাচীনতম নাট্যগীতেরও নিদর্শন। আবিষ্কার করি, চর্যাপদ বেশ কিছু পদের ভেতরে রয়েছে নাটকীয় ঘটনার বিবরণ এবং কিছু কিছু পদ মূলত নাট্যমূলক গীত। পদের গঠনগত দিক বিবেচনা করে দেখি কিছু পদ নিশ্চিতভাবেই নাট্যমূলক সংলাপাত্মক গীত, বর্ণনাত্মক গীত এবং মিশ্র গীত (সংলাপ-বর্ণনা মিশ্রিত গীত)। এক সময় চর্যাপদ বাংলার নাট্যমূলক পদগুলোকে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে একটি নাট্যাখ্যান ন নৈরামণি রচনা করি, যা ২০০২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থিয়েটারের ৩০তম প্রযোজনা হিসেবে মঞ্চস্থ হয়; রচনা করি চর্যাপদের নাটক সম্ভাবনা ও নাটক প্রসঙ্গ নিয়ে একাধিক প্রবন্ধ।

লেখাগুলো পর্যায়ক্রমে ঢাকার সাহিত্য পত্রিকা সহজিয়া, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শিল্পকলা একাডেমীর গবেষণা পত্রিকা শিল্পকলা এবং কলিকাতার সাহিত্য পত্রিকা বঙ্গ-বসুন্ধরা ও নাটকের পত্রিকা স্যাস-এ প্রকাশিত হয়।

“চর্যাপদ কেন্দ্রিক আমার নিরন্তর সব ভবনা-চিন্তা ও কর্মের মধ্যে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয় অধ্যাপক সেলিম আল দীনের গবেষণা অভিসন্দর্ভ মধ্যযুগের বাংলা নাট্য। গ্রন্থটিতে মূলত মধ্যযুগের বাঙলা নাটকের গৌরবময় ইতিহাসের সুবিস্তৃত বিবরণ উপস্থাপন করা হলেও এর প্রথম অধ্যায়ে প্রাচীন বাংলার নাটক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে, যা আমাকে প্রাচীন বাংলার নাটকের ইতিহাস রচনায় অনুপ্রাণিত করে। প্রায় একই সময়ে আমার হাতে আসে জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এ প্রকাশিত সৈয়দ জামিল আহমেদের গবেষণা প্রবন্ধ বুদ্বিস্ট থিয়েটার ইন এন্সিয়েন্ট বেঙ্গল। এরপর থেকে আমি আমার চর্যাপদ কেন্দ্রিক পূর্ববর্তী সব ধরনের চিন্তা-চেতনার সঙ্গে প্রাচীন বাংলা নাটকের ইতিহাস রচনার একটি সুগভীর প্রত্যয় খুঁজে পাই। যে প্রত্যয়ের হাতে রচিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থ প্রাচীন বাংলার বুদ্ব নাটক।

“এতদ্ব্যতীত বাংলার ইতিহাস রচনার মহা মহামূল্যবান উপাদান সংগ্রাহক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন এবং তাঁদের সংগৃহীত ইতিহাস উপাদানের ব্যাখ্যাদাতা ও বাংলার নতুন ইতিহাস রচনার পথিকৃৎ আচার্য ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, নীহাররঞ্জন রায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, আহমদ শরীফ, সৈয়দ আলী আহসান, অতীন্দ্র মজুমদার, নির্মল দাশ, মণীন্দ্রমোহন বসু, নীলরতন সেন, মণীন্দ্রনাথ কুণ্ডু প্রমুখের বুদ্ব নাটক সম্পর্কিত আলোচনা— অত্রগ্রন্থে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় এনেছি।

“গ্রন্থনাম ‘বুদ্ব নাটক’, এ সম্পর্কে প্রশ্ন আসতে পারে কেন গ্রন্থনাম ‘বৌদ্ধ নাটক’ নয়? উত্তরটা চর্যার পদ থেকে দেওয়াটাই সমীচীন মনে করি। চর্যার ১৭ সংখ্যক পদে স্পষ্ট বলা হয়েছে—‘নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।/ বুদ্ব নাটক বিসমা হোই।’ বিভিন্ন চর্যা সংকলনে এই পাঠটি

অবিকৃত রয়েছে। অতএব চর্যার উক্ত পদটির সূত্র ধরে গ্রন্থনামে ‘বুদ্ধ নাটক’ শব্দবন্ধটি অবিকৃতভাবে গ্রহণ করেছি এবং উৎসর্গ পত্র রচনায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাণীসুধা থেকে বাক্যঋণ নিয়েছি।

“আমার সকল সৃজনকর্মের প্রধান প্রেরণাদাত্রী হচ্ছেন মা আমেনা খাতুন। তাঁর নিরন্তর তাগাদা আমার এই গ্রন্থ রচনায় গতি দান করেছে। এছাড়া, যাঁদের মতামত ও সহযোগিতা ছাড়া বর্তমান গ্রন্থটি সমৃদ্ধ ও নির্ভুল হয়ে উঠতো না তাঁরা হচ্ছেন, কবিবন্ধু রায়হান রাইন, মজনু শাহ, সাইমণ রানা, শিল্পী তরিকত ইসলাম ঝন্টু ও আমার মানুষ কানিজ ফাতেমা ছন্দা। গ্রন্থটি সমৃদ্ধির মূলে আরেকটি নাম আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে, তিনি বাংলা একাডেমী লাইব্রেরির ক্যাটালগার সফিজ উদ্দিন, লাইব্রেরির এক লক্ষ এগারো হাজার বইয়ের বিশাল সংগ্রহ থেকে এ গ্রন্থ রচনার জন্য প্রয়োজনীয় ও দুর্লভ বইয়ের তিনিই ছিলেন মূল জোগানদাতা। এঁদের সবার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

“সবশেষে গ্রন্থ প্রকাশে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ও পাঠ্যপুস্তক বিভাগের পরিচালক ডক্টর আবদুল ওয়াহাব-এর অকৃত্রিম সহযোগিতার ঋণ স্বীকার করি।

“সবার মঙ্গল হোক।”^{১৪}

মুখবন্ধের সমগ্র বক্তব্যটি এখানে উদ্ধার করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল বিজ্ঞানের এক ছাত্রের আগ্রহ, অধ্যাবসায়, তাগিদ কেমন করে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ও অনুসন্ধান নিবিষ্ট হয়েছিল তা দেখানো। আমরা বিস্মিত হই এই জেনে যে, ছাত্রাবস্থায় পাঠদান শুরু হবার আগেই সাইমন জাকারিয়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে ঐ সমস্ত পাঠ্য ও দুর্বোদ্ধ গানগুলির পাঠোদ্ধার যেমন করেছিলেন, তেমনি তার ভেতরের ধারাবাহিক ভাবনাগুলি নিয়ে নতুনভাবে গানগুলির রূপান্তরও করেছিলেন। আমরা সাইমন জাকারিয়ার মতো বিস্মিত হয়েছি এই জেনে যে, শ্রেণিকক্ষে বিখ্যাত অধ্যাপক এবং প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস একজন ছাত্রের রূপান্তর করা চর্যাপদের অনুবাদ অনুসরণে পাঠদান করেছিলেন। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, ছাত্রের রূপান্তরিত চর্যাপদগুলির সাহিত্যমূল্য ও শিল্পমূল্য দুটিরই গুরুত্ব এবং অভিনবত্ব, নতুনত্বের কথা অনুভব করে এই বিশেষ কাজটি করেছিলেন তিনি। সেজন্য তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয়। সঙ্গীর্ণ মানসিকতার অনেক উর্দে ছিলেন তিনি।

মুখবন্ধ থেকে আমরা আরো জানতে পারি সাইমন জাকারিয়া চর্যার গানগুলির প্রকৃতিগত রূপ ও গঠনগত রূপেরও বিচার করেছিলেন। গানগুলির সংলাপাত্মক রূপ যে আসলে নাটকের সংলাপ, তা তিনি উপলব্ধি করে গীতগুলি ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে নাট্যাখ্যান নির্মাণ করেছিলেন, যার নাম ছিল ‘ন নৈরামণি’। ২০০২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থিয়েটারে ৩০তম নাট্য প্রযোজনা হিসাবে সেই নাটকটির অভিনয়ও হয়েছিল বলে জানা যায়। শুধু তাই নয়, বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ ও গ্রন্থরচয়িতাদের বক্তব্য যেমন গ্রন্থটির মধ্যে সংযোজন করেছেন নাট্যকার, তেমনি চর্যাপদের ১৭ সংখ্যক চর্যার শব্দবন্ধ অনুসারে নাটকের নামে ‘বুদ্ধ নাটক’ শব্দটিও যুক্ত করেছেন। নাটকের সূচিপত্রটি এই রূপ —

“প্রথম অধ্যায়ঃ প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটকের স্বরূপ অন্বেষণ/ ভূমিকা ১/
বুদ্ধ নাটকের প্রাচীনত্ব ৫/ বুদ্ধ নাটকের গীতবাহী ‘চর্যাপদ’-এর গায়ন
রীতি ৭/ বুদ্ধ নাটকের নৃত্য গীতি, বাদ্যযন্ত্র, সাজ-পোশাক, অলঙ্কার, পাত্র-
পাত্রী ও অভিনয়স্থান ১১/ বুদ্ধ নাটক প্রসঙ্গে চর্যাপদকর্তাদের জীবনবৃত্তান্ত,
রেখাচিত্র ও পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের সমন্বিত পাঠ ১৬।/ দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ
নাট্য প্রাসঙ্গিক চর্যাপদ/ প্রসঙ্গ কথা ৩৯/ চর্যাপদের মূলপাঠ, আধুনিক
বাংলা কাব্য-গীত, আধুনিক বাংলা পাঠ ও নাট্য পরিবেশন প্রসঙ্গ ৪১/
চর্যা--২: / কুকুরীপা।। চর্যা-৬: ভুসুকুপা।। চর্যা-১০: কাহুপা।। চর্যা-১১:
কাহুপা।।/ চর্যা-১২: কাহুপা।। চর্যা-১৬: মহিভাপা।। চর্যা-১৭: বীণাপা।।
চর্যা-১৮: কাহুপা।।/চর্যা-১৯: কাহুপা।। চর্যা- ২০: কাহুপা।। চর্যা-২৮:
শবরপা।। চর্যা- ২২: ডেউগপা।।/চর্যা-৩৫: ভাদেপা।।চর্যা-৩৬: কাহুপা।।
চর্যা-৩৭: তাড়কপা।। চর্যা- ৩৯: সরহপা।।/ চর্যা-৪০ : কাহুপা।। চর্যা-৪৯
: ভুসুকুপা।। চর্যা-৫০ : শবরপা।।/ তৃতীয় অধ্যায়ঃ চর্যাপদ অবলম্বনে
একটি বর্ণনাত্মক নাটক/ নাট্যকথাঃ চর্যাপদের নাটক সম্ভাবনা ৭০/
নাটকঃ বোধিধ্রু ৭৩/ শব্দার্থ ১২১।/ পরিশিষ্ট /নৃত্য, গীত ও নাট্যসংশ্লিষ্ট
চর্যাপদকর্তাদের জীবনী ১২৩/ গ্রন্থপঞ্জি ও প্রবন্ধপঞ্জি ১৩৯/ নির্ঘণ্ট ১৪১ /
নাট্য প্রাসঙ্গিক চিত্রমালা ১৪৩।”^{১৫}

প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটকের স্বরূপ অন্বেষণ করতে গিয়ে সাইমন জাকারিয়া নাটকটির ভূমিকা অংশে জানিয়েছেন যে তিনি মূলত ‘চর্যাপদ’ অবলম্বন করে এই নাটকটি লিখেছেন। তাঁর কথায়—

“প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটকের স্বরূপ অন্বেষণের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে চর্যাপদ। কেননা, এটি বাংলা ভাষায় প্রাপ্ত প্রাচীনতম সাহিত্য নিদর্শন এবং এর পদেই মিলেছে প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটকের সুস্পষ্ট উল্লেখ”।^{১৬}

নাটকের বিষয়বস্তু ও রচনাকাল সম্পর্কে নাট্যকার জানিয়েছেন —

‘চর্যাপদ মূলত আনুমানিক অষ্টম খ্রিস্টাব্দ থেকে দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বৌদ্ধ সহজিয়া মতের সাধনপদ্ধতির সূত্র প্রকাশক গান হিসাবে রচিত।’ এই গানগুলোর প্রকৃতি সম্পর্কে গবেষক বলেন, গানের মাধুর্য বাণীর উৎকর্ষে নয়—সুরলালিতে। কথা সেখানে গৌণ, সুরই মুখ্য। কিন্তু চর্যাপদগুলো মূলত বাণীপ্রধান গান। সে গানের বাণীতে গুহ্য সাধনতত্ত্বের কথা বিভিন্ন নাটকীয় ঘটনা ও কাহিনীর মোড়কে প্রকাশিত হয়েছে। এদিক দিয়ে চর্যাপদকে নাট্যমূলক গান হিসেবে শনাক্ত করা যায়। আসলে, এর নাট্যমূলক গানে বৌদ্ধ সহজিয়া মতের কিছু ধর্মীয় আচরণবিধির ইঙ্গিত দেওয়া হলেও, পদকর্তাগণ সমসাময়িক কালের সামাজিক মানুষের জীবনচিত্রের যে চিত্রাকর্ষক ছবি এঁকেছেন তা জীবনরসিক কাব্যপাঠক ও ঐতিহাসিকের কাছে মহামূল্যবান সামগ্রী।”^{১৭}

নাট্যকারের উপরোক্ত মন্তব্য থেকে জানা যায় তিনি চর্যার গানগুলিকে মূলত ‘বাণীপ্রধান গান’ বলতে চান। তাঁর মতে চর্যার গানের মধ্যে ‘গুহ্য সাধনতত্ত্বের কথা’ বিভিন্ন নাটকীয় ঘটনা ও কাহিনীর মোড়কে প্রকাশিত হয়েছে। শুধু এইটুকুই নয়, চর্যার গানগুলিতে যে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন কাহিনি-বিবৃত রয়েছে, সে সম্পর্কে সাইমন জাকারিয়া জানিয়েছেন—

“সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকা, শ্রম ও বিশ্রাম, কাজ ও আনন্দ, জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুর কারণ, পেশা ও নেশা, অবসর ও খেলাধুলা, পূজো আর্চা ক্রিয়াকর্ম, গৃহস্থের পারিবারিক জীবন, বস্ত্র-অলঙ্কার, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত খাদ্য ও বাসনপত্র, অপরাধ ও বিচার-পদ্ধতি সম্পর্কে বিবরণ লাভ করা যায়, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নৃত্য, গীত ও গীত উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রসমূহের গঠনশৈলী, সুর, তাল, লয়, ধ্বনিরূপ ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে নাটক ও নাট্য পরিবেশনারীতি সম্পর্কেও শিল্পসম্মত বিবরণ পাওয়া যায়।”^{১৮}

চর্যার গানে প্রকাশিত সামাজিক জীবন-কাহিনীর পাশাপাশি সাইমন জাকারিয়া চর্যাপদকর্তাদের জীবনী ও তাঁদের বেশ কিছু রেখাচিত্র এবং পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে প্রাপ্ত নানান তথ্য ও টেরাকোটা চিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে—

“চর্যাপদকর্তাদের জীবনীর সন্ধান মিলেছে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে তিব্বতে প্রাপ্ত চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি নামক সিদ্ধদের একটি জীবনী সংকলনে। সম্প্রতি তিব্বতী ভাষায় রচিত এ সংকলনটি বাংলায় অনূদিত হয়ে চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।”^{১৯}

বিভিন্ন সূত্র থেকে চর্যাপদকর্তাদের ব্যক্তিগত জীবনের যে পরিচয় উদ্ধার করেছিলেন সাইমন জাকারিয়া, তা তিনি ‘প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক’ গ্রন্থের ভূমিকায় জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন-

“চুরাশি সিদ্ধর কাহিনীর মধ্যে চর্যাপদের আঠারোজন পদকর্তার জীবনী বা পরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে। সে পরিচয়ের ভেতর দিয়ে জানা যায় বেশ কয়েকজন চর্যাপদকর্তা নৃত্য, গীত, বাদ্য বা নাট্য সংশ্লিষ্ট ছিলেন।.... তাঁরা না ছিলেন সমাজের উপরতলার মানুষ, না উঁচুদরের পণ্ডিত মহলের মধ্যমণি। বরং তাঁরা প্রায় সবাই সাধারণ জেলে-রাখাল-ব্যাধ-কামার-কুমোর-ধোপা-তেলী-তাঁতী-চাষী-চণ্ডাল- সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষ।... শুঁড়িখানা, শ্মশান, নদীর তীর, জঙ্গলের মধ্যে গাছের তলায় ছিল এঁদের বসবাস। সঙ্গিনী—ও এমন কি দীক্ষাদাত্রী—গ্রহণ করতেন এমন সব নারীকে, সমাজ যাঁদের কখনই অভিজাত বলে মনে করেনি। তাঁদের মধ্যে গণিকা ও শূদ্ভিনীরও উল্লেখ চোখে পড়ে! বিদ্যাবুদ্ধির দিক থেকে সিদ্ধরা ছিলেন নিরক্ষর দেশবাসীর কাছাকাছি।”^{২০}

সাইমন জাকারিয়া গবেষকের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে অত্যন্ত পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করে বহু নতুন তথ্য আমাদের পরিবেশন করেছিলেন। চর্যাপদের উপরে তাঁর এই বিরল প্রচেষ্টা নাট্য গ্রন্থটিকে আপামর শিক্ষিত জন সাধারণের কাছে চর্যার গান সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলেছে। গ্রন্থটির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর মধ্যে প্রকাশিত পদকর্তাদের রেখাচিত্র প্রসঙ্গের অবতারণা। সাইমন জাকারিয়া এই বিষয়ে গ্রন্থের ভূমিকায় জানিয়েছেন—

“চর্যাপদকর্তাদের জীবনীর সঙ্গে রেখাচিত্রেরও সন্ধান মিলেছে তিব্বতে।। যা সংগ্রহ করে আনেন মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন। তিনি চুরাশি

সিদ্ধদের ছবি বা রেখাচিত্র দিয়ে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ মহামূল্যবান একটি গ্রন্থ পুরাতত্ত্ব নিবন্ধাবলী প্রকাশ করেন।^{২৫} এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত চুরাশি সিদ্ধাচার্যের মধ্যে আঠারোজন চর্যাপদকর্তার সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং রেখাচিত্র স্থান পায়। রেখাচিত্রে চর্যার বেশ কয়েকজন পদকর্তাকে নৃত্য বা নাট্য ভঙ্গিরত অবস্থায় দেখা যায়। রেখাচিত্রে সম্ভবত লোকায়ত বৌদ্ধধর্মচর্চায় ব্যবহৃত বিভিন্ন সাধনমুদ্রার আশ্রয়ে অভিনীত কোনো না কোনো নাট্যাখ্যান বা নৃত্য পরিবেশনার ছবিই অঙ্কিত রয়েছে। আবার কয়েককটি রেখাচিত্রে কোনো কোনো চর্যাপদকর্তা বাদ্য-বাদন বা সংগীত পরিবেশনের ভঙ্গিতে চিত্রিত আছেন। যা দেখে পদকর্তাদের দ্বারা অভিনীত প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটকে ব্যবহৃত গীত-বাদ্য সম্পর্কেও প্রমাণ পাওয়া যায়।”^{২৬}

এই গ্রন্থের মধ্যে সাইমন জাকারিয়া মোট ১৮ জন পদকর্তার দুস্ত্যাপ্য রেখাচিত্র উদ্ধার করে প্রকাশ করেছেন। চিত্রগুলি সাদা-কালো রেখায় অঙ্কিত। তাতে- ১/সরহপা, ২/লুইপা, ৩/কাফুপা, ৪/বিরূপা, ৫/কঙ্কণপা, ৬/দাড়িকপা, ৭/বীণাপা, ৮/ভুসুকুপা, ৯/কর্ণরিপা, ১০/জয়ানন্দ, ১১/তন্তিাপা, ১২/জলন্ধরপা, ১৩/ভদ্রপা, ১৪/শান্তিাপা, ১৫/তিলোপা, ১৬/ডোম্বীপা, ১৭/মীনপা, ১৮/গুপ্তরিপা - প্রমুখের চিত্র আছে। চিত্রগুলি তিব্বতের স্ক্য বিহার থেকে উদ্ধার করেছেন তিনি।

চর্যার গানগুলি রচনার সমসাময়িক কালে নির্মিত পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার প্রসঙ্গে নানা তথ্য উদ্ধার করে গ্রন্থ ভূমিকায় সাইমন জাকারিয়া জানিয়েছেন—

“চর্যা রচনার সমসাময়িককালে এ বিহারটি নির্মিত হয়। যার প্রাচীন নাম সোমপুর বিহার। গবেষকদের ধারণা, পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার ও তার মন্দিরগাত্রে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক বা টেরাকোটায় সাধারণ মানুষের কর্ম-চিত্রের পাশাপাশি গীত, নৃত্য, বাদ্য পরিবেশন ও নাট্যাভিনয়ের নানা ধরনের অঙ্গভঙ্গি উৎকীর্ণ রয়েছে। তাই প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটকের স্বরূপ অন্বেষণে পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক বা টেরাকোটা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। এমন কথার আরেকটি জোরালো যুক্তি পাওয়া যায় আচার্য সুকুমার সেনের রচনায়। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রাচীন বাংলার ‘সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কৃতি’র আলোচনায় পাহাড়পুর বৌদ্ধ মন্দিরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক

বা টেরাকোটা সম্পর্কে লিখেছেন—‘পাথরের মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ, ইটের মন্দিরের গায়ে পোড়া মাটিতে ছাপা অথবা ঘরের চালের নীচে কাঠের কাঠামোয় খোদাই করা কিংবা আঁকা ভিত্তিচিত্রে ও চালচিত্রে সেকালের বাঙ্গালা দেশের ভাস্কর্য তক্ষণ ও চিত্রণ শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিবার অনেক আগেই কোন কোন বিশিষ্ট বিষয় এইভাবে প্রথমে শিল্পে প্রকটিত হয়েছিল’। এ কথার সূত্র ধরে বলা অসঙ্গত হবে না যে, প্রাচীন বাংলা নৃত্য, গীত, বাদ্য ও নাট্য পরিবেশনার বিবরণ সাহিত্যে স্থান পাবার আগে মন্দির গাত্রে বিচিত্র টেরাকোটা চিত্রে উৎকীর্ণ হয়েছিল।

“প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটকের স্বরূপ ও প্রকৃতি বিষয়ে সাহিত্য নিদর্শনে স্পষ্ট কিছু লিপিবদ্ধ হবার আগেই পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের টেরাকোটা চিত্রে বিভিন্নভাবে তার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। শুধু তাই-ই নয়—পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে যেসব প্রস্তর ও পোড়ামাটির ফলক খোদিত আছে, তা দেখে একদিকে যেমন বাংলার নিজস্ব ভাস্কর্য-শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি এর নির্মাতা ভাস্করদের সম্পর্কে ধারণা করা যায়—তারা ছিলেন সমাজ ও সংসার ঘনিষ্ঠ আর তাঁরা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিচিত দৃশ্যাবলী এবং কাল্পনিক ও বাস্তব জগতের চিত্র বিশেষভাবে ভাস্কর্য ও টেরাকোটাতে রূপ দিয়েছিলেন। সে ক্ষেত্রে পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের মন্দিরগাত্রে প্রাপ্ত চিত্রে সেকালে প্রচলিত নাটক পরিবেশনার দৃশ্যাবলী অঙ্কিত থাকা অসম্ভব কিছু নয়।

“পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ টেরাকোটা বা পোড়ামাটির ফলকচিত্র সম্পর্কে গবেষকের মত হচ্ছে—‘এই লোকায়তশিল্পের বিষয়বস্তু যেমন বিচিত্র তেমনি প্রাণাবেগপূর্ণ। মনে হয় এ সকল শিল্প নির্মাণকালে শিল্পীরা তাঁদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। ফলে শিল্পীরা বিষয়বস্তুর প্রাচুর্যে ও মহত্বে চরম উৎকর্ষতা দেখাতে পেরেছিলেন। শিল্পীরা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে দৃশ্যমান অভিজ্ঞতাকেই শিল্পের বিষয়বস্তু করে নিয়েছিলেন’।^{২৭} শিল্পীদের দৈনন্দিন জীবনের সেই দৃশ্যমান অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিশ্চয় চর্যাপদে লিখিত ‘বুদ্ধ নাটক’ দর্শনের অভিজ্ঞতার যোগ ছিল।”^{২২}

‘প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক’ গ্রন্থে সাইমন জাকারিয়া মোট ২১টি টেরাকোটা চিত্র উদ্ধার করে প্রকাশ করেছেন। যার প্রথমটি সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন—‘বাস্তব জীবন থেকে আহরিত এই টেরাকোটা চিত্রটিতে এক শিকারি শবরকে বিচিত্র সাজ-পোশাকে ধনুক হাতে গতিশীল দেখা যাচ্ছে। তার ধনুক-ধারী বাহুর নিচে সম্ভবত প্রেমিকা বা স্ত্রী শবরীও ক্রিয়াশীল। টেরাকোটা চিত্রের এমন শিকার দৃশ্যের সঙ্গে চর্যাপদের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত শবর-শবরীর শিকার জীবনের সাদৃশ্য রয়েছে। এ ক্ষেত্রে অনুমান করা যায়, শবর-শবরীর শিকার জীবনকেন্দ্রিক নাটক এই টেরাকোটা চিত্রটির মতো আসরেও অভিনীত হতো’।^{২৩} / দ্বিতীয় চিত্র সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন—‘এক সো পদমা চউসট্টী পাখুড়ী। তঁহি চড়ি নাচই ডোম্বী বাপুড়ী।’^{২৪} চর্যার ১০ সংখ্যক পদে উদ্ধৃত এই বিবরণের সঙ্গে টেরাকোটা চিত্রটির হুবহু সাদৃশ্য রয়েছে। চর্যাপদটির বিবরণ মতো চিত্রে দেখা যাচ্ছে—‘একটি পদ্মফুলের পাপড়ির উপরে একজন নর্তকী নাচছেন। তার হাতে, পায়ে, কানে, গলে ও কটিতে বিচিত্র অলঙ্কার দৃশ্যমান। দুই বাহুর সাহায্যে অঙ্গে পেঁচানো রয়েছে একখণ্ড বস্ত্র বা উত্তরী’।^{২৫} / তৃতীয় টেরাকোটা চিত্র সম্পর্কে সাইমন জাকারিয়ার বক্তব্য—‘যোদ্ধার অভিনয়। একহাতে ঢাল অন্যহাতে তরবারী নিয়ে বীরের মতো বিশেষভঙ্গিতে এক যোদ্ধাকে গতিশীল দেখা যাচ্ছে’।^{২৬} / চতুর্থ ও পঞ্চম চিত্র সম্পর্কে তিনি বলেছেন যথাক্রমে—‘বীর রসের অভিনয়। এক পায়ের উপর ভর দিয়ে অন্য পা উন্মুক্ত রেখে নৃত্যভঙ্গিরত এক যোদ্ধা কুশীলবকে দেখা যাচ্ছে। তার একহাতে অস্ত্র অন্যহাতে কোমরে সংযুক্ত। অভিনেতার গায়ে কোনো বস্ত্র নেই, তবে পরনে দৃশ্যমান রয়েছে ধুতি’।^{২৭} / ‘বাম পাশের টেরাকোটাতে দুই উরুর মাঝখানে অস্ত্র নিয়ে বিশেষ প্রকারের বাহনযাত্রার অভিনয় এবং ডান পাশের টেরাকোটাতে শিকারীর সাজে ধনুক হাতে এক গতিশীল ভঙ্গিমায় অভিনয় দৃশ্যমান’।^{২৮} / ষষ্ঠ ও সপ্তম চিত্র দুটিও পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার থেকে উদ্ধার করেছেন তিনি। ষষ্ঠ চিত্রে আছে—‘বুদ্ধ নাটকে নির্মাণ পর্বের অভিনয়। বিশেষ প্রকারের মুকুট মাথায় পদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন হয়ে একজন ধ্যানী বসে রয়েছে। প্রার্থনার ভঙ্গিতে তার দুই হাতের করতল বুকের কাছে সংযুক্ত’।^{২৯} / ‘নৃত্যভঙ্গির দৃশ্য। একজন কুশীলব তার হস্ত ও পদদ্বয়কে আলাদা আলাদা ভাবে কৌণিক অবস্থানে বিন্যস্ত করে বিশেষ ধরনের নৃত্যভঙ্গিরত। এখানে কুশীলবের হস্তে সর্পের উপস্থিতি দেখে একে সর্প-নৃত্য বলা যায়’।^{৩০} তার বাইরেও গ্রন্থটির পরিশিষ্টে মোট ১৪টি রঙিন টেরাকোটা চিত্র পাহাড়পুরে বৌদ্ধ বিহার থেকে উদ্ধার করে ছাপিয়েছেন। প্রতিটি চিত্রের যথাযথ বিবরণও দিয়েছেন। চিত্রগুলির বিবরণ যথাক্রমে নিম্নরূপ—

১. “পাশাপাশি অবস্থানে দুটি টেরাকোটার এক একটিতে একজন কুশীলব যোদ্ধার ভূমিকায় ঢাল ও তরবারি হাতে বীরের ভঙ্গিতে গতিশীল, অন্যটিতে আরেকজন যোদ্ধা তারই মুখোমুখি বীরের ভঙ্গিতে ক্রিয়াশীল।”^{৩১}
২. “চিত্রে একজন অভিনেতা তার সহ-অভিনয়শিল্পীর পিঠের উপর একটি পা তুলে দিয়েছে। এক্ষেত্রে অভিনেতা পিঠে তুলে দেওয়া পায়ের হাঁটুতে এক হাতে ভর দিয়ে অন্যহাতটি উঁচিয়ে পদদলিত ব্যক্তিকে আঘাত করতে উদ্যত। পাশের টেরাকোটাতে বিচিত্র অলঙ্কারে শোভিত একজন ধনুকধারী অভিনেতাকে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে।”^{৩২}
৩. “অভিনয় উপকরণ হিসেবে একটি সাপ নিয়ে একজন নৃত্যশিল্পী বা নাট্যাভিনেতা নৃত্য ভঙ্গিতে ক্রিয়াশীল। অভিনেতার হাত ও পায়ের কৌণিক অবস্থান এক ধরনের গতিশীল নৃত্য বা নাট্যাভিনয়কে প্রমাণ করে। অভিনেতার পরিধানের ধুতি কোমরে গিঁট দিয়ে বাঁধা এবং কণ্ঠে অলঙ্কার হিসেবে কণ্ঠহার দৃশ্যমান।”^{৩৩}
- ৪ এবং ৫ নং চিত্রের “প্রথমটিতে একজন কুশীলব বুক ও কাঁধে একখণ্ড বস্ত্র বা উত্তরীয় পেঁচিয়ে একটি বাহুর নিচে ছড়িয়ে দিয়ে হাতটি কোমরে সংযুক্ত রেখেছে। অন্য হাতটি দেহের অন্যপাশে কাঁধ বরাবর তুলে রাখা। দ্বিতীয় চিত্রে ধুতি পরিহিত আরেকজন অভিনেতাকে গতিশীল ভঙ্গিতে নৃত্যরত দেখা যাচ্ছে।”^{৩৪}
- ৬ এবং ৭ “চিত্র দু’টিতে নৃত্য বা নাট্যাভিনয়ে ব্যবহৃত সাজ-পোশাকের দৃষ্টান্তের সঙ্গে অভিনয়ের গতিশীল ভঙ্গির প্রমাণ রয়েছে।”^{৩৫}
৮. “বিবিধ অলঙ্কার শোভিত একজন অভিনেতা নৃত্য বা নাট্য ভঙ্গিরত। অভিনেতার দুই কানে কুণ্ডল, কণ্ঠে কণ্ঠহার, কোমরে বিশেষ ধরনের নকশা আঁকা বস্ত্র বাঁধা। এক্ষেত্রে অভিনেতা দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে একটি হাত উপরে তুলে মাথার কাছাকাছি রেখে অপর হাতটি বুক বরাবর ধরে রয়েছে।”^{৩৬}
- ৯, ১০, ১১ এবং ১২ “চিত্রগুলোতে প্রাচীন বাংলার লোকায়ত মানুষের জীবনচিত্রের পাশাপাশি সেকালের লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন পরিবেশনা শিল্পরীতির পরিচয় বহন করে। উপরের একটি টেরাকোটাতে বৃক্ষকেন্দ্রিক মানুষের জীবনচিত্রের প্রতিচ্ছবি এবং অন্যটিতে

মানুষের বাস্তব জীবনের হেঁটে যাবার গতিশীল ভঙ্গি দৃশ্যমান।
নিচের দু'টি চিত্রে নৃত্য ও নাট্যাভিনয় ভঙ্গির প্রমাণ রয়েছে।”^{৩৭}

১৩. “চিত্রে নাটকের পোশাক পরিহিত একজন অভিনেতা দৃশ্যমান। এখানে অভিনেতা হাত দু'টিকে কৌণিক অবস্থানে নিয়ে নিজের কোমরে বেঁধে বিশেষ ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে।”^{৩৮}

১৪. “মাথার চুল ও কানকে অলঙ্কার সজ্জিত করে গাছের পাতার পোশাক পরে হেঁটে চলেছে এক অভিনেত্রী। হেঁটে চলার অভিনয়ে স্তন যুগলকে সে কৌশলে এক হাতে ঢেকে অন্য হাতটি ঝুলিয়ে রেখেছে।”^{৩৯}

বুদ্ধ নাটকের প্রাচীনত্ব বিষয়ে সাইমন জাকারিয়া বিভিন্ন তথ্য উদ্ধার করেছেন। তাঁর মতে গৌতম বুদ্ধের জীবনকালে সাধারণ জনসমাজে নৃত্য, গীত ও নাট্যাভিনয়ের প্রচলন ছিল। আর মহামতি গৌতমবুদ্ধ তাঁর শিষ্যদেরকে সেই নাচ গান ও অভিনয় দেখতে শুনতে নিষেধ করেছিলেন। এ বিষয়ে সাইমন জাকারিয়া তাঁর গ্রন্থে ম্যাক্স মূলারের একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন—

‘Where as some recluses and Brahans, while living on food provided by the faithful, continue addicted to visiting shows (this word, found here, has always been rendered theatrical representations); that is to say (1) Nautch dances (nakkam) (2) Singing of music (gitam) (3) Instrumental music (vaditam) (4) Shows of fairs (pekkham),.....Gotama the recluse holds aloof from visiting such shows.’^{৪০}

সাইমন জাকারিয়ার মতে এ রকম একটি বিবরণ থেকে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে, গৌতমবুদ্ধের সময়ে এক ধরনের নাট্যাভিনয়-রীতির প্রচলন ছিল, যা তাঁর শিষ্যদের ধর্মসাধনার জন্য অনুকূল ছিল না, বরং তা ছিল সাধনার একাগ্রতার প্রতিবন্ধক। অর্থাৎ বহু আগে থেকেই যে সমাজে বৌদ্ধ নাটকের অভিনয় হতো, সেকথা খুব সহজেই অনুমান করা যায়। বৌদ্ধ নাটকের বিষয়বস্তু ছিল মূলত বুদ্ধের জীবন ও বাণী নির্ভর। ভগবান গৌতমবুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনা ও তাঁর উপলব্ধ জীবন সত্যকে শিষ্যদের কাছে প্রত্যক্ষ করে তোলাই ছিল এই নাটক লেখা ও তার অভিনয়ের মূল লক্ষ্য। নাটকগুলির প্রকৃতি বিষয়ে সাইমন জাকারিয়া বলেছেন এগুলি আসলে ‘মিস্ট্রি’ ও

‘মিরাকেল প্লে’র মতো ছিল। চর্যাপদগুলির সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গে সাইমন জাকারিয়া জানিয়েছেন—

“চর্যার গীত বা সংগীতরূপ সম্পর্কে দ্বিমত করার কোনো কারণ নেই। কেননা, চর্যার পদসমূহ যে গীত হতো, তার আরেকটি প্রমাণ পাওয়া যায় চর্যার প্রকাশিত সকল সংকলনেই। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক অতীন্দ্র মজুমদার বলেন— “প্রত্যেকটি চর্যাপদের মাথায় সিদ্ধাচার্যদের আর কোনো নির্দেশ থাকুক না থাকুক— একটি নির্দেশ সুস্পষ্ট। সেটি রাগরাগিণীর উল্লেখ। মল্লার, মালশী, বঙ্গালী, পটমঞ্জরী, গবড়া, ধনসী (ধানশ্রী?), কামোদ –ইত্যাদি বহু পরিচিত এবং অপরিচিত রাগের উল্লেখ প্রতিটি চর্যার শুরুতেই সিদ্ধাচার্যরা দিয়েছেন। চর্যাপদে এই ধরনের রাগরাগিণীর মোট সংখ্যা ষোলটি। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে পটমঞ্জরী রাগটি— এই রাগে পদের সংখ্যা মোট বারটি। বাকি রাগরাগিণীতে গায় পদসংখ্যা সর্বনিম্ন এক থেকে চার-পাঁচ পর্যন্ত। এদের মধ্যে কতকগুলি রাগ হিন্দুস্থানী মার্গসংগীতের অন্তর্ভুক্ত। কতকগুলির উল্লেখ আছে মার্গসংগীতের শাস্ত্রে। কিন্তু তাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এখনও সঠিকভাবে কেউ কিছু বলতে পারেননি। তবে একথা ঠিক যে—সংগীতশাস্ত্রে যাকে মার্গসংগীত বলে শ্রেণীবদ্ধ করে ও স্থান দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে, সে সমস্তই এসেছে জনপ্রচলিত সহজ সরল লোকসংগীত থেকে। উচ্চকোটির সংগীত পণ্ডিতেরা এক সময়ের জনপ্রচলিত সহজ সরল লোকসংগীতগুলিকে অবলম্বন করে, তাদেরকে নানা অলঙ্কারে সজ্জিত করে এবং নতুন রূপ দিয়ে রাগরাগিণীর শৃঙ্খলে বেঁধেছেন। পরবর্তীতে সংগীত-পণ্ডিতগণ তাদেরকে আবার নানা ঘরানার নামের দোহাই দিয়ে শাস্ত্রীয়-সংগীত হিসাবে জনসাধারণের আয়ত্তের বাইরে নিয়ে যান। এরপর থেকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই ভারতীয় সংগীত ‘শাস্ত্রীয়’ এবং ‘লৌকিক’, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং তাদের ধারাও পৃথক পৃথক খাতে প্রবাহিত হয়েছে। ...

“চর্যা সংকলনের দিকে তাকালে আরও দেখা যায়— তাতে অন্তর্ভুক্ত একাধিক পদের সুর বা রাগ হচ্ছে গবুড়া। কোনো সংগীতশাস্ত্রে এই রাগ বা রাগিণীর উল্লেখ নেই। এমনকি এর গায়ন পদ্ধতি নিয়েও এ পর্যন্ত গবেষকদের পক্ষে সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি। এছাড়া, চর্যার পদশীর্ষে লিখিত বঙ্গাল, দেবক্রী, অরু-সহ আরও কয়েকটি রাগের প্রকৃতি সম্পর্কে চর্যার পদসমূহ থেকে তেমন কোনো কিছুই জানা যায় না।” ^{৪১}

প্রাসঙ্গিকভাবে বিভিন্ন সমালোচকের মন্তব্য তুলে ধরে এবং চর্যার গানগুলির বিভিন্ন রাগ-রাগিণী, ধ্রুবপদ, সুর, তাল, লয় প্রভৃতি বিষয়ে তিনি কিছু আলোকপাত করেছেন। এর সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছেন নৃত্য, গীত, বাদ্যযন্ত্র, গান, পোশাক, অলঙ্কার, পাত্র-পাত্রী, অভিনয়স্থল ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা। প্রতিটি ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তসহ বিস্তৃত বর্ণনা করে প্রাচীন কালের বুদ্ধ নাটকের অভিনয় ও তার সঙ্গে আনুসঙ্গিক প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ তুলে ধরেছেন সাইমন জাকারিয়া। তাঁর সেই আলোচনা তথ্যবহুল আলোচনা, যা অনুসন্ধিৎসু গবেষকের আগ্রহকে উজ্জীবিত করে। গ্রন্থের ভূমিকায় জাকারিয়া নাট্যকারদের সাজ-পোশাক, নৃত্যগীত, বাদ্যযন্ত্র, অলঙ্কার, অভিনয়স্থল এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীর পরিচয় যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি পাহাড়পুরের বৌদ্ধস্তূপের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও বিস্তারিত বিবরণ উদ্ধার ও তা পরিবেশন করেছেন। প্রতিটি পদকর্তার ব্যক্তিগত পরিচয় যেমন উদ্ধার করেছেন তিনি, তেমনি প্রতিটি গানের সুর, তাল, লয়, ছন্দসহ গানগুলিতে প্রকাশিত সমাজ বাস্তবতা, ধর্মীয় সাধন তত্ত্ব, তাৎপর্য ও পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। ‘প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক’ লিখতে গিয়ে চর্যাপদের পদকর্তাদের বিষয়ে গবেষণামূলক বহু তথ্য সাইমন জাকারিয়া উদ্ধার করেছেন, যা একালে বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে।

বেশ কতগুলি চর্যাগান ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে ‘প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক’ নাম দিয়ে সাইমন জাকারিয়া চর্যাপদের নাট্য পুনর্নির্মাণ বিষয়ক অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর গবেষণাধর্মী একটি নাটক রচনা করেছেন। নাটকটির কাহিনি ও প্লট পরিকল্পনা প্রসঙ্গে ‘নাট্যকথা’ অংশে সাইমন জাকারিয়া বলেছেন—

“এই কাহিনিতে আছে—প্রেম, বিবাহ, পরিশেষে দাম্পত্যজীবন এবং তার পরিসমাপ্তি। তাদের সে জীবনের একদিকে আছে সুখ-তৃপ্তি, অন্যদিকে অতৃপ্তি এবং সেই সূত্রে পরকীয়া এবং দাম্পত্যকলহ। তবু স্ত্রী অপহরণে স্বামী অন্তর্জাত বেদনার প্রকাশও লক্ষণীয়। অতএব এই সুষম কাহিনিতে যেমন ধারাবাহিকতা বর্তমান, তেমনই বর্তমান নাটকীয় টানাপোড়েনের যৌক্তিক ভিত্তি। যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে চর্যাপদের নাটক সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিতে তেমন কোনো বাধা থাকে না। আর সে সম্ভাবনার সূত্র ধরেই রচিত হয়েছে এই নাটক।”^{৪২}

চর্যার পদগুলির কাহিনি বিশ্লেষণ করলে নাট্যকারের কথার মূল বক্তব্য আরও বেশি করে স্পষ্ট হয়। ১০ সংখ্যক চর্যাপদে তৎকালীন সমাজের নর-নারীর প্রেমের সম্পর্ক অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে—

“নগর বারিহিরেঁ ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ।
ছইছোই যাসি বাক্ষ নাড়িআ।।
আলো ডোম্বী তোএ সম করিবে ম সাজ
নিঘিণ কাহু কাপালি জোই লাগ।।”^{৪৩}

আলোচ্য এই পদে প্রেমিক পুরুষ কাহু প্রেমিকা নারী ডোম্বীর প্রতি প্রেম নিবেদন করেছে। ১৯ সংখ্যক পদে দেখা যায় কাহু-ডোম্বীর বিবাহের প্রসঙ্গ—

“ভবনির্বাণে পড়হ মাদলা
মন পবণ বেণি করণু কশালা।।
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ-উছালিআঁ
কাহু ডোম্বী বিবাহে চলিআ।।
ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম
জউতুকে কিঅ আগুতু ধাম।।”^{৪৪}

ঢোল, কাঁসি, মাদল, দুন্দুভির শব্দে এবং জয় জয় ধ্বনির মধ্য দিয়ে কাহু ডোম্বীকে বিবাহ করে। এই বিবাহে যৌতুক পায় এবং কাহুর নবজন্ম হয়। ২০ সংখ্যক পদে ডোম্বী নারীর হৃদয় যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত হয়েছে—

“হউঁ নিরাসী খমণ ভাতারী।
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই।।
ফেটলিউ গো মাত্র অন্তউড়ি চাহি।
জা এথু চাহন সো এথু নাহি।।
পাহিলে বিআণ মোর বাসন-পুড়া।
নাড়ি বিআরন্তে সেঅ বাপুড়া।।”^{৪৫}

আলোচ্য পদে ডোম্বী বলেছে তার স্বামীর মনটা শূন্য, কামনাবিহীন। কাম বাসনায় একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিলেও সে বেঁচে নেই। এখন তার জীবন ভীষণভাবে নিরাশায় ভরা। ২ সংখ্যক চর্যাপদে বিবাহিতা নারীর স্বামীর অক্ষমতার কথা যেমন আছে, তেমনি আছে নারীর পরকীয়া প্রেম নিবেদনের কথা—

“দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।

রুখের তেন্তুলি কুস্তীরে খাত।।

.....

দিবসই বহুড়ী কাড়ই ডরে ভাত

রাতি ভইলে কামরু জাত।।”^{৪৬}

আলোচ্য পদে পদকর্তা কুকুরীপাদ রসিকতা করে বলেছে গাছের তেঁতুল যেমন গৃহকর্তার অগোচরে কুমিরে খেয়ে যায়, তেমনি অক্ষম পুরুষের পত্নীকেও অন্য পুরুষ সম্বোগ করে। কোনো কোনো নারী স্বামীর অক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত যৌবনের চাহিদা পূরণ করে রাত্রিবেলায় পরকীয়া প্রেমের দ্বারা। ১৮ সংখ্যক পদে কাহ্নু তার বিবাহিতা নারী ডোম্বীকে তিরস্কার করেছে অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক করার জন্য। ৪৯ সংখ্যক পদে জলদস্যুদের আক্রমণ, গৃহবধূদের লুণ্ঠন এবং পত্নীহারা স্বামীদের হাহাকার প্রকাশ পেয়েছে—

“বাজ গাব পাড়ী পঁউআ খালৈ বাহিউ।

অদঅ বঙ্গাল দেশ লুড়িউ।।

আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী।

গঅ ঘরিণী চণ্ডালৈ লেলী।।

চউকোড়ি ভণ্ডার মোর লইআ সেস।

জীবন্তে মইলৈ নাই বিশেষ।।”^{৪৭}

৫০ সংখ্যক পদে শবর-শবরীর সুখী দাম্পত্য জীবনের চিত্র একদিকে যেমন আঁকা হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে শবরের জীবন পরিণতির অনিবার্যতার (মৃত্যু) দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে—

“চারি বাঁসে গড়িলা রে দিআঁ চঞ্চলী।

তঁহিঁ তোলি সবরো ডাহ কএলা কান্দই সগুণ সিআলী।।

মারিঅ ভবমত্তা রে দহ দিহে দিধলি বলী।

হের সে সবরো নিব্বাণ ভইলা ফিটলি সবরালী।।”^{৪৮}

এইভাবে চর্যার একাধিক পদ ধারাবাহিকভাবে অন্বেষণ ও সংযোগ সাধন করে সাইমন জাকারিয়া ‘প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক’ রচনা করেন। চর্যার এই জীবনভাবনায় আধুনিককালের নাটকের সাক্ষাৎ মেলে। তেমনি পাওয়া যায় একালের ভাষার পরিচয়। ফলে চর্যাপদ পুরাতন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন হলেও নাট্যকারের লেখনীতে পুনর্নির্মিত ও নবনির্মিত আধুনিক নাটক হয়ে উঠেছে।

সাইমন জাকারিয়া : বোধিধ্রু (২০১৪) ;

চর্যাপদের কাহিনি অবলম্বন করে সাইমন জাকারিয়া লিখেছেন ‘বোধিধ্রু’ নামের একটি নাটক। নাটকটি প্রকাশিত হয় ২০১৪ সালে। ১৭.৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১১ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটির প্রচ্ছদপত্র (২), নামপত্র (২) মুখবন্ধ (২), ভূমিকা (৭), মূল নাটক (৫৮) সহ মোট ৭১টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ-

‘বোধিধ্রু/ একটি বুদ্ধ নাটক/ সাইমন জাকারিয়া।’^{৪৯}

নাটকের নামপত্র এইরূপ—

‘বোধিধ্রু /একটি বুদ্ধ নাটক।’^{৫০}

নাটকটি পার্শ্বশঙ্কর বসু কর্তৃক নয়্যা উদ্যোগ, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা- ৭০০০০৬ থেকে প্রকাশিত এবং সারদা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৭/১ গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন, কলকাতা- ৭০০০৬৭ থেকে মুদ্রিত। গ্রন্থের প্রচ্ছদে বুদ্ধদেবের ধ্যানরত একটি হলুদ রঙের পাথরের মূর্তির চিত্র অঙ্কিত আছে।^{৫১} নাটকটির সম্পর্কে ‘মুখবন্ধে’ সাইমন জাকারিয়া বলেছেন—

“বাংলা নাটকের ঐতিহাসিক পরম্পরা সহস্রাধিক বছরের পুরানো। সেই ঐতিহাসিক পরম্পরায় ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ‘ন নৈরামণি’ নামে ‘বোধিধ্রু’ নাটকটির প্রথমপাঠ রচনা এবং নিজের সম্পাদনায় ‘সহজিয়া’ নামের একটি সাহিত্য পত্রিকায় তা প্রকাশ করি। এরপর ‘ন নৈরামণি’ নামের সেই প্রথম পাঠটি ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে যথাক্রমে কলকাতার ‘বঙ্গ বসুন্ধরা’ সাহিত্য পত্রিকায় কবি উৎপলকুমার বসু-র ভূমিকা এবং ‘স্যাস’ নাট্যপত্রে একজন বিশেষজ্ঞের মতামতসহ প্রকাশিত হয়। একই বছর নাটকটি প্রযোজনা হিসেবে মঞ্চে আনে বাংলাদেশের আবৃত্তি প্রযোজনা হিসেবে মঞ্চে আনে বাংলাদেশের আবৃত্তি সংগঠন ‘স্বরবৃত্ত’। শুনেছি উক্ত আবৃত্তি প্রযোজনার নির্দেশক রবিশঙ্কর মৈত্রী কর্তৃক নাটকটির অংশবিশেষ ফ্রান্স, ইটালিসহ পৃথিবীর নানা দেশে উপস্থাপিত হয়েছে।...চর্যা-র বাণী মাধুর্য, সুরসংগতি ও আখ্যান-সূত্রের সুনিপুণ বর্ণনার গাঁথুনিতে রচিত এই শিল্পকর্ম ‘বোধিধ্রু’-এর পথ ধরে প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটকের ঐতিহাসিক পরম্পরায় পুনর্জাগরিত হোক।”^{৫২}

গ্রন্থটির ভূমিকা অংশে নাট্যকার বলেছেন—

“‘বুদ্ধ নাটক’ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে এ যাবৎকালে প্রাপ্ত বাংলা ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্য-সাংস্কৃতিক নিদর্শন চর্যা-র গীত-বণীতে। প্রাচীন বাংলার এই নাটক পরিবেশনার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন বীণাপা, তিনি চর্যা-র ১৭ সংখ্যক পদে বলেছেন—নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী/ বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই। এর অর্থ—বজ্রাচার্য (যিনি সাধক) নাচছেন, দেবী (যিনি সাধিকা) গান করছেন, আর তাই ‘বুদ্ধ নাটক’ বিপরীতভাবে পরিবেশিত হয়।”^{৫২}

সাইমন জাকারিয়া এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন চর্যাপদের কালে বুদ্ধ নাটক ছাড়াও আরো কিছু নাটকের অভিনয় হতো। সেই কারণে ‘বুদ্ধ নাটক’ গুলিকে ‘বিসমা’ বলা হত। খ্রিস্টাব্দ অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত চর্যাকেন্দ্রিক একটি বিশেষ ধরনের নাট্যরীতির প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। বিংশ শতকের গোড়ার দিক থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের গবেষকগণ চর্যাপদ অন্বেষণে রত আছেন। তাঁরা শুধু পদ সংকলন করলেন না, উপরন্তু নেপাল তিব্বতে চর্চিত নতুন চর্যা-সংস্কৃতি সম্পর্কে তথ্য হাজির করেছেন। ২০০৯ সালে সাইমন জাকারিয়া নেপালে গিয়ে তার চলমান পরিবেশনার ধারা লক্ষ্য করেছেন। এই ঐতিহাসিক চলমানতা সাম্প্রতিক কালেও বহমান। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের চাকমা নৃগোষ্ঠীদের মাঝে ‘বুদ্ধ কীর্তন’ নামে বিশেষ এক ধরনের নাট্য ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যাকে প্রাচীন বুদ্ধ নাটকের সাম্প্রতিক ঐতিহ্যের রূপ বলা চলে। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন যে চর্যার সংকলিত পদগুলি গভীরভাবে পাঠ ও বিশ্লেষণ করলে, তাতে ব্যবহৃত গীত, সংলাপ, বর্ণনা পাওয়া যায়, তা নিঃসন্দেহে আধুনিক নাটকের পরিচয় বহন করে। গবেষক সেলিম আলদীন মনে করেছেন যে চর্যার পদগুলো পরিবেশনার শুরুতে, মাঝখানে ও শেষে থাকতো সুনির্দিষ্ট কোনো কাহিনির বর্ণনা এবং তার ব্যাখ্যা। এই মত থেকে আরো জোরের সঙ্গে বলা যায় প্রাচীন চর্যাপদ নাট্যমূলক পরিবেশনার একটি গীতি সংকলন। সাইমন জাকারিয়া চর্যাপদে উদ্ধৃত ‘বুদ্ধ নাটক’ সম্পর্কে জানিয়েছেন—

“প্রাচীন বাংলার চর্যা-র অভ্যন্তরস্থ কাহিনী বিচারে যায় যে- ১০ সংখ্যক পদে আছে, গ্রামীণ জীবনে একজন কাহু নিজের জাত-পাতে বিসর্জন দিয়ে লোকসমাজের বাইরের কোনো এক অচ্ছুত ডোম্বীর উদ্দেশ্যে প্রেম নিবেদন করেছে; এবং ১৯ সংখ্যক পদে সেই কাহু বাদ্য বাজিয়ে ডোম্বীকে

বিবাহ করতে যায়। আর বিবাহ করে কাহ্নু নব জীবন পায়। পদকর্তার ভাষায়- এই নবজন্ম হয়তো সমাজের উঁচু স্তরে জন্ম নেওয়া কাহ্নু-র নিচু জাতে বিবাহ করার রূপকে প্রকাশ পেয়েছে, এরপরেও কাহ্নু সেই খেদ ভুলেছে। কেননা জাত হারলেও বিবাহে সে প্রচুর যৌতুক পেয়েছে। বিবাহের মাধ্যমে দাম্পত্যজীবনে কাহ্নু বেশ সুখিই ছিল, চর্যা-র ১০ সংখ্যক পদ হতে সেকথার প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে।”^{৫৩}

নাট্যকার সাইমন জাকারিয়া ‘বোধিধ্রু’ নাটকের আখ্যান বিশ্লেষণ করেছেন চর্যার পদ অবলম্বন করে। মানুষের সামাজিক জীবনের সুখ-দুঃখ, তৃপ্তি-অতৃপ্তি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, পরকীয়া প্রেম, দাম্পত্য কলহ, বধূ অপহরণ প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরেছেন তিনি নাটকীয়ভাবে। প্রসঙ্গত তিনি বলেছেন—

“বোধিধ্রু’ নাটকটিতে মূলত চর্যাপদ অভ্যন্তরস্থ কাহিনী অনুসরণের চেষ্টা থাকলেও এতে পদকর্তাদের জীবনী ও রেখাচিত্রের দিকে যেমন, তেমনই সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধবিহার এবং তার মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ সুবিন্যস্ত টেরাকোটাগুলোর প্রতি। এছাড়া, বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় প্রস্ফুটনে বাঙালির ইতিহাস পাঠ ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সাথে সাথে কল্পনার পেখম মেলে উড়ে যেতে হয়েছে সুদূর চর্যায়ুগে। দেখতে হয়েছে কাহ্নু-ডোম্বীর প্রেম-বিবাহ, দাম্পত্যজীবন, সংকট, বিচ্ছেদ-বিরহ এবং বিধবা ডোম্বীর প্রতি ব্রাহ্মণ এক তরুণ পদকর্তার প্রেম ও বিদ্রোহ, সেইসাথে আরো দেখতে হয়েছে বিপন্ন দেশবাসীকে, ভুসুককে, এমনকি লোকায়ত বৌদ্ধ ধর্মের কৃত্যে ও বিকৃতিতে ন্যস্ত রহস্যময় চরিত্র কুকুরীকে।

“চর্যা-র কাহিনী হিসেবে গৃহীত হওয়াতে এই নাটকের আখ্যানবস্তু সময় ও প্রেক্ষাপটের বিচারে সুদূর প্রাচীনযুগের হয়েও তা একই সাথে সাম্প্রতিক এবং শাস্ত্রতকালের স্মারক বক্তব্য উপস্থাপন করেছে বলেই আমাদের ধারণা। এই নাটক রচনায় সেই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কিছুটা কল্পনা, কিছুটা বাস্তবে চর্যায়ুগের চরিত্রদের সাথে বসবাস করতে হয়েছে।”^{৫৪}

সাইমন জাকারিয়া জানিয়েছেন যে বীণাপা রচিত চর্যার ১৭ সংখ্যক পদে ‘বুদ্ধ নাটক’ শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। চর্যার একাধিক পদে প্রাচীন বাংলার যে পরিবেশনা

রীতির পরিচয় পাওয়া যায় তা মূলত এক ধরনের সাংগীতিক পরিবেশনা, যার সঙ্গে রাগ-রাগীর ব্যবহার যুক্ত হয়ে আছে। এমনকি কিছু পদে চর্যার সমসাময়িক কালের সাংগীতিক পরিবেশনার সঙ্গে নৃত্য ও নাট্যের পরিচয় মেলে। চর্যাপদগুলি যখন গায়কের কণ্ঠে পরিবেশিত হতো, তখন রচয়িতার ভনিতায় ‘গীত’, ‘গাইতু’, ‘গাইল’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হত। এখনও বাংলাদেশের সাধন সঙ্গীতে পদ-পদাবলীর ভণিতা অংশে এ ধরনের শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, তেমনি চর্যার সমসাময়িক কালে নির্মিত সোমপুর বিহার ও তার মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ টেরাকোটা চিত্রের ব্যবহার পাওয়া যায়।

চর্যাপদের ঐতিহাসিক গবেষণাধর্মী তথ্য অন্বেষণ করে সাইমন জাকারিয়া বলেছেন যে নেপালের জাতীয় ঐতিহ্যের অংশ ছিল চর্যা-সংস্কৃতি। সেই সময় তিন ধরনের পরিবেশন রীতি প্রত্যক্ষ করা যায়। এক, বৌদ্ধ মন্দির প্রাঙ্গণে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সমবেত কণ্ঠে চর্যাগানের পরিবেশন। দুই, মন্দির প্রাঙ্গণে চর্যার হাতে লেখা পুথি পাঠ। তিন, গীতসহ চর্যার অভিনয়। তাদের এই ধরনের ধর্মীয় আচরণ বা গীতিনাট্যের অভিনয়ের মূল লক্ষ্য ছিল জনগণের বৌদ্ধ ধর্মশিক্ষা বিস্তার। কিন্তু রাজনৈতিক উত্থান পতনের ফলে সেন রাজাদের আধিপত্য কয়েক হলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কবিগণ বিপন্নতার মুখোমুখি হন। তখন তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মানুসারী পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল ও তিব্বতে চলে যান। জাকারিয়া মনে করেছেন যে সম্ভবত সেই সূত্রেই নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগারে স্থান পায় বাংলাদেশের প্রাচীনতম সাহিত্য-সাংস্কৃতিক নিদর্শন চর্যার প্রাচীন পাণ্ডুলিপি।

চর্যার গীতি-নৃত্যের অভিনয় সম্পর্কে জানতে সাইমন জাকারিয়া নেপালে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান—

“নেপালে বৌদ্ধ সংস্কৃতির অংশ হিসেবে স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরের চূড়ায় নিত্য যেমন বৌদ্ধ ধর্মের উপাসনা সম্পাদিত হয়, তেমনি সমকালীন চর্যার গান গীত হতে দেখা যায়। সেখানে দেখা যায়, একদল সাংগীতরসিক হারমোনিয়াম, তবলা, করতাল বাজিয়ে সমকালীন নেওয়ারি ভাষার নিরন্তর চর্যা পরিবেশন করেন, যার সুর বাংলা কীর্তনের মতো। এ পর্যায়ে আমরা স্মরণ করতে পারি, আজ থেকে শতাধিক বছর আগে চর্যাগীতির পরিবেশনারীতি সম্পর্কে এর আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্য। তিনি লিখেছিলেন চর্যার গানগুলো কীর্তনের মতো এবং সমকালীন কীর্তনের মতো তা আসরে গীত হতো। নেপালের স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরের পরিবেশিত

চর্যার সমকালীন আসরটি তার ব্যতিক্রম নয়। অতএব, বৌদ্ধ সংস্কৃতির কীর্তন গানের ধারা প্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি প্রবাহমান রয়েছে।”^{৫৫}

এই অনুসন্ধানে প্রাচীন বুদ্ধ নাটকের পরিবেশন রীতির জীবন্ত রূপের পরিচয় মেলে একালে বাংলাদেশের চাকমা নৃত্য গোষ্ঠীদের মাঝে। এই প্রসঙ্গে চাকমা গোষ্ঠীর পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন হয়—

“চাকমাদের বাস বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ভারতের সীমান্ত ঘেঁসে পার্বত্য এলাকায়। এই জনগোষ্ঠী মূলত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পার্বত্য চট্টোগ্রামে চাকমাদের বসবাসের নজির আছে। ১৫৬১ সালে এক ইউরোপীয়দের আঁকা ছবি থেকে বাংলার যে মানচিত্র পাওয়া যায় সেখানে চাকমাদের অবস্থানের প্রমাণ আছে। চাকমাদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে, ভাষার নাম চাক বা চাকমা। এই ভাষার বর্ণমালাও রয়েছে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টোগ্রামে চাকমাদের সংখ্যা ২ লাখ ৩৯ হাজার ৪১৭ জন। তবে, বর্তমানে চাকমাদের জনসংখ্যা পাঁচ লক্ষাধিক বলে ধারণা করা হয়।..... চাকমা জনগোষ্ঠীর মৌখিকরীতির পরিবেশনার মধ্যে ‘গেংখুলী গীদ’ অন্যতম। এই রীতিতে চাকমা ভাষায় একাধিক পালা যেমন—‘রাধারমন-ধনপুদি’, ‘সান্দবীর বারমাসী’ ইত্যাদি। মূলত একজন গায়ক কর্তৃক বর্ণনাত্মক সংগীত আকারে চাকমাদের ‘গেংখুলী গীদ’-এর পালাগুলো বিভিন্ন উৎসব-আমোদে পরিবেশিত হয়। অপরপক্ষে চাকমাদের মধ্যে একাধিক নাট্যশিল্পী কর্তৃক আঙ্গিক-অভিনয়, নৃত্য, গীত ও সংলাপ আকারে ‘সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ’ নামে বুদ্ধকীর্তনের ধারায় ‘বুদ্ধ নাটক’-এর এক ধরনের নাট্যপালার পরিবেশনা প্রচলিত। এ ধরনের নাট্য-পরিবেশনা সাধারণত কৃত্যমূলক এবং তা সচরাচর কারো মৃত্যু হলে তার শ্রদ্ধার অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়।”^{৫৬}

চাকমা গোষ্ঠীর নাটকগুলি মূলত ‘সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ’ বিষয় অবলম্বনে রচিত হয়েছে। এই নাটকের গানে তাঁদের সামগ্রিক দর্শন প্রকাশিত হয়। শুধু চাকমা গোষ্ঠী নয়, সেকালেও বুদ্ধ নাটকের আসরে সাধারণত বৌদ্ধ ধর্মের সাধন পদ্ধতি, গৌতমবুদ্ধের জীবন আখ্যান পরিবেশিত হত। তবে তাদের ভাবনাতে মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীর কিছু সাদৃশ্য মেলে। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় প্রাচীন বুদ্ধ নাটকের প্রবাহ বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে চর্যা গীতিকবিতার সাঙ্গীতিক ধারা নবরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে।

‘বোধিচরম’ নাটকের কাহিনির সূত্রপাত চর্যার পদ অনুসরণ করে—

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী

বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই।। ধ্রু।।”^{৫৭}

বজ্রাচার্য প্রভু যখন বুদ্ধনাটকের আসরে ‘বঙ্গালবাসী’র উদ্দেশ্যে বোধিচিহ্ন দানের কথা বলেন, তখন তরুণ কাহ্নু বোধিচিহ্ন লাভের জন্যে প্রার্থনা জানিয়েছে— ‘প্রভু প্রভু বোধিচিহ্ন চাই আমি...দাও দাও আমাকে বোধিচিহ্ন।’ উত্তরে বজ্রাচার্য প্রভু তাকে জানায়— “হ্যাঁ হ্যাঁ বোধিচিহ্ন পাবে...তার আগে বিবাহ করে চীত্র মাঝের ইন্দ্রিয় সুখ জাগাও। মরজীবনের ইন্দ্রিয় সুখ মেটাও।” নিরাশ হয়ে কাহ্নু ঘরে ফিরে আসে। প্রভুর কথামতো একসময় কাহ্নু ডোম্বীকে বিবাহ করে এবং মধুর দাম্পত্যজীবন কাটাতে থাকে। ‘তখন কাহ্নু ভাবে যে সে এক প্রমত্ত পরগামী কাহ্নু।’ আর তাকে নিয়েই ডোম্বী- মাঝির নৌকা ভেসে যায়। কখনো কাহ্নুর মনে হয় যে জীবনের ‘সুরতসঙ্গের নদীতে’ ডোম্বী-ই নৌকা আর সে নিজে মাঝি হয়ে প্রমত্ত নদীর ঢেউ রাশিকে অতিক্রম করে যেতে চায়। মধুর জীবনের সুর তরঙ্গে ভেসে কাহ্নুর মন-পবনে নিঃশব্দে গান বাজে—

“দুটি অঙ্গ এক হলে পৃথিবীতে আসে আলো

দেহ-মন-প্রাণ সেই আলোতেই

করে ওঠে ঝলোমলো।”^{৫৮}

এর মধ্যেই ‘বঙ্গালে’ পুনরায় বুদ্ধ নাটকের দল আসে। আসেন বজ্রাচার্য প্রভু। বুদ্ধদেবের জীবনকথা নিয়ে আসরে নাটকের অভিনয় হয়। এই আসরেই প্রভুকে কাহ্নু বলে— ‘প্রভু আজ আমার আত্ম-সংবোধের মোহ ভেঙেছে...” কিন্তু ডোম্বী তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় আপন গৃহে। প্রভু বজ্রাচার্য ডোম্বী ও তার পরিবারের লোকজনকে বলে— ‘সো এমু নাহি...কাহ্নুর দৃঢ়তা দেখে বলছি—পরম এই আত্মার শপথ ফিরে যাও তোমরা...” ডোম্বী কাহ্নুকে আর ফেরাতে পারে না। সে সকলকে অতিক্রম করে এগিয়ে যায় পরমাত্মার দিকে। কাহ্নু বোধিচিহ্নের জন্য সুদূর নেপালের পথে যাত্রা করে। এদিকে ডোম্বী মৃত পুত্র প্রসব করে। তার অন্তর বেদনায় ফেটে পরে। বুদ্ধ নাটকের কুকুরী এসে ডোম্বীকে খবর দেয়—‘কাহ্নু বোধিচিহ্ন পেয়েছে।’ ডোম্বী বুঝতে পারে কাহ্নু আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। ইতিমধ্যে দস্যুদল আক্রমণ করে বঙ্গদেশ। ডোম্বী পালায় কিন্তু বন্ধী-বউ পালাতে চায় না। কুঠার নিয়ে দস্যুর মুখোমুখি হয় প্রতিশোধ নিতে। তার একমাত্র সন্তানকে এই দস্যুরাই হত্যা করেছিল তারই চোখের সামনে। ভুসুকু বন্ধীকে বাঁচানোর চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। সে দস্যুদের হাতে আঘাত পায়। বন্ধীকে তারা বিবস্ত্র করে আদিম অত্যাচারের উল্লাসে ফেটে পরে। তাকে ধরে নিয়ে যায় দস্যুদল। একসময় বন্ধী বিভ্রান্তের

মতো ক্ষত-বিক্ষত দেহ নিয়ে ফিরে আসে। ডোম্বী ও বঙ্কী প্রতিবাদহীন, হৃদয়হীন সমাজ-সংসারকে ত্যাগ করে এগিয়ে যায় অনিশ্চিত জগতে। সে বলে-

“যে সমাজ-সংসারে বিপন্নের কোনো স্থান নাই...আছে কেবল বিপন্নের অপমান প্রত্যাখ্যান। সেই সমাজ-সংসারের প্রতি ডোম্বীর মনে তীব্র অভিমান। সে তাই বঙ্কীর বিপন্নতার সাথে স্বামী কাহুর বোধিচিন্ত প্রাপ্তিতে নিজের একাকিত্বের বিপন্নতা আর মৃত-সন্তান প্রসবের বিপন্নতাকে মিশিয়ে নিয়ে অনিশ্চিত পথে বেরিয়ে পড়ে বওকীর সাথে।”^{৫৯}

একসময় তাদের ঠিকানা হয় কুকুরীর বুদ্ধমন্দিরে। কুকুরী ডোম্বীকে নৃত্য শেখায়। বুদ্ধ নাটকের আসর জমে ওঠে ডোম্বীর নৃত্য-গীতের পারদর্শিতায়। কুকুরী ডোম্বীর কাছ থেকে শারীরিক সুখভোগ পেতে চায়। ডোম্বী উপায় না দেখে কাউকে না জানিয়ে অন্ধকার পথে অজানার জগতে পাড়ি দেয়। ‘জীবন নদীর পরিবর্তে ডোম্বী এখন জলের নদীতে পাটনি হয়ে যায়।’ লোকালয়ের বাইরে সে বসত গড়ে। কিন্তু রাজার লোক এসে তাকে আক্রমণ করে—‘অপনা মাংসে হরিণা বৈরী।’ এই পাটনী-জীবনে ডোম্বীর সঙ্গে দেখা হয় তরুণ কবি কাহুর। সরল চিত্তের যুবক কাহুর জন্যে তার অন্তরে দুর্বলতা তৈরি হয়। কবি কাহুর সমাজের লোকেরা ডোম্বীকে ‘নৈরামণি’ বলে অপবাদ দেয় এবং আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে। কবি কাহু ভালোবাসার আঘাতকে সহ্যে পারে না। সে সমাজ-সংসারের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে ডোম্বীর পায়ে নিজেকে সমর্পণ করে। এরপর—‘ডোম্বীর আঁচল হতে রক্ত লোহিত সিঁদুর সংগ্রহ করে কাহু রাঙিয়ে দেয় ডোম্বীরই সিঁথি।’ তাদের মিলন প্রকৃতির বুকে চঞ্চলতা তৈরি করে। আক্রমণকারীর ভয়ে তারা বন ছেড়ে পালায়। এই প্রসঙ্গে নাট্যকারের দেওয়া বিবরণ অতি মনমুগ্ধকর। তিনি বলেছেন-

“সহসা প্রেমময় আত্মার অনুভবে কাহু-ডোম্বী হরিণ-হরিণী রূপে একে অপরকে সঙ্গী করে ছুটতে থাকে...যে ছোট্ট গতিতে তাদের সঙ্গী হয়ে ওঠে প্রকৃতির অপরূপ লীলা—বায়ু নদী পাখি আর গান। তারা ছুটতে থাকে প্রেমময় আত্মার অনুভবে জগত-সংসারে। পৃথিবীতে তাদের প্রেমের সেই গতিময় মহিমা অনন্তকাল ধরে প্রবহমান রয়...আজও কান পাতলে তাদের প্রেমগাঁথা চর্যার শরীর থেকে বাংলার মানুষের মনে ছড়িয়ে পড়ে। এই আখ্যান তারই প্রমাণ। জাতের প্রেমময় আত্মার মঙ্গল হোক। আর নিত্য আনন্দে জেগে থাক বাংলার শাস্ত্রত রূপ।”^{৬০}

নাট্যকার সাইমন জাকারিয়ার এই ‘বোধিদ্ৰুম’ নাটকটি পুরাতন ভাবনাজাত হলেও আধুনিক নাটক। এই নাটকের ভাবনা, ভাষা পরিবেশ—সমস্ত কিছুই আধুনিক মানুষের জীবনকথার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। এমনকি চরিত্রগুলির যুক্তিবদ্ধ বাক্য বিন্যাস ও বক্তব্য আধুনিক মানুষের মতো। কবি কাহ্নু ও তার পিতার কথোপকথনের মধ্যে এর প্রমাণ মেলে—

—‘ডোম্বীকে সাঙ্গ করতে চাও কোন সাহসে...তুই কি জাত-পাতের মাথা খেয়েছিস...।’

—তাই হয়তো...কিন্তু বাবা...তোমার কাছে একটা প্রশ্ন...

—প্রশ্ন...

—হ্যাঁ বাবা...প্রশ্ন...একটা সামান্য প্রশ্ন... আচ্ছা বাবা বলো তো...ডোম্বী যদি ব্রাহ্মণের পারাপারের জন্য নির্বাচিত হতে পারেও...তবে কেন সাঙ্গার জন্য নির্বাচিত হতে পারবে না...কেন...

—এমন কথা শোনামাত্র কাহ্নুর পিতা অকস্মাৎ কাহ্নুকে একটা চপেটাঘাত করে বলে—

—চুপ কর বারুণী খোর...জাত গেলে সমাজে আমাদের থাকে কী...

—সমাজ... যেখানে মানুষ থেকে জাত বড়- সে কি সমাজ...আমার খুব প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে... আকাশের চেয়ে মেঘ কি কখনও বড় হতে পারে...নাকি মানুষের চেয়ে জাত...যদি তা-ই হয়... তবে আমি এ সমাজ মানি না... মানি না...আমাকে ক্ষমা করে দিও এখনই চলে যাচ্ছি।’^{৬১}

কবি কাহ্নু ডোম্বীকে ভালোবাসে জাত না দেখে। এখানে কাহ্নু সবকিছুর ঊর্ধ্বে একজন উদার মানব-প্রেমিক পুরুষ। তাই বন্ধু ভাদেকে সে বলছে —

“জানি আমি ব্রাহ্মণ। কিন্তু তার চেয়ে আরেকটি সত্য আমি জানি— আমি মানুষ। ডোম্বীও মানুষ।...এ এক পরম সত্য। এর নাম প্রেম। আমি এ প্রেম মায়ার ভেতর থেকে কিছুতেই নিজেকে বের করে আনতে চাই না।’^{৬২}

এইভাবে জাতি-ধর্মের বিদ্বেষ মুছে ফেলে ‘বোধিদ্রুম’ নাটক আধুনিক হয়ে উঠেছে। সংলাপ রচনায় সাইমন জাকারিয়ার পারদর্শিতা অসাধারণ। কাহিনি-কথনের মাঝে এসেছে চরিত্রগুলির নিজস্ব পরিচয়। কথোপকথনের মধ্যে আমাদের চিনে নিতে পারি কাহুকে, চিনে নিতে পারি ডোম্বীকে বা অন্যান্য চরিত্রগুলিকে। বুদ্ধ নাটকের অভিনয় যখন বজ্রাচার্য প্রভু সমাপ্ত করেন, তখন তিনি মুখে উচ্চারণ করেন-

“ওম্ ওম্ ওম্। তার এই ওম্ ধ্বনি উচ্চারণে পৃথিবীর সকল সম্মোহন—
একবিন্দু মায়া শক্তিতে মিলিত হয়। সাথে সাথে কারো মনে আত্মার
চৈতন্যের বোধ জেগে ওঠে। এই বোধ চন্দ্রাকর্ষী জোয়ারপ্রবণ সমুদ্রের
মতন। কাহু আজ সেই জোয়ার-বোধে সংসার-সমুদ্র থেকে উছলে পড়তে
চায় দূরে বহু দূরে। তার চৈতন্যসত্তায় কূল ভাঙা নব জাগরণ।”^{৬৩}

কাহু প্রভুর কাছে বোধিচিন্তা লাভের কামনা জানায়। বজ্রাচার্য প্রভু এগিয়ে যান, কাহু তাঁর পথ অনুসরণ করে। ডোম্বীর ঘর ও হৃদয় -দুটিতেই শূন্যতা বিরাজ করে। সে এই শূন্যতা মেনে নিতে পারে না। যে সমাজে বিপন্ন নারীর কোনো জায়গা নেই, সেই সমাজকে ডোম্বী ধিক্কার জানায়। স্বামী কাহুর বোধিচিন্তা প্রাপ্তির পর সে পাড়ি দেয় অনিশ্চিতের পথে। একসময় বুদ্ধ মন্দিরের পুরোহিত কুঙ্করী ডোম্বীকে আপন করে পেতে চায়, ডোম্বী তাকেও অতিক্রম করে চলে যায় রাতের অন্ধকারে। জীবন নদীর পরবর্তী পর্বে ডোম্বী কালের নদীতে পাটানির কাজ করে। তখন আর এক তরুণ কবি কাহুর সাথে তার দেখা হয়; ভালোবাসা জন্মে। কবি কাহুকে নিয়ে ডোম্বী পালিয়ে যায়। কাহু ডোম্বীকে বলে তাদের ভালোবাসার পরিণতির কথা -

“সমাজ-সংসার আর জাগতিক ক্ষুধার বিপক্ষে তার গতি। তাইতো যুগে
যুগে ভালোবাসা-প্রাণ মানুষদেরকে এক স্বর্গীয় অনুভূতিতে ছুটে পালাতে
হয়... ছুটে চলতে হয়...দূরে বহু দূরে। কেননা ভালবাসার গন্তব্য থাকে
দূর সুদূরে...তার যাত্রাপথে সীমাহীন গন্তব্যের পথে হারিয়ে যায়...আর
সেখানেই ভালবাসার পরম আনন্দ... চলো আমরা সেই আনন্দে মিশে
যাই.... চলো চলো...”^{৬৪}

সহসা প্রেমময় আত্মার অনুভবে কাহু ও ডোম্বী হরিণ-হরিণীর মতো একে অপরের সঙ্গী হয়ে ছুটে থাকে। পৃথিবীতে তাদের প্রেমের সেই গতিময় মহিমা অনন্ত কাল ধরে প্রবহমান। তাই চর্যার জীবন ভাবনা আজকের জীবন চেতনায় সমানভাবে জীবন্ত হয়ে আছে।

সংলাপ রচনায় সাইমন জাকারিয়ার পারদর্শিতা উল্লেখের দাবি রাখে। কাহিনিকথনের মাঝে এসেছে চরিত্রগুলির নিজস্ব পরিচয়। চরিত্রগুলির কথোপকথনের মধ্য থেকে আমাদের চিনে নিতে হয় কাহ্নকে, চিনে নিতে হয় ডোম্বীকে বা অন্যান্য চরিত্রকে। কবি কাহ্ন হৃদয়ের কাব্যিকতা প্রকাশ করে ডোম্বীকে আবেগের ভাষায় একসময় বলেছে -

“গোপন এক কাব্য-শক্তির অনুপ্রেরণা আমি তোমার মাঝে পেয়েছি ডোম্বী। কাজে কাজেই আমার আর কোন ভাবনা নেই। তোমারই গোপন ইন্ধনে আমি আমি এমন সব পদ বেঁধে যাবো- যে সব পদ হবে অনন্ত আনন্দরূপ। সে পদ তুমি- ডোম্বী তুমি। আমার আনন্দরূপ পদ থেকে তোমাকে কেউ কোনোদিন পৃথক করতে পারবে না।”^{৬৫}

ডোম্বীর ভাষায় একই ভাবে উঠে আসে জীবনের নানা সময়ের সুখ-দুঃখের অনুভূতি। কবি কাহ্নর সাক্ষাৎ পাওয়ার পর ডোম্বী মনে মনে ভাবে -

“কে এই কাহ্ন। কাহ্নর বসতি এখন নেপালে, সে তো বোধিচিত্ত পেয়েই গেছে। আবার কেন কাহ্ন... তবে কি বোধিচিত্তপ্রাপ্ত সেই স্বামী কাহ্নই ফিরে এসেছে আরেক রূপে এই যুবক কাহ্নতে...”^{৬৬}

নাটকের সমস্ত ঘটনার মধ্যেই রয়েছে বাস্তব জীবনের খুঁটিনাটি বিবরণ, আছে climax-এর চমক, আছে সব কালের প্রেমিক-প্রেমিকার ভালবাসা। চর্যার এই জীবনভাবনা সাইমন জাকারিয়া পুনর্নির্মিত করে আধুনিক জীবনচেতনার নাটকে রূপান্তরিত করেছেন।

শিবাশিস মুখোপাধ্যায় - অসম্ভব গোলটেবিল (২০০২);

২০০২ খ্রিস্টাব্দে শিবাশিস মুখোপাধ্যায় চর্যাপদের কাহিনি অবলম্বনে লিখেছেন ‘অসম্ভব গোলটেবিল’ নামের একটি নাটক। ২১ সে.মি লম্বা ও ১৩.৫ সে.মি চওড়া এই নাটকটির প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (১), মূল নাটক (১১) সহ গ্রন্থটিতে মোট ১৩টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকটি ‘বাংলা লোকনাট্য নাটক ও রঙ্গমঞ্চ’ নামক গ্রন্থে বিশ্বনাথ রায় ও ছন্দা রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত। প্রকাশক সঞ্জয় সামন্তের তত্ত্বাবধানে ‘এবং মুশায়েরা’, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ—

“বাংলা লোকনাট্য নাটক ও রঙ্গমঞ্চ/ সম্পাদক/ বিশ্বনাথ রায় ও ছন্দা রায়।”^{৬৭}

প্রচ্ছদপত্রের আভ্যন্তরীণ অংশে বলা হয়েছে—

“নাটকের আলোচনা-সমালোচনায় তাত্ত্বিকদের গবেষণা-বিশ্লেষণে ধ্রুপদী আলোক প্রক্ষেপণে আধুনিককালে নাট্যতত্ত্বের বহুকৌণিক তল গড়ে উঠেছে। নাট্য-সমালোচনা আর শিল্প-সাহিত্যবোদ্ধা নাট্যতাত্ত্বিকের আলোচনার সীমায় আবদ্ধ নেই। নাটক যেহেতু রঙ্গমঞ্চের বিষয়, জন সংযোগের, গণমত সংগঠনের মাধ্যম, তাই আজকের নাট্য-সমালোচনার সীমানা বহুধা বিস্তৃত। এই প্রেক্ষাপটে যৌথশিল্প নাটকের বিশেষত্ব অনুসন্ধান কলম ধরতে এগিয়ে আসেন কবি নাট্যকার অভিনেতা নাট্যনির্দেশক মঞ্চনির্মাতা আলোক প্রক্ষেপক মেকআপম্যানদের মতো নাট্য শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আর্টিস্ট এবং বিশিষ্ট নাট্যপ্রেমীরা। তাঁদের বহুকৌণিক আলোক সম্পাতে নাটকের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের সামনে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নাটকের কাব্যত্ব বা নাটকীয়তার সীমানা ছাড়িয়ে তার বহুমুখী ভাব বিস্তারের অনুপুঙ্খ মর্ম উদ্ঘাটনের প্রয়াসে এই সংকলন। উপসংহারে দুটি নাটকের সন্নিবেশ পাঠকের কাছে উপরি পাওনা বলে বিবেচিত হতে পারে।”^{৬৮}

চার রঙের সমন্বয়ে গ্রন্থটির প্রচ্ছদকে রূপ দেওয়া হয়েছে। মাঝখানে একটি ত্রিভুজের ছবি অঙ্কিত আছে। নাটকের নামপত্রটি এই রূপ—

“বাংলা লোকনাট্য নাটক ও রঙ্গমঞ্চ/ সম্পাদনা বিশ্বনাথ রায়/
ছন্দা রায়/ এবং মুশায়েরা/ ১৫, শ্যামচরণ দে স্ট্রিট/ কলকাতা
৭০০০৭৩।”^{৬৯}

গ্রন্থটির মূল্য চারশত টাকা। গ্রন্থটির পঞ্জীয়ন নং- ৯৭-৯৩-৮৫ ১১৯-৫৮-৩। নতুন সংস্করণের নিবেদন অংশে সম্পাদক বিশ্বনাথ রায় বলেছেন -

“সব চরিত্র ও ঘটনা কাল্পনিক হলেও ‘নাটক’ মাত্রই জীবনসম্ভব অভিনেয় শিল্প এবং সে শিল্প শুধু বহুমুখী যৌথ প্রচেষ্টার ফসল নয় শিল্পের জগতে সবচেয়ে বেশী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার নিরিখেই জীবজগতের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপাধারী। সেখান থেকেই গমন তার ভাবের জগতের মধ্য দিয়ে উপলব্ধির পথে। নাটক তাই মগজের মধ্য দিয়ে বুঝে ওঠার বস্তু ততটা নয়, যতটা উপলব্ধির তত্ত্বীতে বেজে ওঠার জিনিস।

“মানুষের ধর্ম’ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মানুষের ‘দ্বৈতসত্তা’র কথা বলেছেন। একদিকে তার পশুধর্ম;--আহার নিদ্রা মৈথুনের জৈবতা। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মাৎস্যের্যের সে অধীন। সেখানে তার ‘টিকে থাকা’র লড়াই। অপরপক্ষে এই জৈব ধর্মকে অতিক্রম ক’রে মনোময় জীব হিসাবে তার ‘বেঁচে থাকা’র সার্থকতা, মনুষ্যত্বের পথে অভিগমন। সেটাই মানব ধর্ম, মানুষের ধর্ম। প্রতিটি মানুষের মধ্যে এই দুয়ের দ্বন্দ্ব—পশুত্ব ও মানবত্বের লড়াই নিয়েই তার জীবন।

“কাব্যতত্ত্ব’-এর বঙ্গীয় অনুবাদক শিশিরকুমার দাশের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি ‘দ্রামা’ কথাটির অর্থ ‘ক্রিয়া’ বা ‘করা’। তাই ‘মানুষ ও তার ক্রিয়া-কলাপ’ই নাটকের বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ মানবজীবনের ক্রিয়াকলাপের প্রতিফলন ঘটে নাটকে। কেননা তার স্বভাবেই আছে অভিনয়। কাব্যতত্ত্ব প্রণেতা এমনটাই আমাদের জানিয়েছেন। সুতরাং প্রতিটি মানুষের জীবনই এক একটি নাটক; বরং বলা ভালো ছোটো বড়ো অনেক নাটকের ভাণ্ডার বিশেষ। মানুষ নিজেই বুঝতে পারে না কীভাবে জীবনের রঙ্গমঞ্চে বহুরূপী হয়ে একক অভিনয় করে চলেছে সে। মঞ্চে দেখা অভিনয়ের মতোই অন্ধকার বিসর্পিল সে পথ শেষ হয় নির্মম ট্রাজেডিতে কিংবা সে মানুষ ডুবে যায় অস্থির মনের জগতের পাঁকে।

“সাগর পারের আদি কাব্যতাত্ত্বিক তাই ‘ভালো’ ও ‘মন্দ’ মেশানো মানুষের কথা বলেছিলেন। তা ছিল অনেকটা রবীন্দ্রনাথ কথিত মানুষের ‘দ্বৈতসত্তা’র মতো। তার শঠতা হীনতা নীচতা নিষ্ঠুরতা জৈব পশুত্ব যেমন তাকে ‘মন্দ’ মানুষ করে তেমনি সাধুতা মহত্ত্ব ভালোত্ব মমতা দয়া-প্রেম-ভালোবাসার মনুষ্যত্ব তাকে ‘ভালো’ মানুষ করে। এই দুইয়ের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষণ রেখা নেই। একজন মানুষের মধ্যেই এই সবকিছু মিলেমিশে থাকতে পারে কম-বেশিভাবে। ‘ভালোমানুষ’ হয়ে ওঠা স্বাভাবিক প্রবণতায় তাই মানুষ তার মন্দটাকে আড়াল আবডালে ছলাকলার দ্বারা চেপেচুপে রাখতে চায় ভণ্ডামির অভিনয় করে। জীবনের এই গোপন ‘ক্রিয়াকলাপ’কে সে ‘একান্ত ব্যক্তিগত’ বলে একটা সামাজিক পরিচ্ছদও পরিয়ে দেয়। কিন্তু যখন কোনোভাবে সেই ছদ্ম পোশাকটি (মুখোশ) খসে পড়ে এবং ‘মন্দ’-এর নগ্নরূপটি উৎকটভাবে প্রকাশ্যে চলে

আসে তখন মানুষের সেই বিপন্ন সত্তা অভিনয়ের মিথ্যাচারে সামাজিক মাপকাঠির ভালোত্বে উত্তীর্ণ হতে চায়। জীবনে এই সবকিছুই যে সজ্ঞানে ঘটে তা নয়, মনের বাহিত চেতনার স্তর পরস্পরায় তা সম্পন্ন হয়। একালের মানবজীবন আসলে অভিনয়ের নিত্যনতুন বিনির্মাণ। প্রতিটি মানুষ তার প্রকৃত জীবন সত্য থেকে তিন ধাপ বা ত্রিস্তর পিছিয়ে অসত্যের ধারাবাহিকতায় চলাফেরা করে বলে মঞ্চের নাটকের মতো তা প্রকাশ্যে আসে না বটে তবে ব্যবহারিক জীবনে ‘নাটক করা’ কথাটি নতুন তাৎপর্যে অতি প্রচলিত হয়ে মুখে মুখে ফেরে আজকাল। জীবনের এই ‘নাটক’ থেকে নাট্য-শিল্পের ব্যবধান দুষ্টর। সে কারণেই প্রতিদিনের যাপ্য অভিনয়ের সঙ্গে মঞ্চের অভিনয়ের বিরাট তফাত। প্রথমটি যদি হয় জীবন-জটিলতার অতলান্ত রহস্যে ঘেরা অগুপ্তি অকথিত চলমান নাটক, তবে শেষোক্ত ‘ক্রিয়া-কলাপ’টি রসভোক্তার কাছে আনন্দদানকারী এক শিল্পরূপ। জীবনের বিভিন্ন চেতনাস্তর বাহিত (বা অবদমিত) ক্রিয়া যখন অভিনয়ে শিল্প-মাধ্যম হিসেবে দর্শকের ‘চিত্তপট’-এ সুরের মতো ‘বেজে’ উঠবে তখনই তা হবে নাটক; একটি নান্দনিক শিল্পকলা। স্রষ্টা ও দ্রষ্টার মাঝখানে তার অবস্থান খেয়াতরীর মতো।”^{৭০}

প্রাচীনযুগের সাহিত্য চর্যাপদের নবভাবনা নিয়ে এলেন একালের নাট্যকার শিবশিস মুখোপাধ্যায়। তিনি এই ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন তিনটি চরিত্রকে অবলম্বন করে— নান্দী, তরুণ কবি এবং কাহ্ন। কাহ্ন প্রাচীন যুগের একজন চর্যাপদের প্রতিনিধি। অভিনবভাবে প্রাচীন যুগের ব্যক্তিত্ব কাহ্নকে গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন একালের প্রতিনিধি তরুণ কবি। কথাবস্তুতে রয়েছে চর্যাপদের উৎকর্ষতা, আধুনিকতার তুল্যমূল্য বিচার। তাঁদের মধ্যে কথা শুরু হয়েছে এইভাবে—

“নমস্কার কাহ্নপাদ। চর্যা পড়ে ভাল্লেগেছে। মাটি-গন্ধে ভরা। রূপকে প্রতীকে ঢালা সাধারণ লোকের ভাষা। চিন্তাও গভীর। অন্ত্যজ জীবন ধারা যেভাবে এসেছে তাতে চিহ্নিত সময়।”^{৭১}

সঙ্গতভাবে কাহ্ন উত্তর দিয়ে বলেছেন— ‘বাঙালি শেষে চর্যাপদই ভুলে গেল? শিকড়কে হারাল?’ তখন তরুণ কবি প্রতিবাদ করে বলেছেন—‘শিক্ষিত বাঙালি আজও চর্যাপদটা জানে।’ কিন্তু চর্যাপদ গান না কবিতা সংকলন, তা বলা মুশকিল। কাহ্ন উত্তর দিয়েছেন— ‘চর্যা কবিতায় সংহত, তা গানে বিস্তার।’ তবে চর্যাপদ বৈষ্ণব পদাবলীর মতো সাধারণ

বাঙালির মুখে মুখে ফেরে না। কেননা এটি ‘গঞ্জে, গাঁয়ে, মাঠে ঘোরা সাহিত্য’ নয়। এর প্রধান কারণ ঐতিহাসিক রাজরাজাদের কালগত বিবর্তন। দ্বিতীয়ত, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সহজাত বৌদ্ধ ভাবনাকে প্রাধান্য না দেওয়ার একটি ধর্মীয় কারণ। কাহ্ন বলেছেন—

“দেহের পাঁচ নাড়িতে পঞ্চ তথাগত—আর সেইটারই সাধনা। ব্রাহ্মণে তা মানবে কেন? তারা তো ঈশ্বর মানে, যাগ-যজ্ঞ মানে। তাই সব গোপন করে, রূপকে প্রতীকে সামলে তবে গাইতে হলো তাতে একটু শক্ত হলো, কবিতাও তো গড়ে উঠল, সেই আলো-আঁধারে!”^{৭২}

চর্যাপদ আসলে প্রাচীন, নবীন বা আধুনিক কালের নয়, এটি কালোত্তীর্ণ গৃঢ় সাধনার তত্ত্ব। সব কালের মনীষীদের কাছে সমানভাবে গ্রহণীয়। এখানে রয়েছে ‘মহাসুখের তত্ত্ব’, যা শরীরীতত্ত্বকে অতিক্রম করে আর এক অনুভব শক্তিতে সমাহিত— ‘সে সুখের শাস্ত্র শরীর হাতড়িয়ে খোঁজা, মায়ামোহহীন।’ আধুনিক সাহিত্যের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা চর্যার বিষয় বলে কাহ্ন দাবি করেছেন এবং পণ্ডিতরা সকলেই তা মানেন। পালযুগে একটা সময় ছিল, যখন চর্যাকে সাধারণ মানুষ ধর্ম বলে মেনেছেন। শিক্ষিত বাঙালি হয়তো একসময় চর্যাপদকে ভুলেছে, অন্য সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছে; কিন্তু কাহ্ন বলেছেন—‘অন্ত্যজ লোকেরা খুবই মান্য করেছে।’ এক সময় তরুণ কবি স্বীকার করে নিয়েছেন— ‘চর্যা হলো নাগরিক। শিক্ষিত, গোপন, শরীর যেখানে শাস্ত্র। চৌষটি কলার শাস্ত্র। গৃঢ় ও গভীর।’ চর্যার আধুনিকতা কাহ্ন যথোচিতভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

“শিল্পের তুমি কী বোঝ? রূপের দিকটাও দ্যাখো, চর্যা কত গঠনে উন্নত! আড়াল তৈরির চেষ্টা, ঠারেঠোরে কথা বলা, ছন্দধারা, শব্দের ওজন, এসব দিক থেকেও কিন্তু চর্যা খুবই আধুনিক।”^{৭৩}

কাহ্ন এই কথার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে মধ্যযুগের ধর্মীয় সাহিত্য উপাদানগুলির তুলনায় চর্যাপদে ধর্মের ভাবনা অনেক কম। আধুনিক সাহিত্যে যেমন মানুষের কথা প্রধান বিষয়, তেমনি চর্যাপদের কবিতাতেও ধর্মের কথা নেই বললেই চলে, সেখানে মানুষই প্রধান। তাই তিনি বলেছেন যে আধুনিক কবির চর্যার কাছে ঋণী। তাঁদের রচনা অনেক জটিল, তীব্র হলেও ‘চর্যার সন্তান প্রায়’। আধুনিক কবিতা হলো চর্যার পুনরুত্থান, তার অন্তর রূপের বহিঃপ্রকাশ। আধুনিক সময়কালে চর্যার প্রবাদ পঙক্তিগুলি কতটা গ্রহণীয়, তা বোঝা যাবে কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিলে। যেমন—‘হরিণা আপনা মাংসে নিজেই নিজের বৈরি’, ‘কায়াতরু’, ‘পাঁচটা ইন্দ্রিয় শাখা’। তরুণ কবি যখন প্রতিবাদী প্রশ্নে কাহ্নকে আক্রমণ করে বলেন যে আধুনিক কবিতায় যে মনের জটিল

খেলা আছে? তার উত্তরে কাহ্ন বলেছেন নানা প্রাসঙ্গিক যুক্তি। আধুনিক বাঙালির জীবনে নানা প্রসঙ্গে এর উপাদান যুক্ত হয়ে আছে। শরীর সেখানে একটি প্রধান বিষয়, তাকে বাদ দিয়ে অন্য কথা নেই —

“আমরা শরীরের সেই ছন্দ নিয়ে তত্ত্ব গড়ে বিধিবদ্ধ করেছি মুক্তিকে। শরীর না ছুঁয়ে কিন্তু স্পর্শ করা যায় না কোনও অতীন্দ্রিয় অস্তিত্বের ধারণা।”^{৭৪}

তরুণ কবি স্বীকার করে নেন- ‘এ কালে কবির লেখা এসব লাইন তবে আপনাদেরই পুনর্নির্মাণ?’ এই ভাবে নাট্যকাহিনি পরিণতি পেয়েছে। চর্যাপদ থেকেই যে আধুনিক সাহিত্যে নানা শাখার পুনর্নির্মাণ হয়ে চলেছে, তা মেনে নিতে অসুবিধা থাকে না তরুণ কবির। ‘অসম্ভব গোলটেবিল’ নাটকটি যে চর্যাপদের পুনর্নির্মাণ, সেকথা দর্শক বা পাঠককে, আর বলে দিতে হয় না।

নাটকটিতে শিবশিস মুখোপাধ্যায় ছোটো-বড়ো বাক্য বিন্যাস করে, পুরাতন ও নতুন শব্দবন্ধ চয়ণ করে এবং দু’কালের প্রতিনিধি কাহ্ন ও তরুণ কবিকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে চর্যাপদের ভাবনাকে বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেন যে এটি আধুনিক জীবনের অতীত আখ্যান; যেমন একজন মানুষের ছোটবেলা থেকে বড় বেলায় পৌঁছানো। নাটকের সংলাপের মধ্যে সেই আধুনিক ও পুনর্নির্মিত রূপটি আমরা বার বার পেয়েছি। কাহ্ন বলেছেন -

“সে খেলাও খেলেছি আমরা, মনের জটিল খেলা, শরীর সেখানে একটা ঘটি। প্রতি চালে বাজিমাৎ, দাবার ছকের মতো, সাদা কালো মিলিয়ে ধূসর। ধূসর মনের রাজ্য, শান্ত ও সুমঙ্গল, স্বাধীন ও বন্ধনবিহীন। আনন্দ-বিষাদহীন নারী ও পুরুষসত্তা, সৃষ্টিশীল, কবিতাসম্ভব। নিজস্ব জীবনভঙ্গি ছাড়া কি নিজস্ব কলা, বাকভঙ্গি গড়ে তোলা যায়? ফলত সমান্তরাল আরেকটা সমাজরীতি তৈরি করা প্রয়োজনই ছিল, মূল ধরার পাশে যেটা চিরকাল বয়ে চলবে, মূল ধারায় কখনও মিশবে না। গোপা ও রাহুল দিয়ে আটকানো যাবে না তাকে, সিদ্ধি যার ভিক্ষুকে ভ্রমণে। বাউল, সিদ্ধাই, আখড়া, সুফি, কি তান্ত্রিক, ক্ষ্যাপা, গৌণকর্মী কিংবা ধরো কবি— ‘একেলা জগৎ ভুলে’ সবই সাধনা করছে, প্যারালাল গড়ার সাধনা। একদিকে প্রকৃতি, তার জীবনপ্রবাহ দায়, আগে গড়া সমাজ ধারণা— অন্যদিকে তুমি-আমি, ভাঙা ও গড়ার নেশা, আমাদের শিল্প ও কবিতা—

এসবেই আছি আমরা, বাউলে-আখড়ায় আছি, দেহতত্ত্ব, গৌণ ধর্মে আছি।
গ্রামের কিছুটা বাইরে, সমাজতলের নীচে, খ্যাতি প্রতিষ্ঠার থেকে
দূরে...ছোট পত্রিকার বুকে এই দ্যাখো লুকিয়ে আছি, কবিসংঘে, প্রকাশ্যে,
গোপনে।”^{৭৫}

কাহ্নুর কথাবলার ধরন, ব্যাখ্যাদানের পদ্ধতি এবং যুক্তিবদ্ধ উত্তর প্রদান যেন একালের
ভাব-চিন্তার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রতিফলন। ছোট ছোট ইংরাজি শব্দ উভয়ের কথোপকথনে
উঠে আসে, যা নাটকের আবেদনকে পাঠকমহলের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।
যেমন—‘দিস্ ইজ দ্য পয়েন্ট কাহ্নু’, ‘অ্যাডভান্টেজ’, ‘অবসিকিওর’, ‘রিলিজিয়াসে’,
‘অ্যাকসেস্ট’, ‘ইজিকলটু’, ‘ল্যাংগুয়েজ’, ‘টার্মিনোলজি’, ‘আদারওয়াইজ’, ‘প্যারালাল’,
‘চ্যানেলে’ ইত্যাদি। এইভাবেই ‘অসম্ভব গোলটেবিল’ নাটকটি ভাবে, ভাষায়, সংরূপে
চর্যাপদের আধুনিক নব সংযোজন হয়ে উঠেছে।

আমরা আগেই স্বীকার করেছি যে, চর্যাপদের কাহিনি নিয়ে কেবল নাটক রচিত
হয়নি, একাধিক সাহিত্যিক লিখেছেন উপন্যাস, ছোটগল্প, অনুবাদ-কবিতা। চর্যাপদের
আধুনিক সাহিত্য পুনর্নির্মাণের সামগ্রিক রূপ তুলে ধরার জন্যে সংক্ষেপে সেই
উদাহরণমূলক পরিচয়টি রাখা প্রয়োজন। চর্যাপদের কাহিনি অবলম্বনে একেবারে প্রথম
পর্বে লেখা হয়েছে দুটি উপন্যাস। এক, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘বেনের মেয়ে’ (২০১৩) এবং
দুই. সেলিনা হোসেনের ‘নীল ময়ূরের যৌবন’ (২০০৯)। চর্যাপদের কাহিনি নিয়ে লেখা
সময়, কাল, পটভূমি, জীবনদর্শন প্রভৃতি যাবতীয় ভাবনা একেবারে প্রথম পর্বে লেখা এই
দুটি উপন্যাসে আশ্চর্যভাবে ঔপন্যাসিকদ্বয় প্রকাশ করেছেন। ফলে আধুনিক জীবনের
শিকড় সন্ধানে এর মূল্য অনস্বীকার্য। ফেলে আসা অতীতের কাহিনির মধ্যে কত
সুন্দরভাবে আধুনিক জীবনচেতনার প্রকৃত স্বরূপ লুপ্তায়িত আছে, তা আমরা জানতে
পারতাম না, যদি ‘বেনের মেয়ে’ ও ‘নীলময়ূরের যৌবন’ উপন্যাস দুটি হাতে না পেতাম।

২০১৩ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সেকালের বাংলার অতুলনীয় ছবি এঁকেছেন
‘বেনের মেয়ে’ উপন্যাসে। ঔপন্যাসিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ‘মুখপাত’ অংশে ‘বেনের
মেয়ে’ প্রসঙ্গে বলেছেন—

“বেনের মেয়ে’ ইতিহাস নয়। কেন না, আজকালকার ‘বিজ্ঞানসঙ্গত’
ইতিহাসের দিনে পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন ইতিহাসই হয় না। আমাদের রক্ত-
মাংসের শরীর, আমরা পাথুরে নই, কখন হইতেও চাই না। ‘বেনের মেয়ে’
একটা গল্প। অন্য পাঁচটা গল্প যেমন আছে, এও তাই। তবে এতে এ-

কালের কথা নাই। সব সেই কালের, যে কালে বাংলার সব ছিল। বাংলার হাতি ছিল, ঘোড়া ছিল, জাহাজ ছিল, ব্যবসা ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কলা ছিল। বাঙালি এখন কেবল এ-কেলে ‘গণিকাতন্ত্রের’ একখানি বই পড়িয়া মুখটা বদলাইয়া লউন না কেন ?”^{৭৬}

উপন্যাসটি হিন্দু-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির একটি মাইলস্টোন রূপে বিবেচিত হয়। সাধারণ বাগ্দি থেকে রাজা হয়ে ওঠা, সাধারণ বেণে থেকে রাজা হয়ে ওঠা, সাধারণ মেয়ে থেকে রাজকুমারী হয়ে ওঠা, বৌদ্ধবিহারের নানা প্রসঙ্গ, ব্রাহ্মণ্য সমাজের মানুষের সার্বিক তথ্যনিষ্ঠ পরিচয়, কাল পরিবর্তনের ইঙ্গিতদান, মুসলমান সম্প্রদায়ের আগমনবার্তা এবং যুদ্ধের আসন্ন সংকেত যেন উপন্যাসের স্বতন্ত্র ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করেছে। গাজন উৎসবকে অবলম্বন করে ‘বেণের মেয়ে’ উপন্যাসের কাহিনি শুরু হলেও ক্রমে ক্রমে কাহিনির প্রসঙ্গে এসেছে বৌদ্ধবিহারের কথা। সাতগাঁয়ের রাজা রূপনারায়ণ সিংহ সিদ্ধাচার্য লুইপাদকে যেহেতু গুরুদেব বলে মেনেছেন এবং গাজনের মূল সন্ন্যাসী করেছেন, সেহেতু তাঁর রাজত্বকালে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছে। কাহিনির টানে এসেছে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বেণে জাতির লোক বিহারীর কথা, এসেছে তারই মেয়ে মায়ার কথা। যখন তাঁর কন্যা বিধবা হয়, তখন বৌদ্ধসম্প্রদায়ের লোকেরা চাইলো বিহারীর সম্পত্তি ও মেয়ে তাঁদের অধিকারে আসুক; কিন্তু বিহারী তাতে রাজি হননি। তাই তিনি উপায় না পেয়ে নিজ ধর্ম ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মে আশ্রয় খুঁজে পেতে চান। বিহারী ব্রাহ্মণঠাকুর ভবদেবের শরণাপন্ন হন। এরপর ব্রাহ্মণ্যবিধান অনুযায়ী বিহারী ও তাঁর মেয়ের পোষ্যপুত্র গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। ইতিমধ্যে যুদ্ধ বেধেছে, বৌদ্ধদের অধঃপতন ঘটেছে, রূপারাজার মৃত্যুতে গুরু পুত্রের অবস্থা মর্মান্তিক হয়েছে। উপন্যাসের উক্ত বিবরণ প্রমাণ দেয় বৌদ্ধ ধর্মের বিপন্নতা এবং হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থানের কথা। এইভাবেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ‘বেণের মেয়ে’ উপন্যাসটিতে প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ-বেণে-ব্রাহ্মণ্য সমাজের কথাকে পুনর্নির্মাণ করেছেন একালের মতো করে।

ঠিক একইভাবে, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে সেলিনা হোসেন চর্যাপদের ভাবনা অবলম্বন করে রচনা করেছেন ‘নীল ময়ূরের যৌবন’ নামের একটি উপন্যাস। উপন্যাসটির কাহিনিকথন, পরিবেশ, চরিত্র, জীবনধারণের রীতি-নীতি, সংস্কার-বিশ্বাস, আনন্দ-উৎসব সমস্ত ভাবনাই ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন চর্যার পদগুলির সঙ্গে সংগতি রেখে বিস্তার ঘটিয়েছেন। উপন্যাসের সূত্রপাত ঘটেছে কাকুপাদ ও শবরীর সংসার জীবনের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। কাকুপাদ রাজদরবারে পাখা টানার কাজ করে। কিন্তু তার ভেতরে কবিসত্তা আহত হয়। তার উপর নীচু জাতের মানুষ বলে রাজদরবারের

ব্রাহ্মণদের কাছে নানাভাবে অপমানিত হয়। কাহ্নপাদ বিষণ্ণ হতে থাকে। ব্রাহ্মণ্যবাদের এই পীড়ন থেকে মুক্তি পেতে চায়, কিন্তু পথ খুঁজে পায় না। পাখা টানতে টানতে কাহ্নপাদ কেবলই নিজেকে প্রকাশ করার পথ খোঁজে। ভেতরে ভেতরে নিদারুণ জ্বালা অনুভব করে। কোথায় গিয়ে কী করবে বুঝতে পারে না। কাহ্নপাদকে তাদের সমাজের ছোটো-বড়ো সমস্ত মানুষ আপন করে ভালোবাসে এবং মনের কথা বলে। কিছু করতে গেলে তার পরামর্শ নেয়। খেয়া পারাপার করে যে ডোম্বী, সে একটু বেশি ভালোবাসে কাহ্নকে। তাই নদী পারাপার করে দিলেও কাহ্নর কাছ থেকে কড়ি নিতে চায় না। অন্যদিকে কাহ্নও ডোম্বীকে ভালোবাসে, তাকে কবিতা শেখায়। ডোম্বী সেই কবিতা আওড়ে আনন্দ পায়। কাহ্ন ডোম্বীর নাম দিয়েছে ‘মল্লারী’। এক সময় কাহ্ন প্রচণ্ড ক্রোধে ও যন্ত্রণায় লিখে ফেলে ডোম্বির কথা—

“নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরী কুড়িআ

ছই ছোই যাইসি ব্রাহ্ম নাড়িআ”^{৭৭}

এতে রাজমন্ত্রী দেবল ভদ্র এবং ব্রাহ্মণ্য সমাজে আঘাত আসে। শাস্তিস্বরূপ কাহ্নকে এক মাসের অধিক চুনের ঘরে আটকে রাখা হয় এবং দু’হাতের আঙুল কেটে নদীর চরে ফেলে দেওয়া হয়। সেই ঘটনায় ছোটোলোক সমাজে কেউ প্রতিবাদ করেনি, একমাত্র প্রতিবাদ করেছে ডোম্বী। সে মন্ত্রী দেবলভদ্রের ভাগ্নেকে রাতে নিজের ঘরে পেয়ে হত্যা করে। পরের দিন রাজার লোক এসে ডোম্বীকে ধরে নিয়ে যায়। শাস্তিতে ডোম্বীর মৃত্যুদণ্ড হয়, তাকে মেরে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। আদিবাসী মানুষের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। কেউ কেউ রাত্রে ঘুমের মধ্যে মারা যায়; আকাশে- বাতাসে মানুষের চামড়া পোড়ার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। যারা পালাতে পেরেছে তারা অনেকটা দূরে টিলার উপর, খোলা আকাশের নীচে, অন্ধকারে এসে দাঁড়ায়। এইভাবেই আদিম মানব-মানবীদের উপর সভ্য মানুষদের শোষণ নির্বিচারে চলে। ডোম্বীর জোরালো প্রতিবাদ সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে। তা সত্ত্বেও এইরকম সর্বহারা মানুষদের স্বপ্ন দেখাতে কাহ্ন ভোলেনি। ‘নীল ময়ূরের যৌবন’ উপন্যাসে সেলিনা হোসেন এইভাবে চর্যার জীবন ভাবনার পুনর্নির্মাণ করেছেন।

চর্যাপদের কবিতা নিয়েও পুনর্নির্মাণ হয়েছে অনেক। মণীন্দ্রমোহন বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, সুকুমার সেন, অমিতাভ দাশগুপ্ত, পবিত্র সরকার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখ একালের কবিরা সেকালের সাহিত্য নিয়ে রূপান্তরের কাজ করেছেন। সেগুলিতে পুরাতন সাহিত্য প্রতিফলিত হয়েছে আধুনিক ভাবনায়। এই রূপান্তরণ আমাদের আলোচ্য অধ্যায়ের বিষয়-বৈচিত্র্যে যেমন অভিনবত্ব

আনে, তেমনি ভাষা বিচারে ‘সন্ধ্যাভাষা’র পরিবর্তে একালের ভাষা ব্যবহার হওয়ায় তাঁদের লেখা চর্যা কবিতা পুনর্নির্মাণের রূপ লাভ করে। যেমন চর্যার পদকর্তা লুইপাদ ১ সংখ্যক পদে লিখেছেন—

“কা আ তরুবর পঞ্চ-বি ডাল।
চঞ্চল চিত্র পাইঠো কাল।।
দিট করিঅ, মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।।”^{৭৮}

সেখানে সুকুমার সেন উক্ত পদটি রূপান্তর করলেন এইরূপ –

“দেহ (হল) তরুবর পাঁচটি (সে) ডাল।
চঞ্চল চিত্রে উপবিষ্ট কাল।।
সবিশ্বাসে মহাসুখ-দোহাই মানিবে।
লুই বলে, গুরুকে জিজ্ঞাসি জানিবে।।”^{৭৯}

এইভাবে সেকালের চর্যাপদের কবিতা একালের কবিদের হাতে পুনর্নির্মিত হয়েছে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে ১৯১৬ সালে চর্যাপদ আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে নানাভাবে তার চর্চা যেমন শুরু হয়েছিল, তেমনি আধুনিক সাহিত্যপ্রকরণেও তার নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ বা কোথাও কোথাও কাহিনির বিনির্মাণও করা হয়েছে। আমাদের আলোচনা সে কথার প্রমাণ দেয়। গবেষণা অভিসন্দর্ভের এই অধ্যায়ে আমরা তার বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণের প্রয়াস করেছি।

প্রসঙ্গনির্দেশ ও মন্তব্য -

- ১। বঙ্গ বসুন্ধরা পত্রিকায় ২০০০ সালে প্রকাশিত হয়।
- ২। বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা, জুন ২০০৭ সালে প্রকাশিত।
- ৩। নয়া উদ্যোগ, ২০১৪ সালে প্রকাশিত।
- ৪। এবং মুশয়েরা, ২০০২ সালে প্রকাশিত।
- ৫। নাথ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১৩ সালে প্রকাশিত।
- ৬। নয়া উদ্যোগ, ২০০৯ সালে প্রকাশিত।
- ৭। সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১০ সালে প্রকাশিত।

- ৮। অনিশ্চয় চক্রবর্তী সম্পাদিত গল্প সংগ্রহঃ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অফবিট পাবলিকেশন, জানুয়ারি, ২০০২।
- ৯। সাইমন জাকারিয়া, প্রাচীন বাংলার বুদ্ধনাটক, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-১, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৬৯।
- ১০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা সংখ্যা- আভ্যন্তরীণ প্রচ্ছদপত্র।
- ১১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ২, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৭০।
- ১২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- উৎসর্গপত্র অংশ।
- ১৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- মুখবন্ধ অংশ।
- ১৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- মুখবন্ধ অংশ।
- ১৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- সূচিপত্র অংশ।
- ১৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা-১।
- ১৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা-১।
- ১৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা-১।
- ১৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা-২।
- ২০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা-২।
- ২১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা-২।
- ২২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা-৩।
- ২৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৪।
- ২৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৫।
- ২৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৫।
- ২৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-২২।
- ২৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-২৪।
- ২৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-২৫।
- ২৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-২৮।

- ৩০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-২৯।
- ৩১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৪৪
- ৩২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৪৪
- ৩৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৪৫
- ৩৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৪৬
- ৩৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৪৬
- ৩৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৪৭।
- ৩৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৪৮।
- ৩৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ১৪৯।
- ৩৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৫০।
- ৪০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৫।
- ৪১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৮-৯।
- ৪২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৭২।
- ৪৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪৪।
- ৪৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪৪।
- ৪৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৫৩।
- ৪৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪১।
- ৪৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৬৪
- ৪৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৬৫।
- ৪৯। সাইমন জাকারিয়া, বোধিদ্রুম, নয়া উদ্যোগ, ২০১৪, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত
বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৭১।
- ৫০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ
পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৭২।
- ৫১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, মুখবন্ধ অংশ। পৃষ্ঠা -১।

- ৫২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, ভূমিকা পৃষ্ঠা- ১।
- ৫৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, ভূমিকা পৃষ্ঠা- ৩।
- ৫৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, ভূমিকা পৃষ্ঠা- ৫।
- ৫৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, ভূমিকা পৃষ্ঠা- ৯।
- ৫৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, ভূমিকা পৃষ্ঠা- ১০-১১।
- ৫৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-২৫
- ৫৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৩৮।
- ৫৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৫৮।
- ৬০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৮০
- ৬১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৭২-৭৩।
- ৬২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৭২।
- ৬৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৮৮।
- ৬৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৮০।
- ৬৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৭৯।
- ৬৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৬৮।
- ৬৭। শিবাশিস মুখোপাধ্যায়, অসম্ভব গোলটেবিল, এবং মুশায়েরা, ২০০২, প্রচ্ছদপত্রের
বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৭৩।
- ৬৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- প্রচ্ছদপত্রের আভ্যন্তরীণ অংশ।
- ৬৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ
পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৭৪।
- ৭০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- নিবেদন অংশ।
- ৭১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৪১২।
- ৭২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৪১৪।
- ৭৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৪১৯।

- ৭৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৪২২।
- ৭৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৪২০-৪২২।
- ৭৬। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বেণের মেয়ে, নাথ পাবলিশিং, নাথ পাবলিশিং, ২০১৩,
পৃষ্ঠা- মুখপাত অংশ।
- ৭৭। সেলিনা হোসেন, নীল ময়ূরের যৌবন, নয়া উদ্যোগ, নয়া উদ্যোগ, ২০০৯।
পৃষ্ঠা-৩৮।
- ৭৮। সুমন গুণ (সম্পাদনা), আচ্ছন্ন নৈঋত, প্রতিভাস, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ৩০।
- ৭৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৩০।

তৃতীয় অধ্যায়

রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কাব্য ও পদাবলী সাহিত্য অবলম্বনে রচিত বাংলা নাটক:

পরিচয় উদ্ধার এবং তার আলোচনা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাহিনিকাব্য ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’। রাধা, কৃষ্ণ, বড়াই এই তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে যে ‘নাট্যগীতি-পাঞ্চালী’ কাব্যটি পঞ্চম শতকের গোড়ার দিকে রচনা করেছিলেন বড়ু চণ্ডীদাস, তা আজও কাব্যরস পিপাসু মানুষের মনে সাড়া জাগায়। এর মূল কারণ, মধ্যযুগীয় কাব্যের বাতাবরণ অতিক্রম করে কবি বড়ু চণ্ডীদাস সমকালীন মানব জীবনভাবনাকে কাব্যের বিষয় ও চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই শুধু সেকালে নয়, একালেও ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের জনপ্রিয়তা সমান ভাবে বর্তমান। এই জনপ্রিয়তার ধারা বজায় আছে আধুনিক নাট্যকারদের রচনায়ও। তাঁরা মধ্যযুগের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্য ও পদাবলী সাহিত্যের বিষয় নিয়ে নাটক রচনা করে দর্শকমহলে সমাদর পেয়েছেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে সেই নাটক ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের বিষয়কেন্দ্রিক হলেও বাস্তবে তা আধুনিক জীবনভাবনায়ুক্ত। এই কর্মে আত্ম-নিয়োগ করেছেন ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকের নাট্যকারেরা। গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন ‘দোললীলা’ (১৮৭৮) ও ‘ব্রজবিহার’ (১৮৮৩), রাজা মহেন্দ্রলাল খান লিখেছেন ‘মথুরা মিলন’ (১৮৮৩), মনোমোহন বসু লিখেছেন ‘রাসলীলা’ (১৮৮৯), ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ লিখেছেন ‘বৃন্দাবন-বিলাস’ (১৯০৩), হরিপদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ‘মান’ (১৯১৬), ভুবনকৃষ্ণ মিত্র লিখেছেন ‘নিকুঞ্জবিহার’ (১৯২৫), অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ‘শ্রীকৃষ্ণ’ (১৯২৬), আঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ লিখেছেন ‘মাথুর’ (১৯৩৮) প্রভৃতি একাধিক নাটক। নাটকগুলি যে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্য ও পদাবলীর বিষয়ভাবনা ও চরিত্রকে কেন্দ্র করে লেখা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই নাটকগুলির প্রতিটি যে আধুনিক জীবন ভাবনাকেন্দ্রিক, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। একালের নাট্যমোদী দর্শকমহলে এই নাটকগুলির জনপ্রিয়তা আজও বর্তমান। আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক কাব্য ও পদাবলী সাহিত্যের বিষয় ও চরিত্র অবলম্বন করে রচিত এই জাতীয় নাট্য পুনর্নির্মাণের আলোচনার করতে আগ্রহী আমরা।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ - দোল-লীলা (১৮৭৮);

আধুনিক কালের একজন প্রধান নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেছিলেন ‘দোল-লীলা’ নামের একটি নাটক। এটি একটি নাট্যগীতি। সংক্ষিপ্ত পরিসরের এই গীতিনাটকটি ‘গিরিশ রচনাবলী’র প্রথম খণ্ডে স্থান লাভ করেছে। ২১.৫ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১৪ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটিতে প্রচ্ছদপত্র (১), প্রস্তাবনা (১), মূল নাটক (৪) সহ মোট ৬ টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকের উল্লিখিত চরিত্র গুলি হল কৃষ্ণ, রাধা, গোপবালকগণ, সখীগণ। দুটি অঙ্ক ও দুটি গর্ভাঙ্ক এবং একটি পট পরিবর্তনের দৃশ্য নিয়ে নাটকটি রচিত। নাটকটি প্রকাশিত হয় সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা- ৯ থেকে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘দোল-লীলা’ নাটকটি আধুনিক কালের পটভূমিতে রচিত মধ্যযুগীয় বিষয়কেন্দ্রিক নাটক। এখানে বৃন্দাবনের রাধা-কৃষ্ণের দোললীলার ভাবনাকে প্রধান করে তুলে ধরা হয়েছে। নাটকের প্রস্তাবনা অংশে বলা হয়েছে-

“আজি সবে শুভ দিনে, গাও রে আনন্দ মনে,
নাচ গাও বিনা কিবা সুখ আর জীবনে।”^১

নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় রাজপথে কৃষ্ণের সঙ্গে হোলি খেলার জন্য গোপ বালকেরা পথে নেমেছেন। ওদিকে রাধা এবং সখীগণও কাননে এসেছেন কৃষ্ণের সঙ্গে হোলি খেলার জন্য। কৃষ্ণের বাঁশির আওয়াজ শুনে রাধা সখীদের বলেছেন-

“বাজে গো বাঁশরি, প্রাণসখি,
প্রাণকানাই
চল চল আঁখি ভরি দেখি।
ব্যাকুল বাঁশরি ব্যাকুল মুরারি
ব্যাকুল গোপিনী- প্রাণ কেমন রাখি?”^২

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে রাধা কৃষ্ণকে খুঁজে না পাওয়ায় তাঁর জন্য মন ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। রাধা কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলেছেন -

“পরাণ বাঁধিতে নারি গো সজনি!
ওই শুন ডাকে শ্যাম গুণমণি।
রাধা নাম ধরি বাজে গো বাঁশরি,
চল গো সজনি, চল ত্বরান্বিত করি,

হেরি শ্যাম- ধন, রাধিকা- জীবন
জীবন সফল করি।”^৩

কৃষ্ণ ব্রজনারী এবং রাধাকে দেখেও যখন দেখতে চান না, তখন রাধা কৃষ্ণের নকল অভিনয় রীতি দেখে বলেছেন-

“ছাড় ছলা, কেন কালা, নিদয় এমন।
প্রাণের কানাই এস, হৃদয়ের ধন।”^৪

রাধাকে ক্ষণকালের জন্য দেখা দিয়ে কৃষ্ণ অদৃশ্য হয়ে গেলেন, রাধা ব্যাকুলভাবে সখীদের অনুসরণ করে বলেছেন- “কোথা লুকাইল হরি।” সখীগণ রাধাকে সান্ত্বনা দিলেও রাধার মন মানেনা। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নিধুবন ও যমুনা পুলিনের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। রাধা ও গোপীদের মনে হয়েছে কৃষ্ণ বুঝি যমুনার ঘাটে অন্যের সঙ্গে হোলি খেলছেন। রাধা গোপীদের অনুরোধ করেছেন যমুনা-পুলিনে যাওয়ার জন্য। সেখানেই কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার সাক্ষাৎ হয়েছে। এই সময় কৃষ্ণ রাধা ও সকল ব্রজ নারী-পুরুষকে হোলি খেলার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেছেন-

“এস সবে খেলি আজি হেরি,
ফাগে কিবা শোভা হয় হেরিব সুন্দরি
শ্রমরঞ্জিত বদনে কুঙ্কুমরাগ রঞ্জে,
সুখে হেরিব নয়নে, কে হারে কে জিনে
পিপাসিত চিরদিন পিয়াস হরি।”^৫

হোলি খেলা শুরু হয় রাধা, কৃষ্ণ ও সখীদের নিয়ে। এরপর নাটকের পট পরিবর্তন হয়। সেখানে দেখা যায় কুঞ্জবনে রাধা-কৃষ্ণের যুগল মিলনের দৃশ্য, যা দেখে সকলেই তৃপ্তি অনুভব করেন। সখীরা বলেছেন -

“হের লো শোভা নয়ন ভরি,
রাধা সনে দোলে দোল শ্রীহরি।”^৬

দোললীলার মাধুর্যে নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘটে। এইভাবে ‘দোললীলা’ নাটকটি প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শাখা বৈষ্ণব পদাবলীর সাদৃশ্যপূর্ণ রাধা-কৃষ্ণের ভাব-ভাবান্তরযুক্ত পূর্বরাগ, অভিসার, মিলনপর্ব-কেন্দ্রিক পুনর্নির্মিত নাটক হয়ে উঠেছে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই ‘দোল-লীলা’ নাটকে কেন্দ্রীয় ভাবনায় দুটি চরিত্রের কথা বলেছেন- এক. শ্রীকৃষ্ণ এবং দুই. রাধা। সমগ্র বাঙালি জাতির একটি অন্যতম উৎসব

বসন্তের দোল খেলা- এই নাটকের কেন্দ্রীয়বিষয়। বৈষ্ণব পদকারেরা বৃন্দাবনের গোপবালক কৃষ্ণ ও গোপবালিকা রাধাকে কেন্দ্র করে এই উৎসবের বিবরণ দিয়েছেন বারবার। সেইসঙ্গে যুক্ত করেছেন কাল উত্তীর্ণ জীবনভাবনা। তাই বলা যায়, পদাবলী সাহিত্যের একটি অন্যতম প্রধান বিষয় এই দোললীলা। নাটকটিতে একদিকে যেমন কৃষ্ণের অন্তঃকরণের পরিচয় আছে, অন্যদিকে তেমনি রাধার অন্তরের নিবিড়তর মনস্তত্ত্বের পরিচয়টি পাওয়া যায়। সখী চরিত্রগুলি এখানে রাধাকৃষ্ণের মধ্যে সংযোগ সাধনের কাজ করেছে। পরিস্থিতি ও পরিমণ্ডল সুচারু রূপে প্রকাশ করতে তাঁরা নানা ভাবে সহায়তা করেছেন। রাধার সংলাপে প্রেমিকা-নারীর পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। রাধা কৃষ্ণের সাক্ষাতে যাওয়ার জন্য সখীদের অনুরোধ করে বলেছেন –

“গঞ্জনা দিও না ধরি সখী পায়
চল লো গঞ্জনা দিব যমুনায়ে।
কেন কল্লোলিনী প্রবল বাহিনী,
উজান নাহিক ধায়।
রাধাতে ত নাই রাধিকার প্রাণ,
সই কে করিবে তবে অভিমান।”^৭

রাধার যেমন কৃষ্ণ-অন্ত প্রাণ, তেমনি কৃষ্ণও রাধাকে ভালবাসেন হৃদয় দিয়ে। কৃষ্ণ রাধাকে বলেছেন–

“রাধে রাধে বলে বাজে রে বাঁশি,
রাধে বলে বাজে বাঁশি আমি ভালোবাসি,
রাধা নাম বিনা বাঁশি, কোথা পাবে
সুধারাশি,
সুখের সাগরে ভাসি, মনে হলে
মধুর হাসি।”^৮

এইভাবে নাট্যকার রাধা-কৃষ্ণের ভালবাসার দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে আধুনিক নর-নারীর হৃদয়কথাকে প্রকাশ করেছেন। রাধা-কৃষ্ণের হোলি খেলা ও মিলনে আমাদের সমাজের চির পরিচিত দৃশ্যগুলি চোখের সামনে ভেসে উঠে, যা প্রেমের চরম পরিণতির বাস্তব চিত্র বলে মনে হয়। সকল বৈষ্ণব পদকার অবশ্য মিলনে প্রেমের সার্থকতা মানতে রাজি নন। অনেকে বিরহের চির বিচ্ছেদ-বেদনায় এবং প্রেমের দহন জ্বালাতে প্রেমের চরম পরিণতি বলে মনে করেছেন। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের কবি বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর কাব্যের সমাপ্তিতে

বিরহকে প্রধান করেছেন। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীতে গোবিন্দ দাসের মতো কবির রাধা-কৃষ্ণের মিলনে প্রেমের সার্থক পরিণতি দেখিয়েছেন। ‘দোল-লীলা’ নাটকে নাট্যকার রাধা-কৃষ্ণকে বাঙালি নর-নারীর চির পরিচিত রূপেই অঙ্কন করেছেন। তাই বসন্ত উৎসবের দোল খেলাকে নাট্য বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছেন। শুধু তাই নয়, নাট্যকার ভাবের সঙ্গে ভাষার অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। সখীদল একে অপরকে বলেছেন –

“চল যমুনা-পুলিনে সই
ত্বরিত গমনে,
আজি ধরিব কালারে, আজি ছাড়িব না
শ্যামধনে, চল চল চল।
সখী, শ্যাম অঙ্গে ফাগ দিব রঙ্গে
রঞ্জিব বরণ সাধ মনে, চল চল চল।”^৯

একইরকম ভাবে ও ভাষায় রাধিকাও সখীদের বলেছেন–

“রাধারে ত সখি বাস গো ভাল,
কালো বিনা কাঁদি হেরিব কাল।
চল চল সখি চল চল চল
ধরি গো পায়।
তুমি কি দেখেছ কালার নয়ন,
ভুলেছ গো যদি দেখনি কখন,
প্রণয়ে কি প্রাণ দেছ বিসর্জন,
আয় লো সজনি আয় লো আয়।”^{১০}

এই উক্তি-প্রত্যুক্তিতে সহজ সরল আধুনিক কাব্যরূপের পরিচয় পাই আমরা। কৃষ্ণের বাঁশি বাজিয়ে মন চুরি করা, রাধার হৃদয় ব্যাকুলতা, সখীদের সাহায্যপূর্ণ মনোভাব– সমস্ত কিছুই আধুনিক সমাজের নর-নারীর প্রেম ভাবনাকে বাস্তবায়িত করেছে। তাই একথা স্বীকার করতেই হয় যে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের রাধা-কৃষ্ণের প্রেমভাবনা পুনর্নির্মিত ও বিনির্মিত হয়েছে গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘দোল-লীলা’ নাটকে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ - ব্রজবিহার (১৮৮৩);

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের বিষয়কে কেন্দ্র করে গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন ‘ব্রজবিহার’ নামের একটি নাটকটি। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে। তিনটি অঙ্ক নিয়ে নাটকটি রচিত। প্রথম অঙ্কে দুটি গর্ভাঙ্ক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে একটি করে গর্ভাঙ্ক আছে। নাটকটির প্রচ্ছদপত্র (১), ভূমিকা (১) সহ মূল নাটকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮। ১২৮৮ সালে চৈত্র মাসে নাটকটি ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। ২১.৫ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১৪ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকে উল্লিখিত পাত্র-পাত্রীরা হলেন- রাধা, কৃষ্ণ, সখীগণ, বৃন্দা। ‘গিরিশ রচনাবলী’র দ্বিতীয় খণ্ডে নাটকটি স্থান লাভ করেছে। নাটকটি প্রকাশিত হয় সাহিত্য সংসদ, ৩২-এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা- ৯ থেকে।

‘ব্রজবিহার’ নাটকে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের বৃন্দাবনলীলার দুটি কাহিনি গৃহীত হয়েছে। এক. বস্ত্রহরণ এবং দুই. রাসলীলা। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে রাধা ও সখীগণের কথোপকথনে উঠে এসেছে কৃষ্ণবিরহে রাধার হৃদয় ব্যাকুলতার কথা। রাধা জানিয়েছেন কৃষ্ণ তাঁর হৃদয়ে প্রেমের আগুন জ্বালিয়েছে। তিনি সখীদের বলেছেন-

“হয়েছি আপন হারা,
জ্বেলেছি আগুন হৃদে,

কি উপায় করি বল গো সজনি,
কেমনে পাইব শ্যাম গুণমণি ?”^{১১}

সখীরা রাধাকে নানাভাবে সাঙ্ঘনা দিয়েছেন। যমুনা নদীতে স্নানের জন্য যখন রাধা ও সখীগণ নেমেছেন, তখন কৃষ্ণ তাঁদের বস্ত্র চুরি করেছেন। বস্ত্র খুঁজে না পেয়ে তাঁরা কৃষ্ণকে চোর বলে দায়ী করেছেন। কৃষ্ণ সেকথা অস্বীকার করেন। সকলে কৃষ্ণের কাছে বস্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন -

“কালচাঁদ পায়ে ধরি,
দাও না বসন দাও না হরি,
ছি ছি হে লাজে মরি,
বসন নিয়ে এ কি খেলা!
যাব হে গৃহ-কাজে,
দেখ কত বাড়ুচে বেলা।”^{১২}

রাধাও কৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। ততপর কৃষ্ণ রাধাসহ সকল সখীকে বস্ত্র দান করেছেন-

“যে ব্রতে হ’য়েছ ব্রতী, কর গোপী উদ্‌যাপন।
এই ব্রতের(ই) সমাধান, কুলমান বিসর্জন।।

তজ অভিমান, প্রেমিকা নাগরী ধর ধর বসন।।”^{১৩}

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক নৌকাবিলাস। কৃষ্ণের নানা ছলা-কলা এবং মাঝির ভূমিকা নেওয়ার কথা এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে, যা আমরা ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যে বিস্তারিতভাবে পাই। এখানে তারই নাট্য রূপ প্রকাশ পেয়েছে। রাধা যখন কৃষ্ণকে বলেন- ‘ধর পণ্ নে যাও পারে’, কৃষ্ণ তখন রাধাকে এবং সখীদের জানিয়েছেন-

“জলে জলে ফিরি সাধে।
ফিরি রাই তোমার আশে,
আকুল হ’য়ে পরাণ ভাসে,
বাড়ে ডোর পালাই যত,
বেঁধেছে কি নূতন বাঁধে।।”^{১৪}

তৃতীয় অঙ্ক রাধা-কৃষ্ণের মিলন পর্ব, ‘রাসলীলা’ নামে কাহিনিধারা পরিবেশিত হয়েছে। রাধা-কৃষ্ণ ও সখীগণের মিলিত রাস উৎসব। সখীগণ গানে গানে রাধা-কৃষ্ণের মর্ত্যপ্রেমের মহিমা ব্যক্ত করেছেন এইভাবে-

“প্রেম বিনা কিছু চাহে না শ্যাম;
রাধা রাসরঙ্গিনী।
নিত্যলীলা রাসোৎসব,
বৃন্দাবনে গোলোক বিভব,
একপ্রাণ মাধবী মাধব,
সখীভাব ব্রজে মেদিনী।।”^{১৫}

কাহিনিকথনের মধ্যে দিয়ে ‘ব্রজবিহার’ নাটকটি চিরন্তন মানব-মানবীর জীবন কথা হয়ে উঠেছে, যা বড় চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের ভাবানুসারী বললে কোনো দ্বিধা থাকে না।

‘ব্রজবিহার’ নাটকে পৌরাণিক রাধা-কৃষ্ণের পরিচয় কথিত হলেও এ নাটকে আধ্যাত্মিকতার কোন পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়নি। এখানে রাধা-কৃষ্ণের চরিত্রকে নাট্যকার চিরন্তন কালের মানব-মানবীর প্রতিনিধি করেছেন। প্রেম ব্যাকুল রাধা একালের প্রেমিকা

নারীর মতোই প্রিয়কে পাবার জন্য আত্মহারা। শুধু তা নয়, কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য রাধা সখীদের সঙ্গে ব্রজের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি জানেন জীবনে কোনো কিছু সহজে পাওয়া সম্ভব নয়; তার জন্যে কঠিন পথ অবলম্বন করতে হয়, এমনকি পথের শত কষ্ট স্বীকার করতে হয়। রাধা চরিত্রে এইভাবে একালের নারী মনস্তত্ত্বের পরিচয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার। প্রেমবিরহে ব্যাকুল রাধা যখন হৃদয়ের কথা সখীদের বলেন, তখন রাধার কথায় সর্বকালের প্রেমিকার হৃদয়ব্যথা প্রকাশ পেয়েছে। এ রাধা যেন বৈষ্ণব পদাবলীর বা ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের রাধা নন, এ রাধা আমাদের সমাজে বসবাসকারী কোনো প্রেমিকা নারী। তাঁর আচরণ, কথা-বার্তা, অভিব্যক্তি- সমস্ত কিছুই আমাদের অতি পরিচিত বিষয়। রাধার বচন-ভঙ্গিতে রয়েছে সেই আন্তরিকতার ছোঁয়া। রাধা সখীদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন-

“ধরম করম সকলি গেল লো,
শ্যামা পূজা মম হল না ।
মন নিবারিতে, নারি কোনমতে,
ছি ছি কি জ্বালা বল না ।।
কুসুম-অঞ্জলি দিতে শ্রীচরণে,
ত্রিভঙ্গি ঠাম পড়ে সখি মনে,
পিতবসনে, হেরি গো নয়নে,
ভাবিতে দিকবসনা ।
ভাবি বনমালি কালি অসি করে,
হেরি বনমালী, বাঁশরি অধরে,
তিনয়না ধ্যানে, বঙ্কিম-নয়নে,
হেরি হই সই বিমনা,
এ কি লো এ কি লো ছলনা,-
মোরে নিদয়া হর-ললনা ।।”^{১৬}

পর-ঘরের নারী হওয়া স্বত্বেও রাধার অন্তরে কৃষ্ণের প্রতি যে তীব্র আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, তা উক্ত সংলাপে ধরা পরেছে। রাধা কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা। কৃষ্ণের জন্য তিনি জীবন-যৌবন, মান-সন্মান সমস্ত কিছুই জলাঞ্জলি দিয়েছেন। এ রাধা কঠিন ব্রতে আত্মনিষ্ঠ এক সাধিকা। তিনি যে-কোনো কিছুর বিনিময়েই নিজের অসীম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবেন। ‘ব্রজবিহার’ নাটকে কৃষ্ণচরিত্রের পৌরাণিক আভিজাত্য একেবারেই নেই। বরং তিনি এক দুরন্ত গ্রামীণ বালক। রাধার মন চুরি করে তাঁর হৃদয়ে যে যন্ত্রণার সূচনা করেছেন,

তার জন্য কৃষ্ণ যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী। শুধু রাধা নন, ব্রজের সমস্ত গোপবালিকার সঙ্গে তাঁর দুরন্তপনার পরিচয়ও আছে। রাধাসহ সখীরা যখন যমুনাতে স্নান করতে নেমেছেন, তখন তাঁদের বস্ত্র চুরি করেছেন কৃষ্ণ; তাঁদের নানাভাবে নাস্তানাবুদ করেছেন। খেয়াঘাটের মাঝির ভূমিকাতেও কৃষ্ণ রাধাকে নানা ছলা-কলায় কাছে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। এইভাবে কৃষ্ণ দুরন্ত প্রেমিকচরিত্র হয়ে উঠেছেন। আমাদের সমাজজীবনেও কৃষ্ণের মতো এমন কিছু প্রেমিক পুরুষকে আমরা পাই, যাঁরা কৃষ্ণের মতো নিজের প্রেমকে চরিতার্থ করার জন্য ছলা-কলার পথ অবলম্বন করেন; কৃষ্ণ যেন তাঁদেরই প্রতিভূ চরিত্র। তাঁর সংলাপে, আচার-আচরণে সে কথার প্রমাণ মেলে। নৌকাবিহারে কৃষ্ণ রাধার সখীদের উদ্দেশ্যে চাতুরী করে বলেছেন—

“আমার এ সাধের তরী
 প্রেমিক বিনা নেইনি কারে,
 যে প্রেম জানে না, চড়তে মানা,
 ডোবে তরী একটু ভারে ।
 মনে মন বুঝে দেখ, এস যদি প্রেমিক থাক,
 যে ধর প্রেমপসরা, এস ত্বরান্বিত নে যাই পারে ।
 প্রেম তুফানে তরী ভাসে,
 প্রেমিক দেখলে কূলে আসে,
 ঢেউ দেখে যে ভয় পাবে না,
 অকূল পারে নে যাই তারে ।।”^{১৭}

এইভাবে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের ভাবনার উপর নির্ভর করে ঊনবিংশ শতকের নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ অতি সুকৌশলে আধুনিক প্রেম-প্রণয় ও তাঁদের মনস্তত্ত্বকে তুলে ধরেছেন। ফলে ‘ব্রজবিহার’ নাটকের কাহিনি মধ্যযুগের হলেও আধুনিক ভাবনায় ভাবিত হয়ে পুনর্নির্মিত হয়েছে। নাটকটির পরিবেশ-পরিমণ্ডল সৃজনে বৃন্দা, রাধার অন্যান্য সখী এবং সঙ্গীতের বড় ভূমিকা আছে। যদিও ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’ বড় চণ্ডীদাস কাব্য-কাহিনির সমাপ্তি করেছেন রাধার বিরহ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে, কিন্তু একালের নাট্যকার গিরিশচন্দ্র তাঁর ‘ব্রজবিহার’ নাটকের পরিণতি দেখিয়েছেন রাধা-কৃষ্ণের মিলন ও বসন্ত উৎসবের চিত্র অঙ্কন করে। এখানে নাট্যকার এক ধাপ এগিয়ে এসেছেন। ফলে একালের নাট্যপাঠক ও দর্শকের কাছে নাটকটি আরও বেশি করে আত্মস্বাদ্যময় হয়ে উঠেছে।

রাজা মহেন্দ্রলাল খান - মথুরা-মিলন (১৮৮৩) ;

১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে রাজা মহেন্দ্রলাল খান বৈষ্ণব পদাবলী অবলম্বনে রাধার মাথুর পর্বের বিরহ নিয়ে রচনা করেছেন ‘মথুরা মিলন’ নামের একটি নাটক। ২৪ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১৬ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটিতে প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (১), বিজ্ঞাপন (১), চরিত্রলিপি (১), মূল নাটক (৫২) সহ মোট ৫৬টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ—

“মথুরা-মিলন / গীতিনাট্য/ শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্রলাল খান।”^{১৮}

নাটকটির নামপত্রটি এইরূপ—

“মথুরা-মিলন/ গীতিনাট্য/ নারাজোল ও মেদিনীপুরাধিপতি/ শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্রলাল খান কর্তৃক/ সুর লয়ে গঠিত/ [বন্ধুবর্গের ব্যবহাবার্থে প্রথম বার মুদ্রিত।]/ MATHURA- MELAN/ OPERA/ BY/ RAJA HOHENDRAO LALL KHAN/ শ্রীকৃষ্ণ রসসঙ্গীতগ বীণাধ্বনিসমম্বিতং।/ কুরুবৎসাধুনাত্রেব শৃণু মুনয়ঃ সুরাঃ।।/ পদ্মাপুবাশং/ রাধার বঁধু তুমি হে, আমি চিনেছি তোমায় শ্যামরাব।/ রাজার বেশ ধরেছ হে মথুরাষ।/ রাখালেরবেশ লুকায়েছ বঁধু,/ বাঁকা নয়ন লুকাবে কোথায়।/ নিত্যানন্দ বৈরাগী।/ কলিকাতা। / শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানিকর্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে/ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/ সন ১২৮৯ সাল। ইং ১৮৮৩ সাল।”^{১৯}

প্রকাশকালীন গ্রন্থকার নাটকটির ‘বিজ্ঞাপন’ পত্রে বলেছেন -

“মথুরা-মিলন” প্রকাশ করিতে বাধিত হইলাম। এই ক্ষুদ্র নাট্যগীতিকাখানি প্রায় চারি বৎসরাতীত হইল সুরলয়ে গঠিত হইয়াছে। ইহা মুদ্রাঙ্কিত করাইতে আমার বড় একটা ইচ্ছা ছিল না, কেবল কতিপয় সহৃদ-বান্ধবের আগ্রহাতিশয়ের বশবর্তী হইয়া, পূর্বাভিলাষ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থা এক্ষণে যেরূপভাবে দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আদ্যরস সংসৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত সংস্কীর্ণন যে আধুনিক সভ্য সমাজের কতদূর প্রীতিপ্রদ হইবে তাহা বলিতে পারি নাই, এবং আমি ক্ষণকালের জন্যও সে চিন্তা করিয়া এই গীতিকা প্রণয়ন করি নাই। কেবল সাত্বিকভাবে কৃষ্ণলীলা সংস্কীর্ণন করাই যখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন ইহাতে কেহ তুষ্ট বা রুষ্ট হউন, আমি তাহাতে ক্ষুব্ধ নহি। তবে যাঁহারা

অবকাশ কাল বৃথা নষ্ট না করিয়া, ভূতভাবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের
গুণানুকীৰ্তন ক্ষেপণ করিতে বাঞ্ছা করেন, এই গীতিকা অবশ্য
অল্পপরিমাণেও যে তাঁহাদের সাহায্যপ্রদ হইবেক, তাহাতে অণুমাত্রও
সংশয় নাই, ইতি।/ নারাজোল রাজবাটী, জেলা মেদিনীপুর।/ গ্রন্থাকার /
শকাব্দ ১৮০৪, ওরা চৈত্র।”^{২০}

নাট্যোল্লিখিত চরিত্রগুলি হল- শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীদাম, নন্দ, উপানন্দ, শ্রীরাধা, যশোদা, বৃন্দা,
চিত্রেখা, ললিতা, যশোদা, রোহিনী, বিশাখা, প্রথম ও দ্বিতীয় দ্বারী প্রমুখ। নাটকটি
প্রকাশিত ও মুদ্রিত হয় ঈশ্বরচন্দ্র বসুর কোম্পানি কর্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে। প্রচ্ছদপত্রে কেপ্টা মুচির চার পংক্তির ছোট পদ লেখা আছে। তাতে বলা
আছে-

“ছবি কে বুঝে, তোমার এ লীলে।
ভাল প্রেম করিলে।
হইয়ে ভূপতি, কুবুজা যুবতী, পাইয়ে শ্রীপতি
শ্রীমতী রাধারে রহিলে ভুলে।”^{২১}

ঠিক একইভাবে নাটকের নামপত্রেও নিত্যানন্দ বৈরাগীর চার পংক্তির আর একটি ছোট
পদ লেখা আছে। সেখানে বলা আছে—

“রাধার বেশ ধরেছ হে মথুরায়।
রাখালের বেশ লুকায়েছ বঁধু
বাঁকা নয়ন লুকাবে কোথায়।”^{২২}

নাটকটি পাঁচটি অঙ্ক এবং অনেকগুলি দৃশ্য নিয়ে রচিত।

‘মথুরা-মিলন’ নাটকের কাহিনি ভাবনা গড়ে উঠেছে কৃষ্ণের মথুরা যাত্রার জন্য
প্রেমিকা নারী রাধার বিরহ-বেদনাকে অবলম্বন করে। কৃষ্ণ কংস বিনাশের জন্য মথুরায়
গেলে রাধা বৃন্দাবনের নিকুঞ্জকাননে বসে একাকিত্বের যন্ত্রণা অনুভব করেছেন। মৃত্যুতুল্য
এই বিরহবেদনা অনুভব করে রাধা সখীদের বলেছেন—

‘নাথ কোথা রহিলে।/ তব অদর্শনে, বিচ্ছেদ-দংশনে,/ দিবানিশি ভাসি
অশ্রু- সলিলে।/ আসিবার আশা দিয়ে অধীনীরে, করি প্রতারণা গেলে
মধুপুরে,/ অদ্যাপি পুনঃ না আসিলে ফিরে,/ এত কঠিনতা, কেবা
শিখালে।/ তুমি তথা সুখে করিছ যাপন, হেথা খরশরে আমারে মদন,/
প্রহরে প্রহরে করে প্রপীড়ন,/ উহু মরি মরি প্রাণ যায় জ্বলে।”^{২৩}

প্রিয় সখী বৃন্দা রাধাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন নানাভাবে। কখনো ধৈর্য ধরতে বলেছেন, কখনো কৃষ্ণকে অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু রাধার মন কিছুতেই শান্ত হয়নি। রাধা বলেছেন—

‘প্রাণ-স্বজনি প্রাণে দিব বিসর্জন।/ আর সহে না রে বিচ্ছেদ-দহন।/ হায় হায় হায়,/ প্রাণ জ্বলে যায়,/ কি করি কি করি,/ না হেরি উপায়;/ পিকের পীড়নে, স্মর-শর-সন্ধানে,/ প্রাণ ধরি কতক্ষণ’।^{২৪}

দিনের পর দিন কৃষ্ণবিরহে রাধার অন্তর জ্বালাময় হয়ে উঠেছে প্রকৃতির নানা রূপবৈচিত্র্যে। বসন্তের আগমন, কোকিলের ডাক, মলয় বাতাস, ভ্রমরের গুজন, গাছে গাছে ফুলের বাহার প্রভৃতি নানাবিষয় রাধার অন্তরের দুঃখকে দ্বিগুণ করে দিয়েছে। রাধা মলয় পবনকে অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন—

‘শুন ওহে মলয়পবন।/ আজি ব্রজ হ’তে, যাও মথুরাতে,/ প্রাণনাথ তথা করেছে গমন।/ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে আমি বিরহিণী, বিচ্ছেদবিকারে হয়েছি তাপিনী,/ বিষম বিষাদে করেছে দুখিনী,/ করিও না আর মোরে জ্বালাতন।/ তবে যদি মম প্রতি দয়া কর, যাও কুঞ্জ ত্যজি হইয়ে তৎপর,/ মম ক্রন্দনের ধ্বনি উপহার,/ গিয়ে ত্বর তবে শ্যামে কর দান।’^{২৫}

রাধার এই ভাবনার সঙ্গে মিলে গেছে কবি কালিদাসের ‘মেঘদূত’ কাব্যের যক্ষের বিরহযন্ত্রণার বর্ণনা। যক্ষ যেমন মেঘকে দূত করে তাঁর কুশলবার্তা পৌঁছাতে চেয়েছেন অলকাপুরীতে থাকা প্রিয়ার উদ্দেশ্যে, ঠিক তেমনিভাবে রাধাও মলয় পবনকে দূত করে মথুরায় পাঠাতে চেয়েছেন কৃষ্ণের কাছে নিজের করুণ অবস্থার কথাকে বোঝাতে। এটি একটি বার্তা প্রদানের অভিনব প্রাকৃতিক মাধ্যম। এমনকি রাধা রতিপতিকেও অনুরোধ জানিয়েছেন মথুরায় কৃষ্ণের প্রেমতৃষ্ণাকে জাগিয়ে তোলার জন্যে; ঠিক যেমনভাবে পার্বতীর জন্য তিনি বান নিক্ষেপ করেছিলেন শিবের উপর। রাধা এখানে বিচ্ছেদকে একটি কাল্পনিক চরিত্ররূপে কল্পনা করে অভিযোগের সুরে তাঁকে বলেছেন—

‘যাও যাও যাও হে বিচ্ছেদ, একবার।/ আমাদের জ্বালালে হবে কি লাভ তোমার।/ প্রাণ হরি প্রাণ হরি,/ গিয়েছে মথুরাপুরী,/ যাও তথা ত্বর করি, মিনতি আমার।/ তারে জ্বালাতে পার না,/ মোরে দিতেছ যন্ত্রণা,/ আর ত প্রাণে সহে না, এত অবিচার’।^{২৬}

রাধার ব্যাকুলবেদনা প্রশমিত করার কোনো উপায় না পেয়ে, সখীরা যুক্তি করেছেন মথুরায় গিয়ে কৃষ্ণকে অনুরোধ করে ফিরিয়ে আনবেন রাধার কাছে। বৃন্দা রাধাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন—

‘ধনি ধৈর্য্য ধর ধর।/ চলিলাম আনিবারে শ্যাম নটবর’।^{২৭}

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে নন্দরাজার ঘরে মা যশোদা কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। মা যশোদা বিলাপ করে বলেছেন—

‘কোথায় গেলি রে মম প্রাণের নীলরতন।/ তব অদর্শনে রে বাপ্ সতত কাঁদে জীবন।/ এস বাছা করি কোলে,/ বারেক ডাক মা বলে,/ বল কি ভেবে হইলে, যাদু, নিষ্ঠুর এমন।/ এই দেখ ক্ষীর-শর,/ নবনীত, ধর ধর,/ বারেক তুলে অধর, দেখা রে হাস্যবদন।’^{২৮}

শুধু রাধা বা নন্দরাণী নন, কৃষ্ণবিরহে সমগ্র বৃন্দাবন অন্ধকার হয়ে পরেছে। শুধু মানুষ নন, বৃন্দাবনের ধেনু, নদী, গাছ-পালা, পাখিকুল- সমস্ত কিছুই যেন কৃষ্ণবিরহে কাতর। মথুরায় গিয়ে রাধার সখীরা রাজা কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। বৃন্দা রাধার বিরহ-ব্যাকুলতার কথা কৃষ্ণের কাছে ব্যক্ত করে বলেছেন—

‘আর সুধাও কিহে সমাচার।/ হরি তোমা বিনে, তব বৃন্দাবনে, দিবস যামিনী/ শুনি হাহাকার।/ গোপগোপীকুল সবে শোকাকুল,/ পশু-পক্ষিকুল হয়েছে ব্যাকুল,/ গোষ্ঠে বিচরণে যায় না গোকুল, শোকে বিলুপ্তিত/ সবে শবাকার।/ স্পন্দন-রহিত নন্দ উপানন্দ,/ রাণী যশোমতী কেঁদে কেঁদে অন্ধ,/ শ্রীদাম সুদাম আদি নিরানন্দ, কেহ কার তত্ত্ব/ নাহি লয় আর।/ রাধার দুর্গতি কি কহিব হয়,/ সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পতিতে ধারায়,/ দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে কায়, হয়েছে ধনীর/ প্রাণে বাঁচা ভার।’^{২৯}

বৃন্দার কথাতে যেমন একে একে সমগ্র বৃন্দাবনের বিরহ উঠে এসেছে, তেমনি উঠে এসেছে রাধার মাথুর বিরহের কথা। ঠিক একইভাবে গোপবালিকাদের কাছে প্রকাশ পেয়েছে কৃষ্ণের বৃন্দাবন বিরহের কথা। কৃষ্ণ নিজের অন্তরের কথা প্রকাশ করে তাঁদের বলেছেন—

‘এখানে যদিও দেখিতেছ মোরে,/ অন্তর আমার আছে ব্রজপুরে,/ নিরন্তর হৃদে ভাবি গোপিকারে, অলক্ষ্যভাবে/ সদা তথা রই।/ বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী কিশোরী,/ প্রাণাধিক প্রিয়ে প্রাণের ঈশ্বরী, / শয়নে স্বপনে সেরূপ

নেহারি, তাঁর প্রেমের/ ভিক্ষুক মাত্র হই।/ মধুপুর কিছু হতে বৃন্দাবন, মম
প্রিয়প্রদ নহে কদাচন,/ এ জনমে নাহি হব বিস্মরণ, কখনই তোমাদিগে
প্রাণ সহি।”^{৩০}

সমগ্র নাটকের কাহিনির পঁচানব্বই ভাগেই রাধার ও বৃন্দাবনবাসীর হৃদয়বিরহকে প্রধান করে তুলেছেন নাট্যকার। এর ফলে নাটকটি অনেকাংশেই বিরহ নাটক। শেষের পাঁচভাগ অংশে কৃষ্ণের বৃন্দাবনে আগমন ও রাধার সঙ্গে মিলিত হওয়ার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তাই পরিণতি বিচারে রাধা- কৃষ্ণের মিলন দৃশ্যের পরিচয়ে নাটকটি মিলনান্তক নাটক হয়ে উঠেছে। এইভাবে বিরহ-মিলনের মধ্য দিয়ে ‘মথুরা-মিলন’ নাটকটি পুনর্নির্মিত ও বিনির্মিত হয়ে উঠেছে।

নাটকের চরিত্র-ভাবনার মধ্যে রাধাকেই প্রধান করে দেখানো হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীতেও ‘বিরহ’ পর্বে কৃষ্ণের বিরহ অপেক্ষা রাধার বিরহ পদকর্তারা অনেকটা বেশী করে দেখিয়েছেন। এই নাটকেও আমরা একইভাবে রাধার অন্তর জগতকে অনেকটা বড় করেই দেখতে পাই। কৃষ্ণের বিরহের কথা থাকলেও তা অতি সামান্য অংশ জুড়ে আছে। এই বিরহ প্রকাশে প্রকৃতির ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নিয়েছে। নিজের মৃত্যু কামনা করে রাধা যখন বলেছেন—

‘বাধা দিওনা স্বজনি, আর মোরে পুনঃ পুনঃ।/ আজি যমুন-জীবনে দেখ
তাজিব জীবন।/ উছ মরি কি যাতনা,/ আর ত প্রাণে সহে না,/ জীবনে
নাহি বাসনা, প্রাণে নাহি প্রয়োজন’।^{৩১}

তখন পাঠক নিজের অন্তরে রাধার বেদনা অনুভব করে ব্যথিত হন। মথুরায় কৃষ্ণ নিজের বৃন্দাবনকে ভুলে থাকার জন্য অনুশোচনা করে বৃন্দাকে বলেছেন—

‘রাখ রাখ রাখ সখী এই বিনয় আমার।/ আর কেন অকারণে লজ্জা দাও
বারম্বার।/ শুনি ব্রজের মঙ্গল, কে কেমন আছে বল,/ চিত্ত হইল চঞ্চল,
ব্যঙ্গ করিও না আর’।^{৩২}

এইভাবে রাধা-কৃষ্ণ সহ বিভিন্ন চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে নাটকটি আধুনিক ভাব, ভাষায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। নাটকের গানগুলি এবং নির্ধারিত তাল-মান নাট্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে যুগোপযোগী হয়েছে। প্রধান চরিত্র দুটি ছাড়াও শ্রীদাম, নন্দ, উপানন্দ, মাতা যশোদা, বৃন্দা, চিত্ররেখা, ললিতা, রোহিনী, বিশাখা প্রমুখ চরিত্রগুলি নাট্যকাহিনির গতিদানে ও পরিবেশের বৈচিত্র্যদানে নানাভাবে সহায়তা করেছে। ফলে নাটকটি আধুনিক দর্শকের কাছে আকর্ষণীয় রুচি সংগত হয়েছে। এইভাবে সার্বিক দিক

বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি যে রাজা মহেন্দ্রলাল খানের ‘মথুরা-মিলন’ নাটকটি সার্থকভাবে পুনর্নির্মিত ও বিনির্মিত নাটক হয়ে উঠতে পেরেছে।

মনোমোহন বসু- রাসলীলা (১৮৮৯);

১৮১১ খ্রিষ্টাব্দে মনোমোহন বসু রাধা-কৃষ্ণের মিলন উৎসবের ভাবনাকে নিয়ে লিখেছেন ‘রাসলীলা’ নামের একটি নাটক। এই নাটকটি বৈষ্ণব পদাবলীর ‘মিলন’ পর্বের অন্তর্গত। ২২ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১২.৬ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকের প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (১), পিতৃদেব স্মরণে দুটি গোড়ার কথা (২), অভিনয়োক্ত ব্যক্তিগণ (১), মূল নাটক (১০৪) সহ গ্রন্থটিতে মোট ১০৯টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ—

“রাসলীলা নাটক/ শ্রীমনোমোহন বসু/ কলিকাতা”^{৩৩}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ—

“রাসলীলা নাটক/ (A Melo-Drama) / শ্রীমনোমোহন বসু-কর্তৃক প্রণীত /ও/ কলিকাতা ২০২ নং করন্‌ওয়ালিস্‌ স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।/ কলিকাতা/ ৬৫/২ নং বিডনস্ট্রীট, দেব-যন্ত্রে/ শ্রীরাজকুমার ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত।/জ্যৈষ্ঠ, ১৯২৬ সাল/ শকাব্দ ১৮১১।/ All raghts reserved.”^{৩৪}

‘পিতৃদেব স্মরণে দুটি গোড়ার কথা’ অংশে নাটকটি সম্পর্কে ননীগোপাল রায়(গৌরদাস) জানিয়েছেন—

“শৈশবকাল হতেই আমি আমার পরমারাধ্য পিতৃদেবকে (স্বর্গীয় হরচন্দ্র রায়) এক সংসার-বিরাগী সম্পূর্ণ মুক্তপুরুষ হিসাবে দেখে আসছি; আর মাকে (মহামায়া দেবী) দেখেছি ঠাকুর ঘরে। পিতৃদেবের আগ্রহাতিশয্যে দিনরাত গৌরভক্ত মহাজনদের পবিত্র চরণ-ধূলিতে আমরা ধন্য হতেম; তাঁদের সুললিত কণ্ঠ নিঃশ্রিত পাণ-মাতানো “গৌর বিষ্ণু প্রিয়া” নাম কীর্তনে আমাদের ঠাকুর-গৃহ ও সংলগ্ন বহির প্রাঙ্গণ সদা সর্বদা আনন্দ মুখরিত থাকত। গৌরভক্তবৃন্দ ছাড়াও অন্যান্য সাধু সজ্জন ভক্ত বৈষ্ণবদেব কৃপালাভে আমরা বঞ্চিত ছিলাম না। সংসার-মুক্ত পিতৃদেব মহাশয় সাধু সন্ন্যাসীদের নিয়ে স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করতেন এঁদের সেবা পরিচর্যা ও সঙ লাভ করে।

“আমাদের গৃহে দৈনন্দিন এরূপ সাধু সমাগম ও তাঁদের অভ্যর্থনা আপ্যায়ণের পেছনে আমার মাধ্যম খুড়া মহাশয় স্বর্গীয় রায় বাহাদুর জগৎচন্দ্র রায় এবং ছোট খুড়া মহাশয় স্বর্গীয় নবদ্বীপচন্দ্র রায়ের অবদান অতুলনীয়। বস্তুতপক্ষে তাঁরা তিন ভাইই অতীব ধর্মপ্রাণ এবং ভক্ত বৎসল ছিলেন। ধর্মীয় ব্যাপারে তিন ভাইয়ের সমদৃষ্টিভঙ্গী থাকাতেই সংসারমুক্ত অগ্রজের পক্ষে দীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপী সাধু সজ্জনদের এরূপ অকুণ্ঠ ও নিরলস সেবা করে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

“গৌর ভক্তবৃন্দের সহ কীর্তনানন্দে বিভোর থেকে কখন যে পিতৃদেব কলম হাতে নিয়েছিলেন এবং কি পরিবেশের মাঝেই বা ‘নদীয়া যুগল’ লিখেছিলেন সেকথা আজ আমার মনে আসে না। জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে একদিন পিতৃদেব আমার স্ত্রী (হাসি) ও আমাকে তাঁর পাশে ডেকে এনে বইটি ছাপাবার অন্তিম ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আজীবন আত্মপ্রচারে কুণ্ঠিত বলেই হয়ত পাণ্ডুলিপিটি ১৩৪১ বঙ্গাব্দে সম্পূর্ণ করেও তিনি সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল পর্যন্ত উহা স্থায়ী তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত করার প্রয়াসী হন নাই। কিন্তু আমি এমনই হত ভাগ্য সন্তান, পিতৃদেব স্বর্গীয় হবার পর দীর্ঘ ১২ বৎসরের মধ্যেও উহা ছাপাবার মতো মানসিক প্রেরণা লাভে বঞ্চিত ছিলাম। আজ আমার একমাত্র দুঃখ, পিতৃদেবের জীবদ্দশায় যদি বইখানা ছাপিয়ে পিতৃদেবের সাধন-সঙ্গী সকল গৌরভক্তদের করকমলে একখানা করে উৎসর্গ করতে সক্ষম হতেম তাহলে হয়ত পিতৃদেবের দীর্ঘ কালের লালিত এক অব্যক্ত কামনার তৃপ্তি লাভ হত। পিতৃদেবের সেই অতৃপ্ত কামনা বাস্তবায়িত হতেই যেন নানা হাত ঘুরে এক অলৌকিক নির্দেশে শেষপর্যন্ত পাণ্ডুলিপিখানা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হতে এখানে এসে পৌঁছেছে।

“গ্রন্থটি প্রকাশনার পেছনে সর্বাত্মে শ্রদ্ধেয় ভক্তপ্রবর স্বর্গীয় রজনীকান্ত ভৌমিক ও স্বর্গীয় অনঙ্গমোহন পোদ্দারের নাম উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ এঁদের উভয়ের নিরলস প্রচেষ্টা ও সক্রিয় প্রেরণা ব্যতীত এ কাজ কখনও আমার পক্ষে সম্ভব হত না। কিন্তু আমার এমনই দুর্ভাগ্য—মুদ্রিত বইটি এঁদের কেহই দেখে যেতে পারলেন না। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে পাণ্ডুলিপিটির স্থানে স্থানে লেখা অস্পষ্ট এবং ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, যার ফলে ছাপতে গিয়ে সম্পূর্ণ নির্ভুল উদ্ভূতি হয়ত সম্ভব হয় নি। সকল ত্রুটি

বিচ্যুতি ও অক্ষমতার জন্য গৌরবদাশ্রিত সকল ভক্তবৃন্দের অপার স্নেহ
করুণা মিশ্রিত মার্জনা ভিক্ষা করি।”^{৩৫}

নাটকে উল্লিখিত পুরুষ চরিত্রগুলি হলো- কৃষ্ণ, বলরাম, ছিদাম, সুবল, অন্যান্য রাখালগণ, দেমো, ভেমো, আয়ান, আয়ানের ভৃত্য ভেকো এবং নারী চরিত্রগুলি হলো- রাধা, বৃন্দাদূতী, ললিতা, বিসখা, চকিতা, চম্পকলতা, মদনলেখা, চিত্রলেখা, অঞ্জনী, শ্যামা, অন্যান্য সখীগণ, কালিন্দী-বৈষ্ণবী, জটিলা, কুটিলা, আয়ানপুরীর পরিচারিকা জা’নকী, প্রতিবাসিনীগণ। নাটকের মধ্যে রাধার সখীদের দ্বারা অভিনীত নারী-পুরুষ চরিত্রগুলি হলো- নন্দ, উপানন্দ, অন্যান্য গোপগণ, কৃষ্ণ, বলরাম, ছিদাম, সুবল, অন্যান্য রাখালগণ, নলকুবর, মণিগ্রীব এবং যশোদা, রোহিণী, নব্যা প্রতিবাসিনীদ্বয়, ব্রাহ্মণী-রূপিনী পুতনা, যশোদার পরিচারিকা সুগন্ধা, কুড়ুনী মাসী। নাটকটি মনোমোহন বসু কর্তৃক প্রণীত ও কলিকাতা ২০২ নং করন্‌ওয়ালিস স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। রাজকুমার ভট্টাচার্য দ্বারা ৬৫/২ নং বিডনস্ট্রীট, দেবযন্ত্রে মুদ্রিত। নাটকটির প্রচ্ছদপত্রে ‘A Melo-Drama’ নাটক বলে উল্লিখিত হলেও প্রত্যক্ষভাবে মৃত্যুর দৃশ্য এখানে দেখানো হয়নি।

মনোমোহন বসু রাধা-কৃষ্ণের বসন্ত মহারাসের বিবরণ দিলেও নাটকটিতে তিনি অতি সচেতনভাবে তৎকালীন সমাজ জীবনের কথা তুলে ধরেছেন। রাধা এখানে আয়ান ঘোষের পত্নী। তিনি এক কুলবধূ, তাঁর পক্ষে বাইরের পুরুষ কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম বিনিময় করা কিছুতেই সম্ভব নয়। একদিকে সমাজ-বিধানের নিয়ম-কানুন, অন্যদিকে স্বামী-পরিবারের নানা বাধা অতিক্রম করা দূরূহ। নাট্যকার এই দুই বৈপরীত্যের টানাপোড়েনে নাটকটিকে সামাজিক নাট্যপালার মতো করে গড়ে তুলেছেন। ফলে দর্শকের কাছে নাটকটির আবেদন অনেকগুণ বেড়ে গেছে। প্রথম অঙ্কের শুরুতে আমরা দেখি ননদি কুটিলা নানাভাবে রাধার আচার-আচরণের নিন্দা করেছেন -

“দেখ একবার বৌ ছুঁড়ীর আঙ্গুষ্ঠাটা দেখ! এই খানিক আগে কতই না ব’কিছি! মাও কত বোজালেন! ও মা, সব ভস্মে ঘি ঢালা হলো। শাশুড়ী ননদের এত কথা, সব বাঁ পায় ঠেলে চলে গেল! ইরি মধ্যে কখন বাশী বাজলো, কখন ছটকে বেরুলো, কিছুই তো টের পাইনি! আমি আর পারিনে—কি কুক্ষ্যাণে নচ্ছান্নী বৌ ঘরে এলো, আমার হাড় গোড় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মা’ল্লে! মা ভাবেন ছোঁড়া ছেলে মানুষ, খেলা ক’ত্তে বৌ গেলই বা! দাদার মনেতেও বুঝি অগ্নি একটা ভাব আছে, নৈলে আর শাসন করে না! কিন্তু আমি বেস জানি, ওটা সর্ব্বনেশে ছেলে— যারে বলে এঁচড়ে পাকা!

এই বয়েসে না ক'ল্লে কি? ও বাবা! ও আবার ছেলে মানুষ! ছেলে মানুষ
চুলোয় যাক, ওটা মানুষই নয়- ও ছোঁড়া নিশ্চয়ই দতি-দানব অপদেবতা-
টপদেবতা কি একটা এসে নন্দের ঘরে মায়া করে জুটেছে!”^{৩৬}

এমনকি বউকে দাদা উপযুক্ত শাসন করেন না বলেই বউয়ের এতো বড় ‘আস্পদা’।
তিনি দাদার উপর রাগ করেছেন। ইতিমধ্যে জটীলা-কুটিলার কাছে খবর এসেছে
মহারাসের ‘অছিলায়’ রাধা-কৃষ্ণ মিলিত হবেন। খবর শুনে কুটীলা বলেছেন—

“বটে! এত বড় বুকের পাটা! মার ঝ্যাঁটা! এততেও আশ্ মেটে না, আবার
রাস-মহারাস—সব্বনাশ! কারে বলে রাস, তাও ছাই জানিনে! দেখবো
কেমন রাস, মুখে দেব পাঁশ, বুকে ডলবো বাঁশ, আনুক আগে বাঁশী- যাতে
নাগায় ফাঁসি! যাই তার যোগাড় দেখিগে—”^{৩৭}

নাট্যকার এই লৌকিক কাহিনিতে ক্রমে ক্রমে যুক্ত করেছেন অলৌকিক ভাবনা। আসলে
তিনি রাধা ও কৃষ্ণকে গোলকের লক্ষ্মী ও নারায়ণ বলে সমাজ প্রচলিত পরকীয়া প্রেমের
উর্ধ্বে উঠিয়ে রাধা-কৃষ্ণের মহিমাকে বজায় রাখতে চেয়েছেন। এদিকে রাধার সখীরা
মহারাসের উৎসবের জন্যে নানা আয়োজন করতে থাকেন। স্বয়ং রাধা যাকে যে কাজের
ভার দিয়েছেন, তাঁরা সেই কাজটি করতে চেয়েছেন হাসি মুখে। রাধা ললিতা ও বিসখাকে
বলেছেন-

“ভাই ললিতে, তোমার উপর লতার-ভাই বিসখা, তোমার উপর শাখা
পল্লবের ভার-যেখানে যেখানে যত লতা পাতা শাখা পল্লব যে ভাবে
সাজাতে বসাতে হবে, তার অধ্যক্ষ তোমার- সব যেন ভাই সুললিত
হয়।”^{৩৮}

রাধা সখী কুসুমকে বলেছেন-

“সখী কুসুমের উপর স্থলজ পুষ্পের, আর সখী সরোজিনীর উপর জলজ
পুষ্পের ভার- কিন্তু যেন মনে থাকে, এ কাজে পর্বত প্রমাণ রাশ রাশ
ফুল চাই! সখী মালিনীকে ফুলের মালা আর ফুলের অলঙ্কারের ভার দেও!
সখী মালিনীকে ফুলের মালা আর ফুলের অলঙ্কারের ভগার দেও! সখী
কুঞ্জবতীর উপর কুঞ্জ সাজাবার ভার—”^{৩৯}

জাটীলা, কুটীলার পরামর্শ মতো দেমো ও ভেমো বালক রাখাল সেজে কৃষ্ণের বাঁশী চুরি করেন এবং ধরা পরে যান; রাখাল বালকেরা তাঁদের মারতে আসলে কৃষ্ণ তাঁদের বাধা দেন। দেমো-ভেমো নিজের বিপথগামিতার জন্য কৃষ্ণের কাছে ক্ষমা চান। ভেমো বলেন—

“আমরা প্রভু! কুসঙ্গে কাল কাটিয়েছি, পথ হারিয়েছি—ঐ (কুটীলাকে নির্দেশ) উনি আমাদের আরো কুপথে নে গেলেন—একে আমরা নষ্ট, দুষ্ট, পাপিষ্ঠ, মোদের আরো নষ্ট কর্ত্ত্বেন—কত লোভ দেখিয়ে বাঁশী চুরিতে মজালেন—তোমাদের সাড়া পেয়ে মোদের ঘুঁটের মাচায় নুকিয়ে রা’খলেন।”^{৪০}

দেমো বলেন—

“দয়া কর দয়াময়! দয়া কর! মোদের আর কেউ নেই, কৃষ্ণ, কেউ নেই—তুমিই বা, তুমিই ভাই, তোমার পদ-হস্ত পর্শ মাত্রেই জ্ঞান পেয়েছি—চিনেছি মোরা চিনেছি! ঐ রাঙা চরণ জন্মে আর ছা’ড়বোনা— আর কুপথে যাব না— কানাই, কানাই, পায় রাখ! সাথে নেও! সুমতি দেও! সুপ্তহ দেখাও! গোষ্ঠের সাথী কর— তোমার রাঙা পা দেখতে দেখতে, সাথে সাথে ঘুরবো— আর মোরা কিছুই চাইনে!”^{৪১}

কৃষ্ণ তাঁদের আলিঙ্গন করেন এবং তাঁদের অপরাধ ক্ষমা করেন। আমাদের সমাজে জাটীলা, কুটীলার মতো কুচক্রী নারীর পরিচয় যেমন মেলে, তেমনি মেলে দেমো, ভেমোর মতো অন্যায়কারি চরিত্র। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভুল বুঝতে পেরে নিজেদের অপরাধ প্রবণতা ত্যাগ করে ভালো মানুষ হয়ে ওঠে; আবার কেউ সেই অপরাধের অন্ধকার অতিক্রম করে আলোতে পৌঁছাতে পারে না। কৃষ্ণের বাঁশী চুরি যেন সেই ঘটনার বহিঃপ্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধার রাত্রিকালে রাস উৎসবে মিলনের যে দৃশ্য বৈষ্ণব পদাবলীতে ছিল, তা এই নাটকে চিত্রিত হয়েছে। রাধা তাঁর লৌকিক জীবনের স্বামী আয়ানের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন নিজের লক্ষ্যে যাওয়ার জন্যে। ঠিক তখনই নাট্যকার আমাদের মনের বাধা দূর করার জন্য একের পর এক আধ্যাত্মিক তথ্যগুলি পরিবেশন করেছেন। আয়ানের কাছেও যেন পত্নী রাধার আধ্যাত্মিক স্বরূপটি জানা ছিল। তিনি রাধাকে দেবীজ্ঞানে বলেছেন—

“(সিংহাসন আনিয়া স্থাপন কালে) ব’সো ব’সো—দীনের কুটীরে দয়া করে একবার এলে তো একটু ব’সো! এই রত্ন সিংহাসনে ব’সো—এখানি তোমার তরেই প্রস্তুত করে রেখেছি! (বক্ষে মৃদু করাঘাত) এই পাপ-তাপ-

ময় হৃদয়-সিংহাসন প্রস্তুত রাখতে সাহস পাই না—কাজেই আত্মমত সেবার ব্যবস্থামতে ইহাতেই বসাই—বসিয়ে চর্ম-চক্ষু রূপ-মাধুরী দেখে জন্মসফল করি রাধে! সত্যই আ'জ অধম আয়ানের জন্মকর্ম সফল হলো—সাধনের ধন, সাধের রতন হাতে পেয়ে পূর্ব-সাধন সিদ্ধ হ'লো!”^{৪২}

এরপর আয়ান জ্ঞানচক্ষুতে দেখতে পেয়েছেন -

“এই তো দিব্যজ্ঞানের উদয় অনুভব হচ্ছে বটে! বুঝলেম, তুমিই দিলে—এ জ্ঞান-চক্ষু তুমিই দিলে—তায় সন্দেহ আর নাই! দেখি, দেখি, ধ্যানে দেখি, তুমি কে? হা! একি দেখি! এ যে অপরূপ! ত্রিলোক যে দৃষ্টির আয়ত্ত! বিচিত্র দৃশ্য! অতি বিচিত্র! পবিত্র গোলোক ধামও দেখতে পাচ্ছি—তা যে শূন্য! আহা, আমিই যে ধন্য! মহালক্ষ্মী কমলা যে রাধা রূপে আমার গৃহে—এই যে, এই পামরের সম্মুখেই উদয়!—অহো! কি ভাগ্য—কি ভাগ্য—কি আনন্দ! স্বয়ং গোলোকেশ্বরী ব্রজেশ্বরী রূপে আমার জীবিতেশ্বরী! তবে কি আমিই সেই নারায়ণ? কৈ, না—দিব্যজ্ঞান তো তা দেখায় না! তবে তিনি কোথায়? এই যে দেখছি ব্রজের মাঝে—নন্দের গৃহে—হা! এই যে রাখাল-বেশ—এই যে গোচারণ—এই যে যমুনাপুলিনে মোহন মুরলীধারী! আবার ও কি? বামে কে? হা এত দিনে ভ্রম ঘুচলো—রাধাকে আমার রাধা ব'লে নরাধমের ভ্রম ছিল! কিন্তু এতেও যে একটা বিষম সমস্যায় পড়লেম—তবে কেন নারায়ণের বিশালাক্ষী পুরুষাধম আয়ানের অঙ্কলক্ষ্মী? যদিও অঙ্কলক্ষ্মী কেবল নামে, তথাপি কেন তাও হলো? বল বল প্রাণবল্লভে! সর্ব্বারাধ্যো! বল বল, কমলে, কি ছলে ব্রজমণ্ডলে এ লীলা—এ খেলা? বল বল, কি পুণ্য-বলে পাপ-পূর্ণ পাপিষ্ঠের ভবন ধন্য হ'লো? জ্ঞান দিলে তো পূর্ণ মাত্রায় দেও—অপূর্ণ রেখো না!”^{৪৩}

এইভাবে নাট্যকার রাধা চরিত্রের প্রচলিত কলঙ্ক মুছে ফেলে রাধাকে নিষ্কলঙ্ক করেছেন এবং শারদীয়া পূর্ণিমায় মহারাসের কালপর্বে পৌঁছে গেছেন। আকাশে, বাতাসে, পত্র-পল্লবে, গাছে-গাছে, ফুলে-ফুলে, বাতাসে-বাতাসে, আকাশে-পাতালে, স্বর্গে-মর্ত্তে, যমুনা-পুলিনে সর্বত্র মহারাসের মহা আনন্দ বিরাজ করেছে। রাধা-কৃষ্ণকে কদম্বতলে দাঁড় করিয়ে সখীরা সকলে মিলে উচ্চ স্বরে বলেছেন-

“রাধা কৃষ্ণ কি জয়! রাসেশ্বরী রাসবিহারী কি জয়!”^{৪৪}

এইসময় কৃষ্ণের আনন্দ গীতিতে রাধা প্রেমের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে—

“হৃদয় মন্দিরে রাধা সদা প্রেমেশ্বরী!/ ও তাই, সুধা মাখা রাধা নামে সাধা
মোর বাঁশরী!/ রাধা আমার অঙ্গ আধা, রাধার প্রেমে আছি বাঁধা,/ আমি
সর্বদা—থাকি আমি সর্বদা!/ (আমার রাধা ভিন্ন, নাহি অন্য, রাধাই পরম
ধন!)/ (মীনের বারি যেমন আমার তেমন, রাধাতেই জীবন!)/ (ও সই,
জাগ্রত স্বপনে সদা সাধনের সেই ধন!)/ রাই পদ্মিনী আমি ভৃঙ্গ, রাই
লাবণ্য আমি অঙ্গ,/ তিলেক ছাড়া হলে সঙ্গ, বাঁচেনা জীবন--/ আমার
বাঁচেনা জীবন!/ রাধারূপ বিনে ভুবনে সকল আঁধার হেরি!”^{৪৫}

রাসপর্বের পরমানন্দের মধ্যেই কৃষ্ণের কিছু সময়ের জন্য অদৃশ্য হওয়া নাট্য কাহিনিতে climax এনেছে। রাধাসহ সখীরা কৃষ্ণাশ্বেষণে ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। রাধাকে শান্ত করার জন্য কৃষ্ণ সেজে রাধার কাছে অভিনয় করেছেন তাঁর সখীরা। এই অভিনয়ে কৃষ্ণের বাল্যঘটনার নানা প্রসঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে। যুক্ত হয়েছে পূতনা বধ, কালীয় দমন, ননীচুরির ঘটনাগুলি। এরপরেই কৃষ্ণের উপস্থিতিতে রাস উৎসবের মহানন্দ পুনরায় শুরু হয়। এই মহারাসের ভাবনাতেই এসেছে সমাজ-সাম্যতার কথা। সকলে কৃষ্ণকে সমানভাবে পেতে চাইলে, কৃষ্ণ সকলকে বলেছেন—

“মধুর প্রেমে মত্ত হয়ে সবাই আজ আপন ভুলবে—শত হৃদয়কে আজ
একটি করে তুলবে—“আমিই কৃষ্ণ” এই ভাবটা সবাই আজ ভাববে—
তোমরা যে গোপী, তোমরা যে সখী, তোমরা যে নারী, তোমরা যে
দেহধারী, তোমরা যে পরস্পরে ভিন্ন, তোমরা যে আমা হতে ভিন্ন—
তোমরা যে রাধাশ্যাম হতে ভিন্ন—তোমরা যে প্রেমের মূর্তি ছাড়া অন্য, সে
সব সামান্য ভাব এককালে আজ ভুলে যাবে, তবেই আমাকে পাবে তবেই
সবে কৃষ্ণময় হয়ে নির্মল প্রেমানন্দ—বিমল ব্রহ্মানন্দ উপভোগ ক’বে!”^{৪৬}

কৃষ্ণ নিজে এই রাস উৎসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

“শুধুই সামান্য বিলাস আর সামান্য সুখের অভিলাষ জন্যই এই মহা-রাস
নয়! যাতে ভক্ত ভাবুক মাত্রেই পবিত্র প্রেমোল্লাস আর মনোভিলাষ পূর্ণ
হবে, এস, সেই ভাবে এই মহারাস-বিলাসের অনুষ্ঠান করি! এস, প্রিয়তমে
রাসেশ্বরী রাধে! এস, প্রিয়তমে সখীগণ! এস, এস, সেই অপূর্ব লীলা
করি।”^{৪৭}

রাধা-কৃষ্ণের এই অপূর্ব রাসের আনন্দ সকলের হৃদয়কে প্লাবিত করে। স্বর্গ-মর্ত্যের ভাবনা একাকার হয়ে যায় এখানে- ‘তন্ময় এ মহারাস, সর্ব রস পরিণাম’। এইভাবে নাট্যকার আধ্যাত্মিক ভাবনা ও লৌকিক রসচেতনাকে মিলিয়ে একটি অভিনব বৈষ্ণবীয় ভাব-পরিমণ্ডল রচনা করেছেন। ফলে নাটকটিতে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক কাব্য ও পদাবলীর নাট্য পুনর্নির্মাণ এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার বিনির্মাণ দেখে মুগ্ধ হলাম আমরা।

‘রাসলীলা’ নাটকের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে রাধা-কৃষ্ণের রাস উৎসব। সেই সঙ্গে নানা চরিত্রের বিভিন্ন ভাবনা। কৃষ্ণ-রাধার মধ্যে আধ্যাত্মিকভাব থাকলেও নাটকের কোথাও অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় নেই। কৃষ্ণের বাল্য ঘটনাতে অস্বাভাবিক কাহিনি থাকলেও সেটি এখানে নাট্যরূপে কথিত। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম, গোপীদের কথোপকথন, কৃষ্ণের উপস্থিতি, জটীলা, কুটিলার কার্যকলাপ- সমস্ত কিছুই যথাসম্ভব বাস্তবতায় চিত্রিত। পাশাপাশি আয়ানের মতো মানুষকে আমরা এই নাটকে পেয়েছি। যিনি সংসার মোহে আচ্ছন্ন নন, এমনকি অন্যের কাজে বাধাও দেন না। এখানে কৃষ্ণের জন্যে রাধার চিন্তা ব্যাকুলতা চিরন্তন। প্রেমিকের প্রেম প্রার্থিত এই ব্যাকুলতা আমরা একালের নারীর মধ্যেও দেখি। রাধা-কৃষ্ণের রাস উৎসবে কৃষ্ণের সমানভাবে সখীদের গ্রহণ করা নাট্য ভাবনার একটি অভিনব দিক। এ যেন কৃষ্ণের সাম্যবাদের মূল মন্ত্র প্রচার করা প্রতি জনে জনে। ললিতা, বিসখা, চকিতা, চম্পকলতা, মদনলেখা, চিত্রলেখা, অঞ্জনী, শ্যামা চরিত্রগুলিকে প্রতি কালেই আমরা পাই। তাঁরা এখানে নাটকের পরিমণ্ডল গঠনে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। নাটকটির মূল আকর্ষণ সমাজ ভাষার তীব্র ও তীক্ষ্ণ ব্যবহার। রাধার বিরহ-যাতনার বহিঃপ্রকাশ আমাদের প্রত্যেকের অন্তরকে আঘাত করে। কৃষ্ণবিরহের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে রাধা বলেছেন—

“কৈ কৃষ্ণ কৈ? কৈ সখি কৃষ্ণ কৈ? তোমরা কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক’চ্ছিলে, কৈ আমার কৃষ্ণ কৈ? (ক্রমে উত্থান) কৈ সে হৃদয়-সর্বস্ব পরম নিধি কোথায়? সখী, দেখাও একবার—সেই বঞ্চক কৈ? তোমরা আড়াল ছাড়—দেখি, একবার আঁখি ভ’রে ভাল ক’রে দেখি—যে নিষ্ঠুর নিদয়, অবলা জনের সরল হৃদয় নিয়ে খেলা করে, সেই হৃদয়হীন চিন্তাচোরের বদনখানি এখন কেমন ভাব ধ’রেছে, সর দেখি, ভাল ক’রে দেখি!”^{৪৮}

রাধার এই বেদনা আমাদের অন্তর ছুঁয়ে যায়। জটীলা, কুটীলা ভিন্ন ধরনের চরিত্র হলেও বাস্তবে রক্ত মাংসের মানুষের প্রতিনিধি। কুলবধূ রাধার আচার-আচরণ তাঁদের কাছে

একদম ভালো লাগেনি। রাধাকে তাঁরা কুলের কলঙ্ক বলে মনে করেছেন। ভেকোকে কুটিলা সর্বনাশা রাসযাত্রা সম্পর্ক বলেছেন—

“চল্-এখুনি স্বচক্ষে দেখ্বি কেমন সতী নকী! সেই কেলে ছোঁড়াকে মাঝে নিয়ে সেই সতী নকীর দল আজ্ কি একটা কাণ্ড কারখানা ক’র্বে, তারেই তারা বলে “রাস”—আর আমি বলি সর্বনাশ—আর তুই বলচিস ডাইনের চাতর! ডাইনের চাতরই বটে! উঃ! ঝ্যাঁটা পেটা ক’রে যত ডাইনীর আর সেই ভূতো ছোঁড়ার মুখ থেঁতো ক’রে আ’সতে পারি, তবেই এ দুঃখ ঘুচবে!”^{৪৯}

কুটিলার কথায় প্রতিশোধ-পরায়ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তা নয়, নাটকের সর্বত্র গ্রামীণ চলিত বাংলা ভাষার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। যেমন—‘নোকে’, ‘লেগে’, ‘ষতুর’, ‘গোল্লায়’, ‘ছুঁড়ী’, ‘ঠেঁটা’, ‘কেলে’, ‘ঝ্যাঁটা’ ‘পেটা’, ‘মাগী’ ইত্যাদি অজস্র শব্দ। তৎকালে বিধবা সমাজের উপর সমাজপতিদের নিয়ম-রীতি যে কী কঠোর ছিল, তা বোঝা যায় ‘চুনের’ প্রসঙ্গ উত্থাপনে। আয়ানপুরীর পরিচারিকা জানকী যখন কুঁজি পিসির কাছে ‘চুন’ চেয়েছেন পান খাবার জন্যে, তখন তিনি প্রচণ্ড রেগে গেলেন বিধবা বলে। জানকীকে কুঁজি পিসি বলেছেন—

“ওরে ভাই, যেই ব’লেছি, কুঁজি পিসি, একটু চুণ দেবে গো, অম্লি রেগে উঠে কেঁদে বলে কি ‘আমি বিধবা, আমার ঘরে চুণ! তবে যেন আমি পান খাই—তবে যেন আমি হবিষ্যি করিনে—তবে যেন আমি অসতী—তবে যেন আমি দশ পুরুষকে ঘরে এনে পান খাওয়াই!”^{৫০}

এইভাবে টুকরো টুকরো নানা সামাজিক ঘটনা জনপ্রিয়ভাবে তুলে ধরে বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা-কৃষ্ণের রাসলীলাকে নাট্যকার মনোমোহন বসু আধুনিককালের রূপ দিয়েছেন। ফলে কাহিনি, চরিত্র, ভাষা— সমস্ত দিক দিয়ে নাটকটি পুনর্নির্মিত ও বিনির্মিত হয়ে উঠেছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ - বৃন্দাবন-বিলাস (১৯০৩);

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বৈষ্ণব পদাবলী অবলম্বন করে লিখেছেন ‘বৃন্দাবন-বিলাস’ নামের একটি নাটক। ২২ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১৪ সেন্টিমিটার চওড়া এই গীতি নাটকটিতে প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (১), উৎসর্গপত্র (১),

মুদ্রণপত্র (১), চরিত্রলিপি (১), মূল নাটক (৮৪) সহ মোট ৮৯ টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ—

“বৃন্দাবন-বিলাস/ গীতিনাট্য/ শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ/ এম.এ।”^{৫১}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ—

“বৃন্দাবন-বিলাস/ (গীতিনাট্য)/ [ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত]/ শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ,/ প্রণীত।/ রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ/কলিকাতা/ ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।/ সন ১৩১০ সাল, ২২শে পৌষ/ মূল্য ছয় আনা।”^{৫২}

নাটকের উৎসর্গপত্রে বলে হয়েছে—

‘যাঁহাদের চির-মধুর পদাবলী এই গীতিনাট্যের মেরুদণ্ড,/ যাঁহাদের আরাধ্য ধন ইহার প্রাণ,/ সেই মহাজনদিগের/ পদপ্রান্তে/ ইহা ভক্তিসহকারে/ রক্ষিত হইল’।^{৫৩}

নাটকে উল্লিখিত পুরুষ চরিত্রগুলি হলো— শ্রীকৃষ্ণ, নারদ, নন্দ, আয়ান, সুবল, বলরাম, রাখাল বালকগণ, টহলদারগণ এবং নারী চরিত্রগুলি হলো— শ্রীরাধিকা, যশোদা, জটীলা, বৃন্দা, বিশাখা, ললিতা, সখীগণ ও প্রতিবেশীগণ। নাটকটি প্রকাশিত হয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী থেকে। নাটকটির মূল্য ছয় আনা। নামপত্র থেকে জানা যায় নাটকটি ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল।

‘বৃন্দাবন-বিলাস’ নাটকটি চারটি অঙ্কে রচিত। প্রথম অঙ্কে তিনটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে চারটি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য আছে। নাট্যকার কাহিনি পরিকল্পনায় বৈষ্ণব পদাবলীর অন্তর্গত রাধা-কৃষ্ণের পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মিলন প্রভৃতি পর্বগুলিকে সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন। সেইসঙ্গে প্রতি মুহূর্তে যুক্ত করেছেন তৎকালীন সমাজ শাসনের নানা প্রসঙ্গ। রাধা এখানে আয়ান ঘোষের বিবাহিতা পত্নী। রাধার ঘরে স্বামী ছাড়াও জটীলা ও কুটিলার মতো ননদি ও স্বাশুড়ী আছে। রাধার কাজ-কর্মের জন্য তাঁদের গঞ্জনা ও অশান্তির যথেষ্ট কারণ রয়েছে। জগতে প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বালকরূপে গোকুলে বড়ো হয়ে উঠেছেন, মিলিত হবেন

রাধার সঙ্গে এবং লীলাময় হয়ে উঠবে ধরাধাম। নারদ বৃন্দাবনে সেই যুগলমূর্তি দর্শন করতে চান। রাধার সখী বৃন্দা নারদকে জানান—

“শ্রীমতী যে এখন পরহস্তগত। আপনার ব্রজদুলালের হাতছাড়া। দুঃখে মা নন্দরাণীর কাছে তিনি নাড়ুগোপাল হয়ে আছেন। আর মনের দুঃখে ব্রজগোপীদের ঘরে ঢুকে ভাঁড় ভাঙ্গছেন আর ননী চুরি করেছেন। সে তীর্থ দর্শন বড়ই কঠিন কথা। অম্লরস চান ত ভাঙ্গা দধিভাণ্ডের অন্বেষণ করুন। কটুরস চান ত গোচারণের মাঠে যান। রাখাল বালকেরা পাঁচন বাড়ীর, সাহায্যে আপনাকে পিট ভরে খাইয়ে দেবে। মধুর রস—সেটা আর হচ্ছেনা। সে গুড়ে বালি। রসের কুম্ভটী আয়ানঘোষ দখল করে বসেছেন। ওদিক পানে চাইলে আয়ানের লাঠী।”^{৫৪}

নারদ বৃন্দাকে রাধা-কৃষ্ণের মিলনের জন্য ব্যবস্থা করতে বলেন। তা না হলে সংসারে নব-বৃন্দাবন সৃষ্টি হবে না। নাটকটির মধ্যে কৃষ্ণের শিশু থেকে গোচারণ বালক হয়ে ওঠার মধ্যে বাল্যলীলার একটি পরিচয় রয়েছে, যাতে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। মা যশোদা যে দিন কৃষ্ণকে প্রথম গরু চরাতে মাঠে পাঠিয়েছেন, সেদিন সমাজের নিয়ম মেনে প্রতিটি গোপ মাতার মতোই কৃষ্ণকে আশীর্বাদ এবং দেবতার পূজা অর্চনা করেছেন। এমনকি গোপালকে নানাভাবে সাবধান করে বলেছেন—

“আমার শপথ লাগে, না ছুটো ধেনুর আগে,/ পরাণের পরাণ নীলমণি।/
নিকটে রাখিয়ো ধেনু, পূরিও মোহন বেণু,/ ঘরে ব’সে আমি যেন শুনি।।/
বলাই ধাইবে আগে, আর শিশু বামভাগে,/ শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।/
তুমি তার মাঝে যেও, সঙ্গ ছাড়া না হইও,/ মাঠে বড় রিপুভয় আছে।।/
ক্ষুধা হ’লে চেয়ে যেয়ো, পথপানে চেয়ে ধৈর্যে,/ অতিশয় তৃণাকুর পথে।/
কারো বোলে বড় ধেনু, ফিরাতে না যেয়ো কাণু,/ হাত তুলি দেহ মোর মাথে।।”^{৫৫}

মায়ের এই কথাগুলি আসলে বৈষ্ণব পদকর্তা রাধা মাধবের লিখিত ‘বাৎসল্য’ পর্যায়ের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ পদ, যা পাঠককে বলে দিতে হয় না। পারিবারিক জীবনে বিবাহিতা কুলবধূর নানা সামাজিক বাধা রয়েছে। কারো কারো জীবনে রাধার মতো দজ্জাল শ্বাশুড়ী ও ঝগরুটে ননদিও থাকে। সেই রকম পরিবারের কুলবধূদের অবস্থা আরো কঠিন। রাধা স্বপ্নে কৃষ্ণের শ্যাম বর্ণ দর্শন করেন, অজানা কৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তিনি সখী বৃন্দাকে বলেছেন—

“মনের মরম কথা, তোমারে कहিয়ে হেথা,/ শুন শুন পরাণের সহ।/
স্বপনে দেখিনু যেন, শ্যামল বরণ দেহ,/ তাহা বিনু আর কারও নই।”^{৫৬}

যমুনা থেকে ফেরার সময় একবার রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে দেখা হয়েছিল, তাতেই উভয়ের মধ্যে গভীর প্রেম জন্ম নিয়েছে। তাঁরা একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছেন। বৃন্দা ও ললিতার মধ্যে এ নিয়ে নানা চিন্তার উদয় হয়েছে। ললিতা বৃন্দাকে রাধার ভাবান্তরের কথা বর্ণনা করে বলেছেন—

“আর জিজ্ঞাসা! কাকে জিজ্ঞাসা? আর কি সে রাই/ আছে যে, জিজ্ঞাসা
ক’রলে উত্তর দেবে।/ সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল,/ সম্বরণ নাহি করে।/
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি,/ ভূষণ খসায় পড়ে।।”^{৫৭}

বৃন্দা একথা শুনে বলেন—

“তা হলে ত বড়ই বিপদের কথা ললিতা! গুরুজন শুনলে গঞ্জনার
একশেষ, সমবয়সী পাঁচজন শুনলে কলঙ্ক। কত লোকে কত কথা কইবে
তার কি ঠিক আছে। ললিতা! রাই যে আমাদের আদরের সামগ্রী—রাই যে
আমাদের প্রাণ।”^{৫৮}

ললিতার কথায় বৈষ্ণব পদাবলীর চণ্ডীদাস রচিত রাধার পূর্বরাগের পদটির কথা আমাদের মনে পড়ে। সেখানে কবি বলেছেন—

”রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা

বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে

না শুনে কাহারো কথা।”^{৫৯}

এ যেন তারই ভাষান্তর। অন্যদিকে কৃষ্ণের মধ্যেও রাধাকে দেখার অনুরাগ জন্ম নিয়েছে। কৃষ্ণের প্রিয় সখা সুবল বলেছেন—

“নীরদ নয়নে নবঘন সিঞ্চনে/ আকুলি বিকুলি কেন হও হে।।/ স্বেদ
মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত/ কি নব ভাবে টলে কত ভাব উথলে,/ (যেন)
আসিতে আসিতে কোথা ধাওহে।।/ যমুনার তীরে যেন কি ফেলে এসেছে
সখা/ ঘন ঘন কুল পানে চাওহে।।”^{৬০}

কৃষ্ণ ব্যাকুলতা রাধাকে আত্মহারা করেছে। রাধা সংসার জীবনের পথ হারিয়েছেন। কৃষ্ণের জন্যে পথে নেমেছেন। অভিসার যাত্রার আগে সখীকে অনুরোধ করে রাধা বলেছেন—

“পথই হারিয়েছি। সখী বলে দাও, কোন পথে যাই।- এদিকে শ্যাম, এদিকে কুল, মধ্যে আমি পথ হারা, জ্ঞান হারা, গতিবিহীনা রমণী। সখি, দয়া করে আমাকে পথ বলে দাও।- সখি!”^{৬১}

ঘরের শত বাধা সত্ত্বেও রাধা রওনা দিয়েছেন কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য, যেখানে কৃষ্ণ সংকেতকুঞ্জে রাধার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। রাধা সখী ললিতাকে বলেছেন—

“আমার শ্যাম যে আমার জন্য সংকেতকুঞ্জে প্রতীক্ষা করছেন। --ও ললিতা, কি হবে! কেমন করে শ্যামকে দেখব! অই দেখতে পাচ্ছি—শ্যামসুন্দর কদম্ব কানন কুঞ্জে আমার আশাপথ চেয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখবার জন্য তিনি উদগ্রীব, আমার কথা শোনবার জন্য তিনি আকুল। আমাকে স্পর্শ করবার জন্য প্রতি অঙ্গ তাঁর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কি হবে ললিতা! কেমন করে শ্যামকে সুখী করি।”^{৬২}

এরপর কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার সাক্ষাৎ ঘটে। এটি রাধার আত্ম নিবেদনের পর্ব। রাধা কৃষ্ণকে বলেছেন—

“শ্যামসুন্দর, শরণ আমার,/ শ্যাম শ্যাম সদা সার।/ শ্যাম সে জীবন, শ্যাম প্রাণ ধন,/ শ্যাম সে গলার হার’।।”^{৬৩}

কৃষ্ণও অনুরূপভাবে আত্মহারা হয়ে রাধাকে বলেছেন—

‘গৃহ মাঝে রাধা, কাননেতে রাধা,/ রাধাময় সব দেখি।/ শয়নেতে রাধা, গমনেতে রাধা,/ রাধাময় হলো আঁখি।।’^{৬৪}

পরমুহূর্তে কৃষ্ণকালীরূপে রাধা-কৃষ্ণের মিলন ঘটে। নাটকের প্রতিটি ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে যেমন বৈষ্ণব পদাবলীর ভিন্ন ভিন্ন কবির পদ গ্রহণ করা হয়েছে, তেমনি কাহিনিতেও রাধা-কৃষ্ণের লীলা পর্যায়ে পদাবলীর ভাব আশ্রয় করা হয়েছে। ফলে নাটকটি বৈষ্ণবী ভাবনায় লালিত হয়ে আধুনিক নাটক হয়ে উঠেছে। এককথায় নাটকটিতে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবনার পুনর্নির্মাণ ও বিনির্মাণ ঘটেছে।

‘বৃন্দাবন-বিলাস’ নাটকের চরিত্রগুলি পুরাণকেন্দ্রিক হলেও নাট্যকার তাঁদেরকে সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠা করেছেন। দু’একটি জায়গায় অতি সংক্ষেপে রাধা-কৃষ্ণের

আধ্যাত্মিক মহিমার কথা উল্লিখিত হলেও প্রায় পুরো নাটকে রাধা-কৃষ্ণকে নাট্যকার আমাদের সমাজের অতি পরিচিত নর-নারী করে তুলেছেন। তাঁদের জীবনকথা আমাদের সমাজের প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমকথা। নাটকটির বিশেষ আকর্ষণ জুটিলা-কুটিলার মতো চরিত্রের উপস্থাপনা। তাঁদের চরিত্রের সন্দেহপরায়ণতা, অন্যকে কারণ-অকারণে দোষারোপ করা, সমাজ মানুষের সঙ্গে সংঘাত নাটকটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। রাধার প্রতি কুটিলার সন্দেহ সেকালের সমাজ ভাষার পরিচয় বহন করেছে। রাধাকে কুটিলা বলেছেন—

“তাতো হবেই—অবাক হবারই ত কথা!—/ যে দিন দেখিব, আপন
নয়নে,/ তা সনে কহিতে কথা।/ কেশ ছিঁড়ি বেশ, দূরে তেয়াগিব,/
ভাঙ্গিব বাড়িয়া মাথা।।”^{৬৫}

নারদ কুটিলাকে দেখেছেন অন্য দৃষ্টিতে। কুটিলা পরম কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণভক্তি না করেও কুটিলা কৃষ্ণের সান্নিধ্য পেয়েছেন একাধিকবার। নারদ মনে মনে বলেছেন—

“এরাই আছে ভাল। আর, সকলের চেয়ে আছে ভালো কুটিলা। কৃষ্ণের
উপর ঈর্ষায় সে যেমন দিন নেই ক্ষণ নেই সর্বকাল সমস্ত বস্তু কৃষ্ণময়
দেখছে, কই আমরা ত এতকাল জপতপ করেও তা পারলুম না।- হা
হরি! আপনাকে ধরা দিতে তুমি যে কত প্রকার সাধনার ডোর রচনা
করেছ তা কে বলতে পারে! ব্রজেশ্বরীর কৃষ্ণকলঙ্ক দেখতে আমি বিফল
প্রয়াসে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর কুটিলা ঈর্ষা-পরবশা—আগে হতেই সে
কলঙ্কের ঔজ্জল্য নিরীক্ষণ করছে।”^{৬৬}

বৃন্দাবন বিলাসিনী রাধা সমস্ত বাধা অতিক্রম করে একসময় কৃষ্ণের কাছে আত্ম-নিবেদন করেছেন। রাধা কৃষ্ণকে বলেছেন—

“বঁধু কি আর বলিব আমি।/ ও দুটী চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু
আমি।।”^{৬৭}

এ রাধা বৈষ্ণবীয় রাধা। তাঁর নিবেদন পর্বটি সর্বকালের প্রেমিকা নারীর আত্মনিবেদন। নাটকে আছে কিছু সমাজ প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার, যেগুলি এখনো আমাদের সমাজে নিত্য ব্যবহৃত হয়। যেমন— “বারে বারে পাখি তুমি খেয়ে যাও ধান।/ এই বারে পাখি তোমার বাধিব পরাণ।” এখানে আছে সমাজ প্রচলিত নানা গ্রামীণ ভাষার উপযুক্ত ব্যবহার। যেমন ‘অবাগী’, ‘মরগে’, ‘পাগলী’, ‘ন্যাকা মাগী’, ‘গঞ্জনা’ প্রভৃতি অনেক শব্দ। এইভাবে নাট্যকার ‘বৃন্দাবন-বিলাস’ নাটকটিতে আধুনিক সমাজ বাস্তবতার উপর নির্মাণ

করেছেন বৈষ্ণবীয় ভাবনার আদর্শকে। ফলে নাটকের নায়ক-নায়িকা (রাধা-কৃষ্ণ) হয়ে উঠেছেন মানব-মানবী। এর ফলে নাটকটিতে যেমন পুরাতন সাহিত্যের পুনর্নির্মাণ হয়েছে, তেমনি ভাব, ভাষা ও চরিত্রের আচার-আচরণেও একালের ভাবনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়— মান (১৯১৬);

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে হরিপদ চট্টোপাধ্যায় বৈষ্ণব পদাবলীর অন্তর্গত রাধা-কৃষ্ণের ‘মান’ পর্বকে অবলম্বন করে লিখেছেন ‘মান’ নামের একটি নাটক। ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১৪ সেন্টিমিটার চওড়া এই পৌরাণিক নাটকটিতে প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (১), গ্রন্থ তালিকা (১), মূল নাটক (২২৪) সহ মোট ২২৭ টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ—

“মান/ পৌরাণিক নাটক/ শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।”^{৬৮}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ—

“মান/ (পৌরাণিক নাটক)/ শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত/ মঁথুরানাথ সাহা ও নীলকান্ত দাসের/ যাত্রায় অভিনীত/ (শ্রীভূতনাথ দাস দ্বারা সুরলয়ে গঠিত)/ কলিকাতা;/ ৬৫ নং কলেজ স্ট্রীট,/ ভট্টাচার্য এন্ড সন্ এর পুস্তকালয় হইতে/ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত।”^{৬৯}

নাটকে উল্লিখিত চরিত্রগুলি হল— শ্রীকৃষ্ণ, হরিদাস, জ্ঞানদাস, নারদ, রাখালগণ, বলরাম, নন্দ, উপানন্দ, যশোদা, রোহিনী, আয়ান, জটীলা, কুটীলা, শ্রীদাম, গোপীগণ, বৃন্দা, চান্দরায়ণ, সদানন্দ, ললিতা, বিশাখা, বৃষভানু, মন্ত্রী, অলীক, কুন্দলতা, গুরু, শারি, ইন্দ্র, মহাদেব, ব্রহ্মা, পবন, বরুণ, যম, দুর্লোভা, ভগবতী প্রভৃতি। নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে এবং প্রতি অঙ্কে অনেকগুলি করে গর্ভাঙ্ক রয়েছে। প্রথম অঙ্কে নয়টি গর্ভাঙ্ক আছে, দ্বিতীয় অঙ্কে সাতটি গর্ভাঙ্ক আছে, তৃতীয় অঙ্কে নয়টি গর্ভাঙ্ক আছে, চতুর্থ অঙ্কে আটটি গর্ভাঙ্ক আছে, পঞ্চম অঙ্কে সাতটি গর্ভাঙ্ক আছে। এই বৃহৎ আকারের নাটকটি দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের তত্ত্বাবধানে ভট্টাচার্য্য এন্ড সন্স- এর পুস্তকালয়, ৬৫ নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত। নাটকটির নামপত্র থেকে জানা যায় যে নাটকটি মঁথুরানাথ সাহা ও নীলকান্ত দাসের যাত্রায় অভিনীত হয়েছিল। ভূতনাথ দাস দ্বারা সুরলয়ে নাটকটি গঠিত। প্রকাশের সময় নাটকটির মূল্য ছিল এক টাকা।

বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা-কৃষ্ণের মান-অভিমানের পালাকে কেন্দ্র করে নাট্যকার ‘মান’ নাটকটিতে প্রকাশ করেছেন তৎকালীন সমাজের ভাবনা এবং সামাজিক মানুষের নানা রীতি-নীতি-, কলহ- বিবাদ, আনন্দ-উৎসবকে। কখনো কখনো তিনি মর্ত্যের কাহিনিকে স্বর্গের সঙ্গে যুক্ত করে এক অভিনব ভাবনা আনার চেষ্টা করেছেন। বৈষ্ণব পদসাহিত্যের নানা পদ প্রাসঙ্গিকভাবে ব্যবহার করে ভাগবতের রাধাকৃষ্ণ ভাবনার পরিচয়টি যুক্ত করেছেন। এই তত্ত্বভাবনাকে আলোকপাত করার জন্য জ্ঞানদাস, মহর্ষি নারদ ও হরিদাসের মতো চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের চিন্তা-ভাবনার কথা। ফলে নাটকটিতে একই সঙ্গে রাধা-কৃষ্ণের তাত্ত্বিক, লৌকিক এবং আধ্যাত্মিকভাব যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি বৈষ্ণব ভাবকেন্দ্রিক রাধা-কৃষ্ণের মানভঞ্জন পলাটিও আমাদের সামনে পরিবেশিত হয়েছে। বলাবাহুল্য এই প্রেমভাবনার মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে একালের মানব-মানবীর দুঃখ, জটিলতা, অন্তরের ক্ষোভ এবং মিলন পর্বটি। নাট্যকার হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের ‘মান’ নাটকটি যেন তারই আধুনিক নাট্যরূপায়ণ। নাটকটির সূচনা হয়েছে ভক্তগণের রাধা কৃষ্ণের চরণবন্দনা করেন -

‘জয় জয় রাধাগোবিন্দ চরণার বিন্দ-মকরন্দে মত্ত হও মনোভৃঙ্গ।/ দেখ বিষয়-কেতকী, সে বনে ভ্রম কি, সে বনে ভ্রম, যে বনে ত্রিভঙ্গ।।/ বৃন্দাবন প্রেম-সরোবর তাহে মত্ত প্রফুল্ল অনন্তকোটি পদ্ব, / পদ্বমধ্যে নীলপদ্ব—রাধাপদ্ব ব্রহ্মাণ্ড গাঁথা যার মৃণাল-সঙ্গ।।/ মধুরূপ কৃষ্ণের মধুর মুরতি, বিহরে মধুরূপ বামে শ্রীশ্রীমতী, / রাখ রাখ মতি, সেই মধুর ভাব প্রতি, মনোভৃঙ্গ দিও না ভঙ্গঃ/ গুন গুন স্বরে গাও রাধাশ্যামের গুণ, পাবে সুধা, যাবে ভবের ক্ষুধাগুণ, / ঘটিবে সৎগুণ—ঘুচিবে বিগুণ—নির্গুণ-গুণ-প্রসঙ্গ।।’^{৭০}

এরই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে জ্ঞানদাস এবং হরিদাসের কৃষ্ণ-স্বরূপ অন্বেষণের নানা কথা। জ্ঞানদাস বলেছেন—

“হরিদাস, মিলছে, মিলছে! আমার দর্শন—আমার বেদান্ত—সব তোমার কথায় গিয়ে মিলছে! বল—বল মিলিয়ে নি, মিলিয়ে নি, যতক্ষণ না মিলন হয়, ততক্ষণ শান্তি পাব না! জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু ভক্তির উচ্চতায়— সে অতলান্ত মহাসাগর হ’তেও গভীর! ভক্তি পূর্ণচন্দ্রমা, সে জগতের তমঃ হরণ ক’রে জগতে স্নিগ্ধ কিরণ ছড়িয়ে দেয়! জ্ঞানালোকে সে স্নিগ্ধতা নাই!

বাতাস সব জায়গায় বয়, কিন্তু মলয়-পরিশীলন জলকণবাহী সমীর অতি স্নিগ্ধ, অতি মধুর, অতি মনোমোহকর।”^{৭১}

নাটকটির মধ্যে কৃষ্ণের নন্দালয়ে বড় হয়ে উঠার চিত্র আছে। আছে কৃষ্ণের বাৎসল্য রসের পরিচয়টি। নন্দরাজা কৃষ্ণকে গোপবংশের নিয়ম অনুসারে একসময় গোষ্ঠে পাঠাতে চান, কিন্তু মাতা যশোদা তাঁর একমাত্র পুত্র নয়নের মণিকে কিছুতেই চাড়তে চান না। মা যশোদা বলেন—

“গোপরাজের কথা শোন! পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, মাত্র একটা আমার, কত সাধ্যসাধনের ধন বাছা আমার, কত যুগযুগান্তর মা কাত্যায়নীর পূজার ফলে তবে গোপালের আমার চাঁদবদন দেখতে পেয়ে, সে ছেলেকে কি একটু লেখাপড়া শিখাতে নেই গা ঠাকুরপো!”^{৭২}

সেক্ষেত্রে নন্দরাজা বলেছেন—

“শোন উপানন্দ! গোপাল আমার কি বড় হলে টোল খুলে ব’সবে, না কোথাও চাকরী বাকরী ক’রতে যাবে? আরে মাগি! ও সব লেখাপড়ার কাজ কাদের—বামুনদের, ক্ষত্রিয়দের। গয়লার ছেলের ও সবের দরকারটা কি হবে বল দেখি? মনে মনে মুখে মুখে নয় জোর মনকষাটা, না হয় সেরকষাটা দরকার, তা আবার গোপালকে আমার পাঠশালায় দোব কি? সে যে বুদ্ধিমান ছেলে, তাকে সে সব কিছুই শিখতে হবে না। কি বল উপানন্দ!”^{৭৩}

কৃষ্ণের পিতা-মাতার এই কথোপকথনে উঠে এসেছে তৎকালীন সমাজের জাতধর্ম অনুযায়ী কর্মের প্রসঙ্গটি। সেকালে সমাজে জাত অনুযায়ী কর্ম সুনির্দিষ্ট ছিল- এ যেন তারই পরিচয়। নাটকের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে আয়ান ঘোষের পরিবারের কথা। কেননা আয়ানের বিবাহিতা পত্নীই হলেন রাধা; যিনি কৃষ্ণের প্রেমে অন্ধ ও আত্মহারা। এদিকে রাধার ঘরেই রয়েছে দারুণ শ্বাশুড়ী ও জটিল ননদি। যাঁরা প্রতি মুহূর্তে রাধার সঙ্গে অশান্তি করেন এবং রাধার গতিবিধির উপর সন্দেহ করেন। কিন্তু আয়ান পত্নী রাধাকে ভালোবাসেন। তাই যেদিন তিনি শুনতে পেয়েছেন যে তাঁর বউকে হাটে পাঠিয়ে কুটিলা বাড়িতে বসে আছেন, সেদিন তিনি প্রচণ্ড রেগে যান। কুটিরার উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন -

“আমার মাগ যাবে হাটে দই বেচতে, আর কড়ে রাঁড়ি –একোলষাঁড়ী, বদমাইসীর ধাড়ি, উঁ, কি বলবো ছুঁড়ি ছুটে পালাল, তা না হলে এতক্ষণ গজাগজ কচাকচ টুকরো বিটুকরো করে ফেলতুম!”^{৭৪}

ঘরোয়া জীবনে নারীর প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে আয়ানের প্রতিবাদ যেন সমস্ত ঘরোয়া বিবাদে বউয়ের হয়ে স্বামীর প্রতিবাদ। প্রথমবার কৃষ্ণ রাধা রূপ দর্শন করেছেন, তাতেই তাঁর হৃদয়ে রূপানুরাগ জন্মেছে। বৈষ্ণব পদকর্তা কৃষ্ণের রূপানুরাগ ব্যক্ত করে বলেছেন—

“অপরূপ পেখনু রামা।/ কনকলতা, অবলম্বনে উয়ল, হরিণীহীন হিমধামা।।/ নয়ন-নলিনী দউ, অঞ্জে রঞ্জই ভাঙ বিভঙ্গি বিলাস,/ চকিত চাকোর জোর, বিধি বাঞ্চল, কেবল কাজরপাশ।/ গিরিবর-গুরুয়া, পায়োধর পরশিত, গীম গজমোতি হারা,/ কাম-কম্বু ভরি, কনয়া শম্বু’পরি, ঢরত সুরধুনী-ধারা।/ পরসি প্রয়াগে, জাগয়ত জাগই, সো পাওয়ে বহুভাগী,/ তুহু লাগি কালা গোকুল-নায়ক সো নারী অনুরাগী!”^{৭৫}

রাধার মনেও কৃষ্ণরূপ দর্শনে ব্যাকুলতা তৈরি হয়েছে। বৈষ্ণব পদকর্তা চণ্ডীদাসের সুরে রাধা বলেছেন—

“সই, সই, কে বা শুনাইল শ্যাম-নাম।/ কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,/ আকুল করিল মোর প্রাণ।।/ না জানি কভেক মধু, শ্যামনামে আছে গো,/ বদন ছাড়িতে নাহি পারে।/ জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,/ কেমনে পাইব সই তারে।।/ নাম-পরতাপে যার, ঐছন করিল গো,/ অঙ্গের পরশ কিবা হয়।/ যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো,/ যুবতী ধরম কৈছে রয়।।”^{৭৬}

রাধা সখীদের জানিয়েছেন যে কৃষ্ণের কালোরূপে তাঁর প্রাণ ডুবেছে। তাঁর কুল, মান, সম্মান সমস্ত কিছুই ডুবেছে। কানাই যেন তাঁর জীবনের সর্বস্ব। রাধাবিরহে কৃষ্ণও মাধবীকুঞ্জে অপেক্ষা করেছেন চাতকের মতো। কৃষ্ণ বলেছেন—

“বৃন্দা গেছে আনিবারে প্রিয়ারে আমার,/ বিলম্ব হতেছে কেন আসিতে প্রিয়ার?/ নিকটে আছয়ে কি গো তার গুরুজন,/ তাই কি সখীর এত বিলম্ব কারণ?/ কোথা রাধে, কোথা রাধে প্রাণ-প্রাণেশ্বরী,/ তিলেক বিরহ তব সহিতে না পারি!/ এস চন্দ্রমুখি, এস, সুধা কর দান,/ তোমার সুধার আশে চাতকের প্রাণ!”^{৭৭}

এরপর রাধা-কৃষ্ণের মিলন মুহুর্তে রাধার অন্তরে জেগেছে সামাজিক বাধার প্রসঙ্গটি। রাধা- কৃষ্ণকে জানিয়েছেন যে তিনি অন্যের কুলবধূ। কিন্তু একসময় সমস্ত বাধা অতিক্রম করে রাধা- কৃষ্ণের মধুর মিলন ঘটেছে। কৃষ্ণের মনে রাধার সামাজিক বাধা কোনো জায়গা পায়নি। কারণ কৃষ্ণ জানেন শ্রীমতী রাধা তাঁরই হ্লাদিনী শক্তির অংশ—

“আমার এই রাধাই যে সেই গোলকের রাধা! আমি নিত্য পুরুষ, যেমন সেই নিত্য গোলকের নিত্য হরি, তেমনি এই শ্রীমতী শ্রীরাধাই সেই নিত্য গোলকের নিত্য হ্লাদিনীময়ী শ্রীরাধা!”^{৭৮}

এইভাবে রাধা-কৃষ্ণের লৌকিক প্রেম-গাথাতে উঠে এসেছে আধ্যাত্মিক রাধা-কৃষ্ণের ভাবনা। সেকালের সমাজ জীবনে বিনোদনের একটি প্রধান দিক ছিল পাশাখেলা। অবিবাহিত বা বিবাহিত নারী-পুরুষ দলবেঁধে পাশা খেলায় অংশ নিতেন এবং তাতে হার-জিতের নানা পণ যুক্ত থাকতো। কৃষ্ণ-রাধাও সেই পাশা খেলায় অংশ নিয়েছেন। সেখানে রাধার কাছে কৃষ্ণ হার মেনেছেন। এই সুযোগে রাধা কৃষ্ণের বাঁশি জিতে নিয়েছেন। সেকালের সমাজে নারী নির্যাতন একটি বহু প্রচলিত ধারণা ছিল। রাধার উপর শ্বাশুড়ি ও ননদির নির্যাতন যেন তারই প্রতীকীভাবনা। রাধার পিতা বৃষভানু নন্দরাজাকে এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

“শুনলে ত ভাই নন্দ, রাধার আমার অবস্থার কথা শুনলে ত? প্রথরা কুটিলার অত্যাচার বাছা আমার পেটপুরে খেতে পর্য্যন্ত পায় না। মহিষী এ কথা শুনলে কি আর রক্ষা রাখবেন? রাধার অদৃষ্ট নয় ভায়া, আমারই অদৃষ্ট! একটা মেয়ে নিয়ে ভগবান আমায় সুখী হতে দিলেন না!”^{৭৯}

বৃষভানুর কথাতে একই সঙ্গে পিতৃহৃদয়ের সন্তান বাৎসল্য ও অসহায়তা প্রকাশ পেয়েছে। সেকালের সমাজে নিয়ম লঙ্ঘনকারী পরিবারের একমাত্র সাজা ছিল একঘরে করে রাখা। আয়ানের পরিবারের ক্ষেত্রেও রাধার জন্য এই নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু প্রমাণ না পাওয়ায়, তা বলবৎ হয় নি। রাধা স্বামী-পরিবারের এই লাঞ্ছনা আর সহ্য করতে পারছেন না। তাই কৃষ্ণের কাছে রাধা সেই হৃদয়-যাতনার কথা ব্যক্ত করে বলেছেন—

“তাল বন্ধু ভাল কালে আইলে।/ মরিত অভাগী রাধা তোমার বিচ্ছেদে নইলে।।/ বধূ আর ত নারী হে সৈতে শ্বাশুড়ী-ননদী-গঞ্জনা,/ তাহার উপরে নিরদয় স্বামী করয়ে নিতুই লাঞ্ছনা পাষণ যাই ত ফেটে এ হেন যাতনা সইলে।।”^{৮০}

নাটকের পঞ্চম অঙ্কে কৃষ্ণের প্রতি রাধার মান-অভিমানের চিত্র আমরা পাই। নিকুঞ্জবনে রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে রাত্রি যাপনের ইচ্ছায় সখীদের সঙ্গে অপেক্ষা করে আছেন, কিন্তু সারারাত্রে কৃষ্ণের দেখা মেলে না। রাধার অন্তর বেদনায় ব্যাকুল হয়ে উঠে। চন্দ্রাবলীর সঙ্গে রাত কাটিয়ে কৃষ্ণ যখন শেষ রাতে রাধার কাছে আসেন, তখন রাধার মনে কৃষ্ণের প্রতি অভিমান জন্মায়। রাধা কৃষ্ণকে অভিযোগের সুরে বলেছেন—

“বটে, নটবর! এই তোমার ভালোবাসা? তুমি যে আমার পর হবে—এ যে কখ স্বপ্নেও ভাবি না নাথ! হায়, তুমি আমার অকূলের কাণ্ডারী হয়ে আমায় অকূলে ভাসালে?”^{৮১}

কৃষ্ণকে রাধা কপট, শঠ, লম্পট বলে অভিযোগ করে তাড়িয়ে দেন। এতে কৃষ্ণের মনে আঘাত লাগে। রাধার আঘাতে কৃষ্ণ যোগীবেশ ধারণ করে পথে পথে ঘুরে বেড়ান। একথা রাধা সখী বৃন্দার কাছ থেকে জানতে পেরে আর মান করে থাকতে পারেন না। রাধা কৃষ্ণের কাছে গিয়ে বলেছেন—

“রাধার হৃদয়াশ্রমের যোগীশ্বর! যোগীবর! তুমি যে রাধার সর্বস্বয় সর্বস্ব! তোমায় আমার অদেয় কি নাথ! আমার দুর্জয় মান—তোমার শ্রীপদে দক্ষিণাস্বরূপ দান ক’রলুম, এখন অবলা অধীনা বলে শ্রীচরণে স্থান দাও।”^{৮২}

প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ রাধার হাত ধরে বলেছেন—

“ক্ষমা কর রাধে! এবার এ যোগীকে তোমার মান ভিক্ষা দাও, তোমার নিকট মান ভিক্ষার জন্যই আমার এই যোগিবেশ ধারণ।”^{৮৩}

সেই সময় রাখাল বালকেরা রাধা-কৃষ্ণের মান-ভঞ্নের গান শুরু করেন -

“বিনোদ বেশে বিনোদ কানু—এই যে রে ভাই এই হেথায়,/ আয় আয় রে—আমাদের ভাই কানু/ আজ রাই নিয়ে—যুগল হয়ে দাঁড়িয়েছে,/ নয়ন সফল যদি করবি কেউ ভাই রে/ ও ভাই কানু, তুই এলি কেন, যে রাই তোরে পাগল করেছিল রে,/ রাইএর মানই কি বড় হল আমাদের ভাই কানাইকে/ মান ভিক্ষা করতে হল!”^{৮৪}

রাধা-কৃষ্ণের এই মান-ভঞ্জন পালা আমাদের প্রতিটি বাঙালি ঘরের পতি-পত্নীর দাম্পত্য কলহ ও মিলনের বাস্তব চিত্র। নাটকটিতে যতটা আধ্যাত্মিক মহিমার কথা বলা হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী সামাজিক ও পারিবারিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তেমনি ‘মান’

নাটকটিতে সমাজ কথার অন্তরালে বৈষ্ণবীয় ভাবনার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। এইভাবে নাট্যকার ‘মান’ নাটকটিকে পুনর্নির্মাণ করেছেন।

বৈষ্ণবীয় ভাবনাকে পাঠক ও দর্শকের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য নাট্যকার ‘মান’ নাটকের চরিত্রগুলিকে সামাজিক করে তুলেছেন, তেমনি তিনি ভাষা ব্যবহারের প্রতিও সচেতন ছিলেন। রাধা-কৃষ্ণের মতো প্রেমিক-প্রেমিকা, জটিলা-কুটিলার মতো শ্বাশুড়ী-ননদি চরিত্র অঙ্কন করে তিনি সেকালের প্রমিক-প্রমিকা ও শ্বাশুড়ী-ননদি চরিত্রের স্বরূপটি স্পষ্ট করেছেন। বৃষভানুর মতো ব্যথিত পিতা, যশোদার মতো স্নেহময়ী মাতা, বৃন্দার মতো প্রাণপ্রিয় সখী, বলরামের মতো দাদা, আয়ানের মতো স্বামী, হরিদাস, জ্ঞানদাস এর মতো তাত্ত্বিক চরিত্রগুলি আমাদের সমাজের অতি পরিচিত চরিত্র। নাট্যকার অতি কৌশলে বৈষ্ণব ধর্মীয় তত্ত্বকথাকে এই নাটকে ব্যাখ্যা করেছেন ভক্তের কথা-বার্তাতে। হরিদাস কৃষ্ণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে—

“কাম ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য, সৌহার্দ, এই কয়টির যে কোনটি দ্বারা যিনি সর্বদোষহারী শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় নিবিষ্ট থাকেন, তিনিই তন্ময়তা প্রাপ্ত হন। যেমন শিশুপাল প্রভৃতি বিষ্ণুদেবী দুরাচারগণ ক্রোধেও ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছিল পাণ্ডবগণ স্নেহে জগৎবল্লভকে অমনি পাওয়া দূরে থাক, রথের সারথী পর্যন্ত করে ছেড়ে দিলেন আত্মরামগণ ঐক্যে, কৌশিকাদি সৌহার্দে, দুবৃত্তাদি ভয়েও ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছেন। তেমনি কামভাবে গোপীগণও পরমারাধ্য ধন কৃষ্ণধনকে প্রাপ্ত হবেন ভাই! হরি বল মন—হরি বল।”^{৮৫}

হরিদাসের কথায় একজন সাধারণ ভক্তের ভক্তিতে কৃষ্ণের আত্মস্বরূপের পরিচয়টি যেন দর্শকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে রাধার সখী বৃন্দার সঙ্গে কুটিলার ঝগড়া সেকালের নিত্য দিনের ঘটনা। কুটিলা ঝগড়া করে বলেছেন—

“ভালো হল নি! কুটনী মাগি, তুই ত দাদাকে আমার গুণ করেছিস! বুড়ো কালটী, অধঃপতি বরাখুরি, চিরণদাতি, বাজারে নাম ডাকান বেবুশ্যে—হাঁ লা যত কিছু বলব না মনে করি, তত তুই বেড়েছিস, দাদাকে হাত করেছিস, আমাদের ঘর তুই মজাবি! মজাতে দোব, দাদার ভয় কি আমি রাখি? ওরে আমার দাদা রে, কুটিলার ভাতার ঢের করলে, তা আবার মায়ের পেটের ভাই ঢের করবে! দেখ বৌ, বলি শোন, যদি ভাল চাস, তা হলে আর ঢলানটা ঢলাসনে। তা হলে কেশ ছিঁড়ে, বেশ খুলে, শেষ মাথা

ভেঙে বাড়ী থেকে তাড়াব, তখন বুঝবি, কুটিলা বড় যে সে মেয়ে মানুষ নয়। এত বড় স্পর্ধা মেয়েমানুষের! বুকে বসে উনি মুখে কালি মাখাবেন, তবু কিছু বলতে পারব না! বাবা, আমায় এমন বাপে জন্ম দেয় নি!”^{৮৬}

রাধাকে ও তাঁর সখীকে যেভাবে কুটিলা আক্রমণ করেছেন, তাতে সমাজ ভাষার জীবন্ত পরিচয় ফুটে উঠেছে। আবার কৃষ্ণ যখন নানা রকম ছলনা ও সাজ করে রাধার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তখন তাঁর সেই সাজ দেখে আমাদের মনে পরে যায় বহুরূপী পেশার কথা। সেকালে যে বহুরূপী পেশা ছিল, এ যেন তারই প্রমাণ। কৃষ্ণ কখনো নাপিতিনি সেজে রাধার পা কামিয়ে দিয়েছেন, কলাবতী বউ সেজে রাধার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। রাধাও নানা ছলে সমাজ সংসারের সমস্ত ভয় অতিক্রম করে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। এই ঘটনাগুলি সমাজের নর-নারীর প্রেম ও তাঁদের মিলন ভাবনার সঙ্গে যুক্ত। এই নাটকে আমরা পাই আয়ানের মতো মানুষকে। যিনি বিচার-বুদ্ধি, যুক্তির চেয়ে নিজের অহংকারকে বড়ো বলে মনে করেছেন। পত্নীকে ভালোবাসলেও আয়ান ঘোষ কখনো কখনো মা-বোনের কথায় প্রভাবিত হয়েছেন। পত্নী রাধাকে সন্দেহ করেছেন। তাঁর কথাতে রয়েছে হিন্দী ভাষার প্রত্যক্ষ প্রভাব। কুটিলার উপর রেগে গিয়ে আয়ান বলেছেন—

“পোড়ারমুখী কঁড়ে রাঁড়ি, তুই এখন ঘরে বসে? মজা দেখছিস, মজা পেয়েছিস? একজনের সর্বনাশ, আর তোর পৌষ মাস? বেরও হতচ্ছাড়ী, বকেয়া ধূমশী; জানতা নেই, হাম আয়ান ঘোষ হ্যায়! (মারিতে উদ্যত হইল)।”^{৮৭}

এছাড়াও নাটকটিতে আছে সমাজ প্রচলিত কিছু প্রবাদের ব্যবহার। যেমন—‘একজনের সর্বনাশ, আর তোর পৌষ মাস’, ‘যেটা রটে, তার কিছু না কিছু ঘটে’, ‘আজ মলে কাল দুদিন’, ‘যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়’, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর আছে অজস্র গ্রাম্য ভাষা ও মেয়েলী শব্দের ব্যবহার। যেমন—‘মাগি’, ‘ধাড়ি’, ‘মিনসে’, ‘সোহাগ’, ‘গতর খাগী’, ‘ভাতার’, ‘ঢং’, ‘ইষ্টীলা’, ‘ঝাঁটা’, ‘হতচ্ছাড়ী’, ‘রাড়ি’ ইত্যাদি। এছাড়াও রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করে বিরহের ভাষা, মিলনের ভাষা। বৈষ্ণবভক্ত হরিদাস ও জ্ঞানদাসের কথায় বৈষ্ণব তত্ত্ব-দর্শনের নানা ভাব-ভাবনাও প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি শিব, ভগবতী, নারদের মতো দেব-দেবী চরিত্রগুলির উল্লেখ এবং তাঁদের কথোপকথন ও ভূমিকাদান নাট্য-পরিমণ্ডলে বৈচিত্র্য এনেছে। সব মিলিয়ে ‘মান’ নাটকটি একালের প্রেক্ষাপটে বৈষ্ণবভাবনায় জারিত হয়ে পুনর্নির্মিত নাট্য আখ্যান হয়ে উঠেছে।

ভুবনকৃষ্ণ মিত্র— নিকুঞ্জবিহার (১৯২৫);

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ভুবনকৃষ্ণ মিত্র বৈষ্ণব পদাবলী অবলম্বন করে রচনা করেছেন ‘নিকুঞ্জবিহার’ বা ‘গোপিনীলীলা’ নামে একটি নাট্য-গীতিকা। ২৩ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১৩.৫ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটিতে প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (১), উৎসর্গ পত্র (১), উপসংহার পত্র (১), একটি কথা অংশ (১), নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ (১), মূল নাটক (৩৩) সহ মোট ৩৬টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকটির প্রচ্ছদপত্র এইরূপ—

“নিকুঞ্জবিহার বা গোপিনীলীলা/ ভুবনকৃষ্ণ মিত্র”^{৮৮}

নাটকের উৎসর্গপত্রে বলা হয়েছে—

“পরমপূজনীয় সুবিজ্ঞবর, হিন্দুকুলচূড়ামণি;/ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা
প্যারীমোহনমুখোপাধ্যায় সি, এস, আই মহাশয়/ শ্রীচরণ
কমলেশু/প্রণামা শতসহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষ।/ রাজন/ দুর্লভ
হিন্দুর কুলে জন্মেছি যখন।/ এবে হিন্দুকুল রীতি প্রভু করিয়া
স্মরণ।।/ যোগ্যপাত্রে দান আছে শাস্ত্রেতে বিধান।/ সৎপাত্রে
উৎসর্গ রীতি আছে হে প্রমাণ।।/ আধুনা সৎপাত্র আর কে আছে
এমন?/ কারে বা অর্পিব মম যতনের ধন।।/ সুপন্ডিত, শাস্ত্রবিৎ,
হিন্দ্র ভূষণ।/ মানসে বিচারি প্রভু! তেঁই সে এখন।।/ উৎসর্গ
করিয়া গ্রন্থ তোমার চরণে।// শুভদিনে, শুভলগ্নে, অর্পিণু
এক্ষণে।।/ পূতস্নেহ পুরস্কার আছে কি সংসারে?/ দিতে পারি
সমাদরে স্নেহময় করে।।/ তবে যে দিতেছি আজি সাদরে
তোমারে।/ সে কেবল দাসব্রত দেখাবার তরে।।/ জন্মিয়া
কায়স্থকুলে, বিধির কল্যাণে।/ দাস ব্রতে চিরবদ্ধ (জানি) বিপ্রে
সদনে।।/ তেঁই সে আনন্দে আজি প্রভুর গোচরে।/ বিনম্রে মিনতি
করি লইতে সাদরে।।/ ভুবন সাধন ধন, রেখো সযতনে।/
ভুলোনা, ভুলোনা দেব! অকৃতী ভুবনে।।/ কৃপাদৃষ্টি ইথে প্রভু! কর
একবার।/ ধর দেব! উপহার “নিকুঞ্জ-বিহার”।।/ নিতান্তানুগত
সিমুলিয়া মিত্র-ভবন /শ্রীভুবন কৃষ্ণ মিত্র দাসস্য।”^{৮৯}

উপহারপত্রে নাট্যকার বলেছেন—

‘পরম পূজনীয়/ কবিবর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় / শ্রী চরণ
কমলেশু।/ প্রণামা শতসহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষ—/ মহাশয়! অদ্য

শুভদিনে,--শুভলগ্নে আপনার পবিত্র করে আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ
“নিকুঞ্জবিহার”খানি সাদরে উপহার প্রদত্ত করা হইল। আশা করি মহাশয়
আপনার অবকাশ মতে ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমার সকল
পরিশ্রম সফল করিবেন। এ জগতে আপনিই আমার প্রথম উৎসাহ দাতা।
আপনার ঋণ আমি জন্মেও ভুলিব না। ইহা শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।/
নিতান্তানুগত/ শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র দাসস্য।”^{৯০}

‘নাটকের কথা’ অংশে নাট্যকার জানিয়েছেন—

“বহু ভদ্রজন ও বান্ধববর্গের উৎসাহ অদ্য জনসমাজে ‘নিকুঞ্জ-বিহার’
গীতি-নাট্যখানি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। এখানি কৃষ্ণ বিষয়ক গীতি-
নাট্য, সুতরাং আদি রসের ছড়াছড়ি আছে। প্রেমরসে প্রেম ভাব না
থাকিলে চলেনা কাজে কাজেই কিছু বেয়াদপি হইয়াছে, পাঠক মহোদয়গণ
অনুগ্রহ করিয়া সে দোষটি নিজগুণে ক্ষমা করিলে, ও যত্নে পাঠ করিলে
শ্রম সফল জ্ঞান করিব। এই পুস্তকের গীতগুলির সুর তাল দিলাম না
কেবল নম্বরানুযায়ী রাখা গেল তাহার কারণ এই যে থিয়েটারের
অভিনেতাগণ রঙ্গমঞ্চে আপনারা নিজ নিজ সুরলয়ে অভিনয় করিয়া
থাকেন; তাঁহাদের সুবিধার জন্য ও আধুনিক নিয়ম অনুসারে আমাকেও
সেই নিয়মে বাধ্য হইতে হইল। নিবেদন ইতি।”^{৯১}

নাটকে উল্লিখিত চরিত্রগুলির মধ্যে একমাত্র পুরুষ চরিত্র হলেন শ্রীকৃষ্ণ। নারী
চরিত্রগুলির মধ্যে আছেন শ্রীরাধা, চন্দ্রবলী, বৃন্দা, ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতা, চিত্ররেখা,
চন্দ্রপ্রভা, মধুমঞ্জরী, মণিমালিকা, চপলা, চঞ্চলা প্রমুখ। একটি অঙ্ক এবং চারটি গর্ভাঙ্কের
সমন্বয়ে নাটকের কাহিনি রচিত হয়েছে। প্রথম দৃশ্যে আছে বৃন্দাবনের রাধাকুঞ্জ সন্নিকটে
বকুলাকুঞ্জ; দ্বিতীয় দৃশ্যে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ, তৃতীয় দৃশ্যে যমুনাতীরে রাধাকুঞ্জ; চতুর্থ দৃশ্যে
কেলীকুঞ্জ।

বৈষ্ণব পদাবলীর চিরপরিচিত রাধা-কৃষ্ণের বিরহ ও মিলন পর্বের পরিচয়
নিয়ে ‘নিকুঞ্জবিহার’ বা ‘গোপিনীলীলা’ নাটকটি রচিত হয়েছে। নাটকের শুরুতে
কৃষ্ণবিরহের আক্ষেপোক্তি শোনা যায় রাধার কণ্ঠে। অন্যদিকে কৃষ্ণ রাধাকে রাধাকুঞ্জে
দেখতে না পেয়ে ব্যকুলভাবে বলেছেন—

“আহা! বসন্ত আগমনে আজ নিকুঞ্জ- কাননের কি মনোমোহন শোভাই
হ’ইয়েছে। যে দিকে দৃষ্টি করি সেই দিকেই নয়নানন্দকর প্রকৃতির

শোভাই দেখতে পাই। এ দিকে সুগন্ধ কুসুম-ভারে বনলতা কি রমণীয়া
শ্রীই ধারণ ক’রেছে; অন্য দিকে সুনাদী বিহঙ্গকুল মধুর স্বরে প্রাণ আকুল
কচ্ছে। কোকিলের “কুহু কুহু” রবে আজ আমার প্রাণের ভিতর, আর
আমার প্রাণের প্রাণের ভিতর মদনান্নি যেন “হু হু” করে জ্বলছে! যাক্,
আর এখন বিষাদ হৃদয়ে সে প্রেমের ভাবনা ভাবলে কি হবে? কেবল
অন্তর্দাহ বৈত নয়!”^{৯২}

কৃষ্ণের এই আক্ষেপোক্তিতে একই সঙ্গে প্রকৃতিপ্রীতি এবং রাধাপ্রীতির পরিচয় ফুটে
উঠেছে। রাধার জন্য কৃষ্ণের এই রকম বিরহ যন্ত্রণা বৈষ্ণব পদাবলীতে খুব বেশি দেখা
যায় না। অন্যদিকে সখীদের সঙ্গে নিয়ে রাধা বৃন্দাবনের বকুলকুঞ্জে উপস্থিত হয়েছেন
কৃষ্ণের দর্শন ও মিলনের প্রত্যাশায়। কিন্তু কৃষ্ণের দেখা না পেয়ে তাঁর অন্তরে বেদনা
জন্ম নিয়েছে। কৃষ্ণের বাঁশির সুর রাধার অন্তরকে প্লাবিত করেছে। সখীদের অনুসরণ
করে রাধা বলেছেন-

‘সখি! কুঞ্জে এলে, ডাকে বাঁশী রাধাবোলে।/ কে জানে কে বাজায় বাঁশী,
এই বকুলের তলে।।/ চল সখি খুঁজি তারে,/ ধরি চল মনচোরে,/ পাই
যদি আনি ধরে, বাঁধি রাখি প্রেম-শিকলে।/ “রাধা”, “রাধা” বোলে বাঁশী,
একুল যে মম মজালে’।। ‘মনচোর’ কৃষ্ণ রাধাকে দর্শন না দিলে রাধার
অন্তরে মিলনের জন্য ব্যাকুলতা বিরহের রূপ নেয়। রাধিকা বলেন—
‘সখিরে! এনে দেও মম শ্যামধনে।/ দহিছে অন্তর মম, শ্যামেরি বিহনে।।/
জ্বলে প্রাণ যাতনায়,/ জ্বলুক কি ক্ষতি তায়;/ সহেনা যাতনা হয়! মরি
তার আদর্শনে।।’^{৯৩}

কিন্তু পরবর্তীসময় কৃষ্ণের দর্শন ও সাক্ষাতে রাধার অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
তার পরেই কৃষ্ণের প্রতি তাঁর অভিমান জন্মেছে। এখানে আমরা বৈষ্ণব পদাবলীর মান
ও কলহান্তরিতা রাধার পরিচয় পাই। শ্রীকৃষ্ণ রাধার মান-ভঞ্নের জন্য বলেছেন—

“বদন তোলো রাই কিশোরী।/ এই এলো তোমার বংশীধারী/
দেও প্রিয়ে প্রেম চুম্বন,/ খুল এবে মুখবসন; /এস করি আলিঙ্গন,
হেথা হে নির্জনে।।’^{৯৪}

কিন্তু রাধা কৃষ্ণকে বাধা দিয়ে বলেন—‘ছুঁওনা, ছুঁওনা, ছুঁওনা কালা।/ আমি যে গোপের
কুলবালা’।। রাধার কথায় উঠে এসেছে সেকালের কঠোর সমাজ ব্যবস্থার কথা।
একদিকে তিনি বৃন্দাবনের ‘কুলবালা’, অন্যদিকে পরকীয়া রমণী। এই সম্পর্কের বাধা

থাকা সত্ত্বেও রাধা সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে কৃষ্ণপ্রেমের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছেন। একসময় কৃষ্ণের প্রেমকে ‘ছলা কলা’ বলে রাধা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এমনকি কৃষ্ণকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এইসময় কৃষ্ণকে রাধা বলেছেন—

‘পুরুষ কি কঠিন, তারে কিসে বল সাঁপি প্রাণ।/ একেত অবলা মোরা,
নাজানি রাখিতে মান।।/ পদে ধরি কভু সাধ, কভু ধর অপরাধ;/ বিচ্ছেদ
অনলে মলে, বল, কে করিবে পরিত্রাণ।/ তাই বলি ওহে শ্যাম, আশা
তাজি যাও নিজ স্থান।’^{৯৫}

কৃষ্ণ রাধাপ্রেমে প্রত্যাখ্যাত ও হতাশ হয়ে কুঞ্জবন থেকে ফিরে যেতে উদ্যত হলে, রাধার সখীরা তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে এনেছেন এবং রাধার সঙ্গে মিলিত করিয়েছেন। এইসময় সখীরা পুষ্পচয়ন করে রাধা-কৃষ্ণকে নিবেদন করেন এবং গান গাইতে থাকেন—

‘চাঁদে চাঁদে আজ মিলেছে ভালো।/ ও সই! রাধার রূপে হ’ল ভুবন
আলো।।/ বামে রাই গোরাচাঁদ, দক্ষিণে মোদের শ্যামচাঁদ;/ চাঁদের হাট
বসলো কিবা! এসে দেখলো।।/ রবি শশী একাধারে, ধারায় কি শোভা
ধরে;/ মোহিল মোদের মন, হের রাধাশ্যামে মিলিলো।।’^{৯৬}

নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখানো হয়েছে চন্দ্রাবলীকে। তিনি এই নাটকের দ্বিতীয় নায়িকা। তিনি কৃষ্ণ প্রেমে আত্মহারা এক গোপবালিকা। কৃষ্ণপ্রেমের জন্য চন্দ্রাবলী রাধার মতোই বিরহ-বেদনায় ব্যাকুল হয়ে আছেন। চন্দ্রাবলী তাঁর সখীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন—

‘বৃথা এ জীবন বৃথা কুঞ্জবন, বৃথা মমরূপ সই!/ গোপিনীমোহন কুঞ্জের
ভূষণ, আমার এ কুঞ্জে কই?/ এখন প্রাণান্ত হলে আমি বড় সুখী।
হই।’^{৯৭}

চন্দ্রাবলীর সখী চপলা ও চঞ্চলা তাঁকে সাহুনা দিয়েছেন। রাধার ভালোবাসার প্রতি চন্দ্রাবলীর ঈর্ষা আছে। সখীসহ চন্দ্রাবলী রাধাকুঞ্জে রাখাল বালকের বেশে কৃষ্ণ অন্বেষণে গিয়েছেন। কিন্তু কৃষ্ণের খোঁজ না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছেন। ওদিকে সখী বৃন্দা রাধাকে কৃষ্ণের সন্ন্যাসী হওয়ার খবর এনে দিয়েছেন। রাধাবিরহে কৃষ্ণ সন্ন্যাসব্রত নিয়ে ব্রজের পথে পথে ঘুরে বেরাচ্ছেন। বৃন্দা রাধাকে বলেছেন—

‘আজ তোমার অভাবে শ্যামের যে কি শোচনীয় অবস্থা ঘটেছে, তাত তুমি
দেখতে পাচ্চ না। সে এখন সংসার ত্যাগ করে বনে বনে কুঞ্জে কুঞ্জে

সন্ধ্যাসীবেশ ধরে, কেঁদে কেঁদে ‘রাধে,’ ‘রাধে,’ করে বেড়াচ্ছে, আর তুমি হেথায় রত্নসিংহাসনে বসে মজা কচ্ছে? ধিক্ তোমায়, ধিক্ তোমার হেন প্রেম, আর ততোধিক্ আমাদের এই ছার জীবনে! আমরাও কিনা আজ শ্যামের এ দুর্দশা বসে বসে দেখছি! আজ শ্যামের দুর্দশা দেখলে কঠিন পাষণ্ড পর্যন্ত কাঁদছে। একবার দেখ তার দুর্দশা কি হ’য়েছে।।”^{৯৮}

রাধা কৃষ্ণের এই রকম অবস্থার কথা শুনে মনে মনে কষ্ট পান; নিজেকে ধিক্কার দেন। তাঁর প্রেমের জন্যেই কৃষ্ণের এই অবস্থা, সেকথা মেনে নেন। কৃষ্ণের সাক্ষাতে রাধা বলেন—

“যোগীবেশ ত্যজ কালা ধরি তব পায়।/ ও বেশ হেরিলে প্রাণে, বড় জ্বালা দেয়।।/ ত্যজ ত্যজ ও ভূষণ, ধরি তব শ্রীচর;/ কর দোষ মার্জন, রাখ রাঙ্গা পায়।।/ মিনতি আমার রাখ, কস্তুর চন্দন মাখ;/ বিভূতি ভূষণ ত্যজে, লও এ রাধায়।।”^{৯৯}

এরপর রাধা কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ জানান এবং নিজের হাতে কৃষ্ণকে সাজিয়ে দেন; রাধাকৃষ্ণে কৃষ্ণ-রাধার মিলন হয়। নাট্যকাহিনির আধ্যাত্মিক ভাব-পরিমণ্ডলটি উন্মোচিত হয়েছে চন্দ্রাবলীর সঙ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ ও কথোপকথনে। চন্দ্রাবলী কৃষ্ণের উপর অভিমান করেন, কৃষ্ণ তখন চন্দ্রাবলী ও সখীদের ‘শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ মূর্তি’ দর্শন করান। তখন কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের সকল অভিমান দূর হয়। চন্দ্রাবলী কৃষ্ণকে বলেন—

“হরি যে সাক্ষাৎ ভগবান তা এখন বেশ বুঝতে পাচ্লেম। এখন আমার ভ্রমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কত্তে হবে। (প্রকাশ্যে) দয়াময় হরি! তোমার লীলা অনন্ত। তোমার শ্রীচরণে এ দাসীর শতকোটি নমস্কার! কিন্তু হরি! শেষ তোমার নিকট আমার এই প্রার্থনা, যেমন তুমি আমাদের পরস্পরের মনোবিবাদ ও ভ্রম ভঞ্জন করলে, আবার অন্তিমে তেমনি যেন তোমার ঐ শ্রীরূপ সজ্জানে দেখে মরি; আর মৃত্যুর পর যেন পরলোকে চিরকাল ও রাঙ্গাপদের সেবাদাসী হ’য়ে আজীবন সুখ ভোগ করি। আর যেন সংসারে এসে অনন্ত যাতনা ও এমন ক’রে বিরহ যাতনা ভোগ কত্তে না হয়। হরি! দাসীর সকল দোষ ক্ষমা কর।”^{১০০}

এরপর কৃষ্ণের কথা মতো রাধা ও চন্দ্রাবলীর মিলন হয়। তাঁদের মধ্যে বিদ্রোহ দূরীভূত হয় এবং সখ্যতা ঘটে। নাট্য পরিণতিতে বসন্ত উৎসব ও দোল খেলার চিত্র রয়েছে। রাধা, কৃষ্ণ, চন্দ্রাবলী, সখীগণ, গোপবালক- সকলে মিলে রঙের উৎসবে মেতে ওঠেন।

এইভাবে নাট্যকার ‘নিকুঞ্জবিহার’ নাটকে ‘বৈষ্ণব পদাবলীর’ চিরন্তন ভাবনাকে আমাদের সমাজের নর-নারীর ভাবনায় রূপান্তরিত করে নাট্যকাহিনির পুনর্নির্মাণ করেছেন। ফলে রাধা-কৃষ্ণের ভাবনা আধুনিকরূপ পেয়েছে।

‘নিকুঞ্জবিহার’ নাটকে একটি ত্রিভূজ প্রেমের কাহিনি গড়ে উঠেছে বৈষ্ণব পদাবলীর তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে। মাঝখানে কৃষ্ণ তাঁর একদিকে রাধা, অন্যদিকে চন্দ্রাবলী। অর্থাৎ একজন প্রেমিক, অন্য দু’জন প্রেমিকা। তাঁদের কথোপকথনে উঠে এসেছে একালের নর-নারীর প্রেম মনস্তত্ত্বের ভাবনা। রাধা ও চন্দ্রাবলীর হৃদয়ের কথা, তাঁদের অন্তরের যন্ত্রণা এবং মিলন পর্ব- সব কিছুই কাল থেকে কালান্তরে প্রবাহিত হয়েছে। এর ফলে এখানে নারীবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে। নাটকটির একটি বিশেষত্ব পুরুষ হৃদয়ের বিরহ যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ। কৃষ্ণ রাধাকে পাওয়ার জন্য যেভাবে ব্যাকুল হয়েছেন, নাট্যকার তা এখানে সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। এমনকি রাধার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য কৃষ্ণ যে কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি হয়েছেন। রাধা যখন কৃষ্ণকে অন্য কপট পুরুষের মতো ছেড়ে পালানোর অভিযোগ করেছেন, তখন কৃষ্ণ রাধাকে বলেছেন—

“হইলাম পরাজিত, এখন দিতেছি নাকেখৎ।/ এবার তোমার পাঠশালের পোড়ো হব, এই তোমায় দণ্ডবৎ।।/ বলি, কোরোনা বঞ্চিত, হয়েছি তবাপ্রিত;/ থাকবো তোমার অনুগত, শেষ লিখে দিয়ে দাসখৎ।।”^{১০১}

এ কৃষ্ণ যেন রাধাঅন্ত প্রাণ। আবার চন্দ্রাবলী যখন কৃষ্ণের উপর মান করেছেন, তখন কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর মান ভঞ্জন করতে গিয়ে বলেছেন—

“প্রিয়ে চন্দ্রাবলি! আচ্ছা তোমার মানবাসনা পূর্ণ হবে, এখন আমার পদ ছাড়। (চন্দ্রাবলীর পদত্যাগ) আচ্ছা, এখন বল দেখি প্রিয়ে তোমার মনের আঁধার ঘুচেছে কি না? স্থূলকথা, আমায় যে যখন যে ভাবে দেখবে, আমিও তখন তার কাছে সেই ভাবে বিরাজ করবো। জান ত আমার অন্য নাম লীলাময়! এ জগতে আমার লীলার জন্যই অবতীর্ণ হওয়া, আমি লীলা খেলা বড় ভালবাসি।”^{১০২}

চন্দ্রাবলী একসময় কৃষ্ণকে অন্তরে লাভ করেছেন, তাই তিনি বাইরে কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য আর হাহাকার করেন নি। নাট্যকার একই সঙ্গে কৃষ্ণের দ্বৈত সত্তার পরিচয়টি তুলে ধরেছেন দুটি নারী চরিত্রের মধ্য দিয়ে। রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন পর্বের বর্ণনায় বৈষ্ণবীয় পরিবেশ বজায় রেখেও নাট্যকার একালের নর-নারীর প্রেমভাবনায় উদ্ভীর্ণ হতে

পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘বৈষ্ণব-কবিতায়’ এইরূপ বাস্তব চিত্র আমরা পাই।
কবি সেখানে বলেছেন-

“সত্য করে’ কহ মোরে, হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত? হেরি কাহার নয়ন,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?”^{১০৩}

‘নিকুঞ্জবিহার’ বা ‘গোপিনীলীলা’ যেন তারই আধুনিক চরিত্রের আখ্যান। কতোগুলি জীবন
পর্ব অতিক্রম করে পরিণতিতে পৌঁছে যাওয়া। নাটকটির আর একটি বিশেষ দিক হল
এতে আধুনিক ভাষার সংযোজন। যেহেতু নাটকটি নাট্যগীতিকা, তাই এর কাহিনিতে
নাট্যকার আধুনিক গীতিকবিতার সুরমূর্ছনার পরিচয়টি সংযুক্ত করেছেন। ৩২নং
গীতিকায় বলা হয়েছে—

“অচিন্ত্য তোমার লীলা, লীলাময় শ্রীমুরারী।/ কাহারে কাঁদাও কভু,
কার বা প্রেমভিখারী।।/ কত রূপে কত খেলা, খেল তুমি ওহে
কালো,/ অনন্ত তোমার লীলা, কেমনে বুঝিতে পারি।/ এই সৃষ্টি
কর সৃজন, কভু বা কর পালন;/ মুহূর্তে কর নিধন, হে
সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী।।”^{১০৪}

বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনে উঠে এসেছে সমাজ প্রচলিত কিছু প্রবাদ-প্রবচন, যেগুলি
আজও আমাদের সমাজে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন- ‘মেঘ না চাইতেই জল’,
‘পুরুষ পরশমণি যতনের ধন’, ‘মুখে সুখ হৃদে বিষ’, ‘মনিহারা ফণি’ ইত্যাদি। এছাড়াও
কিছু নিম্নমানের শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে কৃষ্ণের স্বভাব বোঝানোর জন্য। যেমন
রাধা বলেছেন-‘জানি সে চতুর, শ্যাম লম্পট বর’। এখানে ‘লম্পট’ শব্দের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণ
চরিত্রের চঞ্চল, খারাপ স্বভাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। নাটকটি কাব্যিক ভঙ্গীতে
লেখা হলেও আধুনিক গদ্যের পরিচয় রয়েছে প্রতিটি চরিত্রের কথাবার্তায়। এইভাবে
নাটকটি কাহিনি, চরিত্র, ভাষার পুনর্নির্মাণ ও বিনির্মাণ হয়েছে। কোথাও বৈষ্ণব তত্ত্ব,
কোথাও ভাব এবং কোথাও চরিত্রের মনস্তত্ত্বকে আধুনিক দর্শক বা পাঠকের অনুকূলে
পরিবেশন করে নাট্যকার এই উদ্দেশ্য সাধন করেছেন।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়- শ্রীকৃষ্ণ (১৯২৬);

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ‘শ্রীকৃষ্ণ’ নামের একটি পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য রচনা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ও মানবিক ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে নাট্যকার চরিত্রটিকে এই নাটকে অভিনব রূপ দিয়েছেন। ২৪ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১৮ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটির প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (২), স্তুতিপত্র(১), অভিনয়লিপি (১), নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ (১), মূল নাটক (২১১) সহ মোট ২১৭টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ—

“শ্রীকৃষ্ণ/ পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য/ শ্রী অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।”^{১০৫}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ—

“শ্রীকৃষ্ণ/ পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য/ আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের তত্ত্বাবধানে/ স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত/ প্রথম অভিনয় রজনী— শনিবার ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩/ শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়/ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স/ ২০৩/১/১; কর্ণওয়ালিস্ ট্রাষ্ট, কলিকাতা।”^{১০৬}

নাটকের ‘স্তুতিপত্রে’ বলে হয়েছে—

“শ্রীকৃষ্ণার্ণবমস্ত/ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈশ্চৈব নরোত্তমম্। দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।।”^{১০৭}

নাটকটি প্রথম অভিনয় হয় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে, শনিবার ১লা জ্যৈষ্ঠ, স্টার থিয়েটারে। প্রথম অভিনয়ের সময় চরিত্রলিপিতে উল্লেখিত অভিনেতৃগণ হলেন—

“বলরাম- শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণ- শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্তী, ব্যাসদেব ও কংস- শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত, ভীষ্ম- শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবারু), বিশ্বামিত্র ও উগ্রসেন- শ্রীপ্রফুল্লকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, নারদ- শ্রীশরৎচন্দ্র সুর, বসুদেব ও জরাসন্ধ- শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বসু, কর্ণ - শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দ ও ব্রাহ্মণ- শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, দ্রোণাচার্য- শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সরকার, অশ্বত্থামা- শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায়, সাত্যকি- শ্রীসন্তোষকুমার দাস, অক্রুর, সারথি, বৃদ্ধ যাদব—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী, কৃতবর্মা, মন্ত্রী ও বিদুর- শ্রীতুলসীচরণ চক্রবর্তী, অনিরুদ্ধ- শ্রীবিজয়কৃষ্ণ

মুখোপাধ্যায়, ধৃতরাষ্ট্র- শ্রীভূজেন্দ্রনাথ দে, দুর্যোধন- শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, দুঃশাসন- শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ধৃষ্টদ্যুম্ন- শ্রীপ্রভাতরঞ্জন বসু, শিশুপাল- শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শকুনি- শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যুধিষ্ঠির- শ্রীকনকনারায়ণ ভূপ, ভীম- শ্রীননীগোপাল মল্লিক, অর্জুন-শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নকুল- শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার, সহদেব- শ্রীসন্তোষকুমার সিংহ, জরাসন্ধের মন্ত্রী- শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দত্ত, দৌবারিক- শ্রীতারকচন্দ্র ঘোষ, সঞ্জয়- শ্রীবিনোদবিহারী ঘোষ, প্রতীহারি- শ্রীনলিনীরঞ্জন দাস, চেকিতান- শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ, জরা- শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন, যদুবালকগণ- শ্রীযুক্তা রাজলক্ষ্মী, বালা, মতিবালা, আশালতা, তারকবালা, প্রাপ্তি- শ্রীযুক্তা সুশীলাসুন্দরী, অস্তি- শ্রীযুক্তা নীহারবালা, দেবকী ও দ্রৌপদী- শ্রীযুক্তা রাণীসু, যশোদা ও গান্ধারী- শ্রীযুক্তা নন্দরা, রাধিকা- শ্রীযুক্তা ফিরোজাবালা, রুক্মিণী- শ্রীযুক্তা সরস্বতী, সুভদ্রা- শ্রীযুক্তা মতিবালা, সত্যভামা- শ্রীযুক্তা রাজলক্ষ্মী।” ১০৮

প্রথম রজনীতে অভিনয়ের সময় যাঁরা সাংগঠনিক নানা দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তাঁরা হলেন—

“নাট্যাচার্য্য- শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শিক্ষক- শ্রীঅপারেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীত-শিক্ষক- শ্রীজানকীনাথ বসু, বংশীবাদক- শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃত্য-শিক্ষক- শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হারমোনিয়ম বাদক- শ্রীসন্তোষকুমার দাস, সঙ্গীত- শ্রীহরিপদ দাস ও শ্রীমন্মথনা, স্মারক- শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গপীঠাধ্যক্ষ- শ্রীনারাণচন্দ্র দাস।” ১০৯

নাটকে উল্লিখিত পুরুষ ও নারী চরিত্রগুলি হল—

“বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাসদেব, ভীষ্ম, বিশ্বামিত্র, নারদ, কর্ণ, কংস, উগ্রসেন, বসুদেব, জরাসন্ধ, নন্দ, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বথামা, সাত্যকি, অত্রুর, সারথি, বৃদ্ধ যাদব, কৃতবর্মা, মন্ত্রী, বিদুর, অনিরুদ্ধ, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন, দুঃশাসন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিশুপাল, শকুনি, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, জরাসন্ধের মন্ত্রী, দৌবারিক, সঞ্জয়, প্রতীহারি, চেকিতান, সারণ, শাশ্ব

প্রভৃতি যদুবালকগণ, জরা ইত্যাদি।/ প্রাপ্তি, অস্তি, দেবকী, যশোদা, রাধিকা, গান্ধারী, দ্রৌপদী, রুক্মিণী, সুভদ্রা, সত্যভামা ইত্যাদি।”^{১১০}

নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক আছে। প্রতিটি অঙ্কে কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের নানা ঘটনাকে প্রধান করে তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম অঙ্কের পাঁচটি দৃশ্য নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন থেকে মথুরা পর্যন্ত কাহিনি দেখানো হয়েছে। এই অংশের কাহিনিতে বৈষ্ণব পদাবলীর বৃন্দাবনলীলা ও মথুরালীলার প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। বাকী চারটি খণ্ডে কৃষ্ণের কর্তব্য-পরায়ণতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে নানা ঘটনার সমাহারে। সেই সূত্র ধরে এসেছে মহাভারতের নানা প্রসঙ্গ। কৃষ্ণের দ্বারকা রাজ্য প্রতিষ্ঠা, জরাসন্ধের কথা, পঞ্চপাণ্ডবদের সখ্যতা প্রভৃতি নানা কাহিনি নাটকটির মধ্যে পত্র-পুষ্পে বিকশিত হয়ে উঠেছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে আমরা পূর্ণিমায় রাধা-কৃষ্ণের মহারাসের কথা বার-বার শুনেছি। কিন্তু অমাবস্যায় রাসের প্রসঙ্গ তেমনভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার এই রকম বৈচিত্র্যময় বিষয় নাট্যকার এখানে দেখিয়েছেন। রাধার একজন সখী অন্যদের বলেছেন—

“যেখানে কৃষ্ণচন্দ্র, সেইখানেই পূর্ণচন্দ্র। যেখানে শ্রীরাধা সেইখানেই পূর্ণীমা! রাসের কি সময়-অসময় আছে? আজ প্রাণ ভরে ফুল তুলেছি, মালা গেঁথেছি। উজান বেয়ে আসতে দেরী হ’য়েছে চল, যুগল চাঁদের চরণে ফুলের অঞ্জলি দিইগে।”^{১১১}

নাটকের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের মধুর প্রেমলীলা অপেক্ষায় কৃষ্ণের কর্তব্যপরায়ণ চরিত্রের পরিচয়টি নাট্যকার বড় করে দেখিয়েছেন। তাই বলরাম যখন অত্রুর সংবাদের কথা জানান, তখন কৃষ্ণ দাদাকে বলেছেন—

“বিশ্বব্যথা করিতে বারণ/ করিয়াছ আকার ধারণ?/ গ্লানি দূর করিতে ধরার,/ অধর্মের করিতে বিনাশ/ ধরিয়াছি নরের আকার,/ কহ আর কতদিন বদ্ধ রব মোহে?”^{১১২}

এখানে কৃষ্ণের কর্তব্যপরায়ণতার স্বরূপটি প্রকাশিত হয়েছে। কৃষ্ণের মথুরা যাওয়ার কথা শুনে মা যশোদা দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত হয়েছেন। তিনি কৃষ্ণকে বলেছেন—

“আকস্মাৎ এ কি বজ্রাঘাত!/ একি শুনি নিদারুণ বাণী,/ তুই নাকি যাবি মথুরায়?”^{১১৩}

মাকে সান্ত্বনা দিয়ে কৃষ্ণ যে বাক্যগুলি বলেছেন, তাতে কৃষ্ণের বৃন্দাবন-প্রীতি প্রকাশিত হয়েছে। কৃষ্ণ মা যশোদাকে বলেছেন—

“যাব মথুরায়,/ কিন্তু সত্য কহি--যেথা যাই, যেথা রহি,/ বৃন্দাবন যাবে
সাথে সাথে!/ বাহিরে বিশ্বের হৃদে করিব ভ্রমণ,/ অন্তরে আমার/
বিরাজিবে নিত্য বৃন্দাবন!/ যাবে তুমি জননী আমার—স্নেহের আধার,/
আঁধার করিয়া দূর/ অগ্রে অগ্রে দেখাইয়ে পথ;/ সঙ্গে পিতা নন্দ গোপেশ্বর
আদর্শ জনক;/ সহ সহচর/ ব্রজের রাখাল যাবে ল’য়ে ধেনু পাল; / নুপুরে
তুলিয়া রোল/ ব্রজাঙ্গনা যাবে পাশে পাশে;--/ যমুনা ধরিবে তান,/
কেকারবে ময়ূর ডাকিবে,/ কদম্ব ফুটিবে, অলির গুঞ্জন/ মিশাইবে বাঁশরীর
তানে!/ প্রেমে উদ্বোধন,/ প্রেমে হবে ব্রত উদ্‌যাপন;/ শিখাইতে নরে
প্রেমের মহিমা/ বৃন্দাবন ত্যজি/ একপদ নাহি যাব কভু;/ বৃন্দাবন—
বৃন্দাবন চিরসাথী মোর!”^{১০৪}

কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে প্রেমাকুল রাধা তীব্র হৃদয়বেদনায়
সখী বৃন্দাকে বলেছেন—

“চলে গেল? সত্যই চ’লে গেল? আমরা আসছি দেখে চ’লে গেল? যাবার
সময় একটা কথাও ব’লে গেল না? এমনি নিষ্ঠুর! সই! সই!”^{১০৫}

রাধার এই কৃষ্ণ ব্যকুলতা বৈষ্ণব পদাবলীর ‘মাথুর’ বিরহের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। মথুরায়
কৃষ্ণ একে একে অনেকগুলি কর্তব্য পালন করেছেন। প্রথমত, আপন পিতা বসুদেব ও
মাতা দেবকীকে কংসের কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন। দ্বিতীয়ত, অত্যাচারি কংসকে
বিনাশ করে পুনরায় ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। তৃতীয়ত, জরাসন্ধের আক্রমণ থেকে
মথুরাবাসীকে বাঁচানোর জন্য দ্বারকাপুরী নির্মাণ করেছেন এবং সেখানকার দায়িত্ব
নিয়েছেন। আমাদের মনে হয় রাজকর্তব্য অবহেলা করে শ্রীকৃষ্ণ আর বৃন্দাবনে ফিরে
আসতে পারেননি। রাধার দুঃখমোচন, যশোদা-মায়ের কষ্ট লাঘব করা তাঁর পক্ষে সম্ভব
হয়নি। তবে বৃন্দাবনের স্মৃতি, দুঃখবোধ তাঁর মধ্যে সর্বদা বিরাজ করেছে। নাট্যকাহিনির
আকর্ষণীয় চমক মল্লযুদ্ধে কংসের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরামের সংঘাত। কংসের মৃত্যুর পর কৃষ্ণ
মথুরার রাজ সিংহাসনে বসালেন রাজা উগ্রসেনকে। কৃষ্ণ উগ্রসেনকে রাজ্য পরিচালনার
প্রসঙ্গে বলেছেন—

“পুত্র সম কর রাজা, প্রজার পালন।/ এক পুত্র হত,/ হের শত শত পুত্র
তব কুটীরে প্রাসাদে!/ ভেদ নীতি করিয়া বর্জ্জন,/ এক পরিবার সম সবে
করহ পালন;/ লুপ্ত ধর্ম পুণ্যভূমে হ’ক প্রচারিত;/ যেন আদর্শে তোমার,

শিখে নর--/ রাজা—রাজা—প্রজার রঞ্জক,/ বন্ধু—পিতা—রক্ষক সবার;
নহে জম,/ নহে সিংহ, নহে ব্যাঘ্র নরাকারে!”^{১১৬}

এখানে কৃষ্ণ উগ্রসেনকে এমন রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন, যেখানে রাজা-প্রজার মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক থাকবে, থাকবে বন্ধুত্বের সম্পর্ক, রাজা হবেন প্রজার প্রকৃত পালক। অর্থাৎ একটি সাম্যবাদী আদর্শ রাজ্য গড়ার কথা বললেন। কিন্তু রাজা কংসের অকাল মৃত্যু তাঁর পত্নী প্রাপ্তি কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। তিনি কৃষ্ণকে স্বামী হত্যার দায়ে অপরাধী করেছেন। কৃষ্ণকে দায়ী করে প্রাপ্তি বলেছেন—

“তুমি কৃষ্ণ? শুনি তুমি অখিলের স্বামী,/ তাই বুঝি পতিহীনা করিলে
আমারে?/ করিয়াছ দুষ্টির শাসন! কিন্তু কহ,/ কোন্ অপরাধে অপরাধী
আমি?/ কোন্ পাপে পতিহীনা আজি?/ তুমি বুঝ জগতের ব্যথা;/ কিন্তু
মোর ব্যথা বুঝিবার/ বুঝি ভগবান্ নাহি কেহ আর!/ আরে ছল, আরে
কপট,/ আরে হীন গোপের নন্দন!/ যে অনলে দগ্ধ আজি আমি সে
অনলে/ অহরহ মর্মস্থল পুড়িবে তোমার,/ তিল মাত্র শান্তি কভু না পাবি
জীবনে!/ আমি জ্বালাব অনল—দীপ্ত দবানল--/ যে অনলে মথুরার
সিংহাসন/ ভস্ম-স্তূপে হবে পরিণত!/ আজি হ’তে রণধূম গ্রাসিবে
মেদিনী,/ আজি হ’তে স্বামী হারা শত শত নারী/ মোর সম লুটাবে ধরায়,
প্রতিচ্ছবি তার, অন্তরে তোমার/ তুলিবে ভীষণ হাহাকার!/ অভিশাপে
মোর,/ আজি হ’তে আঁখিধারা তব/ এ জীবনে কভু না শুকাবে!”^{১১৭}

প্রাপ্তির অভিশাপ কৃষ্ণকে আঘাত করেছে। বৈষ্ণব পদাবলীর কোনো কোনো পদে আমরা খুঁজে পেয়েছি দ্বারকার রাজা হয়েও কৃষ্ণের মনে শান্তি ছিলনা। তখন আমাদের মনে হয়েছে এই অশান্তির কারণ হয়তো স্বামীহারা পত্নী প্রাপ্তির অভিশাপ হতে পারে। নাটকটিতে বৃন্দাবনের কাহিনি কম থাকলেও মথুরাখণ্ডের কাহিনি অনেক বিস্তৃত। তাতে রাজা কৃষ্ণ চরিত্রের ব্যক্তিস্বরূপটি বড়ো হয়ে উঠেছে। এইভাবে নাট্য কাহিনিকে বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে সঙ্গত রেখে নাট্যকার নাটকটিকে আধুনিক রূপ দিয়েছেন। ফলে কাহিনির পুনর্নির্মাণ ও বিনির্মাণ হয়েছে।

‘শ্রীকৃষ্ণ’ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ। তিনি সমস্ত নাট্যকাহিনির কর্ণধার। বৃন্দাবন থেকে মথুরা, মথুরা থেকে হস্তিনাপুর— সমস্ত কাহিনির ভাবনায় কৃষ্ণের একছত্র অধিকার রয়েছে। এখানে কৃষ্ণ কারো প্রেমিক, কারো স্নেহের দুলাল, কারোর রক্ষাকর্তা, কারো রাজা, কারো-বা স্বামীরূপে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন। রাধার ভূমিকা এখানে

কম থকলেও বৈষ্ণবীয় পরকীয়া প্রেম ভাবনার নায়িকা রাধাকেই এই নাটকে আমরা পাই। কৃষ্ণ বিরহে তিনি ব্যাকুল ও অভিমানী। কংস এখানে অত্যাচারি রাজার ভূমিকায় থাকলেও সত্যভাষী। নিজের প্রকৃত জন্ম রহস্যের কথা নারদের কাছ থেকে জানতে পেরে অকপটে পত্নী প্রাপ্তিকে বলেছেন—

“সত্য যদি ক’রে থাক এক-পতি সেবা/ জ্ঞান বা অজ্ঞানে,/ শুন তবে
জরাসন্ধ- সুতা,/ শুনিতে শুনিতে ঘৃণায় না ফিরাও বদন,/ নহি আমি
উগ্রসেন-সুত,/ দ্রুমিল জনক মোর;/ দেবর্ষি নারদ দিলা মোরে
সমাচার।”^{১১৮}

কংসপত্নী প্রাপ্তি নাটকের একটি প্রধান আকর্ষণ। নাটকের আর একটি বড়ো আকর্ষণ হল প্রাপ্তির মুখের ভাষা বা তাঁর সংলাপ। কংসের কারাগারে কৃষ্ণের উপস্থিতিতে পিতা-মাতার অন্তরে যে বাৎসল্য রসের স্রোত প্রবাহিত হয়েছে, তাতে অপূর্ব নাট্য আকর্ষণের জন্ম ঘটেছে। বসুদেব পুত্র কৃষ্ণকে আবেগপূর্ণ ভাষায় বলেছেন—

“ওরে, কি ব’লে ডাকিব তোরে?/ মোর কাছে নামহীন তুই!/ বৎস—
বাছা—দুলাল আমার--/ পুত্র—পিতার গৌরব--/ বংশের নরক-দ্রাণ—আয়
বক্ষুমাঝে!/ ওরে লৌহদণ্ড কি কঠিন ব্যবধান এই--/ প্রসারিত বক্ষ বাহু/
কিন্তু স্পর্শিতে না পারি তোরে, ওরে মোর আনন্দ বিগ্রহ!”^{১১৯}

কৃষ্ণ পাপী, অত্যাচারী কংসকে প্রথমে হত্যা করতে চাননি, তাঁকে ভালো হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। কৃষ্ণ কংসকে বলেছেন—

“কিন্তু বীর, পুনঃ কহি, পুনঃ যাচি,/ নিষ্ঠুরতা তব ভিক্ষা দেহ মোরে;/ রণে
দেহ ক্ষমা; নির্দয় সংহার-কার্যে/ উত্তেজিত ক’রনা আমায়। কারাগারে
রাখিয়াছ জননী জনকে,/ মুক্তি দেহ দোঁহে, দেহ মুক্তি উগ্রসেনে;/ চ’লে
যাই হাসি মুখে/ উচ্চ কণ্ঠে জয় তব করিয়া ঘোষণা।/ কিন্তু যদি বিপরীত
কর আচরণ,/ এস ত্বরী হও আগুরান,/ বিধিবদ্ধ যজ্ঞ প্রয়োজন,--/ সেই
যজ্ঞে--/ পশু সম তুমি হও প্রথম আহুতি মোর!”^{১২০}

কৃষ্ণের এই কথাতে অনুরোধের সুর যুক্ত আছে। কিন্তু কোন উপায় না পেয়ে কৃষ্ণ তাঁকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন এবং সাধারণ মানুষকে কংসের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেছেন। এই রকম দ্বন্দ্ব সংঘাতময়, ভাষার বৈচিত্র্যে নাটকটি দর্শকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এইভাবে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ‘শ্রীকৃষ্ণ’ নাটকটির কাহিনি, ভাষা, চরিত্র, পরিবেশ- সবদিক থেকেই পুনর্নির্মিত ও বিনির্মিত হয়েছে।

আঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ — মাথুর (১৯৩৮) ;

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে আঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ বৈষ্ণব পদাবলীর মাথুর পর্যায় অবলম্বন করে রচনা করেছেন ‘মাথুর’ নামের একটি নাটক। ২৪ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১৪ সেন্টিমিটার চওড়া এই কৃষ্ণযাত্রামূলক নাটকটিতে প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (১), গুরুশিষ্য সংবাদ (১), মূল নাটক (৪৮) সহ মোট ৫১টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ—

“মাথুর/ (কৃষ্ণযাত্রা)/ শ্রীআঘোর চন্দ্র কাব্যতীর্থ”^{১১১}

নাটকটির নামপত্রটি এইরূপ—

“মাথুর / (কৃষ্ণযাত্রা)/ রচয়িতা/ বৈষ্ণব-প্রবর প্রবীণ নাট্যকার/
শ্রীআঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ/ প্রকাশক—শ্রীপফুল্লকুমার ধর/ সুলভ
কলিকাতা লাইব্রেরী/ ১০৪, অপারচিৎপুর রোড, কলিকাতা/
প্রিন্টার—শ্রীঅশ্বিনীকুমার সামন্ত/ নিউ মদন প্রেস/ ১০-সি,
ওয়ার্ডস্ ইনস্টিটিউশন্স ট্রাষ্ট, কলিকাতা/ ১৩৪৫সাল/ প্রকাশকের
সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।”^{১১২}

নাটকে উল্লিখিত চরিত্রগুলি হল- রাধা, কৃষ্ণ, বলরাম, কুজা, কুজার সখীগণ, শ্রীদাম, সুদাম, সুবল, নন্দ, যশোদা, বৃন্দা, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি। নাটকের ‘গুরুশিষ্য সংবাদ’ অংশে নাট্যকার বলেছেন—

“গুরুশিষ্য সংবাদ, শ্রীইন্দুভূষণ ভক্তিবিনোদ প্রণীত। ইহাতে সংসারে
আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বাস করিয়া কি রকম সাধনার পথে অগ্রসর হইতে
হয় তাহার সোজা উপায় লিখিত আছে। ইহার ভিতরে ধর্মের অনেক
নূতন তত্ত্ব সুন্দর ভাবে বর্ণিত আছে। প্রত্যেকের গৃহস্থের একখানি করিয়া
এই গ্রন্থ রাখা উচিত। মূল্য এক আনা।”^{১১৩}

নাটকটির গঠনগত অভিনবত্ব হল মোট আটটি দৃশ্যে ও দৃশ্যান্তরে নাট্যকাহিনি পরিবেশিত হয়েছে। কোনরূপ অঙ্ক বিভাজন এখানে দেখানো হয়নি। নাটকটি প্রকাশিত হয় প্রফুল্লকুমার ধরের তত্ত্বাবধানে সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী, ১০৪, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা থেকে। নাটকটি ছাপা হয় অশ্বিনীকুমার সামন্তের নির্দেশ মতো নিউ মদন প্রেস, ১০-সি, ওয়ার্ডস্ ইনস্টিটিউশন থেকে।

নাট্য কাহিনির আটটি দৃশ্যের প্রথম দৃশ্যে দেখানো হয়েছে কৃষ্ণের বৃন্দাবন থেকে কংস বিনাশের উদ্দেশ্যে মথুরাগমন এবং রাধার অন্তর বিরহ। দ্বিতীয় দৃশ্যে আছে কৃষ্ণের

বৃন্দাবনজনিত বিরহ ব্যাকুলতা। তৃতীয় দৃশ্যে দেখানো হয়েছে কুজার প্রসন্নতা তথা কৃষ্ণহৃদয়ের অসহায় অবস্থা। চতুর্থ দৃশ্যে আছে বৃন্দাবনের গোপবালকদের বিরহ এবং সেইসঙ্গে আধ্যাত্মিকতার প্রসঙ্গ। পঞ্চম দৃশ্যে কৃষ্ণের জন্যে নন্দরাজ ও যশোদার বিরহ যন্ত্রণা। ষষ্ঠ দৃশ্যে রাধার সখী বৃন্দার মথুরা গমন, কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ, রাধার হৃদয়-বেদনার কথা প্রকাশ। সপ্তম দৃশ্যে কুজার সঙ্গে বৃন্দার বাদ-প্রতিবাদ। অষ্টম দৃশ্যে কৃষ্ণের বৃন্দাবন ফিরে আসা এবং রাধার সঙ্গে মিলন। এই সমগ্র নাট্য কাহিনিটিকে বৈষ্ণব পদাবলীর মাথুরের ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত করে নাট্যকার পরিণতিতে রাধা-কৃষ্ণের মিলন ঘটিয়েছেন। বিয়োগান্তক ভাবনাকে মিলনান্তক পর্বে রূপান্তরিত করেছেন। ফলে কাহিনি পরিকল্পনায় বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবনায় নতুনত্ব এসেছে। যদিও আমরা দেখেছি বৈষ্ণব পদাবলীতে পদকর্তারা মাথুরের পরবর্তী পর্বে রাধার ‘ভাবসম্মেলন’ পর্যায়ের পদ রচনা করে কৃষ্ণকে কল্পনায় রাধার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। রাধা আত্মানুভবে কৃষ্ণকে নিজের কাছে পেয়েছেন এবং তাতে তাঁর মাথুরবিরহ যন্ত্রণার অবসান ঘটেছে। কিন্তু এখানে নাটকের পরিসমাপ্তি মিলনে করার জন্যে নাট্যকার কৃষ্ণকে কংস বিনাশের পর মাথুরা থেকে ফিরিয়ে এনেছেন এবং রাধার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। ফলে নাটকের কাহিনিতে অভিনবত্ব এসেছে। নাটকটি শুরু হয়েছে কৃষ্ণবিরহে উন্মাদিনী শ্রীরাধার পরিচয় দিয়ে। রাধা সখীদের বলেছেন—

“কই? সখি কই?/ শ্যামচাঁদ এলো কই?/ নাই পারি ধৈরজ ধরিতে।/
মিছে তোরা দিস আশা,/ মেটে না ত প্রাণের তিয়াসা,/ দুরাশায় প্রাণ
আরো ওঠেলো জ্বলিয়ে।”^{১২৪}

রাধার এই বিরহ যন্ত্রণা অনুভব করে সখী বৃন্দা বলেছেন—

“কেন রাধে!/ সেধে সেধে করিলি পিরীতি?/ যার তরে কুলে দিলি
কালি,/ যার তরে ব্রজপুরে/ কিনিলি কলঙ্ক-রাশি?/ সেই সে নিষ্ঠুর নিদয়
কালিয়া,/ ফেলি তোরে কোথা গেল চলি,/ একবারে ভ্রমেও কি হয়/ করে
তোরে স্মরণ কখনো?”^{১২৫}

রাধার আক্ষেপ কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে যাওয়ার আগে একটি বারের জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি। কৃষ্ণের প্রতি তাঁর এই ‘পিরীতি’র জন্যে তিনি নিজেকেই দায়ী করেছেন। সখী ললিতা রাধাকে কৃষ্ণের বার্তা দিতে গিয়ে বলেছেন যে মথুরায় কংস বিনাশের পর কৃষ্ণ সেখানকার রাজা হয়েছেন এবং কুজা রূপশীকে কাছে পেয়ে রাধাকে ভুলে গেছেন। রাধার বিরহ যন্ত্রণা প্রশমিত করার জন্য বৃন্দা রাধার দূতীরূপে মথুরা নগরে যাওয়ার

পরিকল্পনা করেছেন। অন্যদিকে কৃষ্ণেরও হৃদয়ে বৃন্দাবন-বিরহ দেখা দিয়েছে। কৃষ্ণ দাদা বলরামকে বলেছেন—

“দাদা! দাদা! / সহসা এ কঠিন পাষাণে--/ প্রবাহিত অশ্রুধারা আজি? /
বুঝিতে পারনি দাদা! / বুঝিয়াছি আমি এতক্ষণে।”^{১২৬}

কৃষ্ণের হৃদয়ে রাধার জন্য, নন্দরাজা-নন্দরাণীর জন্য, ব্রজ গোপিনীদের জন্য, ব্রজ বালকদের জন্য, এমনকি বৃন্দাবনের প্রকৃতির জন্য ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছেন। কৃষ্ণের সেই বিরহ যন্ত্রণাকে রাধার সখী বৃন্দা এসে দ্বিগুণ করে তুলেছেন। বৃন্দা মথুরায় এসেছেন কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে। কৃষ্ণের সাক্ষাৎ লাভের পর, বৃন্দা কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে বলেছেন—

“আমিও এসেছি নিতে, / না নিয়ে কি যাব একাকিনী?”^{১২৭}

মথুরাতে কৃষ্ণ কুজার প্রেমভক্তিতে ধরা পরেছেন, তাঁকে নিজের পত্নীর মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু রাধার জন্যে কৃষ্ণের অন্তর বারংবার কেঁদেছে। নাটকের চতুর্থ ও পঞ্চম দৃশ্যে বৃন্দাবনের গোপ বালকদের কৃষ্ণ-বিরহ এবং নন্দরাজা-যশোদার সন্তান-বিরহ যেভাবে নাট্যকার তুলে ধরেছেন, তা সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীতে দুর্লভ। নন্দরাজা পুত্র কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগবশত বলেছেন—

“আর না আসিবে ফিরি গোপাল আমার? / সে যে মোর অঞ্চলের নিধি, সে
যে মোর বুকের মাণিক। / সে যে মোর নয়নের তারা, / হারা হ’য়ে প্রাণ
গোপালে, / কেমনে রাখিব প্রাণ? / হায়! নাথ! / তখনি ত ব’লেছিলাম আমি,
দিওনা আত্মকে সনে প্রাণকৃষ্ণ মোবে।”^{১২৮}

নাটকটির একটি বিশেষত্ব হল আধ্যাত্মিক ভাবনার সঙ্গে বাস্তবের সংযুক্তিকরণ। কৃষ্ণবিরহে গোকুল বালকেরা কৃষ্ণের অনুভব কল্পনা করেছেন। অতীতের নানা ঘটনার স্মৃতিচারণ করে সুবল সুদামকে বলেছেন—

“আমার যেন মনে হয়, কানাই আমাদের মতো রাখাল নয়। ও দেবতা,
দিনকত রাখাল সেজে আমাদের সাথে খেলা ক’রে গেল।”^{১২৯}

প্রভুতরে শ্রীদাম তাঁর কথাকে সমর্থন করে বলেছেন—

“শুধু যে সে দেবতা নয়। স্বয়ং গোলকের হরি। মাঝে মাঝে দেখতি সনে
কেমন যেন হ’য়ে যেতো। এক একটা দৈত্যকে যেন তুণের ন্যায় দুই নখে
ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।”^{১৩০}

এছাড়াও এসেছে কৃষ্ণের পূতনাবধূ, কালীয়দমন, দৈত্য বধের মতো অলৌকিক ঘটনাগুলি। নাটকটি যে বৈষ্ণব পদাবলীর মাথুর ভাবনার দ্বারা জারিত, তা বোঝা যায় প্রতিটি দৃশ্যের ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের মাথুর পর্যায়ের নানা পদের প্রত্যক্ষ সংযোজনে। অষ্টম দৃশ্য রাধার হৃদয় যন্ত্রণার প্রসঙ্গে রয়েছে কবি চণ্ডীদাসের সেই বিখ্যাত বৈষ্ণবপদ। কবি চণ্ডীদাস বলেছেন —

“সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু,/ অনলে পুড়িয়ে গেল।/ অমিয় সাগরে,
সিনান করিতে,/ সকলি গরল ভেল’।।/ সখী, কি মোর করমে লিখি।/
শীতল বলিয়ে, ও চাঁদ সেবিনু,/ ভানুর কিরণ দেখি।।/ নিচল বলিয়া,
উচলে চড়িনু,/ পড়িনু অগাধ জলে।/ লহমী চাহিতে, দারিদ্র বেড়ল,/
মানিক হারানু হেলে।।/ নগর বসালাম, সাগর বাঁধিলাম,/ মানিক পাবার
আশে,/ সাগর শুকালো, মানিক লুকাল,/ অভাগীর করম দোষে।।” ১৩১

এইভাবে নাট্যকার মাথুরের কাব্যকাহিনিকে নাট্যকাহিনিতে পুনর্নির্মাণ ও বিনির্মাণ করেছেন।

শুধু কাহিনি নয়, ‘মাথুর’ নাটকের চরিত্র এবং সংলাপ রচনাতেও নাট্যকারের কৃতিত্ব কম নয়। তিনি প্রতিটি চরিত্রকে স্বতন্ত্র ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। বৈষ্ণবপদাবলীর বিরহ পর্যায়ের মতো করে রাধা, কৃষ্ণের চরিত্রের বিরহ দেখানোর পাশাপাশি সমগ্র বৃন্দাবনবাসীর বিরহকে দেখিয়েছেন। এমনকি প্রকৃতির মধ্যেও কৃষ্ণবিরহ খুঁজে পেয়েছেন। মথুরাজনিত কৃষ্ণবিরহ রাধা সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছেন। রাধা তাঁর প্রিয় সখী বৃন্দাকে বলেছেন-

“এক কাজ কর বৃন্দ!/ শ্যামের বিরহ জ্বালা/ দাউ দাউ করি/ দিবানিশি
হিয়ামাঝে উঠিছে জলিয়া,/ আর নাহি পারিনু সহিতে। নিশ্চয় জানিস্ মোর
হইবে মরিতে।” ১৩২

কৃষ্ণের বিরহযন্ত্রণা একইভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নানা কথায়। রাধা-কৃষ্ণের এই বিরহ কাতরতা চিরন্তন মানব-মানবীর প্রেম ব্যাকুলতায় প্রকাশিত হয়েছে, যা ধরা পরেছে নাটকের চরিত্র-চিত্রণে। কৃষ্ণ চরিত্রের একটি বিশেষ দিক হল অকপট সত্য স্বীকারোক্তি। তিনি পত্নী কুজার কাছে নিজের অতীত জীবনের রাধাপ্রেমের তীব্র আকর্ষণের কথা ব্যক্ত করেছেন নির্দিধায়। কুজাকে তিনি বলেছেন—

“শোন লো সুন্দবি!/ রাগ নাহি কর/ ধৈর্য্য ধরি অবসান কর কথা
মোর।/ শৈশবে যাপিনু কাল--/ বৃন্দাবন ধামে।/ বৃন্দাবনে

ব্রজপুরী মাঝে/ ব্রজাঙ্গনা সনে--/ বহুদিন করিয়াছি কেলি।/ কভু
কুঞ্জে—কভু বা নিকুঞ্জে,/ কভু সেই কালিন্দীর কুলে,/ কভু
কদম্বের মূলে, নিশিদিন করিয়াছি কতই আনন্দ।/ তার মাঝে
শ্রীমতী শ্রীরাধা,/ প্রাণ দিয়ে মোরে বেসেছিল ভালো,/ বাজাতাম
বাঁশী যবে রাধা রাধা বলি,/ আসি ত ছুটিয়ে উধাও হইয়ে/ তখন
সে কদম্বের তলে।/ লাজ-মান-ভয়-জাতি-কুল-পতি,/ সব
ত্যাগেছিল মোর তরে।/ এক মাত্র আমি তার ধ্যান,/ আমি তার
জ্ঞান,/ আর কিছু জানিত না রাই।”^{১৩৩}

এই রকম স্বীকারোক্তি কৃষ্ণ চরিত্রকে কলঙ্কমুক্ত করেছে। বৃন্দার সঙ্গে কৃষ্ণের ব্রজে ফিরে আসা মূলত কৃষ্ণের রাধাপ্রেমের মূল্য দেওয়া। এই কৃষ্ণ বৈষ্ণব পদসাহিত্যের কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হলেও আধুনিক কৃষ্ণ; যিনি নিজের দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সর্বদা সচেতন ছিলেন। মথুরাজনিত বিরহ আমাদের সমাজে সর্বদা দেখা না গেলেও নর-নারীর জীবনচেতনায় বিরহের উপস্থিতি সর্বদা বর্তমান। বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা-কৃষ্ণ যেন তারই প্রতীকী ভাবনা। নন্দরাজা, যশোদা, বিশাখা প্রমুখ চরিত্রগুলি নাট্য পরিবেশ সৃজনে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁদের উপস্থিতি নাটকের আকর্ষণ বাড়িয়েছে। প্রকৃতির ভূমিকা এখানে অভিনবভাবে এসেছে। বৃন্দাবনে কৃষ্ণবিরহে যখন সকল মানুষ যন্ত্রণায় কাতর হয়েছেন, তখন পশুপাখি ও প্রকৃতিতেও তার প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। নন্দরাজ যশোদাকে সেই কথাই বলেছেন—

“গোকুলের পশু-পক্ষী তরু-লতা/ তৃণ জল স্থাবর জঙ্গম/ কৃষ্ণের বিরহে/
সকলেই আছে মান।/ এক কৃষ্ণ -চন্দ্র বিনে/ আঁধার আঁধার সকলি
আঁধার।”^{১৩৪}

নাটকটিতে রাধাবিরহের পাশাপাশি কৃষ্ণবিরহ বড়ো করে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি দৃশ্যের চরিত্র পরিকল্পনার সঙ্গে বৈষ্ণবপদের গীতি সংযোজন এবং নাটকের চরিত্রগুলির অন্তর জগতের বহিঃপ্রকাশ অভিনব হয়ে উঠেছে। অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থের ‘মাথুর’ নাটকটিতে তাই বৈষ্ণব পদাবলীর ‘মাথুর’ পর্যায়ের কাব্যভাবনা পুনর্নির্মিত হয়েছে নাট্যভাবনায়। ফলে নাটকটি একালের পাঠক বা দর্শকের দরবারে অভিনব এবং পুনর্নির্মিত নাটক হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে।

উপরোক্ত বিস্তারিত ও বিশ্লেষিত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক কাব্য ও পদাবলী সাহিত্য অবলম্বনে একাধিক নাটক রচিত হয়েছে আধুনিক

কালে। নাটকগুলিতে চরিত্র এবং কাহিনির বিশেষ কোনো পরিবর্তন না করেও নাট্যকারগণ পুনর্নির্মাণে আধুনিক দর্শকের রুচি, মানসিকতা ও মননকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। বক্ষ্যমান অধ্যায়ে আমরা তারই বিস্তৃত পরিচয় উদ্ধার করার প্রয়াস করেছি।

প্রসঙ্গনির্দেশ ও মন্তব্য : —

- ১। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দোল-লীলা (প্রথম খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, ১৯০০, পৃ- ৫।
- ২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৫।
- ৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৩।
- ৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৬।
- ৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৭।
- ৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৮।
- ৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৭।
- ৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৭।
- ৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৭।
- ১০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৭।
- ১১। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ব্রজবিহার, (দ্বিতীয় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, ১৯০০, পৃ-১২৭।
- ১২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১২৯।
- ১৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৩০।
- ১৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৩১।
- ১৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৩২।
- ১৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১২৮।

- ১৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৩০।
- ১৮। রাজা মহেন্দ্রলাল খান, মাথুরা মিলন, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানি, ১৮৮৩,
প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ৭, পৃষ্ঠা
সংখ্যা- ৪৭৫।
- ১৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট,
চিত্র সংখ্যা- ৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৭৬।
- ২০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- বিজ্ঞাপনপত্র অংশ।
- ২১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- প্রচ্ছদপত্রে উল্লিখিত পদ।
- ২২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- নামপত্রে উল্লিখিত পদ।
- ২৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১।
- ২৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৩।
- ২৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৯।
- ২৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১১
- ২৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১২।
- ২৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৭।
- ২৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪১।
- ৩০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪৩।
- ৩১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১২।
- ৩২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪০।
- ৩৩। মনোমোহন বসু, রাসলীলা, কলিকাতা, ১৮১১, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ
ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ৯, পৃষ্ঠা- ৪৭৭।

- ৩৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- নামপত্র অংশ।
- ৩৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- পিতৃদেবর স্মরণে দুটি গোড়ার কথা অংশ।
- ৩৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১।
- ৩৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৬।
- ৩৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৮।
- ৩৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৮।
- ৪০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৫।
- ৪১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৬।
- ৪২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৩৭।
- ৪৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৩৮।
- ৪৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৫১।
- ৪৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৫২।
- ৪৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৯৯।
- ৪৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৯৯।
- ৪৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৬৭।
- ৪৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-২৫।
- ৫০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪৫।
- ৫১। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, বৃন্দাবন-বিলাস, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ১৯০৩,
প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ১০, পৃষ্ঠা
সংখ্যা- ৪৭৮।
- ৫২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- নামপত্র অংশ।

- ৫৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, উৎসর্গপত্রের ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ১১, পৃষ্ঠা- ৪৭৯।
- ৫৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৫।
- ৫৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৫-১৬।
- ৫৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-২১।
- ৫৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৩৮।
- ৫৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৩৮।
- ৫৯। দ্রষ্টব্যঃ বৈষ্ণব পদাবলী, সম্পাদনা- সত্য গিরি, রত্নাবলী, ১৯৯৯, (পঞ্চম মুদ্রণ), পৃষ্ঠা-১৯৫।
- ৬০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৩২।
- ৬১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৫২।
- ৬২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৭৬।
- ৬৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৮১।
- ৬৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৮১-৮২।
- ৬৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৬১।
- ৬৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৭৩।
- ৬৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৬০।
- ৬৮। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, মান, ভট্টাচার্য এন্ড সন্স এর পুস্তকালয়, ১৯১৬, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ১২, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৮০।
- ৬৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- নামপত্র অংশ।
- ৭০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ১।

- ৭১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৫-৬।
- ৭২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৯।
- ৭৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ১০।
- ৭৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ১৯।
- ৭৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ২৬।
- ৭৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৬১।
- ৭৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৮০।
- ৭৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৯৫।
- ৭৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ১৪৫।
- ৮০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ১৬৫।
- ৮১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ১৯২।
- ৮২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ২২২।
- ৮৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ২২২।
- ৮৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ২২৪।
- ৮৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৭৭।
- ৮৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ১০৯-১১০।
- ৮৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৩১।
- ৮৮। ভুবনকৃষ্ণ মিত্র, নিকুঞ্জবিহার বা গোপিনীলীলা, ১৯২৭, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত
বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ১৩, পৃষ্ঠা- ৪৮১।
- ৮৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, উৎসর্গ-পত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ
পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ১৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৮২।

- ৯০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- উপহারপত্র অংশ।
- ৯১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- নাটকের কথা অংশ।
- ৯২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ১।
- ৯৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৩।
- ৯৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৫
- ৯৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৭।
- ৯৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৯-১০।
- ৯৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ১২।
- ৯৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ২১।
- ৯৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ২০।
- ১০০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ২৬।
- ১০১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৭।
- ১০২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ২৭।
- ১০৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোনারতরী কাব্য, বৈষ্ণব কবিতা, পৃষ্ঠা- ৪৯।
- ১০৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ২৭।
- ১০৫। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, ১৯২৬,
প্রাচ্যদপত্রেরবিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ১৫, পৃষ্ঠা
সংখ্যা- ৪৮৩।
- ১০৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্র অংশ।
- ১০৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- স্ততিপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ
পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ১৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৮৪।

- ১০৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ অংশ।
- ১০৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- সংগঠনকারিগণ অংশ।
- ১১০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- চরিত্ররলিপি অংশ, বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি
দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৮৫।
- ১১১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-২।
- ১১২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৩।
- ১১৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৫।
- ১১৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৫-৬।
- ১১৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৯।
- ১১৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৩৮।
- ১১৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৩৯-৪০।
- ১১৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ১৭।
- ১১৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-২৩।
- ১২০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৩২।
- ১২১। অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ, মাথুর, সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী, ১৯৩৮, প্রচ্ছদপত্রের
বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ১৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা-
৪৮৬।
- ১২২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট,
চিত্র সংখ্যা- ১৯, পৃষ্ঠা- ৪৮৭।
- ১২৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- গুরুশিষ্য সংবাদ অংশ।
- ১২৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১।

- ১২৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-২।
- ১২৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৮
- ১২৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৩১।
- ১২৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-২০
- ১২৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৭।
- ১৩০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৭।
- ১৩১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪০-৪১।
- ১৩২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৫।
- ১৩৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৩৬-৩৭।
- ১৩৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-২২।

চতুর্থ অধ্যায়

নাট্য পুনর্নির্মাণে মঙ্গলকাব্যের বিষয়: অন্বেষণ ও তার সমীক্ষা

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ব্রত ও পাঁচালী কথার আদলে, সমাজ পুনর্গঠন এবং জাতিগত সৌহার্দ্য বজায় রাখার তাগিদে জন্ম ঘটে মঙ্গলকাব্যের। তার ফলে লেখা হয় মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল আদি কাব্য। এই সকল মঙ্গলকাব্যের মূল লক্ষ্য জনমানসে দেব-দেবীর মহিমা প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজের উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ দূর করা। তবে কবি স্বভাবের শ্রেষ্ঠতায়, কোনো কোনো কবিরা তাঁদের রচনায় সচেতনভাবে ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখকে যেমন যুক্ত করেছেন, তেমনি তৎকালীন সামাজিক এবং আর্থিক জীবনচেতনার পরিচয়টিও তুলে ধরতে পেরেছেন। ফলে তাঁদের কাব্য হয়ে উঠেছে সেকালের সমাজ বাস্তবতার জীবন্ত দলিল। এইরূপ তথ্য সমৃদ্ধ কাব্য একালের পাঠকের প্রতিক্রিয়ায় ধরা পড়বে না তা তো সম্ভব নয়; ফলে সেই কাব্যের পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় লেখা হয়েছে আধুনিক সাহিত্যিক নাট্য পুনর্নির্মাণ। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা যথাক্রমে (ক) মনসামঙ্গল কাব্য অবলম্বনে রচিত নাট্য পুনর্নির্মাণ, (খ) চণ্ডীমঙ্গল কাব্য অবলম্বনে রচিত নাট্য পুনর্নির্মাণ, (গ) ধর্মমঙ্গল কাব্য অবলম্বনে রচিত নাট্য পুনর্নির্মাণ, (ঘ) শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য অবলম্বনে রচিত নাট্য পুনর্নির্মাণ এবং (ঙ) অন্নদামঙ্গল কাব্য অবলম্বনে রচিত নাট্য পুনর্নির্মাণ- এইরূপ পাঁচটি ভাগে ভাগ করে প্রত্যেকটি ভাগের নির্বাচিত মোট ষোলোটি নাটকের পরিচয় উদ্ধার ও তার বিশ্লেষণ করেছি। এই কর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বহু বিখ্যাত এবং কয়েকজন অখ্যাত নাট্যকার। বক্ষ্যমাণ গবেষণা অধ্যায়ে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের কয়েকজন নাট্যকারকে আমরা আলোচনার জন্য নির্বাচন করেছি, তাঁদের মধ্যে মনসামঙ্গল কাব্য অবলম্বনে নাটক লিখেছেন (১) মীর মশাররফ হোসেন। এমনিতেই তিনি ঔপন্যাসিক। কিন্তু মনাসা মঙ্গলকাব্যের বিষয় অবলম্বন করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি লিখেছেন ‘বেহুলা গীতাভিনয়’ (১৮৮৯) নামের একটি নাটক। মনসামঙ্গল কাব্য নিয়ে একাধিক নাট্যকার নাটক লিখলেও এখানে আমরা বিংশ শতাব্দীর মোট ছয় জন বিখ্যাত নাট্যকারের রচিত ছয়টি উল্লেখযোগ্য নাটককে আলোচনার জন্য নির্বাচন করেছি। এঁদের মধ্যে আছেন (২) অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘সওদাগরের নৌকা’ (১৯৬৯), (৩) শম্ভু মিত্র রচিত ‘চাঁদ বণিকে পালা’ (১৯৭৮), (৪) শেখর দেবরায় রচিত ‘মনসাকথা’ (২০০২), (৫) উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘মনসামঙ্গল’ (২০১৮) এবং (৬) দেবেশ ঠাকুর

রচিত ‘বেহুলা’ (২০১৮)। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য অবলম্বনেও ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে একাধিক নাটক রচিত হয়েছে। এই কাজে একাধিক নাট্যকার আত্মনিয়োগ করেছেন। বর্তমান অধ্যায়ে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য অবলম্বনে নাট্য পুনর্নির্মাণের রূপরেখাটি তুলে ধরার জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি ও বিংশ শতাব্দীর চারটি নাটককে নির্বাচন করেছি আমরা। নাটক চারটি হল (৭) অতুলকৃষ্ণ মিত্র রচিত ‘মা’ (১৮৯৫), (৮) অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত ‘ফুল্লরা’ (১৯২৫), (৯) শিশিরকুমার দাস রচিত ‘ভাঁড়ুদত্ত’ (১৯৭৭) এবং (১০) রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী রচিত ‘ফুল্লকেতুর পালা’ (২০০০)। ধর্মমঙ্গল কাব্য অবলম্বনে তেমন কোনো নাট্যপুনর্নির্মাণ আমাদের নজরে আসেনি। বহু অনুসন্ধানের পর একটি নাট্য পুনর্নির্মাণকে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। সেটি হল (১১) উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় রচিত ‘ধর্মমঙ্গল’ (২০২০)। আর অন্নদামঙ্গল কাব্য অবলম্বনে (১২) ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত ‘বিদ্যাসুন্দর’ (১৮২৩) এবং (১৩) নিখিল চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা’ (২০১৬) নাটকটি নির্বাচন করেছি। শিবায়ন কাব্য নিয়ে খ্যাত-অখ্যাত অনেক নাট্যকারই নাটক রচনা করেছেন। আমাদের গবেষণা প্রবন্ধের বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ে আমরা শিবায়ন কাব্যের অন্তর্গত (১৪) রাধারমণ ঘোষ রচিত ‘মুচকি মঙ্গল কাব্য’ (২০১০), (১৫) রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী রচিত ‘আজকের দুর্গতিনাশিনী’ (২০১০) ও (১৬) মনোজ মিত্র রচিত ‘শিবের অসাধি’ (২০১৫) নাটক তিনটিকে আলোচনার জন্য নির্বাচন করেছি। মঙ্গল কাব্যের নাট্য পুনর্নির্মাণ বোঝাতে নিম্নের রূপরেখা অনুযায়ী উপরোক্ত ষোলজন নাট্যকার রচিত ষোলটি নাটকের আলোচনা করবো আমরা;

ক। মনসামঙ্গল কাব্য অবলম্বনে রচিত নাট্য পুনর্নির্মাণ-

- ১। মীর মশাররফ হোসেন : ‘বেহুলা গীতাভিনয়’ (১৮৮৯)
- ২। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় : ‘সওদাগরের নৌকা’ (১৯৬৯)
- ৩। শম্ভুমিত্র : ‘চাঁদ বণিকের পালা’ (১৯৭৭)
- ৪। শেখর দেবরায় : ‘মনসাকথা’ (২০০২)
- ৫। উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় : ‘মনসামঙ্গল’ (২০১৮)
- ৬। দেবেশ ঠাকুর : ‘বেহুলা’ (২০১৮)।

খ। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য অবলম্বনে রচিত নাট্য পুনর্নির্মাণ-

- ৭। অতুলকৃষ্ণ মিত্র ; ‘মা’ (১৮৯৫)
- ৮। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : ‘ফুল্লরা’ (১৯২৮)
- ৯। শিশিরকুমার দাস : ‘ভাঁড়ুদত্ত’ (১৯৭৭)
- ১০। রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী : ‘ফুল্লকেতুর পালা’ (২০০০)

গ। ধর্মমঙ্গল কাব্য অবলম্বনে রচিত নাট্য পুনর্নির্মাণ-

১১। উজ্জ্বলকুমার মুখোপাধ্যায় : ‘ধর্মমঙ্গল’ (২০২০)

ঘ। অন্নদামঙ্গল কাব্য অবলম্বনে রচিত নাট্য পুনর্নির্মাণ-

১২। ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : ‘বিদ্যাসুন্দর’ (১৯১৩)

১৩। নিখিল চট্টোপাধ্যায় : ‘অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা’ (২০১৬)

ঙ। শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য অবলম্বনে রচিত নাট্য পুনর্নির্মাণ-

১৪। রাধারমণ ঘোষ : ‘মুচকি মঙ্গল কাব্য’ (২০১০)

১৫। রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী : ‘আজকের দুর্গাতিনাশিনী’ (২০১০)

১৬। মনোজ মিত্র : ‘শিবের অসাধ্য’ (২০১৫)

-এই ধরনের নাটকগুলির মধ্যে কোথাও চরিত্রের পুনর্নির্মাণ, কোথাও কাহিনির বিনির্মাণ, আবার কোথাও-বা আধুনিক সমাজবাস্তবতায় মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিকগত নবনির্মাণও লক্ষ্য করা যায়। অনুসন্ধিৎসু গবেষকের কাছে যা আজও কৌতূহল উদ্বেক করে। সেই আগ্রহবশত আমাদের এই প্রচেষ্টা। নিম্নে উক্ত নাটকগুলির পরিচয় উদ্ধার এবং বিশ্লেষণ করে বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে ;

ক। মনসামঙ্গল কাব্য অবলম্বনে রচিত নাট্য পুনর্নির্মাণ-

১। মীর মশাররফ হোসেন - বেহুলা গীতাভিনয় (১৮৮৯);

মীর মশাররফ হোসেনের ‘বেহুলা গীতাভিনয়’ নাটকটি ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত। মনসামঙ্গল কাব্যের বিষয়কেন্দ্রিক এই নাটকটি ২১ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১৫.৫ সেন্টিমিটার চওড়া। এই নাটকটির প্রচ্ছদপত্র (১), নাম পত্র (১), ভূমিকা পত্র (১), মূল নাটক (৮৯) সহ মোট ৯১টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকটি সাধু সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। নাটকের নামপত্রটি এইরূপ-

“বেহুলা গীতাভিনয়/ মীর মশাররফ হোসেন প্রণীত/ টাঙ্গাইল/ আহমদী
যন্ত্রে/ সাধু সরকার দ্বারা/ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/ ১২৯৬ শাল ৭ই
আশ্বিন।/ মূল্য ৬০ আনা।”

নাটকে উল্লিখিত চরিত্রগুলি হল- চাঁদসওদাগর, সনকা, মনসা, ত্রিগুণা, হনু, বটু, দাড়িগণ, চন্দ্রকেতু, গোঁসাই, লখিন্দর, ভট্টাচার্য, গৌরী, কামিনী, গুণমনি, সায়া বনিক, রামা, বটু, নেতা ধোপানী, মহাদেব ইত্যাদি।

মনসামঙ্গলের কাহিনিকে একালের নাট্যমোদী দর্শকের কাছে উপযুক্ত করে পরিবেশন করেছেন নাট্যকার মীর মশাররফ হোসেন। নাটকের সূচনা করা হয়েছে ব্যক্তিত্বের বিরোধী পরিবেশ রচনা করে। পত্নী সনকার অনার্য দেবী মনসার পূজা-অর্চনা এবং অসন্তুষ্ট চাঁদসওদাগরের ব্যক্তিত্ব ও বাণিজ্যযাত্রার মধ্য দিয়ে নাটকের সূচনা হয়েছে। পত্নীর এই স্বামীবিরোধী মঙ্গলসূচক কাজের ধিক্কার দিয়ে চাঁদ সনকাকে বলেন-

“হায়! হায়! কি লজ্জার কথা। কি ঘৃণার কথা! আমি আজ যাচ্ছি বাণিজ্যে, আমি করেছি শুভ যাত্রা, আমার বাড়ী মনসার পূজা? কি অমঙ্গল! কি অমঙ্গল!! দুঃখের কথা কি আর বলবো; আমি এক পথে- তিনি আর এক পথে।”^২

এতে সনকা কষ্ট পেয়েছেন, স্বামীকে সেই দিন যাত্রা করতে নিষেধ করে বলেছেন - ‘যেয়না যেয়না নাথ তুমি আজি যাইও না।’ কিন্তু কোন বাধাকে গুরুত্ব না দিয়েই চাঁদসওদাগর বাণিজ্যযাত্রা করেন। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ত্রিগুণা ও মনসার কথোপকথনে উঠে এসেছে চাঁদসওদাগরের এই অটুট মনোবলের কথা। মনসা বলেছেন -

“পুত্রশোকে যার মন দমিল না। আহা! একটি নয়, দুটি নয়,
ছয় পুত্রের শোক শেল যাহার হৃদয়ে বিঁধিল না,
তাকে কি আর মানুষ বলা যায়?”^৩

চাঁদসওদাগর যখন মনসাকে কিছুতেই পূজা করতে চাইলেন না, তখন মনসা তাঁর ছয় পুত্রকে যমের দুয়ারে পাঠিয়েছেন। চাঁদের সাতটি ডিঙা সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে দিয়েছেন মনসা। তবুও চাঁদসওদাগর মনসার পূজা করেননি। তখন মনসা চাঁদসওদাগরের বাণিজ্যযাত্রা লণ্ডভণ্ড করার জন্য হনুমানকে কাজে লাগিয়েছেন, বহু ক্ষয়-ক্ষতির পরেও চাঁদসওদাগর বেপরোয়া ভাবে বলেছেন -

“ভয় কি? গেছে সাত ডিঙ্গে চিন্তা কি? প্রাণ থাকতে ভাবনা কি? দৈব
বিপদে আর দুঃখ কি? স্থির হও, স্থির হও, সকলই পাওয়া যাবে,”^৪

এই উক্তিতে চাঁদসওদাগরের চারিত্রিক কঠোরতা যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি মঙ্গলকাব্যের পুনর্নির্মিত চরিত্ররূপে চাঁদ চরিত্র স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চাঁদসওদাগর মুসলমান মাঝিদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন ‘আল্লার’ নাম করে। এই ঘটনায় চাঁদের ধর্ম-নিরপেক্ষ মানসিকতাও প্রকাশ পেয়েছে। চাঁদসওদাগরকে নাট্যকার এখানে আধুনিক ধর্ম-নিরপেক্ষ সাম্যবাদী মানুষ করে তুলেছেন। চাঁদসহ সকল মাঝিরা দেশে ফেরার আশা করেছে অজানা সমুদ্রপারে

দাঁড়িয়ে। আবার চাঁদসওদাগর যখন তাঁর পরিচিত বন্ধু চন্দ্রকেতুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন, তখন সেখানে মনসা পূজার বাজনা শুনে তিনি বিচলিত হয়েছেন। বন্ধু চন্দ্রকেতুকে ত্যাগ করে যাওয়ার সময় চাঁদ বলেছেন –

“শুনিতে চাহি না বল না রে আর।/ চলিলাম ওরে ভাই
নমস্কার।।/ যার কোপে পড়ে হারাইয়া ধন। / লইয়া ছিলাম
তোমার স্মরণ।।/ যে নামে আমার দেহ জ্বলে যায়। / তুমি তার
ভক্ত মরি হয় হয়।। / শোক সেল বুকে হানিল যে জন। / তারি
নাম হেথা শুনিব এখন।।”^৫

কাহিনি-পালায় গোঁসাইদাস ঠাকুরের প্রবেশ ঘটে। চন্দ্রকেতু যখন চাঁদ সওদাগরের উন্মত্ত অবস্থা দেখে বিচলিত হন, তখন গোঁসাই ঠাকুর বাউলের সুরে গোপীযন্ত্র বাজিয়ে পুরাণের উপদেশবাণী শুনিয়েছেন-

“নল রাজার অভাব কি ছিল, তবে-

কি দোষে হারায় রাজ্য, দময়ন্তী-

হারাল- কোথা রাম হবে রাজা-

মানবে প্রজা, সেই ক্ষণে বনে গমন।”^৬

তাঁর গানে উঠে এসেছে মহাভারত, রামায়ণের নানা প্রসঙ্গ, যা মঙ্গলকাব্যভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হলেও এখানে কৌশলে নাট্যকার সন্নিবেশ করে দর্শকের মনোরঞ্জন করেছেন। এটি অভিনব নাট্যকৌশলও বটে। একসময় বনের মধ্যে চাঁদ রাস্তা হারিয়ে ফেললে দুইজন ব্যাধের হাতে মার-ধোর খান, এক প্রকার প্রাণ যাওয়ার অবস্থা হয় তাঁর। কিন্তু দু'জন কাঠুরে তাঁকে লোকালয়ে নিয়ে আসে। সমাজে যে মন্দ-ভালো দুই জাতীয় লোকই আছে এ যেন তারই আভাস। মীর মশাররফ হোসেন এমনিতে বিখ্যাত উপন্যাসিক। তাঁর উপন্যাস পড়তে পড়তে সমাজ বাস্তবতার এমন চিত্রই দেখতে পাওয়া যায় বার বার। কিন্তু নাট্যকার হিসাবেও তিনি যে সমাজ বাস্তবতার কথা, লোকশিক্ষার কথা মাথায় রেখেছেন, এই ঘটনা তার প্রমাণ দেয়। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে সনকা ও লখিন্দরের কথোপকথন এবং বটুর চম্পক নগরে উপস্থিত হওয়ার প্রসঙ্গ আছে। সনকাকে সে জানিয়েছে চাঁদসওদাগরসহ মাঝি-মল্লারা সকল বেঁচে আছে। এরপর চম্পক নগরে চাঁদের আগমন ঘটে। নিজের দুরাবস্থার কথা ও পোশাক-পরিচ্ছদের কথা চিন্তা করে কলা বাগানের পথ ধরে চাঁদ নিজের গৃহে প্রবেশ করতে গেলে বাড়ীর চাকর-বাকর তাঁকে চোর বলে আটক করে এবং পরে চিনতে পেরে সনকাসহ সকলেই আশ্চর্য হন।

নাটকের চতুর্থ অঙ্কে সনকা চাঁদকে অনুরোধ করেন মনসার পূজা করার জন্যে। সনকার কথা শুনে চাঁদ মহারোষে ফেটে পড়েন। তিনি পত্নীকে বলেন-

“যা তোমাদের ইচ্ছে হয় কর। আমি আমার পথ দেখি, তুমি তোমার আদরের পূজা নিয়ে থাক। যদিকে আমার চক্ষু যায়, মন চলে, আমি সেই দিকে যাই। তোমার ছেলে, তোমার বাড়ী, তোমার পূজা, সবই রৈল, আমার জন্যে আর দুঃখ কি?”^৭

লখিন্দর বাবাকে শান্ত করার জন্য বলেন যে তাঁরা আর মনসার পূজা করবেন না। ইতিমধ্যে শুরু হয় লখিন্দরের বিবাহের প্রস্তুতি এবং খুঁজে পাওয়া যায় নিছনি নগরের ছায়া বনিকের কন্যা বেহলাকে। চূড়ামণি ঘটক যখন বেহলাকে পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন বেহলা রামায়ণ, মহাভারত, দাতাকর্ণের কথা বলেন। তাঁর কথায় উঠে আসে রামায়ণের সীতার প্রসঙ্গ। এখানে পৌরাণিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে লৌকিক জীবনভাবনা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। চাঁদসওদাগরের বাড়ি, বিবাহ উপলক্ষ্যে নানা বাদ্য বাজছে, ভোজনে লোকজন ব্যস্ত। বাসরঘরে বেহলা-লখিন্দরকে ঘিরে প্রতিবেশী স্ত্রীলোকেরা গান-বাজনা করছেন। সেখানে লাঠি হাতে চাঁদের প্রবেশ ঘটলে সকলেই চাঁদকে প্রণাম করেন। চাঁদ বলতে শুরু করেন -“কোন ভয় নাই, আমি জেগে আছি।” এই সকল ব্যবস্থা সত্ত্বেও সনকার মাতৃ হৃদয়ে যন্ত্রণা, ভয় ও সন্তান হারানোর বেদনা বিন্দুমাত্র কমেনি। লোহার বাসরঘরে শেষরাতে বেহলা ও লখিন্দর যখন নিদ্রামগ্ন, তখন ঘরের মেঝে ফাটিয়ে মনসার আবির্ভাব ঘটে। কাহিনিতে নাট্যচমক আনার জন্য নাট্যকার স্বকীয়তার পরিচয় রেখেছেন এইভাবে। মূল মঙ্গলকাব্যের কাহিনি থেকে পৃথক হয়ে নাটকটি অভিনব রূপ লাভ করেছে। বেহলা, লখিন্দরের অপরূপ রূপ-লাবণ্য দেখে মনসা ক্ষণকালের জন্য দ্বিধাস্থিত হয়ে পড়েন। কিন্তু চাঁদের বাক্যবাণে ক্ষুব্ধ হয়ে মনসা কালী নামে বিষধর সর্পকে পাঠিয়ে দেন লখিন্দরকে দংশন করার জন্য। কালফণীর দংশনে লখিন্দরের মৃত্যু হয়। এই সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও চাঁদ ব্যর্থ হন। এই প্রথমবার চাঁদ মৃত লখিন্দরকে বুকে নিয়ে কাঁদতে থাকেন-

“লখিন্দর! বাবা লখিন্দর! (বেগে ছুটিয়া যাইয়া লখিন্দরকে বক্ষে করিয়া)
লোহার ঘরে রেখেও তোকে রাখতে পার্লেম না। লখিন্দর! তোকেও হারালেম। হায়! হায়! আমার সকলই বিফল হলো।... প্রাণের প্রাণ বাছা!
আমায় তুই আজ কাঁদালি।”^৮

নাট্যকার চাঁদ চরিত্রে পৌরুষের পাশাপাশি পিতৃহৃদয়ের কোমলতাও দান করেছেন। নিজের পরিশ্রম, অধ্যাবসায় আর অদম্য ইচ্ছার বলে চাঁদসওদাগর সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন এবং ধন-সম্পদের অধিকারী হয়েছেন। কিন্তু অনার্য নারীদেবতা মনসার রোষে তাঁর সব কিছু পরাভূত হতে বসেছে। ছয়-ছয়টি পুত্রের মৃত্যু, সপ্ত ডিঙ্গার গঙ্গাপ্রাপ্তি, নিজের অপমান সব কিছুই তিনি অদম্য মনোবলে সহ্য করলেন। কিন্তু তাঁর শেষ সম্বল লখিন্দরের মৃত্যু তাঁর পিতৃসত্তার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার দ্বন্দ্ব তৈরী করেছে, যে দ্বন্দ্ব চাঁদ কিছুটা হলেও পরাভূত হয়েছেন। তাঁর কান্না সে কথারই প্রমাণ দেয়। নাট্যকার অসাধারণ দক্ষতায় চাঁদ চরিত্রের এইরূপ মানবিক দিকটি প্রকাশ করে নাটকটিকে সার্থক পুনর্নির্মাণ করে তুলেছেন। এরপর বেহুলা কলার ভেলায় মৃত লখিন্দরের দেহ নিয়ে যাত্রা করেছেন, এখানে নাট্যকাহিনির আর একটি আধুনিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় উঠে এসেছে। বেহুলার মনে একমাত্র আশা-

“এই মরা পতি যদি আমি জিয়াইতে পারি।

সার্থক জীবন হবে জগতে জনম নারী।।”^৯

জলপথের শত দুঃখ কষ্ট অতিক্রম করে বেহুলা স্বর্গের রাজসভায় উপস্থিত হন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের প্রভৃতি দেবগণের করুণায় এবং মনসার আশীর্বাদে বেহুলা স্বামীর প্রাণ ফিরে পান। বেহুলাকে মনসা আশীর্বাদ দিয়ে বলেন-

“আশীর্বাদ করি তুমি আজীবন/ পতিসুখে সুখি থাক।

নখিন্দরের ঔরসে তোমার সন্তান সন্ততি হক্,/

চিরকাল তোমার সিঁতের সিঁদুর বজায় থাকুক।”^{১০}

এখানে নাট্যকার বাংলাদেশের আপামোর সাধারণ মানুষের মনের কথাকে মনসার মুখে বসিয়েছেন। বাঙালি পত্নীরা আজও বিধবা হওয়ার কথা ভাবতে পারেন না। বিধবা হওয়াটা নিজেদের বড় দুর্ভাগ্য বলে মনে করেন। আর বক্ষ্যা হওয়া তার থেকেও যন্ত্রণার। ফলে মনসার বেহুলাকে আশীর্বাদ যেন চিরন্তন বাঙালি নারীর মনের একান্ত বাসনারই বহিঃপ্রকাশ। আর সেইখানেই নাট্যকারের সিদ্ধি। নাট্য পরিশিষ্টে চাঁদ সওদাগরের বাড়ীতে সকল সন্তানের উপস্থিতি এবং মিলনপর্ব দেখানো হয়েছে। নাটকটি মঙ্গলকাব্যধারার হলেও তা আধুনিক জীবন চেতনাধর্মী; একেবারে একালের ভাব-ভাষার নাটক। মঙ্গলকাব্যের পুনর্নির্মাণ হলেও চাঁদসওদাগর চরিত্রের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যকে নাট্যকার বারবার বজায় রাখার জন্য সচেষ্টিত হয়েছেন। নাটকটি যে বেশ জনপ্রিয় ও দর্শকের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

‘বেহুলা গীতাভিনয়’ নাটকের চরিত্রভাবনার মধ্যে নাট্যকার বেহুলাকে একটু বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। বেহুলার কথা নাট্যকাহিনীর দ্বিতীয় পর্যায়ে এলেও নাট্যকাহিনীর মূল সংঘাত সমাপ্ত হয়েছে তাঁরই বুদ্ধিমত্তায়। তাই তাঁর নাম অনুসরণে নাটকটির নামকরণ করেছেন নাট্যকার। চাঁদ-মনসার-সংঘাত আমাদের একালের মানুষের সংঘাতের মতো— একজন নিজের অন্ধবিশ্বাস ও অহংকারের মোহে আচ্ছন্ন; ভালো-মন্দের বিচার-বিবেচনার ধার ধারেন না। অন্যজন নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যে কোনো প্রতিহিংসা ও হননের পথ অবলম্বন করতে দ্বিধাশ্রিত নন। নাট্য কাহিনিতে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির দ্বন্দ্বই দেখানো হয়েছে। সেখানে বেহুলা আর পাঁচটি নারীর মতো অনেক আশা ও শুভকামনা নিয়ে স্বামী ও স্বশ্বরের গৃহে এসেছেন। স্বামীর মৃত্যু তাঁকে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে বাধ্য করেছে। তাঁর সামনে এসেছে জীবন-মৃত্যুর দোলাচলতার হাতছানি। কিন্তু বেহুলা সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও অদম্য উৎসাহে আপন ভাগ্য জয় করে নেওয়ার জন্য লড়াইয়ের কঠিন পথ বেছে নিয়েছেন। তিনি চাঁদের কাছে স্বামীর মৃত দেহটির ভিক্ষা চেয়েছেন —

“এই ভিক্ষা মাগি আমি দেহ মোরে পতি দেহ।/ দিও না ইহাতে বাধা,
কথাটি কও না কেহ।।/ দেখেছি স্বপ্নেতে যাহা আমি তাহাই করিব।/ মরা
পতি কোলে করি, এখনই জলে ভাসিব।।/ ভাসিয়া যাইব জলে যে দিকে
জলের গতি।/ যদি সতী হই তবে অবশ্য বাঁচাব পতি।/ দাঁড়ি মাঝি
নৌকা ডিঙ্গে চাহিনা রে টাকাকড়ি।/ সর্বস্ব ধন কোলে করি যাইব ভেলায়
চড়ি।।”^{১১}

বেহুলা বিশ্বাস করেন যদি লখিন্দরকে কোনোভাবে বাঁচানো সম্ভব হয়, তাহলে সে পথ যতই কঠিন হোক, তাতে তিনি জয়লাভ করবেনই। পরবর্তীসময় নেতা ধোপানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং দেবসভায় বেহুলার উপস্থিতি হওয়া— কিছুটা অলৌকিক ভাবনাজাত হলেও ধারাবাহিক নাট্যকাহিনিতে বেশ মানানসই হয়েছে। মনসার কাছে বেহুলার করুণ প্রার্থনা আজও আমাদের অন্তরকে ব্যথিত করে। মনসার পা ধরে বেহুলা অনুনয় করে বলেন—

“আমি ভিক্ষা চাই। আমি অবলা অসহায়া পতিহারা বালিকা,—ভিক্ষা/ চাই।
ছ’মাস অনাহারে—অনিদ্রায়, মরা কোলে করে জলে ভেসে/ বেড়াচ্ছি।
সকল দেবদেবীর চরণে দুখিনির এই প্রার্থনা। আমার/ প্রাণপতির প্রাণ—
আমাকে ভিক্ষাস্বরূপ দান করুন।—দোহাই/ আপনাদের। হতভাগিনীর
প্রতি দয়া করে—আমার পতিকে জীবিত/ করুন। এই ভিক্ষা মাগি। মা!

মনসা! ওমা বিষহরী! রক্ষা কর/ মা!—ক্ষমা কর মা! তোমার দুখানি চরণ
ধরিতেছি মা—পূর্ব্ব অপরাধ/ ক্ষমা কর। চাঁদ সদাগরের অপরাধ ক্ষমা
কর মা। আমায় বাঁচাও—/তোমার বেহুলাকে বাঁচাও—(মনসার পদ
ধারণ)।”^{১২}

মূল মঙ্গলকাব্যে বেহুলার এমন করুণ প্রার্থনার ইঙ্গিত থাকলেও নাট্যকার এখানে কৌশলে
বেহুলাকে বাঙালি পতিব্রতা, স্বামী-সোহাগিনী নারী করে তুলেছেন। সমাজের মঙ্গলকামনা
ও লোকশিক্ষা দান এর প্রধান উদ্দেশ্য হলেও এই আচরণের জন্য বেহুলার চিরকাল
পতিব্রতা সতী বলে বিখ্যাত হয়ে আছেন। দেবসভায় স্বামীর প্রাণ ভিক্ষার জন্য বেহুলার
ব্যাকুল প্রার্থনা তাঁর সতীত্বেরই প্রমাণ দেয়। অন্যদিকে নাট্যকার কৌশলে নাট্যদ্বন্দ্ব
করণরস প্রকাশ করে দর্শকের মনোরঞ্জন করেছেন। বেহুলাকে সতীনারী ও
পতিব্রতানারী রূপে দর্শকের কাছে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তবে দেবী মনসার কাছ থেকে
স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা পেয়ে, পরবর্তী সময় তিনি ভুলে যাননি নিজের কর্তব্যের বিষয়টি।
চাঁদকে অনুরোধ করে মনসা পূজার প্রচলন করেছেন বণিক সমাজে। এইভাবে
কাহিনিধারার আবর্তে বেহুলা চিরকালের মানুষের দরবারে সতীত্বের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত
হয়েছেন। শ্বশুর চাঁদ চরিত্রটিরও পরিবর্তন হয়েছে, মনসাও একসময় তাঁর কুটিলরূপ
ত্যাগ করে বরদাত্রী জননীরূপে পরিচিত হয়েছেন। সনকা, লখিন্দর, দেবগণ,
চম্পকনগরের সাধারণ বেণেসমাজ— সকলেই নাটকটির পরিবেশ রচনায় ও পরিমণ্ডল
সৃজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এইভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কাহিনি, চরিত্র,
সংলাপ বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারব চিরপ্রচলিত মনসামঙ্গলের কাহিনি
পুনর্নির্মিত ও বিনির্মিত হয়েছে ‘বেহুলা গীতাভিনয়’ নাটকে।

২। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় - ‘সওদাগরের নৌকা’ (১৯৬৯) ;

মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনি অবলম্বনে ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয় একটি বিখ্যাত
নাটক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সওদাগরের নৌকা’। ২১.৫ সেন্টিমিটার লম্বা, ১৩.৫
সেন্টিমিটার চাওড়া এই নাটকটির প্রচ্ছদপত্র (১), উৎসর্গপত্র (১), নিবেদন অংশ (১),
চরিত্রলিপি (১), মূল নাটক (২৮) সহ মোট ৩২টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি
এইরূপ-

“সওদাগরের নৌকা/ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়”^{১৩}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ -

“সওদাগরের নৌকা/ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়/ ভারতী বুক
এজেন্সী/ ৬৬/ ৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা- ৯।”^{১৪}

নাটকের প্রচ্ছদে একটি পালের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। প্রচ্ছদ তৈরিতে কালো ও খয়েরি রঙের সমাহার রয়েছে। চলচিত্র পরিচালক শ্রীযুক্ত তপন সিংহকে নাটকটি উৎসর্গ করা হয়েছে। নাটকটির মূল্য ষাট টাকা। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় ‘নিবেদন অংশে’ নাট্যকার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন -

“আমি তবু এ পর্যন্ত বিদেশী নাটক অনুবাদ করেছি, রূপান্তর করেছি কিন্তু মৌলিক নাট্যরচনার পাট সেই যে ছেলেবেলায় চুকেছে তারপর এখন চেষ্টা করলে তার অবস্থা কী দাঁড়ায় এই বইটি নিজের কাছে তার একটি হিসেবের মতো। এটি কোথাও যে ছাপা হবে, বই হবে এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের ছাড়া আর কারো ভালো লাগবে একথা ভাবি নি। ‘বহুরূপী’ ত্রিমাসিকে এটি বেরিয়েছিল, অনেকের ভালো লেগেছিল এজন্যে তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ওই বিশিষ্ট পত্রিকায় মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণের জন্যে শ্রীদেবতোষ ঘোষের কাছে আমি ঋণী। সওদাগরের নৌকা ‘নান্দীকার’ কোনোদিন অভিনয় করবে এ সুবাদে এখনও পর্যন্ত নাটকটি আটকে আছে। হঠাৎ শ্রীশ্যামল ঘোষ এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে চেয়েছেন এবং তার দাবী এতই জোরালো যে আমি প্রায় বাধ্য হয়ে নাটকটি তাঁকে দিয়ে দিলাম। এটির যে একটি সুদৃশ মলাট থাকবে এবং বই- বই চেহারা হবে সে সব কিছুর জন্যে তিনিই দায়ী। তাঁর ভালোবাসা আমার আজীবন স্মরণে থাকবে।”^{১৫}

নাট্যকারের স্বীকারোক্তি থেকেই একথা স্পষ্ট হয় যে, মৌলিক নাট্য রচনার নিতান্ত প্রয়াস থেকে ‘সওদাগরের নৌকা’ নাটকটি রচিত। সেকালের বিখ্যাত নাট্যপত্রিকায় নাটকটি যে শুধু প্রকাশিত হয়নি তা নয়, নাটকটি যে বেশ খ্যাতিলাভ করেছিল তা উপরোক্ত স্বীকারোক্তি থেকে প্রমাণ মেলে। হয়তো সেই প্রয়োজনের তাগিদেই নাটকটির গ্রন্থরূপ আমার পেয়েছি। নাটকে উল্লেখিত চরিত্রগুলি হল- প্রসন্ন, সতী, কালো, আশা, হরিসাধন, মাধব গড়াই, কালীকৃষ্ণ। সম্পাদক কৌশিক রায় চৌধুরীর সম্পাদনায় নাটকটি প্রকাশিত হয় ভারতী বুক এজেন্সী, ৬৬/৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা- ৯ থেকে।

‘সওদাগরের নৌকা’ নাটকটি একেবারে আধুনিক। নামকরণ এবং নাট্যমধ্যে লখিন্দরের বিয়ের বাজনা, সাপুরের বাঁশি ও ‘সওদাগর নৌকা ভাসাও’- এইটুকু প্রসঙ্গ ছাড়া মনসা মঙ্গলকাব্যের অনুসঙ্গ আর কোথাও স্বচ্ছভাবে নেই। নাট্যকার পৌরাণিক চাঁদের অদম্য সাহস ও ইচ্ছাশক্তিকে অবিচলিতভাবে দেখাতে চেয়েছেন একালের মানুষ প্রসঙ্গের মধ্যে। প্রসঙ্গের স্ত্রী সতী একেবারে সনকার প্রতিকল্প, স্বামী ও সন্তান যেন তার প্রাণ। কালো প্রসঙ্গের একমাত্র সন্তান, কারখানার শ্রমিক। তাকে আঁকা হয়েছে লখিন্দরের মতো করে। আশার সঙ্গে কালোর বিবাহের প্রসঙ্গ থাকলেও তাদের বিবাহ হয়নি। এমনকি আশা বেহুলার মতো নারী নয়। হয়- নয়ের বৈচিত্র্যে চরিত্রগুলি একালের মানুষ হয়ে উঠেছে, পুরোপুরি মঙ্গলকাব্যের মতো হয়ে উঠেনি। তবে সেই ভাবাদর্শে জারিত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নাটকটির কাহিনিধারা যেহেতু যাত্রাপালার উপর প্রতিষ্ঠিত, সেহেতু মনসামঙ্গলের চাঁদ, বেহুলার প্রসঙ্গ এসেছে নানা পরিস্থিতিতে। প্রসঙ্গ যাত্রাপালায় নানা চরিত্রে অভিনয় করে, কখনো কখনো চাঁদ সওদাগরের ভূমিকা নেয়। সেই অভিনয়ে সে মনে-প্রাণে সওদাগর হয়ে উঠে। চাঁদের মতোই সে আধুনিক সমাজের সমস্ত আঘাতকে অতিক্রম করে যেতে চায়। সে জীবনকে বোঝে, গভীরভাবে জীবনকে অনুভব করে। পত্নী সতীকে নিজের ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করে নেয়। তার বন্ধু সহ অভিনেতা হরি সাধনকে সে ভালোবাসে। তাকে ‘বেউলো’ (বেহুলা) বলে ডাকে। যাত্রাই যেন তার জীবনের সব। প্রবহমান নদীর মতো সমস্ত বাধা অতিক্রম করে প্রসঙ্গ এগিয়ে যায় জীবনের অন্তিমপর্বে; যেমন চাঁদ সওদাগর নতুনভাবে নৌকা ভাসান। একালের মানুষ সেকালের মানুষের আদর্শে, আশা-ভরসায়, ভাবনায় অঙ্কিত হয়ে এই নাটকে পুনর্নির্মিত হয়ে উঠেছে।

নাট্যপটভূমির সূচনায় দেখানো হয়েছে নিম্ন-মধ্যবিত্তের ঘর, প্রসঙ্গ ও পত্নী সতীর কথোপকথন-

- “প্রসঙ্গ । শুনেছো, ও কালোর মা- এ যে দরজাটা যে ঢুকতে দেয় না গো। শুনেছো, ও কালোর মা!
- সতী । এসো, মাথাটা নিচু করো।.... এই যে বোসো।
- প্রসঙ্গ । মাথা নিচু করলে বড়ো লাগে। চাঁদ সদাগর কি না মাথা নিচুকরে নি।.... কই ভোরবেলায় আজকে আমাকে খেতে দিলে না তো?

সতী । এই যে উনুনে আঁচ দিলুম এই মাত্র ।
রাতের রুটি আছে । গরম করে দিই-চায়ে ডুবিয়ে
ডুবিয়ে খেয়ো ।”^{১৬}

এই কথোপকথনে উঠে আসে চাঁদের প্রসঙ্গ । বাড়িতে আসে একমাত্র ছেলের ভাবী বউ
আশা । প্রসঙ্গ চিন্তা জীবনের শেষ পর্বের প্রতি । প্রসঙ্গ আশাকে অনুরোধ করে বলে -

“তুমি ভালো ক’রে বোলো । ও শুনবে । জোয়ান ছেলেরা জোয়ান মেয়েদের
কথা ঠেলতে পারে না । তুমি বুঝিয়ে বোলো, আমি ওর বাবা, বুড়ো মানুষ,
ওর মায়ের কত বয়েস হয়েছে, ওই একবস্ত্রে সংসারটার জন্যে দিন-রাত
খাটছে সে তো ওই কালোরই সুখের জন্যে, তাই না?”^{১৭}

যাত্রা প্রসঙ্গ প্রাণ । কিন্তু একমাত্র সন্তান কালোর অবজ্ঞা, অপমান সে কিছুতেই মেনে
নিতে পারে না । তাই প্রসঙ্গ আশাকে বোঝানোর জন্যে অনুরোধ করে -

“এক্ষুণি কালো আসবে । ও তো তোমাকে পছন্দ করে । যদি দ্যাখে,
তোমার সঙ্গে কথা বলছি তবে হয়তো আমাকেও ওর ভালো লাগবে, তবে
হয়তো সকাল বেলায় গালিগালাজ করবে না । জানো, ও আমাকে সময়
সময় লাগি মারে । আমাকে বলে পাগল । আমি বলি, কালো, আমি ম্যাট্রিক
পর্যন্ত পড়েছি! আরো কত বই পড়েছি আমি, ইংরেজি জানি । যদি রঙে
এই পাগলামির নেশা না থাকতো রে, তবে আমাকে তো সমীহ ক’রে কথা
বলতো লোকে- বোলো মা, বলতো না ?”^{১৮}

এদিকে কালোর কাছে বাবার অভিনয় বড় নয়, টাকার মূল্য অনেক বেশি । আশাকে
কালো সেই প্রসঙ্গে বলেছে-

“তা ভালো, যদি আসো তো গলার মালা করে রাখবো ।.. জীবনে
কোনোদিন সুখ পেলুম না । লেখাপড়া করলুম না! কী বংশের ছেলে, কী
কাজ করছি! লোকে বলে গায়ে খাটনিতে আবার অসন্মান কি? সন্মান তো
টাকায় । তাই যদি হবে তো যারা গায়ে খাটে তাঁদের টাকাগুলো কোন্
কানাগলিতে বেপাভা হয়ে যায়? জানো, দুনিয়ায় যদি বাদর-নাচিয়ে
সবচেয়ে বেশি টাকা রোজকার করা যেতো তো বাঁদর- নাচানোই হতো
সবচেয়ে সন্মানের কাজ ।”^{১৯}

একসময় প্রসন্ন নিজেকে পাগল বলে মনে করেছে, যেমন চাঁদ সওদাগর সমস্ত কিছু সমুদ্রে হারিয়ে উন্মাদের মতো পথে পথে ঘুরে বেরিয়েছেন। আশার বিয়ের ব্যাপারে যখন প্রসন্ন ভিন্ন মত দেয়, তখন সতী ও কালো তার উপর প্রচণ্ড রেগে যায়। প্রসন্ন বলে—

“জানিস কালো, তোর মা ভাবে আমি পাগল। যেন বিন্খোয়ালে বলেছি কথাটা। বিয়ে করলে তুই কি আর দেখবি আমাদের? পরের ঘরের মেয়েকে বৌ করে এনে তোর মা চৌপার খুশিতে ডগমগ করুক না- আমি কই বুঝি নে, বিয়ের পরে তুই আর খেতে পরতে দিবি না আমাদের।.... মনে হচ্ছে আমি স্বার্থপর, না?”^{২০}

কালো বাবার উপর ঝাঁপিয়ে পরে, তাকে মারে এবং বলে- ‘আমি তোমাকে খুন করবো’। সতী তাকে বাধা দেয়। হরিসাধনের উপস্থিতিতে নাট্যপালার পট পরিবর্তন হয়। মনসা পালার বেহুলা চরিত্রে অভিনয় করে এই হরিসাধন। প্রসন্নের অতি প্রিয়জন হরিসাধন। সংসারের কষ্ট, প্রিয়জনের কাছ থেকে শারীরিক আঘাত পাওয়ার পরও তার মনের জোর, যাত্রায় চাঁদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বিন্দুমাত্র কমেনি। হরিসাধন যখন প্রসন্নকে জিজ্ঞাসা করে তাকে সনকা চরিত্রে মানায় কিনা, তখন প্রসন্ন উত্তর দেয়—

“সনকা? বেহুলা মানায় তোমাকে।... সব পুরুষই তো অন্তরের একাংশে নারী, যেমন সব নারীই অন্তরের একাংশে পুরুষ। শুধুমাত্র আপন শরীরে সন্তানকে লালন করে বলেই কি মাতৃত্ব? তাহলে যে নারী কোনোদিন সন্তানের জন্ম দেয় নি সে কেন মাতৃত্বের প্রতিমূর্তি হয়ে দেখা দিতো সংসারে? তোমাকে মানায়, সত্যি বলছি, এখনো মানায়।”^{২১}

মাধব গড়াইয়ের হাত ধরে প্রসন্ন ও হরিসাধন আবার চলে যায় পুরাতন যাত্রার পথে; চাঁদ সওদাগর ও বেহুলা সাজার লক্ষ্যে।

নাট্য কাহিনির দ্বিতীয় পর্বে প্রসন্নই চাঁদ সওদাগর। সে অনন্ত জীবনস্রোতে পাড়ি জমায়। সওদাগরের ভাবনা তার দৃষ্টিতে, নৌকা তার সত্তায়। সমুদ্র চলমানতার প্রতীক। চাঁদ সওদাগর সেখানকার অংশ। যাত্রা পালার দর্শক সমুদ্র রূপের মতো, প্রসন্ন সেখানে তার অভিনয়ের তরী ভাসায়, তাদের মুগ্ধ করে, সেই টানেই ঘর ছাড়ে। যাত্রার টানে প্রসন্ন বৃদ্ধ বয়সেও ঘর ছেড়েছে, দু’দিন হয়ে গেছে, আজও ফেরেনি। পত্নী সতী তীব্র ব্যাকুলতায় পথ চেয়ে আছে। যেমন চাঁদের পত্নী সনকা লখিন্দরকে বুকে আগলে পথ চেয়েছিলেন। সতীর মনে প্রসন্নের জন্য মঙ্গল-অমঙ্গল চিন্তা বারংবার বাসা বাঁধে। আশা এসে তাকে সান্ত্বনা দেয়। একমাত্র ছেলে কালো পিতার গায়ে হাত তোলার জন্য

অনুশোচনায় জর্জরিত হয়। তাই বাবা প্রসন্ন দুদিন পর ফিরে এলে কালো তার কাছে ক্ষমা চায়-

“বাবা, আমাকে তুমি মাপ করো। আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, আমি যা করেছি অন্যায় করেছি, পাপ করেছি, পাপ করেছি বাবা, আমাকে ক্ষমা করো।”^{২২}

এরপর প্রসন্ন বাড়ি আসে, যেমন ফিরে এসেছিল চাঁদসওদাগর সমস্ত কিছু হারিয়ে। প্রসন্নের সঙ্গে কথা হয় সতীর, কালোর এবং আশার। আশাকে প্রসন্ন বিরাট গাঁয়ের ‘বেহুলা পালার’ অভিনয়ের কথা শোনায়ে। যাত্রাপালার অভিনয় সম্বন্ধে প্রসন্ন বলে-

“সেই কথা আসরে মানুষের মনে মাঠে ঘাটে শিশিরে ঘাসে পাতায় রাতের পাখিদের বাসায় বাসায় জাগর পাহারাওয়ালার চোখের পাতায় শিহর তুললো আচম্কা- ‘সওদাগর, নৌকা ভাসাও’ (সব বাজনাগুলোই এ কথা বলছে) আর সঙ্গে সঙ্গে সাপের বাঁশী বেজে উঠলো, দুলতে লাগলো শঙ্খচূড়ের নাচের তালে হিংস্র ঘর ছাড়ানো সুর। প্রিয়জনেরা বলতে লাগলো- ‘ও লখীন্দরের মা, তোমার স্বামীকে বোঝাও। সাত-সাতটা ছেলে যে তোমার মনসার রোষে মরেছে সপ্ত-ডিঙ্গার মারণলীলায়। ঘরে তোমার সাত- সাতটা পূর্ণযৌবনা পুত্রবধূ। তারা শাঁখা ভেঙ্গে শাদা থানে রুম্ম এলোচুলে তোমার প্রাসাদে ঘুরেছে – ফিরছে মৃত্যুভয়ভীত নীলকণ্ঠ পাখির মতো। আর তুমি এয়োতী, শাঁখা –সিঁদুর পরে তাম্বুলে ঠোঁট রাঙিয়ে চিতার পাশে বসে প্রহর জাগছো, এর চেয়ে বড়ো শাস্তি তোমার কি হতে পারে? সনকা, স্বামীকে বলো, চাঁদকে বোঝাও।”^{২৩}

মনসা চরিত্রকে আশার ভালো লাগে না। সে বলে-

“(মনসা) কেমন জেদী, কেমন ঠাকুর দেবতার মতো না, কেমন যেন মানুষের মতো।”^{২৪}

প্রসন্ন বলে-

“মানুষই যে ভেবেছে মনসাকে। আর সব দেবতার সাবেকি, মনসা যে নতুন ঠাকুর। অন্য দেবতাদের কল্পনা করেছে ব্রাহ্মণ ঋষিরা, মনসাকে যে কল্পনা করেছে লোকের – এই যে দেবতাকে ছল করতে হয়, বল করতে হয়, কৌশল না হলে চলে না- এই যে তার মানুষের মতো ব্যবহার,

দেবতার এই কল্পনাই তো যুগসন্ধিক্ষণে মানুষের নতুন স্বর্গকল্পনা। এ যেন প্রচণ্ড শক্তির মানুষের সঙ্গে অল্পশক্তির মানুষের লড়াই। ফলাফল নিশ্চিত। তবু চাঁদ যখন দেহের শক্তিতে হারেন তখন মনসাও আত্মার শক্তিতে হেরে তার সমান হন। তখন যে হেরেও জেতে তারই জিত।”^{২৫}

এখানে নাট্যপালার প্রাসঙ্গিক আলোচ্য বিষয় হয়েছে মনসামঙ্গল, যা একেবারে মধ্যযুগীয় ভাবনা থেকে উঠে এসেছে। প্রসন্ন চাঁদের মতো নিজের সঙ্গে, মনসারূপী সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে লড়াই করে চলেছে। নিজে শিক্ষার আলো পেলেও সন্তানকে তা থেকে বঞ্চিত করায় সে আত্ম-অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে -

“কালো, আমি তোকে প্রসন্ন মনে ক্ষমা করছি। তোর দোষ নেই রে। দায়ী আমি নিজে। আমি যতটা বিদ্যে আহরণ করতে চেয়েছি, অথচ কাজে লাগাইনি, কিংবা দুঃখ এই যে, আমার যা কাজ আর ক্ষমতা ছিলো এই বিদ্যেকে ব্যবহার করে তা করতে পারি নি বলে তাই- সেই সঞ্চিত পুঞ্জীভূত বিদ্যে আমার নিজের মধ্যে অব্যবহৃত দাহ্যশক্তির মতো অগ্নিক্রিয়া করে আমাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমি সম্পূর্ণ মানুষ, স্বাভাবিক মানুষ থাকতে পারিনি, তাই আমি তোকে দোষ দিই না কালো।”^{২৬}

যাত্রার দরবারে প্রসন্নের ডাক পরে। রয়েল সদানন্দ অপেরার কালীকৃষ্ণ বাবু আসেন তার নতুন অপেরা দল নবযুগে প্রসন্নকে নেওয়ার জন্যে। পত্নী সতী যেতে দিতে চায় না। প্রসন্ন দ্বিধাশ্রিত হয়। কিন্তু তার মন সায় দেয় ‘চাঁদ সদাগর’ পালা হবে শুনে। পত্নী, সন্তান, সংসার সমস্ত বাধা অতিক্রম করে প্রসন্ন কালীকৃষ্ণের নতুন অপেরা দলে যোগ দেয়। সতীকে সান্ত্বনা দিয়ে কালীকৃষ্ণ বাবু বলেন-

“কোন চিন্তা করবেন না বৌদিদি। আমরা দলে এতোগুলো লোক রয়েছে, বিপদে- আপদে সবাই যদি সবাইকে না দেখি, কী ভরসায় ঘরের বাইরে পা বাড়াবো বলুন তো? নিন- আসুন তবে প্রসন্নবাবু... ওহে নটে, সনাতন, যতীন, রামনাথ...রাজী!! এবার তবে সওদাগর নৌকা ভাসাও।”^{২৭}

প্রসন্নরূপ সওদাগরের নৌকা ভাসে জীবন সমুদ্রের ঘাটে ঘাটে। কোথাও নিশ্চিত ভাবে থাকে না, কোন আঘাতে থেমে যায় না। প্রসন্ন সেই ধ্বনি নিজের কর্ণে শুনতে পেয়েছে বার বার-

“বড়ো বৌ, শুনতে পাচ্ছে, ময়ূরপঙ্খী দুলছে? নাগিনীর মতো ঢেউ উঠছে ফুলে ফুলে, পালে দক্ষিণের হাওয়া লেগে সামুদ্রিক জলচরের পেটের মতো উত্তাল হয়ে উঠেছে। আমার চারিদিক থেকে মহতী ধ্বনি বেগবান গান উঠছে প্রকম্পিত হয়ে, সেই আদিমতম পরমতম ঘর ছাড়ার ডাক ‘সওদাগর, নৌকা ভাসাও-’ এখানে হারলেও জিত, জিতলেও জিত।”^{২৮}

নাটকটি আধুনিক জীবন পটভূমিতে লেখা হলেও মঙ্গলকাব্যকেন্দ্রিক নাটক। চাঁদের মতো আধুনিক বুদ্ধিজীবী মানুষও সমস্ত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে টিকে থাকতে চায়। নাট্যকাহিনীতে প্রসন্ন সেই ভূমিকাই পালন করেছে। এইভাবে মধ্যযুগীয় লৌকিকভাবনার নবরূপায়ণ ঘটেছে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সওদাগরের নৌকা’ নাটকটিতে।

‘সওদাগরের নৌকা’ নাটকের চরিত্রগুলি পুরোপুরি একালের সমাজ বাস্তবতা থেকে গ্রহণ করেছেন নাট্যকার। এখানে ‘সওদাগরের নৌকা’ আসলে জীবন সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাওয়ার এক প্রতীকী ভাবনা। মনসামঙ্গল কাব্যের কেন্দ্রীয়চরিত্র চাঁদ সওদাগর যেমন শত আঘাতের পরেও, নানা বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েও মনের জোরে পুনরায় নৌকা ভাসায়, ঠিক তেমনি প্রসন্ন শত দুঃখ-কষ্টের পরেও নতুনভাবে অভিনয় জীবনের পথে পা বারায়। অভিনয় জীবনে প্রসন্ন অনেকদিন চাঁদ সওদাগরের ভূমিকায় অভিনয় করেছে, নিজেকে চাঁদবেণে বলে মনে মনে ভেবেছে, তাতে তার মাথা উঁচু হয়েছে। অভিনয় জগতে সুনামও পেয়েছে এতদিন। দীর্ঘদিনের অভিনয়ের সঙ্গী হরিসাধন মারা গেলে প্রসন্নের অন্তর বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু তারপরেই আবার কালীকৃষ্ণ বাবুর অপেরায় নতুনভাবে অভিনয়ের জন্য এগিয়ে গেছে। প্রসন্নের কাছে জীবনটা যেন রঙ্গমঞ্চ। সেখানে আমরা প্রত্যেকেই নানা রকম অভিনয় করি। নিজেদের নানা রূপে, রঙে সাজিয়ে তুলি, যেন সওদাগরের মতো নতুনভাবে পাড়ি দেওয়ার জন্যে। প্রসন্নের মধ্যে দুঃখ আছে, সে একমাত্র সন্তান কালোকে ভালোভাবে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে বড় করে তুলতে পারেনি। কালো এখন কারখানায় দিনমজুরের কাজ করে। বাবা প্রসন্নের প্রতি তার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধ নেই। তাই একসময় বাবার সঙ্গে অশান্তিতে তার গায়ে হাত তোলে। কালো বাবাকে শাসিয়ে বলে—

“খবরদার বলছি, ছোটোলোক স্বার্থপর কোথাকার—পাগলামি করার জায়গা পাওনি তুমি? ভেবেছ তোমার মতলব আমি কিছু জানি না—(চড় তোলে) না?”^{২৯}

মা চরিত্র সতী কালোর ব্যবহারে দুঃখ পায়, তাকে তিরস্কার করে। একসময় কালো তার নিজের অন্যায় ব্যবহারের জন্যে অনুশোচনায় দগ্ধ হয় এবং বাবার কাছে ক্ষমা চায় নিজের প্রায়শ্চিত্তের জন্য—

“বাবা! তুমি ফেরার পর থেকে তোমাকে প্রণাম করি নি, আমাকে তুমি মাপ করো বাবা, আমি অন্যায় করেছি। তোমাকে এ কথা বলতে আমার লজ্জা করছে, আমি এর আগেও অন্যায় করেছি তোমার ওপরে, এর আগেও ক্ষমা চেয়েছি। তুমি তো আমাকে ভালোবেসেই ক্ষমা করেছো। এবার যে তুমি এই বয়েসে জোর করে রোজগারে বেরিয়ে গেলে, আমি বুঝেছি কত দুঃখ তোমার বুকে জমাট বেঁধে ছিলো। তুমি আমাকে মাপ করো বাবা।”^{৩০}

চাঁদ সওদাগরের নৌকা যেমন বারংবার অজানা সমুদ্রস্রোতে পথে পাড়ি জমায়, ঠিক তেমনি প্রসন্নও সংসার জীবন থেকে রঙ্গমঞ্চের নতুন নতুন ঠিকানায় এগিয়ে চলে, কখনো সওদাগরের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যে, কখনো-বা অন্য কোনো চরিত্রে অভিনয়ের জন্যে। প্রসন্ন এখানে তার নিজের দৃষ্টিতে সওদাগর হয়ে উঠেছে, আর তার পাড়ির সাথি নৌকা যেন তার সত্তায় বিরাজ করেছে। অভিনেতারূপে প্রসন্ন দর্শকের সঙ্গে মিশে যায় এক নিবিড় একাত্মতায়। চাঁদ ও প্রসন্নের নৌকাযাত্রা ও অভিনয়পালা সমান তালে চলতে থাকে মানবজীবন নদীতে। তাই প্রসন্নের উদ্দেশ্যে কালীকৃষ্ণ বাবু বারবার বলেছেন—“সওদাগর, নৌকা ভাসাও- ‘এখানে হারলেও জিত, জিতলেও জিত’। প্রসন্নের অভিনয় জীবনের সঙ্গী হরিসাধন একসময় জীবন সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে বলেছে—

“কিন্তু বড়ো মায়া লাগে ভাই। নিজেকে যত ভালোবাসি ততটা আর কাকেই বা বেসেছি বলো? এত দিন ধরে, এত বছর যে শরীরটাকে সাবান মাখিয়েছি চান করেছি, আয়নায় দেখেছি, জলে- ডাঙায় ছায়া দেখে অবাক হয়ে বয়েস কমিয়ে ভেবেছি, এই কি আমি? এ কে? কোথা থেকে এলাম আমি? কোথায় যাবো? পায়ে একটা নীলরঙের কাঁচ কি খয়েরি রঙের জং ধরা পেরেক ফুটে কয়েকটা ফোঁটা রক্ত মাটিতে কি মেঝেতে পড়তে দেখে মন হয়-হয় করে উঠেছে। রগের কাছে একটা পাকাচুল দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেছে। সেই আমাকে একরাশ কাঠের ওপর চড়িয়ে সারা গায়ে ঘি মাখিয়ে আগুন লাগিয়ে দেবে, আর নদীর বেহাগী

হাওয়ায় এলোমেলো চুল উড়তে উড়তে আমি নিঃসাড়ে পুড়ে যাবো
প্রিয়জনের চোখের মমতার ওপর—একথা ভাবতে আমার খারাপ লাগে।
তখন বুঝি, প্রেম মমতা আর প্রাণ কাকে বলে—”^{৩১}

জীবন সত্যের এমন নির্মোহ, নিরাসক্ত বাস্তব রূপের প্রকাশ হরিসাধন চরিত্রের বক্তব্যের
মধ্য দিয়ে নাট্যকার দর্শকের উদ্দেশ্যে যে বার্তা দিয়েছেন তা আসলে প্রতিটি মানুষের
জীবন দর্শনের সঙ্গে মিলে যায়। এইভাবেই ‘সওদাগরের নৌকা’ নাটকের প্রতিটি চরিত্র
নিজেকে ব্যাখ্যা করেছে নিজে নিজে। তাতে নাটকটি হয়ে উঠেছে আধুনিক জীবনের
অভিজ্ঞতা সংযুক্ত আত্মভাবনা। সনকার মতো সতীও প্রসন্নকে উৎসাহিত করেছে তার
স্বপ্নকে পূরণ করার জন্য; সেখানে তার নিজের একাকিত্বের যন্ত্রণা কখনো বড়ো হয়ে
উঠেনি। প্রসন্নকে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে সতী বলেছে—

“তুমি যাও। কিন্তু আমাকে কাঁদতে মানা করো না। আমি একা থাকবো
না একথা ভেবে তুমি খুশি হও। আমি বর্ষায় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে
থাকবো পুরোনোকালের মতোই, অনেকদিন ধরেই...অনেককাল
ধরেই...অনেক সময় ধরেই...”^{৩২}

যাত্রাদলের অধিকারী চরিত্র মাধব গড়াই, কালীকৃষ্ণ বাবু— এরা সকলেই সওদাগরের
নৌকার মতো প্রসন্নকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সহায়তা করেছে। নাটকে তাদের গুরুত্বও
কম নয়। কম নয় কালোর ভাবী স্ত্রী আশার ভূমিকা। এইসকল মানুষ আমাদের কালের,
আমাদের সমাজের। তাদের ভাবনাচিন্তা, জীবনের স্বপ্ন, বাস্তব জীবনের সংঘাত, সেই
সংঘাতকে অতিক্রম করে যাওয়া— সমস্ত কিছুর মধ্যেই ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের
চাঁদসওদাগরের অদমনীয় পৌরুষের কথা আমাদের বারংবার মনে করিয়ে দেয়। আর
আছে আকর্ষণীয় কিছু সংলাপ, যার জন্যে আধুনিক পাঠক বারংবার নাট্যপালাটি পাঠ
করেন। এই সবকিছু মিলিয়ে অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়ের ‘সওদাগরের নৌকা’ নাটকটি হয়ে
উঠেছে পুরাতন কাব্যের পুনর্নির্মাণ ও নবনির্মাণ।

৩। শম্ভু মিত্র - চাঁদ বণিকের পালা (১৯৭৭) ;

মনসামঙ্গল কাব্য-কাহিনি অবলম্বন করে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে শম্ভু মিত্র লেখেন একটি
বিখ্যাত নাটক ‘চাঁদ বণিকের পালা’। ২১.৫ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১৩ সেন্টিমিটার চওড়া
এই নাটকের প্রচ্ছদপত্র (১), উৎসর্গপত্র (১), ভূমিকা (১), আমার প্রতিবেদন অংশ (১),

লেখক পরিচিতি (১) সহ মূল নাটকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৩। তিনটি পর্বে নাটকটি সম্পূর্ণ।
নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ-

“চাঁদ বণিকের পালা/ শম্ভু মিত্র”^{৩৩}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ-

“চাঁদ বণিকের পালা/ শম্ভু মিত্র/ এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স
প্রাইভেট লিমিটেড/ ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭৩।”^{৩৪}

নাটকের প্রচ্ছদপত্রে একটি পালতোলা নৌকার রঙিন চিত্র অঙ্কিত আছে, সেটি জলের উপর ভাসমান। সাদা, হলুদ ও নীল- এই তিনটি রঙের সমাহারে প্রচ্ছদপত্রটি অঙ্কন করা হয়েছে। নাটকের উল্লিখিত পাত্র-পাত্রীরা হল- চাঁদসদাগর, ভবদেব, নরহরি, করালী, বেনীনন্দন, বল্লভাচার্য, শিবদাস, বনমালী, সনকা, ঘোষক, ন্যাড়া, রমণী, নাবিক, লখিন্দর, সূয়া, লহনা, কেবট, ভৈরব, সূত্রধর, নেতা, লট, ভুলু, তারাপতি, বেহুলা, ভয়িল, বুড়ো ওঝা, ভিড়, মনসা। নাটকটি জনৈক বুলবুলকে উৎসর্গ করা হয়েছে। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭৩ থেকে নাটকটি প্রকাশিত। নাটকটির মূল্য পঁচাত্তর টাকা। ‘আমার প্রতিবেদন’ অংশে শম্ভু মিত্রের কন্যা শাঁওলি মিত্র জানিয়েছেন-

“চাঁদ বণিকের পালা যে নাটক হিসেবে অসাধারণ এক সৃষ্টি- এপিকের তুলনীয় এর ব্যাপ্তি এবং গভীরতা তা সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শতকরা আশিভাগ গুণীজন অনেক পূর্বেই স্বীকার করেছেন।”^{৩৫}

একথা সত্য শম্ভু মিত্রের ‘চাঁদ বণিকের পালা’ একটি স্মরণীয় সৃষ্টি। নাটকটির বিষয়ে পুরাতন ভাবনা থাকলেও মৌলিকতার দাবি রাখে। নাটকটির প্রসঙ্গে সমালোচক অপূর্ব দে সুন্দরভাবে বলেছেন-

“স্বনামধন্য নাট্য ব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্রের ‘চাঁদ বণিকের পালা’ এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। শম্ভু মিত্রের সর্বশেষ এই মৌলিক নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে। ‘বহুরূপী’ পত্রিকায় ‘বটুক’ ছদ্মনামে নাটকটি লেখেন তিনটি পর্বে যথাক্রমে ১৯৬৫, ‘৬৬ এবং ৭৪ সালে। মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ সদাগরের কাহিনিকে আশ্রয় করে এ নাটকের মধ্য দিয়ে শম্ভু মিত্র প্রকাশ করেছেন আধুনিক কালের কিংবা সর্বকালের এক উপাখ্যান। মূল কাহিনির মধ্যে ভাঙচুর ঘটিয়ে দেশ- কাল সম্পর্কে নিজস্ব অভিজ্ঞতা, দর্শন, উপলব্ধি ও অনুভবের এক গভীরতম কাহিনি তিনি আমাদের

শুনিয়েছেন ‘চাঁদ বণিকের পালা’য়। এ পালা নীতিহীনতার বিরুদ্ধে, অজ্ঞানের বিরুদ্ধে, অন্ধকারের বিরুদ্ধে এক সুগভীর প্রতিবাদ।”^{৩৬}

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় শম্ভু মিত্রের এই নাট্যকর্মকে রবীন্দ্রনাথের ধারাবাহিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বলে স্বীকার করেছেন। তাঁর ভাষায় -

“শম্ভু মিত্র পালা বেঁধেছেন- ‘চাঁদ বণিকের পালা’। আর একবার টের পেলাম পশ্চিমের দিকে জানলা যার যটা ইচ্ছা খুলুন - জমিটুকু নিজের হওয়া চাই, ভিটেখানি তুলতে হবে নিজের হাতে- কেননা সেখানে বাস করব আমি এবং আমরা। এ পালায় অন্ধ নেই, দৃশ্য নেই- আছে ‘পর্ব’। এ পালার চরিত্রগুলি আমাদের মুগ্ধ করে না, ভাবায়, বিচার করায়। মূল চরিত্র আমাদের ঘা-খাওয়া হাড়-আলগা, ঢিলে-ঢোলা, হেরো-ভাব ছুঁড়ে ফেলে দিতে বলে। একটা ‘ট্রাজিক সংকল্প’- তার যা grandeur তা সবই আছে চাঁদ বেনের মধ্যে। কিন্তু মিত্র মহাশয়ের বাহাদুরী এইখানে যে, তিনি সব কিছুকে একটা ভারতীয় মাত্রা দিতে পেরেছেন। বলতে কী, বাংলা নাটকের স্বরাজ সাধনার নতুন পালা শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের হাতেই। ‘রাজা’, ‘ডাকঘর’, ‘মুক্তধারা’, ‘রক্তকরবী’ সেই সাধনার পথের এক-একটা নিশানা। বিশেষকে নির্বিশেষ করে তোলা এবং নির্বিশেষকে বিশেষের ফ্রেমে জীবন্ত করে তোলার দুরায়ত্ত সমস্যা রবীন্দ্রনাথের হাতে চ্যালেঞ্জ পেল এইসব পালায়। সুখের বিষয়ে উত্তরাধিকারেও সে চ্যালেঞ্জ উপেক্ষিত হয়নি।”^{৩৭}

শম্ভু মিত্র ‘চাঁদ বণিকের পালা’য় চাঁদের জীবনভাবনাকে তিনটি পর্বে তুলে ধরেছেন। প্রথম পর্বে, পূর্বপুরুষদের বাণিজ্যযাত্রার প্রতি মোহ, চাঁদের বাণিজ্য যাত্রা এবং সমুদ্রের দাপটে সমস্ত সম্পত্তি ও সহকর্মীকে হারিয়ে ফেলার দৃশ্য। দ্বিতীয় পর্বে, সবকিছু হারিয়ে বাধ্য হয়ে কোন মতে দেশে ফেরার ঘটনা। তৃতীয় পর্বে, লখিন্দরকে ঘিরে চাঁদের স্বপ্ন দেখা, পুত্রের মৃত্যুতে স্বপ্নভঙ্গ এবং হৃদয়গত শূন্যতাবোধ অনুভব করা। নাটকটিতে শম্ভু মিত্র চাঁদ সওদাগরের এক ট্রাজিক সংবেদনা ফুটিয়ে তুলেছেন, যা আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ব-সংশয়ে উদ্দীপিত এক অসহায় মানুষের প্রতিভূ হয়ে উঠেছে। চাঁদ যখন ‘চম্পক নগরীর মানুষদের সঙ্গে বাণিজ্য যাত্রার কথা উত্থাপন করেছেন, তখন এক ব্যক্তি লাফিয়ে উঠে বলে- “ভাইরে, আমরা সমুদ্রের বুকে পাড়ি দিবই দিব”। তখন সকলে কোলাহল করে তাকে সমর্থন জানায়। প্রসঙ্গতঃ চাঁদ সওদাগর তাদেরকে উত্তেজিত করে বলেছেন-

“ভাইসব, -এটা কথা মনে রাখা চাই, যে দিনেরেতে বুকে ভরসা রেখো, আমাদের জয় হবেই হবে।... কিন্তুক এটাও যেন ভাই বেভুল না হয়, যে, আমাদের পথে হোল দুরন্তর বাধা। সমাজে, সংসারে, - দেখো, সবায়ো তো আমাদের খালি অপবাদ দিবে।... ভাইরে, আমরা কি সেই নিডরিয়া বাপপিতেমহদের বংশের সন্তান? নাকি আমরা সবাই সব বেজন্মা? ক্ষেত্রজ? প্রাণ দিয়া তারা নিজ-নিজ প্রাণটারে সওদা করেছে- আর আমরা কী করি? (হাঁক দিয়ে বলে) এ চম্পক-নগরীর যতো নিডরিয়া সদাগর ভাই, - সেই সব আত্মার তর্পণ আজ আমাদের কাজ। আমাদের পথ সত্য, চিন্তা সত্য, কর্ম সত্য। আমাদের জয় কেউ ঠেকাতি পারে না।”^{৩৮}

এই সমুদ্র পাড়িতে এক সময় তলিয়ে গেল সপ্তডিঙা। চাঁদ হারালেন তাঁর সঙ্গী-সাথিদের। তখন চাঁদ সর্বহারা একজন পরাজিত মানুষ। যে সঙ্গী-সাথিরা তাঁর সঙ্গে উৎসাহ নিয়ে যাত্রা করেছিল ভিন রাজ্যের উদ্দেশ্যে, স্বপ্ন দেখেছিল ধনসম্পদ বৃদ্ধির, তারা আজ আর কেউ নেই। একথা চাঁদের মনকে শুধু ভারাক্রান্ত করেনি, অপরাধবোধেও নিপীড়িত করেছে। তাই তিনি একাকীত্বের যন্ত্রণা ভোলার চেষ্টা করেছেন।

নাটকের অন্তিম পর্বে চাঁদ উন্মত্ত প্রায়। জরাজীর্ণ মানুষের মতো এখানে সেখানে ঘুরে বেঁচেছেন। ন্যাড়া তাকে আগলে রাখছে। চাঁদ এখানে নিজের অবস্থার কথা স্বীকার করে বলেছেন-

“এই-এই। এই মতো কতো শত আনকা ঘটনা এসে পড়ে জীবনেতে। যেটো ঠিক মনে হয়েছিল, সেটারেই ভুল মনে হয়। তবু তো মানুষ চায় একপথে শেষাবধি যাবে। বড় আলুখালু হয়্যা গেছে ন্যাড়া, সব বড় আলুখালু হয়্যা গেছে।”^{৩৯}

এই পরিপ্রেক্ষিতে শোনা যায় সূত্রধর ও জুড়ির গান, যা নাট্যভাবনাকে জোরাল করে তোলে --

“শিব তারে বাঁচালো না,/ সদুদ্দেশ্যে বাঁচালো না,/ আপন কর্মের প্রতি নিষ্ঠা তারে বাঁচালো না,/ কোথা যে কী ভুল হোল জানে না আবার।/ এইবার কিবা করে চাঁদ সদাগর।”^{৪০}

এরই মধ্যে লখিন্দরের পুনরুজ্জীবনের আশ্বাস নিয়ে বেহুলা ফিরে আসেন। বেহুলা চাঁদকে বলেন-

“ফিরায়ে এনেছি আমি তোমার সন্তানে। (আরো দু-পা এগিয়ে এসে) ফিরায়ে এনেছি আমি তোমার সন্তানে। (হাঁটুগেড়ে বসে) জানি নে তো, পা ছোঁয়ার অধিকার আছে কিনা আর। আমার প্রণাম নেও। (ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে, তারপর মুখ তুলে বলে) সন্তান তোমার মাটিতে পা দেওনের অধিকার পাবে, বেঁচে রবে তোমাদের সাথে, যদি- মনসার পূজা দেও তুমি। এই এট্টা শর্ত আছে। যদি অস্বীকার যাও, সন্তান তোমার ডিঙ্গিতেই মর্যা যাবে। (দু-জনে দু-জনের দিকে একটু তাকিয়ে থাকে) পূজা দিবে কি দিবে না? (আবার একটু চুপ। বেহুলা শ্বশুরের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বলে) বেহুলার আধখানা মন কয়, আমার যা হয় হোক পূজা তুমি দিও না শ্বশুর। যতো কষ্ট কর্যা থাকি আমি- সমস্ত বিফলে যাক, তবু- (মাথা নীচু করে। তারপর মুখ তুলে বলে) সন্তান তো তোমাদের। তোমাদের সাথে রবে, তাই সিদ্ধান্ত তোমার। কও,পূজা দিবে কি দিবে না।”^{৪১}

এখানে বেহুলা শ্বশুরের সত্যনিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধায় নত হয়েছেন। কিন্তু স্বামীকে ফিরে পাবার সিদ্ধান্তে বিচলিত হয়েছেন। কোনটা ঠিক, কোনটা নয়, তা বুঝে উঠতে পারেননি। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ছেড়ে দিয়েছেন শ্বশুরের উপর। তখন চাঁদ বেহুলাকে কথা দিয়েছেন মনসার পূজা করার-

“আমি পূজা দিব। পূজা দিব। জানিনে তো সে মানুষ আছি কিনা। তবু পূজা দিব। (বেহুলাকে ছেড়ে) জীবনের থিক্যা অঙ্ক কষ্যা-কষ্যা শিবাইয়ে পোঁছ্যাতে চাই, সেথা শিবাই মেলে না। আর শিবায়ের থিক্যা অঙ্ক কষ্যা-কষ্যা জীবনে পোঁছ্যাতে চাই, দেখি জীবন মেলে না। তবু উন্মাদ হব না আমি, আমি পূজা দিব। (যেতে গিয়ে একধারে ধাপের উপরে বসে পড়ে) কিন্তুক কী দিয়্যা যে মনসার পূজা হয় তাও তো জানি না। আমি বেলপাতা দিয়্যা পূজা দিব। তাই দিব। শিব, তোর খেলা আমি শেষাবধি খেল্যে যাব, আমি বেলপাতা দিয়্যা মনস্যার পূজা দিব।”^{৪২}

বেহুলার ত্যাগ স্বীকার এবং তাঁর বৈধব্যের যন্ত্রণাকে অস্বীকার করতে না পারায় চাঁদসওদাগর মনসার কাছে নত হয়েছেন। অনমনীয় চাঁদের ব্যক্তিত্ব একসময় পরাজয়ের

অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে। এ পরাজয় ভীৰুতার কাছে নয়, মনসার ভয়ে ভীত হয়ে নয়, এ পরাজয় নিজ যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেচনার কাছে, বেহুলার সতীত্বের কাছে; যা পারে একজন আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন বিচক্ষণ মানুষ। এর ফলে নাটকটিতে একই সঙ্গে চাঁদ ও বেহুলা আধুনিক চরিত্রভাবনায় অলোকিত হয়ে উঠেছে।

আমাদের মনে একটি প্রশ্ন জাগে যে নাট্যকার শম্ভু মিত্র কেন আধুনিক নাটকের বিষয় নির্বাচনে মধ্যযুগীয় সাহিত্যশাখার অন্যতম মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনিকে গ্রহণ করলেন কেন? তার উত্তর অন্বেষণ করা চলে ‘কাকে বলে নাট্যকলা’ গ্রন্থে তাঁরই আলোচনায়। ‘কাকে বলে নাট্যকলা’ গ্রন্থে শম্ভু মিত্র এক জায়গায় বলেছেন যে নাট্যকলার মূল কথা হলো সম্পর্ক। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের সম্পর্ক, আর নিজের সম্পর্ক। এই কথাটাই প্রকাশ পায় নাটকে। ‘চাঁদ বণিকের পালা’ নাটকেও সেই সম্পর্কের দিকটির উপর জোর দেওয়ার জন্য নাট্যকার চাঁদ সওদাগরকে একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র বলে মনে করেছেন। কারণ চাঁদ সাধারণ মানুষের মতো ভীৰু নন, একাধিক সন্তান হারিয়েও সোজা হয়ে দাঁড়াতে জানেন, প্রতিবাদ করতে জানেন। মনসার কুটিল চক্রান্তের কাছে সহজে নতি স্বীকার করেন না। চিন্তা-চেতনা ও বিচার বুদ্ধির বহিঃপ্রকাশ তাঁকে আধুনিক মানুষের সমগোত্রীয় করে তুলেছে। এই সকল দিক লক্ষ্য করে শম্ভু মিত্র তাঁর আধুনিক নাট্যপালার কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে চাঁদ সওদাগরকে নির্বাচন করেছেন। চাঁদ সওদাগর কাল্পনিক চরিত্র হলেও তিনি বাঙালি বণিককুলের প্রতিভূ রূপেই মঙ্গলকাব্যে চিত্রিত। আপামর বাঙালির এই বাণিজ্যিক প্রয়াস তৎকালীন কবিদের কল্পনায় নাটকীয় সংঘাতের ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়েছে। শম্ভু মিত্রের চাঁদ সওদাগরের কাহিনি তারই নমুনা। ‘চাঁদ বণিকের পালা’ নাটকে ঠিক এই ভাবেই সেই সময়ের বাংলার ইতিহাস লেখা হয়েছে, যা শম্ভু মিত্রের কাছে প্রয়োজনীয় আধুনিক নাট্য-আখ্যান বলে গ্রহণীয় হয়েছে।

‘চাঁদ বণিকের পালা’ ভিন্ন স্বাদের আধুনিক নাট্য-আখ্যান, এখানে চরিত্রগুলির ভিন্ন ভিন্ন রূপ আমরা পাই। কখনো পরস্পরবিরোধী, কখনো একে-অপরের প্রতি সহানুভূতিতে ব্যাকুল। চম্পক নগরীর সমুদ্র অভিযাত্রী নাবিকের দল, চাঁদ-সনকা-বেহুলা-লখিন্দর প্রধান বা অপ্রধান প্রতিটি চরিত্র নিজস্ব বাকরীতি ও রক্তমাংসে জীবন্ত। একসময় শম্ভু মিত্রের কণ্ঠস্বরে ও অভিনয়ে নাটকটি আলাদা মাত্রা পেয়েছিল। কারো কারো মতে শম্ভু মিত্রের ‘চাঁদ বণিকের পালা’ অন্ধকারের নাটক। কারণ এখানে অন্ধকারের ভূমিকা চোখে পরার মতো। এ অন্ধকার মধ্যযুগের চম্পক নগরীর অন্ধকার হলেও আসলে সত্তর দশকের বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের ভয়ের অন্ধকারকে মূর্ত করে

তোলার চেষ্টা হয়েছে। এই অন্ধকারের একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়েছেন শম্ভু মিত্রের কন্যা শাঁওলি মিত্র। তিনি বলেছেন যে মানুষের জীবন যতটা তাঁর জানা, তার চেয়ে অনেক বেশি অজানা। এই সামান্য জীবনপর্বে বেঁচে থাকার মধ্যেই রয়েছে সাহস, অহঙ্কার, আকাঙ্ক্ষা, বেদনা। অন্ধকার থেকে আলোয় এগিয়ে যাওয়ার বাসনা বুকে নিয়ে মানুষ এগিয়ে চলে। মানুষের এই পরিণতি একই সঙ্গে মহৎ চিন্তা ও জীবনভাবনার করুণাকে উদ্বেক করে। শাঁওলি মিত্রের এইভাবনা ‘চাঁদ বণিকের পালা’ নাটকের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। নাটকের প্রথমপর্বে গুরুদেব বল্লভ চাঁদকে বলেছেন- ‘সত্য শুধু অন্ধকার, মনসার সর্পিলা অন্ধকার।’ এরপর মনসার বন্দনাগীতিতে এই অন্ধকারের প্রসঙ্গ আসে -

“পাতালবাসিনী মাগো আন্ধার নাগিনী।/ চৌদিকে ছায়াতে ঘোরে
তোমার বাহিনী।/ যুক্তির অতীত তুমি, জ্ঞানের অতীত।/ তমসার
রূপে মাগো, আলোর অতীত।।”^{৪৩}

এই নাটকে মনসা সেই অশুভ অন্ধকারের পটভূমি তৈরি করেছেন। অন্যদিকে চাঁদবেনে সেই অশুভ অন্ধকারের মাঝে আধুনিকতার আলো প্রজ্বলিত করার চেষ্টা করেছেন। ফলে ‘চাঁদ বণিকের পালা’ একালের পুনর্নির্মিত আধুনিক নাট্য-আখ্যান হয়ে উঠেছে।

৪। শেখর দেবরায় – মনসাকথা (২০০২) :

২০০২ খ্রিষ্টাব্দে মনসামঙ্গল কাব্য অবলম্বনে ‘মনসাকথা’ নাটকটি লিখেছেন শিলচর, আসাম সিলেটের বাসিন্দা শেখর দেবরায়। ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১২.৫ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটির প্রচ্ছদপত্র (২), লিপ পের (২), নামপত্র (২), উৎসর্গ পত্র (২), মুখবন্ধ (৩), অনুপ্রাণিত পত্র (১), আমার কথা (২), মঞ্চনির্দেশ (২), মূল নাটক (৪৫), মনসা কথা : প্রথম দেখার অভিজ্ঞতা (৪) সহ মোট ৬৫টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এই রূপ-

“মনসা কথা / শেখর দেবরায়”^{৪৪}

প্রচ্ছদপত্রটি অঙ্কিত হয়েছে সাতটি রঙের সমাহারে। যেখানে লোকশিল্পীর কল্পনায় মনসারূপের একটি পূর্ণ মূর্তি আঁকা রয়েছে; যেটি পশ্চিম আসামের গৌরীপুর অঞ্চলের পূজিতা শোলার তৈরী মনসা মূর্তি। নামপত্রে বলা হয়েছে—

“মনসা কথা/ শেখর দেবরায়/ শিলচর কালচারেল ইউনিট/
রামকৃষ্ণ মিশন রোড/ শিলচর -৭৮৮০০৭/ কাছাড়/ ২০০২”^{৪৫}

শ্রীমতী মিত্রা দেবরায়ের গ্রন্থস্বত্বে শিলচর কালচারেল ইউনিট, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, শিলচর-৭৮৮০০৭, কাছাড় থেকে নাটকটি প্রকাশিত। নাটকটির মূল্য তিরিশ টাকা। নাটকটির উৎসর্গপত্রে বলা হয়েছে—

“দীনবন্ধু মিত্র ও রামকুমার নন্দী মজুমদার/ এর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে।/ ১৮৭২ খ্রিঃ শিলচর সহরে/ এই দুই ব্যক্তিত্বের সম্মিলন বরাক উপত্যকায় আধুনিক নাট্যচর্চার/ গতি ত্বরান্বিত করেছিল।”^{৪৬}

বিখ্যাত রবীন্দ্র-সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্যয়ের কনিষ্ঠ সহোদর অমলেন্দু ভট্টাচার্য ‘মনসা কথা’ নাটকের ‘মুখবন্ধ’ রচনা করতে গিয়ে জানিয়েছেন—

“মনসা কথা” নাটক মনসামঙ্গল কাব্যকে ঐতিহাসিক কাব্য রূপে দেখার চেষ্টা করেছেন শ্রীশেখর দেবরায়। এই বিশ্লেষণ যুক্তিগ্রাহ্য। মনসা নাগমাতা। বাঙলা অভিধানে নাগ ও সর্প একার্থক। কিন্তু ‘শব্দকল্পদ্রুম’এ সর্পের ৫২টি প্রতিশব্দের মধ্যে নাগ শব্দটি নেই। আবার সর্প শব্দের একটি অর্থ স্লেচ্ছ জাতি বিশেষ ; তাঁরা ক্ষত্রিয় ছিলেন। বশিষ্ঠের আদেশে সগর রাজা এঁদের বেদধর্ম বহিষ্কৃত করেন। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, বরাহ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ, কাশ্মীরের নীলমত পুরাণ, জাতক ইত্যাদিতে একাধিক নাগ উপাখ্যান বিদ্যমান। এসব বিবরণে নাগদের মানুষ পরিচিতিই প্রাধান্য পেয়েছে। নৃতাত্ত্বিকেরাও নাগদের প্রাচীন ভারতীয় জনগোষ্ঠী বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁরা ছিলেন সূর্য ও সর্প উপাসক এবং তাঁদের সভ্যতা ছিল জলনির্ভর। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেও নাগদের জল সংলগ্ন বা জল মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসের ইঙ্গিত রয়েছে। নাগদের বাসস্থান পাতালে। পদ্মপুরাণ (পাতাল খণ্ড) এবং ভাগবতের (চতুর্বিংশ অধ্যায়) বর্ণনানুযায়ী পাতাল এক রম্যস্থান। অতল, বিতল, সূতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল— এই সাতটি অধোভুবন একত্রে পাতাল। ‘ঐ জায়গার অধিবাসীরা নানা উপকারী গাছ-গাছড়ার রস, রোগনাশক, আয়ুর্বদ্ধিকারী, পথ্য পান-ভোজন করে বলে তাদের আধিব্যাধি নেই’। অর্জুন নাগলোকে প্রবেশ করে উলুপীর কাছে জানতে চেয়েছেন – ‘কশ্চায়ং সুভগো দেশঃ’ (আদি। ২০৭। ১৭) –এই সুন্দর দেশটির নাম কি? ভাগবতের (প্রথম স্কন্ধ, একাদশ অধ্যায়) দ্বারকা নগরের বর্ণনা

প্রসঙ্গে নাগদের নাগলোক রক্ষণাবেক্ষণের প্রশংসা করা হয়েছে। জাতকেও নাগলোক ‘রমণীয় ভূভাগ’। সেখানে ‘বিতরে শীতল ছায়া তরু নানা জাতি/ মনোহর গন্ধ লয়ে বহে সমীরণ’ (চাম্পেয় জাতক)। আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে নাগদের প্রধান অস্ত্র ছিল বিষ ; আবার বিষ চিকিৎসায়ও তাঁদের দক্ষতা ছিল। মহাভারতে ছদ্মবেশী নাগবালকদের দেওয়া বিষাক্ত ফল ভক্ষণেই পরীক্ষিতের মৃত্যু হয়েছিল, ভাগবতে কালীয় বিষ প্রয়োগে যমুনা সংলগ্ন হ্রদের জল বিষাক্ত করেছিলেন, দুর্যোধনের বিষ প্রয়োগে অচেতন ভীমসেনকে নাগলোকে চিকিৎসা করা হয়েছে। মনসামঙ্গলে চাঁদ সওদাগরের ছয় পুত্রের মৃত্যু (!) হয়েছিল কালকূট মিশ্রিত বিষাক্ত ভাত খেয়ে। কালকূট স্থাবর বিষ, জঙ্গম বিষ নয়। সুশ্রুত সংহিতায় (কল্পস্থান, দ্বিতীয় অধ্যায়) কালকূট, বৎসনাভ, সর্ষপ ইত্যাদি ত্রয়োদশটি কন্দবিষের নাম আছে। মনসাপূজার একটি উপাদান স্নহী বৃক্ষ। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রানুযায়ী স্নহীক্ষীর বিষ ও দুধী-বিষ নাশক।

“মানুষ নাগদের সর্পে রূপান্তরের কারণ মাথায় সর্পফণা ধারণ। নাগপুরুষদের শিরোভূষণে সর্পফণার সংখ্যা ছিল তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদার দ্যোতক। শ্রেণী নির্বিশেষে নাগ রমণীরা মাথায় ধারণ করতেন একটি সর্পফণা। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে (ত্রয়োবিংশ অধ্যায়, আহার্য্যভিনয়) বলা হয়েছে, দিব্যানারীদের মতই নাগিনীদেরও মুক্তামণি লতাদি ভূষণ করণীয়, শুধু তাদের মাথায় থাকবে ফণা- ‘মুক্তাণিলতাপ্রায়ং ফণস্তাসাং তু কেবলম্’।”^{৪৭}

এই প্রেক্ষাপটে মনসাকে নাগ জনগোষ্ঠীর দেবী হিসেবে বিচার করাই অধিকতর সঙ্গত। চাঁদ সওদাগরের সঙ্গে মনসার দ্বন্দ্ব স্বীকৃতি আদায়ের লড়াই। শেখর দেবরায় এভাবেই মনসামঙ্গল কাব্যকে দেখেছেন। অমলেন্দু ভট্টাচার্য আরো জানিয়েছেন-

“মনসাকথা” সম্পর্কিত একটি জরুরী বিষয় নাট্যভাষা। শেখর যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা ভাষাবিজ্ঞান সম্মত কোন উপভাষা নয়, তবে ঔপভাষিক শৈলীটি এখানে আছে। মনসামঙ্গল কাব্য বাঙলার সব অঞ্চলেই প্রচলিত। মূলত নিম্ন বর্ণের মানুষদের মধ্যেই কাব্যটির ব্যাপক জনপ্রিয়তা। এই সাধারণ মানুষদের উপস্থাপনের লক্ষ্যেই অনুসৃত হয়েছে ঔপভাষিক রীতি। বিশেষ কোন একটি উপভাষাকে আশ্রয় করলে অন্য

ঔপভাষিক অঞ্চলে নাটকটি সহজবোধ্য না-ও হতে পারে,- এই আশঙ্কা থেকেই শেখর তৈরী করেছেন নাট্য সংলাপের নিজস্ব ভঙ্গি। যা স্পষ্টতই উপভাষাকে ইঙ্গিত করেছে, অথচ আঞ্চলিক নয়।

“স্রষ্টার কাজ সৃষ্টি করা। শেখর তার ভাবনাকে নাটকে তুলে ধরেছেন। আপনাদের ভালো লাগলেই নাট্যকারের তৃপ্তি।”^{৪৮}

নাটকটি রচনা করতে নাট্যকার শেখর দেবরায়কে যাঁরা উৎসাহিত করেছিলেন, তাঁরা হলেন—

“মুকুন্দদাস ভট্টাচার্য, ড. জহরকান্তি সেন, ড. আনন্দমোহন মোহন্ত, সঞ্জীব দেবলক্ষর, ড. বিশ্বতোষ চৌধুরী, শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার, শ্যামানন্দ চৌধুরী, সুদীপ দেব, রাহুল দাশগুপ্ত, কল্যাণী চৌধুরী, প্রসেনজিৎ নাথ, নমিতা ভট্টাচার্য, কেশব চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ দাস, শান্তনু রায়, জয় বসু, দেবায়ন রায়চৌধুরী, প্রদীপ নাথ, সৌমিত্রশঙ্কর চৌধুরী, কমলেশ ভট্টাচার্য, গোরা চক্রবর্তী, গণনাট্য সংঘ (শিলচর), রূপম (শিলচর থিয়েটার ওয়ার্কশপ, (বদরপুর), কালচারেল ক্যাম্পেন, খোয়াই(ত্রিপুরা), কথাকলি (সিলেট, বাংলাদেশ), প্রসেনিয়াম(সিলেট, বাংলাদেশ)।”^{৪৯}

‘আমার কথা’ অংশে নাট্যকার শেখর দেবরায় জানিয়েছেন—

“একুশ শতকের সূচনা-পর্বে আমরা দেখেছি একদিকে তথ্য-প্রযুক্তির অগ্রগতি ও ভুবনীকরণের এককেন্দ্রিকতা মানবিক মূল্যবোধকে ক্রমশই ক্ষয় করেছে। অন্যদিকে চলছে আত্মানুসন্ধানের প্রয়োজনে নূতন প্রেক্ষিতে ঐতিহ্যের বিচার বিশ্লেষণ। সেলিম আলদীন, রসিদ হারুন (বাংলাদেশ), বিভাস চক্রবর্তী (কলকাতা), রতন থিয়াম, কাহ্নাইলাল, দোরেন্দ্র সিংহ (মণিপুর), হাবিব তানবীর (দিল্লি) প্রমুখ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নাট্যকার-পরিচালকরা এই নূতন ধারার দিশারী। তাঁদের নাটক দেখেছি, বক্তব্যের বলিষ্ঠতা ও উপস্থাপন কৌশলে মুগ্ধ হয়েছি এবং অনুপ্রেরণা পেয়েছি। দূর থেকেই এই নাট্য ব্যক্তিত্বদের জানাচ্ছি শ্রদ্ধা।

“কাছের মানুষ হিসেবে পেয়েছি আমার শিক্ষক ড. উষারঞ্জন ভট্টাচার্য ও ড.অমলেন্দু ভট্টাচার্যের সন্মেল নির্দেশ। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ডীন তথা বাঙলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান

ড. উষারঞ্জন ভট্টাচার্য চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যেও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে আমাকে যে ভাবে উৎসাহিত করেছেন তা চিরকাল আমার পাথেয় হয়ে থাকবে। লোকসংস্কৃতির নিষ্ঠাবান গবেষক ড. অমলেন্দু ভট্টাচার্যের একটি প্রবন্ধই এই নাটকের উৎস। ‘মনসামঙ্গল কাব্য : পুনর্বিচার’ (‘একা এবং কয়েকজন’/ ১৪০৮) শীর্ষক উক্ত প্রবন্ধে প্রচলিত তত্ত্বের বিরোধিতা করে বলা হয়েছে, মনসামঙ্গল কাব্য সর্পদেবীর মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক কাব্য নয়; রচনাকর্মটি নিম্নবর্গের মানুষের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে জয়ী হবার এক সাহিত্যিক দলিল। লেখাটি পড়েই মনে হয়েছিল, চাঁদ সওদাগরের বাম হাতে পূজা নিবেদন সামন্ততান্ত্রিক কৌশল মাত্র! এই চাতুর্য কি মধ্যযুগীয় সাহিত্যের পরিমণ্ডলেই শেষ হয়ে গেছে? নাকি আজও তা বাহমান? এই উত্তর সন্ধানেরই ফসল ‘মনসাকথা’।”^{৫০}

শেখর দেবরায় নাটকটি সম্পর্কে আরো জানিয়েছেন যে মনসামঙ্গল কাব্যের স্মরণীয় কবি ব্যক্তিত্ব বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপলাই, নারায়ণ দেব প্রমুখের কাব্য থেকে প্রাসঙ্গিক নানা উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন তিনি। নাটকের ‘সারি’ গানটি ‘বরাক উপত্যকার বারমাসী গান’ এবং শিবের বন্দনা ও মনসার পূজামন্ত্র নেওয়া হয়েছে যথাক্রমে ‘যজুর্বেদ’ ও ‘দেবীভাগবত’ থেকে। ‘মনসা কথা’ নাটকটির প্রকাশের আগে পাণ্ডুলিপি থাকা অবস্থায় আসাম, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছে। সকলের অনুপ্রেরণায় ও শিলাচর কালচারেল ইউনিটের সহায়তায় নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ‘মঞ্চ-নির্মাণ’ প্রসঙ্গে নাট্যকার যে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, তা হল-

“বঙ্গ-সংস্কৃতির পূর্ব প্রান্তবর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চল বরাক উপত্যকায় মনসামঙ্গল নৃত্য-গীত সহ পরিবেশিত হয়। লৌকিক এই উপস্থাপনার নাম ‘ওঝার গান’। একক অভিনয়ে গায়ন ওঝার বিশেষ পোষাকের আদল অনুসরণ করতে পারেন। বায়েনরা ‘ওঝার গানের’ বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র ‘পাখাজ’ ব্যবহার করলে অভিনয়টি সমৃদ্ধ হবে। মঞ্চের বাম দিকের তৃতীয় উইংস থেকে স্টেজের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত আড়াআড়ি ভাবে একটি ময়ূর পঙ্খী নৌকা। নৌকার উপর সোনালী দণ্ডে বাঁধা রেশমী পতাকা। চাঁদ সওদাগর মাঝে মাঝেই নৌকার উপর দাঁড়িয়ে সংলাপ বলবে। আত্মগরিমামূলক সংলাপের সময় পতাকা পত্পত্প করে উড়বে, আলোয় উদ্ভাসিত হবে।/ মঞ্চের ডানদিকে ছোট একটা বেদী। এই বেদী মূলত মনসার।/ একটি ঘটনা থেকে আর একটি ঘটনার দূরত্ব এবং দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরের মধ্যবর্তী

সময়ের বিরতি, আলো এবং যন্ত্রানুসঙ্গ কি হবে পরিচালক/অভিনেতা নিজেরা নির্ধারণ করবেন।”^{৫১}

নাটকটির কথাবস্তু শুরু হয়েছে শিব, পার্বতী, কৃষ্ণ, মনসার বন্দনাগীতি দিয়ে। সেই আসরে গায়ের কবি সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মনসাকথা শোনার শোনার জন্য। তিনি বলেছেন -

“আসেন গো বাবুমশায়রা, - আপনাগো আইজ একখান কিচ্ছা শুনাই! মা মনসার চরণ বন্দনা করলাম, আপনারা নিশ্চয় বুইজ্যা লইছেন, আমি কোন কিচ্ছার কথা কইবার লইছি। আরে- আপনারা অইলেন মাইন্যজন! মোর কোন ভুলচুক অইলে নিজগুণে ক্ষেমা করবেন গো। তা অইলে শুরু করি।”^{৫২}

তার কথাতেই শোনা যায় চম্পক নগরের চাঁদ সদাগর ও মনসার সংঘাতের কথা। যেহেতু চাঁদ শিবভক্ত, তাই তিনি নীচকুলের দেবী মনসার পূজা করতে চান না। কিন্তু চাঁদের হাতে পূজা না পেলে জগৎ-সংসারে মনসা নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। চাঁদ দৃঢ়তার সঙ্গে নিজ সমাজের সকলকে ডেকে সভা করে জানিয়ে দেন—

“শুইন্যা রাখ। আমি দেবাদিদেব মহাদেবের ভক্ত চান্দ সদাগর- আমার ক্ষ্যামতার সীমানায় বাবা ভোলানাথ ছাড়া আর কারো পূজা-আচ্চা করা নিষেধ। এই কথার খেলাপ কেডা করে একবার দেখতি চাই!”^{৫৩}

সেই সভাতেই বন্ধু লেংগা চাঁদকে জানায় সনকার মনসাপূজার কথা। তাতে চাঁদের অহংকারে আঘাত লাগে। লেংগা বন্ধু চাঁদকে বলে—

“ওই এক পূজাই চম্পকেরে কাঁপাইতেই পারে। অহং বড় খারাপ রিপু রে চান্দ। মোহে অন্ধ অইয়া যদি দৃষ্টি বন্ধ রাখতে অইলে সেই আধার পথেই নাগিনী আইতে পারে। এটাই আমার শেষ কথা! বন্ধু! তবে যাই- বিদায়—”^{৫৪}

প্রচণ্ড ক্ষোভে, দুঃখে চাঁদ বাড়ি ফিরে আসেন এবং মনসার ‘বারা’ হেতালের লাঠি দিয়ে দ্বিখণ্ড করে দেন। পত্নী সনকাকে ধিক্কার দিয়ে বলেন—

“ধিক ধিক রাণী তোর বুদ্ধি নাহি মনে।/ লঘু জাতি কানী পূজা কর কি কারণে।।/ এই কথা হয় যদি জগতে প্রকাশ।/ সম্মান ঘুচিবে মোর হবে জাতি নাশ।।”^{৫৫}

চাঁদ মনসাপূজা বণিক সমাজে নিষিদ্ধ করলে জেলে মাঝিরা দুঃখ পায়; মনসা তাদের পূর্বপুরুষের দেবী, সেই দেবীর অপমান তারা সহ্য করতে চায় না। এদিকে চাঁদ ঢোল পিটিয়ে নগরে নগরে ঘোষণা করান—

“যে জন পদ্মারে পূজে দণ্ড দিব তারে।।/ পথে পথে সাড়া দিয়া বলে
অধিকারী।/ সর্প পাইলে যে না মারে সে আমার বৈরী।।/ এক গুটি সর্প
মারি যে দেয় আমরে।/ হাতে পায়ে তারখাড়া পরাইব তারে।।”^{৫৬}

এখানে চাঁদ চরিত্রে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের দম্ভ প্রকাশ পেয়েছে। ফলে চাঁদের সঙ্গে মনসার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সংঘাত অনিবার্য হয়ে পরেছে। কবি বলেন—

“অহংকারী চান্দ সাধু করে নানা ছল। অধিক পদ্মার সঙ্গে বাধিল
কোন্দল।। রাত্রি দিন গালি পাড়ে কোপ অহংকারে। কোপ মনে বেড়ায়
চান্দ সাপ পাইলে মারে।। রাজ্যের ঠাকুর চান্দ পথে দিল থানা।। চম্পক
নগরের মধ্যে পূজা করল মানা।। মহাদেবের কন্যা পদ্মা সবে করে ভয়।
আপন মুখে গালি পাড়ে যত মুখে লয়।। অভিমানে বলে পদ্মা কি করি
উপায়। লঘুর ভর্ৎসনা আর সহন না যায়।।”^{৫৭}

প্রথম দিকে মনসা চাঁদকে বুঝিয়ে রাজি করতে চেয়েছেন। মনসা বলেছেন—

“চম্পকের সদাগর অইল শিবভক্ত। আর আমি শিব কইন্যা। মাইনষের
মনটাই অইল আসল কথা—মনে যদি কেউ বিবাদের বীজ পুইষ্যা রাখে
তে অইলে কি সুবিরিক্ষির জন্ম হয়? আমার মনে লয়, চান্দ বণিক্য এই
কথাটা জানে না! তাই ভেবেছি আমি তারে বুঝামু, বিবাদটা ঠিক পথ
না!”^{৫৮}

চাঁদ মনসাকে মেনে নিতে পারেন নি। চাঁদকে মনসা নিজের পরিচয় দিলে, চাঁদ মনসাকে ‘চেঙ্গমুড়িকানী’ বলে অপমান করেন, তাতেও মনসা রাগ করেন না। উপরন্তু বুদ্ধিমতী নারীর মতো মনসা শান্তভাবে চাঁদকে যুক্তি দিয়ে বলেছেন—

“চান্দ! তুই আমারে নিত্য দিন গালি দিস্। কিন্তু এখন আমার কথা শোন,
-- ক্যান এইয়েছি আমি তোর কাছে! আমার নাগ পোলাপানেরা – তোর
মাঝিমাঝারা আমার পূজার্চনা করতে চায়, তুই বাঁধা দিস না চান্দ। শোন!
তুই সমাজপতি! এই কথাটা জাইন্যা রাখ, যে যার মত কইরো বড় হতি
পারলে তবেই সমাজের হিত হয়। অন্যের ধর্ম-কর্ম, রীতি-নীতি সব কিছু

মাইন্যা করতি হয়। মনে কুটিলভাব রাইখ্যা যদি মাইনষেরে তুশ্চ তাচ্ছিল্য করিস – তা অইলে সেই সর্বনাশের জালে নিজেই আটকা পড়বি।”^{৫৯}

মনসার কোন যুক্তিই চাঁদ গ্রহণ করেন না। তখন মনসা রাগ করে বলেন যে যাদের জন্য (মাঝিদের) তাঁর এই ধন-সম্পদের প্রাচুর্য, তাদের কথাটা শোনাও জরুরি। যখন সমুদ্রের নোনা জলের উপরে দিনের পর দিন তারা কষ্ট করে হাল ধরে থাকে, ঘাম ঝরায়, তখন তাদের নীচুজাতের মানুষ বলে ঘৃণা হয় না, কিন্তু ডিঙ্গায় তাদের আরাধ্য দেবীর নাম করলে তাঁর মান যায়, এটা অন্যায্য। এর পরেই মনসা খুঁক হন, চাঁদের জেদের কারণে মনসার কোপে তাঁর ছয় পুত্র হারান। কালীদহে সপ্ততরী জলমগ্ন হয়, তবুও তিনি মনসার কাছে মাথা নত করেন না। তিনি তাঁর আত্ম-অহংকারে আঘাত লাগতে দেয় না। মাঝিদের উদ্দেশ্যে মনসা চাঁদের আত্মমর্যাদার লড়াইয়ের প্রসঙ্গে বলেছেন—

“আমার আসল কথাটাই তো তোরা বুঝস নাই– তাইবা যদি আমি সমাজপতিরেই মাইর্যা ফালি তো দুনিয়ার মাইনষে চিরকাল একটা কথাই জানব, চান্দ সদাগর মনসারে মানে নাই বইল্যা মারা পড়েছে। এমনতরো অইলে ঐ সমাজের কাছে আমাগোর জিত অইল কই? আরা বাছারা! যার সঙ্গে লড়াই সেই যদি না থাকে তে অইলে মাইন্যতা আদায় করমু কার কাছ থাইক্যা? বাকি না কইর্যা দেইখ্যা যা!”^{৬০}

এরপর মনসা আরো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কালনাগিনীর ছোবলে লখিন্দরের মৃত্যু ঘটান। বেহুলার কান্নায় বেনেসমাজের মধ্যে চাঁদের প্রতি বিরূপ মনোভাব তৈরী হয়। বেহুলা প্রচণ্ড জেদের সঙ্গে, চাঁদের কথাকে উপেক্ষা করে, মৃত স্বামীকে ভেলায় নিয়ে এগিয়ে চলেন। কবি বলেন—

“আসল কথা তো আপনারা জানেন গো বাবুমশাইরা! মনের জোর আর নিষ্ঠা থাকলি কি না করন যায়! তাই সে কোন দিকে না চাইয়া উজান পানে যাইতেই থাকে। একদিন বেহুলার ভেলা আসি পৌঁছায় তিপুন্নির ঘাটে। এই ঘাটে মা মনসার সহচরী নেতার অধিকার। বেহুলা সজল নয়নে নেতারে তার দুষ্কের কথা জানান দেয়। কইন্যারে দেইখ্যা নেতা বুঝতি পারে– এ মাইর্যা আলাগা জাতের! নেতা বেহুলারে কয়, তুই মোর বহিন ঝি! ডর কিসের, তোরে নিয়া যাইমু বিষহরির কাছে।”^{৬১}

নাটকের এই অংশে নারীবাদী ভাবনা প্রধান হয়ে উঠেছে। এখানে বেহুলা ও মনসা একে অপরের মুখোমুখি। একজনের দাবী মর্ত্যে চাঁদের হাতে পূজা পাওয়া– তা সে যে কোনো

মূল্যেই হোক, অন্যদিকে বেহুলার দাবি মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরে পাওয়া। ফলে এই দুই নারীর মধ্যে বাকযুদ্ধ শুরু হয়। বেহুলা মনসাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন চম্পক নগরের সমাজপতির পৌরুষত্বকে। মনসা নারী বলে, চাঁদ তাঁকে মান্য করতে চান না। সমাজবিধানের নাম করে বেহুলাকেও তিনি বাধা দিয়েছেন, কিন্তু অন্য বধূদের মতো বেহুলা নির্দিধায় তা মেনে নেন নি। বেহুলা আরো বলেছেন—

“মা গো! আইজ আমি আর একা নই, শুনতে পাও না চম্পকের মাইনষের মনের কথা! অশান্তির আগুনে দগ্ধ হতি হতি তারা আর বিবাদ চায় না – সর্ব্বার মনের ভিতর একটাই কথা— এই অনল যেন চিরকালের জন্য নিভি যায়। এই লোকবলের জোরেই আইজ আমি তুমারে বাক্য দিতে সাহস পাইতেছি— তুমি আমার সোয়ামীরে ভালো কইর্যা দ্যাও— তে অইলে আমরা সোয়ামী স্ত্রী মিল্যা তুমার মহিমা প্রচার করে নাগমাতার মাইন্যতা আদায় করব।”^{৬২}

বেহুলার এই সকল কথা শুনে মনসার চিত্ত পরিবর্তন হয়। তিনি বলেন -

“যা তবে ঐ কথাই রইল! আমি লখাইরে জিয়াইয়া দিমু, তবে সাক্ষী থাকব বাতাস চন্দ্র সূর্য আর তিনলোক। তবে কথার যদি খেলাপ হয়, চম্পকের কুলপতি যদি আমার জয় না দেয় – কইয়া দিলুম বিধে বিধে সবকিছু শেষ কইর্যা দিমু।”^{৬৩}

বেহুলা ফিরে আসেন চম্পক নগরীতে, সঙ্গে আসেন লখিন্দর। এই সময় চাঁদ বুঝতে পারেন যে তাঁর মিথ্যা দম্ভ, মিথ্যা অহংকার আর টঁকে থাকবে না। পরিবার, পরিজন, বেনে সমাজের সকলেই চাঁদের এই বিরোধী মনোভাবের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তারা মনে ভাবে যে মনসার যদি কোন মহিমা বা ক্ষমতা না থাকতো, তা হলে বেহুলা কি করে তার স্বামীকে ফিরে পেল? অন্যদিকে মনসাকে দেবী হিসেবে মান্যতা দিতে চাঁদের আপত্তির কারণ কি? পরিস্থিতির চাপে পরে চাঁদ নিজেকে কিছুটা হলেও পাল্টে নিতে বাধ্য হন। চাঁদ চম্পক নগরীর উদ্দেশ্যে বলেন—

“শোন চম্পাইবাসী! শোন মাঝিমাঝারী! – তুমাগো সর্ব্বার মুখ চাইয়া – আমি চম্পাইয়ের সমাজপতি চান্দ বণিক্য আইজ অতি রাজি হলাম। তে অইলে আন! চুয়া-চন্দন পুষ্প-জল আন! –আমি! হ্যাঁ আমি! বাবা দেবাদিদেবের দীনদাস চান্দ বণিক্য ম-ম-মন-সারে পূজা দিমু।”^{৬৪}

বেনে সমাজে মনসা পূজা প্রতিষ্ঠা হয়, চাঁদ বাঁ হাতে মনসাকে পূজা করেন। সবাই হতবাক হন। কিন্তু মনসা তাতেই খুশি হন। দূর থেকে মনসা সকলের উদ্দেশ্যে বলেন—

“সমাজপতির চালের কাছে হার মানতি অইল বলি দুক্ষ করবা না! জানি রাখ, বাম হাতে হলিও সদাগর আমারে পুষ্পজল দিতি বাধ্য অইয়েছে। চম্পাইবাসী শুইন্যা রাখ – এমন একটা দিন আইব- যখন আমাগো কথা মাইনষের মুখে মুখে গান অইয়া ফিরব। বাম হাতের পূজা আদায় কইর্যা যে কাজটা শুরু অইয়েছে সেটাই চলাইয়া নিবা তুমরা, তুমরা। এই লড়াই কিন্তু শেষ হয় নাই- আরম্ভ করে একজন- শেষ করে অনেকজন!”^{৬৫}

এখানে মনসার জয় হয়, তা মূলত নারী জাতির জয়, নিম্ন=শ্রেণির মানুষের জয়। যাঁরা সমাজে গুরুত্ব পান না, যাঁরা সমাজের মূল কাঠামো ধরে রাখেন তাঁদেরই জয়। একদিন তাঁদের হাতেই সমাজ নিয়ন্ত্রিত হবে- এই ভাবনা দিয়েই ‘মনসাকথা’ নাটকের পরিসমাপ্তি। এই নাটকে পৌরাণিক মনসার কথা, চাঁদের কথা বলা হলেও নাট্যকার মূলত আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের অহংকার ও তার পরাজয়কে চিহ্নিত করেছেন। ফলে ‘মনসাকথা’ নাটকের কাহিনি বিশ্লেষণে মঙ্গলকাব্যের বিনির্মাণ ঘটে গেছে।

শেখর দেবরায় তাঁর ‘মনসাকথা’ নাটকে চরিত্রগুলি অঙ্কন করেছেন একালের জীবনচেতনার প্রেক্ষাপটে। তাঁর পৌরাণিক দেবী মনসার মধ্যে শান্তশ্রী রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। মনসার মধ্যে নিষ্ঠুরতা থাকলেও সেই নিষ্ঠুরতা সাময়িক, তা একসময় পরিবর্তিত হয়েছে অন্যের কল্যাণে। বেহুলার স্বামী লখিন্দরকে মনসা হত্যা করলেও শেষ পর্যন্ত তিনিই তাঁকে বাঁচিয়ে তুলেছে। এমনকি বেহুলার কষ্টের কথা শুনে মনে মনে দুঃখ পেয়েছে। তবে নিজের অধিকার সম্পর্কে মনসা সর্বদা সচেতন ছিলেন, যা একালের মানব-মানবীর ভাবনার সঙ্গে একেবারে সম্পৃক্ত। শুধু তাই নয়, এই নাটকের মনসা যেন ভালো-মন্দে মিশ্রিত এক সজীব নারীসত্তা। একালের নারীবাদী ভাবনার প্রতীক হিসাবে নাট্যকার তাকে অঙ্কন করেছেন। সনকা চিরকালের পরিচিত এক বিবাহিতা নারীর প্রতীক; যিনি একদিকে স্বামীকে মান্য করতে চান, অন্যদিকে মনসাকেও দেবী হিসাবে গ্রহণ করতে চান। এই দোলাচলতায় চরিত্রটি নাটকে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। চাঁদসদাগর চরিত্রটি এখানে সামন্ততান্ত্রিক শক্তির প্রতীকরূপে অঙ্কিত। যিনি নিজের অহংবোধ ও দম্ভে একেবারে অন্ধ। তাঁর পৌরুষে, অহংবোধে নারীর মূল্য কোনো ভাবেই স্বীকৃত নয়। সেখানে নীচকুলের দেবী মনসার কোনো স্থান নেই। তাই মনসার কোপে একের পর এক পুত্র হারিয়েও, তিনি কোনো ভাবেই মাথা নত করেনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত

পরিস্থিতির চাপে পরে বাধ্য হয়ে অবজ্ঞাভরে মনসাকে গ্রহণ করেছেন বণিক সমাজের দেবী হিসাবে। এতে তাঁর মিথ্যা দম্ভ, অহংকারে আঘাত লেগেছে। তবে পুরোপুরি দমিত হননি। আমাদের আধুনিক সমাজে এমন অনেক পুরুষ চরিত্রের পরিচয় মেলে, যাঁরা মৃত্যুকে শ্রেয় জ্ঞান করেন, কিন্তু কারো কাছে নত হন না। চাঁদ সদাগর ঠিক সেইরকমই সামন্ততান্ত্রিক সমাজের এক প্রতীক চরিত্র। বেহুলা একালের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং আত্মবিশ্বাসী এক নারী। যিনি সমস্ত অশুভ শক্তিকে অতিক্রম করে নিজের সংকল্পে এগিয়ে চলেছেন। তাই তিনি ফিরিয়ে আনতে পেরেছে তাঁর স্বামী লখিন্দরকে। কালে কালে আমরা বেহুলার মতো নারী চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই, যাঁরা আধুনিকতার আলোতে উদ্ভাসিত। নাট্যকারে মূল লক্ষ্য ছিল চরিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্ণের সঙ্গে উচ্চ-বর্ণের সংঘাত দেখানো, সেই প্রচেষ্টায় নাট্যকার সফল হয়েছেন। এর ফলে ‘মনসাকথা’র প্রতিটি চরিত্র একালের মানুষের মতো হয়ে উঠতে পেরেছে।

শুধু চরিত্র নয়, ‘মনসাকথা’ নাটকের সংলাপ তীক্ষ্ণ এবং সংঘাতময়। নিম্নবর্ণের মানুষের মুখের ভাষা এখানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য তিনি সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন। ফলে নাটকটি পাঠক বা দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। মনসাকে চাঁদ যখন গালি দিয়েছেন, তখন তাঁর কথাতে গ্রাম্য অকথ্য ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—‘চেঙ্গমুড়িকানী’, ‘ঢ্যামনা ভাতারী’, ‘লঘুজাতি’ ইত্যাদি। তেমনি মনসার কথাতেও উঠে আসে গ্রামীণ ভাষার পরিচয়—

“শোন! তাগোর পরিচয়টা তুই যখন জানান দিতি দিবি না – তে অইলে তো একটা লড়াই লাগল বলে! নায্যি পাওনা আদায়ের এই লড়াই লাগল বলে! নায্যি পাওনা আদায়ের এই লড়াই শেষ না অইলে আমিও চুপ করুম না। দেইখ্যা লইমু, চম্পকের চান্দ সদাগরের কতখানি ক্ষ্যামতা--!”^{৬৬}

এখানে ‘দিতি দিবি না’, ‘নায্যি পাওনা’, ‘দেইখ্যা লইমু’, ‘ক্ষ্যামতা’ প্রভৃতি শব্দগুলিতে কালভেদে গ্রাম্যভাষার পরিচয় বহন করে। বেহুলার উক্তি থেকে ধরা পড়েছে বুদ্ধিমতী নারীর চিন্তা-চেতনার কথাও। মনসাকে যখন বেহুলা বলেন—

“জয় মা বিষহরি। তুমার শ্রীচরণে পেন্নাম মাতা নাগের জননী! আইজ থাইক্যা তুমি আমাগোরও জননী, বাক্যি দিলাম তুমার মান আমি ঠিক আদায় কইর্যা লইমু।”^{৬৭}

তখন বেহুলা যে বুদ্ধিমতী তা স্পষ্ট হয়। মনসার সংগ্রামকে বেহুলা নিজের সংগ্রাম করে নিয়ে তিনি তাঁর ইচ্ছাপূরণ করেছেন। যার জন্য চাঁদ মনসার পূজা করতে বাধ্য হয়েছেন। এইভাবে আত্মভাবনায় জারিত করে নাট্যকার চরিত্রগুলির পরিবর্তন করেছেন। ফলে নাটকটির কাহিনিগত পুনর্নির্মাণের পাশাপাশি চরিত্র ও ভাষাগত বিনির্মাণ হয়েছে।

৫। উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় - মনসামঙ্গল (২০১৮);

২০১৮ খ্রিস্টাব্দে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্য অবলম্বনে লিখেছিলেন পৌরাণিক ও আধুনিক ভাবনাজাত নাটক ‘মনসামঙ্গল’। ১৯ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১৪ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটির প্রচ্ছদপত্র (২), নামপত্র (৪), লিপপেজ (২), উৎসর্গপত্র (১), ভূমিকালিপি (২), সূচিপত্র (২), চরিত্রলিপি (১), মূল নাটক (৬৬) সহ মোট ৭০ পৃষ্ঠা আছে। নাটকটির প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ -

“তিনটি উজ্জ্বল নাটক/ উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়/ মনশ্চক্ষু চক্র
মনসামঙ্গল।”^{৬৮}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ -

“তিনটি উজ্জ্বল নাটক/ মনশ্চক্ষু চক্র মনসামঙ্গল/ উজ্জ্বল
চট্টোপাধ্যায়/ধানসিড়ির।”^{৬৯}

প্রচ্ছদপত্রটি তৈরি করা হয়েছে নীল, লাল এবং হলুদ- এই তিনটি রঙের সমন্বয়ে। সেখানে একটি স্পট লাইটের আলো দেখা যাচ্ছে। ‘তিনটি উজ্জ্বল নাটক’ গ্রন্থে নাট্যকার উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়, ধানসিড়ির পক্ষ থেকে শুভ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক, ৬০ এফ কালীচরন ঘোষ রোড, কলকাতা-৭০০০৫০ থেকে প্রকাশিত। নাটকের চরিত্র লিপিতে উল্লিখিত চরিত্রগুলি হল-

“চাঁদ, সনকা, নেতা, বেহুলা, শিব, মনসা, চণ্ডী, ইন্দ্র, লখিন্দর,
সায়, অমলা, জগাই, গোদা ধনন্তরি ওঝা, লখিন্দর, গানের দল,
নাচের দল, ও সূত্রধর এবং আরও অনেকে।”^{৭০}

উৎসর্গপত্রে বলা হয়েছে—

“নান্দীপট নাট্যদল সৃজিত/ মনসামঙ্গল নাট্যের সমস্ত কুশীলব/
কালাকুশলীদের/ যাঁরা আনন্দ-বেদনার বন্ধু।/ নাটকটি অঙ্কে

বিভাজিত নয়/ বা দৃশ্য দৃশ্যান্তরে লিখিত নয়/ একেবারে নূতন করে ভাবায়িত।”^{৭১}

‘নাট্যভূমিকা’য় নাট্যকার জানিয়েছেন=

“এই রচনাটি মধ্যযুগের বাংলার সাহিত্যপর্ব মনসামঙ্গলের ভিত্তিতে তৈরি। প্রধান উৎস কেতকীদাস ক্ষেমানন্দের রচনা। কাব্য পণ্ডিতগণের মতে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত। শম্ভু মিত্রের রচনা ‘চাঁদ বণিকের পালা’-তে চাঁদ সদাগর উন্নত চরিত্রের মানুষ, যে কিনা তখনকার সমাজের অচলনশক্তির বিরুদ্ধে নৌকা ভাসায়। আমাদের নাটকে চাঁদ নানান দোষে দুষ্ট। মনসা তাকে লাস্যময়ী নারীর বেশে এসে মনোহরণ করে এবং কামার্ত চন্দ্রধর হারায় তার মহাজ্ঞান। মনসা যেমন আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে পাগলিনী, চাঁদ তেমনি অহংবোধে ভরপুর, অবুঝ। বেহুলার ভাগ্য-বিড়ম্বনা তাই মনসা ও চাঁদের কলহের ফল। বেহুলা এই নাটকে অযৌক্তিক কলহের বিরুদ্ধে জাগ্রত এক একাকী নারী। তাই এই নাটক বেহুলারই নাটক। চাঁদ গায়ক, সুর তার গলায় ঝলমল করে। মনসার অভিশাপে চাঁদ হারাতে থাকে তার সুকণ্ঠ আবার বেহুলার সংগ্রামের পর চাঁদ ফিরে পায় তার গান। এইটুকুই নতুন এই নাটকে এবং হয়তো তাৎপর্যময়। এ ছাড়াও মনসা দেবী হিসাবে ব্রাত্য তাই সেখানেও একটি রাজনীতি বর্তমান।”^{৭২}

নাটকটির পটচিত্র- ১ থেকে পটচিত্র- ১০ পর্যন্ত কতগুলি চরিত্র ও কাহিনিভাবনা এখানে রেখাচিত্রে অঙ্কিত। ফলে মঙ্গলকাব্যের কাহিনিভাবনা প্রকরণগত ভাবে নাট্যভাবনায় পুনর্নির্মিত হয়েছে। নাট্যকাহিনির প্রথম পটচিত্র উন্মোচিত হলে আমরা দেখতে পাই চাঁদ শিবের নাম মন্ত্র জপ ও আরাধনা করছেন—

“তুমি সংসারের সার তোমা বিনা কেবা আর/ পূজা নেয় চন্দ্রধর হতে।/
তুমি মোর গুরুমন্ত্র তোমার অধীন’এ যন্ত্র/ তেজঃরূপে রহ পূজা-ঘটে।/
সেই মহামন্ত্র বলে পূর্ব আরাধন ফলে/ কাব্য নিঃসরে তোমার কারণে/
গায়ক করিলে মোরে অকিঞ্চন চন্দ্রধরে/ তোমা ছাড়া চন্দ্র দেবতা না জানে।”^{৭৩}

সেই একই পটভূমিতে পরবর্তী সময় ধ্বস্তুরি ওঝার সঙ্গে কথোপকথনে চাঁদসওদাগর মনসার প্রসঙ্গে অবজ্ঞামূলক বাক্য ব্যবহার করেছেন—

“মনসা কি দেবী নামে অভিহিত হল আজ? হাস্য আসে শুনে—তারে কী করে তুমি উপদেবী না অপদেবী—সাপেদের রানি বটে—থাকুক সে জঙ্গলে পাতালে বিষের পসরা লয়ে। চাঁদ তার বন্দনা করবে কি কারণে কও? যে হস্তে শিব মহেশ্বরে পূজা দিই সেই হস্তে দিব মনসারে পূজো?”^{৭৪}

চাঁদ মনসাকে ‘চ্যাংমুড়ি কানি’ বলে গাল মন্দ করেন, মনসা তাতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। নাট্যপালায় ক্রমে ক্রমে যুক্ত হয় শিব, মনসা, চণ্ডী। তাঁদের পারিবারিক কলহ, যা একেবারেই আধুনিক সামাজ্যের মানুষের সাংসারিক কোন্দল। মনসা এসে শিবের কাছে দাবি করেন কন্যার অধিকার। শিব মনসাকে মান্যতা দিতে চাইলেও চণ্ডী তাঁকে গ্রহণ করতে চান না। ফলে অশান্তি শুরু হয়। তারই একটি আকর্ষণীয় নাট্য প্রসঙ্গ এইরূপ -

“মনসা । শিব মহারাজের মনসকন্যা আমি—মনসা।

চণ্ডী । এখানে কী মনোভাব নিয়ে এসেছ?

মনসা । পিতা-মাতার কোলেই তো সন্তানের অধিকার।

চণ্ডী । কে তোমার মাতা! অসম্ভব! আমি তোমার মাতা নই।

মনসা । তবে কে আমার মাতার স্থান লয় মাগো?

চণ্ডী । যে লয় সে লয়—আমি সে মনুষ্য না।”^{৭৫}

এখানে উঠে এসেছে একালের অনাথ কন্যার বেদনার কথা। স্বাভাবিক ভাবে মনসার অন্তর বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়। শিব মনসাকে সাঙ্ঘনা দিয়ে বলেন—

“শুনো হে মনসা/ সদয় হইয়া আমি তোরে দিই বর/ কবির তোমার পূজা দেব সুর নর/ আমি শিব আমার সেবক চাঁদ ব্যাণা/ হইবে তোমার বৈরী তত্ত্ব নাহি জান্যা,/ বেউশ্যা হইয়া তার হরি নিবে জ্ঞান/ ধ্বস্তুরী ওঝা তারে করিবে সিয়ান।”^{৭৬}

শিবের কথা অনুযায়ী মনসা পূজা পাওয়ার জন্য চাঁদকে নানাভাবে আক্রমণ করেন। এই ঘটনায় একালের কুচক্রী স্বার্থপর মানুষের পরিচয় ফুটে ওঠে মনসা চরিত্রে। চাঁদের ছয়টি সন্তান মারা গেল, বাণিজ্য তরী জলে ডুবে গেল, তবুও তাঁর মনোবল দমল না। তখন মনসা বলেন—

“বড়ো তেজ তোমার চাঁদ! মহাজ্ঞানী হয়েছ বটে—দেখব কী করে রাখো ওই মহাজ্ঞান, পুরুষ তুমি, কামশর তোমাকে যখন বিদ্ধ করে তুমি উন্মত্ত প্রায়, আছে সে সংবাদ, সনকার কান্নার ওপর দিয়ে হেঁটে তুমি যাও বেশ্যাগৃহ।”^{৭৭}

তখন মনসা কৌশল নেয় চাঁদের মহাজ্ঞান জটা চুরি করার। পরম সুন্দরী রূপসী হয়ে মনসা আসেন চাঁদের মন ভোলাতে। মনসা চাঁদকে বলেন—

“আমার পতি বৃদ্ধ তাই ব্রহ্মচারী, ননদিনী অতি দুরাশায়। আমার উদর থাকে ভুখা, শরীর করে খাঁখাঁ। ননদিনী শূন্য ঘরে মোর চুল ধরে টেনে টেনে ঘুরায়, আমি রক্তমাংসের মানুষ না চাঁদ ? এ রূপ যৌবনের ডালি লয়ে, কুলের ধর্ম-লাজ ভুলে, আমি তোমার কাছে এসেছি, জুড়াও মদনতাপ।”^{৭৮}

চাঁদ যখন ছদ্মবেশী সুন্দরী রূপসী মনসার নাচ-গানের কলাকৌশলে আবেগে আশ্লুত হন, তখন মনসা চাঁদের মহাজ্ঞান জটা চুরি করেন। এরপর চাঁদের পুনরায় বাণিজ্য যাত্রা, হনুমানের তাণ্ডব, কোন রকমে চম্পক নগরে ফিরে আসা, সনকার সঙ্গে দেখা হওয়া, সপ্তম সন্তান লখিন্দরকে পাওয়া— এই সমস্ত কাহিনি নাট্য-সংলাপে ও পরিবেশনে অভিনবভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। নাট্যপালার পঞ্চম পটচিত্রে আছে লখিন্দরের বিবাহের আয়োজন, বেহুলার সঙ্গে লখিন্দরের বিবাহ। চাঁদ মনসার আক্রমণ থেকে লখিন্দরকে বাঁচানোর জন্য বিশ্বকর্মাকে দিয়ে সাঁতালি পর্বতে একটি লোহার বাসরঘর নির্মাণ করান। মনসা তাতে বিশ্বকর্মার উপর ক্ষুব্ধ হন। বিশ্বকর্মাকে মনসা বলেন—

“তুমি আমার শত্রুরের বন্ধু হয়েছ। অ্যাঁ! সাঁতালি পর্বতে লোহার বাসর নির্মাণ করছ—অ্যা—লোহার বাসরে শোয়া হইব পুত্রধু? অ্যাঁ—যদি প্রাণের মায়া থাকে তো কই হে বিশ্বকর্মা—পাতালবাসিনী আমি প্রতিশোধরূপিনী আমার কথা রাখো—।”^{৭৯}

বিশ্বকর্মা প্রাণের ভয়ে লোহার বাসর ঘরে একটি ছিদ্র রাখেন। যার মধ্য দিয়ে বেহুলা-লখিন্দরের বাসর ঘরে প্রবেশ করে কাল নাগিনী। কাল নাগিনীর ছোবলে লখাইয়ের মৃত্যু হয়। অন্তিম পুত্রকে হারিয়ে সনকা পাগলের মতো বেহুলাকে চুল ধরে মারেন এবং গালি দিয়ে বলেন—

“পিশাচিনী তুই, আমার লখাইরে খেতে এসেছিলি রে বেউলা, এখনও সিঁদুর পরে আছিস যে বড়ো! আরে মাগি পায়ের আলায় তোর ধুলা

লাগেনি এখনও! খণ্ড কপালিনী তুই বেহুলা চিরুন্দাঁতি বিভা দিনে খাইলি
পতি না পোহল রাতি!”^{৮০}

এই সকল আঘাত, আপমানের পরেও বেহুলা কথা দিলেন—‘আমি ফিরায়ে দেব তোর
ছেলে মাতা’। বেহুলা মৃত স্বামীকে কোলে নিয়ে ভেলায় ভেসে এগিয়ে চলে অনন্ত
অনিশ্চিত জীবন পথে। এখানে বেহুলা চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে সর্বকালের পতিব্রতা নারীর
পরিচয়। বেহুলা জল পথে নানা মানুষের লোভের শিকার হন। কিন্তু বুদ্ধিমতী নারীর
মতো সমস্ত লোককে পরাজয় করে এগিয়ে চলেন নিজের লক্ষ্যে। গোদাকে ডুবিয়ে
মারেন, কুমিরের সঙ্গে লড়াই করেন, জাগতিকের বুড়ো আঙুল জাতি দিয়ে কেটে দেন,
বৈদ্যের কুপ্রস্তাবে গালমন্দ করেন। এ যেন একালের নানা অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিটি
অসহায় নারীর লড়াই। অবশেষে বেহুলার সঙ্গে দেখা হয় নেতা ধোপানীর। যে বেহুলাকে
নিয়ে যায় দেবসভায়। সেখানে বেহুলা নৃত্য-গীতের নৈপুণ্যে ইন্দ্র, শিবসহ সমস্ত দেবতাকে
খুশি করেন। তাঁদের দেওয়া কথা মতো বেহুলা স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি
করেন—

“মনসার কোপে কালনাগিনীর বিষে আমার পতি মৃত, কিন্তু আত্মা আছে
দেহে। জলে আসলাম ছয় মাস। তার জীবনের আশে—যতেক দেবতা যদি
করহ কল্যাণ—।”^{৮১}

শিব যখন বেহুলাকে মনসার পা ধরে কেঁদে অনুরোধ জানাতে বলেন, তখন বেহুলা
শিবের কথায় প্রতিবাদ করে বলেন—

“কারো পায়ে ধরে না সায়বেনের কন্যা। সে একাকী লড়াকু। সে চাহে
ন্যায্যতা। প্রতিকার এই মনসা কোন সাহসে খায় মোর পতিদেবে? কী
করেছে সে? কী করেছি আমি?”^{৮২}

বরং বেহুলা মনসাকে চোখে আগুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর অন্যায়ের দিকটি।
এখানে বেহুলা মনসাকে স্বার্থান্বেষীরূপে চিহ্নিত করেছেন। বেহুলা প্রতিবাদী ভাষায়
মনসাকে বলেছেন—

“নিতে হবে কেন-না তুমি অন্ধ মা গ। চাঁদের শত্রু করেছ—তার অসীম
যজ্ঞণা করেছ—ছয় পুত্রে খেলে কেন ? তারা কি দোষ করেছিল? লখিন্দরে
খেলে কেন? সে কি বাপের মতন তোমাকে করেছিল অস্বীকার? সে
জানেনা কিছুই কেন মৃত্যু এসে হানা দিল তারে! শক্তির জন্যে উন্মাদিনী

তুমি মা তাই দুর্বলের এত আঘাত করেছ—নিজের প্রতিষ্ঠা নিজে করো
দেবীর মমতা দিয়ে—ভালোবেসে—তবে যদি সত্য পথ পাও—।”^{৮৩}

মনসা এখানে দেবী নয়, ভুল শুধরে নেওয়া এক সামান্য নারী, যিনি নিজের ভুলের
প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং চাঁদের সমস্ত ধন-সম্পদ
এবং ছ’পুত্রের প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে। এ মনসা প্রতিশোধ পরায়ণা হিংস্র দেবী নন।
নাটকের শেষে তিনি উদার কল্যাণী রূপে পরিচিত হয়েছেন মানুষের কাছে। একসময়
বেহুলা চাঁদকেও বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন। চাঁদের মিথ্যা অহংবোধ ভেঙ্গে গেছে। মনসার
প্রতি চাঁদের অন্তরে বিদ্বেষ দূর হয়েছে। বেহুলা চাঁদকে বলেছেন—

“পৃথিবী চলেছে সদাগর যুক্তির নিয়মে। দেবতারা কোন যুক্তিতে দেবতা—
সেটি জানো? মানুষ মানে তারে তাই সে দেবতা—তাই তার শক্তির প্রকাশ
হয় মানুষের দংশন করে। একবার মনসারে ডেকে বলো না যে কত ব্যথা
পেয়েছ তুমি সন্তান বিহনে। বুঝাও যে পূজা হল ভালোবাসা, পূজা
আনুগত্য না। তারে ভালোবাসা দিলে সে যদি দেবত্ব পায়—পাক—সুখে
থাক মনসার অহং। তবে তোমরা দুজনই এক মুদ্রার দুই পিঠ—নিজের
প্রতিষ্ঠা করো অন্যের ওপরে—।”^{৮৪}

চাঁদ মনসার পূজা করেন, পুত্রবধূর যুক্তিকে ফেলে দিতে পারেন না, বুঝতে পারেন
নিজের অহংকারের দিকটি। তাই চাঁদ নিজেকে শুধরে নেন, মনসা-চাঁদের সন্মতি সূচক
মিলন হয়। মনসা চাঁদকে বলেন—

“পূজার আড়ম্বরেই পূজার অবসান চাঁদ। জোর করে দেবী হবার
সাধ আর নেই। বেহুলা আমার অহং-এ খোঁটা দিয়েছে।”^{৮৫}

চাঁদ মনসাকে বলেন— “আমারও—আমি একচক্ষু আজ—।” নাট্যপরিণতিতে মনসা
মানুষের জয়গান করেন। বেহুলার আত্মত্যাগের ভাবনাকে, তাঁর বুদ্ধিমত্তাকে, তাঁর
প্রতিবাদী রূপটিকে প্রশংসা করে মনসা বলেন—

“পূজা তো তুমি পাবে একাকী লড়াকু মেয়ে, তুমি সেই দেবী—
মনুষ্যের মাঝে যায় অধিষ্ঠান—প্রেমিকের জীবনসন্ধানে যে নিজের
জীবন করে পণ।”^{৮৬}

এইভাবে নাট্যকার মঙ্গলকাব্যের দেবীমহিমাকে পরিবর্তন করেছেন মানবপ্রেমের আদর্শে।
আলোচ্য নাটকের কাহিনি ও চরিত্রে সেই কাব্যভাবনার পুনর্নির্মাণ করেছেন নাট্যকার।

তবে চাঁদের কামুক স্বভাব, তাঁর গানের দক্ষতা ইত্যাদি বিষয় নাট্যকারে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার ফল।

‘মনসামঙ্গল’ নাটকটিতে অঙ্কিত সব চরিত্রই ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের চরিত্র। নাট্যকারের কল্পনায় এখানে চরিত্রগুলি যেমন পুনর্নির্মিত হয়েছে, তেমনি কাহিনির সঙ্গে কল্পকাহিনির সংমিশ্রণে পাঠক বা দর্শকের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। চাঁদ ও মনসার সংঘাত নাটকের মধ্যে প্রধান ঘটনা হলেও বেহুলার জীবনজিজ্ঞাসা, মনসার ছদ্মরূপে চাঁদের মহাজ্ঞান জটা চুরির ঘটনা, চাঁদের অতিমাত্রায় নারী লোভের ঘটনা, অন্তিম সন্তান লখিন্দরকে সাপে কাটার পর ব্যাকুলভাবে কান্নার ঘটনা- নাট্যকারের ভাবনার অতিরঞ্জিত সংযোজন। এইভাবে পুরাতন ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যকথা একালের নাট্যকারের হাতে পুনর্নির্মিত হয়েছে। চাঁদ চরিত্রের একনিষ্ঠ শিবভক্তির কথা আমাদের ভালো লাগে। কিন্তু এখানে চাঁদের সেই আচরণ কিছুটা হলেও বিভ্রান্তমূলক হয়েছে। যদিও কয়েকটি ক্ষেত্রে মনসা বনাম চাঁদের কলহ এ নাটকে ফুটে উঠেছে। ধন্বন্তরি ওঝাকে চাঁদ বলেছেন -

“ছাই করবে সে আমার! এক অসংস্কৃত নারী সে, কোনো কৌলীন্য নাই তার। শোনোনি সে রটনা যে শিব দ্বারা সমুদ্রমন্ଥনকালে দশম মন্ডনে সমুদ্র থেকে উঠেছিল চাঁদ ব্যাণা। সে কী করবে আমার? এই জটাভার দ্যাখো মস্তকে, এর মধ্যে আছে এক মহাজ্ঞান আর তুমিও আছ—বৈদ্য-সর্প এসে গরল উগরালে করবে না সে গরল নির্বিষ?”^{৮৭}

একের পর এক সন্তান হারিয়েও চাঁদ অদমিত, কিন্তু একমাত্র বেহুলার অনুরোধ তিনি ফেলে দিতে পারেন নি। বেহুলা তাঁর অন্ধ বিবেকের দরজায় ঘা দিয়েছেন, চাঁদকে প্রকৃত পূজার অর্থ বোঝাতে পেরেছেন— ‘পূজা হল ভালোবাসা, পূজা অনুগত্য না’। চাঁদ বুঝতে পেরেছেন যে সমাজ পরিবর্তনশীল, মানুষ পরিবর্তনশীল, মানুষের হৃদয় পরিবর্তনশীল। পুত্রবধূর কথায় চাঁদ নিজের অবিচল সিদ্ধান্ত থেকে একসময় বিচ্যুত হন; নিজের ভুল বুঝতে পারেন। নিজের অন্ধমোহ ত্যাগ করে মনসাকে বাঁ হাতে পূজা করেন। তখন চাঁদ প্রকৃতভাবে সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ হয়েও একালের বিচার-বুদ্ধিতে উত্তীর্ণ এক আধুনিক মানুষ হয়ে ওঠেন। এ নাটকের বেহুলা নিজের বুদ্ধিমত্তায় আলোকিত এক নারী, যে নারীশক্তির আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন মধ্যযুগীয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে। মনসা নারী হলেও দেব মহিমার দ্বারা আগাগোড়া আচ্ছন্ন নন। তাঁর মধ্যে শুভ কামনাও আছে। তিনি বেহুলার কথায় রাজি হয়ে তাঁর স্বামীর জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন। চাঁদকে তাঁর সাতটি

পুত্র ফিরিয়ে দিয়েছেন। এমনকি সাপ কামড়ালে, সাপের বিষই তার নিরাময়ের ঔষধরূপে পরিগণিত হয়েছে মনসার আশীর্বাদে। একসময় মনসা আর দেবী হয়ে উঠতে চাননি, তিনি চেয়েছেন মানুষ হয়ে মানুষের সমাজে থাকতে—“হ্যাঁ হ্যাঁ মানুষের সংসারে সুখ দুঃখে সাধারণ হয়ে যদি থেকে যেতে পারি”। তাই নাট্য-পরিণতিতে আমরা দেখি চাঁদ ও মনসার সম্মতিসূচক ভাব-মিলন হয়েছে। সনকা একনিষ্ঠ পতিব্রতা বিবাহিতা নারী ও মাতারূপে আমাদের সমাজে আজও জীবন্ত হয়ে আছেন। লখিন্দর চরিত্রটি কাহিনিধারার অগ্রগতির অবলম্বন মাত্র। তাঁকে নিয়েই কাব্য বা নাটকের কাহিনি স্বর্গ-মর্ত্যের সীমারেখায় সংযুক্ত হয়েছে। মর্ত্যের কাহিনি পৌঁছে গেছে স্বর্গের দেবসভায়। এইভাবে বিশ্লেষণ করলে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের ‘মনসামঙ্গল’ নাটকটি একালের জীবনদর্পণ হয়ে উঠেছে। এই সফলতার পিছনে নাট্য-সংলাপের গুরুত্ব ও আধুনিকতা বেশ বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। সব মিলিয়ে নাটকটি পুনর্নির্মিত ও বিনির্মিত আধুনিক নাটক হয়ে উঠেছে।

৬। দেবেশ ঠাকুর—বেহুলা (২০১৮) ;

নাট্যকার দেবেশ ঠাকুর মনসামঙ্গল কাব্যের বিষয় অবলম্বন করে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে লিখেছেন ‘বেহুলা’ নামের একটি নাটক। ১৮ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১২ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটির প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (১), সূচিপত্র (১), চরিত্রলিপি (১), মূল নাটক (১২) সহ মোট ১৬টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ-

“পনেরো জন প্রখ্যাত নাট্যকারের ১৫টি ভিন্ন স্বাদের নাটক/ পঞ্চদশ শ্রুতি কথা / সম্পাদনা- প্রীতিশেখর।”^{৮৮}

নাটকটির নামপত্রটি এইরূপ-

“একক নাটক/ বেহুলা/ দেবেশ ঠাকুর/ চরিত্রলিপি / বেহুলা।”^{৮৯}

প্রচ্ছদপত্রটি তৈরি করা হয়েছে লাল, নীল, হলুদ, সবুজ এবং গোলাপী- একাধিক রঙের সমন্বয়ে। প্রচ্ছদপত্রে সমুদ্রের চিত্র অঙ্কিত আছে। চরিত্রলিপিতে কেবল বেহুলার উল্লেখ থাকলেও প্রাসঙ্গিক কাহিনিতে আমরা মনসামঙ্গল কাব্যের প্রায় সব প্রধান চরিত্রকেই পাই। চাঁদসওদাগর, সনকা, লখিন্দর, নেতা ধোপানী থেকে শুরু করে ইন্দ্রের সভার শিব-মনসাসহ সমস্ত দেবতার প্রসঙ্গ আছে। নাটকটি জনৈক প্রীতি শেখরের সম্পাদনায় লালমাটি প্রকাশন, ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩ থেকে প্রকাশিত। নাটকটির মূল্য দুইশত টাকা মাত্র।

দেবেশ ঠাকুরের লেখা একক নাটক ‘বেহুলা’। এই নাটকের কাহিনিভাগে মনসার যে জীবন কথা বলা হয়েছে, তা বিজয় গুপ্তের ‘পদ্মাপুরাণ কাব্য’ থেকে নেওয়া হয়েছে। তবে নাট্যকার পৌরাণিক দেবী মনসার মহিমার কথা যতটা না গুরুত্ব দিয়েছেন, তার চেয়েও বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন বেহুলাকে। তাই নাটকের মধ্যে বেহুলা চাঁদসওদগরের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্ব পেয়েছেন। একালের নাট্যকার আধুনিক নারীর দৃষ্টিভঙ্গিতে সেকালের বেহুলাকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। নাটকের সূচনা হয়েছে ইন্দ্রের রাজসভায় নৃত্য-গীতের পরিবেশের বর্ণনা দিয়ে। বেহুলাকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হবে। তাঁকে ইন্দ্রের দেবসভায় নাচ-গান করে সকল দেবতাকে আনন্দ দিতে হবে, খুশি করতে হবে, তবেই তিনি স্বামী লখিন্দরের জীবন ফিরে পাবেন। এ যেন নিজের সঙ্গে বেহুলার নিজের সংঘাত। নারীত্বের অবমাননার সঙ্গে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে নেওয়ার প্রতিজ্ঞার সংঘাত। বেহুলা তাই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে উঠে বলেছেন—

“আমি প্রস্তুত দেবগণ! প্রণাম তোমাদের চরণে হে ইন্দ্র—চন্দ্র—বরুণাদি দেবগণ। উজানী নগরের বঙ্গবধু বেহুলার প্রণাম তোমাদের চরণে। তোমাদের নির্দেশ মতো আমি এখন নাচ শুরু করব। না, আমার আর এতটুকু লজ্জা নেই। কুণ্ঠা নেই। আনুরাগও নেই, বিরাগও নেই। আমি একজন নারী, একজন কুলবধূ—হয়তো সেই পরিচয়ের তকমাও নেই শরীরে কিম্বা মনে।”^{৯০}

বেহুলার অন্তরে জাগে একটি প্রশ্ন যে পুরুষকে কখনো সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয় না। কিন্তু নারীকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয় কেন? এর উত্তর বেহুলার কাছে অজানা। একইভাবে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছে পৌরাণিক সীতাকে ও দ্রৌপদীকে। বেহুলা নিজের প্রতিজ্ঞার কাছে হার মানতে চান না। তাঁর প্রতিজ্ঞা—

“যদি স্বামীর জীবন ফিরে পাই, ফিরব উজানীতে। নইলে ফিরব না।”^{৯১}

দেবসভায় বেহুলা উপস্থিত হয়েও নানা শর্তের সম্মুখীন হন। দেবতারা তাঁকে বলে—

“তোমার পায়ের নীচে থাকবে লোহার বল। লৌহ গোলক। তোমার পদভারে সেই লৌহ গোলক যদি চূর্ণ হয়। তবে জানবো তুমি সতী। তোমার পায়ের নীচে থাকবে তীক্ষ্ণধার ক্ষুর। সেই ক্ষুরে তোমার চরণ যদি ক্ষতবিক্ষত না হয়, তবে জানবো তুমি সতী। তোমার পায়ের নীচে কাঁচা মাটির পাত্রের উপর তোমায়

নাচতে হবে। ‘নরম কাঁচা মাটির সরা যদি পদভারে নষ্ট না হয়,
ভেঙে না যায়, তবে তুমি সতী।’^{৯২}

সতীত্বের নামে পুরুষদের দ্বারা নারীর অপমান যেন বার বার ধ্বনিত হয়েছে নাটকটিতে।
এখানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্যের কথা প্রধান হয়ে উঠেছে। বেহুলা দেবতাদের
কাছে সতীত্ব প্রমাণের শর্তে হতবাক হন। তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে চিৎকার করে বলেন—

“হা রে সতীত্ব। আর কতদিন—কতদিন এ দেশের মেয়েদের
সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হবে! বলো আর কতদিন। রামচন্দ্র
বারণের অপহরণ থেকে রক্ষা করতে পারেন না সাধ্বী স্ত্রীকে।
সেটা তাঁর অপরাধ নয়। অপরাধ হল সীতার। রাবণের
অশোককাননে কতখানি নষ্ট হল সীতা। আগুনে পুড়ে মরো।
পরীক্ষা দাও। স্বয়ং সতীকে পরীক্ষা দিতে হয়েছে সতীত্বের—
দক্ষের আগুনে পুড়ে। পরীক্ষা দেবে সাবিত্রী, দয়মন্তী, শৈব্যা আর
বেহুলা! সীতা। তিনবার পরীক্ষা দেবার পরে তবু পেয়েছিলেন
ধরণী-ধাত্রীর কোল। আর আমার জন্যে কি রইল। শুধু অনিশ্চিত
বিপন্নতা।”^{৯৩}

বেহুলা জানেন পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অধিকারের মানদণ্ডটি। যাঁদের কাছ থেকে
আশীর্বাদ পেতে হবে, তাঁদেরকে দেখাতে হবে শরীরের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; নৃত্যগীত
সেখানে প্রধান। বেহুলা বারংবার পারা-না পারার দোলাচলতায় মনে মনে বিচলিত
হয়েছেন। ইন্দ্রের দেবসভায় দেবতাদের নারীলোলুপ দৃষ্টি লক্ষ্য করে ভয় পেয়েছেন।
নীরব অন্তরের ভাষায় বেহুলা বলেছেন—

“ওই চন্দ্র, বরুণ-নেশাতুর চাহনি চোখে। এক্ষুণি হয়তো হিংস্র
স্বাপদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে। ছিঁড়ে খাবে আমার আত্মার
শুদ্ধতাকে। না পারব না, আমিষখণ্ডের অধিকার পাওয়ার জন্য
আমার শরীরের মাংসখণ্ড আমি পারব না তুলে দিতে।”^{৯৪}

‘পদ্মাপুরাণ’-এর এই কাহিনির সঙ্গে যুক্ত হয় একালের কবি জীবনানন্দ দাশের
কাব্যচেতনা। কবি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে বেহুলার দুঃখে আর কেউ কাঁদুক
বা না কাঁদুক, কেঁদেছিল প্রকৃতি। কবির ভাষায়—

“বেহুলাও একদিন গাঙুরের জলে ভেলা নিয়ে—কৃষ্ণ দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায় সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বখ বট দেখেছিল হায় শ্যামার নরম গান শুনেছিল-- একদিন অমরায় গিয়ে। ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দের সভায় বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।”^{৯৫}

‘বেহুলা’ নাটকের অন্তিমপর্বে নাট্যকার ভোগবিলাসী যন্ত্রসভ্যতার নগ্ন বিপন্নতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন; যে সভ্যতায় নারীকে ভোগের পণ্য করা হয়। ইন্দের দেবসভা যেন তারই প্রতীকী ভাবনার সার্থক উদাহরণ। এখানে প্রেম নেই, অমাবস্যায় দীপাবলি নেই, আছে শুধু নীচতা আর পোলুপত। তাই নাট্যকার বেহুলাকে দিয়ে নির্দিধায় বলিয়েছেন—

“প্রেম-প্রেম-বুকে নিয়ে কত শত অমাবস্যা দীপাবলি—থাক, মুছে যাক প্রীতি, ঘুচে যাক শাড়ির আঁচল। এ শুধু শরীরী খেলা, এ শুধুই নগ্ন বিপন্ন। কেউ ক্রেতা, বিক্রেতা না কেউ। নাচ—বেহুলা—সতীত্বের দান ফেলে জুয়ার বাজারে দেহের পসরা সাজিয়ে নাচ। মন্দাভাগ বেহুলা সুন্দরী—বাজাও বাদ্যভাণ্ড, মুরজ-মুরলি বীণা—মন্দিরা—মৃদঙ্গ—তা থৈয়া—থৈয়া—থৈয়া থৈয়া— ধিনা ধিনি না—।”^{৯৬}

নাটকটিতে মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনীর অনুসরণ করা হলেও বেহুলা চরিত্রের বিশ্লেষণে নাট্যকার আধুনিক সভ্যতার নগ্ন রূপটিকে তুলে ধরেছেন। টান টান নাট্যকাহিনীর অবতারণা কাব্যভাবনা অপেক্ষা অনেক বেশী আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেছে দর্শকমণ্ডলীর কাছে। সেই সঙ্গে সংলাপের তীক্ষ্ণতা ও ব্যঙ্গনাধর্মীতা নাটকটিকে চারুত্ব দান করেছে। ফলে ‘বেহুলা’ মনসামঙ্গল কাব্য কাহিনীর পুনর্নির্মিত নাটক হয়ে উঠতে পেরেছে। জীবনানন্দের ‘রূপসী বাংলা’ কবিতার সংযোজন এই কাজ আরো তরান্বিত হয়েছে।

বেহুলা চরিত্রকেন্দ্রিক দেবেশ ঠাকুরের এই নাটকটি আধুনিক নারীবাদী নাটক। ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যকাহিনীর আধারে নাটকটি লেখা হলেও এর মুখ্য ভূমিকায় চাঁদ সওদাগর নন, বেহুলাকেই প্রধান জায়গা দেওয়া হয়েছে। এ বেহুলা বুদ্ধিমতী, যুক্তিবাদী, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, আত্মবিশ্বাসী এক আধুনিক নারী, যিনি কিনা সমস্ত অশুভ-শক্তিকে পরাভূত করে এগিয়ে যেতে পারেন নিজের লক্ষ্যে। তাই নাটকটির শুরু চম্পক নগরীতে নয়,

ইন্দের দেবসভায়। বেহুলা জানেন ইন্দের সভায় নাচ-গান করে তাঁদের খুশি করতে না পারলে স্বামীর প্রাণ ফিরে পাবেন না। অন্যদিকে দেবগণের লোলুপ দৃষ্টি তাঁর অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। বেহুলা মনে মনে বলেছেন—

“এতগুলো পুরুষের সামনে নাচতে পারব না। ওই দেখ দেবরাজ ইন্দ্র—
হাতে মাধবী। চোখ নেশায় ঢুলঢুল। দুচোখে কামনার লোলুপতা।”^{৯৭}

বেহুলার ভাবনায় ধরা পরেছে একালের নারীলোভী মানুষের স্বরূপ, যা দেবতার উপর আরোপিত হয়েছে। সতীত্ব নিয়ে একসময় বেহুলা প্রশ্ন করেছেন দেবরাজের কাছে— ‘সতীত্ব কারে কয়!’ একসময় বেহুলা দেবসভা থেকে স্বামীর প্রাণের অধিকার ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন, মনসার অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ জানাতে পেরেছেন, এমনকি শ্বশুরের মিথ্যা পৌরুষের অহংকারকে বিনষ্ট করতে পেরেছেন নিজের পারদর্শিতায়। এ বেহুলা জীবন যুদ্ধে জিতে যাওয়া এক আধুনিক নারী। নাটকে তাঁর প্রতিটি সাংলাপে আধুনিকতার স্পষ্ট। সেই আধুনিকতা আরো বেশি করে রাঙায়িত হয়েছে কবি জীবনান্দের ‘রূপসীবাংলা’ কবিতার সম্মিলনে। ফলে ‘বেহুলা’ নাটকটি পৌরাণিক ভাবনাকে অতিক্রম না করেও একালের ভাব, ভাষায় পুনর্নির্মিত ও বিনির্মিত নাটক হয়েছে।

(খ) চণ্ডীমঙ্গলকাব্য অবলম্বনে রচিত নাট্য পুনর্নির্মাণ-

৭। অতুলকৃষ্ণ মিত্র - মা (১৮৯৫);

১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে অতুলকৃষ্ণ মিত্র লিখেছেন চণ্ডীমঙ্গল কাব্য অবলম্বনে ধর্মমূলক নাটক ‘মা’। ১৭.৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১১ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটির প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (২), নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ (১), মূল নাটক (১৬০) সহ মোট ১৬৪ টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকটির নামপত্রটি এইরূপ-

“ধর্মমূলক নাটক/ এমারল্ড থিয়েটারে অভিনয়ার্থ/ শ্রীযুক্ত বাবু
অতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত।/ শ্রীনিমাইচরণ বসু প্রকাশিত।/ ২০ নং
ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীট।”^{৯৮}

নাটকটি বি. এল দাস কর্তৃক এ্যাট দি নিউ ক্যালকাটা প্রেস, ২ নং হরিমোহন বসুর লেন, কলিকাতা থেকে মুদ্রিত। গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রে গণেশ কোলে দেবী চণ্ডীর একটি ছোট রঙিন ছবি আছে। নাটকে উল্লিখিত পুরুষ চরিত্রগুলি হলো- কালকেতু, সোমাই ওঝা, ভাঁড়দত্ত,

বুলান মণ্ডল, মুরারি, রোস্তম, শিবা, ধূমকেতু, সিদ্ধিনাথ, ব্যাধগণ, সভাসদগণ, পাইকগণ, কলিঙ্গকোটাল, পুরোহিত, সৈন্যগণ এবং নারী চরিত্রগুলি হলো- ফুল্লরা, বিমলার মা, দুঃশীলা, সাধনা, ষোড়শী রমণী, দুর্মুখা, অষ্টকুমারীগণ, মুরারি পত্নী, ব্যাধিনীগণ প্রমুখ। এই নাটকটিতে আছে পাঁচটি অঙ্ক। প্রথম অঙ্কে আছে চারটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে আছে চারটি দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্কে আছে পাঁচটি দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্কে আছে চারটি দৃশ্য এবং পঞ্চম অঙ্কে আছে তিনটি দৃশ্য।

নাট্যবিষয়ের সূত্রপাত হয়েছে পশুরাজ সিংহ ও অন্যান্য পশুরদের কথোপকথন দিয়ে-

“রাজাসনে সিংহরাজ একপার্শ্বে ছত্র করে হস্তী, অপর পার্শ্বে মন্ত্রী বেশে

ভল্লুক, সেনাপতি বেশে ব্যাঘ্র, দূতবেশে বানর ও অন্যান্য পশুগণ
উপস্থিত।”^{১১}

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রচলিত ধারা অনুযায়ী এই নাটকের কাহিনিতে রয়েছে কালকেতু ও ফুল্লরার দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবন ভাবনা, চণ্ডীর আশীর্বাদ ও গুজরাত নগর পত্তনের কাহিনি। কাহিনিধারাতে একের পর এক এসেছে নানা ঘটনা। কালকেতুর পশু শিকারের জন্যে বনে গমন, পশুগণের সঙ্গে কালকেতু যুদ্ধ, পশুগণের রণে পরাজয় এবং পলায়ন। অন্যদিকে কালকেতুর কুটীর প্রাঙ্গণে ফুল্লরা ও বিমলার সুখ-দুঃখের কথোপকথন, বিমলার বাড়িতে ফুল্লরার চাল ধার করতে যাওয়া, কালকেতুর নিত্য দিনের মত পশুশিকারে বার হওয়া, যাত্রা পথে অমঙ্গল সূচক গোধিকার রূপ দর্শন, বনে পশু শিকার করতে না পারা, ফেরার পথে ধনুকের ছিলায় সেই গোধিকাকে বেঁধে কুটীরে ফিরে আসা, গোধিকা রেখে গোলাহাটে মাংস বিক্রয় করতে যাওয়া, ফুল্লরার আগমন, ষোড়শী রমণীকে দেখে ফুল্লরার মনে সতীনের ভয় জাগরণ, রমণীর সঙ্গে কথোপকথন ও তাকে বুঝিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা, কালকেতুর আগমন, দেবীর পরিচয় দান, কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি, কালকেতুর অঙ্গুরী বিক্রয়, গুজরাট রাজ্য স্থাপন, ভাঁড়ু দত্তের আগমন, ভাঁড়ুর চক্রান্তে কলিঙ্গ রাজার সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধ, যুদ্ধে কালকেতুর পরাজয় ও বন্দী হওয়া, দেবীর আশীর্বাদে কালকেতুর মুক্তিলাভ, ভাঁড়ুর শাস্তি বিধান, পুনরায় কালকেতুর রাজ্য শাসন, দেবী চণ্ডীর মন্দির প্রতিষ্ঠা, অবশেষে কালকেতুর গীত দিয়ে নাট্য ঘটনার সমাপ্তি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গল নিয়ে লেখা এই নাটকের কাহিনির মধ্যে একাধিক নাট্যঘটনার যে টানাপোড়েন রয়েছে, তা মূলত আধুনিক যে কোন নাটকের সমতুল্য।

দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজিয়ে নাট্যকার যেভাবে মঙ্গলকাব্যের ভাবনাকে আধুনিক রূপ দিয়েছেন, তা সত্যই চমৎকার।

নাটকটির নব ভাবনার আর একটি দিক হোল এখানে নাট্যকার দেবী চণ্ডীর কল্যাণরূপের প্রকাশ দেখিয়েছেন মূলত অনগ্রসর জাতির উন্নতি বিধানের জন্য। দ্বিতীয়ত নাটকটি ভাষা। অতুলকৃষ্ণ মিত্র খুব সচেতনভাবে ঊনবিংশ শতকের গদ্য ভাষাকে নাট্য কাহিনির সংরূপে ব্যবহার করে কাব্য ভাষার পরিবর্তন করেছেন। সমকালীন ভাষাকে তিনি নিজের মতো করে সাজিয়ে আধুনিক নাটকের গঠনশৈলীতে রূপ দিয়েছেন। কালকেতু নিজের রাজ্যের প্রধান সেনাপতি পদে নির্বাচন করেছেন রোস্তুম নামের এক যবনকে। কলিঙ্গ থেকে অত্যাচারিত হয়ে আসা বুলান মণ্ডলকে রাজা কালকেতু রাজ্যের প্রধান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই দুটি ঘটনা প্রমাণ করে মুকুন্দকবির সমাজ চেতনাকে। সেইসঙ্গে আমাদের মনে করিয়ে দেয় সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের দিকটিও। নাটকটির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কুড়িটি নাট্যসঙ্গীত, যা নাট্যকারের বিশেষ মৌলিকতার দাবী রাখে। প্রতিটি সঙ্গীতেই দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারমূলক হওয়ায় একটি ভক্তি ভাবাপন্ন পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে, যা সেকালের নাট্য-দর্শকের চাহিদা পূরণ করেছে। এইভাবেই অতুলকৃষ্ণ মিত্রের ‘মা’ নাটকটি পুরাণভাবনায় জারিত হয়ে আধুনিক পুনর্নির্মিত নাটক হয়ে উঠেছে।

৮। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় – ফুল্লরা (১৯২৮);

১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনি নিয়ে লেখেন ‘ফুল্লরা’ নামের একটি নাটক। ১৭ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১১ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটিতে প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (২), নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ (১), উৎসর্গপত্র (১), নিবেদন (১), প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্র-পাত্রীগণ (১), মূল নাটক (১৩০) সহ মোট ১৩৭ টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ -

“ফুল্লরা/ পৌরাণিক নাটক/ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।”^{১০০}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ -

“ফুল্লরা/ পৌরাণিক নাটক/ আর্ট থিয়েটার পরিচালিত
স্টার রঙ্গ মঞ্চে অভিনীত/ প্রথম অভিনয় রজনী -
মহাসপ্তমী রবিবার ৪ঠা কার্তিক ১৩৩৫/ অপরেশচন্দ্র

মুখোপাধ্যায়/ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স/ ২০৩-১-১
কর্নওয়ালিস স্ট্রীট.....কলিকাতা- ৬।”^{১০১}

১৩৬০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে চতুর্থ মুদ্রণটি প্রকাশিত হয়। মূল্য দুই টাকা। নাটকটির উৎসর্পত্রে বলা হয়েছে-

“লব্ধ-প্রতিষ্ঠ নাট্যকার,/ শ্রীযুক্তনিত্যবোধবিদ্যারত্ন/
মহাশয়ের করকমলে,”^{১০২}

নাট্যোল্লিখিত পুরুষ চরিত্রগুলি হল- মহাদেব, নারদ, কলিঙ্গরাজ, যুবরাজ, ভাঁড়ু, রাম, মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, কালকেতু (ব্যাধসদর্দার), সভাসদগণ, সহচরগণ, ব্যাধগণ, প্রতিহারী, রক্ষিগণ ইত্যাদি। নারী চরিত্রগুলি হল- পার্বতী, পদ্মা, বল্লভা (কলিঙ্গের যুবরাজ পত্নী), ফুল্লরা (কালকেতুর স্ত্রী), ব্যাধরমণীগণ, নর্তকীগণ ইত্যাদি। নাট্যকার নাটকের নিবেদন অংশে বলেছেন—

“মহাকবি মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য অবলম্বন করিয়াই ফুল্লরা লিখিত হইয়াছে। ইহা ঠিক নাটক নহে, গীতিবহুল হওয়ায় ইহাকে গীতিনাটক বলা যাইতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ গীতিনাটকও ইহা নয়। নাটক ও গীতিনাটকের মাঝামাঝি যাহা, ইহা তাহাই। বাঙ্গলায় এমন গীতিবহুল নাটক বিরল নহে। ফুল্লরা সেই শ্রেণীর। বড় অল্প সময়ের মধ্যে ফুল্লরা লিখিত হয়। তাড়াতাড়িতে ইহার সব গান বাঁধিয়া উঠিতে পারি নাই। এই গানগুলি আমার পরম শুভানুধ্যায়ী শ্রদ্ধাস্পদ প্রবীণ সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের রচিত।”^{১০৩}

চারটি অঙ্কে নাটকটি লেখা হয়েছে। প্রথম অঙ্কে চারটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য আছে। তবে মূল ব্যাধকাহিনি শুরু হওয়ার আগে একটি ‘প্রস্তাবনা’ অংশ আছে। সেখানে কৈলাসের দেব-দেবীর কথোপকথন অবলম্বন করে কাহিনির পূর্বসূত্র রচিত হয়েছে।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত ‘ফুল্লরা’ পৌরাণিক নাটক হলেও একালের দর্শক বা পাঠকের কাছে তা জনপ্রিয় হয়েছিল। একদিকে নাটকের বিষয় বৈচিত্র্য, অন্যদিকে ঘটনার টান-টান বিন্যাস এবং চরিত্রগুলির সজীবতা নাটকটিকে আত্মদ্যময় করে তুলেছে। ‘প্রস্তাবনা’ অংশে কৈলাসের পটভূমিতে পার্বতী ও মহাদেবের কথোপকথনে নাট্যপটভূমি তৈরি করা হয়েছে। এখানে দেব-দেবী চরিত্রগুলি স্বর্গীয় পরিমণ্ডলে আধ্যাত্মিক মহিমায়

মণ্ডিত নন, তাঁরা একালের অতি সাধারণ মানুষের পরিচয় বহন করেছেন। এখানে শিব নেশাখোর মানুষ, অভাবের সংসার, নুন আনতে পান্তা ফুরায়, এমন অবস্থা। শিবের এই দশায় পার্বতী প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। তার উপর স্বামী শিব অলস, কর্মবিমুখ এবং নেশাখোর। পার্বতী ও শিবের এই অভাব-অনটনের সাংসারিক কলহের চিত্র এখানে মূর্ত করে তুলেছেন নাট্যকার-

“পার্বতী। সকালবেলা উঠেই সিদ্ধি, তার পর গাঁজা, তার পর ধুতরো, তারপর নাগিনী বোলাও! সাপে না ছোবলালে তো আর নেশা হবে না? তা, সন্ধ্যের পর ও সব ছাই পাঁশ যা হয় ক’রো, সকালে উঠেই যদি নেশা ক’রতে শুরু কর, তোমার ঐ সিদ্ধির দাণ্ডা মাথায় মেরে ম’রব তা আমি ব’লে রাখছি। একে হাড়ে নাড়ে জ্বলি তোমার সংসার নিয়ে—

মহা। কৈবল্য! বুঝেছ গিন্নি, সিদ্ধির দাণ্ডায় মাথা ভাঙলে কৈবল্য! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তাতে আর কাজ নেই। তার চেয়ে বরং আজ পাঁচ রকম রন্ধে কিছু খাওয়াও। আহা! নিম দিয়ে, শিম দিয়ে, বেগুন দিয়ে—

পার্বতী। তাতে খানিক বিষ মিশিয়ে—

মহা। আহা, শীতকালের শুভ্রো—বড়োই মধুর! চোঁয়া চোঁয়া ক’রে পটোল ভাজা, ফুলবড়ী ভাজা, নটেশাক দিয়ে কাঁটাল বিচি—

পার্বতী। যমের অরুচি! যম আমায় নেয় না কেন তা বুঝতে পারিনে?”^{১০৪}

শিবের অভিশাপে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর ও পুত্রবধূ ছায়া মর্ত্যে ব্যাধ কালকেতু ও ফুল্লরারূপে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র এইটুকুই পৌরাণিক প্রসঙ্গ, তারপরেই নাটকটি পুরোপুরি মানব জীবনের বাস্তব কাহিনির জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে। পার্বতী তাঁদের দুঃখ-কষ্ট মোচন করার জন্য মর্ত্যলোকে আসেন। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখানো হয়েছে গুজরাট বন, ফুল্লরা ও কালকেতুর দরিদ্রের সংসারে অভাব-অনটন। এই রকম একটি নাট্যপ্রসঙ্গ-

“কাল। কি কথা কইব? যার ঘরে ভাত নেই তার আবার কথা কি? দিন দিন না খেয়ে শুকিয়ে তোর চেহারা কি হ’য়েছে দেখে দেখি! আমি মরদ, কিন্তু আমি তোকে খেতে দিতে পারি নে। এক একবার ইচ্ছে হয় ম’রে তোর পথ পরিষ্কার ক’রে দিই। তুই আবার কাউকে বিয়ে কর, সুখে থাক--দু’ মুঠো খেয়ে বাঁচ!

ফুল্লরা। খেয়ে তো সবাই বাঁচে। আমরা তো না খেয়েও এতদিন একরকম বেঁচে আছি। কি অভাব আছে আমাদের। কাঁসাইয়ের বুক ভরা মিষ্টি জল আছে, সব দিন শিকারে মাংস না মেলে, গাছে ফল আছে, মাঠে শাক আছে, এমনি ক’রেই দিন যাবে! আর বিয়ে? একটুও বুদ্ধি নেই তোমার? মেয়ে মানুষের কবার বিয়ে হয়? এহকাল পরকালের সম্বন্ধ তোমায় আমায়, আমরা ইচ্ছে ক’রে কি এ বাঁধন কেউ প’রেছি। জন্ম-জন্মের বাঁধন! -তোমারও পালাবার যো নেই, আমারও পালাবার যো নেই। তবে মিছে কেন ওসব কথা তুলে আমায় কষ্ট দাও।”^{১০৫}

তাদের এই কথায় অভাব অনটনের পরিচয় থাকলেও দাম্পত্য ভালোবাসার সম্পর্কটি অনেকটা বড়ো হয়ে ধরা দিয়েছে; যা একান্তভাবে সবকালের মানুষের কাছে শ্রেয়। ইতিমধ্যে কলিঙ্গ রাজার পুত্র যুবরাজ ফুল্লরার আত্মসম্মানে আঘাত আনার চেষ্টা করে। কিন্তু ফুল্লরা তার কান ধরে নিয়ে আসে এবং কুড়ুল দিয়ে তাকে হত্যা করতে চেয়েছে। কিন্তু কালকেতু যুবরাজকে চিনতে পেরে রেহাই দেন এবং বন থেকে চলে যেতে বলেন। এইভাবে অপমানিত হয়ে যুবরাজ প্রতিহিংসার দাবানলে জ্বলতে থাকে। তাতে ইন্ধন জোগায় ভাঁড়ুদত্ত। ভাঁড়ুদত্ত যখন যুবরাজকে বলে যে কলিঙ্গ রাজার ছেলে হওয়া সত্ত্বেও ফুল্লরা তার কান মলে দেওয়ার সাহস পায় কি করে? যুবরাজ তখন পিতা কলিঙ্গ রাজার উপর রাগ করে বলে-

“যত দোষ সব আমার ঐ বুড়ো বাবার। বাবা যদি না থাকত তাহ’লে কি আমায় এই রকম ক’রে লুকিয়ে এসে অপমান হ’তে হয়! সিংহাসনে বসলে আমি কি এ বেটাদের গ্রাহ্য ক’রতুম! বেটাদের গ্রামকে জ্বালিয়ে দিতুম, মেয়ে মদ সব বেঁধে নিয়ে গিয়ে দোরস্ত ক’রে দিতুম! তা বুড়ো

মরবেও না, আর আমার সিংহাসনে বসাও হবে না—মনের দুঃখ সব মনেই রইল।”^{১০৬}

নাটকের তৃতীয় অঙ্কে ব্যাধপল্লীতে বাবাঠাকুরের ছদ্মবেশে নারদের উপস্থিতি ঘটেছে এবং তিনি কালকেতু-ফুল্লরাকে মা দুর্গার আগমনের কথা জানান। ফুল্লরার মনে দুর্গা মাকে দেখার ইচ্ছা প্রবলভাবে জাগে। কিন্তু কলিঙ্গ রাজবাড়িতে যেতে সাহস পায় না ব্যাধেরা। কারণ তারা যদি মারে। তাদের প্রশ্নের উত্তরে নারদ জানান—

“সে দোষ তোদের। তোরা মনে করিস্ মার খেতে জন্মেছিস, তাই তোদের মারে; তোরা মনে করিস ওরা বড়, তোরা ছোট, সেই জন্যেই মারে; তোরা ওদের ভয় করিস, দেখলে পালাস্, সেই জন্যেই তারা মারে। যেদিন- যে মুহূর্তে তোরা মনে ক’রবি—তারাও মানুষ তোরাও মানুষ, সেই দিন—সেই মুহূর্ত থেকে দেখবি তোদের সঙ্গে তাদের কোন তফাৎ নেই। আর তারা মারবে না; যদি মারতে যায়, তাদের হাত উঠবেনা। সেই দিন থেকে তারাও জান্বে যে, মার খেলে তাদেরও যেমন লাগে, তোদেরও তেমনি লাগে।”^{১০৭}

এদিকে কলিঙ্গ রাজার কাছে খবর আসে ব্যাধের দল জগজ্জননী মাকে দেখার জন্য দলে দলে রাজবাড়ির দিকে আসছে। কলিঙ্গরাজা পুরোহিতকে নির্দেশ দেন—

“পুরোহিত মশায়, আপনি যান, প্রহরীদের বলুন প্রজাপ্রাঙ্গণের যে দ্বার তা যেন ভাল ক’রে বন্ধ ক’রে রাখে ; সেনাপতিকে সংবাদ দিন, মন্ত্রীকে সংবাদ দিন, সকলকে সতর্ক হ’তে বলুন। এ পবিত্র পূজা স্থানে অস্পৃশ্য ব্যাধ যেন প্রবেশ না করে।”^{১০৮}

পর পরই কালকেতু সকল ব্যাধদের ডেকে বলেন—

“আরে ঐ ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে এতদিন আমাদের জন্তু ক’রে রেখেছিস্! আর আমরা ভয় করিনি। আরে এই ঘরে মা আছে, এই ঘরে মা আছে। আরে—তোরা সব আয়—আয়—দেখবি আয়।”^{১০৯}

কলিঙ্গ রাজা ব্যাধের স্পর্শ করা প্রতিমাকে বিসর্জন করার নির্দেশ দেন। এদিকে মদ্যপ কুলাঙ্গার পুত্র যুবরাজ পিতাকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন ভাঁড়ুদত্তের পরামর্শে। কলিঙ্গ রাজা পুত্রের এই অধঃপতন দেখে হতবাক হন; রাজ্য ছেড়ে বনবাসে

চলে যান। এদিকে রাজ্যের মানুষের উপর অত্যাচার, নারী নির্যাতন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। দ্বিতীয় দৃশ্যে (২য় অঙ্ক) ব্যাধ কালকেতুর কাছে স্বর্ণগোধিকা রূপে পার্বতী ধরা দেন। ফুল্লরা বাড়ি এসে দেখেন এক রূপবতী ষোড়শী রমণী তাঁর কুটীরে বসে আছে। যখন তিনি জানতে পারলেন কালকেতু তাঁকে ধরে নিয়ে এসেছেন, তখন সতীন সম্ভাব্য জ্ঞানে তাঁকে বিদায় করার চেষ্টা করেন। বুদ্ধিমতী নারীর মতো ফুল্লরা তাঁকে বলেন—

“ওমা! আমার মাথা খেতে একি কথা বলে গো? স্পষ্ট ব’ল্লে, আমার স্বামীর দুঃখে কাতর? আমি জেনে শুনে এই সুন্দরী, ঘোর যুবতীকে আমার ঘরে ঠাই দেব? (প্রকাশ্যে) না বাছা, আমার এখানে থাকবে কোথায়? আমাদের এই একখানি ঘর ; তারপর, তুমি নিজেই তো ব’ল্লে আমাদেরই পেট চলে না—তোমার অন্ন জোটাতে কে?”^{১০}

কিন্তু কালকেতুকে ছেড়ে ষোড়শীরূপী পার্বতী যখন ঘর থেকে যেতে চান না, তখন ফুল্লরা রাগ করে বলেন—

“ওমা, একেবারে ম’রেছে! এ বলে কি? এমন বেহায়া তো কখনো দেখিনি। (প্রকাশ্যে) ছি মা, ছি, এমন কথা কি মুখে আনতে আছে? সোমন্ত মেয়ে, ঘর ছেড়ে পরের ঘরে থাকবে? লোকে ব’লবে কি? মুখ দেখাবে কি ক’রে? আর আমি মেয়েমানুষ হ’য়ে তোমায় এ হীন কাজ ক’রতেই বা দেব কেন? তার পর ধর, তোমার বিরহে তোমার স্বামী যদি ম’রেই যায়, তখন কোন্ ঘাটে জল থাকবে? তোমার স্বামী যাই হ’ক—তোমায় দেখে মনে হ’চ্ছে তুমি বড় ঘরের মেয়ে ; তুমি মা বাপের মুখ পোড়াবে? স্বামীর মাথা হেঁট করাবে? তার চেয়ে—আমার ঘরে অস্ত্র আছে, বল তো বা’র করেই, গলায় দাও—কাঁসাইয়ের ঐ জল আছে, ডুবে মর!”^{১১}

ফুল্লরা স্বামীকে গভীরভাবে ভালোবাসেন ও বিশ্বাস করেন। কিন্তু সম্ভাব্য সতীনের ভাবনাটি তাঁকে ব্যথিত করে। কালকেতু ফুল্লরার কাছে এইসব অপবাদ শুনে প্রচণ্ড রেগে যান এবং ছদ্মবেশী চণ্ডীকে দেখে অবাক হন। পরবর্তী সময় চণ্ডী তাঁর আপন পরিচয় জানান এবং বলেন তাঁদের দুঃখ মোচনের জন্যই তাঁর আগমন। কালকেতুকে পার্বতী সাতঘড়া ধন এবং একটি বহুমূল্যের আংটি প্রদান করেন এবং নির্দেশ দেন—

“কালকেতু, তোমায় যা বলিছি তা যেন কখনো ভুলে যেওনা। এই সম্পদ নিয়ে তুমি কাঁসায়ের এপারে বন কেটে নূতন বাজ্য বসাত। তুমি গরীব থেকে রাজা হবে, গরীবকে কখনো ভুলোনা—গরীবের ব্যথা বুঝে কাজ করো।”^{১২}

এখানে কালকেতু চরিত্রে একালের লোভী মানুষের পরিচয় ফুটে উঠেছে। যে দেবীমা তাঁকে সাত ঘড়া ধন দান করেছে, সেই মার কাছে তিনি আরো এক ঘড়া ধন চেয়েছেন। এমনকি শেষের ধনঘড়া মাকেই বহন করে নিয়ে আসতে বলেছেন। তারপরেও দেবীর উপর তাঁর সন্দেহ রয়েছে পুরোদমে—

“তবে এস। (দুই এক পদ গিয়া) (স্বগত) পেছনে আসছে, ঘড়াটা নিয়ে স’রবে না তো?”^{১৩}

একসময় কাঁসাইয়ের পারে বনকেটে কালকেতু গুজরাট নগর পত্তন করেন। গুজরাট রাজ্যের রাজা হয়ে কালকেতু সকল ব্যাধদের এবং কলিঙ্গ রাজ্য থেকে আগত প্রজাদের স্বাধীনভাবে বাঁচার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিন্তু ভাঁড়ুদত্তের প্রতারণায় গুজরাটের প্রজাদের মধ্যে যখন ক্ষোভ তৈরি হয়, তখন কালকেতু দোষী ভাঁড়ুদত্তের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করেছেন। একজন ব্যাধকে ডেকে কালকেতু ভাঁড়ুদত্তের শাস্তিদানের প্রসঙ্গে বলেছেন—

“একে নিয়ে যাও; একে পাঁচচুলো ক’রে কামিয়ে, এর মাথায় ঘোল ঢেলে, গাধার পিঠে চড়িয়ে, নিজের দেশে পাঠিয়ে দাও!”^{১৪}

কালকেতুর এই শাস্তিদানের কথা ভাঁড়ুদত্ত ভুলে যায়নি। সে কলিঙ্গ রাজার সঙ্গে পরামর্শ করে কৌশলে কালকেতু ও ফুল্লরাকে বেঁধে নিয়ে যায় কলিঙ্গ রাজ্যে। সেখানে ফুল্লরার উপর নির্যাতন করার চেষ্টা করেন কলিঙ্গ যুবরাজ। কিন্তু ব্যর্থ হন। যুবরাজ পত্নী বল্লভা স্বামীর এই অশোভনীয় আচরণের প্রতিবাদ করে বলে—

“তোমার স্ত্রী আমি, চিরদিন নরকে বাস কচ্ছি, কিন্তু এর চেয়ে নরক আর কোথায় আছে যেখানে গিয়ে দাঁড়াবো? তুমি এসেছ এই সতীর সর্বনাশ ক’রতে—যাঁর দয়ায় আমি কলিঙ্গের রাজকুলবধূর সম্মান নিয়ে ফিরে এসেছিলুম তোমার গৃহে, যে গৃহ তোমার ব্যবহারে চিরদিনই আমার নরক ব’লে মনে হ’য়েছে! তবু ফিরে এসেছিলুম, কিন্তু এখন দেখছি বুঝি না এলেই ভাল ছিল! আমি

এই মার কাছে মেয়ের মতই থাকতুম, এ জ্বালা আর ভোগ
ক'রতে হতো না।”^{১১৫}

যুবরাজের তরবারির আঘাতে বল্লভার মৃত্যু হয়। এদিকে বন্দী কালকেতু ফুল্লরাকে
বাঁচাতে না পেরে দেবী চণ্ডীর উদ্দেশ্যে বলেন—

“মা—মা, একি রহস্যের আবরণে ঢাকা তোর বিচিত্র লীলা! আজ
আমারই সামনে—আমি সেই কালকেতু কিন্তু একটা ক্ষুদ্র শিশুর
চেয়েও অসহায়, নিরীক্ষ্য, অক্ষম, আমারি সামনে একটা পশু,
একটা পিশাচ, নারীর উপর অত্যাচার ক'রছে, আর আমি শুধু
দাঁড়িয়ে দেখছি, দাঁড়িয়ে দেখছি! ফুল্লরা! ফুল্লরা! এখনো আমি
বন্দী!”^{১১৬}

ভক্তের কাতর অনুনয়ে সাড়া দিয়ে তাঁদের এই বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য
স্বয়ং পার্বতী আসেন। কালকেতু ফুল্লরাকে অভয় দিয়ে বলেন—

‘এস পুত্র কালকেতু, এস মা ফুল্লরা, তোমাদের অন্ধকার কেটে
গেছে, আর ভয় নেই’।”^{১১৭}

এরপরেই দৃশ্য পরিবর্তন হয়। কালকেতু তাঁর আরাধ্যা দেবীকে এইরকম দুঃখ পাওয়ার
কারণ জানতে চাইলে মা চণ্ডী বলেন—

“ব্যথার সংসার, দুঃখই গুরু—দুঃখই শিক্ষক। তুমি গরিব থেকে
রাজা হ'য়েও গরীবের দুঃখ ঠিক বোঝনি; হিংস্রক ব্যাধের সংস্কার
তোমার একেবারে যায় নি। এখন তুমি আগুনে পোড়া সোনা।
আর তোমার ভয় নেই।”^{১১৮}

এই অংশে নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে মহাদেব চরিত্র, যা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা পাই
না। মহাদেব কলিঙ্গ রাজার কারাগারের সামনে উদয় হন এবং হুঙ্কার দিয়ে বলেন—

“কৈ রাজা, কারা কলিঙ্গ আক্রমণ ক'রেছে? কৈ সেই ব্যাধের রাজা
কালকেতু? কোন্ দেবতা তার সহায়! ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ—দেখি
কার স্পর্ধা এই ত্রিশূলের আঘাত—”(ত্রিশূল উত্তলোন করিয়া
মহাদেব প্রবেশ করিলেন, তাহার সঙ্গে মন্ত্রী ও পুরোহিত) (পার্বতী
দেখিয়া) হরি! হরি! হরি! একি পার্বতী? তুমি? তবে নারদটা
আমায় কি ব'লে নিয়ে এল। কৈ কোথায় গেল সে?”^{১১৯}

নাটকের পরিণতি অংশে অবশ্য যুবরাজ চরিত্রের শুদ্ধিকরণ ঘটেছে। মা পার্বতীর আশীর্বাদে এবং ফুল্লরা কালকেতুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনায় যুবরাজের মুক্তি হয়েছে। দেবী পার্বতী মর্ত্যের স্বার্থপর কুচক্রান্তকারী মানুষের প্রতীক ভাঁড়ুদত্তের প্রসঙ্গে বলেছেন—

“যারা বিশ্বাসঘাতক, যারা ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য অনায়াসে পরের সর্বনাশ করে, যারা দেশদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, যারা মানুষ হ’য়ে মানুষের শত্রু, তারা চিরদিনই এমনি চোখ বুজে থাকে—চোখ বুজে থাকবে। ওকে ছেড়ে দাও।”^{১২০}

কালকেতু-ফুল্লরার মিলনে নাটের সমাপ্তির ঘটে। চণ্ডীমঙ্গলের পৌরাণিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্যের কাহিনি একালের নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নতুনভাবে বাস্তব প্রেক্ষাপটে আধুনিক করে পরিবেশন করেছেন। স্বর্গের দেব-দেবীর দয়া-দাক্ষিণ্য থাকলেও কালকেতু-ফুল্লরার দাম্পত্য জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথাকেই তিনি নাটকের প্রধান বিষয় করে তুলেছেন। সেই সঙ্গে তুলে ধরেছেন ভাঁড়ুদত্তের মতো অসৎ, লোভী মানুষের পরিচয়, যা সবকালেই আমরা খুঁজে পাই। আমরা পাই কলিঙ্গ রাজার মদ্যপ, লম্পট, চরিত্রহীন পুত্র যুবরাজকে, যে নিজের স্বার্থ চারিতার্থ করার জন্য বৃদ্ধ পিতাকে বনবাসে যেতে বাধ্য করেছে। এমনকি ব্যাধ পত্নী ফুল্লরাকে সে ধরে এনেছে নিজের কামনা চরিতার্থ করার জন্য। এইরকম চরিত্রের সন্ধান একালেও পাওয়া যায়। এইভাবে নাট্যকার কাহিনি বিস্তার এবং চরিত্র গঠনে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করেছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রেক্ষাপটে ‘ফুল্লরা’ নাটকটি এইভাবে কাহিনিগতভাবে পুনর্নির্মিত হয়ে উঠেছে।

নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের কাহিনী অনুসরণ করলেও নাটকটির নামকরণ করেছেন ‘ফুল্লরা’ চরিত্রটিকে অবলম্বন করে। ফলে নাটকটিতে গুরুত্ব পেয়েছে নারীভাবনার কথা। ফুল্লরার দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবন থেকে গুজরাট রাজ্যের রাণী হয়ে উঠার মধ্যে একটি নাটকীয় বিবর্তন দেখানো হয়েছে। প্রথমপর্বে ফুল্লরা দরিদ্র ব্যাধপত্নী হওয়া সত্ত্বেও সংসার চালানোর জন্য স্বামী কালকেতুকে নানাভাবে সহায়তা করেছে। এমনকি নিজে মাংস বিক্রি করে উপার্জনের চেষ্টা করেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ফুল্লরার মতো নারী কীভাবে নিজের স্বাধীনতা ও অধিকার বজায় রাখতে সংগ্রামী হয়ে উঠেছে, এ নাটক তারই প্রমাণ দেয়। স্বামী কালকেতুর প্রতি তার একনিষ্ঠ ভালোবাসা সাংসারিক অভাব-অনটনের মধ্যে বিন্দুমাত্র কমেনি। এমনকি সতীন সম্ভাব্য নারী দেবীচণ্ডীকে তাড়ানোর জন্যে নানারূপ কৌশল অবলম্বন করেছে ফুল্লরা। সেই আচরণে একদিকে তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় যেমন ফুটে উঠেছে, অন্যদিকে স্বামী প্রেমের

একনিষ্ঠতাও ধরা পড়েছে। আবার কলিঙ্গ যুবরাজের স্ত্রীকে কালকেতু বন্দী করে রাজবাড়ীতে আনলে নারী হয়ে ফুল্লরা নারীত্বের অপমান সহ্য করেনি। সে কালকেতুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলেছে—

“কি পাপ ক’রেছিল এই সব নিরীহ মেয়ে, কি পাপ করেছিল যুবরাজের স্ত্রী—যে, গরু ভেড়া ছাগলের মতো তাদের বেঁধে এনেছ? আমরা মেয়ে—আমাদের যদি কেউ ধরে নিয়ে যায়, আমাদের ইজ্জৎ যাবার ভয়েই না তোমাদের অপমান? আর তাদের দেশের মেয়েদের ইজ্জৎ নেই? যারা পাপ করলে, তারা শাস্তি পেলেনা, সে অত্যাচারী যুবরাজের কিছু করতে পারলে না; তাদের দেশের কতগুলো লোককে মেরে কেটে তাদের মেয়েদের ধরে আনলে।”^{১২১}

ফুল্লরার প্রতিবাদী কথায় একালের নারীবাদ প্রতিধ্বনিত হতে দেখা গেছে। পরবর্তী সময় কালকেতু ও ফুল্লরা যখন কলিঙ্গ রাজার কারাগারে বন্দী হয়েছে, তখন ফুল্লরা করুণাময়ী মা চণ্ডীকে ডাকতে ভোলেনি- ‘মা, করুণাময়ী-মা, একি তোমায় ভুলবার প্রয়শ্চিত্ত। এত কঠিন—এত কঠিন’। নাট্যকাহিনিতে দেবতার কথা থাকলেও ফুল্লরা ও কালকেতুর জীবনকাহিনি প্রধান হয়ে উঠেছে। কালকেতুর ব্যধ থেকে রাজা হয়ে উঠার মধ্যে অল্পবিস্তর অবাস্তবতা প্রকাশ পেলেও তাকে বাস্তব করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে দেবীর আশীর্বাদে। আবার এরই পাশাপাশি বাস্তব চরিত্র আঁকতে গিয়ে মুরারি শীল ও ভাঁড়ু দত্তের মতো চরিত্রদুটি এসেছে। এইভাবে দোষে-গুণে ভরা ‘ফুল্লরা’ নাটকের চরিত্রগুলি পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। যদিও এ সবই মূল কাব্যের অনুসরণ, তথাপি নাটকের এই সফলতাকে সার্থক করে তুলেছে সংলাপ। সংলাপই নাটকের প্রাণ। সঠিক পরিবেশ রচনা, শব্দচয়ন, উপযুক্ত বাক্যবিন্যাস এবং চরিত্রগুলির মুখোমুখি কথোপকথন নাটকটিকে আঙ্গাদনযোগ্য করেছে। এর ফলে নাটকটি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। যেমন কালকেতু দরিদ্রজীবনের কথা বলেছে এইভাবে—

সম্বলের মধ্যে এই ভাঙ্গা কুঁড়ে, তার আবার মটকায় খড় নেই ; ভেরাণ্ডার কচার খুঁটি—জাউ খাবার একখানা ভাঙ্গা খোঁরাও নেই—গর্ত খুঁড়ে আমানি খাই—^{১২২}

উপরোক্ত সংলাপে মূল কাব্যের অনুসরণ স্পষ্ট হলেও ‘মটকা’ (ঘরের চাল অর্থে ব্যবহৃত), ‘কচা’ (ভেরাণ্ডার থাম বা খুঁটি অর্থে ব্যবহৃত), ‘জাউ’ (খুদের ঘণ্টা অর্থে ব্যবহৃত) এবং ‘খরা’ (মাটির পাত্র অর্থে ব্যবহৃত)- প্রতিটি আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার ভাষা ও সংলাপকে

জীবন্ত, বাস্তব এবং মানানসই করে তুলেছে। কালকেতুর ভাষা আমাদের আদিম ব্যাধ-সমাজের কথা মনে করিয়ে দেয়। আবার ভাঁড়ু দত্ত যখন কলিঙ্গ রাজ্যের সহায়তায় কালকেতুকে বন্দী করতে আসে, তখন তার ভাষাতে কূটকৌশলী মানুষের পরিচয় বড় হয়ে উঠে। ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুকে বলে—

“সব জিনিসের কি আর মানে হয় বাবা! তা হ’লে আর ভাবনা কি? যখন বনের মাঝে ঘড়া ঘড়া টাকা পেয়েছিলে, তখন কি তার মানে খুঁজেছিলে? এর মানে হচ্ছে (ইঙ্গিত করিলামাত্র কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ) এই কালকেতু, বিদ্রোহী ; একে বাঁধো।”^{১২৩}

এইভাবে ভিন্ন-ভিন্ন চরিত্রের জীবন্ত ভাষা-সংলাপে নাটকটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। মধ্যযুগের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের ভাবনা একালের মতো করে নাট্যকার পরিবেশন করেছেন। ফলে নাটকটি পুনর্নির্মিত হয়ে উঠেছে।

৯। শিশিরকুমার দাস- ভাঁড়ু দত্ত (১৯৭৭);

১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে শিশিরকুমার দাস ‘চণ্ডীমঙ্গল কাব্য’র অন্যতম খল চরিত্র অবলম্বনে রচনা করেন ‘ভাঁড়ু দত্ত’ নামের একটি ছোট নাটক। ২১ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১৬.৫ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটিতে প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (১), চরিত্রলিপি (১), ভূমিকা (১), মূল নাটক (৪৩) সহ মোট ৪৭ টি পৃষ্ঠা আছে। নাট্য পত্রিকাসহ নাটকটির প্রচ্ছদপত্র এইরূপ -

“বহুরূপী/ সাংখ্যা- ৪৮/ ৭, লোয়ার রেঞ্জ,/ কলকাতা - ৭০০০১৭।”^{১২৪}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ-

“ভাঁড়ু দত্ত/ শিশিরকুমার দাস/ বহুরূপী/ সাংখ্যা - ৪৮/ ৭, লোয়ার রেঞ্জ,/ কলকাতা - ৭০০০১৭।”^{১২৫}

নাটকে উল্লিখিত চরিত্রগুলি হল- কালকেতু, ফুল্লরা, দেবী, বুড়ী, হরি, মধু, যদু, বুড়ো, গণেশ, গণৎকার, মন্ত্রী, ভাঁরু দত্ত, শ্রীনিবাস, রাধিকা, গোপিনী, রামধন, রহিম, প্রহরী, যাত্রী, সওদাগর ইত্যাদি।

শিশিরকুমার দাস রচিত ‘ভাঁড়ু দত্ত’ নাটকটির সূচনা হয়েছে স্থান-কাল চিহ্নিত করে। স্থান- বাংলাদেশের একটি গ্রাম। কাল- ষোড়শ শতাব্দী। সকাল বেলা, চারদিক

কুয়াশায় ঢাকা, খড়ের তৈরি একটি কুঁড়ে ঘরের সামনে মাটির দাওয়ায় ব্যাধ কালকেতু তীর ধনুক পরীক্ষা করছে। আর তার বৌ ফুল্লরা সংসারের কাজে ব্যস্ত। এইসময় এক প্রতিবেশী বৃদ্ধা এসেছে ফুল্লরার কাছে ধার চাইতে। কালকেতুর দারিদ্রের সংসারে অভাব-অনটন লেগেই আছে, তার পক্ষে ধার দেওয়া সম্ভব নয়। তবু কালকেতু খুড়িকে ধার দেওয়ার জন্য ফুল্লরাকে অনুরোধ করে। কিন্তু ফুল্লরা এই অভাবের কষ্টকে মেনে নিতে পারে না। স্বামী কালকেতুকে অভিযোগ করে বলে—

“মুরোদ তো নেই কিছু কামাবার প্রাণের খুড়িকে দিতে হবে ধার! আজ চারদিনে কি এনেছ ঘরে? জুটেছিল বৌ কী বরাত জোরে তাই তো খাচ্ছ, আর কেউ হলে বাপের বাড়ীতে কবে যেত চলে। খুড়ি, খুড়ি, খুড়ি মরণ আমার।”^{১২৬}

কালকেতু পত্নী ফুল্লরার কষ্টে দুঃখ পায়, ফুল্লরাকে কথা দেয় পূজার সময় গহনা গড়িয়ে দেওয়ার। ফুল্লরা রাগ করে কালকেতুকে বলে—

“হ্যাঁ, হ্যাঁ জানা আছে, সব আছে জানা কার কী মুরোদ, ঘরে নেই দানা বাঁচতে দিলে না দুটো ভাত মুখে মরলে রাখবে একেবারে বুকো। আহা, মরে যাই, জ্বলে গা পিঁত্তি একই কথা সেই, নিত্বি নিত্বি শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা—বানরের গায় মুক্তোর মালা—”^{১২৭}

কালকেতু-ফুল্লরার অভাবের সংসারে এই রকম নিত্যদিন অশান্তি লেগেই থাকে। ফুল্লরার কথায় কালকেতুর পৌরুষে আঘাত লাগে। সে বনে শিকার করতে যায়। ফুল্লরা তাকে ঐ দিন যেতে মানা করে। সেদিন চারিদিকে অন্ধকার কুয়াশায় ভরা, তার উপর প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। কালকেতু ফুল্লরার কোন কথা শুনতে চায় না, ফুল্লরা তাকে অনুরোধ করে বলে—

“ওগো শোন শোন, একটু দাঁড়াও আজকে যেও না, দিন ভালো নয় আমার কেমন করছে গো ভয়। যা আছে তা খাব। কিছু আছে জাউ পুকুরে কলমী, বাগানের লাউ কুমড়োর ফুল। কি চাই বা আর রয়েছে মায়ের হাতের আচার।”^{১২৮}

তা সত্ত্বেও কালকেতু শিকারে বার হয়। ফুল্লরা দুর্গা নাম জপ করে এবং সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরে আসতে অনুরোধ করে। কালকেতুর ও ফুল্লরার অনুপস্থিতিতে তাদের কুঁড়ে

ঘরের সামনে বসে থাকে একটি সুন্দরী মেয়ে রূপী ছদ্মবেশী দেবীচণ্ডী। ফুল্লরা সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে এসে তাকে দেখে অবাক হয়। ফুল্লরা মেয়েটির পরিচয় জানতে চায়, ছদ্মবেশী দেবী জানায়—‘ ফুল্লরা, নই চোর আমি নিয়ে এসেছে তোর স্বামী’। ফুল্লরা ভুলবশত স্বামী কালকেতুর উপর সন্দেহ করে, আশু সতীনের জ্বালা অনুভব করে নিজেই নিজেকে বলতে থাকে—

“কি বলছে গো, সর্বনাশী—আমার দুঃখ, তোমার হাসি—দাঁড়াও দেখি আসুক ঘরে ঝাঁটা ভাঙব পিঠের পরে/ দিনে দিনে বাড়ছে বয়স/ উথলে উঠছে তবু যে রস/ পরের বৌ-র দিকে দৃষ্টি/ বুড়ো বয়সে অনাসৃষ্টি/ আপদ জুটলো সতীন কাঁটা—/ মুখে মারব খ্যাংরা ঝাঁটা—”^{১২৯}

এরপর ফুল্লরা অপরিচিত রমণীকে তার বারো মাসের দুঃখ-কষ্টের কথা শোনায। কোন কথায় যখন মেয়েটি বৃঝাতে চায় না, তখন ফুল্লরা মাটিতে বসে চিৎকার করে কান্না শুরু করে। ইতিমধ্যে কালকেতুর আগমন ঘটে। কালকেতু ফুল্লরাকে জিজ্ঞাসা করে—

“হঠাৎ আবার কী হল তোর? সন্ধ্যা বেলায় তুলিস নে শোর—কি হয়েছে, বলবি, না কি?”^{১৩০}

ফুল্লরা অনেক রকম হেঁয়ালী করে কালকেতুকে জানায় যে সে অন্যের বউকে ঘরে এনেছে। কালকেতু অবাক হয়। সে মেয়েটির প্রকৃত পরিচয় জানতে চায়—

“কে গা তুমি, বাপের কি নাম? কতদূরে তোমাদের গ্রাম? তুমি একলা মেয়েছেলে কেমন করে চলে এলে?”^{১৩১}

এর পরেই দেবী চণ্ডী কালকেতু-ফুল্লরাকে আশীর্বাদ করেন ও সাত ঘড়া মোহর দান করেন এবং কালকেতুকে গুজরাট নগরের রাজা হওয়ার বর দেন। নাট্যকাহিনীতে আসে ভাঁড়ু দত্তের প্রসঙ্গ। কলিঙ্গ রাজ্যে ভাঁড়ু দত্ত লোক ঠকানোর ব্যবসা করে। কাউকে পাশা খেলায় পাশা বদল করে অন্যায়ভাবে হারিয়ে সমস্ত কড়ি জিতে নেয়, কারো কাছে নকল ঘি বিক্রি করে বোকা বানিয়ে অর্থ উপার্জন করে। এমন সময় ভাঁড়ু দত্ত কয়েক জনের কাছ থেকে জানতে পারে বীর কালকেতুর কথা। সেই প্রসঙ্গের একটি নাট্য মুহূর্ত —

“যদু।। গিয়েছিলাম শেয়াল রাজা, যাচ্ছি এখন বনগাঁয়।

ভাঁড়ু।। শেয়ালরাজা? নামটাতো কই ঠেকছে নাকো
জানাশোনায।

শশী।। আগে ছিল বনজঙ্গল, এখন বাড়ি যায়না গোণা
দেবীর বরে হ'ল রাজা। কালকেতু ঐ বীর শিকারী
আজ সারাদিন খাওয়াচ্ছে লোক, ঐ দেখা যায়
রাজার বাড়ি।

ভাঁড়ু।। শেয়ালরাজা, শেয়ালরাজা, গাঁয়ের নামটি শুনতে
বেশ।

যদু।। গাঁ লয়গো, গাঁ লয়গো, নতুন রাজ্য, নতুন দেশ
কালকেতু সে দয়ার শরীর, দেখা করতে যেই
যাচ্ছে সেই তো কেমন সুখে আছে, দিব্যি কেমন
খাচ্ছে দাচ্ছে আমাদের সব খেতে দিয়েছে, ধুতি
দিয়েছে, দেবেও আবার—”^{১৩২}

এবার ভাঁড়ু দত্তের মনে মাকালির উপর ক্ষোভ জন্মায়। সে মাকালীকে অভিযোগ করে
বলে—

“জয় তোমারই। জয় তারা জয়! জয় তারা জয়! একি বিচার,
মাগো তোমার আমিও ভক্ত, কালকেতুকে দিলে তুমি পড়ে রইল
ভাঁড়ু দত্ত।”^{১৩৩}

এর পরেই ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুর রাজবাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। কালকেতুকে ভুল
বুঝিয়ে নিজের মিথ্যা পরিচয় দেয়—

“ধর্মকেতুর মামার জামাই তার সেজ পিশির ন’ নন্দাই তার যে
ছেলের খুড়তুতো বোন তার মাসশাশুড়ির নিজের আপন জেঠতুতো
ভাই আমার হলেন তাওই মশাই বয়স আশী, ভীষণ বুড়ো বুঝলে
তুমি কোন সুবাদে আমার খুড়ো।”^{১৩৪}

মন্ত্রী এবং ভাঁড়ু দত্ত মিলে অন্যায়ভাবে প্রজাদের উপর অত্যাচার করে অর্থ আদায় করে।
কালকেতু যখন ভাঁড়ুকে প্রজাদের নালিশের কথা বলে, তখন ভাঁড়ু দত্ত উত্তর দেয়—

“শোন না, বলছি, শোন কালু কাকা তুমি তো জানোই গঙ্গার বান
ভেসে গেছে লোক, হারিয়েছে প্রাণ শত শত লোক, ডোবা পথ ঘাট
ডুবে গেছে, ঘর ভেসে গেছে মাঠ শুধুই তাদের জন্য এ টাকা।”^{১৩৫}

একের পর এক কালকেতুর অভিযোগ ভাঁড়ু দত্ত খণ্ডন করে। একসময় রাজ বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয় কালকেতুর বাল্য বন্ধু গদাই। সে মন্ত্রী ও ভাঁড়ুদত্তের অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কালকেতুকে বলে—

“গালে দিয়ে হাত ভাবলে কি হবে? মন্ত্রী তোমার লুটে পুটে নিল রাজভাণ্ডার আজ এর ঘরে, ওর ঘরে কাল লাগায় আগুন, হয়ে গেল লাল টাকা মেরে মেরে। যেখানে পাচ্ছে তোমার ভাইপোটি ঠকিয়ে খাচ্ছে সমস্ত দেশ, কানে দিয়ে তুলো পিঠেও বেঁধেছ বোধকরি কুলো। এই কে আছিস, নিয়ে আয় বাওয়া এখন একটু কড়া গাঁজা খাওয়া। আগুন লাগাবে ঘরেতে আমার। সেদিন অ্যাসা দিয়েছি না মার ভাঁড়ু দত্তকে, ফস্টি নস্টি মেয়ের সঙ্গে। পস্টিপস্টি বলি কালুরাজ, ভাঁড়ুকে তাড়াও এ রাজ্য চলে মন্ত্রী ছাড়াও কী বাড় বেড়েছে, ওরা দিন দিন অবস্থা শেষে হবে সঙ্গীন।”^{১৩৬}

কালকেতুর রাজসভায় রামধন পাঁড়ে, রহিম চাষী, ফলওয়ালী, বৈষ্ণবেরা এসেছে অভিযোগ জানাতে। রাজা কালকেতু এবার সত্য উপলব্ধি করে। কালকেতু ভাঁড়ুকে হাত-পা বেঁধে কারাগারে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়। ঠিক সেইসময় যুদ্ধের দামামা বেজে উঠে। এক অপরিচিত ভিন গাঁয়ের যাত্রীর মুখ থেকে শোনা যায় কালকেতুর যুদ্ধ জয়ের কথা। একজন যাত্রী বলে—

“তা যা বলেছো, রাস্তায় চলা ফেরা করা ছিল দায়। ম’ল ভাঁড়ুটাকে জুটিয়ে – এখন ত ল্যাজ গুটিয়ে ভুনি রায় গেল গর্তে, বৃথাই যুদ্ধ করতে এসেছিলি বাপু, ভুনি রায় সেই তো পালালি লজ্জায়।”^{১৩৭}

তৃতীয় যাত্রী সহমত পোষণ করে বলে যে যত নষ্টের মূলে মন্ত্রীমশাই। সে এক জোচ্ছোর। ভাঁড়ু দত্তকে কালকেতু গদান দেওয়ার কথা বললে ফুল্লরা বাধা দেয়। শেষ পর্যন্ত কালকেতু ভাঁড়ুকে নাপিত দিয়ে মাথা ন্যাড়া করে, ঘোল তেলে গাধার পিঠে বসিয়ে সারা নগরে ঘোরায়ে এবং কারাগারে ঢোকায়। কিন্তু কালকেতু কৌশল করে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এর পরেও ভাঁড়ুদত্তের চরিত্রের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। পুনরায় মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে যুক্তি করে দুই বিদেশী সদাগরের টাকা পয়সা ও মণিমুক্ত লুটপাট করে। দ্বিতীয় সদাগরের মুখে শোনা যায় সেই কথা—

“লুটেপুটে নিলরে সব, সব যে গেল ওদের হাতে। তোমার জন্যে, সব নিল যে দুই ডাকাতে।”^{১৩৮}

পাহারাদার গণেশ বুঝতে পারে এই ডাকাত আর কেউ নয়, ভাঁড়ুদত্ত ও মন্ত্রী। এর পরে দুই জন প্রহরী ভাঁড়ু দত্তকে ধরে নিয়ে আসে। তখন গণেশ বলে—

“অবশেষে সাধু বাবা দৈব দুর্বিপাকে ধরা পড়লে? এসো, এসো, এই সদাগর এঁরাই বুঝি গুরু শিস্য? বুঝেছি, তারপর মুখ তোল ভাই, তোল, তোল, দেখি বদন চাঁদ অনেক ঘুঘু দেখেছ ভাই এবার দ্যাখ ফাঁদ।”^{১৩৯}

বিদেশী সদাগর তাদের অর্থ ও মণিমুক্ত ফেরত পায়। ভাঁড়ু দত্তের হাতে লোহার কড়া পরানো হয় এবং জেলে বন্দী করে রাখা হয়। নাট্যকাহিনির অনেক অংশেই শিশিরকুমার দাশ মূল চরিত্রগুলিকে পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেছেন। মূল কাহিনি বজায় রেখেও ভাঁড়ু দত্ত চরিত্রটির সঙ্গে তিনি সংযোজন করেছেন মন্ত্রীমশাইয়ের চরিত্রটি, যে একেবারে তার উপযুক্ত সহযোগী। কাহিনিপালাতে এসেছে ভিন্ন গাঁয়ের নানা মানুষের কথা। এসেছে রত্নব্যবসায়ী সদাগরের প্রসঙ্গ এবং সেইসঙ্গে ভাঁড়ুর চতুরতার কথা। এইভাবেই নাট্যকার চরিত্রটিকে গুরুত্ব দিয়ে অঙ্কন করেছেন ভিন্ন স্বাদের নব আখ্যান। ফলে নাটকটিতে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পুনর্নির্মাণ হয়ে উঠেছে।

শুধু কাহিনি বা চরিত্র নয়, পরিবেশ ও সংলাপ রচনায় নাট্যকার ‘ভাঁড়ু দত্ত’ নাটকটিকে একালের দর্শকের উপযুক্ত করে প্রকাশ করেছেন। ভাঁড়ু দত্তের মতো লোভী, চক্রান্তকারী মানুষ আজকের সমাজেও আছে। তাদের চক্রান্তের শিকার হয় সাধারণ দরিদ্র মানুষ। যেমন হরি তার সঙ্গে পাশা খেলতে গিয়ে হেরে যায়, তার সব অর্থ ভাঁড়ু দত্ত নিয়ে নেয়। কিন্তু পরবর্তী সময় সে তার চাতুরি ধরতে পারে। হরি বলে—

“ওরে ওরে ধরে ফেলেছি। চোর পাশা কাঠি বদলে নিয়ে—তোর শেষদিন, নয় আজকে আমার— চুরি আজকে তোরা গলায় দেব ছুরি।”^{১৪০}

একইভাবে ঠেকে যায় মধু, যদু, শশীর মতো মানুষেরা। ভাঁড়ু দত্ত ঠকবাজ বেপরোয়া মানুষের প্রতিনিধি। কালকেতুর রাজসভায় অনুমতি ছাড়াই সে ঢুকে পরে। মন্ত্রী বাধা দিলে, সে জানায়—

“তুমি চুপ করো, বন্ধু আমার ওর অনুমতি নেই দরকার। গদাই গদাই কাছে আয় ভাই। কি খবর বল রোজ ভাবি যাই কিন্তু কপাল চারিদিকে জাল। পড়ে গেছি ফাঁদে কতদিন বাদে এলিরে গদাই, ভালো আছে সব বুধুয়া, মাধব, শ্রীপতি, কানাই?”^{১৪১}

কালকেতু ভাঁড়কে কিছু টাকা দিতে চাইলে, ভাঁড় টাকা নিতে চায় না। নিজের সৎ চরিত্র প্রমাণ করতে চায়। উপরন্তু ভাঁড় বলে—

“না, খুড়ো, না না, না, খুড়ো আমি ধন্য তোমার ভালোবাসার জন্য আমার দিন তো যাবে চলে জানই তো কি শাস্ত্রে বলে টাকা পাপ কালসাপ কী ভীষণ বিষদাঁত যত হয় তত ভয়, ঘুমহীন দিনরাত টাকা মায়া টাকা ছায়া, মিথ্যা অনিত্য সরলতা সত্যতা আমি তার ভৃত্য টাকা ক্ষয়, টাকা লয়, অর্থ অনর্থ জয় হরি গান করি আমি ভাঁড় দত্ত।”^{১৪২}

ভালো মানুষের ছদ্মবেশে এবং আপনজনের পরিচয়ে সে প্রবেশ করে কালকেতুর রাজ্যে ও সংসারে; খুড়ি ফুল্লরাকে নানা ভাবে বশ করে। এমনকি রাজ্যের মানুষকে ঠকিয়ে অর্থ উপার্জন করে বিনা পরিশ্রমে। কালকেতু প্রথমে তাকে ধরতে না পারলেও পরবর্তী সময় তা বুঝতে পারে, তখন তাকে শাস্তি দেয়। কিন্তু ভাঁড় দত্ত কোনভাবেই নিজেকে শুধরে নিতে চায় না। পুনরায় সেই রকম অন্যায় কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়। একমাত্র গণেশ প্রথম থেকে ভাঁড় দত্ত ও মন্ত্রীকে বুঝতে পেরেছিল। তাই সে সামনা-সামনি মন্ত্রীকে বলেছে—

“না, না, না, ছেলেটি স্বভাবে স্নিগ্ধ, বহুগুণে ভারী গুণী গাঁজাও খায় না, সিদ্ধি টানে না, ভুলেও খায় না তাড়ি এমন কি তিনি রাখেননি রামছাগলের মত দাড়ি, শুধু ওস্তাদ সেই বিদ্যেয়, মহাবিদ্যেয়, যাতে ধরা না পড়লে শ্রেষ্ঠ বিদ্যে ; তবে যদি হাতে নাতে ধরা পড়ে যায়, ধরা পড়ে যাও—”^{১৪৩}

মন্ত্রীও ভাঁড় দত্তের মতোই অর্থলোভী মানুষ। একসময় কালকেতুর রাজসভা থেকে তার চাকরি যায়, কিন্তু অন্যায় কাজে সে সর্বদা ভাঁড় দত্তের সঙ্গে সেও যুক্ত থেকেছে। এইভাবে নাট্যকার পৌরাণিক চণ্ডীমঙ্গলের ভাব, ভাষা ও চরিত্রগুলিকে আধুনিককালের প্রলেপ দিয়েছেন। ফলে নাটকটি চরিত্র ও কাহিনিগতভাবে পুনর্নির্মিত হয়ে উঠেছে।

১০। রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী- ফুল্লকেতুর পালা (২০০০);

২০০০ খ্রিষ্টাব্দে রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনি অবলম্বন করে লেখেন ‘ফুল্লরকেতুর পালা’। এই নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ‘বহুরূপী’ নাট্য পত্রিকার ৯৪ সংখ্যা। (; হবে) সম্পাদক ছিলেন কুমার রায়। ২৪ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১২.৫ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকের প্রচ্ছদপত্র (২), নামপত্র (১), চরিত্রলিপি (১), পত্রিকার

সূচিপত্র (১), সম্পাদকীয় পত্র (২), স্মরণ অংশ (২), মূল নাটক (২৫) সহ মোট ৩৪ টি পৃষ্ঠা আছে। নাট্যপত্রিকায় প্রকাশিত নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ—

“বহুরূপী/ সংখ্যা- ৯৪/ সম্পাদক/ কুমার রায়/ এই সংখ্যার
সহযোগী ড. রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়/ ৭, লোয়ার রেঞ্জ, কলকাতা-
৭০০০১৭/ দূরভাষ- ২৪৭-৩৯৮৭”।^{১৪৪}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ -

“ফুল্লরকেতুর পালা/ রত্নপ্রসাদ চক্রবর্তী।”^{১৪৫}

পত্রিকার সম্পাদক কুমার রায় জানিয়েছেন সমাজবাস্তবতাই যে কোনো শিল্পে রূপ পায়। বিশেষভাবে তা নাট্যশিল্পের ক্ষেত্রে আরো বেশি করে প্রযোজ্য। তাঁর কথায়-

“বিচ্ছিন্ন ভাবেই নাট্যের ক্ষেত্রে আমাদের অনেককেই বিষয়টা নানভাবে ভাবাচ্ছে। ভাবাচ্ছে বলেই আমরা আলোচনা সভা সংগঠন করে অনেক নাট্যদল বা অন্য সংগঠনের মধ্যে হাজির হচ্ছি। আলোচনা করছি এবং শুনছি। আমাদের নাট্যচর্চা নিয়ে ভাবনার বিষয় আছে বলেই না এই সব উদ্যোগ। পথের হৃদিস পেতে, অতীতের অভিজ্ঞতা জানতে, সংগঠনের চেহারা কী হয়ে জানতে এবং সময়কে ধরবার মানসেই এ-সব আয়োজন। সময়, আজকের নাটক, সংগঠন নিয়ে এসব আলোচনা সভাতেই এই ‘সময়’ কেই ধরবার চেষ্টা চলেছে—এবং সেই সঙ্গে আজকের নাটক কী হবে সেই আলোচনাও উঠছে। সময়ের কথা বলতে অনেকেই বিপন্নতার কথাটা উঠিয়েছেন। অনেকেই শীত কবলিত নৈতিকতা এবং সন্ত্রাস-লগ্ন রাজনৈতিক বাতাবরণের কথা বলেছেন। আমাদের চারপাশের সমাজ বাস্তবতা, রাজনীতি ও ক্ষমতার ব্যাভিচার আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। এই সব সংবাদই সংবাদ মাধ্যমগুলির পাতা ভরিয়ে দিচ্ছে। আমাদের চৈতন্যকে আসড় করে দিতে এও এক বাস্তবের আঘাত। আর এক আঘাত এই একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ মুখে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যন্ত্রবিজ্ঞানের, প্রযুক্তির কৃৎকৌশলে মানুষের মাথা হয়ে উঠছে বড়—হৃদয় সঙ্কুচিত। বিলীয়মান শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে বর্ট্রান্ড রাসেল,—চল্লিশের দশকের এক ভীষণ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন—শুভবুদ্ধি (wisdom) ছাড়া শক্তির (power) প্রকাশ এবং প্রসার ভয়াবহ। গ্যায়টে এবং রবীন্দ্রনাথের কথাও কি আমাদের মনে পড়বে না? গ্যায়টের নাটকের

এক নায়কের লোভ, ক্ষমতার লোভ, কি মানবতার নৈতিক বুনোটকে ছিন্ন ভিন্ন করেনি। ‘মুক্তধারা’ এবং ‘রক্তকরবী’ নাটকে রবীন্দ্রনাথকেও তো বিপন্ন দেখেছি আমরা।”^{১৪৪}

নাটকটি তথা নাট্যপত্রিকাটি (বহুরূপী) প্রকাশিত হয় কুমার রায়ের সম্পাদনায়; ৭, লোয়ার রেঞ্জ, কলকাতা- ৭০০০১৭ থেকে। নাট্যপত্রিকার প্রচ্ছদপত্রটি রচনা করেছেন ইন্দ্রপ্রতিম রায়। বীরভূমের ছৌ-নাচের আদলে একটি রাজকীয় পুরুষের মুখোশ-মূর্তি অঙ্কিত হয়েছে নাট্যপত্রিকার প্রচ্ছদে। নাট্যপত্রিকাটির দাম পঁয়তাল্লিশ টাকা। নাটকটির চরিত্রলিপিতে উল্লিখিত চরিত্রগুলি হল—

“পাত্র : অধিকারী, জনৈক পুরুষ, কালকেতু, মুরারি শিল, ন্যাড়া, শিবে, রামাই, অষ্টাখুড়া, ১ম বিচার প্রার্থী, ২য় বিচার প্রার্থী, বুলান মণ্ডল, অষ্টরম্ভা, ভাঁড়ুদত্ত, নটী, কালকেতুর পাইক, কলিঙ্গ সেপাই, বিশল্ল (কলিঙ্গ শ্যালক), গবাক্ষ (কলিঙ্গ শ্যালক অনুচর), জনৈক অনুচর, আতর আলি, গোঁদো (জনৈক হাটুরে), কলিঙ্গরাজ, কলিঙ্গ সেনাপতি, কলিঙ্গ মন্ত্রী, (জনৈক জনতা) বাপিল খুড়ো, বঙ্কা (সুখদার স্বামী)

পাত্রী : জনৈক মহিলা, ফুল্লরা, সুখদা, দেবী চণ্ডী, বেনেনী, বিমলা, মোক্ষদা, বামী, নটী, বেহুলা, ঘেঁটু’।”^{১৪৫}

‘ফুল্লকেতুর পালা’ নাটকটির কাহিনি ও চরিত্রভাবনা মুকুন্দ চক্রবর্তীর ‘অভয়ামঙ্গল’ কাব্য অবলম্বনে লিখিত হলেও নাট্যকার এই কাহিনিকে প্রকাশ করেছেন আধুনিক মানুষের জমি আগ্রাসন মনোভাবকে ব্যক্ত করার জন্যে। কালকেতু যেন সেই মনোভাবের প্রতীকী চরিত্র। দেবী চণ্ডী এখানে সহায়ক চরিত্র রূপে অঙ্কিত, মানুষের সুখ- দুঃখের অংশীদার মাত্র; একেবারে মর্ত্যের বাস্তব চরিত্র। তিনটি অঙ্ক এবং বেশ কতোগুলি দৃশ্য নিয়ে নাটকটি রচিত। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে অধিকারীর বক্তব্যে নাটকের মূল গল্পকথা অতি সংক্ষেপে পাঠক বা দর্শকের কাছে প্রকাশ পেয়েছে। অধিকারী শ্রোতাদের বলেছে -

“চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু ফুল্লরার গল্প শোননি? সেই যে গো ধর্মকেতু ব্যাধের বেটা কালকেতু বনেবাদাড়ে শিকার করে বেড়াত, বউ ফুল্লরা মাংসের পশরা সাজিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ফেরি করত [অভিনয় সহ] ‘মাংস লিবি গো! তাল্লর চণ্ডী দেবীর কৃপায় ব্যাধের পো একদিন গুজরাটের রাজা হয়ে বসল—কলিঙ্গ দেশের রাজার সঙ্গে লড়াই করল—অবিশ্যি এ কলিঙ্গ-

গুজরাট দূর দেশ নয়। আমাদের এই বাংলা দেশের পাশাপাশি দুটো জেলা। কবি নাম দিয়েছে।”^{১৪৮}

অধিকারী জানিয়েছে যে কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনি কোনো কালেই পুরাতন হতে পারে না। এর স্বাদ কালভেদে নতুনভাবে পরিবেশিত হয়। অর্থাৎ ‘ফুল্লকেতুর পালা’ যে একালের নবনির্মিত নাট্যপালা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নাটকের শুরুতেই ফুল্লরা ও কালকেতুর দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবনের কথা রয়েছে। কালকেতু দুঃখ করে বলেছে—

“জানি জানি, কপালে আমার সুখ নাই তা জানি। উদিকে দেখে
রামাই-শিব-ল্যাড়ারা কেমন একদিন বনবাদাড় ঘুরে এসে তিন
দিন পায়ের উপর পা তুল্যা বস্যা বস্যা খায়টে। এই জন্যেই বিয়া
করতে চাইনি। বুড়াটাই যত লষ্টের গড়া—[অভিনয় করে] ‘বাপ
কালু ইবার বিয়া কর্যা সংসার ধম্ম পালন কর, বুড়া হলুম আমরা
ইবার তীখ ধম্ম করি’। যাবে যাও কেনে তীখ ধম্ম কর, মোর
সাথে শত্রুতা কর ক্যানে?”^{১৪৯}

কালকেতু জাতিতে ব্যাধ। পশু শিকার করে এবং মাংস বিক্রয় করে তাদের জীবন চলে। কিন্তু একদিন সে কোনো পশু শিকার করতে পারে না। কারণ যাত্রাপথে গোধিকা দেখে যাত্রা করা ব্যাধেরা অমঙ্গলসূচক মনে করে। বাধ্য হয়ে সে গোসাপকেই বেঁধে নিয়ে আসে। কালকেতু ভাবে এই গোধিকাকে পুড়িয়ে খেয়ে একদিন চলে যাবে। কিন্তু সেই স্বর্ণগোধিকা একসময় অপরূপ নারীর রূপ ধারণ করে। আসলে তিনি ছিলেন ছদ্মবেশী দেবী চণ্ডী। কিন্তু ফুল্লরা তাঁকে সতীন ভেবে ভয় পায়, তাঁকে নানা যুক্তি দিয়ে স্বামী গৃহে ফিরে যেতে অনুরোধ করে বলে —

“আহা কী করবে বাছা, সবই নিয়ত। একবার সীতার কতা বিবেচনা কর্যা
দেক—[দেবী মুখের দিকে অবাক চোখে তাকায়] সীতা গো সীতা! নাম
শুনেচো তো? বিটির কী না ছিল বল? কিন্তু ওই যে বললুম নিয়তি!
সারাজীবন দুঃখ কষ্টে গেল! কিন্তু একদিনের তরেও সোয়ামিকে ভুলিনি।
তাই না সতী। সব মেয়েমানুষকে সতী হতে হয়, নইলে লোকে নিন্দে
করে।”^{১৫০}

ফুল্লরা তাকে বোঝাতে চায় যে স্বামীর গৃহের বাইরে রাত কাটালে লোকে নানা রকম মন্দ কথা বলবে; স্বামীর ঘরেই নারীর একমাত্র পবিত্র জায়গা। কিন্তু ছদ্মদেবী দেবী ফুল্লরাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন—

“কী কর্যা যাই দিদি! আমি কি নিজের ইচ্ছায় এসচি? মোকে কালুবীর নিজগুণে ধর্যা এনেচে। আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে, আনিলা তোমার স্বামী বান্ধি নিজগুণে। হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ মহাবীরে, যদি বীর বলে তবে যাব স্থানান্তরে। যে বল সে বল আমি বীরে না ছাড়িব, দিয়া আপনার ধন দুঃখ নিবাবিব।”^{১৫১}

একথা শুনে ফুল্লরার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। সে ক্ষোভে ছদ্মবেশী চণ্ডীকেই গালি-গালাজ করতে থাকে—

“[মাটিতে বসে কান্না] ওগো আমার কী হবে গো। ই বিটি যে আমার কুনুকতায় কান দিচ্ছেনি গো। ন্যাকা বজ্জাত ঢ্যাটা মেয়েছেলে! ওগো ব্যাধের পো একবার ঘরকে এস গো। মুয়ে আগুন ঢ্যামনা মাগী! ওগো আমার কী হবে গো।”^{১৫২}

কালকেতু ফুল্লরার অভিযোগ শুনে হতবাক হয়। কিন্তু পরবর্তী সময় দেবী আপন রূপে দেখা দেন এবং জানান তাদের দুঃখ মোচনের জন্যই তাঁর আগমন। দেবীচণ্ডী কালকেতুকে বর চাওয়ার কথা বলেন। কালকেতু বর চায়—

“এই বরও দাও মা, রোজ যেন তিনটা হরিণ, একটা হাতি, আর দুটা দাঁতি মারতে পারি।”^{১৫৩}

এখানে কালকেতুর যে চাওয়া, তা একেবারে সাধারণ মানুষের চাওয়া; যা কিনা শুধুমাত্র নিজেরা ভালোভাবে খেয়ে- পরে দিন কাটাতে পারলেই হবে। কিন্তু দেবীচণ্ডী তাকে রাজা হওয়ার আশীর্বাদ দেন এবং পশুশিকার বন্ধ করার নির্দেশ দেন। গুজরাট নগর পত্তন করে রাজা হয়ে দরিদ্র মানুষদের সুখে রাখবার ব্যবস্থা করতে বলেন। দেবী বলেন —

“এই আংঠি লাও। বিক্লে অনেক টাকা হবে, তা দিয়্যা বন কেটে বসত কর, রাজা হও। রাজা হয়্যা গরিব মানুষগুলোকে রক্ষা কর।”^{১৫৪}

মা চণ্ডীর কথামতো কালকেতু বন কেটে গুজরাট নগর পত্তন করে। রাজসভা ও সভাসদ বানায় নিজেদের ব্যাধ পরিবারের লোকজনকে নিয়ে। সকলের অতি প্রিয় রাজা হয় কালকেতু। তারা কালকেতুর নাম বন্দনা করে—

“জয় জয় মহারাজা আখেটিনন্দন।/ সবে মিলে করযোড়ে করি গো বন্দন।।/ এমন রাজা সরল সোজা নাই ত্রিভুবনে।/

সর্বলোক সুখে আছে তাহারি শাসনে।।/ যুদ্ধ নয় শান্তি যার
কামনার ধন।/ শান্তি পায় শুধু যেরা অন্তরে রাবণ।।/ বন কেটে
সৃষ্টি যার নব রাজ্যপাট,/ দেবীর কৃপায় নাম দিলেন গুজরাট।।/
অদ্যকার মতো সাজ হোল যে বন্দন।/ সবে মিলে বল জয়
আখিটি নন্দন।”^{১৫৫}

ইতিমধ্যে কলিঙ্গ রাজ্যে অত্যাচারিত হয়ে আসে দরিদ্র মানুষ বুলান মণ্ডল। সে কালকেতুর
কাছে বসতির আবেদন জানায়-

“মহারাজ মুই গরিব চাষি, মোর নাম বুলান মণ্ডল। কলিঙ্গ দেশে ঘর
ছিল্য। মহারাজ উবছর খরায় ফসল হল্যনি মাঠের ধান মাঠেই শুকি গেল।
কিন্তু এক পয়সা রাজকর মকুব হল্যনি। ইবার হল্য বান! বানে বউ মেয়্যা
ভেসে গেল, ঘর গেল, মাঠের ধান গেল, তবু রাজার পাইক—[দুহাতে মুখ
ঢেকে নীরব থেকে] তাই গুজরাটে এস্চি যদি জমি পাই তো সোনা
ফলাই!”^{১৫৬}

কালকেতু বুলানকে সাদরে গ্রহণ করে, জমি দেয় চাষের জন্য এবং তিন সাল কর না
নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু কলিঙ্গ রাজ্য থেকে ভাঁড়ু দত্তের আগমনে কালকেতুর
গুজরাট নগরে অশান্তির কালো ছায়া ঘনিয়ে আসে। সে কালকেতুকে নিজের পরিচয়
দিতে গিয়ে বলে—

“মহারাজ আমি ভাঁড়ু দত্ত সাত পুরুষের কুলিন। ইটি আমার শ্যালক
অষ্টরম্ভা। রাজার সঙ্গে দেখা করতে হল্যে লজর আনতে হয়। আমি
তোমার জন্যে কাঁচকলা লজর এন্চি—আমার গাচের।”^{১৫৭}

ভাঁড়ু দত্ত রাজার কাছে নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে, অতি সুকৌশলে গুজরাটে
অধিপত্য কায়েম করে। ভাঁড়ু দত্ত নানা লোকের কাছ থেকে অর্থ উপার্জন করে
অন্যায়ভাবে। এই অন্যায় কালকেতু মেনে নেয় নি। বুলান মণ্ডল প্রত্যক্ষভাবে প্রতিবাদ
জানাতে এসেছে রাজার কাছে; সে বিচার চায়। রাজা কালকেতু ভাঁড়ু দত্তের অন্যায়
কাজের বিচার করে বলে—

“ভাঁড়ু দত্ত, তোমাকে গুজরাট থিক্যে এই মুহূর্তে- এইয়া মুহূর্তে
[অসহায়ভাবে রাজকবির দিকে তাকায়। অষ্টা এসে কালকেতুকে নিম্নকণ্ঠে
কিছু বলে] তোমাকে নির্বাসিত করলাম।”^{১৫৮}

এতে ভাঁড়ু দত্ত অপমানিত হয়। সে কলিঙ্গরাজ্যের সহায়তায় কিছু সৈন্যসামন্ত নিয়ে কালকেতুকে আক্রমণ করে। কলিঙ্গ রাজা সেনাপতিকে জানায়—

“আমার রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত বে-দখল হয়্যা গেছে? চমৎকার!”^{১৫৯}

আসলে কালকেতু জমি দখল করেছে। এই অধিকার খর্ব করার জন্য এবং জমি ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যই গুজরাট রাজ্যের সঙ্গে কলিঙ্গ রাজ্যের যুদ্ধ বাধে। সেই যুদ্ধের সুযোগে ভাঁড়ু দত্ত নিজের অপমানের প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে। কৌশলে ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুকে বেঁধে নিয়ে যায় কলিঙ্গ রাজ্যে। গুজরাটের সকল মানুষ একজোট হয় তাদের রাজা কালকেতুকে উদ্ধার করার জন্য। তারা সকলে মা চণ্ডীর কাছে প্রার্থনা জানায়। দেবী তাদের উদ্দেশ্যে বলেন—

“জাগো গুজরাটের অধিবাসীবৃন্দ জাগো! তোমাদের সমবেত ক্রোধের আগুন বিধাতার অভিশাপ হয়ে জ্বলে উঠুক। সেই আগুনে ধ্বংস হোক কারাগারের লৌহ শৃঙ্খল। হে লোকলক্ষ্মী তোমার অগ্নিময় স্পর্শে আমাদের প্রাণের রাজা বন্ধন মুক্ত হোক!”^{১৬০}

বুলান মণ্ডল মায়ের কথার সমর্থন করে এবং অন্যান্যদের বলে—

“দোষ লয় দেশের সর্বসত্ত্বের মানুষ ই দ্যাশটারে নিজের বল্যা ভাবে নাই। তা বাদে মোরাও ভাবতে শিখাই নাই। তাই বিপদের দিনে তারা ঘুমায়ে আচে। ভাই সব শূন্যে রাখ দেবী লয় দেবী লয় আজ মানুষ ঘুমায়ে।”^{১৬১}

অর্থাৎ তিনি সকলকে জেগে উঠতে হবে। অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে হবে। তখনই গুজরাট হয়ে উঠবে প্রকৃত আনন্দভূমি। একসময় আমরা দেখতে পাই তারা সকলে মিলে কালকেতুকে কলিঙ্গের কারাগার থেকে মুক্ত করে এনেছে। বুলানের কাঁধে চেপে কালকেতু আসে। তার গলায় লৌহ শৃঙ্খলের কিছুটা অংশ মালার মতো ঝুলছে। সঙ্গে পাত্র-মিত্র ও কিছু নর-নারী। এই প্রসঙ্গে সুখদা বলেছে— ‘রাজা হয়্যাও তোর ব্যাধের পো কুন্ডিন মোদের ভুলেনি।’ এবার কালকেতু সবার সামনে মাটিতেই বসে। তার মতে— ‘সিংহাসনের দরকার কী শিবে? মাটির চেয়ে ভালো সিংহাসন আর নাই’। এরপর সকলে মিলে বিজয় উৎসবে মেতে ওঠে। পুনরায় গুজরাট রাজ্য সাজানোর ভার পড়ে কাশিম ভাই, আবিদ ভাই, বুলান ভাই, হারান ভাইয়ের মতো সাধারণ মানুষের উপর, যাদের পরিশ্রমে গুজরাট ভূমি একদিন হয়ে ওঠে ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ এক নগরী। নাট্যকার রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী এইভাবেই সাম্যবাদী জীবনচেতনার শেষ বিন্দুতে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন ‘ফুল্লকেতুর পালা’ নাটকটিতে। সেই সঙ্গে যুক্ত করেছেন জমি দখলের

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি। ফলে নাটকটিতে কাব্য-কাহিনির শুধু পুনর্নির্মাণ নয়, বিনির্মানও হয়েছে।

‘ফুল্লকেতুর পালা’ নাটকের প্রতিটি চরিত্রই পুনর্নির্মিত হয়েছে। কালকেতু, ফুল্লরা একালের সামন্ততন্ত্রের অধিকার অর্জনের জন্য অঙ্কিত মানব-মানবী। দেবী চণ্ডীর কাছে তাদের চাওয়া পাওয়া শুধু সেকালের নয়, একালের মানুষের অধিকার গ্রহণের লড়াই। দেবীচণ্ডী এখানে পৌরাণিক মহিমায় মণ্ডিত নন; অর্থবান মানুষের প্রতীকী নারী চরিত্র। তিনি কালকেতুকে সহায়তা করেছেন বড়ো হওয়ার জন্য। এই রকম প্রকৃত স্বহৃদয় বড়ো মানুষের সাক্ষাৎ আমরা একালেও কখনো কখনো পাই। ফুল্লরা স্বাধীনচেতা বুদ্ধিমতী নারী। সে সংসার চালানোর জন্য হাটে হাটে মাংস বিক্রয় করে। ছদ্মবেশী দেবীচণ্ডীকে নিজের সতীন বলে ভেবে, নানা কৌশলে তাকে তাড়ানোর চেষ্টা করেছে। ফুল্লরা দেবীর অলঙ্কারের প্রলোভনে বশীভূত হয়নি। বরং সে দেবীকে বলেছে-

“না বাছা, তোমার গয়নায় মোর কাজ নাই। মুই ব্যাধের মেয়্যা, গয়না লিয়ে করব কী? [সহসা] আচ্ছা বলত কোন সুখ ব্যাধের ঘরে থাকবে? শুনবে মুই কেমন সুখে আছি?”^{১৬২}

স্বামী কালকেতুর এই রকম অন্যায় আচরণের জন্যে ফুল্লরা প্রতিবাদ করে বলেছে-

“পিপিড়ার পাখা ওটে মরিবার তরে, কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াচ ঘরে।
বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী, আখেটীর ঘরে শোভা পাইবে উর্বশী”^{১৬৩}

তার এই সংলাপে ধরা পরেছে একালের নারীর বুদ্ধিমত্তা, স্বামীপ্রেম এবং পতিব্রতা নারীর পরিচয়টি। মুরারি শীলের মতো লোভী মানুষ এই নাটকে আছে। ভাঁড়ু দত্তের মতো স্বার্থপর, চক্রান্তকারী মানুষের সাক্ষাৎ আমরা এখানেই পাই। এরা মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যেমন ছিল, রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর কালেও তেমনি আছে। কালভেদে তাদের স্বরূপ আলাদা হলেও তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিন্দুমাত্র পাল্টায়নি। বুলান মণ্ডলের মতো প্রতিবাদী চরিত্র কালে- কালে আমরা পাই, যারা নিজের কথা না ভেবে অন্যের জন্য প্রতিবাদ করে; রাজার কাছে প্রতিকার চায়। একসময় ভাঁড়ু দত্তকে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে বুলান বলেছে—

“অত আদিখ্যেতায় কাজ নাই। তুমি গোঁদাটারে চড়ালে কেনে তাই বল।”^{১৬৪}

ভাঁড়ু দত্ত তখন বিপদে পরে যায় এবং বুলানকে বোঝানোর চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। একসময় কালকেতু ভাঁড়ু দত্তকে অন্যায়ের সাজা হিসাবে গুজরাট নগরের সীমা থেকে

বার করে দেয়। এছাড়াও অন্য চরিত্রগুলিতেও একালের সাধারণ মানুষের পরিচয় নানাভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সুখদা, ন্যাড়া, শিবে, রামাই, বন্ধা, বুলান, ঘেটু, অষ্টা, সনকা— সকলেই একালের সাধারণ মানুষ, শুধুমাত্র কালে-কালে নামগুলির পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। কালকেতু যখন কলিঙ্গ রাজার আক্রমণে ও ভাঁড়ু দত্তের চক্রান্তে কারাগারে বন্দী হয়, তখন গুজরাটের সাধারণ প্রজা ও ব্যাধেরা সকলে একজোট হয়ে লড়াইতে নেমেছে। তারা কালকেতুকে উদ্ধার করেছে। এইভাবে অশুভ শক্তির পতন ঘটেছে এবং গুজরাট নগরে পুনরায় শুভ শক্তির জয় হয়েছে। অসময়ে বা বিপদে দেবী চণ্ডী প্রজাদের সহায়তা না করে তাদেরকে জেগে উঠতে বলেছেন, তাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে গণচেতন্যের জাগরণ ঘটেছে এবং প্রতিটি মানুষ নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। এইভাবে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে ‘ফুল্লকেতুর পালা’ নাটকটি একালের প্রেক্ষাপটে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকাহিনির পুনর্নির্মিত ও বিনির্মিত বলতে কোন দ্বিধা থাকে না।

গ। ধর্মমঙ্গলকাব্য অবলম্বনে রচিত নাট্য পুনর্নির্মাণ-

১১। উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় - ধর্মমঙ্গল (২০২০) ;

মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল নিয়ে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে একাধিক নাট্য পুনর্নির্মাণ রচিত হতে দেখা গেলেও ধর্মমঙ্গল কাব্য নিয়ে তেমন কোনো রচনা আমাদের হাতে আসেনি। বহু অনুসন্ধানে ধর্মমঙ্গল কাব্যকাহিনি অবলম্বনে রচিত একটি মাত্র নাট্য পুনর্নির্মাণের হৃদিশ আমার করতে পেরেছি। খুব সাম্প্রতিককালে অর্থাৎ ২০২০ সালে ধর্মমঙ্গল কাব্য কাহিনি নিয়ে একটি নাটক রচনা করেন উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়। ১৮ সেন্টিমিটার লম্বা ১২.৫ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটিতে প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (২), উৎসর্গপত্র (১), ভূমিকাপত্র (১), সূচিপত্র (১), চরিত্রলিপি (১), মূলনাটক (৪৯) সহ মোট ৫৬টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকটির প্রচ্ছদপত্র এইরূপ -

“রাজ্য ও জাতীয় স্তরে পুরস্কার প্রাপ্ত নাটক/ লোক নাট্য সংকলন/ উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়।”^{১৬৫}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ-

“লোক নাট্য সংকলন/ উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়/ লালমাটি।”^{১৬৬}

প্রচ্ছদপত্রটি রচিত হয়েছে কমলা, সাদা, কালো, হলুদ, সবুজ রঙের সমন্বয়ে। তাতে একটি অভিনয়রত নাট্য ব্যক্তিত্বের আলোক চিত্র রয়েছে। নাটকটির মূল্য দেড়শো টাকা। বাবা ও মাকে নাটকটি উৎসর্গ করেছেন নাট্যকার— ‘আমার বাবা ও মা কে’। ভূমিকাপত্রে নাটকটি প্রসঙ্গে অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন—

“লোকনাট্য সংকলনের প্রথম নাটক ধর্মমঙ্গল। মঙ্গলকাব্য নিয়ে (মুখ্যত মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল) বাংলায় অসংখ্য নাটক নির্মাণ হলেও ধর্মমঙ্গলের পূর্ণাঙ্গ নাট্যরূপ এই প্রথম। এক্ষেত্রে নাট্যকার ইতিহাস তৈরি করেছেন। এর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল ধর্মমঙ্গলের অলৌকিকতাকে প্রতীকের মাধ্যমে উপস্থাপিত করে মধ্যযুগের কাহিনিকে সমকালীন বা চিরকালীন করার প্রয়াস। সর্বোপরি বহুরূপী, ঘোড়ানাচ, রণপা, রাইবেঁশে, বাউল প্রভৃতি রাঢ় সংস্কৃতিকে একটি নাটকে নিয়ে এসে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন উজ্জ্বল। (বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্যশিক্ষক/ প্রাক্তনী, ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা/ নিউ দিল্লি)।”^{১৬৭}

নাটকের চরিত্রলিপিতে উল্লিখিত চরিত্রগুলি হল —

“ মহামদ	সৈন্য
পুরোহিত	দেবপাল
রঞ্জাবতী	কামদল
কর্ণসেন	সুরীক্ষা
মূল গায়েন ও বাউল দল	কামরূপরাজ
লাউসেন	কলিঙ্গা
হনুমান	মালিনী
দূত	সখী
কালু ডোম ও সম্প্রদায়	কানড়া
মন্ত্রী	প্রজাকুল” ^{১৬৮}

নাটকটি প্রকাশিত হয় উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে, প্রকাশক নিমাই গরাই, লাল মাটি প্রকাশন, ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০৭৩ থেকে।

মধ্যযুগের অন্যতম সাহিত্যশাখার অন্তর্গত ধর্মমঙ্গল কাব্য অবলম্বনে নাটকটি লিখিত হলেও নাট্যকার উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় নাটকের বিষয়বস্তু ও চরিত্র পরিকল্পনার মধ্যে একালের ভাবনার মেলবন্ধন করেছেন। ফলে নাটকটি পুরাতন ও নতুনের মেলবন্ধনে অভিনব সাহিত্য-সংরূপ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। গঠনশৈলীতেও নতুনরূপদেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। নাটকের শুরুতে প্রথম ঘটনা, দ্বিতীয় ঘটনা, তৃতীয় ঘটনার কথা বলে নাট্যকার অভিনয় সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন এবং গানের মধ্যে দিয়ে ‘ধর্মমঙ্গল’ কাব্যের নাটকীয় পালার সূত্রপাত করেছেন। এই নাটকে তিনি কোন অঙ্ক বিভাজন দেখাননি। কিন্তু বারোটি দৃশ্য রচনা করে পুরোপুরিভাবে ‘ধর্মমঙ্গল’ কাব্যভাবনাকে নাটকীয়ভাবে রঙ্গমঞ্চের উপযুক্ত করে প্রকাশ করেছেন। নাট্যপালার সূত্রপাত হয়েছে গানের মধ্য দিয়ে। নাটকের গায়ন চরিত্রটি গানের সুরে পাঠক ও দর্শকদের জানিয়েছে—

“তারপর ত্রুন্ধ বঙ্গেশ দেবপাল বন্ধুপ্রতীম সামন্তরাজ কর্ণসেনকে
যুদ্ধে পাঠালেন। যুদ্ধে বিপর্যয় হল কর্ণসেনের। ছয় পুত্র মারা গেল,
ছয় পুত্রবধূ সহমৃতা হল। আত্মহত্যা করলেন কর্ণসেনের স্ত্রী।
শোকে-দুঃখে বৃদ্ধ কর্ণসেন সন্ন্যাস নিয়ে গৃহ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত
নিলেন। তাকে বাধা দিলেন গৌড়রাজ দেবপাল। তার শ্যালিকা
রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের নিজেই ঠিক করলেন বিবাহ।”^{১৬৯}

নাটকে আমরা দেখি যে রঞ্জাবতী-কর্ণসেনের বিবাহের পর পালকি করে যখন তারা যাত্রা শুরু করবে, ঠিক তার আগে মহামদের উপস্থিতি ঘটে। সে ভগ্নী রঞ্জাবতীর এই রকম বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ হওয়াকে মেনে নিতে পারেনি। মহামদ ভগ্নী রঞ্জাবতীকে স্বামী ত্যাগ করতে বলে। কিন্তু রঞ্জাবতী তাতে রাজী হয় না। মহামদ ভগ্নিকে বোঝাতে চেষ্টা করে—

“আঃ রঞ্জা। তোকে কেমন করে বোঝাই বোন। ওই স্থবির বৃদ্ধের
পাশে দাঁড়ানোর অর্থ তোর নারীত্বের অপমান। ঐশ্বর্য নয়, রাজ্য
নয়, নারীর সুখ তো স্বামীর উষ্ণ পরশে। তা কি দিতে পারবে ওই
স্থবির? নারীত্বের স্বার্থকতা মাতৃত্বে। তুই কি কোনোদিন পাবি মাতৃ
আহ্বান শোনার সুখ?”^{১৭০}

একথা শুনে কর্ণসেনের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। সে মহামদকে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে—

“মহামদ, আমার প্রতি আর একটা কু-শব্দ উচ্চারণ করলে তোমার জিভ ছিঁড়ে নেব। তুমি গৌড় বঙ্গের মহামাত্য, তাই অনেকক্ষণ তোমাকে সহ্য করছি।”^{১৭১}

পরবর্তীসময় কর্ণসেনের অনুশোচনা হয় রঞ্জাবতীর যৌবনের কথা ভেবে। কিন্তু রঞ্জাবতী দৃঢ় প্রত্যয়ে স্বামী কর্ণসেনকে জানায়—

“বাবা ধর্মরাজ যদি চায়, তা হলে নিশ্চয় হবে। এসো আমরা প্রার্থনা করি—হে বাবা ধর্মরাজ, আমি যদি সতী হয়ে থাকি, তাহলে আমার মান রেখো প্রভু।”^{১৭২}

একসময় ধর্মঠাকুরের আশীর্বাদে রঞ্জাবতী পুত্র লাউসেনকে লাভ করে। লাউসেনের প্রধান শত্রু হয় তারই মামা মহামদ। সে-ছলে-বলে-কৌশলে লাউসেনকে মেরে ফেলতে চায়। লাউসেনের মৃত্যুই যেন তার কাছে প্রকৃত আক্রোশ ও অন্যায়ের যোগ্য জয় এনে দিতে পারে। একসময় লাউসেন বড়ো হয়ে ওঠে। বিদ্যা, বুদ্ধি, সঙ্গীত সাধনায় পারদর্শিতা লাভ করে। পিতা কর্ণসেনের পরিকল্পনায় এবং হনুমানের অস্ত্রশিক্ষায় লাউসেন অতি সহজে রণকৌশলের অধিকারি হয়ে উঠে। গুরু হনুমান লাউসেনকে শিক্ষান্তে আশীর্বাদ করে বলে—

“যাও বীর তোমার সাধনা পূর্ণ। মনে রেখো ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য, ধর্ম পথে থাকার জন্য মানবের দুই প্রকার রণকৌশল জ্ঞাত হওয়া আবশ্যিক। অন্তরে ষড়রিপুর সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে হৃদয়ে ধর্মের স্থাপন। এ হল প্রথম সাধনা। আর বহির্জগতে অধর্মের শক্তি অহংকারকে পরাভূত করে অনন্ত ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা এ হল দ্বিতীয় সাধনা। তুমি এই দুই সাধনাতে পরম সিদ্ধ। এই সংসারে ভালো অনেক বেশি, মন্দের সংখ্যা সামান্য। কিন্তু ভালোরা বড়ো নিস্পৃহ, বিচ্ছিন্ন, ভীরা। মন্দেরা শক্তি প্রকাশে উদগ্রীব, সক্রিয় ও ঐক্যবদ্ধ। তাই ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা মানে শুধু একা যুদ্ধ করে যাওয়া নয়, এই বীরভূমির অগণিত গণদেবতাকে শক্তিমত্তায় জাগরিত করা। সক্রিয় কর, ভালোর পক্ষে মন্দের বিপক্ষে দাঁড়াবার সাহস সঞ্চারিত কর তাদের বুকে। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার সক্রিয়তায় জেগে উঠবে রাঢ়ভূমি। দামোদরের ঢেউ উচ্ছল করবে ভাগীরথীকে। ভাগীরথীর উচ্ছ্বাস উদ্বেলিত করবে সমগ্র ভূ-ভারতকে। এই ভারত,

মহাপুণ্যভূমি, ধর্মভূমি, আজ গতিহীন ধর্মহীন শক্তিহীন। তুমি জাগরিত কর
পুণ্যভূমির অমৃতপুত্রদের। এই যুগ, এই সময় তোমার জন্যই
অপেক্ষমান।”^{১৭৩}

ইতিমধ্যে লাউসেনের বীরত্ব ও খ্যাতির সুনাম পৌঁছায় গৌড়বঙ্গে এবং মহামদের কাছে।
দূত মহামদকে জানায়—

“মহামাত্য, লাউসেন এমনই যথেষ্ট বলবান। তার উপর ধর্মরাজের বাহন,
হনুমানের কাছে মল্লযুদ্ধ, গদাযুদ্ধ শিখে আজ সে ত্রিভুবনে জয়ী হওয়ার
সব গুণ অর্জন করেছে। তাই ময়নাগড়ে তাকে কোনোরূপ আঘাত করা
আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।”^{১৭৪}

তখন মহামদ কৌশল অবলম্বন করে। গৌড়বঙ্গের রাজার নির্দেশে মহামদ লাউসেনকে
আনার ব্যবস্থা করে। তার মূল লক্ষ্য লাউসেনকে হত্যা করা। মহামদ লাউসেনকে হত্যা
করার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু লাউসেনের হৃদয়জাত অকৃত্রিম
ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধাবোধে দেহরক্ষী, হিংস্রবাঘ, উন্মত্ত হাতি সকলেই বশ মানে। একথা
মহামদকে জানায় রাজ কর্মচারী ইন্দ্রজাল মহামদকে। ইন্দ্রজাল বলে—

“সে হলে তো ল্যাটা চুকে যেত। কামদলের হিংসা হার মেনেছে
লাউসেনের উদারতায়। শুধু তাই নয় আপনার অনুমতি ছাড়াই আমি মত্ত
হাতির পায়ে ঠেলে দিয়েছিলাম। সে হাতিও হার মেনেছে। পায়ে না পিশে
পিঠে চাপিয়ে নিয়ে আসছে প্রাসাদে। আর এমন আশ্চর্য ঘটনা দেখে
গৌড়ের অগণিত জনতা জয়ধ্বনি দিতে দিতে পিছু নিয়েছে। সেই
জয়ধ্বনি ক্রমে গর্জন হয়ে উঠেছে।”^{১৭৫}

এমনকি বারবনিতা সুরীক্ষাও তারই প্রভাবে জীবনের পথ পরিবর্তন করেছে। লাউসেন
সুরীক্ষাকে বলেছে—

“আমি তো তোমার অন্তরের বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়ে দেখতে পাচ্ছি। সন্তানের
অধর চুম্বন করার জন্য তোমার ওষ্ঠ কাঁপছে, স্নেহে আদরে ভরিয়ে দিতে
হাহাকার করছে তোমার মাতৃ হৃদয়।”^{১৭৬}

প্রত্যুত্তরে সুরীক্ষা বলছে—

“কি ? মা ? বললে আমায় ? বাবা কে তুমি ? এই নটীর অন্তর গুহা থেকে বের করে আনলে অশ্রু মুক্ত। মাতৃ সম্বোধনে আবেগ রুদ্ধ করলে আমার হৃদয়। আমি যে সন্তানহীন।”^{১৭৭}

এইভাবে যখন কিছুতেই লাউসেনকে আঘাত করা সম্ভব হল না, তখন মহামদ কামরূপ রাজার সঙ্গে গোপন আঁতাত করে। মহামদ কামরূপ রাজাকে জানায়—

“রাজা, আমার উদ্দেশ্য দুটি। প্রথমত জয় লাভের পর কামরূপের অধীনে গৌড় শাসন করবো আমি। আর দ্বিতীয়ত—ক্রমাগত জনপ্রিয় হয়ে ওঠা লাউসেনের সমূলে বিনাশ।”^{১৭৮}

মহামদ কৌশল করে গৌড়বঙ্গের রাজ-সেনাপতি করেন লাউসেনকে। সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়ে লাউসেন রাজাকে জানায় -

“চিনবো না? আমার রাঢ় বাংলার ডোম, ভল্লা, বাউড়ি, ভায়েরা... ওদের কাছেই তো শিখেছি আমি মাটির প্রতি ভালোবাসা। ওদের জন্যই পেয়েছি ধর্মরাজ্য স্থাপনের অনুপ্রেরণা। মহারাজ গৌড় যদি আমার নেতৃত্বে যুদ্ধ করে তবে আমার সৈন্যবাহিনী তৈরি হবে তাদের নিয়েই।”^{১৭৯}

যুদ্ধে কামরূপ রাজা পরাজিত হলেও লাউসেন তাকে কোনরূপ অসম্মান করতে রাজি হয়নি। বরং তাকে সম্মানের সঙ্গে রাজ্য ফিরিয়ে দিতে চেয়েছে। এই প্রসঙ্গের একটি নাট্য-সংলাপ-

“কামরূপরাজ।। যুবক, তোমাকে যতই দেখছি আমি মুগ্ধ হচ্ছি। যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার ক্ষীপ্রতা, বীরত্ব দেখেছি, আর মুখমণ্ডলে দেখেছি অদ্ভুত প্রশান্তি। তোমার হাতে একজন করে কামরূপ সৈন্য নিহত হয়েছে, আর তোমার ওই মনমোহিনী আঁখি থেকে বেরিয়ে এসেছে অশ্রু।

লাউসেন।। মহারাজ আমি মাটিকে ভালোবাসি। দেশকে ভালোবাসি তাই যুদ্ধ করেছি। মানুষকে ভালোবাসি তাই হত্যা করে কেঁদেছি। অথচ ওই মানুষগুলোর কোনো দোষ ছিল না মহারাজ। আপনার লালসা,

ক্ষমতা স্পৃহা, আরও-আরও ক্ষমতা পাওয়ার
লোভেই তো অসহায় ওই মানুষগুলোর মৃত্যু।”^{১৮০}

লাউসেনের উদারতায় কামরূপ রাজা আবেগে আগ্রহিত হয়ে তার কন্যা কলিঙ্গকে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করে। কামরূপ ও গৌড়ের মধ্যে একটি সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। কাহিনি ধারায় আসে সিমুল্যা রাজ্যের রাজকুমারী কানড়ার প্রসঙ্গ। সে মনে-প্রাণে লাউসেনের পানি প্রার্থী হয়ে আছে ছোটবেলা থেকে—

“লাউসেনকে পাবার জন্য আমি মহামায়ার সাধনা করেছি। আশীর্বাদ স্বরূপ মহামায়ার কাছ থেকে যে লৌহ গুণ্ডার পেয়েছি মনে মনে স্থির করেছি এই লৌহ গুণ্ডার এক কোপে যে ছেদন করবে তাকেই আমার বরমাল্য তুলে দেব। এখনও পর্যন্ত অনেক রাজা রাজকুমার সে কাজে বিরত থেকেছে। তাই সই মনে বড়ো সংশয় আমার মানস প্রিয় লাউসেন তা পারবে তো।”^{১৮১}

কানড়া পণ করেছিল লোহার গুণ্ডার যে ছেদন করবে, তাকেই সে স্বামীরূপে গ্রহণ করবে। লাউসেন গৌড়েশ্বরের আদেশে সিমুল্যায় এসে সেই লোহার গুণ্ডার ছেদন করে এবং কানড়াকে জিতে নেয়। লাউসেন কানড়াকে গৌড় রাজার ‘অধিকার’ বলে ব্যাখ্যা করলে, কানড়ার নারী ব্যক্তিত্বে আঘাত লাগে। সে লাউসেনের কথায় প্রতিবাদ করে বলে—

“অধিকার। লাউসেন নারী কোনো ভোগ্য পণ্য নয় যে রাজা চাইলেই তাকে তা তুলে দিতে হবে। আমি তোমাকে ধর্মরাজ্য স্থাপনে বৃন্দ হয়ে থাকা এক আত্মত্যাগী যুবক ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি তুমি স্তাবক। রাজার তোষামোদকারী একজন সুযোগসন্ধানী, স্বার্থাশ্রেষ্টী কাপুরুষ তুমি।”

১৮২

তার যুক্তিবাদী প্রতিবাদে লাউসেন তাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কানড়াকে পত্নীরূপে গ্রহণ করায় কলিঙ্গ ক্ষুব্ধ হয়, লাউসেনকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে সে বলে—

“বাঃ বাঃ নাথ। এ কোন ধর্মরাজ্য নাথ? যেখানে প্রথম স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগেই দ্বিতীয় স্ত্রী দিয়ে ঘর সাজানো হয়? যে নারীর হৃদয়কে

খেলনাপাতির মতো ভাঙা গড়া করে... সে কোন ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করবে? কোন অধিকারে সে নিজেকে বলবে ধর্মপুত্র ?”^{১৮৩}

কিন্তু একসময় তারা দু’জন সহমত পোষণ করে স্বামীর ভাবিত ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে। কানড়া বলে—

“হ্যাঁ দিদি আমাদের স্বামী লাউসেন। তার আজীবনের স্বপ্ন ধর্মরাজ্য স্থাপন। আমরা সেই সাধনতেই নিজেদের উৎসর্গ করলাম।”^{১৮৪}

নাট্য-পরিণতিতে মহামদের শেষ পরিকল্পনার কথা জানা যায়। মহামদ বলে—

“ও যেই মুহূর্তে ময়নাগড় ছেড়ে ওর লোকজন নিয়ে ঢেকুড়গড় আক্রমণ করতে বের হবে ঠিক সেই মুহূর্তে আমার লোকজন আক্রমণ করবে ময়নাগড়। লাউসেনকে না পারলেও তার পুরো পরিবারকে শেষ করব। এমনকী আমার ভগিনীও রক্ষা পাবে না। পিতা-মাতা-স্ত্রী পরিবারের সকলের মৃত্যুতে পাগল হয়ে যাবে লাউসেন। আর তাতেই আমার শান্তি। শান্তি শান্তি শান্তি।”^{১৮৫}

এবার লাউসেনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে ঢেকুরগড়ের রাজা ইছাই ঘোষের। কলিঙ্গকে অনুসরণ করে লাউসেন বলে—

“কলিঙ্গা ইছাই ঘোষ আমার ছয় দাদার হত্যাকারী। শুধু তাই নয়, ইছাই ঘোষের খামখেয়ালি শাসনে দক্ষিণ রাঢ়ে এখনও অশান্তি। আমি এই অপেক্ষায় ছিলাম কলিঙ্গা। ঢেকুর বিজয় সম্পূর্ণ হলে এই এই বঙ্গ ভূমিতে শান্তি নেমে আসবে। তাই এই আমার শেষ যুদ্ধ।”^{১৮৬}

দ্বাদশ দৃশ্যে দেখানো হয়েছে ঢেকুরগড়ের পরাজয়ের কথা এবং বঙ্গদেশে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা। দেবপাল বিজয়ী লাউসেনকে বলেছে—

“বৎস লাউসেন। এ বঙ্গদেশে আজ পূর্ণ শান্তি নেমে এসেছে। পরাজিত হয়েছে ইছাই ঘোষ। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ধর্মরাজ্য। হিংসাহীন, বিভেদহীন দ্বন্দ্বহীন এক স্বর্গীয় সমাজজীবনে আমরা উত্তীর্ণ হতে চলেছি। এর রূপকার তুমি। এ দেশ চালানোর ভার যে এবার তোমায় নিতে হবে বাবা।”^{১৮৭}

লাউসেন যে প্রকৃত ধর্মরাজ্যের শাসক হতে পারে, তার প্রমাণ দিতে হয় পশ্চিমে সূর্যোদয় ঘটিয়ে। শেষ পর্যন্ত মহামদ লাউসেনকে ধর্মরাজ্যের রাজা বলে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়

এবং দুহাত তুলে ধর্মঠাকুরের জয় ঘোষণা করে। প্রকৃত দেশপ্রেমী মানুষের মতো লাউসেন নাটকের অন্তিম লগ্নে সমস্ত জনতাকে ধর্মের পথে, কর্মের পথে দীক্ষিত করে ধর্মরাজ্য গঠন করতে চেয়েছে। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন-

“হে বঙ্গবাসীগণ। আমার জীবন নিবেদিত আপনাদেরই কল্যাণে। কিন্তু এ কোন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন আপনারা। একজনকে সিংহাসনে বসিয়ে ক্ষমতাবান করে যদি তাকেই সমগ্র বঙ্গদেশের শাসক করে তোলেন, তাহলে তো তা ধর্মরাজ্য হয় না। বিশ্বাস করুন আমি ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে আসি নি। বরং কালানুক্রমে ঘটে আসা সিংহাসন প্রথার বিলোপ ঘটাতে এসেছি। এই সিংহাসন আমি নিয়ে চলেছি আপনাদের কাছে। আপনারা এর উপর অধিষ্ঠিত করুন আপনাদের সকলের অন্তরের চিরন্তনী ধর্মচেতনাকে। সেই তো যথার্থ ধর্মরাজ্য। বলুন—জয় সত্যের জয়। জয় ধর্মের জয়। জয় মঙ্গলের জয়।”^{১৮৮}

‘ধর্মমঙ্গল’ নাটকটিকে মূলত একালের যুক্তিবাদী ভাবনা-চিন্তা দিয়ে নাট্যকার উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় সেকালের কাহিনিকে বিশ্লেষণ করেছেন। সেই সঙ্গে একালের আদর্শ রাজ্য গঠনের কথা বলে নাটকটির বিনির্মাণ ঘটিয়েছেন। এই কারণেই নাটকটি কাব্য ভাবনা থেকে নাট্য ভাবনায় পরিবর্তিত হয়ে নবরূপ লাভ করেছে।

উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়ের ‘ধর্মমঙ্গল’ নাটকটি মধ্যযুগের রাঢ়বঙ্গের জীবনের আলেখ্য। তাই এখানে ধর্মের কথা যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, তার চেয়েও বেশী গুরুত্ব পেয়েছে লোক জীবনের আখ্যান। রাজ্ঞাবতী ও কর্ণসেনের পুত্র লাউসেনের কথাই এখানে নাট্যকার প্রধানভাবে বলেছেন। লাউসেনের জন্ম ধর্মঠাকুরের আশীর্বাদে হলেও তার বিদ্যাবুদ্ধি, যুদ্ধের পারদর্শিতা এবং অন্যের প্রতি সহানুভূতি ও মমত্ববোধ— সব কিছুই তার নিজস্ব চরিত্রগত বিষয়। রাজ কর্তব্যের প্রতি লাউসেনের অকপট নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাবোধ তাকে উচ্চস্তরে উন্নীত করেছে। সে গৌড়বঙ্গের উদ্দেশ্যে বলেছে—

“এ জীবন সমর্পিত এ মাটিতে। ধর্মরাজ্য স্থাপনে বৃন্দ হয়ে থাকা সৈনিক আমি। তাই রাজকার্য ফেলে মধুরাত যাপন আমার পক্ষে সম্ভব নয় কলিঙ্গ।”^{১৮৯}

আবার অতিসাধারণ মানুষের প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে পত্নীর সঙ্গে কথোপকথনে। লাউসেন বলেছে-

“তুমি ঠিক বলেছ প্রিয়ে। এই পল্লি প্রান্তরের ক্ষেতে কাজ করা কৃষক, তাঁতি, জোলা, কামার, কুমোর—এদের আমি খুব ভালোবাসি। তাই এদের হাতেই তুলে দিতে চাই এই বঙ্গ দেশ।”^{১৯০}

নটী সুরক্ষী যখন মহামদের সঙ্গে চক্রান্ত করে লাউসেনকে কলুষিত করতে চেয়েছে, তখন লাউসেন সেই নারীকে কোনভাবে অসম্মান করেনি। বরং ‘মা’ বলে সম্মোধন করে বলেছে—

“মাগো। সন্তান তোমার ছড়িয়ে রয়েছে এই বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত পল্লিতে। বঞ্চিত, নিপীড়িত সন্তানেরা তোমায় ডাকছে...তুমি যাও তাদের যে আশ্রয় দিতে হবে। ছুটে যাও তাদের কাছে। সার্থক কর তোমার পূণ্যজন্মকে। তোমার নারীত্বকে। তোমার মাতৃ ধর্মকে।”^{১৯১}

মহামদ তার নিজের মামা হলেও তাকে বার বার কৌশল করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু শত আঘাত সত্ত্বেও সে মহাদেবকে আঘাত করেনি, বরং ক্ষমা করেছে। একসময় মহামদও পাল্টে যেতে বাধ্য হয়েছে এবং লাউসেনের হিতাকাঙ্ক্ষি হয়ে উঠেছে। সে লাউসেনকে বলেছে—

“সিংহাসনে বসার আগে সাবধান থেকো বৎস। অজস্র তোষামোদকারী তোমাকে ছেকে ধরবে। আমারই মতো। তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে শেখো।”^{১৯২}

ভালো মানুষের সংস্পর্শে খারাপ মানুষও একসময় ভালো হয়ে যায়। মহামদের পরিবর্তন ঠিক সেই রকম। লাউসেন জীবনের সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেছে মানব কল্যাণ আদর্শে। প্রতিষ্ঠা করেছে ধর্মরাজ্য। এ রাজ্যের দেবতা ধর্মঠাকুর নয়, এ রাজ্যের দেবতা সাধারণ রাজ্যবাসী মানুষ। সেখানে সত্য, ধর্ম, মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। নাটকের মধ্যে রাজকন্যা কানড়াকে আমরা পেয়েছি স্বতন্ত্র নারী চরিত্র রূপে। সে স্বামীর অনুপস্থিতিতে রাজবাড়ী রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এমনকি সে স্বামীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধে যেতেও প্রস্তুত হয়েছে। স্বামী লাউসেনকে বলেছে—

“নাথ, এই শেষ যুদ্ধে আমিও তোমার সঙ্গী হতে চাই। চল এই যুদ্ধ দুজনের মিলিত লড়াই হোক।”^{১৯৩}

এই রকম নারী আমাদের সমাজে কখনো কখনো মেলে, যে স্বামী বা সংসারের জন্য যে কোনো অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। রঞ্জাবতী এখানে মাতৃত্ব আদর্শরূপিনী নারী।

কর্ণসেন আদর্শ পিতা। কালুডোম ও তার সম্প্রদায় সবকালের সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। তাদের জীবনচর্যা, ভাষা আধুনিক হওয়ায় রাঢ় বাংলার কাহিনি হয়ে উঠেছে একালের জীবন-ভাষ্য। ফলে একালের পুনর্নির্মিত নাটক হয়ে উঠেছে ধর্মমঙ্গল কাব্যটি।

(ঘ) অনন্যদামঙ্গলকাব্য অবলম্বনে রচিত নাট্য পুনর্নির্মাণ—

১২) ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়- বিদ্যাসুন্দর (১৮২৩);

১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের ‘অনন্যদামঙ্গল’ কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড অবলম্বন করে ‘বিদ্যাসুন্দর’ নামের একটি নাটক সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১৭ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটির প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (১), মুদ্রণপত্র (১), মুখবন্ধ (১), সূচীপত্র (১০), অবতরণিকা (২), ভূমিকা (৩), মূল নাটক (১৮৩), ভিত্তির পালা (১৭) সহ নাটকটিতে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৯। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ—

‘বিদ্যাসুন্দর/ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়’^{১১৪}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ—

“আসল/ বিদ্যাসুন্দর/ (গোপাল উড়ের যাত্রা সম্পূর্ণ)/
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।/ মূল্য- ৪০
আনা।”^{১১৫}

নাটকে উল্লিখিত চরিত্রগুলি হল- বিদ্যা, সুন্দর, মালিনী, বিদ্যার সহচরীগণ, শুক, রাজা, রানী, জমাদার, চৌকীদার, প্রতিবাসিনী, কোটাল, মুন্সী, কবিরাজ, গঙ্গা, সভাসদ, জয়া, দেবী প্রমুখ। নাটকের ‘মুখবন্ধে’ দীননাথ ধর বলেছেন—

“ভাল জিনিষেরও অপব্যবহার হইয়া থাকে। যে বাঁটাতে তরকারী কুটা তদ্ধারা নরহত্যাও হইতে পারে। কেহ কেহ বিদ্যাসুন্দর যাত্রার বিরোধী, কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধতার বিশেষ কারণ বুঝা যায় না; গন্ধর্ব ও স্বয়ম্বর বিবাহ অশাস্ত্রীয় নহে। রাজা বীরসিংহ ও যুবরাজ সুন্দর ক্ষত্রিয় ছিলেন। বিদ্যা সুন্দর মধ্যে উক্ত দুই প্রকার বিবাহের একপ্রকার বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছিল; ভৈরব হালদার যাত্রা গানের একজন সামান্য বাঁধনদার মাত্র ছিলেন না, তিনি একজন প্রকৃত কবি ছিলেন আসল বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার বেশ দখল ছিল, অপিচ তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার রচিত বিদ্যা সুন্দর

যাত্রা গানের বইখানি একখানি নাটক স্বরূপ। ভূপেন্দ্র বাবু তাহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়া একটি ভাল কাজ করিলেন।”^{১৯৬}

‘ভূমিকা’ অংশে প্রকাশক জানিয়েছেন যে ঝামা পুকুর নিবাসী দীননাথ মিত্র এবং সিন্দুরে পটী নিবাসী কাশীনাথ মল্লিক মহাশয়ের অনুরোধে ১২৩০ সালে ভৈরবচন্দ্র হালদার ‘বিদ্যাসুন্দর’ যাত্রাগানের প্রথম পালা রচনা করেন। সেকালের বিখ্যাত অভিনেতা গোপাল উড়ে মালিনীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন বলে জানা যায়। এই পালার অভিনয় তখন বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এই অংশে তিনি আরো জানিয়েছেন—

“অন্য সব অভিনয় দুই একবার দেখা শুনায় পুরাতন হইয়া যায়, পুনরায় তাহার নূতন সংস্করণ না হইলে আর দর্শন ইচ্ছার প্রবলতা থাকে না, কিন্তু বিদ্যাসুন্দর একই ভাবে একই গানের সহিত প্রায় শত বর্ষ চলিয়া আসিলেও তাহা যখনই দেখা ও শুনা যায় তখনই নূতনের ন্যায় আনন্দ দায়ক হইয়া থাকে। অধিকন্তু উহার ভাব আবাল বৃদ্ধ বনিতার যে যেভাবে গ্রহণ করিবে সে সেই ভাবেই উহার ভাব সংগ্রহ করিয়া সন্তোষ প্রাপ্ত হইবে এজন্য উহা সকল লোকেরই মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। ইত্যাদি কারণে ইহা যে নাট্যপ্রিয় লোকসমাজের সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ তদ্বিশয়ে অণুমান সন্দেহ নাই। এরূপ গ্রন্থের আসল নষ্ট হইয়া না যায়, এজন্য আমি বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়া সাবেক দলের মালিনীর অভিনেতা শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর চক্রবর্তীর নিকট হইতে সাবেক আসল পালার অবিকল একখণ্ড নকল লইয়া বিশেষ যত্নের সহিত এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিলাম। ইহাতে নানা কারণে যে অর্থব্যয় হইয়াছে তাহার সহিত তুলনা করিলে এই বহির বহুল প্রচার জন্য যে মূল্য ধার্য করা হইয়াছে তাহা যৎসামান্য। এক্ষণে এই গ্রন্থ দ্বারা পাঠকদিগের আনন্দ লাভ হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।”^{১৯৭}

নাটকের সূচিপত্রটি বিস্তারিতরূপে লিখিত হয়েছে। কারণ এখানে প্রতিটি ভাবনার মূল বক্তব্য পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুযায়ী একটি পংক্তিতে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন- ‘অঙ্গ জ্বর জ্বর বিরহে তাহার’, ‘আমারি লাজের কথা বলব কি আর’, ‘কোথায় গো ডাকিনী শাকিনী ভৈরবী ভবানী’ ইত্যাদি ইত্যাদি। নাটকটি প্রকাশিত হয় ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ১১৫ নং আমহাষ্ট স্ট্রীট, একমি প্রেস থেকে। নারায়ণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা নাটকটি মুদ্রিত হয়। প্রকাশকালীন নাটকটির মূল্য ছিল ৪০ আনা।

ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত ‘বিদ্যাসুন্দর’ নাটকটির কাহিনিকথন শুরু হয়েছে ‘গণেশ বন্দনা’ ও ‘গুরু বন্দনা’ দিয়ে। ‘অবতরণিকা’ অংশে লেখক নাট্যপালার সম্পূর্ণ কাহিনির অতিসংক্ষিপ্ত রূপ ব্যক্ত করে বলেছেন—

“কালিকা মঙ্গলভাব, নরলোকে সুপ্রকাশ,
বিদ্যাসুন্দর ইতিহাস ভাষা,
শ্রবণে আমোদ হয়, কুলবতীর কুল ক্ষয়,
প্রেমিকের পোরে মন আশা।
বর্দ্ধমান যশকূপ, বীর সিংহনামে ভূপ,
তঁার কন্যা বিদ্যা গুণবতী।
বিচারে হারিয়ে পণে, বিবাহ করে গোপনে,
লোকে বলে করিল উপপতি।”^{১৯৮}

‘বিদ্যাসুন্দর’ নাটকটিতে ধর্মীয় বাতাবরণ থাকলেও এটি পুরোপুরি সামাজিক পালার মতো। বিদ্যা-সুন্দরের গোপন প্রেম-আখ্যানটিকে নাট্যকার এখানে দর্শকের পরিচিত সমাজজীবনের সঙ্গে যুক্ত করে পরিবেশন করেছেন। নাট্যকার দেবী কালীর মহিমাকে প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন। ফলে নাটকটি ধর্মীয়ভাব থেকে অনেকাংশে মুক্ত হয়ে আধুনিক যুক্তিতে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। নাট্যকাহিনির শুরুতে সুন্দরের দেহরূপের চমৎকার বর্ণনা রয়েছে। জল আনতে আসা এক নারী সুন্দরের দেহ-সৌন্দর্যের বর্ণনা করে বলেছেন—

“ওলো ছুঁড়ী! ওতো জলের ভিতর আগুন জ্বলে নাই।/ ঐ বসিয়ে
বকুল তলায় পুরুষ পরিষ্কার।/ কাঁচা বয়েস এই, গোঁফের রেক
উঠছে চমৎকার।”^{১৯৯}

সুন্দর এসেছে মালিনীর ফুল বাগানে। কারণ মালিনীই বিদ্যার পূজার ফুল জোগান দেয়। মালিনীকে সুন্দর নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে—

“কাঞ্চীপুর বাস গুণসিন্ধু রাজার তনয়।/ সুন্দর আমার নাম শুন
পরিচয়’।।”^{২০০-}

সুন্দরের পরিচয় পাওয়ার পর, মালিনী সুন্দরের কাছে বিদ্যার পরিচয় জানিয়েছে এইভাবে—

“অর্দ্ধেক বয়স রাজার, এক পাট রাণী,/ পাঁচ পুত্র নৃপতির, সবে
যুব জানি।/ এক কন্যে আইবুড়, বিদ্যা নাম তার,/ তার রূপ গুণ
কথা, অতি চমৎকার।/ লক্ষ্মী সরস্বতী যদি এক ঠাঁই হয়,/
দেবরাজ দেখে যদি নাগরাজে কয়।/ কিঞ্চিৎ কহিতে সে, পারে
কিনা পারে,/ যে কিছু কিঞ্চিৎ কহি, বোঝা অনুসারে।।/ সকলে
শরতের চাঁদে, দেয় উপমা,/ তা হ’তে উজ্জ্বল বলি, বিদ্যার
মুখচন্দ্রমা।/ সুচলন, সুবলন, সুগঠন দেখে,/ লজ্জা পেয়ে বিদ্যুৎ-
লতা, মেঘের আড়ে থাকে।/ স্থির পাইয়ে উভয়ে, যদি দেখা
যেত,/ তুল্য মূল্য কম বেশী, তবে জানা যেত।/ উর্বরশী, মেনকা,
রম্ভা, তলোত্তমা আদি,/ নিরূপমা উপমা, বিপক্ষ প্রতিবাদী।/ ভুবন
মোহিনী ধনি, নানাগুণ জানে,/ বিদ্যার, বিদ্যার কথা, সকলে
বাখানে।/ বেশ ভূষা করে যদি, বসেন পালঙ্কেতে, হরের গৃহিণী
যেন, এলেন কৈলাস হতে।/ সকলে অশঙ্ক যার, তুলনা বর্ণিতে,/
আমি কি পারিব তার, রূপ গুণ কহিতে।/ ঐ কথা লয়ে গেল,
দেশে দেশে দূত,/ আসি যে হারিয়ে গেল, কত রাজ-সুত।/ রাজ-
পুত্র বটে বাছা, রূপ ভাল বটে,/ বিচারে জিনিতে পার, তবেই
ভালো ঘটে।/ নৈলে বেড়ী খেঁচতে হবে।।”^{২০১}

বিদ্যার এই অপরূপ সৌন্দর্যের কথা শুনে এবং রূপ-লাবণ্যের পরিচয় পেয়ে সুন্দরের মনে বিদ্যার প্রতি অনুরাগ জন্মেছে। সুন্দর নানা ফুল দিয়ে একটি চিকন মালা তৈরি করে এবং তাতে একটি পত্র যুক্ত করে মালিনীকে দিয়ে বিদ্যার কাছে প্রেরণ করেছে। সেই পত্র পেয়ে এবং সুন্দরের হাতের মালার স্পর্শ পেয়ে বিদ্যার অন্তরের পূর্বরাগের উন্মেষ দেখা দিয়েছে। বিদ্যা মালিনীকে বলে—

“মালিনী! ঐ মালা আমায় দেখিয়ে খুন কল্লি।/ একে তনু জ্বর জ্বর,
মদনেরি পঞ্চশর, অহরহঃ হৃদে প্রহরণে,/ কিছার বিছার জ্বালা,
তাহে নারি অবলা, কুলবালা কত সব প্রাণে।”^{২০২}

এরপর মালিনীর সহায়তায় উভয়ের মধ্যে দর্শন এবং অনুরাগ জন্মে। দেবী কালীর আশীর্বাদে সুন্দর মালিনীর ঘর থেকে বিদ্যার প্রাসাদে সুরঙ্গ পথে উপস্থিত হয়। বিদ্যার

রাজ অন্তঃপুরে সুন্দরের এইরকম আকস্মিক আবির্ভাব সখীদের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়।
তারা সুন্দরকে বলে—

“বলি কে তুমি কি ছলে, এখানে কি জন্যে, কেন এলে রমণী মণ্ডলে।/
হংসিনী মণ্ডল যেমন সকল চঞ্চল হয়, হংস দেখিলে।।/ আমরা নারী
কুলবতী, সরমের ভয় করি অতি।/ অবলা সরলার প্রতি, হবে কি
অখ্যাতি, লোক জানিলে।।”^{২০৩}

কিন্তু বিদ্যা সুন্দরকে চিনতে পারে। সে সকল সখীকে আশ্বস্ত করে বলে—

‘তোমার ঠাকুরঝির প্রতাপ এমনি,/ আসিতে সুড়ঙ্গ পথ দিলেন
মেদিনী।/ আপনার ঠাকুরঝির প্রতাপে আমার কোন ভয়নাই।’^{২০৪}

এরপর বিদ্যার সঙ্গে সুন্দরের গভীর প্রণয়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। নাটকের মধ্যে একটি
চমক তৈরি করা হয়েছে সুন্দরের সন্ন্যাসীবেশে রাজদরবারে আগমনের ঘটনায়। সন্ন্যাসী
এসেছেন রাজকন্যা বিদ্যার অহংকারকে পরাজিত করতে। রাজা ভণ্ড সন্ন্যাসীর ছদ্মরূপ
ধরতে পেরে বলে—

“উদাসীন সন্ন্যাসী তুমি বেড়াও তীর্থে তীর্থে।/ নারীর প্রতিজ্ঞা শুনি,
এলে কি নিমিত্তে।।/ যখন নারীর প্রতিজ্ঞা শুনে হলে অভিলাষী,/
বুঝিলাম তুমি হবে, ভণ্ড সন্ন্যাসী।।/ যেমন রাবণ, সন্ন্যাসী হয়ে,
পঞ্চবতী বনে,/ রামের সীতা হয়েছিল, শুনেছি রামায়ণে।।/
সেইরূপ, দেখে তোমায়, সন্দহ ল মনে’।^{২০৫}

কিন্তু সন্ন্যাসীরূপী সুন্দর রাজাকে বলে—

“মহারাজ! বিচারে তাহার সঙ্গে, আমি যদি হারি।/ ছাড়িয়ে সন্ন্যাস
ধর্ম, দাস হব তারি।।/ গুরু কাছে মাথা, মুড়ায়েছি একবার।/
তারে গুরু মানিয়া, মুড়াব জটা ভার।।/ সে যদি বিচারে হারে,
তবে রবে লাজ।/ উদাসীন সন্ন্যাসী, আমি, আমার তাহে কি
কাজ।।/ তবে যদি সঙ্গে দেহ, প্রতিজ্ঞার দায়।/ নিযুক্ত করিয়া
দিব, শিবের সেবায়।।/ ধরাইব জটাভস্ম, পরাইব ছাল,/ গলায়
রুদ্রাক্ষ করে স্ফটিকের মাল।।/ তীর্থে তীর্থে লয়ে যাব দেশ
দেশান্তরে।/ এমন প্রতিজ্ঞা যেন, নারী নাহি করে।।”^{২০৬}

বিদ্যার সঙ্গে রসিকতা করার জন্যই সুন্দর সন্ধ্যাসীরবেশ ধারণ করেছিল। কথাপ্রসঙ্গে সুন্দর সে কথা জানালে বিদ্যা তার মনের ভাব প্রকাশ করে বলে -

“সপেছি ধন, জন্মের মতন, এ জীবন যৌবন।/ আর কার
অধিকার নাই, যা, ভাব চাঁদ বদন।।/ দেখো সখা সংগোপনে, রেখ
হে প্রেম প্রাণপণে,/ হারাইও না অযতনে, ছেড়না আশ্বাস,/
অবশেষ ভাসব দুজনায়, করব কাশীরাস, পূর্ণ অভিলাষ হবে তীর্থ
পার্যটন’।।”^{২০৭}

বিদ্যার এই কথায়, সুন্দরের প্রতি তার গভীর প্রেম ও ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। ইতিমধ্যে বিদ্যার গর্ভসঞ্চারণ হয় এবং রাণীমার কাছে খবর যায়। রাণীমা সংবাদ শুনে ক্ষুব্ধ হয় বিদ্যার সখীদের উপর। রাণীমা তাদেরকে বলে—

‘তোরাই বা কেমন রক্ষিণী ছিলি ভালে।/ সকলে মিলিয়ে রসে, কলঙ্ক দেশ
বিদেশে,/ চুন কালি দিলি গালে।/ থাক্ থাক্ থাক্ কাটাইব নাক/ আগে
ত রাজারে বলি/ তোদের মাথা মুড়াইব, গাধা চড়াইব,/ শেষে দিব চুণ
কালী।’”^{২০৮}

এমনকি নিজের মেয়েকেও নানাভাবে দোষারোপ করতে তিনি বিন্দুমাত্র পিছুপা হল না। এরপর নাট্যকাহিনিতে এলো চোর ধরার পালা। কৌশলে সুন্দরকে ধরে ফেলে জমাদাররা। সেকালে পাহারাদারের কাজ করতো জমাদার শ্রেণির মানুষ। এখানে নাট্যকার সেকালের সমাজ ব্যবস্থার কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরেছেন। তাদের চোর ধরার কৌশল, নারীরূপ ধারণ করে সুন্দরের সঙ্গে প্রেমমালাপ এবং পরিশেষে তাকে দড়ি দিয়ে বাঁধা-সমস্ত কিছুর মধ্যে ফুটে উঠেছে শাসন ব্যবস্থার নিখুঁত বাস্তব ছবি। রাজসভাতে চোররূপী সুন্দর নিজের প্রকৃত পরিচয় দিলেও রাজা বিশ্বাস করতে পারল না। চোরের মাথা কাটার জন্য রাজা কোটালকে নির্দেশ দেয়। তখন চোররূপী সুন্দর বলে—

“কাট মাথা মহারাজ তাতে ক্ষতি নাই।/ কালীর বর পুত্র, আমি কি
মরণে ডরাই?/ কাট মাথা মহারাজ তাতেও ক্ষতি নাই।/ বিধবা
হইবে কন্যা বধিলে জামাই।।/ সে যে কুলবতী সতী, হইয়াছে
গর্ভবতী,/ কি হবে তাহার গতি, ভাবছি আমি তাই।।”^{২০৯}

সুন্দরের কাতর আবেদনেও রাজার চেতনা ফিরল-না। পরবর্তী সময় যখন রাজ কর্মচারী গঙ্গাভাট রাজাকে জানায় চোর আসলে কাঞ্চীরাজের রাজকুমার, তখন রাজার বিশ্বাস জন্মায়। ততক্ষণে সুন্দরকে শ্মশানে হত্যার জন্য নিয়ে যায় মেথররা। কিন্তু দেবীর কৃপায় সুন্দর মুক্তি পায় এবং সুন্দরের সৌজন্যে রাজা-রাণী উভয়েই দেবীর দর্শন পায়। রাণীমা বিদ্যাকে আদর করে বলে —

‘মা! তুমি আমার যথার্থ কন্যা, আজ তোমা হতে যোগী জন বাঞ্ছিত সর্ব ভয়হারিণী মাকে দেখিতে পাইলাম। সখিগণ আজ আনন্দে তোমরা সুন্দরকে সাজাও আজ বিদ্যাকে সুন্দরের হাতে হাতে সমর্পণ করে দিব’।^{২১০}

বিদ্যা এবং সুন্দরের মিলনে নাট্যকাহিনির সমাপ্তি ঘটে।

বিদ্যাসুন্দর নাটকের আর একটি অভিনবত্ব হল ‘ভিস্তির পালা’ নামে একটি ছোটো নাটকের সংযোজন। কুশীলবদের সাজ-সজ্জা করার জন্য সময়ের প্রয়োজনে এবং মূল যাত্রাপালার অভিনয় করতে করতে যাতে পরের দিন সকাল হয়ে যায় তার জন্য, মূল নাটকের অভিনয়ের আগে বা পরে সেকালে অনেক সময় ছোটো ছোটো একাঙ্ক হাস্যরসযুক্ত নাটক যুক্ত করা হতো; সেগুলির অভিনয় হতো মূলত দর্শকের মনোরঞ্জন করার জন্য। ‘ভিস্তির পালা’ নামে এখানেও তেমনি একটি ছোটো পালা বা নাটক সংযুক্ত করা হয়েছে। সেখানে জমিদার, ভিস্তিদার, ভিস্তি, কেলুয়া, ভুলুয়া, মেথরানীর মতো কতোগুলি চরিত্র নিয়ে হাসি-মজার নাট্যদৃশ্য পরিবেশিত হয়েছে। এতে দর্শক চিত্তের মনোরঞ্জন ঘটানোই এই পালার মূল উদ্দেশ্য। এইভাবে কাহিনি বিশ্লেষণ করলে আমাদের বলতে কোন অসুবিধে নেই যে ‘বিদ্যাসুন্দর’ নাটকটি একালের পুনর্নির্মিত নাটক।

‘বিদ্যাসুন্দর’ নাটকের একটি বিশেষত্ব হলো বাস্তবধর্মী চরিত্রের সংযোজন। এই নাট্যপালার প্রধান-অপ্রধান চরিত্রগুলি আমাদের পরিচিত সমাজের রক্তে মাংসে গড়া জীবন্ত, চরিত্র বলে মনে হয়। সুন্দরের বর্ধমানে আগমন, মালিনীকে বশীকরণ, বিদ্যার সঙ্গে সুন্দরের প্রেম, সুন্দরের চোর হিসেবে ধরা পরা, পরিশেষে মিলন— সমস্ত ঘটনাই আমাদের সমাজে ঘটে থাকে। প্রতিটি চরিত্রের বাক্যালাপ ও সংলাপ ব্যবহারে আমাদের সমাজ-ভাষার চমৎকার প্রকাশ আছে। সুন্দরকে প্রথম দেখার পর বিদ্যার মনে যে পূর্বরাগের ব্যাকুলতা তৈরি হয়েছে, তা সত্যই অপূর্ব। বিদ্যার মনের অবস্থা ব্যক্ত করতে গিয়ে নাট্যকার জানিয়েছেন—

“শ্রবণ, মন, নয়ন, আজি প্রাণ বাঁধা ধনি তোমার ঋণে।/ সদা সুখে
অসুখী, বিধুমুখী তোমা বিনে।।/ যে যন্ত্রণা প্রতিক্ষণে, চকোর, যেমন
চন্দ্রহীনে।/ ভিজে কাঠ পোড়ে উননে, যেমন জ্বলন্ত আগুনে’।।”^{২১১}

ঠিক একইভাবে সুন্দরের মনেও বিদ্যার প্রতি গভীর অনুরাগ জন্ম নিয়েছে। সুন্দর মনের
সেই অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে একইভাবে-

‘সখা! দাস্য বলে, দেখ হে রেখ মনে।/ মানে মানে অতি হে যতনে।।/
যেন অন্যে কেহ না জানে,/ আম সঁপেছি প্রাণ তব করে গোপনে।।/
মরিব আদর্শনে, বারি বহে হে দুনয়নে,/ ভাবিরে প্রাণ কতক্ষণে, দেখা
হবে তব সনে।।’^{২১২}

এইভাবে নারী-পুরুষের হৃদয়বেদনাকে নাট্যকার পরিচিত সমাজ সংলাপে বেঁধেছেন।
প্রতিকালেই অবিবাহিতা মেয়ের উপযুক্ত স্বামী পাওয়ার জন্য বাবা-মায়ের মনে দুঃশ্চিন্তার
অন্ত থাকে না- এই নাটকেও তার সন্ধান পাওয়া যায়। স্বামী নির্বাচনে মেয়েদের যদি
কোন পণ করা থাকে, তাহলে পাত্র অন্বেষণের সমস্যা আরো তীব্রতর হয়। পড়াশুনার
অহংকারে বিদ্যার মনে যে পণ ছিল, তাতে তার বিবাহ দেওয়া রাজা-রাণীর পক্ষে কঠিন
হয়ে পরে। অবিবাহিতা কন্যার প্রতি পিতা মাতার চিন্তার পরিচয় নাট্যকার অতি
সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন এইভাবে। রাজা বলেছেন—

“বিষম বিষম চিন্তে, ভেবে প্রাণ যায়, মরি হায় হায়!/ হায় কেন মাটি
খেয়ে পড়লাম বিদ্যায়।/ লাজে বাজে লোক মাঝে, কথা নাহি যায়,/
সেদিন সুদিন কবে, সুপ্রভাত রজনী হবে,/ বিদ্যার বিদ্যায় হারাবে, পাবে
কে কোথায়?/ দিব সেনা হয় তৃপ্ত, করিলে ভোজন,/ নিশিতে না হয়
নিদ্রা, করিলে শয়ন,/ দিবা নিশি ওই কথা, কারে কব মর্ম্ম ব্যথা,/ যে
দুঃখ সর্ব্বদা হতেছে আমার।।/ বিদ্যাকে শিখায়ে বিদ্যা ভালত লাঞ্ছিত,/
কোথা যাব কি করিব, সদা বিচলিত।।’^{২১৩}

কালীমার প্রতি ভক্তি সুন্দরের চরিত্রের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। এই নাটকে সুন্দরের
মাতৃচরণে স্তবপাঠ যুক্ত করে নাট্যকার সুন্দরের মাতৃভক্তির পরিচয় দিয়েছেন। শ্মশান
ভূমিতে মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই জেনে, সুন্দর মাকালীর কাছে কৃপা প্রার্থনা
করে বলেছে—

“কৃপা কর মা কালী করাল বদনি! / খর্ব কর গর্ব, খর্ব ধারিণী। / গতি
গিরি সুতা গোলক রক্ষিণী, / ঘুচাও ঘোর দায় ঘুণিত লোচনী। / উমারূপা
উমেশ মোহিনী, / চিন্তা হর চণ্ডী চৈতন্য দায়িনী। / ছিন্ন মস্তা ছল ছাড় গো
জননি! / জগদ্ধাত্রী কর্ত্রী জগৎ প্রসবিনী। / জঙ্ঘা ভয় হরা ঝংঝাট বারিণী, /
ঈশানী ইন্দ্রচন্দ্র প্রসবিনী। / টঙ্কার মাতা টঙ্কার রূপিনী।”^{২১৪}

নাটকের আর একটি অনবদ্য চরিত্র হিরামালিনী। সে রাজ বাড়ির ফুলওয়ালী হওয়ায় সুন্দর ও বিদ্যার মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করেছে। তার ভূমিকা নাটকে কম নয়। প্রবাদ-প্রবচনের যথাযথ ব্যবহার নাটকটির আকর্ষণ বারিয়েছে। এখানে আছে অজস্র লোকপ্রচলিত দেশী প্রবাদ। যেমন—‘পাকলে শ্রীফল, কাকে কি বল’, ‘কাটা গায়ে নুনের ছিটে’, ‘সীতার ধর্ম’, ‘পতির সঙ্গে সঙ্গী হতে হয়’, ‘বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ালে’, ‘গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল’, ‘রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা দুঃখ পায়’ ইত্যাদি। এছাড়াও আছে হিন্দী ভাষার প্রত্যক্ষ প্রভাব। বিদ্যার সংবাদ পেয়ে রাজা জমাদারকে নির্দেশ দেয়—

‘জমাদার! বিদ্যার মহল যে চুরি হো গিয়া। চোর পাকড়ানেকো ও
আন্তে কোটাল লোককো আবি বোলাও’।^{২১৫}

হিন্দীভাষী জমাদার শ্রেণির মানুষেরা যে সেকালে রাজ-রাজাদের অধীনে পাহারাদারের কাজে নিযুক্ত ছিল, এ নাটকে তার পরিচয় মেলে। নাটকটির আর একটি বিশেষ দিক হল কিছু পদে রাগ-রাগিনীর সংযুক্তিকরণ। এই নাট্যপালা সেই সময়ে যে রীতিমতো গানের মধ্যে দিয়ে পরিবেশিত হতো, এ যেন তারই পরিচয়। তবে বলাবাহুল্য মূলত চরিত্রগুলির আধুনিকিকরণের জন্য সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত ‘বিদ্যাসুন্দর’ নাট্যপালার জনপ্রিয়তা ও আকর্ষণ বিন্দুমাত্র কমেনি। তাই বলতেই হয় ‘বিদ্যাসুন্দর’ নাটকটি চরিত্র, ভাষা, কাহিনি সবদিক থেকেই একালের উপযুক্ত পুনর্নির্মিত ও বিনির্মিত নাটক হয়ে উঠতে পেরেছে।

১৩। নিখিল চট্টোপাধ্যায় - ‘অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা’ (২০১৬);

‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যের বিষয় অবলম্বনে নিখিল চট্টোপাধ্যায় ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে লিখেছেন ‘অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা’ নামের একটি নাটক। ১৮ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১২ সেন্টিমিটার চাওড়া এই নাটকটিতে প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (১), উৎসর্গপত্র (১), ভূমিকা (১), মূলনাটক (২১) সহ মোট ২৫টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ -

“কলাভূৎ/ নিখিল চট্টোপাধ্যায়/ সপ্তডিঙা/ ছোটদের নাটক
সংকলন”^{২১৬}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ-

“সপ্তডিঙা/ ছোটদের নাটক সংকলন/ নিখিল চট্টোপাধ্যায়।”^{২১৭}

নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি রচিত হয়েছে নীল, লাল, সাদা, হলুদ, সবুজ রঙের সমন্বয়ে। তাতে সমুদ্রে ভাসমান চারটি নৌকার দৃশ্য অঙ্কিত আছে। নাটকে উল্লিখিত চরিত্রগুলি হল- মহাদেব, নন্দী, ভৃঙ্গী, উমা, জয়া, বিজয়া, নারায়ণ, লক্ষ্মী, যমরাজ, অগ্নি, সমুদ্রপতি, তিন জন ঋষি, তিন জন অসুর, বন্যা। নাটকটির মূল্য একশত পঞ্চাশ টাকা।

কবি ভারতচন্দ্র ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যের অনুভাবনায় একালের নাট্যকার নিখিল চট্টোপাধ্যায় অন্নদার নব রূপের প্রকাশ ঘটালেন ‘অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা’ নাটকে। নাটকের সূচনায় দেবী অন্নপূর্ণার শৈশবরূপের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। উমারূপে দেবী অন্যান্য পাহাড়ি মেয়েদের সঙ্গে খেলা করছেন, এমন সময় সেখানে উপস্থিত হয়েছেন নারদ। এর পরেই বালিকা উমা ও নারদের কথোপকথন শুরু হয়। এই কথোপকথন অংশে নাট্য সংলাপ রচনায় নাট্যকার বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন -

“নারদ।। কেমন আছো গো মা? ভালো আছো তো ?
উমা।। (ঘাড় নেড়ে) হ্যাঁ ভালো আছি। তোমাদের, দেবলোকের সব
কুশল তো ?
নারদ।। হ্যাঁ মা সব কুশল।
উমা।। ভালো, খুব ভালো।
নারদ।। তাহলে আসি মা ?
উমা।। এসো।”^{২১৮}

উপরোক্ত সংলাপে উমার শৈশব, বাল্যকৌড়া ও মার্জিত কথাবলার দক্ষতাকে নাট্যকার চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন। এই ঘটনার পর পরেই উমার বিয়ে হয় শিবের সঙ্গে। এখন উমা শিবের ঘরনি। তাই নারদের আগমনে এবং তার ডাকে উমা আর আসতে চায় না। নারদ মাতার দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়, অনুরোধ করে একটি বার দর্শন দেওয়ার জন্য-

“আছো তো সাড়া দিচ্ছ না কেন ? কেন এসে আমাকে দেখা দিচ্ছ
না মা? তোমাকে একবার দেখবো বলে আমি যে অধীর আগ্রহে

অপেক্ষা করে আছি। মাগো একবার এসে আমার নয়ন সার্থক করে যাও।”^{২১৯}

উত্তরে উমা বলে-

“না-না। তোমার কোনো অপরাধ নেই। আসলে আমি তো এখন পরের ঘরনী।”^{২২০}

মাতা উমার দর্শন না পেয়ে, নারদ মনোবেদনায় নারায়ণের কাছে উপস্থিত হয় এবং সমস্ত কথা বলে। নারায়ণ নারদের কষ্ট দূর করার জন্যে কথা দেয়। নারদকে বলে-

“ঠিক আছে যাতে তোমার মাতৃদর্শন হয় তার ব্যবস্থা আমি করবো।”^{২২১}

এরপরেই নারায়ণ সুদর্শনকে ডেকে নির্দেশ দেয়-

“আগামীকাল সূর্যোদয়ের শুরু থেকে একদিনের জন্য তিনটি লোক স্বর্গ-মর্ত্য পাতালের সমস্ত খাদ্য হরণ করে নিতে হবে। কোনোস্থানে একবিন্দু খাদ্য কণা যেন না থাকে। যার যত প্রয়োজনই হোক কেউ যেন একবিন্দু খাদ্য কণা না পায়।”^{২২২}

সুদর্শন নারায়ণের কথা মতো স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালের সমস্ত খাদ্য আহরণ করে। এদিকে ক্ষুধার জ্বালায় ত্রিলোকে হাহাকার পরে যায়। স্বয়ং শিব ক্ষুধায় কাতর হয়। নিজের ঘরে গিয়েও এক কণা অন্ন পায় না। উমা বলে-

“হ্যাঁ। ঘরের কোথাও এতটুকু খাদ্য কণা পেলাম না যা আপনাদের দেবো প্রভু।”^{২২৩}

মহাদেব নন্দী ও ভৃঙ্গীসহ বৈকুণ্ঠধামে মা লক্ষ্মীর কাছে অন্নের জন্য উপস্থিত হয়। সেখানেও একই অবস্থা। এরপর মহাদেব ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে পরে। মহাদেবের ডাকে একে একে আসে যমরাজ, অগ্নি, সমুদ্র, কিন্তু তারাও মহাদেবের কষ্ট নিবারণের কোনো পথ না পেয়ে পালিয়ে যায়। এই সময় নারায়ণ কৈলাশে শিবের ভবনে উমার কাছে খবর পাঠায় নারদকে দিয়ে। নারদ উমাকে শিবের সংকটময় অবস্থার কথা বলে-

“তোমার স্বামী মহাদেব আজ অন্নাভাবে ক্ষিধের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে “হা মৃত্যু- কোথায় মৃত্যু” বলে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছেন, সমুদ্রে

ডুবে মরতে যাচ্ছেন। যে কোনো মুহূর্তে দেহ ত্যাগ করবেন বলে মনোস্থির করেছেন। তুমি এসব কি কিছুই জানো না মা ?”^{২২৪}

উমা এবার মহামায়ারূপে ত্রিলোকের সমস্ত খাদ্যভাণ্ডার পূরণ করে দিতে উদ্যোগী হয়। জয়া-বিজয়াকে সঙ্গে নিয়ে উমা অন্নদাত্রী রূপে উপস্থিত হয় শিবের কাছে। একটি রেকাবীতে পায়ের তলে অন্ন তুলে মহাদেবের হাতে দেয় এবং বলে- “খাও ঠাকুর খাও”। তখন নারায়ণ নারদকে বলে জগৎজননী মায়ের রূপ দর্শন করে নিতে। নারদ উমাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে এবং বলে-

“ধন্য ধন্য আমি। হে মা উমা মহামায়া। নয়ন আমার সার্থক তোমার এই ভুবনমোহিনীমাতুরূপ দর্শন করে। আনন্দ- আনন্দ।... মা আমাদের অন্নপূর্ণা’ হয়েছে।”^{২২৫}

ব্রহ্মা অন্নদাত্রী মায়ের এই অন্নদাত্রীরূপ ত্রিলোকের কাছে স্মরণীয় করে রাখার জন্য দুর্গার কাছে অনুরোধ জানায়-

“তোমার এই মূর্তি অর্থাৎ যে মূর্তিতে তুমি বিশ্বেশ্বর মহাদেবকে অন্নদান করছো জয়া, বিজয়া, নন্দীভৃঙ্গী সমেত এই সমগ্র মূর্তিতে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই কাশীধামে। ত্রিলোকের সবাই তোমাকে পূজা করুক মা অন্নপূর্ণা নামে।”^{২২৬}

দেবী মহামায়া কাশীধামে প্রতিষ্ঠিত হলেন নিজ ইচ্ছায় অন্নপূর্ণা রূপে। ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যের প্রথম খণ্ডের নামকরণের সার্থকতা বজায় রেখে ‘অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা’ নাটকের কাহিনি নির্মাণ করেছেন নাট্যকার। নাটকটি যে অন্নদামঙ্গল কাব্যকাহিনির পুনর্নির্মাণ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নাট্যকার নিখিল চট্টোপাধ্যায় মূল অন্নদামঙ্গল কাব্যের কাহিনিকে এখানে কল্পনার রসে জারিত করে ভিন্নরূপ দান করার চেষ্টা করেছেন। তবে কাহিনিতে নাট্যচমক ও ভক্তিবাব সংযোজন করে তিনি মূল কাব্যের প্রধানভাবকে পুনর্নির্মাণ করেছেন। ফলে নাটকটি আধুনিককালেও বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

‘অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা’ নাটকের চরিত্র পরিকল্পনা, ভাব, ভাষা আধুনিকতায় পরিপূর্ণ। অন্নপূর্ণা, শিব, নারদ, নারায়ণ প্রমুখ চরিত্রগুলি স্বর্গীয় মহিমা অনেকটা অতিক্রম করে মর্ত্যের নর-নারীর জীবনচেতনায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। টান টান উত্তেজনা ও সংজ্ঞাপূর্ণ নাট্যকাহিনির সমন্বয়ে নির্মিত এই নাটকটি দর্শককে আগ্নিত করেছে। ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যের কাহিনির এখানে পরিবর্তন হয়েছে। নাট্যকার শিব

চরিত্রের উপর উমার ভালোবাসার বিষয়টি প্রধান করে তুলেছেন। নারদের কাছ থেকে যখন ত্রিলোকের অন্নসংকটের কথা উমা জানতে পেরেছে, তখন সে অন্নপূর্ণার রূপ ধরে অন্নের সংকটমোচন করেছে। নিজের হাতে শিবকে অন্ন দান করেছে। এ অন্নপূর্ণা দেবী নয়, একেবারে আমাদের ঘরের মেয়ে বা বউ; যে সংসারের সংকট মোচনে এগিয়ে আসে। নিজের যথাসাধ্য সামর্থ্য দিয়ে সংসারকে বাঁচিয়ে রাখে। উমা বুঝতে পারে কোনো এক কুচক্রান্তের জন্য আজ এই জগৎ সংসারে অন্নের অভাব ঘটেছে। সেই অশুভ পরিকল্পনাকে প্রতিহত করার জন্য উমা অন্নদার রূপ ধারণ করে। জয়া-বিজয়কে উমা বলেছে—

“বুঝেছি। এ সব কিছুর মূলে ঐ মহাচক্রী বিষ্ণু নারায়ণ। ঠিক আছে প্রভু, তুমি ভগবান। আর আমি বিশ্বেশ্বরী মহামায়া। কিভাবে তুমি ত্রিভুবনকে অন্নহীন করে রাখো আমি এবার দেখাবো।”^{২২৭}

একদল কালবাজারী, মুনাফাখোর মানুষের চক্রান্তে আমাদের সমাজে নানা বিপদ আসে, সংকট দেখা দেয়। তাদেরকে পরাস্ত করতে এগিয়ে আসে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কিছু মানুষ; যাদের কাছে মানুষের মূল্য অর্থের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশি। নাটকে উমা যেন তারই প্রতীক চরিত্র। তার এই আচরণ কেবল স্বামীপ্রেম নয়, মানবপ্রেমও বটে। নাট্যকার নাটকটিতে শুধু কাহিনির পুনর্নির্মাণ করেননি, চরিত্রেরও বিনির্মাণ করেছেন। উমার অন্নপূর্ণা রূপের প্রকাশ তার বড়ো প্রমাণ। শিব ভবঘুরে প্রকৃতির দেব চরিত্র হলেও, পৌরাণিক মাহাত্ম্য তার মধ্যে একেবারে নেই বললেই চলে। সে একেবারে সাধারণ মানুষ। প্রতিটি মর্ত্যবাসী নর-নারীর মতো ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর। দেবী অন্নদার কাছ থেকে অন্নগ্রহণে তার প্রাণ বাঁচে। তাই এখানে শিব পৌরাণিক প্রভাব অতিক্রম করে সাধারণ মানুষ হয়ে উঠেছে। নারদ ও নারায়ণ চরিত্র দুটিকে চক্রান্তকারি মানুষের মতো করে আঁকা হয়েছে, যাদের চাওয়া-পাওয়ার জন্য ত্রিলোকের সমস্ত খাদ্য বিলুপ্ত হয়েছে। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে সংকটে দেখা দিয়েছে। একালেও এইরকম মানুষের সংখ্যা কম নয়, যারা অন্যের কষ্টের জন্য দায়ী। ব্রহ্মা চরিত্রটি ভালো মানুষের প্রতীক, যে কিনা মা অন্নদার অন্নদাত্রী রূপটিকে চিরকালের মানুষের জন্যে ধরে রাখতে চেয়েছে। তার ভাবনায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর মূল্য স্বীকৃত হয়েছে। এইভাবে অন্নদামঙ্গল কাব্যের চরিত্রগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে আলোচ্য ‘অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা’ নাটকের চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব নাট্যকার নিপুণভাবে চরিত্রগুলিকে একালের প্রেক্ষাপটে পুনর্নির্মাণ করেছেন। শুধু চরিত্র ভাবনা নয়, চরিত্রগুলির সংলাপেও আধুনিকতার ছাপ বিদ্যমান। উমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় নারদের কথায় বা শিবের কাতরোক্তিতে

কোনোরূপ আভিজাত্য নেই; একেবারে সাধারণ চলিত গদ্যে নারদ, শিব ও উমা তাদের মনের ভাব প্রকাশ করেছে। নারদ বলেছে-

“কই গো মা উমা? আমি এসেছি গো? একবার আমায় দেখা দিয়ে যাও মা।”^{২২৮}

উমার কাছে শিব প্রচণ্ড ক্ষুধার কথা ব্যক্ত করে বলে—

“তুমি এসেছো? বড় ক্ষুধা— প্রাণ যায়। অন্ন দাও—আর পারছি না। অন্ন দাও।”^{২২৯}

শিবের হাতে রেকাবিতে পায়ের অন্ন তুলে দিয়ে উমা শিবকে বলেছে— ‘খাও ঠাকুর খাও’। এ যেন আমাদের ঘর-পরিবারের নিজস্ব ভাষা। এইভাবেই নাট্যকার নিখিল চট্টোপাধ্যায় ‘অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা’ নাটকে মধ্যযুগীয় দেব-দেবী ভাবনাকে পুনর্নির্মাণ ও বিনির্মাণ করেছেন।

ঙ। শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য অবলম্বনে রচিত নাট্য পুনর্নির্মাণ-

১৪। রাধারমণ ঘোষ- মুচুকি মঙ্গল কাব্য (২০১০);

‘শিবায়ন’ কাব্যের শিব চরিত্র অবলম্বন করে রাধারমণ ঘোষ ২০১০ সালে রচনা করেন ‘মুচুকি মঙ্গল কাব্য’ নামের একটি নাটক। ১৮ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১২ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটির প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (১), উৎসর্গপত্র (১), চরিত্রলিপি (১), মূল নাটক (২০) সহ মোট ২৪টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ -

“কলাভূৎ / রাধারমণ ঘোষ/ এক ডজন একাঙ্ক।”^{২৩০}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ-

“এক ডজন একাঙ্ক।/ বারোটি একাঙ্ক নাটকের সংকলন/
রাধারমণ ঘোষ/ প্রকাশক কলাভূৎ পাবলিশার্স/ পরিবেশক নব
গ্রন্থ কুটির।”^{২৩১}

প্রচ্ছদপত্রটি রচিত হয়েছে লাল, সাদা, সবুজ, হলুদ রঙের সমন্বয়ে। তাতে জ্বলন্ত আগুনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। চরিত্রলিপিতে আছে মুচুকি, মহাদেব, উষ্কি, ভেষ্কি, ভোঁদড় এবং নন্দী। উৎসর্গপত্রে বলা হয়েছে—

“রাধারমণের নাটকগুলি যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদের জন্য।”^{২৩২}

নাটকটি প্রকাশিত হয় কলাভূৎ পাবলিশার্স, এ(পি) ২, বর্ণপরিচয় (দ্বিতল), কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা- ৭০০০০৭ থেকে। নাটকটি পরিবেশনা করেন নব গ্রন্থ কুটির।

নাট্যকার রাধারমণ ঘোষ নাটকটিকে একালের সমাজ-বাস্তবতার পরিমণ্ডলে পরিবেশন করেছেন। এখানে প্রধান চরিত্র মুচকি। তার ডাকেই পৌরাণিক দেবতা শিবের আবির্ভাব ঘটেছে। শিবায়নের শিবের মতো এই নাটকেও শিব চরিত্র নাট্যদর্শকের কাছে উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় হয়েছে। মুচকি বাবা ভোলানাথকে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রার্থনা জানিয়েছে খুবই আকর্ষণীয় কাব্যভঙ্গীতে। সে বলেছে-

“বাবাগো,/ এক বছরে দুঃখ আমার চোন্দোমাস।/ বউটা আমার মারছে ঝাঁটা;/ যখন-তখন বলছে ‘পাঠা’;/ ‘ধুমসো গতর’, ‘হন্দ-কুড়ে’।/ মনের সুখে মারছে ছুঁড়ে—/ উজার করে বাক্য ঝুলি। / হায়রে হলো সর্বনাশ।/ আহারে দুঃখ আমার চোন্দোমাস।/ বাবাগো,/ এই বারেতে পড়ল মাথায় বজ্রাঘাত।।/ ডাইনে আনতে ফুরোয় বাঁয়ে,/ নুনের ছিটে কাটা ঘায়ে।/ সকাল-সন্ধ্য-রাত্রি বেলা/ পাওনাদারের গুঁতোর ঠ্যালা,/ হিসেব দেখে ধারের খাতায় / আকাশ ভেঙে পড়ছে মাথায়।/ হলাম বুঝি কুপোকাত।/ গেছিরে, পড়ল মাথায় বজ্রাঘাত।।/ বাবাগো,/ সশরীরে দাও না দেখা একটি বার।।/ শ্রীচরণে করছি যে গড়/ দাও না বাবা একটুখানি বর।”^{২৩৩}

মুচকির প্রার্থনায় ভোলানাথ থাকতে না পেরে, নিজেই ষাঁড়ের বদলে আধুনিক সভ্যতার যানবাহন সাইকেল চালিয়ে এসে হাজির হয়েছে তার সামনে। তখন মুচকির সন্দেহ হয় সে আসল ভোলানাথ কিনা? মুচকি বলে-

“তুমিই যে সত্যিকারের বাবা ভূতনাথ—ব্যোম ভোলানাথ—পশুপতি—উমাপতি কৈলাসেশ্বর—হর হর মহাদেও সেটা কি করে বুঝব?”^{২৩৪}

কেননা মুচকির হৃদয়ে ভোলাবাবার যে রূপ কল্পিত ছিল, তার সঙ্গে এ বাবার তেমন মিল ছিল না। মুচকি বলে—

“কিন্তু তোমার চেহারায় ঐ শুধু মাথার জটাটি ছাড়া আরতো কোনো মিল পাচ্ছি না। তোমার পরনে বেল-টম প্যান্ট। গায়ে

গুরু-পাঞ্জাবি, পায়ে চকচকে স্যাডেল। কোমরে সাপের বদলে ইয়া
চওড়া মস্তানি বেল্ট।”^{২৩৫}

তখন শিব জানায় তার পোশাক পরিবর্তনের প্রকৃত কারণটি—

“ওরে বাবা, এসব কি আমার নিজের রে। আমিই কি এসব পরে
খুব একটা স্বস্তি পাচ্ছি বলে মনে করছি। কে জানে যে আজকাল
স্বর্গ থেকে মর্ত্যের বর্ডারে এত কড়াকড়ি হয়েছে? একবার বোঝা
মুচকি, সৃষ্টির প্রথম থেকে যে পোশাক পরে এ্যাডিন কাটালাম,
বর্ডারে বলে কিনা ওসব জংলি পোশাক পরে মর্ত্যে যাওয়া চলবে
না। শেষকালে ঘন্টায় পঞ্চাশ পয়সা হিসাবে জামাপ্যান্ট, জুতো এই
সব ভাড়া করতে হলো। কিন্তু বাবা মুচকি, তুমি যত প্রশ্ন করে
সময় কাটাতে ওদিকে আমার কিন্তু তত ড্রেস-ভাড়ার চার্জ
বাড়বে।”^{২৩৬}

মুচকি এবার নিশ্চিত হয়ে মহাদেবের কাছে বর প্রার্থনা করে—

“হাতি চাই, ঘোড়া চাই,/ ঘড়া ঘড়া সোনা চাই,/ গোটাগোটা রূপো চাই, /
বড় বড় বাড়ি চাই,/ নিউ মডেল গাড়ি চাই,/ সুন্দরী নারী চাই/ ক্ষমতাটা
হাতে চাই,/ হাতে মাথা কাটা চাই,/ গাদা গাদা যশ চাই,/ দেশ জুড়ে
খ্যাতি চাই।/ এতগুলো বর চাই।”^{২৩৭}

এতগুলো বর একসঙ্গে দিতে রাজি হয় না মহাদেব। মহাদেব বলেন-

“আরে বাপরে! এ যে তুমি আমাকে দেউলিয়া করে দেবে বাবা
মুচকি। তুমি তো জানো না বাবা, স্বর্গে কি রকম কস্ট-কন্ট্রোল
শুরু হয়েছে। অতগুলো বর দান করতে পারব না বাবা
মুচকি।”^{২৩৮}

তাঁর ভাষায় ধরা পরেছে ইংরেজি শব্দের যথোচিত ব্যবহার (কস্ট-কন্ট্রোল), যা মধ্যযুগীয়
কালপর্বে শিবের মুখে বেশ হাস্যকর হলেও একালের প্রেক্ষাপটে মুচকির সঙ্গে কথাবার্তায়
তা একেবারে সঙ্গতিপূর্ণ। মুচকির ভাষাতে সংকোচের কোনো নামগন্ধ নেই। শিব যখন
এতগুলো বর তাকে দিতে চায়নি, মুচকি তখন শিবকেই ‘চামার’ বলে গালি দেয়।
এমনকি তার এক সাকরেদ উল্লিকে দিয়ে শিবের পেটে ‘চু’ মারায়। এই সব অত্যাচারের
হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য শিব মুচকিকে চাহিদা মত সমস্ত বর দিয়ে স্বর্গে পালিয়ে

যায়। একজন সাধারণ স্বার্থান্বেষী মানুষের ডাকে সাড়া দিয়ে এবং তার পাশ্চাত্য পরে শিব চরিত্র যেভাবে নাস্তানাবুদ হয়েছে, তা একালের নাট্যপ্রেমী দর্শকের কাছে সত্যই উপভোগ্যের বিষয়। শিব চরিত্রের কোন পৌরাণিক তেজ বা গান্ধীর্ষ ‘মুচকি মঙ্গল কাব্য’ নাটকে আমরা খুঁজে পাইনি। নাট্যকার এখানে শিবকে নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন।

নাটকের পরিণতিতে লোভী মুচকি অবশ্য উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে। শিবের বরে মুচকি বড়োলোক হয়েছে, কয়েকটি ফ্যাক্টরির মালিক হয়েছে, বড়ো বাড়ি করেছে, গাড়ি কিনেছে, দুহাতে টাকা উপার্জন করেছে, সুন্দরী নারীও পেয়েছে, আর পেয়েছে অনেক অনেক সোনা-রূপা। এক কথায় ধনবান হয়েছে। কিন্তু তার লোভ-লালসার পরিসমাপ্তি ঘটেনি। কারখানায় শ্রমিকদের সে নানাভাবে শোষণ করে চলেছে। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে, ভুল বুঝিয়ে তাদের হাতে রাখতে চেয়েছে। একালের একজন ছদ্মবেশী রাজনৈতিক নেতার মতো সে শ্রমিকদের খুশি করার জন্যে হিন্দী-বাংলা ভাষা মিশিয়ে বক্তৃতা দিয়েছে। মুচকি বলেছে-

“কথাটা হয় কি দেশকা এই লক্ষ লক্ষ গরিব আদমিকা সেবা করনেকে লিয়ে আমি তো দিনরাত ছটপট করতা হয়। কিসে আপনাদের ভালো হোগা, কিসে আপনারা সুখ-শান্তিমে থাকেগা, তাই চিন্তা করতে করতে রাত্তিরে আমার ঘুম নেই হোতা হয়। আমি সব সময় চাতা হয় কি আপনি লোক দিনরাত হাসেগা, কখনো কাঁদেগা নেহি। আপনি লোক খেতে খেতে হাসেগা। চলতে ফিরতে হাসেগা। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি দেখকে হাসেগা। ভেজাল জিনিস কিনতে কিনতে হাসেগা এমন কি মনের জ্বালায় যখন গলায় দড়ি দেকে গাছমে ঝুলেগা তখনও হাসেগা। (উল্লিখে) হাততালি।”^{২৩৯}

পরপরেই মুচকির পোষা গুন্ডা উল্লি ও ভেল্লি এসে খবর দেয় কারখানার শ্রমিকরা ক্ষেপে গেছে। এবার মুচকি বিপদ বুঝে মহাদেবকে পুনরায় প্রার্থনা জানায়-

“তৈল তৈল দিচ্ছি তৈল/ বাবা-মহাদেব ব্যোস ভোলানাথ বাঁচাও বাবা, বাঁচাও বাবা/ ব্যোম ভোলানাথ,/ হলো আবার মন্দ বরাত।/ টাকায় আমার, শ্যাওলা ধরে/ তবুও টাকা চাই যে প্রভু,/ মজুরেরা কাঁপবে ভয়ে,/ থাকবে ভয়ে জবু থবু।/ কিন্তু সবাই হারামজাদা/ রীতিমত ক্ষেপছে এবার,/ ভাবছে মনে কারখানাটা/ যেন তাদের নিজের বাবার।/ রাগের

চোটে ব্রহ্মতালু/ টগবগিয়ে উঠছে জ্বলে,/ বাপ ভোলানাথ দয়া করো/
উপায় তুমি দাও না বলে।”^{২৪০}

মুচকির ডাকে যখন বাবা ভোলানাথ সাড়া দেন না, তখন উষ্ণ ও ভেঙ্কি তাকে পরামর্শ দেয় ঘুষ দেওয়ার। কিন্তু তাতেও শিবের কোন পাত্তা পাওয়া যায় না। সেখানে আসে শিবের অ্যাসিস্টেন্ট নন্দী। সে মুচকিকে জানায় শিবের বিপন্ন অবস্থার কথা। কৈলাসের ভূত-প্রেতগুলো ভোলানাথের উপর ক্ষেপে গেছে, তাকে ‘রিফিউজি’ করে দিয়েছে। ভূত-প্রেতদের ক্ষেপে যাবার কারণ ব্যাখ্যা করে নন্দী বলেছে—

“বারে, ক্ষেপবে না? তুমি দেখছি একেবারে পয়লা নম্বরের খিপ্পু। বাবা বসে বসে ওদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাবে আর কথায় কথায় ওদের বাপ তুলে গালাগালি দেবে, লাথি মারবে, কান ধরে ওঠ-বোস করাবে—তাহলে কে ক্ষেপে যাবে না বলো? ভূতগুলো বললে, আমরা দিন রাত খেটে খেটে হাড়িসার হয়ে যাচ্ছি আর তুমি আমাদের পয়সায় ঠ্যাং-এর ওপর ঠ্যাং তুলে বসে গাঁজায় দম দিচ্ছ, ঘটি ঘটি খাঁটি দুধ খাচ্ছ আর মা-দুগগার জন্যে লতুন লতুন গয়না গড়াচ্ছ। হয় মোদের খাটুনির ল্যাহ পয়সা দাও, পেট ভরে খেতে দাও, লইলে মোরা এমন ক্ষ্যাপা ক্ষেপব বটে তখন আর আমাদের সামাল দিতে লারবে। বাবা ওদের কথা শুনে রেগে সবার ওপর লুটিস জারি করে দিল, যে কাজকর্ম না করে ট্যা-ফুঁ করবে তাকে তিরশুলের খোঁচা খেটে হবে। লুটিশ দেখে ভূত-প্রেতগুলো বাবাকে খচ্চর-টচ্চর বলে এমন ভূতের লাচ শুরু করল সে কি বলব তোমাদের।”^{২৪১}

বাবা মহাদেবের এই রকম সংকট জনক অবস্থার কথা শুনে মুচকি মর্মাহত হয় এবং সিদ্ধান্ত নেয় কারখানার সমস্ত শ্রমিকদের সে নিজেই বক্তব্য দিয়ে শান্ত করবে। শ্রমিকদের লক্ষ্য করে মুচকি বলে—

“বন্ধু ভাইও, আপনি লোক এত খেপকে গিয়া কেন? রাগকে গিয়া কেন? খেপকে, রাগকে, আদমিকো প্যাঁদায়কে মহৎ কর্ম নেহি হোতা হয় ভাইও। মহৎ কর্ম করনে কে লিয়ে—”^{২৪২}

বক্তৃতার মাঝে উষ্ণ-ভেঙ্কির মাথায় ইঁট পরে। বিপদ বুঝে মুচকি পাল্টি খায়, উষ্ণ, ভেঙ্কি, ভোঁদরের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেয়। শ্রমিকদের অনুরোধ করে বলে—

“হ্যাঁ বন্ধু ভাইও, আমি তোমাদের টাকা দেগা, চাকরি দেগা, যা চাইবে তাই দেগা। আমাকে বাঁচা বাবা। এদেরকে ঠেঙিয়ে ক্যাওড়াতলায় পাঠিয়ে দে।”^{২৪৩}

মুচকির এই রকম আচরণ দেখে তারা প্রচণ্ড রেগে যায়। ভোঁদর বলে—

‘কি বলব উল্কিদা, ব্যাটার আগুনে চাকরি করি বলে আমাকে কম গালাগালি দিয়েছে। আমার গিন্নি তুলে কম খারাপ খারাপ কথা বলেছে। তোমরা ওকে দু’ধার থেকে একটু চেপে ধরবে। আমি ওর তলপেটে জুতো শুদ্ধ একটা লাথি মারব’।^{২৪৪}

ভেঙ্কি মুচকিকে সুযোগ বুঝে চড় মারে। উল্কি বলে—

“এই ব্যাটাকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে যেখান দিয়ে হোক হাওয়া মারতে হবে।”^{২৪৫}

চেয়ারে বেঁধে তারা পালিয়ে গেলে মুচকি শ্রমিকদের ইটের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়। সে বলতে থাকে—

“ওরে তোদের পায়ে পড়ি। আমাকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখ। ওরে তোদের পায়ে পড়ি, আমাকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখ। ও বাবা-মহাদেব, এই শালার মহাদেব। কেন বর দিয়ে আমাকে বড়লোক করলি রে শুয়োরের বাচ্ছা!”^{২৪৬}

যার বরে একসময় সে বড়লোক হয়েছিল, তাকেই সে বিপদে পড়ে গালাগালি করে ‘শুয়োরের বাচ্ছা’ বলে। মুচকি একালের লোভী মানুষের প্রতীক। তার কথাই নাটকের প্রধান বিষয়। একালের মানুষের চাহিদার সঙ্গে শিবায়ন কাব্যের শিব চরিত্র সংযোজনে ‘মুচকি মঙ্গল কাব্য’ পুনর্নির্মিত হয়েছে।

আধুনিক কালের একটি অন্যতম হাসি-মজার নাটক ‘মুচকি মঙ্গলকাব্য’। এই নাটকের প্রতিটি চরিত্র বাস্তব, জীবন্ত ও আকর্ষণীয়। মুচকি, মহাদেব, উল্কি, ভোঁদড়, নন্দী যেন একালের এক একজন মানুষের ভাবনা-চিন্তা ও ক্রিয়া-কলাপের প্রতীকী চরিত্র। মুচকি যখন বউয়ের কাছে বাঁটারবারি খায়, পাওনাদারদের দেনা শোধ করতে পারে না, নিদারুণ দুঃখের মধ্যে দিন কাটায়, তখন অন্য আর পাঁচটি সাধারণ মানুষের মতো সেও দেবতার কাছে বর প্রার্থনা করে। মহাদেবের বরে মুচকি বড়লোক হলেও তার টাকা পাওয়ার ইচ্ছা অবদমিত হয়নি। সে অনেক টাকা চেয়েছে, রাশি রাশি টাকা। কারখানার

শ্রমিকদের শোষণ করেছে, এক সময় কারখানার শ্রমিকরা তার অন্যায়ের প্রতিবাদে কারখানায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ভোঁদড় এসে সেই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছে এইভাবে-

“চিচিং ফাঁক হয়ে গেছে স্যার। কারখানা জ্বলছে। আমার বউ ভয়ের চোটে ছ’বোতল হুইস্কি শেষ করে ফেলেছে। বেয়ারা, চাকর যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই জাপটে ধরে ‘ডার্লিং’ ‘ডার্লিং’ করে চেষ্টাচ্ছে।”^{২৪৭}

আসন্ন বিপদের কথা শুনে মুচকি কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে মহাদেবকে পুনরায় ডাকে, কিন্তু পায় না। কারখানার শ্রমিকদের ইটের আঘাত থেকে বাঁচার জন্য উল্কি-ভেল্কি পালিয়ে যায়। কর্মচারী ভোঁদড় মুচকির দীর্ঘদিনের অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয়। সে বলে—

“আগে তো আমি লাথি মারেগা, তারপর না হয় তুমি আমায় বরখাস্ত করেগা।”^{২৪৮}

মুচকি একা অসহায় ভাবে চেয়ারে বসে ইটের আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচবার চেষ্টা করে। আমাদের সমাজে এই রকমভাবেই অন্যায়কারির যোগ্য শাস্তির খবর মাঝে মাঝে মেলে। মুচকিরও সেই রকম যোগ্য শাস্তি মিলেছে। যে তাকে বর দিল, সেই শিবের উপর অন্যায়-অত্যাচার করতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ হয়নি। এই রকম স্বার্থলোভী মানুষ আমাদের সমাজে অনেক আছে। ‘মুচকি মঙ্গল কাব্য’ যেন সেইসব ঘটনায় প্রত্যক্ষ জীবনের দলিল। এখানে মহাদেব, নন্দীর মতো স্বর্গীয় চরিত্র থাকলেও নাটকটি আসলে একালের জীবনভাবনার ফসল। এখানে পৌরাণিক মহিমা অতিক্রম করে বড়ো হয়ে উঠেছে বর্তমানের জীবনচেতনা। এইভাবে শিবায়ন কাব্যভাবনার বিনির্মাণ ঘটেছে ‘মুচকি মঙ্গলকাব্য’ নাটকে।

১৫। রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী- আজকের দুর্গতিনাশিনী (২০১০) ;

২০১০ খ্রিষ্টাব্দে রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী শিবায়নের শিব চরিত্র ও পরিবার অবলম্বনে লেখেন ‘আজকের দুর্গতিনাশিনী’ নাটক। নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ‘রঙ্গপট’ নাট্যপত্রিকার সপ্তম সংখ্যায়। ২৪ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১৭ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটির প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (১), চরিত্রলিপি (১), মূল নাটক (১২) সহ মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২। নাটকের চরিত্রলিপিতে উল্লিখিত চরিত্রগুলি হল- মহাদেব, পার্বতী, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অসুর, চিত্র পরিচালক, মাওবাদী নেতা।

‘আজকের দুর্গতিনাশিনী’ নাটকে মহাদেব, পার্বতী, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীকে নিয়ে যে কাহিনি পরিবেশ রচিত হয়েছে, তা মূলত আধুনিক কালের। তারা যেন কেউই দেব-দেবী নয়; একালের মর্ত্যবাসী আধুনিক মানুষ। তবে মহাদেব চরিত্রের নেশাপরায়ণতা, গাঁজা খাওয়ার প্রসঙ্গতে শিবায়নের শিবচরিত্র মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। নাট্যকাহিনির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এসেছে আধুনিক সভ্যতার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা, মাওবাদী প্রসঙ্গ, কিডন্যাপের মতো ঘটনা, পোষাক-আসাকের ফ্যাশান, শপিংমলে কেনাকাটার পরিচয়, সিনেমায় অভিনয়। যেসব ঘটনা নিতান্ত একালের জীবন ভাবনার ফসল, যা পৌরাণিক চেতনার সঙ্গে একেবারে খাপ খায় না। ফলে কৈলাসের শিবের কাহিনি একালের জীবনচেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নাট্যকার শিবায়ন কাব্যভাবনার নবনির্মাণ ঘটিয়েছেন।

‘আজকের দুর্গতিনাশিনী’ নাটকের শুরুতেই আছে স্বর্গে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা। শিব ও তার দলবল পথে নেমেছে স্বর্গে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ত্রিশূল চিহ্নে ভোট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে স্লোগানে। দেবরাজ ইন্দ্রের স্বেরাচার রোখার জন্যই শিব মর্ত্যের নির্বাচন ব্যবস্থা স্বর্গে আনতে চেয়েছে। এদিকে পার্বতীর মুখ বিষণ্ণ দেখে মহাদেব চিন্তিত। তবে পার্বতী মহাদেবের ভোটে দাঁড়ানোকে সমর্থন করে বলে—

“জীবনে তুমি এই প্রথম একটা ভালো কাজ করলে। ইন্দ্রটা সেই আদিকাল থেকে গদি আঁকড়ে বসে আছে। আমার বাপের বাড়ির মানুষের চেয়েও বেহায়া।”^{২৪৯}

পার্বতীর বিষণ্ণতার কারণ স্বর্গে ভোট হলে তার মর্ত্যে যাওয়া হবে না। মহাদেব এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মূলত নিজের ছেলে-মেয়েকে নিয়ে নির্বাচনী প্রচার চালানোর জন্য। শিব পার্বতীকে বলেছে—

“বলেছি, তার কারণ এই প্রথম স্বর্গে সাধারণ নির্বাচন হচ্ছে। তোমরা সবাই মর্ত্যে চলে গেলে, বিশেষ করে কাতু-সরো এখানে না থাকলে আমার নির্বাচনী প্রচার চালাবে কে? তুমি ভাবতে পারবে না পারু-ইয়ে পার্বতী, কী জ্বালামুখী ভাষায় সরো বক্তৃতা রচনা করে। আর কাতু সেগুলো কেমন নাটকীয়ভাবে মঞ্চে মঞ্চে উগরে দেয়। আহা কাতুর কণ্ঠ তো নয়, যেন অমিতাভ বচ্চন।”^{২৫০}

এবার পার্বতী আধুনিককালের ভোটে জেতার অভিনব পথ বলে শিবকে। সেগুলি হল - রিগিং, বুথজাম প্রভৃতি। আধুনিক নেতারা যেভাবে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করে, ঠিক

সেইভাবে পার্বতী শিবকে ভোট জেতার পরামর্শ দেয়। এরপর সরস্বতীর উৎসাহে ও উর্বশীর সহায়তায় আসে আধুনিক সভ্যতার ড্রেসের প্রসঙ্গ। সরস্বতী মাতা পার্বতীকে একটি মিনি স্কার্ট দেয়, অন্যদিকে পিতা মহাদেবকে দেয় একটি সাফারিসুট। পার্বতী এই ধরনের পোষাক পরতে না চাইলে সরস্বতী যুক্তি দিয়ে বলে —

“কেন, আজকাল তো এটাই ফ্যাশন মাম্মি? তোমার পুরোনো স্টাইল বাতিল করো। দেখো এটা পরলে তোমাকে কেমন ইয়ং—হ্যান্ডসাম দেখায়। মর্ত্যে আজকাল কেউ তোমার মতো শাড়িটারি পরে না। সবাই এই সব।”^{২৫১}

কিন্তু মহাদেব সেই সুট পরে খুশি হয়। পুরাতন পোষাক পরিবর্তন করে তিনি আধুনিক হয়ে ওঠার চেষ্টা করেন মহাদেব(বাদ)। পৌরাণিক চরিত্র গণেশ আধুনিক শেয়ার বাজার নিয়ে খুব চিন্তিত। গণেশ পার্বতীকে বলে— “কিন্তু যেভাবে সূচক পড়ে যাচ্ছে, শেয়ার বাজার মন্দা, তার কী হবে?” একসময় মহিষাসুর মায়ের কাছে এসে আবদার জানিয়ে বলে—

“শোনো মা, আমার প্রাণেও সাধ-আহ্বাদ আছে। ওখানে আজকাল কত ভালো ভালো শপিংমল, হিন্দী সিনেমা। কত ভালো ভালো ইয়ে—সে সব না দেখে রাতদিন তোমার পায়ের কাছে দাঁত খিঁচিয়ে পড়ে থাকতে পারব না। একটু এদিক ওদিক তাকালেই কোনো ইয়েকে বলতে শুনি ‘দেখ ভাই অসুরটা কেমন ট্যার’। তাই ঠিক করেছি এ বছর মর্ত্যে যাব না। তোমরা অন্য ব্যবস্থা করো।”^{২৫২}

পার্বতীকে লক্ষ্মী সরস্বতী ‘মাম্মি’ বলে সম্মোধন করে। মার কাছে অনুরোধ জানায় শপিংমলে গিয়ে কেনাকাটার জন্যে। কিন্তু মা পার্বতী তাদেরকে সাবধান করে বলে—

“থাম, মল! এই যে তোরা টো টো করে ঘুরছিস, জানিস মর্ত্যে দিনকাল ভালো নয়, চারিদিকে জঙ্গি ঘুরে বেড়াচ্ছে।”^{২৫৩}

জঙ্গি আক্রমণ একালের জনজীবনে ভয়ঙ্কর সমস্যা। মাতা পার্বতীর এই সতর্কীকরণে যেন একালের সকল মানুষকে সজাঙ্ক থাকার বার্তা দেয়। ইতিমধ্যে খবর এসেছে কার্তিক কিডন্যাপ হয়েছে। মাওবাদী নেতা কার্তিককে লালগড়ে পণবন্দি করে রেখেছে। লালবাজার জেলে বন্দী ছত্রপতি মাইতিকে মুক্তির দাবি জানিয়েছে মাওবাদী নেতা।

তাদের লড়াই পেটি-বুর্জোয়াদের সঙ্গে। তাদের কৌশল সাধারণ মানুষকে আটক করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করা। কার্তিক সেই চক্রান্তের ফাঁদে পরেছে। পার্বতী, সরস্বতী, লক্ষ্মী কার্তিকের মুক্তির চিন্তায় ব্যস্ত। এদিকে মহিষাসুর সিনেমা দেখে ফেরার সময় সম্ভ্রাসবাদী সন্দেহে পুলিশ তাকে লালবাজারে ধরে নিয়ে যায়। সেখানে সরস্বতীর পরিচিত একজন ফিল্ম ডিরেক্টর বিভাস ঘাই তাকে মুক্ত করে। এদিকে মহাদেব ‘ভেটো’ খরচ করে কার্তিককে বাঁচায়। মহাদেবের ‘ভেটো’ আসলে একালের ব্যক্তিগত ক্ষমতার প্রয়োগ বা চ্যানেল, যার দ্বারা অনেক কঠিন কাজও সহজ হয়। এই ক্ষমতা সকলের জন্য নয়, বিশেষ বিশেষ লোকের জন্য। ফিল্ম ডিরেক্টর বিভাস ঘাই সরস্বতীকে অফার দেয় ফিল্মে নায়িকার অভিনয় করার জন্য। ইতিমধ্যে মোবাইল বাজে। সরস্বতী ফোনে লক্ষ্মীকে জানায়—

“বল্ লখা!... কাতু হোটেলে ফিরে এসেছে?... আমি জানতাম... আমি ঠিক আছি। চিন্তা করিসনা... অডিশন দিচ্ছি... জানিস তো, সিনেমায় নামা আমার স্বপ্ন। নানা এখনো কনট্রাক্ট হয়নি, তবে দেখছি কাগজপত্র বের করছে। মনে হয় এবার কনট্রাক্ট হবে।”^{২৫৪}

গণেশ বুনবুনওয়ালা বাড়ি থেকে ঘিয়ের লুচি-মন্ডা খেয়ে বাড়ি ফেরে। রাস্তায় তাকে কুকুর তাড়া করে। মহিষাসুর তাকে রক্ষা করে। গণেশ আর হাতির মুখওয়ালা মুখোশ পরতে চায় না। সে বিরক্ত হয়ে মা পার্বতীকে বলে—

“এই শেষ, আর কিন্তু মুখোশ পরে মর্ত্যে আসতে পারব না! তোমাদের পুরাণকার যা একখানা আজগুবি গল্প তৈরি করে বাজারে ছেড়েছে কী বলব!”^{২৫৫}

নাট্যপরিণতিতে অসুরের অনুপস্থিতিতে মহাদেবকে পার্বতী অসুরের ভূমিকা নিতে বলে। পার্বতী একটু নিচু হয়ে তার বুকে ত্রিশূল বসাবার ভঙ্গি করে; নেপথ্যে চণ্ডীপাঠ শোনা যায়। মহাদেব পার্বতীকে বলে—

“স্বামী যখন হয়েছি তখনতো গির্নাদের হাতে বধ হতেই হবে, তবে আর প্রক্সি বলছ কেন? এটাই তো স্বামীদের আসল ভূমিকা।”^{২৫৬}

নাট্যকার রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর মূল লক্ষ্য ছিল নাটকের মধ্যে শ্রেণীশোষণের অবসান ঘটানো এবং অত্যাচারিতের মুক্তি কামনা। আজকের দুর্গতিনাশিনী পৌরাণিক কালের

দেবী শুধু নয়, একালের এবং ভবিষ্যতের নারী দুর্গা। যার প্রতিবাদ বা অসুর নাশ শুধু বাইরের অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে নয়, পরিবারের অত্যাচারী, নেশাখোর স্বামীর বিরুদ্ধেও। এই দুর্গতি নাশ না হলে আজকের সমাজ প্রকৃত সুন্দর ও সুস্থ হয়ে উঠবে না। এইরকম একটি প্রত্যাশা নিয়েই রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী ‘আজকের দুর্গতিনাশিনী’ নাটকের পৌরাণিক কাহিনিকে বিনির্মাণ করেছেন।

‘আজকের দুর্গতিনাশিনী’ নাটকের সমস্ত চরিত্রগুলিই আধুনিক, একেবারে একালের। মহাদেব, পার্বতী, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অসুর-প্রত্যেকেই পুরাতনের আবরণে আর থাকতে চায় না। নিয়ম-রীতিতে, সাজ-পোষাকে, কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে নিজেদের পরিবর্তন করে একাবারে আধুনিক মানুষ হয়ে উঠতে চেয়েছে। তাই তাদের সংলাপেও ধরা পরেছে কখনো ইংরাজী ভাষা, কখনো হিন্দীভাষা, কখনো একালের কথ্যভাষা। পার্বতী মহাদেবকে নিজের অনশন বজায় রাখার প্রসঙ্গে বলেছে— “কভি নেহি। আমার আমরণ অনশন চলছে-চলবে।” এখানে ‘কভি নেহি’ বাংলা নয়, হিন্দী শব্দ। ঠিক একইভাবে সরস্বতী পার্বতীকে বলে— “এই নাও মাস্মি তোমার ড্রেস। উর্বাশি অ্যান্টি তৈরি করেছে।” এখানে ‘মাস্মি’, ‘ড্রেস’, ‘অ্যান্টি’ প্রভৃতি শব্দগুলি ইংরেজি। তারা যেভাবে ভাষাগুলি ব্যবহার করেছে, তাতে চরিত্রের মূল বক্তব্য ধরা পরেছে। সেকালে এবং একালে যেভাবে সমাজের সাধারণ মানুষ নেশা করে, তার পরিচয় শিবের চরিত্রে মেলে। ভাঙ, গাঁজা, দেশী মদের প্রসঙ্গ এসেছে শিবের কথাতে। শিব ফোন করে বলে—

“হ্যালো? হ্যালো আগে বল্, তুই কেলো? রিসেপশন? আছে বল্-বল্? ড্রিংকস, কী চাই? কী-কী আছে আগে শুনি? শ্যাম্পেন, ভদকা, কনিয়াক, রাম। চলবে না...সিদ্ধি আছে? হবে না? কেন, ওটা বুঝি ড্রিংকস-এর মধ্যে পড়ে না?... পড়ে তবে হবে না।... কোথায় হবে বললি? হোটেলের দরোয়ান রামদেওর ঘরে? ঠিক আছে, আমি ব্যবস্থা করে নেব।... বাই... বাই। (ফোনটা রেখে) আমি একটু ঘুরে আসছি পার্কে।”^{২৫৭}

পার্বতী যখন মহিষাসুরকে খোঁজ করে, তখন গণেশ জানায়- ‘ও তো বাপির জন্য গাঁজা কিনতে বড়বাজার গেছে’। আধুনিক পোষাক পরিধানের জন্য মহাদেব উৎসাহিত। মহাদেব বলেছে- ‘আমি স্টাইল-ফ্যাশন সব বদল করব। যাই চেঞ্জ করে দেখি, কেমন মানায়’। সুন্দরী নারীর সঙ্গে পুরুষের সখ্যতা, সম্পর্ক একালের জীবন ভাবনার একটি

প্রধান দিক। সরস্বতী ও লক্ষ্মী শপিংমলে কেনাকাটা করতে গিয়ে পরিচিত হয় মুম্বাইয়ের চিত্র পরিচালক বিভাস ঘাইয়ের সঙ্গে। এ ব্যাপারে মা পার্বতী যখন তাদের সাবধান করে দেয়, তখন সরস্বতী বলে—

“জোটাতে হয়নি, নিজেই জুটে গেছে মাম্মি। মলে আলাপ হতেই আমাদের দুজনকে ডিনারের অফার। আমি বুদ্ধি করে কাটিয়ে দিয়েছি।”^{২৫৮}

কার্তিকের কিডন্যাপ, লাল গড়ের মাওবাদীদের কথা, রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির প্রসঙ্গ, রবীন্দ্র সঙ্গীতের কথা, সরস্বতীর সিনেমায় নায়িকা হওয়ার স্বপ্নপূরণ— প্রভৃতি বিষয়গুলি নাটকে উত্থাপিত হওয়ায় নাটকটি পরিবেশগত ভাবেও আধুনিক হয়েছে। পুরাতন দেব-দেবী একালের মানুষ হয়ে ওঠায় তাদের স্বর্গীয় ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ফলে শিবায়নের শিব ও তার পরিবার এখানে পুনর্নির্মিত হয়েছে। সেই পুনর্নির্মাণের মধ্যে থেকে উঠে এসেছে বিনির্মিত নাট্য ভাবনা— গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই, সাধারণ মানুষের দুর্গতি নাশের লড়াই। এইভাবে নাট্যকার কাহিনি ও চরিত্রের পুনর্নির্মাণ ও বিনির্মাণ করে আধুনিক নাটকের জন্ম দিয়েছেন।

১৬। মনোজ মিত্র - শিবের অসাধ্য (২০১৫) ;

২০১৫ সালে মনোজ মিত্র লিখেছেন শিবায়ন কাব্যের শিব চরিত্রকেন্দ্রিক নাটক ‘শিবের অসাধ্য’। ১৮ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১২ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটিতে প্রচ্ছদপত্র (১), নাম পত্র (১), উৎসর্গপত্র (১), চরিত্রলিপি (১) মূল নাটক (৬৮) সহ মোট ৭২টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ -

“কলাভূৎ/ মনোজ মিত্র/ শিবের অসাধ্য/ তিনটি পূর্ণাঙ্গ
নাটকের সংকলন”^{২৫৯}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ-

“পালিয়ে বেড়ায়/ ছায়ার প্রসাদ/ শিবের অসাধ্য/ তিনটি
পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংকলন/মনোজ মিত্র/কলাভূৎ
পাবলিশার্স।”^{২৬০}

নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি রচিত হয়েছে নীল, লাল, সাদা, সবুজ রঙের সমন্বয়ে। সেখানে চারটি সমুদ্রের ঢেউয়ের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। নাটকের চরিত্রলিপিতে উল্লিখিত চরিত্রগুলি

হল- শিব, নন্দী, ভৃঙ্গী, গণেশ, কার্তিক, ছিদেম, বংশীবদন, তাঁতি, গোবর্ধন, গাওনা বুড়ো, ভিখারি ছেলে, হাঁদু সিঙ্গি, পুরুত, নায়েব, ইয়াসিন, ঢুলি, হারমোনিয়াম বাদক, দেবী দুর্গা, বাসিনী প্রমুখ। সুরথ বসু, অয়ন ভট্টাচার্য, মানব চন্দ্র ও অজিত করকে নাটকটি উৎসর্গ করা হয়েছে। থিয়েটার ল্যাবার্স গ্রুপের প্রযোজনায় নাটকটি প্রথম অভিনয় হয় ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস-এ। পরে নাটকটি ২০১৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কলাভূৎ পাবলিশার্স-এর পক্ষে ৬৫, সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৯ থেকে নাটকটি প্রকাশিত। নাটকটির মূল্য একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

দুটি অঙ্ক নিয়ে এবং কয়েকটি পরিবর্তনশীল দৃশ্যের সমন্বয়ে ‘শিবের অসাধি’ নাটকটি রচিত। ‘শিবায়ন’ কাব্যের শিব চরিত্র এখানে প্রধান চরিত্ররূপে অঙ্কিত। শিবায়নের ভিক্ষাজীবী শিব মর্ত্যের চাষীদের নেতা। জোতদার শ্রেণির মানুষদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চরিত্ররূপে শিব সাধারণ জেলে-কৃষক শ্রেণির মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে নাট্যকাহিনির সূত্রপাত কৈলাসে, তার সমাপ্তি মর্ত্যলোকের শ্রেণি সংঘাতের মধ্য। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নাটকটি শুরু হয়েছে নন্দী, ভৃঙ্গী, শিব চরিত্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। মর্ত্যে আসার জন্য নন্দী ও ভৃঙ্গী যখন শিবকে অনুরোধ করে, তখন শিব হেসে তাদের বলে-

“ওরে সাজগোজ ছেড়ে ফেল! এবারে তো যাওয়া হবে না রে... তোমাদের মায়ের শরীর খারাপ! হ্যাঁ রে, কাল সারাটা রাত্তির নাকে কাঠি দিয়ে সে হেঁচেছে। কাঠি দেয় আর হাঁচে..শয্যে ছেড়ে ওঠবার জো নেই। (জোরে দুর্গার উদ্দেশ্যে) কেমন আছো গো। (নন্দী ভৃঙ্গীকে) সেই যদি না যায়, আমরা আর কী করতে যাব বল....(দুর্গার উদ্দেশ্যে) ও গিল্লি....।”^{২৬১}

কিন্তু এদিকে শিবকে না জানিয়ে গিল্লী দুর্গা কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীকে নিয়ে মর্ত্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। ভৃঙ্গীর কাছে একথা শুনে শিব হতবাক হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে আসে জোতদার শ্রেণির মানুষের কথা। নন্দী বলে -

“রাগ কোরো না গো! মার কি দাঁড়াবার জো আছে! মর্ত্যে এক অত্যাচারী জোতদার... হ্যাঁগো..। বিষম কাণ্ড করছে, তার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে সেখানে লোকজন কেঁদে ভাসাচ্ছে! তাই না শুনে মা ধনুষ্টংকারের মতো খাড়া!”^{২৬২}

পৌরাণিক কাহিনির মধ্য থেকে ক্রমে ক্রমে উঠে আসে একালের শোষিত সমাজ-ব্যবস্থার বাস্তবরূপ। মর্ত্য কাহিনিতে আসে জোতদারের অত্যাচার এবং বংশীবদন, তাঁতি, গোবর্ধনের মতো সাধারণ মানুষের দুঃখের কথা। সেই রকম একটি নাট্যদৃশ্য -

“গোবর্ধন।। অই..অই বেরুয়ে পড়েছে! শ্যালা চ্যাঁদা আদায়ের পাটি!,

বংশীবদন।। (তোতলা) পু-পু-জোর চ্যাঁদা, না বন্যের সাহায্যি...কে এডা কবে!?! বারো মাসে তেরো পাক্বুন লেগেই রয়েছে, পুজো করবি তো মোদের ঘাড়ে কুড়ুল না মেরে নিজেরা করা,,

গোবর্ধন।। পুজো না ছেরাদ্দ! চ্যাঁদার টাকায় মাল খেয়ে খ্যামটা লাচবে! বাবুর লায়বটারে দ্যাখ, ভাবেরসে গদোগদো...তাঁতি।। হবে না? শালা দশহাতে ঝাড়বে! বস্তা বস্তা ধান চাল, গাঁট গাঁট কাপড়, লাখ টাকার বাজিট!,

গোবর্ধন।। সর্বোস্থ জোগাও। আর এই মহামায়ার আরাধনায় না লাগে কি... খাঁটি মধু থেকে খাঁটি বেশ্যাবাড়ির মাটি!”^{২৬৩}

দরিদ্র মানুষের উপর নায়েব-মহাজনদের অত্যাচার নানা অজুহাতে দিনের পর দিন বেড়ে চলে। দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে চ্যাঁদা আদায়ের পরিমাণ বাড়ে। নায়েব গোবর্ধনকে ষাট কেজি দুধ দিতে বলে। গোবর্ধন নায়েবকে অনুন্য়ের সুরে বলে—

“করচেন কি, এটা মান্তর গাই, এত দুধ ছানা আমি কুথায় পাবো—”^{২৬৪}

প্রত্যুত্তরে নায়েব গোবর্ধনকে বলে—

“পাবি চার ঠ্যাঙের ফাঁকে! ব্যাটা গোয়ালার পো, গরুর দুধ কোথায় পাওয়া যায় তা আমায় বলে দিতে হবে!”^{২৬৫}

এরপর বংশীবদনকে নায়েব বলে—‘বংশীবদন জেলে—মাছ দিতে হবে, পুজোর ক দিন মাছ লাগবে...পাঁঠা লাগবে!’। তখন পুরুতমশায়ের কথায় সেকালের নগ্নবাস্তবরূপ ধরা পরে পুরুতমশাই বলে-

“খচ্চর! পাজির পা ঝাড়া! যা দেবী সর্বভূতেশু... রাশ রাশ মাল তুলবে, সোমবচ্ছর ধরে খাবে... হারামজাদা.... সচন্দন এতে গন্ধপুষ্পে.... আমার বেলা লবডঙ্কা... এতে গন্ধপুষ্পে.... মর শালা!”^{২৬৬}

একালের অসৎ মানুষদের প্রতি শিবের ক্ষোভ চূড়ান্ত, কারণ তারা তাকে নিয়ে ব্যবসা করে ফায়দা লোটে। শিব নন্দী ভূঙ্গীকে বিরক্তির সুরে বলে—

“এই সব অকালকুস্মাণ্ডকে আমি দর্শন দেব! কপাল পুড়েছে আমার! চল চল! যত খাজায় মিলে আমায় নিয়ে ব্যবসা ফেঁদেছে! কলকাতায় তো যাচ্চিস, দেখবি মোড়ে মোড়ে ফুটপাত দখল করে আমার নামে পাথর বসিয়ে ঘণ্টা বাজাচ্ছে! সিনেমা পর্যন্ত করছে আমায় হিরো বানিয়ে!”^{২৬৭}

শিবের দৃষ্টিতে জোতদাররা ত্রেতাযুগের দৈত্য, যারা কলিকালে এসে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে অত্যাচার ও শোষণ করে চলেছে। ঘোড়াডাঙ্গার সেই রকম এক জোতদার হাঁদু সিংহের বিরুদ্ধে শিব প্রতিবাদী করে তোলে ছিদেম, বংশী, তাঁতিদের। এককথায় শিব এইসব চাষা-ভূষো মানুষদের নেতৃত্ব দেয়। তাদের সাহস দিয়ে বলে—

“মিছে কথা! যাব না! ওই বেলতলায় শুয়ে থাকছি। লেগে পড়! আমি যতক্ষণ আছি, কেউ তোদের আঁচড়টি কাটতে পারবে না!”^{২৬৮}

ঘোড়াডাঙ্গার মানুষদের এইরকম বিরুদ্ধাচারণ লক্ষ্য করে নায়েব বলে—

“বিদ্রোহ হচ্ছে! ঘোড়াডাঙ্গায় বিদ্রোহ! কার বাপের ঘাড়ে কটা মাথা, হাঁদুবাবুর লাঠির সামনে দাঁড়ায়! মার মার শালাদের...মেরে কিমা বানিয়ে দে...।”^{২৬৯}

নায়েব সঙ্গে নিয়ে আসে লাঠিয়াল ইয়াসিন কসাইকে। তাকে দিয়ে প্রতিবাদীদের জন্দ করতে চায়। এই ঘটনায় শিব প্রচণ্ড রেগে যায়। এরপর শিব ইয়াসিনকে আঘাত করে। সে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পরে যায়। এই দৃশ্য দেখে শিবের প্রতি ছিদামের বিশ্বাস জাগে। সে বলে—

“তুমি কেডা জানিনে, কেনে বাঁচালে তাও না, শুধু এইডা জানি তুমি মোদের রক্ষেকর্তা....বাপ! ন্যাতা!”^{২৭০}

নায়েব এসে জোতদার হাঁদু সিংকে ঘোড়াডাঙ্গার ঘটনার কথা বলে—

“হাড় হারামজাদা চাষাগুলো..শালার জাত...বেজম্মার জাত...এখন তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে ধেই ধেই নাচছে! ওই শুনুন বাবু, ঘোড়াডাঙ্গার চাষাপাড়ায় ডুগডুগি বাজছে!”^{২৭১}

হাঁদু সিং প্রচণ্ড ক্ষোভের সঙ্গে নায়েবকে হুকুম দেয়—

“ঘোড়াডাঙ্গার বিলে নেতাবাবাজির লাশ ভাসিয়ে দাও! তারপর চাষাগুলোকে আমি দেখব! (সিঁদুর মাখানো খাঁড়া তুলে) মা, মাগো, তোর মোষ নেই, পাঁঠা নেই, আশীর্বাদ কর মা, ওই চাষার নেতার মুণ্ডু নামিয়ে যেন তোর পা রাঙাতে পারি...মা, মাগো!”^{২৭২}

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে শিব সাধারণ চাষী মানুষের কাছে নেতা শিবুবাবু হয়ে উঠে। বংশীবদন শিবকে অনুরোধ করে বলে—

“বড্ড খুশি হয়েছে গো বাবু। গরিব মেয়ের ঘরে দুটো শাক-অন্ন খেতি হবে বাবু।”^{২৭৩}

তাদের সঙ্গে সহমত হয়ে শিব জানিয়েছে—

“বাবু! ওরে ওরে তোরা জানিসনে, তোদের মত ইতরজনের সঙ্গেই তো আমার ওঠবোস! ধন ঐশ্বর্য ভোগবিলাস আমার কিছু নেই! ধুলোয় শুই, ভস্ম মেখে ঘুরি, কাপড়ও পরিনে বড় একটা, শুধু বাঘছাল! ভূতপ্রেত ইতরজনের সঙ্গেই যে আমার পটেরে ছিদেম!”^{২৭৪}

প্রসঙ্গত উঠে আসে মা ঠাকুরণের প্রসঙ্গ, অর্থাৎ শিব পত্নী দুর্গার কথা। তখন শিব জানায়—

“মানুষের উপকার করে বেড়াই...সত্তুমী, অষ্টুমী, নওমী, দশুমী...জোতদার শাসন করে দুজনে গঙ্গায় ঝাঁপ দিই...মানে চানটান করি! আবার পরের বছর!”^{২৭৫}

এইভাবে প্রকাশ পেয়েছে জমিদার, জোতদারদের চক্রান্তে দেশের খাদ্য সংকটের কথা। এদিকে কার্তিক-গণেশ নরাসুর জোতদারকে ধ্বংস করার জন্য ঘোড়াডাঙ্গার মানুষদের সঙ্গে নিয়েছে। দুই ভাই পরামর্শ করেছে—

“শুনছ বড়দা, অবস্থা খুব খারাপ! এম্মুনি একটা লড়াই বাঁধছে! ওদিকে ঘোড়াডাঙ্গার মানুষ...তাঁতি কলু জেলে চাষি...এক হৃদয়বান নেতার নেতৃত্বে তারা জোট বেঁধেছে...এগিয়ে আসছে! এদিকে জোতদার হাঁদুবাবুও অস্ত্র শানাচ্ছে! এই মুহূর্তে সেই জোতদারের প্যাণ্ডেলে চুপ করে বসে থাকা যায় না বড়দা! লোকে বলবে কি

বড়দা! চলো সব বেরিয়ে পড়ি! ওদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে
এই নরাসুর জোতদারটাকে ধ্বংস করি!”^{২৭৬}

কার্তিকের কথায় আধুনিক কালের ইংরেজি ভাষার পরিচয় যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি
তার ভাষায় তৎকালীন মানুষের সমাজ বাস্তবতার পরিচয়টি স্পষ্ট হয়েছে। নাট্যকার
সংলাপ বুনেছেন এইভাবে -

“লক্ষ্মী সরো দুটোই সমান! সরস্বতীটা তো মোস্ট ইনঅ্যাকটিভ!
ওর হাতে পড়ে স্কুল-কলেজগুলো এক-একটা গুঁড়িখানা হয়ে
যাচ্ছে! ছুরি বাগিয়ে ছাত্রগুলো মাস্টার পণ্ডিতের পেট চিরছে!”^{২৭৭}

গণেশের কথাতেও তার পরিচয় মেলে—

“কর কর, যত খুশি ইনসালট করে যা...আমি নট নড়নচড়ন !
হুঁ.হুঁ, অক্যোবেলা হাঁদুবাবু জোড়া মোষ কাটবে—হ, আমি তৈরি
হচ্ছি...”^{২৭৮}

দুর্গা যখন কার্তিকের কাছ থেকে জানতে পারে যে ঘোড়াডাঙ্গার চাষীদের নেতা শিব,
তখন তার বিরক্তির সীমা রইল না। তখন দুর্গা বলতে শুরু করে নিজের পারিবারিক
জীবনের অশান্তির কথা—

“কোনোদিন ফিরে দেখল না কত ধানে কত চাল! শ্মশানে-মশানে
গড়াগড়ি খেয়ে কাটালো, জনমদুখিনী আমি...কতদিক সামলে তবে
নিজের মাহাত্ম্য টিকিয়ে রেখেছি! কি করব, কি করে সামলাব!
বুড়োটা আমায় পাগল করে দিল রে—।”^{২৭৯}

নাট্যপরিণতিতে আমরা দেখতে পাই জোতদার হাঁদু সিংকে শাসন করার জন্য তার
বাড়িতে সদলবলে এসে উপস্থিত হয়েছেন চাষিনেতা শিবুবাবু। ত্রিপাক্ষিকের একটি সভা
বসেছে। শিব জোতদার হাঁদুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে—

“তোমার বাড়ি একশো গরু, পঞ্চাশটা গোলা...শুনলাম গরিবদের
চুষে খাওয়া হয়?”^{২৮০}

জোতদার হাঁদুর হয়ে তার নায়েব উত্তর দেয়—

“বাবুর ডায়াবিটিস, চুষে চিবিয়ে কোনোভাবেই খাওয়ার পারমিশান
নেই! দু’পক্ষের অভিযোগ-অনুযোগ, যুক্তি-তর্ক হওয়ার প হাঁদুসিং,

শিবকে পাঁচশো টাকা দেয় ও একটা মদের বোতল দেয়। ছিদাম যখন নেতা শিবকে বলে—‘কত্না ঘুষ খেলে?’”^{২৮১}

শিব তখন জানায়—

“ঘুষ না রে, ঘুষ না—কালো টাকা তুলে নিচ্ছি!”^{২৮২}

এখানে নাট্যকার শিব চরিত্রের উপর বর্তমান কালের কিছু লোভী নেতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন। শিবুবাবুর এই রকম আচরণ দেখে চাষিরা অবাক হয়। শিব তাদেরকে বোঝায়—

“তোরা বড্ড ঝগড়াটে বাপু! ভালবেসে দিলে, আমি কি না নিয়ে পারি? ওরে ছিদেম, আমি যে আশুতোষ রে! তাছাড়া হাঁদুবাবু তো বেশ লোক! দিব্যি লোক! হাঁদুবাবুর কাছে থাকবি! ভাল হয়ে চলবি... কেমন! ওরে নন্দী, ভূঙ্গী, খাওয়া হল? আয় আয়... শহরে যাই... হাঁদুবাবু, একটা দায়িত্ব দেব! গণতন্ত্র! সেটা কি তন্ত্র জানিনে, কিন্তু রক্ষা করতে হবে! হ্যাঁ, কথা দাও হাঁদুবাবু, গণতন্ত্র বাঁচাবে! ওফ, গণতন্ত্রের জন্য আমার.... বেচারি গণতন্ত্র কী অল্প বয়েসে মরে যাচ্ছে গো—।”^{২৮৩}

শিব কিছুতেই জোতদার হাঁদু সিংকে শাসন করতে পারে না। তার যুক্তির কাছে, কৌশলের কাছে, অর্থের কাছে হার মেনেছে পৌরাণিক কালের শিবও —

“হল না রে ছিদেম, হল না! জোতদারের ব্যাকিং বহুদূর! দেবতাদেরও কজা করেছে! ও ছিদেম জোতদার শিবেরও অসাধি রে...শিবেরও অসাধি!”^{২৮৪}

নিজের অক্ষমতার জন্য শিব অস্থির হয়ে পড়েন, তখন দুর্গা তাকে সাঙ্ঘনা দিয়ে বলেছে—

“মানুষের কাজ মানুষই করবে। মানুষের শত্রুকে মানুষই মারবে। মানুষের বুকে তুমি চৈতন্য জাগিয়েছ, এবার তাদের ভালো মন্দ তারাই বেছে নিক... তাদের পথ তারা খুঁজে নিক। সেটাই হবে সব থেকে সুন্দর, সব থেকে মঙ্গলকর....।”^{২৮৫}

স্ত্রীর কথায় শিব সন্তুষ্টি খুঁজে পায়। ছিদামদের উদ্দেশ্যে শিব বলে—

“লেগে পড়... ও ছিদেম, লেগে পড়! পারবি পারবি... পারলে তোরাই পারবি! কিছু করতে হলে তোদেরই করতে হবে! লেগে পড়! উল্টেপাল্টে দে। আসছে বছর আমরা এসে যেন দেখতে পাই, ও ছিদেম, ভবের অসুর নাশ হয়েছে, তোরা জয়ী হয়েছিস...পৃথিবী সুন্দর হয়েছে, মধুর হয়েছে... আসছে বছর আমরা তোদের ঘরে উঠব...ও ছিদেম, আমরা তোদের ঘরে উঠব....।”^{২৮৬}

নাটকটির বিষয়ে শিব, দুর্গা, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, স্বর্গের কথা থাকলেও মর্ত্যের জোতদার ঘোড়াডাঙ্গার হাঁদু সিংহের অত্যাচার ও শোষণের কথা অনেকটা বড় হয়ে উঠেছে। সেখানে শিবের মতো পৌরাণিক চরিত্র তার অত্যাচার দমন করতে সক্ষম হয়নি। সেই অত্যাচার দমনের জন্য সাধারণ মানুষকেই সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে বলে শিব জানিয়েছে। অর্থাৎ গণজাগরণের চেষ্টায় নাট্যকাহিনির সমাপ্তি। পৌরাণিক ভাবনায় এবং পরিবেশে নাটকটি আগাগোড়া জারিত হলেও নাট্যবিষয়ে বাস্তব জীবনের সংকট প্রধান হয়ে উঠেছে। মনোজ মিত্রের ‘শিবের অসাধ্য’ নাটকটি শিবায়ন কাব্যকাহিনির পুনর্নির্মাণ হয়েছে শ্রেণিসংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নাটক হিসাবে।

আমরা আগেই বলেছি ‘শিবের অসাধ্য’ নাটকের কেন্দ্রীয় ভাবনায় আছে শিব চরিত্র। একালের প্রেক্ষাপটে শিবের ক্ষমতা এই নাটকে বড়ো করে দেখানো হয় নি। ‘শিবায়ন’ কাব্যে শিবের মতো এই নাটকের শিবও পৌরাণিক আভিজাত্য ও ক্ষমতা বঞ্চিত একজন সাধারণ পুরুষ; যে একালের সাধারণ চাষি মানুষের নেতৃত্ব দিয়েছে, হাঁদুসিংহের মতো জোতদার মানুষকে জব্দ করার জন্যে। কিন্তু পরবর্তী সময় সে নিজেই তার কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে সরে পড়ে। সেই ঘুষের টাকা ও মদ তার ন্যায্য পাওনা বলে মনে করেছে। হাঁদু যখন শিবকে ঘুষ দেয়, তখন শিব বলেছে—

“রেওয়াজ? না নিলে লোকে হাসবে? (সুকৌশলে বোতলটা নিয়ে) তবে দাও। কিছু মনে করো না হাঁদুবারু, এক পক্ষের কথা শুনে তোমায় আমি প্রথমে ছকে উঠতে পারিনি।”^{২৮৭}

এখানে শিব চরিত্রটি স্বার্থান্বেষী মানুষের পরিচয় বহন করেছে, যারা পয়সার জন্য যে কোন কাজ করতে পারে। এই নাটকের চরিত্রগুলির ভাষা অতি আধুনিক। যখন

দারোগার সাজে কার্তিক আর কনসটেবলের সাজে গনেশ জোতদার হাঁদুসিং-এর সামনে আসে, তখন হাদু সিং-এর ভাষায় ধরা পরেছে একালের মানুষের ভাষা। সে বলেছে -

“চোপ শালা! বুক ফেঁড়ে দেব! ঘোড়াডাঙায় এসে মানুষ খেপানো হচ্ছে!
তোর মতো অনেক লিডারের ভুঁড়ি ফুটো করেছি। হাঁদু সিংগির থাবা
দ্যাখ... থাবা...”^{২৮৮}

চরিত্রগুলির ভাষা দেশী, ইংরেজী এবং হিন্দী মিশ্রিত বাংলা ভাষা। গণেশের কথায় একালের হিন্দী শব্দ ও বাক্যবন্ধের পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। হাঁদুকে কনসটেবলের সাজে গণেশ বলেছে—

“সমঝ গিয়া হুজৌর! ফটক বন্ধ! হেঁসী! এ শালে লোক হুজুতি পাকাতা
হ্যায়! হেঁসী। (শিবকে দেখিয়ে) ইয়ে শালা পাগা, মারেঙ্গা ডাগা!”^{২৮৯}

এছাড়াও নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইংরেজী শব্দের অতিমাত্রায় ব্যবহার রয়েছে, যা নাটকটিকে আরো বেশী আকর্ষণীয় করেছে। যেমন- সিমপ্যাথি, ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলার, লিডার, হোল ওয়ালর্ডে, ইউ বিলিভ, রিলিফ, থ্রিটাইম, পারচেজড, ফ্যাশন ইত্যাদি শব্দ তার প্রমাণ। শিবায়ন কাব্যকেন্দ্রিক এই নাটকের কাহিনি, চরিত্র, ভাষা নিয়ে নাট্যকার সমাজবাস্তবতার পুনর্নির্মাণ এবং বিনির্মাণ করে আধুনিক নাটক রূপে গড়ে তুলেছেন।

মঙ্গলকাব্যের বিষয় নিয়ে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে শুধু নাটকের পুনর্নির্মাণ বা বিনির্মাণ হয়নি; হয়েছে একাধিক উল্লেখযোগ্য কবিতা, উপন্যাস এবং ছোটগল্পের। এই মঙ্গলকাব্যের প্রতি আধুনিক সাহিত্যিকদের তীব্র আকর্ষণের মূল কারণ মাতৃত্বের প্রতি টান। মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই যে আধুনিক জীবনের মূল শিকর নিহিত আছে, তা একালের সকল গবেষক ও পণ্ডিতেরা একবাক্যে মানেন। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার এবং গবেষক আশুতোষ ভট্টাচার্য একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে বলেছেন যে বাংলার পল্লীর জনসভায় এর উদ্ভব হলেও, এর সৃষ্টি প্রেরণা কোন একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্ম বিশ্বাস থেকে আসেনি। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে বাংলাদেশের লৌকিক ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মমতের যে অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে, মঙ্গলকাব্যগুলি তারই পরিচয় বহন করেছে। বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার আচরণ, সংস্কার, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তির উপর এর প্রতিষ্ঠা। আধুনিক বাংলা কাব্যে এই মঙ্গলকাব্যের ভাবনা গৃহীত হয়েছে সমাদরের সঙ্গে। বিশেষ করে শঙ্খ ঘোষের ‘হেতালের লাঠি’ (১৩৯০), বিষ্ণু দেব ‘এবং লখিন্দর’ (১৯৬৫), অরুণ মিত্রের ‘ও বেহুলা’ (১৯৯১), বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘লখিন্দর’ (১৯৫৩), কৃষ্ণ বসুর ‘চাঁদ বণিকের ডিঙা’ (২০০৯) তার উজ্জ্বল

দৃষ্টান্ত। একইভাবে উপন্যাসের মধ্যেও মঙ্গলকাব্যের ভাবনা উঠে এসেছে একালের উপন্যাসিকদের কলমে। মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন ‘ব্যাধ খণ্ড’ (১৯৯৪), অমিয়ভূষণ মজুমদার লিখেছেন ‘চাঁদবেনে’(১৯৯৩), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘অমাবশ্যার গান’(১৯৮১)-এর মতো উপন্যাস। ছোটোগল্পের ভাবনাতেও মঙ্গলকাব্যের বিষয় এসেছে আধুনিক পুনর্নির্মাণ ও বিনির্মাণের রূপ ধরে। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘সতত বেহুলা’ (১৯৮১), মহাশ্বেতা দেবীর ‘বেহুলা’ (১৯৭৮), বিমল করের ‘বেহুলা’ (১৩৯২) ইত্যাদি গল্পে মঙ্গলকাব্যের সেই চেতনার পরিচয়টি বারংবার উঠে এসেছে। এইভাবে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, শিবায়ন কাব্যবিষয় ও চরিত্রভাবনা নিয়ে আধুনিক সাহিত্যিকরা পুরাতন সাহিত্যের পুনর্নির্মাণ ও বিনির্মাণ করে চলেছেন। আধুনিক পাঠকের বা দর্শকের দরবারে এই ধরনের সাহিত্যের আকর্ষণ উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। সেই ভাবনা থেকেই আমরা বক্ষমাণ অধ্যায়ে বিশেষভাবে নাট্য পুনর্নির্মাণের ও বিনির্মাণের বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

প্রসঙ্গনির্দেশ ও মন্তব্য : —

- ১। মীর মশাররফ হোসেনের, বেহুলা গীতাভিনয়, ঢাকা প্রেস, ১৮৮৯, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ২০, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৮৮।
- ২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৭৭।
- ৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৮৩।
- ৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৮৬।
- ৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৯৪।
- ৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৯৭।
- ৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২১৬।
- ৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৫২।
- ৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৫৩।
- ১০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৬২।

- ১১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৫৩।
- ১২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৬২।
- ১৩। অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়, সওদাগরের নৌকা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৯, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-২১, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৮৯।
- ১৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ২২, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৯০।
- ১৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ভূমিকার নিবেদন অংশ।
- ১৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩৯।
- ১৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৫।
- ১৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৭।
- ১৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৯।
- ২০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৫।
- ২১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬৬।
- ২২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৪।
- ২৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৮।
- ২৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৮।
- ২৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৯।
- ২৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৮০।
- ২৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৯৪।
- ২৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৯৪।
- ২৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৭।
- ৩০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৮০।
- ৩১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬৪।
- ৩২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৯৪।

- ৩৩। শম্ভু মিত্র, চাঁদ বণিকের পালা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৬, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৯১।
- ৩৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ২৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৯২।
- ৩৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - আমার প্রতিবেদন অংশ।
- ৩৬। অপূর্ব দে, চাঁদ বণিকের পালা, আধুনিক উপাখ্যান, ভূমিকা অংশ।
- ৩৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা -ভূমিকা।
- ৩৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৪।
- ৩৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১২১।
- ৪০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১২১।
- ৪১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১২৬।
- ৪২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১২৮।
- ৪৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৯।
- ৪৪। শেখর দেবরায়, মনসা কথা, শিলচর কালচারেল ইউনিট, ২০০২, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-২৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৯৩।
- ৪৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ২৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৯৪।
- ৪৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - উৎসর্গ পত্র, বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ২৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৯৫।
- ৪৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - মুখবন্ধ অংশ।
- ৪৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - মুখবন্ধ অংশ।
- ৪৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - যাঁরা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন অংশ।
- ৫০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা -আমার কথা অংশ।

- ৫১। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - মঞ্চ নির্মাণ অংশ।
- ৫২। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১।
- ৫৩। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪।
- ৫৪। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭।
- ৫৫। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১০।
- ৫৬। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৩।
- ৫৭। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৪।
- ৫৮। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৭।
- ৫৯। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২০।
- ৬০। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৭।
- ৬১। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩৩।
- ৬২। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩৮।
- ৬৩। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩৯।
- ৬৪। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৩।
- ৬৫। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৪।
- ৬৬। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৩।
- ৬৭। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩৯।
- ৬৮। উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, মনসামঙ্গল, ধানসিড়ি, ২০১৮, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত
বিবরণসহ ফটোকপি দৃষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-২৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৯৬।
- ৬৯। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্র, বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দৃষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট,
চিত্র সংখ্যা- ২৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৯৭।
- ৭০। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - চরিত্রলিপি অংশ।
- ৭১। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - উৎসর্গপত্র অংশ।
- ৭২। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ভূমিকা অংশ।

- ৭৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১০৯।
- ৭৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১১০।
- ৭৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১১২।
- ৭৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১১৫।
- ৭৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১১৬।
- ৭৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১১৯।
- ৭৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৩১।
- ৮০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৩৬।
- ৮১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৪৯।
- ৮২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৫২।
- ৮৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৫৩।
- ৮৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৫৭।
- ৮৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৫৮।
- ৮৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৫৯।
- ৮৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১১১।
- ৮৮। দেবেশ ঠাকুর, বেহুলা, লালমাটি, ২০১৮, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ
ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ৩০, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৯৮।
- ৮৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্র, বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ
পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ৩১, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৯৯।
- ৯০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১০০।
- ৯১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১০৬।
- ৯২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১০৮।
- ৯৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১০৮।
- ৯৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১০০।

- ৯৫। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১০৯।
- ৯৬। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১১০।
- ৯৭। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১০০।
- ৯৮। অতুলকৃষ্ণ মিত্র, মা, এ্যাট দি নিউ ক্যালকাটা প্রেস, ১৮৯৫, প্রচ্ছদপত্রের
বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দৃষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৩২, পৃষ্ঠা সংখ্যা-
৫০০।
- ৯৯। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৩।
- ১০০। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ফুল্লরা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, ১৯২৮,
প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দৃষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৩৩,
পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৫০১।
- ১০১। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিতগ্রন্থ, চরিত্রলিপি বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দৃষ্টব্যঃ
পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৩৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৫০২।
- ১০২। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - উৎসর্গ পত্র।
- ১০৩। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - নিবেদন অংশ।
- ১০৪। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩।
- ১০৫। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৩।
- ১০৬। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২১।
- ১০৭। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৬।
- ১০৮। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা -৩২।
- ১০৯। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩৪।
- ১১০। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা -৫৮।
- ১১১। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৯।
- ১১২। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭২।
- ১১৩। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৫।
- ১১৪। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১০৪।

- ১১৫। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১২৪।
- ১১৬। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১২৫।
- ১১৭। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১২৫।
- ১১৮। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১২৬।
- ১১৯। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১২৬।
- ১২০। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১২৯।
- ১২১। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৯৮।
- ১২২। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১১।
- ১২৩। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১১৩।
- ১২৪। শিশিরকুমার দাশ, ভাঁড়ু দত্ত, বহুরূপী (সংখ্যা - ৪৮), কলকাতা, ১৯৭৭, প্রচ্ছদপত্র অংশ।
- ১২৫। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - নামপত্র অংশ।
- ১২৬। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪১।
- ১২৭। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪১।
- ১২৮। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৪।
- ১২৯। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৬।
- ১৩০। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৭।
- ১৩১। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৮।
- ১৩২। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৩।
- ১৩৩। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৩।
- ১৩৪। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৮।
- ১৩৫। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬৩।
- ১৩৬। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬৪।
- ১৩৭। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৬।

- ১৩৮। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৮১।
- ১৩৯। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৮২।
- ১৪০। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫১।
- ১৪১। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৬।
- ১৪২। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৯।
- ১৪৩। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬১।
- ১৪৪। রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, ফুল্লকেতুর পালা, বহুরূপী, ১৯৯৪, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত
বিবরণসহ দৃষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৩৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫০৩।
- ১৪৫। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্র ও চরিত্রলিপির বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি
দৃষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৩৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৫০৪।
- ১৪৬। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - সম্পাদকীয় অংশ।
- ১৪৭। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - চরিত্রলিপি অংশ।
- ১৪৮। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১০।
- ১৪৯। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১০।
- ১৫০। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১২।
- ১৫১। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৩।
- ১৫২। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৩।
- ১৫৩। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৩।
- ১৫৪। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৪।
- ১৫৫। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৮।
- ১৫৬। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৮।
- ১৫৭। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৯।
- ১৫৮। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৬।
- ১৫৯। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৭।

- ১৬০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩২।
- ১৬১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩৩।
- ১৬২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৩।
- ১৬৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৩।
- ১৬৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৫।
- ১৬৫। উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়, ধর্মমঙ্গল, লালমাটি, ২০২০, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ৩৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৫০৫।
- ১৬৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৩৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫০৬।
- ১৬৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ভূমিকা অংশ, -৭।
- ১৬৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, চরিত্রলিপির বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৩৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫০৭।
- ১৬৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৪।
- ১৭০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৫।
- ১৭১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৫।
- ১৭২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৬।
- ১৭৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২০-২১।
- ১৭৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৩।
- ১৭৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৮-২৯।
- ১৭৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩১।
- ১৭৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩২।
- ১৭৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩৫।
- ১৭৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩৮।
- ১৮০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩৯।
- ১৮১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৪।

- ১৮২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৫।
- ১৮৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫০।
- ১৮৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫১।
- ১৮৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৩।
- ১৮৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৫।
- ১৮৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৬।
- ১৮৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬০।
- ১৮৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪১।
- ১৯০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪২।
- ১৯১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩২।
- ১৯২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬০।
- ১৯৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৫।
- ১৯৪। ভুপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাসুন্দর, ১৯১৩, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৪০, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫০৮।
- ১৯৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ৪১, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫০৯।
- ১৯৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - মুখবন্ধ অংশ।
- ১৯৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা -ভূমিকা অংশ।
- ১৯৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - অবতরনিকা অংশ।
- ১৯৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭।
- ২০০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩১।
- ২০১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬।
- ২০২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৭।
- ২০৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭০।

- ২০৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭০।
- ২০৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৮৬।
- ২০৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬।
- ২০৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১০৩।
- ২০৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৪১।
- ২০৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৭০।
- ২১০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৮০।
- ২১১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৮০।
- ২১২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৮১।
- ২১৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৯০।
- ২১৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৭৪।
- ২১৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২১৫।
- ২১৬। নিখিল চট্টোপাধ্যায়, অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা, কলাভূৎ পাবলিশার্স, ২০১৬,
প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৪২, পৃষ্ঠা
সংখ্যা- ৫১০।
- ২১৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ
পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ৪৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫১১।
- ২১৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১১৮।
- ২১৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১২০।
- ২২০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ১২০।
- ২২১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১২৩।
- ২২২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১২৪।
- ২২৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১২৬।
- ২২৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৩৫।
- ২২৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৩৭।

- ২২৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৩৭।
- ২২৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৩৫।
- ২২৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১১৮।
- ২২৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৩৬।
- ২৩০। রাধারমণ ঘোষ, মুচুকি মঙ্গল কাব্য, কলাভূৎ পাবলিশার্স, ২০১০, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৪৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫১২।
- ২৩১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৪৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫১৩।
- ২৩২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - উৎসর্গপত্র অংশ।
- ২৩৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৭।
- ২৩৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৮।
- ২৩৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৯।
- ২৩৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৯।
- ২৩৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৮০।
- ২৩৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৮০।
- ২৩৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৮৫।
- ২৪০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৯০।
- ২৪১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৯৩।
- ২৪২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৯৫।
- ২৪৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৯৬।
- ২৪৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৯৬।
- ২৪৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৯৬।
- ২৪৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৯৬।
- ২৪৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৯৮।

- ২৪৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৯৬।
- ২৪৯। রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, আজকের দুর্গতিনাশিনী, রঙ্গপট, সপ্তম সংখ্যা, ২০১০, পৃষ্ঠা- ২৫৭।
- ২৫০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৫৮।
- ২৫১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৫৯।
- ২৫২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৬০।
- ২৫৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৬১।
- ২৫৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৬৬।
- ২৫৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৬৮।
- ২৫৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৬৮।
- ২৫৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৬২।
- ২৫৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৬২।
- ২৫৯। মনোজ মিত্র, শিবের অসাধ্য, কলাভূৎ পাবলিশার্স, ২০১৫, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৪৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৫১৪।
- ২৬০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ৪৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫১৫।
- ২৬১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৩৪।
- ২৬২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৩৭।
- ২৬৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৩৮।
- ২৬৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৪১।
- ২৬৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৪১।
- ২৬৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ১৪২।
- ২৬৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ১৪৬।
- ২৬৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৫৩।

- २४७

পঞ্চম অধ্যায়

অনুবাদ সাহিত্যের বিষয় অবলম্বনে রচিত নাটক: অন্বেষণ ও তার বিশ্লেষণ

১২০২ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি আক্রমণের ফলে আমাদের দেশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাসকদের অধীনস্থ হলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে ধর্ম এবং ভাষাগত ব্যবধান তৈরি হয়। শাসকের ধর্ম ইসলাম, আর তাদের ভাষা হল উর্দু, ফার্সী, আরবী, যা প্রজার ধর্ম হিন্দু এবং ভাষা বাংলার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয় থেকে যে মাৎস্যন্যায়ের জন্ম হয় তা প্রায় দেড়শ থেকে দু'শ বছর বাংলার সাহিত্যকে বন্ধা করে রেখেছিল বলে পণ্ডিতদের অভিমত। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার ফলে যখন ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাসকগণ সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেন, তখন প্রজার মঙ্গল কামনায়, প্রজার ধর্মের প্রতি সহানুভূতির নৈতিক প্রেরণায়, এমনকি প্রজারা যাতে নিজের ধর্ম সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন, সেই সদিচ্ছায় তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় জন্ম নেয় অনুবাদ সাহিত্য। বিশুদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য থেকে প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় লেখা হয় রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত। এইসব অনুবাদ রচনায় বাঙালি শুধু সাহিত্যই পেল না, পেল চিরকালীন জীবন সম্পদ। মধ্যযুগের অনূদিত এই সকল কাব্য অবলম্বনে আধুনিক নাট্যকারেরা লিখলেন একাধিক নাটক। রামায়ণের কাহিনি অবলম্বনে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন 'সীতা' (১৯২৪); মনোজ মিত্র লিখেছেন 'পুঁটিরামায়ণ'(১৯৯০) এবং 'ভেলায় ভাসে সীতা' (২০০৮); সুকুমার রায় লিখেছেন 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'(২০০৯); মানিক মণ্ডল লিখেছেন 'রাম-রাবণের যুদ্ধ' (২০১২) প্রভৃতি নাটক। ঠিক একইভাবে মহাভারতের কাহিনি ও চরিত্র নিয়ে দ্বন্দ্বমুখর জনপ্রিয় নাটক লিখেছেন আধুনিক কালের প্রধান-অপ্রধান অনেক নাট্যকার। মধুসূদন দত্ত লিখেছেন 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন নাট্যকাব্য 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯০০); বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' (১৯৬৬); অনুপ চক্রবর্তী লিখেছেন 'দ্রৌপদী ডট কম' (১৯৮৭); মনোজ মিত্র লিখেছেন 'যা নেই ভারতে' (২০০৫) সৌমিত্র বসু লিখেছেন 'একলব্য' (২০০৯); অক্ষুর মজুমদার লিখেছেন 'উলটপুরাণ' (২০০৯); বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'আর এক দ্রোণাচার্য' (২০১০); মহুয়া চৌধুরী লিখেছেন 'পঞ্চকন্যার কথা' (২০১৯); রতন কুমার ঘোষ লিখেছেন 'শিখন্ডী'(২০১৯) প্রভৃতি নাটক। তেমনি ভাগবতের কাহিনি অবলম্বনে মন্থর রায় লিখেছেন 'কারাগার' (১৯৩০); মহুয়া চৌধুরী লিখেছেন 'আত্মজ' (২০১৯) এবং 'দুর্গার পাঁচালী' (২০১৯) প্রভৃতি নাটক।

এই সমস্ত নাটকে অনুবাদ সাহিত্যের বিষয়টি আজও জীবন্ত হয়ে আছে। গবেষণা অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা অনুবাদসাহিত্য নিয়ে রচিত এই জাতীয় নাট্য পুনর্নির্মাণের অনুসন্ধান ও আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এই অধ্যায়টিকে নিম্নলিখিত তিনটি উপাধ্যায়ে ভাগ করে নিয়েছি।

ক) রামায়ণের কাহিনি অবলম্বনে রচিত নাটক;

- ১) যোগেশচন্দ্র চৌধুরী - 'সীতা' (১৯২৪)
- ২) মনোজ মিত্র - 'পুঁটিরামায়ণ' (১৯৯০)
- ৩) মনোজ মিত্র - 'ভেলায় ভাসে সীতা' (২০০৮)
- ৪) সুকুমার রায় - 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' (২০০৯)
- ৫) মানিক মণ্ডল - 'রাম রাবণের যুদ্ধ' (২০১২)

খ) মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে রচিত নাটক;

- ১) মধুসূদন দত্ত - 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯)
- ২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২)
- ৩) বুদ্ধদেব বসু -- 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' (১৯৬৬)
- ৪) অনুপ চক্রবর্তী - 'দ্রৌপদী ডট কম' (১৯৮৭)
- ৫) মনোজ মিত্র - 'যা নেই ভারতে' (২০০৫)
- ৬) সৌমিত্র বসু - 'একলব্য' (২০০৯)
- ৭) অক্ষুর মজুমদার - 'উলটপুরাণ' (২০০৯)
- ৮) বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় - 'আর এক দ্রোণাচার্য' (২০১০)
- ৯) মহুয়া চৌধুরী - 'পঞ্চকন্যার কথা' (২০১৯)
- ১০) রতন কুমার ঘোষ - 'শিখন্ডী' (২০১৯)

গ) ভাগবতের কাহিনি অবলম্বনে রচিত নাটক;

- ১) মন্মথ রায় - 'কারাগার' (১৯৩০)
- ২) মহুয়া চৌধুরী - 'আত্মজ' (২০১৯)
- ৩) মহুয়া চৌধুরী - 'দুর্গার পাঁচালী' (২০১৯)

তিনটি উপাধ্যায়ে আমরা প্রতিনিধিত্বানীয় এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচিত কয়েকটি নাটকের বিচার-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। সাম্প্রতিকালে প্রকাশিত অর্চিত নাটকের অনুসন্ধান ও তার বিশ্লেষণ আমাদের আগ্রহের বিষয় হয়েছে। যথাসম্ভব দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে অনুবাদ সাহিত্যের নাট্য পুনর্নির্মাণ বিষয়টিকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি আমরা।

ক) রামায়ণের কাহিনি অবলম্বনে রচিত নাটক :-

আমরা আগেই স্বীকার করেছি চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্যের কাহিনি নিয়ে যেমন নাটক লেখা হয়েছে, তেমনি রামায়ণের কাহিনি নিয়েও একাধিক নাট্যকার নাটক রচনা করেছেন। বক্ষ্যমাণ উপাধ্যায়ে আমরা তারই রূপরেখা অঙ্কন করার চেষ্টা করেছি।

১. যোগেশচন্দ্র চৌধুরী- সীতা (১৯২৪);

নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর রামায়ণের কাহিনি অবলম্বন করে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে ‘সীতা’ নাটকটি রচনা করেন। ২১.৫ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১৩ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটিতে প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (২), উৎসর্গপত্র (১), ভূমিকা (১) নিবেদন অংশ (১), চরিত্র পরিচিতি(১), মূল নাটক (১১৩) সহ মোট ১২০টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ -

“সীতা/ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী”^১

নাটকটির নামপত্র এইরূপ -

“যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর/ সীতা/ সম্পাদনা অলোক রায়/ দে’জ
পাবলিশিং।। / কলকাতা- ৭০০ ০৭৩”^২

নাটকটি প্রকাশিত দে’জ পাবলিশিং, ১৩, বক্সিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩ থেকে। নাট্যগ্রন্থটির মূল্য পঞ্চাশ টাকা। ‘গ্রন্থকারের নিবেদন’ অংশে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী জানিয়েছেন-

“আদি কবি বাণ্মীকি থেকে আরম্ভ করে ভারতবর্ষের সমস্ত পুরাতন ও আধুনিক বড় কবি সীতা সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু লিখেছেন। আমার প্রথম নাটক আমি যে ভারতের এই চিরন্তন পুণ্যকাহিনী অবলম্বন করে লিখবার সুযোগ পেয়েছি, সেজন্য আমি নিজেকে বড়ই সৌভাগ্যবান বলে মনে করি। তথাপি সত্যের খাতিরে বলতে গেলে বলতে হয় যে, আমার অন্তরের কোনও প্রেরণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমি এ নাটক লিখতে অগ্রসর হইনি, বাইরের প্রয়োজন আমাকে লিখতে বাধ্য করেছে। কিন্তু লিখতে আরম্ভ করে আমি “রামসীতাবিরহের নির্ঝরিত ধারা” আমার প্রাণের ভিতর অনুভব করেছি এবং বাইরে তার রূপ ফুটিয়ে তুলবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। কৃতকার্য হয়েছি কি না, জানিনে।”^৩

স্বর্গীয় দিদি কিরণশর্মা দেবীকে নাটকটি উৎসর্গ করেছেন নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী।
উৎসর্গপত্রে তিনি বলেছেন -

“দিদি, ছেলেবেলায় একটা মস্ত বড় নাট্যকার হবার ঝোঁকে পড়ে যখন নাটকের পর নাটক লিখেছি, তখন তুমিই ছিলে আমার সে সকল লেখার একমাত্র সমজদার। আমার সমস্ত রচনা তুমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে ও সেগুলি উপভোগ করতে এবং প্রয়োজন মত যথেষ্ট উৎসাহ দিতে। তোমার বড় ইচ্ছা ছিল, সাধারণ রঙ্গালয়ে আমার কোনও নাটকের অভিনয় দেখা। আজ সত্যিই আমার নাটক অভিনয় হচ্ছে। প্রথম যৌবনের সে আনন্দ উদ্যম আজ আর নেই,-একটা কিছু হতে হবে, এই রকম সঙ্কল্প প্রাণে আর বড় একটা সাড়া আনে না। জীবনের এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি, যেখান থেকে অতীতকেই মনোরম বলে মনে হয়, ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল দেখায় না। বর্তমান মানের সমস্ত কোলাহল অতিক্রম করে আজ কেবল তোমার কথাই ভাবছি। জানিনা তুমি কোথায়- আমার বর্তমান সুখ-দুঃখের তরঙ্গাঘাতে তোমার হৃদয় স্পন্দিত হয়ে ওঠে কিনা! আমি সংশয়ী- তবু যেন মনে হয়, হয়তো কোন্ কল্পলোক থেকে তুমি আমাদের দেখতে পাচ্ছ! সেই বিশ্বাসে- জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহীয়সী নারীর জীবনকথা নিয়ে গাঁথা, আমার এই প্রথম প্রকাশিত নাটকখানি তোমাকেই উৎসর্গ করলাম। তোমার স্নেহের ছোট ভাই যোগেশ।”^৪

নাটকে উল্লেখিত পুরুষ চরিত্রগুলি হল- রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, বৈশিষ্ঠ, বাল্মীকি, লব, কুশ, শম্বুক (তপচারী শূদ্র), অষ্টাবক্র, কণ্ঠুকী, দুর্মুখ, বন্দি, বৈতালিক, মন্ত্রী, সচিব, শূদ্র-ঋত্বিকগণ, মুনিগণ, দেবর্ষিগণ, ক্ষত্রিয়-রাজগণ, জনৈক ব্রাহ্মণ, প্রতিহারীগণ, অনুচর, প্রহরীগণ, কয়েকজন লোক, অশ্বরক্ষকদ্বয়, সৈনিকগণ, রাজ্যের নায়কগণ, রাজদূত প্রমুখ। নারী চরিত্রগুলি হল- কৌশল্যা, সীতা, উর্মিলা, আদ্রেয়ী, তুঙ্গভদ্রা (শম্বুকের স্ত্রী), বনলক্ষ্মীগণ, অরণ্যকুমারীগণ প্রমুখ। নাটকটি প্রথমবার অভিনয় হয় শিশিরকুমার ভাদুরীর নাট্যমন্দিরে।

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর ‘সীতা’ নাটকের কাহিনি রামায়ণকেন্দ্রিক। তবে এখানে রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার করে দেখানো হয়নি। এই নাটকে রাজকর্তব্য এবং ব্যক্তি-প্রেমের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত আধুনিক মানুষের প্রতীক হিসাবে রামচন্দ্রের চরিত্রটি অঙ্কিত

হয়েছে। নাটকের শুরুতে রামচন্দ্র যখন দুর্মুখের কাছ থেকে শুনতে পান সীতার কলঙ্কের কথা, তখন তাঁকে তিনি পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। গর্ভবতী সীতাকে বনবাসে পাঠানোর কথা শুনে ভরত রামচন্দ্রের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছেন। রামচন্দ্রকে ভরত বলেছেন-

‘অসম্ভব হেন কার্য্য কভু আমি হইতে দিব না। গর্ভবতী সাধবী সতী পতিমাত্র ধ্যান- নিম্নোঘ আকাশসমা পবিত্রা রমণী তারে দিয়া বনবাস সত্যরক্ষা করিতে যদ্যপি হয়- সে সত্যে ধিক্কার দিই আমি ! তার চেয়ে মিথ্যা মোর হৃদয়ভূষণ !’^৫

সীতাকে পরিত্যাগ করতে হবে নিশ্চিতভাবে, একথা ভেবে রামচন্দ্রের হৃদয় বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। মাতা কৌশল্যাকে এই প্রসঙ্গে রামচন্দ্র ব্যাকুলভাবে বলেছেন -

“তুমিও জননী বাহিরের কার্য্য শুধু করিবে বিচার- দেখিবে না অন্তর আমার? নিজ হস্তে চিতা রচি আপন জীবন আমি বিসর্জন দিতে চলিয়াছি, এ কথা কি তোমাকেও বুঝাইতে হবে? “সীতানির্ব্বাসন” তুমিও বলিবে মাতা “নারীনির্য্যাতন”? তবে দুঃখ জানাব কাহায়? কস্মিন্নাকান্ত দিবসান্তে নিভৃত নিশীথে কার পায়ে মাথা রাখি, জীবনের অভিশাপ বহন করিব?”^৬

পত্নীকে রক্ষা করতে না পারার অক্ষমতা রামচন্দ্রের হৃদয়ে শূন্যতা তৈরি করেছে। সীতা স্বামীর এই কঠোর সিদ্ধান্তে আঘাত পেয়েছেন। কিন্তু নিয়তির বিধান বলে মেনে নিয়েছেন। একনিষ্ঠ পত্নীর মতো কোনো প্রতিবাদ না করে অন্যায়কে মাথা পেতে নিয়েছেন। সীতা স্বামী রামচন্দ্রের এই কঠোর সিদ্ধান্ত এবং সত্য রক্ষার প্রসঙ্গে বলেছেন-

“নাথ, বুঝিলাম সব। কালচক্র নিয়ত ঘুরছে- সেই চক্রে নিপতিত আমি! তোমার কিছু দোষ নাই। আমি কি জানিনে নাথ! কত তুমি ভালোবাস দাসীরে তোমার? আমি সহধর্ম্মিণী তোমার- ধর্ম্মকার্য্যে সত্যের পালনে, কভু বাধা নাহি হব।”^৭

পত্নীকে রক্ষা করতে না পারার অক্ষমতা রামচন্দ্রকে একালের ট্রাজিক হিরোতে পরিণত করেছে। নাট্যমধ্যে একমাত্র শুদ্ররাজ প্রত্যক্ষভাবে রামচন্দ্রের ভুল পদক্ষেপের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। শুদ্ররাজ শম্বুক রামচন্দ্রকে বলেছেন-

”রাজদণ্ডে মরিতে বসেছি- তবু রাম, হাসি পায় শুনিয়া তোমার কথা! দোষী নিজে জানিল না কিবা অভিযোগ, বিচার হইয়া গেল তবু! এ তো বড় অদ্ভুত বিচার! দুঃখ হয়, তোমার এ অধঃপাত নেহারি নয়নে- হে রাঘব! যৌবনের সে প্রতিভা এমনই কি নষ্ট হয়ে গেছে!... কিছু তার নাই? যে সতীর তেজে ছিলে তেজস্বী রাঘব , সেই সীতাহারা হয়ে এ দুর্দশা তব!”^৮

নাটকের তৃতীয় অঙ্কে এসে রামচন্দ্র আরো কঠোর সত্য আঘাতের সম্মুখীন হয়েছেন। সীতার দুই সন্তান লব ও কুশ একসময় রামের সাক্ষাৎ পেয়েছে এবং জানতে পেরেছে রামচন্দ্রই তাদের পিতা। রামচন্দ্র যখন লবকে নিজের কোলে নেওয়ার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করেন, তখন লব প্রতিবাদ করে বলে-

‘না-না- না-না- না, নহি আমি রাজপুত্র। তুমি করিয়াছ ভিখারী আশ্রয়,... জনমের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষাপাত্র করে দেছ তুলি ! মা-মা, কোথা তুমি জননী আমার !’^৯

রামচন্দ্র যখন তাদের অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান, তখন লব ক্ষোভের সঙ্গে বলেছে-

‘অযোধ্যার রাজধানী, রাজা, প্রজা, রাজপুরবাসী করিয়াছে অপমান জননীকে মোর। অভিশপ্ত সে রাজধানীতে জননী আমার কঁদু করিবে না পদার্পণ। ধনগর্বে গর্বিত নগরী, নহি জানে নারীর সম্মান- শিথিয়াছে সুবর্ণের পূজা!’^{১০}

কিছুতেই যখন লব-কুশের ক্ষোভ প্রশমিত হয় না, তখন তাদেরকে শান্ত করার ভার নেয় স্বয়ং সীতাদেবী। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে দুই পুত্রকে বুঝিয়ে বলেছেন-

“ডাকিছেন রঘুনাথ, পিতা করেছেন বাক্যদান, লক্ষ্মণ এনেছে রথ, কেমনে রহিব স্থির এ কাননে আর? চল্ কুশী-লব! অভিমান দূর কর লব, দেখ আমি ত্যজিয়াছি সর্ব অভিমান, ডাকিছেন রাম - অবোধ বালক, আর কিরে অভিমান সাজে !”^{১১}

এরপর সীতা, লব ও কুশ অযোধ্যায় ফিরে আসেন রামচন্দ্রের সঙ্গে। নাট্য পরিণতিতে সীতার পাতাল প্রবেশ ঘটে। সমস্ত ঘটনার মধ্যেই একটি বেদনার সুর ধ্বনিত হয়েছে। একদিকে পত্নী বিচ্ছেদে রামচন্দ্র যেমন দুঃখ প্রকাশ করেছেন, অন্যদিকে সীতাদেবীও

তেমনি দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে বেদনায়পূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠেছেন। নাট্য পরিণতিতে আমরা দেখি সীতার জন্য যখন রামচন্দ্র দুঃখ করছেন, তখন বাল্মীকি তাঁকে সাঙ্ঘনা দিয়ে বলেছেন -

“রাম, প্রিয়তম সন্তান আমার, আপন হৃদয় মাঝে জানকীরে কর
অশ্বেষণ। বাল্মীকির রামসীতা চির-অবিচ্ছেদ।”^{১২}

এইভাবে নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ‘সীতা’ নাটকে সীতা চরিত্রটিকে পত্নী ও মাতা রূপে অঙ্কন করে একালের নারীবাদী ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। নাটকের প্রতিটি সংলাপে রয়েছে বাঙালিয়ানার পরিচয়। প্রকৃত সন্তান বাৎসল্যের রূপটি রামচন্দ্রের সংলাপে ব্যক্ত হয়েছে -

“এখন আমারে প্রভু, সত্য পথ দাও দেখাইয়া! রাজধর্ম ডুবুক অতল
জলে- হৃদয়ের ধর্ম সনে যদি তার না হয় মিলন। হৃদয়ের উপবাস-
আর আমি সহিতে না পারি। তব আগমনে দেব, সত্য পথ পেয়েছি
দেখিতে- সহজ, সরল- নহে আর সমস্যার জাল দিয়ে ঘেরা। প্রভু, এ
দৃঢ় সঙ্কল্প মোর কহি, কথা পাদস্পর্শ করি- জানকীর তরে রাজ্য ত্যাজি
কাননে পশিব পুনরায়।”^{১৩}

এইভাবে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী রামায়ণ কাহিনির পুনর্নির্মাণ করেছেন। ‘সীতা’ নাটকটি অত্যন্ত মধুসফল নাটক। এই নাটকটি লিখে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। নাটকটির মধ্যে চরিত্রনির্মাণ, ভাষাসৃজন ও কাহিনির সামঞ্জস্য রক্ষায় যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর দক্ষতা স্বীকার করতেই হয়। বাঙালি নারীর সতীত্বধর্ম ও স্বামীপ্রেমকে প্রধান করে ‘সীতা’ নাটকটিকে নাট্যকার পুনর্নির্মাণ করেছিলেন; যা আজো বাঙালি নারীর আত্মত্যাগ ও স্বামীপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে আমাদের কাছে গ্রহণীয়। আমাদের অনুসন্ধিৎসু গবেষণায় নাটকটির গুরুত্ব এবং সমাজে তার পরোক্ষ প্রভাব আজো আমরা লক্ষ্য করি, তাই নাটকটির আলোচনা জরুরী এবং প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

মনোজ মিত্র - পুঁটি রামায়ণ (১৯৯০);

১৯৯০ খ্রীঃ প্রকাশিত ‘পুঁটি রামায়ণ’ নামের একটি নাটক রচনা করেছিলেন নাট্যকার মনোজ মিত্র। নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকায় (সেপ্টেম্বর, ১৯৯০)। নাটকটিতে আছে দুটি অঙ্ক। প্রথম অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য এবং দ্বিতীয়

অঙ্কে চারটি দৃশ্য। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রয়েছে পুঁটি রামায়ণের প্রস্তাবনা, দ্বিতীয় দৃশ্যে পুঁটিরামের লঙ্কায় আগমন ও রাবণের গণতন্ত্র শিক্ষা। তৃতীয় দৃশ্যে কুলঙ্গারের সন্ধানে স্বর্ণলঙ্কা তোলপাড়, চতুর্থ দৃশ্যে লঙ্কার প্রশাসন ব্যবস্থা বলবৎ, পঞ্চম দৃশ্যে রাবণের নরমুণ্ড ধারণ ও কাঁটা চামচের কেছা। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রয়েছে রাবণের জন্মদিনে মাছরাঙার শোক, দ্বিতীয় দৃশ্যে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ ও বন্দী হত্যার উদ্যোগ, তৃতীয় দৃশ্যে কুলঙ্গারের আবশ্যিক প্রয়োজনীয়তা, চতুর্থ দৃশ্যে ফাঁসির মঞ্চে বিবাহের মন্ত্রপাঠ। ১৮ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১১.৫ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ -

“কলাভূৎ পাবলিশর্স/ মনোজ মিত্র/ যা নেই ভারতে/
পুঁটিরামায়ণ/ আত্মগোপন/ তিনটি পূর্ণাঙ্গ নাট্য সংকলন”^{১৪}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ -

“যা নেই ভারতে/ পুঁটিরামায়ণ/ আত্মগোপন/ তিন-টি
পূর্ণাঙ্গ নাট্য সংকলন/ মনোজ মিত্র/ কলাভূৎ
পাবলিশর্স”^{১৫}

নাটকে উল্লিখিত পাত্র-পাত্রীরা হল- রাবণ, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ, কালনেমি, মাল্যবান শল্লক, হনুমান, পণ্ডিত, বৈদ্য, বক্শেশ্বর, টেপা, পাখাধারী পরিচারক, ছত্রধারী পরিচারক, পুঁটিরাম বাগচী ও মাছরাঙা। নাটকটি উৎসর্গ করা হয়েছে রমেন্দ্র কুমার দেবনাথ নামের এই জনৈক ব্যক্তিকে। নাকটি প্রকাশিত হয় সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে কলাভূৎ পাবলিশর্স, ৬৫, সূর্যসেন স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০০৯ থেকে। নাটকটির মূল্য একশত পঞ্চাশ টাকা।

‘পুঁটি রামায়ণ’ নাটকটি পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও আধুনিক ভাবনার নাটক। একালের গণতন্ত্রের ব্যবস্থা, আইনী রীতি-নীতি পৌরাণিক রামায়ণের রাবণের উপর চাপিয়েছে একালের মানুষের প্রতিনিধি পুঁটিরাম বাগচী। ফলে নাটকের মধ্যে দুটি পৃথক যুগের ভাবনার মেলবন্ধন ঘটেছে। মাছরাঙার মতো নারীরা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়েছে। নামকরণের মধ্যে রামায়ণের আগে ‘পুঁটি’ শব্দটি যোগ করে নাট্যকার পাঠককে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এটি একটি স্বতন্ত্র আধুনিক নাট্য-রামায়ণ। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় ফেরিওয়ালা বক্শেশ্বর ও টেপা ঘুরে ঘুরে রামায়ণ গান করে আট আনায় ‘পুঁটি রামায়ণ’ বিক্রি করছে-

“রামায়ণ... আটআনায় রামায়ণ পাচ্ছেন... মাত্র আটআনা। বাল্মীকির রামায়ণ আপনাদের প্রত্যেকের জানা আছে... শুনেছেন পড়েছেন দেখেছেন... থেটারে সিনেমায় যাত্রায় টিভি-পর্দায়... দেশে বিদেশে আছে কত রকমারি রামায়ণ... অদ্ভুত রামায়ণ, দিব্য রামায়ণ, বিচিত্র রামায়ণ... আমি এনেছি সম্পূর্ণ আনকোরা এক রামায়ণ... পুঁটি রামায়ণ। হাওড়ার বিখ্যাত পুঁটিরাম বাগচি বিরচিত পুঁটি রামায়ণ। আটআনা... আটআনা... আটআনা! পুঁটি রামায়ণের স্পেশালিটি-সবিশেষ পাতলা। রোববার দুপুরে বালিশে মাথা দিয়ে বইখানা ধরুন, চোখের পাতা না জড়াতে, পৌঁছে যাবেন শেষ পাতায়। অথচ এর মধ্যে আপনি সব পাবেন... রাম পাবেন, সীতা পাবেন... কৌশল্যা কৈকেয়ী হরধনু ভঙ্গ পাবেন...”^{১৬}

বক্শেশ্বরের গানে বোঝা যাচ্ছে এই রামায়ণের শুরু লক্ষা কাণ্ড থেকে। রামের আদেশে সীতার সন্ধানে এসেছেন পবনপুত্র হনুমান। হনুমানের আগমন বার্তা লক্ষার রাজসভায় এনে দেয় প্রধানরক্ষী শল্লক। হনুমানকে কোমরে দড়ি বেঁধে আনা হয়। মাল্যবান হনুমানকে অভিযোগ করে বলে-

“ গৃহস্থের ঘরে ঢুকি ছিঁড়িস মশারি...
টানাটানি করিস যত নিদ্রিত নারী !
সকলেরে ভাবিস সীতা। ”^{১৭}

তখন হনুমান রাবণকে দোষারোপ করে এবং বলেছে-

“ উদ্ধার! লম্বা লম্বা কথা বলে আবার!
কোথায় আমার মাতা, শীঘ্র করে দে বার!
পিতৃসত্য পালনের লাগি মোর প্রভুর নেয় বনবাস...
লালসার মত্তহস্তি কেন তার করিলি সর্বনাশ! ”^{১৮}

উত্তরে রাবণ বলেছে-

“তোর প্রভু করে বনবাস,
না জানি কোন রঙ্গে...
কিন্তু সীতা কেন থাকিবে রে সঙ্গে!
হায় হায় চৌদো বৎসর এক নারী রবে শ্বাপদসঙ্কুলে
জঙ্গলে...
খাবে সে গাছের ফল, লজ্জা নিবাবিবে বাকলে। ”^{১৯}

মামা কালনেমি রাবণকে সমর্থন করে বলেছে-

“ ভাগ্নে মোর বিশ্বজয়ী জাতির নায়ক

স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বর...

নারীত্বের এ অবমাননা কেমনে সহিবে রে বর্বর?”^{২০}

এ রাবণ যেন একজন মানবাধিকার রক্ষায় নিয়োজিত প্রতীকী মানুষ। একথা তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট হয়েছে -

“ জগতে যেখানে উঠিবে জাগি মানবাত্মার আক্ষেপ...

সেখানেই পড়িবে রাবণের হস্তক্ষেপ!

শোন রে নরাধম রামের শাবক,

রাবণ হৈতে চাহে বিশ্বের নৈতিক অভিভাবক।”^{২১}

রামায়ণ কাহিনির মধ্যে উপস্থিত হয় একালের মানব চরিত্র হাওড়ার পুঁটিরাম বাগচী। সে লঙ্কার রাজসভায় উপস্থিত হয়ে রাবণ এবং সকলের উদ্দেশ্যে বলে -

“নমস্কার... নমস্কার... নমস্কার! তাহলে এলাম, উঁ, শেষ পর্যন্ত আসতে পারলাম স্বর্ণলঙ্কার! উঃ চোখকেও বিশ্বাস হয় না। (মালপত্তর নামিয়ে) কে! এ কে! জগতের সেই আদি পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার নায়ক - ফাস্ট সিটিজেন অব স্বর্ণলঙ্কা... মহারাজ রাবণ! (করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে) হ্যান্ড প্লিজ ইওর ম্যাজেস্টি... প্লিজ... প্লিজ...

[হকচকিত রাবণ হাত বাড়িয়ে দেয়, পুঁটিরাম করমর্দন সারে।]

সো গ্ল্যাড টু মিট ইউ স্যার!... ভাবা যায় না । হ্যালো! কালনেমি মামাজি... হ্যালো... হ্যালো...”^{২২}

রাজসভার সকলকে এবং লঙ্কার রাজা রাবণকে পুঁটিরাম একালের গণতন্ত্রের রীতিনীতির কথা বলে অবাক করে দেয়। পুঁটিরাম বলে-

“সবাই মিলে দেশটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন স্যার! হানাহানিই বা কেন? রাজনৈতিক বিবাদ রাজনৈতিক ভাবে মোকাবিলা করুন। আমাদের কালে তো হানাহানি উঠেই গেছে !... জানা নেই। আইনশৃঙ্খলা... স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থা! কাকে বলছি! কিছুই তো ঢুকছে না। প্রশাসনিক পরিকাঠামো কিছু আছে কি?”^{২৩}

তার কথায় সকলেই নতুন শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়। এসে পড়ে বন্দী হনুমানের শাস্তিমূলক বিচারের প্রসঙ্গটি। পুঁটিরাম রাবণকে বলে-

“আজ্ঞে সব তন্ত্র ঘেঁটে আমি নিজের মতো করে এক পুঁটিতন্ত্র বানিয়েছি স্যার, যা আপনাকে এনে দেবে বিংশ শতাব্দীর রীতিনীতির প্রশাসনিক কায়দাকানুন। পুরো আধুনিক।.. আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন স্যার মহাকালের সাগরে। এখন মালকড়ি স্যাংশন করুন, বড় দেখে ফাঁসির মঞ্চ গড়তে হবে। ফাঁসি কিন্তু খুব ব্যয়সাপেক্ষ।”^{২৪}

হনুমানের ফাঁসি দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় একজন ফাঁসুড়ে কুলাঙ্গারের। কিন্তু অনেক খোঁজ করার পরও কোন একজন কুলাঙ্গারের সন্ধান পাওয়া গেল না স্বর্ণলঙ্কায়। তখন পুঁটিরামের কথা মতো রাবণ কুলাঙ্গার ফাঁসুড়ের জন্য একটি প্রার্থীপদ তৈরি করেন, তাতে রাখা হয় নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা। সেই প্রসঙ্গের একটি নাট্য মুহূর্ত -

“পুঁটিরাম : বেতন বাড়ান স্যার, বেতন বাড়ান। ফাঁসুড়ে পোস্টের জন্য একটা লম্বা স্কেল করুন। দেখবেন কুলাঙ্গারেরা গোপন আস্তানা ছেড়ে ছোঁকছোঁক করে বেরিয়ে আসছে।

রাবণ : কত বেতনের কথা বলছ ?

পুঁটিরামঃ : কত টত নয়। দেশের সর্বোচ্চ বেতন ধার্য করা হোক দেশের সর্বোত্তম কুলাঙ্গারটির জন্যে। সেই সঙ্গে দিন ফ্রি কোয়ার্টার। যেটা হবে লঙ্কেশ্বর দশাননের সুবিশাল সুবর্ণপ্রাসাদের চেয়ে দশগুণ বড়। যার মধ্যে থাকবে সোনার জলের ফোয়ারা, জ্বলবে সোনার ঝাড়বাতি, সোনালী প্রজাপতির মতো একঝাঁক সেবা দাসী সোনার নূপুর পায়ে দিবারাত্র নাচবে সেখানে...”^{২৫}

সেকালে লঙ্কায় সেবাদাসী নারীদের বিবাহের কোন অধিকার ছিল না, কিন্তু ফাঁসুড়ে কুলাঙ্গারের পদে লোক না পাওয়ার জন্য রাবণ মাছরাঙ্গার মতো দাসী নারীকেও সেই পদের সঙ্গে যুক্ত করেন। এতে সেবা দাসীরা অধিকার পায় বিবাহ করার। আনন্দে মাছরাঙ্গা বলে-

“সেই ভালো! অধিকার ছিল না, অধিকার পেয়েছি। অধিকারটাই বড়, জিনিসটা যাই হোক! পুঁটিরাম বাবু আমায় সেই অধিকারটাই এনে দিলেন!”^{২৬}

প্রসঙ্গক্রমে আসে একালের পাতাযুগের কথা, ব্রাউন সুগারের কথা, যা সেকালের প্রেক্ষাপটে বেমানান হলেও একালের অভিনব নেশার পদ্ধতি। মেঘনাদকে অনুসরণ করে পুঁটিরাম বলে-

“মদে কিছু হয় না ভাইপো, আমাদের কালে মদ অচল হয়ে গেছে! পুরোপুরি অচল করতে হলে চাই পাতা... আমাদের কালে পাতাযুগ চলছে!”^{২৭}

মেঘনাদ অবাক হয়ে জানতে চান পাতাযুগের পরিচয়। এরপরেই আসে একালের ব্যক্তি অধিকারের প্রসঙ্গ। বিভীষণ পুঁটিরামের ইন্ধনে রাবণের বিরুদ্ধে অন্তরের কথা প্রকাশ করে বলেন-

“কী করলুম জীবনে? স্বর্ণলঙ্কা... সোনার ভাণ্ডার, একা কেন দশানন ভোগ করে? আমি তার চেয়ে কম কিসে! [পাখার বেগ বাড়ায় পুঁটিরাম] মুখে আমি রাবণের স্তাবকতা করে। সত্যি এই ওকে আমি ঘৃণা করি। আমাদের দুই ভাইকেও ফাঁকি দিয়েছে... আমাকে আর মেজদাকে কুম্ভকর্ণকে। অথচ এ রাজত্ব স্থাপনে আমাদেরও অবদান কম ছিল না। [পুঁটিরামের হাতে পাখাটা বনবন করে ঘুরছে।] এখন নিজের ছেলেটিকে সিংহাসনে বসাতে চাইছে!... ছাড়বো না বাগচি, সুযোগের সন্ধানে আছি। তোমায় বলছি বাগচি, একদিন রাবণের এ রাজছত্র রাজদন্ড সিংহাসন কেড়ে আমি নেবই।”^{২৮}

এখানে ভায়ে-ভায়ে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। ঘরের মধ্যেই শত্রুর জন্ম ঘটে। আগামী দিনের সুযোগ সন্ধানে থাকেন বিভীষণ। এদিকে হনুমান ফাঁসির দড়ি গলায় পরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন, অন্যদিকে ফাঁসুড়ে পাওয়া যায় না। ফাঁসুড়ে না পাওয়া গেলে রাজা রাবণের অপমানের সীমা থাকবে না। হনুমান রাবণকে বলেন-

“এই যে! উষালগ্নে ফাঁসির কথা, এখন বেলা দুপুর হলে দুলে আসা হচ্ছে! এভাবে কী প্রশাসন চলবে দশানন! নিজেই সিস্টেম বার করছ, নিজেই তার পিন্ডি চটকাচ্ছ। চলো, কোথায় ফাঁসিমঞ্চ... নিয়ে চলো। চলি গো মিতেনি...”^{২৯}

রাবন পুঁটিরামকে দুঃখে করে ক্ষোভের সঙ্গে বলেন-

“আমি কিন্তু প্রচণ্ড আহত হয়েছি, সোনা নিয়েছ নাও, সোনা নিয়ে কোনো কথা নয়। কিন্তু আমরা কি এই বোঝাপড়া নিয়ে দেশে বিংশ শতাব্দীর পুঁতিতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা নিয়েছিলুম! না পুঁটি, তোমরা যদি সবাই মিলে এই করো, বাধ্য হয়ে আমাকে তো পদত্যাগ করতে হয়।”^{৩০}

শেষ পর্যন্ত পুঁটিরামের পরিকল্পনা মতো রাবণ কুলাঙ্গার ফাঁসুড়ের প্রার্থী পদের তালিকা তৈরি করার জন্য ইন্টারভিউ নেন, যা একেবারে অতি আধুনিক কালের জীবিকা গ্রহণের পথ। এই প্রার্থী তালিকায় আসে স্বয়ং রাজ্যের পণ্ডিত, বৈদ্য, ভাই কুম্ভকর্ণ, কালনেমি প্রমুখেরা এবং রাজ্যের অগণিত প্রজা, যারা প্রত্যেকে ঐ প্রার্থীপদের অংশীদার হতে চায়। তাদের যুক্তিগুলি এইরূপ -

“পণ্ডিত : স্কেলটা যে বড্ড ভালো প্রভু। রাজপ্রাসাদের মতো কোয়ার্টার পাবো, যানবাহন নেশাভাঙ সব ফ্রি পাবো, শতজন্ম পণ্ডিতি করেও এর ধূলিপরিমাণও যে জুটতো না প্রভু দশানন।

বৈদ্য : আজ্ঞে কিছুদিন ধরেই অনুভূতি হচ্ছিল, অধঃপতন হচ্ছে! আমি গোপ্তায় যাচ্ছি! তাই হল। ফাঁসুড়ের চাকরি নিয়েই আমার অধোযাত্রার সমাপ্তি ঘটতে চলেছে।

কুম্ভকর্ণ : শুনলাম চাকরিতে নাকি অটেল নেশার সুযোগ রয়েছে। তবে চাকরিটা আমায় দাও দাদা...

কালনেমি : এরপর দেশে আর ফাঁসুড়ের অভাব থাকবে? আমরা আর মাছরাঙ্গার সন্তানেরা ফাঁসুড়ে নামে খ্যাত হবে। ভেবে দ্যাখো এই সুযোগে আমি হচ্ছি একটি প্রজাতির জনক!”^{৩১}

রাজা রাবণের কাছে স্বর্ণলঙ্কার প্রকৃত কুলাঙ্গারদের ছবি পরিষ্কার হয়ে যায়। পুঁটির কথায় তা প্রকাশ পায়-

“গা ঢাকা দিয়ে ছিল স্যার। পুঁতিতন্ত্র সেই সুপ্ত গুপ্ত কুলাঙ্গাদের টেনে দিবালোকে এনে দিল স্যার। কিন্তু স্যার পদমাত্র একটি... দেশময় বুভুক্ষু উপবাসী ছারপোকা! কাকে ছেড়ে কাকে দেবেন! আপনাকে যে ছিঁড়ে ফেলবে স্যার!”^{৩২}

তখন রাবণ বাঁচার কোন পথ না দেখে পুঁটিরামের কাছে নতজানু হয়ে বলে-

“পুঁটি পুঁটি, রাবণ হৈল নতজানু ।

সাধের স্বর্ণপুরী হৈছে ধ্বংস

রসাতলে যায় মোর সমগ্র বংশ...

বলো এবে কী হৈবে আমার!”^{৩৩}

নাট্যপরিণতিতে পন্ডিতের ভুল মন্তব্য উচ্চারণ, হনুমানের ফাঁসি দিতে না পারা যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি অসমাপ্ত রয়ে গেছে পুঁটিরামের সঙ্গে মাছরাঙ্গার বিবাহ। প্রচুর হাস্যরসের খোরাক রয়েছে নাটকটিতে। চরিত্রের ভাষাগুলি প্রান্তিক জীবনকেন্দ্রিক আঞ্চলিক ভাষা। সমাজে প্রচলিত সংরক্ষণ প্রথার ইঙ্গিত ধরা পরেছে পুঁটিরামের সংলাপে। সেইসঙ্গে নিম্নমানের কথ্যভাষার পরিচয়ও এখানে আছে। পুঁটিরাম রাবণকে বলেছে-

“অলরেডি ঘোষণা করা হয়েছে পদটি লম্পট কুলাঙ্গারদের জন্যে বিশেষভাবে সংরক্ষিত। এখন যদি লঙ্কার কোন সুসন্তানকে কাজটা করতে হয়, তাঁকে এফিডেফিট করে ঘোষণা করতে হবে, তিনি একটি হীন নীচ কুলাঙ্গার লম্পট।”^{৩৪}

চরিত্রগুলি রামায়ণের হলেও তাদের সঙ্গে মিশে গেছে একালের চরিত্র হাওড়ার পুঁটিরাম। তার অধিপত্য ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাই নাটকের প্রধান আকর্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে ‘পুঁটি রামায়ণ’ হয়ে উঠেছে আধুনিক কালের জীবন্ত নাট্যদর্পণ। তাই ‘পুঁটিরামায়ণ’ নাটকটি একই সঙ্গে পুনর্নির্মিত ও বিনির্মিত নাটক হয়ে উঠেছে।

মনোজ মিত্র - ভেলায় ভাসে সীতা (২০১৬) ;

রামায়ণের কাহিনি অবলম্বন করে ‘ভেলায় ভাসে সীতা’ নামে একটি নাটক লিখেছিলেন মনোজ মিত্র। ২০১৬ সালে নাটকটি প্রকাশিত হয়। নাটকটিতে মোট দুটি অঙ্ক আছে। প্রতিটি অঙ্কে চারটি করে গর্ভাঙ্ক আছে। ১৩ সেন্টিমিটার চওড়া এবং ১৯ সেন্টিমিটার লম্বা এই নাটকটির প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (১), চরিত্রলিপি (১), মূলনাটক (৪০) সহ মোট ৪৩টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ -

“কলাভূৎ পাবলিশার্স/ মনোজ মিত্র/ নাকছাবিটা/
নৈশভোজ/ ভেলায় ভাসে সীতা/ তিন-টি পূর্ণাঙ্গ নাটকের
সংকলন।”^{৩৫}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ-

“নাকছাবিটা/ নৈশভোজ/ ভেলায় ভাসে সীতা/ তিন-টি
পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংকলন/ মনোজ মিত্র/ কলাভূৎ
পাবলিশার্স।”^{৩৬}

নাটকটি প্রকাশিত হয় মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স পাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩ থেকে। নাটকের চরিত্র লিপিতে রয়েছে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, শরভঙ্গ, উতথ্য, জটায়ু, সম্পাতি, রাবণ, অনুচর, হনুমান, সীতা, মন্দোদরী, শূর্পণখা এবং অশোকাননের চেড়িদল। নাট্যকার মনোজ মিত্র নাটকটি উৎসর্গ করেছেন বিখ্যাত সাহিত্য ও সমালোচক সমরেশ মজুমদারকে। নাটকটির মূল্য একশত পঞ্চাশ টাকা।

চিরপ্রচলিত রামায়ণের কাহিনি অনুসরণ করে মনোজ মিত্র ‘ভেলায় ভাসে সীতা’ নাটকটি রচনা করেন। নাটকের কাহিনিধারা গড়ে উঠেছে রাম-লক্ষ্মণের চোদ্দ বছরের জন্য পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাস যাত্রা, রাম-হনুমানের লক্ষা আক্রমণ এবং সীতা উদ্ধারের পরিকল্পনাকে অবলম্বন করে। কিন্তু নাট্যকার এই পুরাণ কাহিনিতে খুঁজে পেয়েছেন নতুন ভাবনার অনুসঙ্গ। তিনি আমাদের দেখিয়েছেন রাম-লক্ষ্মণের অযোধ্যা ত্যাগ এবং বনবাস যাত্রার আসল কারণ, অনার্য সভ্যতার উপর আর্যদের অধিকার প্রতিষ্ঠা। একই সঙ্গে নারীর সম্মান বা অধিকার রক্ষার লড়াই, যা শুধু পুরাতন ভাবনা নয়, সর্বকালীন মানব ভাবনার অন্তর্গত। নাটকের প্রস্তাবনায় হনুমান রামচন্দ্রের বন্দনাগান গেয়েছেন। অযোধ্যা ত্যাগ করে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাসহ বিদ্যাপর্বত অতিক্রম করে উপস্থিত হয়েছেন অনার্য সভ্যতার অন্তর্গত রাক্ষস রাজ্য পঞ্চবটী বনে। এই প্রসঙ্গে উঠে এসেছে সীতার প্রকৃতিপ্রীতির কথাও—

“(আপন আবেগে) সখি, মাটি গাছপালার সঙ্গে আমার যে নাড়ির যোগ।
কিন্তু বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়ি সবই আমার রাজার বাড়ি। পঞ্চবটীতে এসে
সেই সম্পর্কটা আবার ফিরে পেলাম। ফিরে পেলাম মায়ের গায়ের গন্ধ –
তার আঁচলখানির ছায়া.....”^{৩৭}

এখানেই সীতার সঙ্গে শূর্পণখার সাক্ষাৎ হয়। সীতা শূর্পণখাকে বনবাসে আসার পারিবারিক কারণ জানায়। সীতা (+ শূর্পণখাকে) বলেছেন -

“পারবে, কোনও মানুষ পারবে বৃদ্ধ পিতার ইচ্ছায় ছোটভাইকে রাজত্ব
ছেড়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ বনবাস মেনে নিতে! বৃদ্ধ পিতা এক দুর্বল মুহূর্তে

মেজোরানি কৈকেয়ীকে কথা দিয়েছিলেন, তাঁর পুত্র ভরতকে সিংহাসনে বসাবেন, আর ভরতের সিংহাসনটি নিষ্কণ্টক করতে রামচন্দ্রকে চোদ্দো বছরের জন্যে নির্বাসনে পাঠাবেন। রাম পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায়নি। শোনো শূর্ণখা, পুরুষশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের সকল রাজৈশ্বর্য হেলায় বিলিয়ে দিয়ে পিতৃসত্য পালনে এক বস্ত্রে রাজপুরী ছেড়েছেন। রাজ্যবাসী কেঁদেছে,... দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করেছে।”^{৩৮}

শূর্ণখা সীতার এই যুক্তি মেনে নেননি। তিনি রামের রাজ্যত্যাগের প্রকৃত কারণ উপলব্ধি করেছেন। সীতাকে শূর্ণখা বলেছেন—

“পিতৃসত্যপালন! তা পিতৃসত্যপালনে যিনি একবস্ত্রে বনবাসে আসছেন, তাঁর পিছু পিছু অযোধ্যার মালবাহকেরা কেন রাশি রাশি অস্ত্রশস্ত্রের পেটিকা বয়ে নিয়ে এনেছিল বলতে পারো? সারিবাঁধা শকটে অস্ত্র ঢাকা দেওয়া ছিল কেন সীতা?”^{৩৯}

এখানে শূর্ণখা অনার্য নারী নন, হয়ে উঠেছেন বুদ্ধিমতী বিচক্ষণ একালের আধুনিক নারী। লক্ষ্মণ শূর্ণখাকে আঘাত করেছেন। সীতা লক্ষ্মণের এই কাজে নারী হিসাবে অসম্মানিত হয়েছেন এবং রামচন্দ্রকে প্রতিবাদ করে বলেছেন—

“এইরকম একটা দয়ামায়াশূন্য বর্বরকে সঙ্গে নিয়ে কেন তুমি ঘুরবে রাম? দূর করে দাও ওকে! যেন ওকে ছাড়া তোমার চলে না?”^{৪০}

পুরুষ হয়ে একজন নারীর উপর অত্যাচারের ঘটনাটি সীতার আত্মসম্মানে আঘাত করেছে। সেইমুহূর্তে রামচন্দ্র সীতাকে নিজের পরিকল্পনা জানিয়ে দিয়েছেন—

“তবে শোনো, অলস দিন কাটাতে আমি বনবাসে আসিনি সীতা। শুধু পঞ্চবটী কেন, বিষ্ণুপর্বতের দক্ষিণের এই সুবিশাল দণ্ডকরাজ্য অধিকার করবো সীতা.”^{৪১}

নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে লক্ষ্মণ রাজসভা ও রাবণের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। শূর্ণখা দাদা রাবণকে রাম-লক্ষ্মণের অন্যায় কাজের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন। তখন রাবণ বলেছেন—

“না! এ হয় না! দূর হোক স্বর্গ! শূর্ণখা কটুবাক্য সহ্য হয় না। ওরে কে আছিস— আমার মন্ত্রীদেব ডাক—সভাসদদের ডাক – লক্ষ্মণ বীরদের ডাক ভগ্নীর লাঞ্ছনার প্রতিশোধ চাই! সভাঘরে ডাক সবাইকে।”^{৪২}

রামায়ণের অনুষঙ্গে নাট্যকাহিনীতে বড় হয়ে ওঠেছে ঐতিহাসিক আর্য-অনার্য সম্পর্কের দ্বন্দ্বটি। রাবণ ভগ্নী শূর্পণখাকে বোঝাতে চেয়েছেন—

“দ্যাখ বোন- কখনও কখনও অস্ত্রেও ক্লান্তি আসে। ভোগ-লালসা-জয়-উল্লাস ঠিক এই সময়ে সবেতেই আমার ক্লান্তি, অনাসক্তি! বরং শান্তভাবে স্বর্গের সিঁড়িটা গড়ে যদি হেঁটে গিয়ে স্বর্গবিজয় সমাধা করতে পারি – (থেমে) স্বর্গবিজয় শুধু ওই নন্দন ভ্রমণের জন্যে নয়! — অনার্য রাবণ যদি হয় দেবরাজ রাবণ –আর্যজাতির সাধ্য হবে না বিদ্যাপর্বতের এপারে সাম্রাজ্যবিস্তারের কিংবা অনার্যের কেশস্পর্শ করার কিংবা তাকে হেয় জ্ঞান করার। প্রভুত্বকামী আর্যের আশ্রাসন রোধের এই মোক্ষম উপায় শূর্পণখা, অনার্যের মহিমা প্রতিষ্ঠা করা। তাই আমার স্বর্গ অভিযান!”^{৪৩}

কিন্তু শূর্পণখা দাদাকে রাম-লক্ষ্মণের প্রকৃত উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট করে বলেছেন –

“এখনই যদি পঞ্চবটী রক্ষে না করো দাদা, জানবে তোমার স্বর্ণলঙ্কাও রেহাই পাবে না। ওই চতুর চূড়ামণি রামচন্দ্র এই কুবেরের ঐশ্বর্য না হাতিয়ে বনবাস থেকে ফিরবে ভেবো না! তোমার স্বর্গের সিঁড়ি শেষ করা অবধি সে দেরিও করবে না দাদা, হাত বাড়ালো বলে!”^{৪৪}

রাবণ তখন ভগ্নীকে জানান তিনি সীতার মুখে একই রকমভাবে অস্ত্রের আঘাত করে প্রতিশোধ নেবেন। কিন্তু তাতে শূর্পণখা সম্মত হননি। তিনি নিজে একজন রাক্ষসী হয়েও অন্য নারীর উপর অত্যাচারের পরিকল্পনায় সায় দিতে পারেন নি। বরং দাদাকে এইরকম পরিকল্পনার জন্য প্রতিবাদ করে বলেছেন— “না, কক্ষনো না! আমি তাকে সখি ডেকেছি! কক্ষনো তার ক্ষতি করবে না!” একসময় সীতা রাম-লক্ষ্মণের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছেন, আসন্ন যুদ্ধের কথা মনে করে শঙ্কিত হয়েছেন। লক্ষ্মণকে সীতা আক্রমণাত্মক ভাষায় বলেছেন –

“দাদা পিতৃসত্য পালনে বনে চলেছে, ভাইও পিছু ধরেছে! তলে তলে জানাতো চোদ্দোবছরে রাজত্বের সীমানা বাড়াবে। সেদিন কেউ ওকে ঠেকাতে পারেনি! উমিলাও না! উর্মিলা পা দুটো জড়িয়ে ধরল— উর্মিলা মূর্ছা গেল – এই পাষণ্ড ফিরেও তাকালো না। আনুগত্য দাসত্ব পদসেবা – গণ্ডমূর্খের মহৎ গুণ।”^{৪৫}

এরপর রাবণ সীতাহরণ করেন এবং সীতাকে লঙ্কার অশোককাননে রাখেন। রাবণ সীতার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। তাকে আত্মগত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। মনোজ মিত্রের সীতা যেন একালের ব্যক্তিত্ব সচেতন আত্মমর্যাদায় পরিপূর্ণ এক নারী, যিনি শত অত্যাচারেও নতি স্বীকার করতে চান না। একসময় রাবণ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে সীতাকে বলেন-

“আবার পা! এ পর্যন্ত অনেক অসম্মান করেছিস। উত্তর একটাই! বধ করব তোকে! জয় দেবী ধান্যমালিনী।”^{৪৬}

কিন্তু মন্দোদরী সীতাকে সন্তান স্নেহে ভালোবাসেন বলেই স্বামী রাবণকে নিরস্ত্র করেন। ইতিমধ্যে হনুমানের লঙ্কাদগ্ধের বার্তা এসে পৌঁছালে পরিস্থিতি জটিল হয়। দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য পঞ্চবটীর সমুদ্রতীরে জটায়ুর দাদা সম্পাতি উপস্থিত আছে। সে দূরে দেখতে পায় একটি ভেলায় করে সমুদ্রের উপরে ভাসতে ভাসতে সীতা এপার আসছেন। এপার এসে সীতা সম্পাতিকে বলেন -

“মুক্তি, সম্পাতি আমার মুক্তি! বেঁচে গেছি! আবার আমি আমার পঞ্চবটীতে ফিরে এলাম!”^{৪৭}

পরমুহূর্তে রামকে দেখে সীতা আবেগে আশ্লুত হয়ে বলেন -

“মুক্তি পেয়েছি, ওগো ওরা আমায় মুক্তি দিয়েছে!....আমার জিদের কাছে, আমার হার না মানা প্রতিজ্ঞার কাছে হার মেনেছে রাবণ! মরণপণ প্রতিজ্ঞা ! আমাকে কেউ জয় করতে পারবে না! জয় করেছে একজন - সেই কবে হরধনু ভঙ্গ করে!.... ভাবতে পারো প্রিয়তম, লঙ্কার লোকেরা আমায় ভেলায় তুলে দিচ্ছে, আর লঙ্কেশ্বর মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।”^{৪৮}

কিন্তু রাম গোপনে সীতাকে গ্রহণ করতে চান না। নিজের অপমান, বংশের অপমান এবং নারী জাতির অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে এবং অনার্য সভ্যতায় নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা না করে কিছুতেই সীতাকে তিনি গ্রহণ করতে চান না। তাই তিনি সীতাকে লঙ্কায় ফিরে যেতে বলেন -

“জগৎ জানে, রাবণ বলপ্রয়োগে আমার স্ত্রীহরণ করেছে! আমাকেও তাই বলপ্রয়োগেই তোমাকে উদ্ধার করতে হবে। আমার পৌরুষ তাই বলে সীতা! ওঠো ওঠো - ভেলায় উঠে পড়ো।”^{৪৯}

এখানে উঠে এসেছে আমাদের সমাজের একটি কলঙ্কিত অধ্যায়; নারী চরিত্রের শুচিতার প্রশ্ন। সীতাকে যখন রাম গ্রহণ করতে চাইল না, তখন সীতা রামচন্দ্রকে ক্ষোভের সঙ্গে বলেন-

“কেন আমি অশুচি! ও অশোককাননে যখন চেড়িদের হাতে যাতনা সয়েছি, তুমি এপারে বসে মেপেছো – সীতা কতটা অশুচি হলো, কতটা অপবিত্র হলো!”^{৫০}

প্রত্যুত্তরে রাম বলেছেন -

“শোন সীতা, নিজেকে বাঁচাতে তুমি যা খুশি করতে পারো! যাকে ইচ্ছা মালাও দিতে পারো! আমার কিছু বলবার নেই! দশদিক তোমার জন্য খোলা। কিন্তু রাবণের শাস্তি – স্বর্ণলঙ্কা থেকে চিরবিদায়। যাও, সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে থেকো না।”^{৫১}

রাম সীতাকে অস্বীকার করার পর সীতা নিরুপায় হয়ে যান। তিনি বাধ্য হন ভেলায় ভেসে যেতে। রামচন্দ্র নিজের সিদ্ধান্তে অটুট থাকেন। নতুন সাম্রাজ্যবাদের নীতি এই নাটকের বিষয়ের মূল ভাবনাকে আলোড়িত করেছে, যা আধুনিক সভ্যতার একটি বিশেষ দিক। এইভাবে ‘ভেলায় ভাসে সীতা’ নাটকের কাহিনি পুরাণ থেকে পৃথক হয়ে একটি নতুন ভাবনায় পুনর্নির্মিত হয়ে উঠেছে।

‘ভেলায় ভাসে সীতা’ নাটকের কেন্দ্রীয় ভাবনায় সীতা চরিত্রের আত্মমর্যাদাবোধ এবং রাম-লক্ষণের সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য প্রধানভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। এই নাটকে সীতাই প্রধান চরিত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বনবাসকালে পঞ্চবটী বনের প্রকৃতিপ্রীতি, স্বামী ও দেওরের পররাজ্য লোভ, শূর্ণগাখার উপর অন্যায় আচরণে দুঃখ পাওয়া- এইসব কিছুতেই সীতা চরিত্রে স্বাধীনচেতা নারীর মন, মানসিকতা এবং অধিকারবোধের পরিচয়টিকে ফুটে উঠেছে। অনার্য সভ্যতার অধিকার নেওয়ার প্রসঙ্গে স্বামী রামের বিরুদ্ধে সীতা প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন—

“আমি তোমাকে পঞ্চবটীতে রক্ত ঝরাতে দেব না-কারও ভূমি দখল করতে দেব না।”^{৫২}

সীতা এখানে ক্ষত্রীয় ধর্মের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নন, কারণ সেই রাষ্ট্রনীতিতে রক্তে ভিজে যায় ধরাতল, হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। মনুষ্যত্বকে হত্যা করে সাম্রাজ্য বিস্তার সীতার কাছে সভ্যতা বিরোধী নীতি বলে মনে হয়। তাই আধুনিক নারীর মতো

স্বামী ও দেওরের বিরুদ্ধে সীতা সোচ্চার হয়েছেন। রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কাপুরীর অশোককাননে বন্দী করে রাখলেও আত্মগত করতে পারেননি; সীতার দৃঢ় মানসিক প্রত্যয়ের কাছে রাবণ হার মেনেছেন। এমনকি সীতা রাবণকে লাথী মেরে অপমান করেছেন, যা মূল রামায়ণে একেবারেই নেই। তাতে রাবণের পৌরুষে আঘাত লেগেছে। রাবণ সীতাকে মিথ্যা দস্ত দেখিয়ে বলেছেন-

“লঙ্কেশ্বর ইচ্ছে করলেই দুটি আঙুলে তোমার টুটি টিপে ধরে—এমনি করে চরকিপাক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তোমাকে তার অঙ্কশায়িনী করতেই পারে.... হাঃ হাঃ হাঃ!”^{৫৩}

কিন্তু রাবণের সমস্ত চেষ্টা এক সময় ব্যর্থ হয়েছে। কোনরূপ রক্তক্ষয়, যুদ্ধ ছাড়াই সীতা এসে উপস্থিত হয়েছেন পঞ্চবতীর সমুদ্রতীরে। সীতা স্বামী রামচন্দ্রকে জানিয়েছেন যে শেষ পর্যন্ত রাবণ হার মেনেছেন তাঁর জেদের কাছে। লঙ্কার লোকেরা তাকে ভেলায় তুলে দিয়েছে। কাহিনিটি যে চিরপ্রচলিত রামায়ণের একটি স্বতন্ত্র পাঠ বা কল্প-ভাবনার এক নবআখ্যান সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই। রাম এখানে সাম্রাজ্য বিস্তারে লুন্ড রাজতন্ত্রের প্রতীক চরিত্র। পিতৃ সত্য পালনের জন্য চোদ্দ বছর বনবাস যাত্রা আসলে তাঁর অনার্য সভ্যতার উপর আধিপত্য কায়েম করার পরিকল্পনা। সেই দিকটি নির্দেশ করেছেন শূর্ণগথা। সীতাকে শূর্ণগথা রামচন্দ্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে পূর্বেই বলেছিলেন—

“সর্বস্ব ত্যাগ করে কেন ও কেন এই জগতের বিস্ময়টিকে অযোধ্যার অঙ্গশালাটি টেনে আনতে হল বনবাসে, সেটাই বড় বিস্ময়ের, তাই না? (কঠিন গলায়) তোমার স্বামীর মূল উদ্দেশ্য শূর্ণগথার পঞ্চবতী রাজ্যটি হস্তগত করা! তাই পঞ্চবতীতে ঢুকে প্রথমেই তিনি আমার সেনাপতি দূষণকে হত্যা করেছেন! মিছে অছিলায় বৈমাত্রের ভাই খরকে বধ করেছেন!... পরপর রাক্ষস হত্যা করে তিনি সেই লঙ্কের দিকেই অগ্রসর হচ্ছেন!”^{৫৪}

রাম সীতার কাছে একসময় নিজের গোপন সংকল্পের কথা স্বীকার করেছেন। রাম-রাবণের যুদ্ধ ছাড়া সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না- একথা রাম বুঝতে পেরেছেন। এই নাটকের রামচন্দ্র পৌরাণিক রামায়ণের আদর্শ পুরুষ রামচন্দ্র নন, তিনি আধুনিক সভ্যতার লোভী মানুষ, সাম্রাজ্যবাদের প্রাণপুরুষ। শূর্ণগথা লঙ্কণের অন্যায় কাজের যোগ্য প্রতিবাদ চেয়েছেন, কিন্তু সীতার ক্ষতি চাননি। নিজে একজন নারী হয়ে, অন্য আর

এক নারীর ক্ষতি করতে চাননি। কেবলমাত্র রাম-লক্ষ্মণকে পঞ্চবটী বন থেকে বিতাড়িত করতে চেয়েছেন, যাতে স্বর্ণলঙ্কা আর্য সভ্যতার আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। এই নাটকের রাবণ যুদ্ধ বিমুখ এক বিচক্ষণ রাক্ষসরাজ। প্রচলিত পৌরাণিক রাবণের অহংকার এই রাবণ চরিত্রে মেলে না। রাবণ এখানে একেবারে সাধারণ মানুষ। লক্ষ্মণ, শরভঙ্গ, উর্তথ্য, সম্পাতি, হনুমান, মন্দোদরী, অশোক কাননের চেড়িদল প্রভৃতি চরিত্রগুলি নানাভাবে নাটকের পরিবেশ সৃজনে সহায়তা করেছে। নাটকের প্রতিটি চরিত্রের ভাষা একালের আদর্শ ভাষার পরিচয় ধরে রেখেছে। সীতার বিবরণে রয়েছে কাব্যিক সংলাপ। পঞ্চবটী বনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আপ্লুত হয়ে সীতা বলেছেন-

“সত্যি এ যে মায়াকানন! এদিকে পদ্মসরোবর... ও দিকে সোনার হরিণ!... দেখ দেখ মাটিমাখা হাঁসেরা ঝাঁক বেঁধে সব কোথায় চলে যাচ্ছে। আয় রে আয় ও মেটে হাঁস, তোরা একমুঠো শাকান্ন খেয়ে যা...আঃ কী কামড়ালো? ওরে দুষ্ট ভ্রমর! যা ভাগ!”^{৫৫}

এইভাবে সবদিক থেকে বিচার করলে মনোজ মিত্রের ‘ভেলায় ভাসে সীতা’ নাটকটিকে পুরাতন রামায়ণ কাব্যের আধুনিক পুনর্নির্মাণ বলতে হয়। এখানে একদিকে যেমন কাহিনিভাবনার বিনির্মাণ ঘটেছে, তেমনি চরিত্র, ভাষা, পরিবেশেরও পুনর্নির্মাণ হয়েছে।

সুকুমার রায় - লক্ষ্মণের শক্তিশেল (২০০৯) ;

সুকুমার রায়ের লেখা ‘লক্ষ্মণের শক্তিশেল’ নাটকটি প্রকাশিত হয় ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে। চারটি দৃশ্য নিয়ে লিখিত এই নাটকটি মূলত ব্যঙ্গাত্মক নাটক। ১৯ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১৩ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটিতে নামপত্র (১), চরিত্রলিপি (১), মূল নাটক (১৭) সহ মোট ১৯ টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ-

“কলাভূৎ পাবলিশার্স/ সুকুমার রায়/ ছোটদের হাসির নাটক সমগ্র/ পিলে কেন চমকায়”^{৫৬}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ-

“পিলে কেন চমকায়/ সুকুমার রায় / ছোটদের হাসির নাটক সমগ্র/ সম্পাদনা/ সৌমিত্র বসু/ কলাভূৎ পাবলিশার্স”^{৫৭}

নাটকটিতে উল্লিখিত পাত্র-পাত্রীরা হল- রাম, জাম্বুবান, বিভীষণ, লক্ষ্মণ, দূত, সুগ্রীব, হনুমান, রাবণ, যম, যমদূতদ্বয়, সভাসদগণ ও বানরগণ। নাটকটি প্রকাশিত হয় সৌমিত্র বসুর সম্পাদনায় ‘কলাভূৎ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭০০০০৭ থেকে। নাটকটির মূল্য আশি টাকা।

‘লক্ষ্মণের শক্তিশেল’ নাটকে বাণ্মীকির রামায়ণের কাহিনি অনুসরণ করা হলেও নাট্যকার নাটকের ভাষা ব্যবহার, চরিত্রচিত্রণ, সম্পর্কের টানাপোড়েন- সব দিক থেকে একালের মানুষের সমগোত্রীয় করে তুলেছেন। নাটকটি শুরু হয়েছে বনবাসী রামের উক্তির মধ্য দিয়ে -

“কাল রাত্তিরে আমি একটা চমৎকার স্বপ্ন দেখেছি। দেখলুম কি, রাবণ ব্যাটা একটা লম্বা তালগাছে চড়ছে। চড়তে-চড়তে হঠাৎ পা পিছলে একেবারে -পপাত চ, মমার চ।”^{৫৮}

নাটকের শুরুতে রামচন্দ্রের অবাস্তব স্বপ্ন এবং জাম্বুবানের কথাগুলি রাবণের মৃত্যুর সংকেত দিলেও তাঁদের কথায় একালের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের পরিচয় উঠে এসেছে। দূত যখন বলে -আজি দুর্দিনেতে নাই কারও রক্ষা। দলেবলে সবে পাবি আজি অক্সা।’ তখন জাম্বুবান বলে- ‘চোপরাও বেয়াদব! মুখ সামলে কথা বলিস’। এই ভাষাতে রেয়েছে একেবারে চলিত বাংলা গদ্যের পরিচয়। একটু পরেই সুগ্রীব এসে লক্ষ্মণকে আহ্বান করে বলে - “চলো হে লক্ষ্মণ, আমরা যুদ্ধ করি গিয়ে।” রামায়ণের বীর যোদ্ধারা এখানে যেন সাধারণ মানুষের মতো। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে জাম্বুবান রাবণের আগমন লক্ষ্য করে বিভীষণ ও সুগ্রীবকে পালিয়ে আসার কথা বলেছে এইভাবে-

“ওরে তোরা পালিয়ে আয়, রাবণ আসছে।

.....

যদি রাবণের ঘৃষি লাগে গায় -

তবে তুই মরে যাবি - তবে তুই ম-রে যাবি -

ওরে, পালিয়ে যা রে পালিয়ে যা

তা না হলে মরে যাবি -

লগুড়ের গুঁতো খেয়ে হঠাৎ একদিন মরে যাবি।”^{৫৯}

পরিস্থিতি জটিল হতে দেখে বিভীষণ সুগ্রীবকে বলে- ‘ওরে আমার মনে পড়েছে - একটা বড্ড জরুরি কাজ বাকি আছে- সেটা চট করে সেরে আসছি।’ তৃতীয় দৃশ্যে রাবণ লক্ষ্মণকে শক্তিশেল দিয়ে আঘাত করেন এবং লক্ষ্মণ মাটিতে পতিত হন-

“পড়লেন লক্ষ্মণ শক্তিশেলে (যেন) ঝড়ে কলাগাছ রে –
খাবি খেতে লাগলেন যেন ডাঙায় বোয়াল মাছ রে!
অনেক কষ্টে রইল বেঁচে –(আহা) কপাল জোরে মইল না –
ওরে স্বর্গ হইতে কিচ্ছু তবু পুষ্পবৃষ্টি হইল না!
ভাগ্যে মোরা সবাই সেথা ছিলাম উপস্থিত গো –
তা নইলে তো ঘটত আজি হিতে বিপরীত গো!”^{৬০}

এই প্রসঙ্গে বানরবাহিনীর কথোপকথন কৌতুক রসে ভরা মানুষের মতো। তারা বলেছে-

“জাম্বুবান – এতগুলো লোক কি সেখানে ঘোড়ার ঘাস কাটছিল নাকি?

সুগ্রীব – হনুমান ব্যাটা কি করছিল ?

হনুমান – আমি বাতাসা খাচ্ছিলুম।

সুগ্রীব – ব্যাটা, তুমি বাতাসা খাওয়ার আর সময় পাওনি ?”^{৬১}

এখানে রাম চরিত্রের পৌরাণিক মাহাত্ম্য একেবারে নেই বললেই চলে। তিনি অসহায় আর্ঘ্যপুরুষ মাত্র। ভাই লক্ষ্মণের আসন্ন মৃত্যু তাঁকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করেছে। রামচন্দ্র ভাই লক্ষ্মণকে বাঁচানোর জন্যে একে একে জাম্বুবান, হনুমান, বিভীষণকে অনুরোধ করেছেন। সেই সংকটকালে রাম-জাম্বুবান-হনুমানের কথোপকথনের একটি নাটকীয় দৃশ্য-

“জাম্বুবান – (হনুমানের প্রতি) এই কাগজে যা প্রেসক্রিপশন লিখে দিচ্ছি, এই ওষুধগুলো চট করে নিয়ে আসতে হবে।।

রাম – হ্যা, এইবার একটা কিচ্ছু ব্যবস্থা দিয়ে ফেল।

জাম্বুবান – (হনুমানের প্রতি) এই কাগজে যা প্রেসক্রিপশন লিখে দিচ্ছি, এই ওষুধগুলো চট করে নিয়ে আসতে হবে।

হনুমান – আচ্ছা, কাল ভোর না হতে উঠে নিয়ে আসব।

জাম্বুবান – না, না, এত দেরি করতে হবে না – এখুনি যা।

হনুমান – আবার এত রাত্তিরে কোথায় যাব? সাপে কাটবে না বাঘে ধরবে।

সুগ্রীব – ব্যাটা, শখের প্রাণ গড়ের মাঠ।

জাম্বুবান – না, ওষুধগুলো এখনি দরকার।

হনুমান - আঃ, হোমিওপ্যাথি লাগাও না।

জাম্বুবান - যা বলছি শোন, এই যা গাছের কথা লিখলাম -
বিশল্যকরণী মৃতসঞ্জীবনী - এইসব গাছের শেকড় আনতে হবে।।

হনুমান - আমি ডাক্তারখানা চিনি নে।।

জাম্বুবান - আ মরণ আর কি! এ কি কলকাতার শহর
পেয়েছিস নাকি যে, বাথগেট কোম্পানি তোর
জন্যে দোকান খুলে বসবে? কৈলাস পাহাড়ের
কাছে গন্ধমাদন পাহাড় আছে জানিস তো?

হনুমান - কৈলাস ডাক্তার আবার কে?

জাম্বুবান - ব্যস! কানের পটহটা দেখি ভারী সরেস - ব্যাটা
কৈলাস পাহাড় জানিস নে ?

হনুমান - ও বাবা! সেই কৈলাস পাহাড়! এত রাত্তিরে আমি
অতদূর যেতে পারব না।

জাম্বুবান - যাবি নে কি রে ব্যাটা? জুতিয়ে লাল করে দেব।
এখুনি যা —দেখিস পথে মেলা দেরি করিস
নে।”^{৬২}

অবশেষে সন্ধটের কাল পেরিয়ে লক্ষ্মণ জীবন ফিরে পান। তাঁর জীবন বাঁচানোর জন্যে
অনেকেই দাবিদার হয়ে ওঠেন। হনুমান, বিভীষণ ও সুগ্রীবের কথায় তা উঠে আসে -

“হনুমান - তা বুদ্ধি থাকুক আর নাই থাকুক - ওষুধ এনে বাহাদুরিটা
নিয়েছি তো!

বিভীষণ - আমি পাহারা না দিলে ওষুধ কি হত রে - ওষুধ আনতে-
আনতে যমের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যেত। আমারই তো
বাহাদুরি।।

সুগ্রীব - অর্থাৎ কিনা আমার বাহাদুরি—আমি বললুম তবে তো
বিভীষণ পাহারা দিল—আর বিভীষণ পাহারা দিল বলেই
তো যমদূতগুলো আটকা পড়ল।

জাম্বুবান - আরে ব্যাটা ওষুধের ব্যবস্থা করল কে? তোদের বুদ্ধি সে-
সময় উড়ে গিয়েছিল কোথায় ?

রাম - হ্যা, সেটা ঠিক—কিন্তু আমি যুক্তির কথা না জিজ্ঞেস
করলে তুমি হয়তো এখনও পড়ে নাক ডাকতে।

লক্ষ্মণ - আর আমি যদি শক্তিশেল খেয়ে না পড়তাম তবে তো এসব
কাণ্ডকারখানা কিছুই হত না— আর তোমরাও বিদ্যা
জাহির করতে পারতে না।”^{৬৩}

এইরূপ উক্তি-প্রতুক্তি শুনে দর্শক আর ভাবতে চান না রামায়ণের রাম-রাবণের যুদ্ধের
কি পরিণতি হয়েছিল। যেন লক্ষ্মণের জীবন পাওয়ার ঘটনায় রামায়ণের সমাপ্তির পালা
সূচিত হয়েছে। এইভাবে কাহিনিভাবনা বিশ্লেষণ করলে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না
যে নাট্যকার সুকুমার রায় পুরাতন রামায়ণের ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠা করেছেন আধুনিক
কালের মানুষের জীবনআখ্যান।

শুধু তা নয়, ‘লক্ষ্মণের শক্তিশেল’ নাটকের চরিত্রভাবনায় পুরাণসুলভ গাভীর
নেই। আছে সাধারণ মানুষ হয়ে ওঠার গৌরব। রামের অবাস্তব স্বপ্ন দেখা এবং রাবণের
সঙ্গে যুদ্ধে সুগ্রীব, হনুমানের ভয় পাওয়া এবং অজুহাত দেখিয়ে বিভীষণের পালিয়ে যেতে
চাওয়া- ইত্যাদি ঘটনা নিতান্তই সাধারণ ভীরা মানুষের আচার-আচরণের পরিচয় বহন
করেছে। নাট্যকার সুকুমার রায় রামায়ণের পৌরাণিক কাহিনিকে এমনভাবে পরিবেশন
করেছেন, যাতে আধুনিক পাঠক বা দর্শকের কাছে তা উপভোগ্যের বিষয় হয়ে ওঠে।
রাম- রাবণের যুদ্ধে সুগ্রীব রাবণকে দেখে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়। তখন রাবণ
বলেন— “ছি, ছি, ছি—এত গর্ব করে, এত আশ্বালন করে, শেষটায় চম্পট দিলি?”
লক্ষ্মণকে রাবণ শক্তিশেল দিয়ে মারার পরিকল্পনা করেছেন, সেটিও যেন অতি সাধারণ
ব্যাপার। রামের শিবিরের বাইরে গোলমালের আওয়াজ শুনে বিভীষণ ভয় পেয়েছেন,
রাবণ আসছেন বলে। তিনি জাম্বুবানকে বলেছেন—“আমার ছাতাটা কোথায় গেল? ব্যাগটা
?” আসন্ন বিপদের সংকেতে বিভীষণ নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে পালিয়ে যেতে
চেয়েছেন। রাবণের শক্তিশেলে লক্ষ্মণের মৃত্যুর পর রাম লক্ষ্মণকে বাঁচানোর জন্য শিবিরে
উপস্থিত সকল অনুচরকে অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু কেউই রামের কথা মতো
এগিয়ে আসতে চায়নি, নানা অজুহাত দেখিয়ে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। এমনকি
যম যখন লক্ষ্মণকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসেন, তখন লক্ষ্মণ বলেন—

“তুমি জ্যান্ত মানুষকে নিয়ে কারবার আরম্ভ করলে কবে
থেকে?”^{৬৪}

আবার লক্ষ্মণকে বাঁচানো দাবি নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমানের মধ্যে।
তারা কেউই নিজের ক্ষমতা ও গুরুত্ব কম হতে দিতে চাননি। এইভাবে হাসি মজার মধ্য
দিয়ে ‘লক্ষ্মণের শক্তিশেল’ নাটকটি রামায়ণ কাহিনির পুনর্নির্মাণ হয়ে উঠেছে। নাটকের

চারটি দৃশ্যের অন্তিমে নাট্যকার মহাকাব্যের মতো সর্গের নামকরণ করে নাটকের দৃশ্যগুলির সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। প্রথম দৃশ্যের অন্তিমে আছে— ‘ইতি সমাপ্তোয়ং লক্ষ্মণের শক্তিশৈলাভিধেয়স্য কাব্যস্য প্রথমো সর্গঃ’। দ্বিতীয় দৃশ্যের অন্তিমে আছে— ‘ইতি সমাপ্তোয়ং লক্ষ্মণের শক্তিশৈলাভিধেয়স্য কাব্যস্য দ্বিতীয়ো সর্গঃ’। তৃতীয় দৃশ্যের অন্তিমে রয়েছে— ‘ইতি সমাপ্তোয়ং লক্ষ্মণের শক্তিশৈলাভিধেয়স্য কাব্যস্য তৃতীয়ো সর্গঃ’। চতুর্থ দৃশ্যের অন্তিমে রয়েছে— ‘ইতি সমাপ্তোয়ং লক্ষ্মণের শক্তিশৈলাভিধেয়স্য কাব্যস্য চতুর্থো সর্গঃ’। এইভাবে নাট্যকার মহাকাব্য ও দৃশ্যকাব্যের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছেন। ফলে নাটকটির গঠনশৈলীতে অভিনবত্ব এসেছে। ভাষা ব্যবহারেও তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হাসি-মজার ভাষা ব্যবহার করে নাট্যকার পাঠককে আনন্দ দান করেছেন। তাই নাটকটিতে নানা চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে সমাজ প্রচলিত লঘু শব্দের ব্যবহার উঠে এসেছে। যেমন- ‘বেয়াদপ’, ‘চম্পট’, ‘হাঁড়িমুখো ভূত’, ‘বেআক্কেল’, ‘বাহাহরি’, ‘বকশিশ’ প্রভৃতি অজস্র শব্দ ও বাক্য, যা থেকে পাঠক বা দর্শক হাসির খোরাক খুঁজে পায়। তেমনি হাস্যকর ভাষার পরিচয় আমরা খুঁজে পাই দূতের মন্তব্যে -

“আজ্ঞে, আমি চান-টান করেই পুঁইশাক চচ্চড়ি আর কুমড়ো ছেঁচকি দিয়ে চাট্টি ভাত খেয়েই অমনি বেরিয়েছি- অবশ্যি আজকে পাঁজিতে কুম্ভাণ্ড ভক্ষণ নিষেধ লিখেছিল, কিন্তু কি হল জানেন? আমার কুমড়োটা পচে যাচ্ছিল কিনা-”^{৬৫}

নাটকে সমাজ প্রচলিত প্রবাদের প্রয়োগ রয়েছে প্রচুর। যেমন- ‘পিঁপড়ের পাখা উঠে মরিবার তরে’, ‘জোনাকি যেমতি হয়, অগ্নিপানে রুবি সম্বরে খদ্যোত লীলা’ ইত্যাদি। এছাড়াও নাটকের পরিবেশ সৃজনে প্রধান চরিত্রের পাশাপাশি অতি ক্ষুদ্র চরিত্রগুলি (বানরগণ) নানা ভাবে সহায়তা করেছে। পুরাণ কথা নিয়ে যে এইভাবে মজার নাটক লেখা যায়, তা দেখালেন নাট্যকার সুকুমার রায়। এর ফলে রামায়ণ কাহিনির পুনর্নির্মাণ হয়ে উঠল ‘লক্ষ্মণের শক্তিশৈল’ নাটকটি।

মানিক মণ্ডল - রাম রাবণের যুদ্ধ (২০১২);

নাট্যকার মানিক মণ্ডল রামায়ণের কাহিনি অবলম্বন করে ‘রাম-রাবণের যুদ্ধ’ নামের একটি নাটক লিখেছিলেন। নাটকটি ২০১২ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১৩ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটিতে প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (১), ভূমিকা (১), মূল নাটক (২০) সহ মোট ২৩টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ-

“কলাভূৎ পাবলিশর্স/ মানিক মণ্ডল/ রাম রাবণের যুদ্ধ/ ছয়-টি দিনবদলের সরস ব্যঙ্গ ছোট নাটকের সংকলন”^{৬৬}

নাটকের নামপত্রটি ও চরিত্রলিপিটি এইরূপ-

“বুঝবে খুড়ো বেলা হলেঃ ছয়/ রাম রাবণের যুদ্ধ/ চরিত্রলিপি / কথকঠাকুর/ রহিমা/ নারদ/ বৃহন্নলা/ বৃদ্ধ/ আরেফালি/ সৈনিক/ ইক্ষুরস/ কোরাস।”^{৬৭}

একটি অঙ্কে দৃশ্য বিভাজন ছাড়াই নাটকটির কাহিনি বিস্তার লাভ করেছে। নাটকটির মূল্য একশত কুড়ি টাকা।

নাটকের মূলভাবনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাম-রাবণের যুদ্ধের কাহিনি অবলম্বন করে। অর্থাৎ আদি রামায়ণের চিত্রচলিত ভাবনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু একালের নাট্যকার অতি কৌশলে তার মধ্যে বর্তমান সভ্যতার আশ্রাসন নীতি এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানুষের সোচ্চার প্রতিবাদকে বুনে দিয়েছেন দক্ষতার সঙ্গে। নাট্যকাহিনিতে তিনি প্রতীকী চরিত্র মুখে প্রশ্ন দিয়েছেন-

“কি অপরাধ ছিল রাক্ষসদের? কেন যুদ্ধ?”^{৬৮}

যুদ্ধে মানুষের কি লাভ হয়? বরং মনুষ্য সভ্যতায় হারাতে হয় অনেক অমূল্য প্রাণ ও সম্পদ। কিছু মানুষের ব্যক্তিগত লোভ-লালসায় এবং স্বার্থপরতার অন্তরালে বলি হয় সাধারণ মানুষের কোটি কোটি প্রাণ। তাই নাট্যকার এই নাটকটির মধ্য দিয়ে একরকম যুদ্ধের বিরুদ্ধে সভ্য মানুষকে প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বলেছেন, যুদ্ধের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। নাটকটি শুরু হয়েছে কথক ঠাকুরের মুখে রামের গুণকীর্তনের মধ্য দিয়ে-

“হে জীবসকল। বিষ্ণু অবতার শ্রীরামচন্দ্রের গুণকীর্তন শোনানোর ধৃষ্টতা আমার নেই। কারণ, আপনারা প্রত্যেকে সেই রাম অনুরক্ত রামভক্ত। প্রজাপতি ব্রহ্মার ইচ্ছায় সৃষ্ট এই ত্রিভুবন। তাঁর ইচ্ছায় ধ্বংস, তাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টি। তিনিই শেষ কথা। জীবসকল! স্বয়ং ব্রহ্মার ইচ্ছায় লঙ্কা

ধ্বংস হবে, গর্ভবতী মায়েরা প্রসব করবে মৃত সন্তান, শিশুরা হয়ে উঠবে মূক বধির, তবে লঙ্কায় কেন সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দন, তবে কি দেবশিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে সেখানে, ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টি- এ খেলার অধিকার তো একমাত্র তাঁর। জীবসকল! তেত্রিশ কোটি দেবদেবীকে উপেক্ষা করে দেবী নিকুম্ভিলার বরে দেবশিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে মর্ত্যে, মহাকাল রূপে। তাকে যে ধ্বংস করা চাই। অচ্ছুত নিচ জাতির দেবী নিকুম্ভিলার ইচ্ছাকে ধূলিসাৎ করার জন্য লঙ্কায় অবতীর্ণ দেবরাজ নারদ। যিনি স্বর্গ মর্ত্যের একমাত্র যোগসূত্র।”^{৬৯}

কথক ঠাকুরের কথামতোই নাটকের মধ্যে রহিমা কে আমরা পাই, যার গর্ভ থেকে জন্ম নেয় নিকুম্ভিলার বরে এক দেবশিশু। ইতিমধ্যে এক যুবকের কণ্ঠ থেকে ভেসে আসে তীব্র আর্তনাদ -

“বাঁচাও, বাঁচাও! চলে যাও তোমরা পাপ লঙ্কা ছেড়ে। মহারাজ কোথা থেকে এক বধূকে চুরি করে অশোকবনে বন্দি করে রেখেছে। সেই বধূকে উদ্ধার করতে এসে এক হনুমান ধরা পড়েছে। রাজভ্রাতা বিভীষণের কথা না শুনে মহারাজের আত্মীয়েরা সেই হনুমানের ল্যাজে কাপড় বেঁধে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। হনুমান দেহটাকে ছোটো করে লাফিয়ে পালায়, হনুমান যত লাফায় চারিদিকে তত আগুন জ্বলে ওঠে, ওই দেখ।”^{৭০}

এখানে হনুমানের লঙ্কা দগ্ধের কথা যতটা না বড়ো হয়ে উঠেছে, তার চেয়েও বেশি বড়ো হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের অসহায়তার কথা। এর পরেই রাম-রাবণের যুদ্ধ শুরু হয়। সেই যুদ্ধের ভয়ঙ্কর রূপ ধরা পরে কথক ঠাকুরের কথায় -

“জীবসকল! লঙ্কা জ্বলছে দাউ দাউ করে, মেঘবর্ণ ভাল্লুক, বানর হনুমানের দল সমুদ্রে সেতু বানিয়ে লঙ্কায় ঢুকে যুদ্ধ করছে। গর্ভবতী তালগাছগুলোর বুক ফেটে জ্বলছে, পোড়া শিশুপা গাছ অভিশাপ দিচ্ছে এই যুদ্ধকে। চারিদিকে মৃতের পাহাড়। চিল শকুনের দল মাটি খুঁড়ে মৃতদেহ ভক্ষণ করছে। ছিন্ন মুণ্ডগুলো পাহাড় থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে খরস্রোতা নদীকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। সমুদ্রে পৌঁছতে না পেরে নদী অভিশাপ দিচ্ছে যুদ্ধের বিরুদ্ধে। তারই মাঝে রাবণের সেনাপতি প্রহস্ত, অকম্পন, মহাদ্রষ্ট্রের নেতৃত্বে সৈন্যের দল মৃতদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করছে,

যাতে মৃতের হিসাব না পাওয়া যায়। এ এক ভয়াবহ, বীভৎস যুদ্ধ চলছে লঙ্কায়। কত মা সন্তানহারা, আত্মীয়বিয়োগের কান্নার রোল, বাতাসকে স্তব্ধ করেছে। প্রতিনিয়ত খুন হচ্ছে মেয়েরা- এই কি যুদ্ধ হল যুদ্ধের খবর চাপা দেওয়ার কত কৌশল। বেয়নেটের খোঁচায় যে শিশুটার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে পিত্তথলি, তার কি দোষ হল? পৃথিবীর কাছে মুক্ত বাতাস, আর খিদের জ্বালায় কেঁদেছিল এই তার অপরাধ? তক্ষশীলা গ্রামের সকলেই প্রায় গ্রাম ছেড়ে গুহায় আশ্রয় নিয়েছে যুদ্ধে যাওয়ার ভয়ে। এ গ্রামে যুবক বলতে কেউ নেই, গুটিকয়েক মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ-বৃদ্ধার করুণ আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। আরেফালি যুদ্ধে যাওয়ার ভয়ে কয়েকদিন গোলার ভিতর লুকিয়েছিল। এরই মাঝে রাবণের সেনাপতি প্রহস্তের নেতৃত্বে সৈনিকেরা ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে সৈন্য সংগ্রহের জন্য।”^{৭১}

রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাকে হরণ করে নিজে যে পাপ করেছেন, সেই পাপের শাস্তি পেতে হবে সাধারণ প্রজাকে। এ কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল একেবারে সাধারণ এক লঙ্কাবাসী মানুষ আরেফালির কথায় -

“আমায় বিদায় দে, লঙ্কায় আজ বড়ো দুর্দিন। একে একে বীর যোদ্ধারা নিহত, রাজা যদি পাপ করে প্রজা হয়ে রক্ত দিয়ে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে দেশমাতাকে রক্ষা করতে হবে - এই দেখ, রথ প্রস্তুত, ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।”^{৭২}

এই নাটকে পৌরাণিক পরিবেশ থেকেও বড়ো হয়ে উঠেছে আধুনিক মানুষের জীবন ভাবনার কথা। বলাবাহুল্য পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনকথাকে নাট্যকার অতি সুকৌশলে পরিবেশন করেছেন। এসেছে ইক্ষুরস নামে একটি অতি সাধারণ চরিত্রের কথা, যার জীবনে স্বপ্ন আছে, মায়ের প্রতি মমত্ব আছে, প্রেমিকার প্রতি ভালোবাসা আছে। নেই শুধু ভালো করে বেঁচে থাকার অধিকার। তাই রহিমা যখন তাকে খুন করতে চেয়েছে, তখন সে নির্দিধায় বলেছে -

“করবে খুন, কর। যদি আমার এই মাথাটা কাটো, তাহলে দেখবে, এ মাথাতেও তোমার স্বামীর মাথার মতো লেখা, কেন এই যুদ্ধ, যদি এই বুকটা চিরে হৃদয়টা বার কর, সেখানেও দেখবে তোমার স্বামীর হৃদয়ের মতোই, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ভরা। হয়তো তোমার স্বামী রাম-রাবণের দু

পক্ষের মাঝে দাঁড়িয়ে গান গেয়েছিল, বলেছিল, ওগো বন্ধ কর তোমাদের এই ভাইয়ে ভাইয়ে খুনোখুনি খেলা, হয়তো দু-পক্ষের তির এসে তোমার স্বামীর কণ্ঠটা দ্বি-খণ্ডিত করেছিল, দেখ দেখ তোমার স্বামীর কাটা মুণ্ডু কেমন লাফাচ্ছে, আর বলছে হায়, মানুষ সভ্য হতে আর কত দিন!”^{৭৩}

ইক্ষুরসের এই কথায় যেন চিরকালীন সভ্য জগতের শান্তিপ্রিয় মানুষের প্রশ্ন উঠে এসেছে— ‘মানুষ সভ্য হতে আর কত দিন!’ কথক ঠাকুর একইভাবে ঐ সূত্র ধরে বলেছেন –

“রাম-রাবণের যুদ্ধ তখন শেষ, ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাতে দশানন রাবণ খতম। মৃত্যুর আগে রাবণ রাঘব-রামচন্দ্রের পদযুগল বক্ষে ধারণ করে বলছে, প্রভু আমি চোর, কিন্তু আমি যদি সীতা মাকে চুরি না করতাম তুমি তো আমার লঙ্কায় আসতে না!”^{৭৪}

এখানে রাবণ রামের বিরোধী নন। তিনি রামের একনিষ্ঠ ভক্ত। শুধু রামকে লঙ্কায় আনার জন্য সীতামাকে হরণ করেছেন এবং রামের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়েছেন। তাই যুদ্ধের সমাপ্তিতে রাবণ রামের পদযুগল বক্ষে ধারণ করে গানের সুরে বলেছেন –

“ধরো চোরকে ধরো বন্দি করো
হে রাম রাখো চোরে
এ জনমের মতো বন্দি কর চরণ কারাগারে
ধরো চোরকে ধরো.....
রাবণ আর কি বলছে কি? রাবণ বলে –
যদি বান্দা হয় অন্তরে
চোরকে দিও দিপান্তরে
স্থান দিতে রাম করো মানা
জননী জন্ম জঠরে”^{৭৫}

কথক ঠাকুরের প্রশ্ন দিয়ে নাট্যকাহিনীর সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছে। কথক ঠাকুর বলেছেন—

“রাম-রাবণের মধ্যে মিলন হয়ে গেল। অর্থাৎ আ-গলে লাগ জা হয়ে গেল দুই শত্রুর মধ্যে। তাহলে ইক্ষুরসের অপরাধ? কি অপরাধ ছিল রাক্ষসদের ? কেন যুদ্ধ? এ দৃশ্য দেখে ইক্ষুরস কাঁদতে কাঁদতে প্রভু রামচন্দ্রকে বলল, প্রভু তাহলে তোমাদের এই যুদ্ধ সাজানো? তাহলে

কেন এতো মৃত্যু। এ যুদ্ধ বুঝি আগে থেকে ঠিক করা ছিল! কেন কেন কেন?”^{৭৬}

যদি রাম-রাবণের এই রকম মিলন হয়, তাহলে যুদ্ধের আর কোনো অর্থ থাকে না। কিন্তু এত প্রাণ বলি হলো কেন? এই প্রশ্ন নাট্যকার রেখেছেন রামের কাছে, রাবণের কাছে, আমাদের সভ্যতার লোভী- মানুষের কাছে; যাঁরা অন্যায় করে সভ্যতায় কলঙ্কের অধ্যায় তৈরি করে। নাট্যভাবনার ব্যাপ্তি সত্যই আধুনিক এবং চিরন্তন। এইভাবে রামায়ণের কাহিনির পুনর্নির্মাণ ও বিনির্মাণ হয়েছে।

‘রাম রাবণের যুদ্ধ’ নাটকের কাহিনির পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান চরিত্র হওয়া উচিত ছিল দুটি- রাম ও রাবণ। কিন্তু তা হয়নি, সেখানে সাধারণ মানুষের কথাই প্রধান হয়েছে। কথকঠাকুর, রহিমা, নারদ, বৃহন্নলা, বৃদ্ধ, নিকুন্ডীলা, সৈনিক, যুবক, ইক্ষুরস, আরেফালি প্রভৃতি চরিত্রগুলি রাম-রাবণের যুদ্ধের বীভৎসতা প্রকাশ করেছে নানা ভাবে। লঙ্কার এক সৈনিক সমস্ত যুবকদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছে—

“শুনুন, শুনুন, শুনুন লঙ্কায় আজ বড় দুর্দিন। মহারাজের হুকুম দেশমাতাকে রক্ষা করার জন্য সমস্ত যুবকদের যুদ্ধে যাওয়ার আহ্বান করা হচ্ছে। অন্যথায় দেশদ্রোহী বলে তাদের শিরোচ্ছেদন করা হবে।”^{৭৭}

আরেফালিকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে রহিমাকে ছেড়ে যেতে হয়, যদিও তাদের কাছে যুদ্ধের কোনো অর্থ নেই। যুদ্ধে যেতে বাধ্য করেছে রাজ-প্রশাসন, তাই তাদের মতো সাধারণ মানুষ মৃত্যুকে বরণ করতে চলেছে। রাম-রাবণের যুদ্ধে রহিমার শিশুসন্তান মারা গেছে। ইক্ষুরস রহিমাকে দুঃখের সঙ্গে বলেছে—

“তুমি আমি শত্রু হতে পারি, এই শিশুর তো কোনো দোষ নেই। ও তো পবিত্র, ফুলের মতো।”^{৭৮}

লঙ্কার যুদ্ধে একের পর এক বীর যোদ্ধারা মারা গেছেন, মেঘনাদ লঙ্কণের হাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আরেফালি যুদ্ধে যাওয়ার পর রহিমা পাগলের মতো জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে; কখনও পাহাড়ে বসে বুক চাপড়ে স্বামীর কথা ভেবে কেঁদেছে। ইক্ষুরস অদ্ভুতভাবে একা একা গদা ঘুরিয়েছে এবং পাগলের মতো নানা কথা বলেছে। লঙ্কার ছন্দোময় জীবনে সবকিছুই এলোমেলো হয়ে গেছে রাম-রাবণের যুদ্ধে। একসময় চরিত্রগুলির কাছে জীবনের কোনো অর্থ থাকে না। ইক্ষুরসের ভালোবাসা পরিণতিতে পৌঁছাতে পারে না। যুদ্ধের অন্তিম পর্বে রাম-রাবণের মিলন দেখে ইক্ষুরস প্রশ্ন করে

রামচন্দ্রকে, এইরকম সাজানো যুদ্ধের কারণ কি? তখন ইক্ষুরসের কপালে দুর্ভোগ নেমে আসে। কিছু রাক্ষস সেনা তাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে এবং ফেলে দেয় হাজার ফুট নিচে গর্তে। এ প্রশ্ন ইক্ষুরসের শুধু নয়, এ প্রশ্ন আপামর সাধারণ মানুষের। যারা নির্মমভাবে যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়, ধ্বংস হয়, যাদের প্রাণ যায় বারবার। আসলে নাট্যকার মানিক মণ্ডল ‘রাম-রাবণের যুদ্ধ’ নাটকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তির পক্ষে জোরালো সমর্থন খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তবে পৌরাণিক পটভূমি গ্রহণ করেছেন নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্যে। এর ফলে নাটকটি পুনর্নির্মিত ও বিনির্মিত হয়েছে। তাঁর এই কাজকে তরাণিত করেছে আধুনিক জীবন সংলাপের প্রয়োগ। যেমন নারদের সংলাপে ধরা পড়েছে সমাজ ধর্মের বাস্তবতার পরিচয় -

“নারায়ণ! নারায়ণ! অযোধ্যার আজ বড় দুর্দিন। এই দুর্দিনে তোদের এগিয়ে আসতে হবে সমবেতভাবে, মনে রাখতে হবে এ লড়াই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের। দুরাচারী ভণ্ড কাপুরুষ রাবণ পরনারী সীতা মাকে ছুরি করে বন্দী করে রেখেছে। ওঠো জাগো, নাভিকুণ্ডুলী থেকে উচ্চারণ কর জয় শ্রীরাম।”^{৭৯}

-এইভাবে নাটকটি সবদিক থেকেই আধুনিক রূপ লাভ করেছে। নাটকের চরিত্র, ভাষা, যুদ্ধের ঘটনা প্রভৃতি রামায়ণের চিরপরিচিত কাহিনির মধ্যে নাট্যকার অতি সচেতনভাবে যুক্ত করেছেন আধুনিক জীবনের নানা প্রশ্ন, যুদ্ধ বিরোধী মানসিকতা। এইভাবে পৌরাণিক রামায়ণের কাহিনিকে পুনর্নির্মাণ করেছেন মানিক মণ্ডল।

খ) মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে রচিত নাটকঃ-

কেবল রামায়ণ কাহিনির পুনর্নির্মাণে রচিত নাটক নয়, মহাভারতের কাহিনি নিয়েও অনেক নাট্য পুনর্নির্মাণ দেখা যায় একালে। প্রতিটি নাটকে মহাভারতের কাহিনি, চরিত্র, পরিবেশকে নতুনভাবে পরিবেশন করতে চেয়েছেন নাট্যকারগণ। একালে এই জাতীয় চর্চা যে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তা খুব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। কারণ নাটকগুলির ভাষা, চরিত্র, সংলাপ এবং সর্বোপরি অভিনয়ের সফলতা নাট্যকারদের এইরূপ নাটক রচনায় প্রলুব্ধ করেছে। এই জাতীয় কয়েকটি নির্বাচিত নাটকের আলোচনা আমাদের এই পর্বের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত – শর্মিষ্ঠা নাটক (১৮৫৯);

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাভারতের আদিপর্ব থেকে যযাতি উপাখ্যানটি গ্রহণ করে ‘শর্মিষ্ঠা’ নামের একটি নাট্য পুনর্নির্মাণ রচনা করেন। ২০ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১৩ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটিতে প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (২), মঙ্গলাচরণ পত্র (১), প্রস্তাবনা পত্র (১), মূল নাটক (৫৮) সহ মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৩টি। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ –

“শর্মিষ্ঠা নাটক/ মাইকেল মধুসূদন দত্ত/ ১৫ই পৌষ, সন ১২৬৫ সাল”^{৮০}

নাটকের আখ্যান-পত্রটি এইরূপ-

“শর্মিষ্ঠা নাটক/ শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত।/ মন্দঃ কবিশঃপ্রার্থী গমিব্যামুপহাস্যতাং।/ প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বারহরিব বামনঃ।/ কালিসাস। কলিকাতা।/ শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যক ভবনে / ইষ্টানহোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত।/ সন ১২৬৫।”^{৮১}

‘মঙ্গলাচরণ’ পত্রে মাইকেল মধুসূদন বলেছেন-

“মদেকসদয়বর/ শ্রী শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর,/ তথা/ শ্রী শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর/ মহোদয়েষু।/ নমস্কার পুরঃসর নিবেদনমিদং,/ আমি এই দৈত্য-রাজবালা শর্মিষ্ঠাকে মহাশয়দিগকে অর্পণ করিতেছি। যদ্যপি ইনি আপনাদের এবং শ্রোতৃবর্গের অনুগ্রহের উপযুক্ত পাত্রী হয়েন, তবে আমার পরিশ্রম সফল হইবে এবং আমিও কৃতকার্য হইব।/ মহাশয়দিগের বিদ্যানুরাগে এ দেশের যে কি পর্য্যন্ত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য। আমি এই প্রার্থনা করি যে, আপনাদিগের দেশহিতৈষিতাদি গুণরাগে এ ভারতভূমি যেন বিদ্যাবিষয়ক স্বীয় প্রাচীন শ্রী পুনর্দ্বারণ করেন। ইতি—/ ১৫ই পৌষ, সন ১২৬৫ সাল।/ কলিকাতা / শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্তস্য।”^{৮২}

নাটকটির মূল্য পঞ্চাশ টাকা। প্রস্তাবনা পত্রে নাট্যকার মধুসূদন লিখেছেন—

“মরি হায়, কোথা সে সুখের সময়,/ যে সময় দেশময় নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময়।/ শুন গো ভারত-ভূমি, কত নিদ্রা যাবে তুমি,/ আর নিদ্রা

উচিত না হয়।/ উঠ ত্যজ ঘমঘোর, হইল ভোর দিনকর প্রাচীতে উদয়।/
কোথা বাল্মীকি, ব্যাস, কোথা তব কালিদাস/ কোথা ভবভূতি মহোদয়।/
অলীক কুনাটা রঙ্গে, মজে লোক রাড়ে বঙ্গে,/ নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।/
সুধারস অনাদরে বিষ-বারি পান করে,/ তাহে হয় তনু মনক্ষয়।/ মধু
বলে জাগো মাগো, বিভুস্থানে এই মাগ,/ সুরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয়
নিচয়।”^{৮৩}

‘শর্মিষ্ঠা’ নাটকে মধুসূদন যযাতি-দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার কাহিনিকে আধুনিক রুচিসম্মত করার জন্য আবশ্যিক মতো পরিবর্তন করেছেন। সেক্ষেত্রে কাহিনির মূল ভাবনাকে অক্ষুণ্ণ রেখে নাটকে পুনর্নির্মাণ করেছেন চরিত্রগুলিকে। কাহিনিতে একজন পুরুষ, দুইজন নারীর টানটান রোমান্টিক প্রণয় ঘটনা একালের দর্শকমহলের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বলাবাহুল্য মধুসূদনের এই ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটকটি প্রথম সার্থক আধুনিক বাংলা নাটক। এখানে মোট পাঁচটি অঙ্ক আছে। প্রথম অঙ্কে দুটি গর্ভাঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি গর্ভাঙ্ক, চতুর্থ অঙ্কে তিনটি গর্ভাঙ্ক এবং পঞ্চম অঙ্কে দুটি গর্ভাঙ্ক আছে। নাটকের সূচনায় দেখা যায় হিমালয় পর্বত, দূরে ইন্দ্রপুরী- অমরাবতী। সেই হিমালয় পর্বতে গোপনে বসবাস করেন একজন দৈত্য, যে প্রতাপশালী দৈত্যরাজের অনুচর। যে দেবতাদের গতিবিধির খবরাখবর নেওয়ার জন্যই এই স্থানে বসবাস করছে। তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে আর এক দৈত্য বকাসুর। দু’জনের কথোপকথনে মধ্যে উঠে এসেছে মূল কাহিনির দুই নারী চরিত্র শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর সংঘাতের কথা। সেই প্রসঙ্গে তাদের সংলাপের একটি নাট্য মুহূর্ত-

“বক।। ভাই হে, তার আর বলবো কি? অন্য দৈত্যকুলের একপ্রকার পুনর্জন্ম।

দৈত্য।। কেন কেন মহাশয়?

বক।। মহর্ষি শুভ্রাচার্য্য ক্রোধাঙ্ক হয়ে দৈত্য -দেশ পরিত্যাগে উদ্যত হয়েছিলেন।

দৈত্য।। কি সর্বনাশ! এ কি অদ্ভুত ব্যাপার, এর কারণ কি?

বক।। ভাই, স্ত্রীজাতি সর্বত্রই বিবাদের মূল। দৈত্যরাজকন্যা শর্মিষ্ঠা গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত কলহ করে, তাঁকে এক অন্ধকারময় কূপে নিক্ষেপ করেন, পরে দেবযানী এই কথা আপন পিতা

তপোধনকে অবগত করালে, তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হতাশনের
ন্যায় একবারে জ্বলে উঠলেন। আঃ? সে ব্রহ্মাগ্নিতে যে আমরা
সনগর দগ্ধ হই নাই, সে কেবল দেবদেব মহাদেবের কৃপা,
আর আমাদের সৌভাগ্য।”^{৮৪}

তাদের কথায় জানা যায় যে দেবযানীর উপর শর্মিষ্ঠা অন্যায় আচরণ করেছে। এই
ঘটনায় দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য ভয়ঙ্কর রেগে যান। দৈত্যরাজ সভায় উপস্থিত হয়ে শুক্রাচার্য্য
ক্রোধের সঙ্গে জানান—

“রাজন্! অদ্যাবধি তুমি শ্রীভ্রষ্ট হবে, আমি এই অবধি এ স্থান
পরিত্যাগ কল্যেম, এ পাপ নগরীতে আমার আর অবস্থিতি করা
কখনই হবে না।”^{৮৫}

এ কথা শুনে দৈত্যরাজ হাতজোড় করে নতজানু হয়ে গুরুদেবের কাছে ক্রোধের কারণ
জানতে চান। শর্মিষ্ঠার অন্যায় আচরণ যে তাঁর রাগের কারণ, সে কথা জানতে পারেন।
দৈত্যরাজ শর্মিষ্ঠার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য গুরু শুক্রাচার্য্যের কাছেই বিধান চান।
তখন গুরুদেব বলেন—

“এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি আছে? তোমার কন্যা চিরকাল দেবযানীর দাসী
হয়ে থাকুক, আমার এই ইচ্ছা।”^{৮৬}

সেই সঙ্গে তিনি একথাও বলেন যে যদি দৈত্যরাজ তা না মানেন, তাহলে দৈত্যরাজ্যের
শ্রীভ্রষ্ট হবে এবং দেবগণের দ্বারা পরাজিত হয়ে নানা রকম দুঃখ-কষ্ট পাবেন। কিন্তু
শর্মিষ্ঠা দৈত্য গুরুর আদেশমত দেবযানীর দাসী হতে কোনরূপ দ্বিধাশ্রিত হননি।
একদিকে পিতাকে রক্ষা করা, অন্যদিকে দৈত্যরাজ্যের শান্তির কথা ভেবে শর্মিষ্ঠা
রাজবাড়ি ছেড়ে চলে আসেন শুক্রাচার্য্যের পর্ণকুটীরে। নিজের ভুলের জন্য শর্মিষ্ঠা
প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছেন, কিন্তু এর জন্য তাঁর মধ্যে কোনো অনুশোচনা ছিল না।
শর্মিষ্ঠার এই পরিণতিতে সখী দেবিকা যখন আক্ষেপ করেন, তখন শর্মিষ্ঠা তাকে বলেন—

“সখি! যদিও আমি দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধা, তথাপি ত’ আমি রাজভোগে
বঞ্চিতা হই নাই। এই দেখ, আমার মনে সেই সকল সুখই রয়েছে। এই
অশোক বেদিকা আমার মহার্ঘ সিংহাসন। (বেদিকোপরি উপবেশন) এই
তরুণর আমার ছত্রদন্ত, ঐ সম্মুখস্থ সরোবরে বিকসিত কুমুদিনীই আমার
প্রিয়সখী। মধুকর ও মধুকরীগণ গুন্ গুন্ স্বরে আমারই গুণকীর্তন কচে।

স্বয়ং সুগন্ধ মলয়-মারুত আমার বীজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়েছে; চন্দ্রমন্ডল নক্ষত্রগণ সহিত আমাকে আলোক প্রদান কচেন। সখি! ঐ সকল কি সামান্য বৈভব? আমাকে এত সুখভোগ করতে দেখেও তোমার কি আমাকে সুখভোগিনী বলে বোধ হয় না?”^{৮৭}

শর্মিষ্ঠা নিজের কৃতকার্যের জন্য বিধাতাকে দোষ দিতে চাননি। তবে পিতা-মাতার কষ্টের জন্য তাঁর অন্তরে দুঃখ আছে। তিনি ঈশ্বরের উপর ভরসা করেন। অন্যদিকে দেবযানী ও পূর্ণিকার কথোপকথন থেকে উঠে আসে অন্ধকূপে নিক্ষেপের কাহিনি এবং রাজা যযাতির সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের প্রসঙ্গ। দেবযানী তাঁর প্রিয় সখীর কাছে সে কথার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—

“শর্মিষ্ঠা আমাকে কূপে নিক্ষেপ করলে পর আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞানাবস্থায় পতিত ছিলাম; পরে কিঞ্চিৎ চেতন পেয়ে দেখলেম যে চতুর্দিক কেবল অন্ধকারময়। অনন্তর আমি ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে আরম্ভ করলেম। দৈবযোগে এক মহাত্মা সেই স্থান দিয়ে গমন করছিলেন, হঠাৎ কূপমধ্যে হাহাকার আর্তনাদ শুনে নিকটস্থ হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কে, আর কি জন্যই বা কূপের ভিতর রোদন কচো?” প্রিয়সখি! তৎকালে এরূপ মধুর বাক্য শুনে আমার বোধ হলো, যেন বিধাতা আমাকে উদ্ধার করবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন। তিনি কে, আমি কিছুই নির্ণয় করতে পারলেম না, কেবল ক্রন্দন করতে করতে মুক্তকণ্ঠে এইমাত্র বললেম, “মহাশয়! আপনি দেবই হইন বা মানবই হউন, আমাকে এই বিপজ্জাল হতে শীঘ্র বিমুক্ত করুন”। এই কথা শুনিবামাত্র, সেই দয়ালু মহাশয় তৎক্ষণাৎ কূপমধ্যে অবতীর্ণ হয়ে আমাকে হস্তধারণপূর্বক উত্তোলন করলেন। আমি উপরিস্থা হয়ে তাঁর অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে একাবারে বিমোহিত হলেম্। সখি! বললে প্রত্যয় করবে না, বোধ হয় তেমন রূপ এ ভূমণ্ডলে নাই।”^{৮৮}

এই অন্ধকূপের ঘটনাতেই দেবযানী ও যযাতির প্রথম দেখা হয়। যযাতি তাঁকে অন্ধ কূপ থেকে উদ্ধার করেন। উদ্ধারকারীর প্রতি দেবযানীর পূর্বরাগ জন্মায়, যা নারী হৃদয়ে প্রেমের প্রথম অবস্থা। যযাতি দেবযানীর পরিচয় পাওয়ার পর বলেন —

“ভদ্রে! আপনি ভগবান ভার্গবের দুহিতা? আমি ঋষিবরকে জানি, তিনি একজন ত্রিভুবনপূজ্য পরম দয়ালু ব্যক্তি ; আপনি তাঁকে আমার শত

সহস্র প্রণাম জানাবেন, আমার নাম যযাতি—আমার চন্দ্রবংশে জন্ম। হে ঋষিতনয়ে। এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি বিদাই হই।”^{৮৯}

দেবযানীর মনে যেমন রাজার প্রতি ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছে, তেমনি রাজা যযাতির মনেও দেবযানীর প্রতি অনুরাগ জন্মায়(জন্মেছে)। এখানে দেবযানীর চরিত্রে বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার সদৃশ্য প্রেমব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। পিতা শুক্রাচার্য কন্যার হৃদয়বর্তার কথা জানতে পারেন পূর্ণিকার কাছ থেকে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন সুবিজ্ঞতম প্রধান শিষ্য কপিলকে রাজর্ষির সান্নিধ্যে পাঠাবেন দেবযানীর বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে। যথারীতি রাজা যযাতি রাজকীয় নিয়মে দৈত্যগুরু ভার্গবের কন্যা দেবযানীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। এই সূত্র ধরে শর্মিষ্ঠাও দেবযানীর দাসীরূপে প্রতিষ্ঠাপুরীতে এসে উপস্থিত হন। একসময় রাজা যযাতির সঙ্গে শর্মিষ্ঠার সাক্ষাৎ, প্রণয় এবং গন্ধর্ব মতে বিবাহ হয়। রাজা যযাতি শর্মিষ্ঠাকে পত্নীর মর্যাদা দেন এবং বলেন—

“প্রিয়ে, আমি সূর্য্যদেব ও দিগ্গুণকে সাক্ষী করে এই তোমার পাণিগহণ করলেম, (হস্ত ধারণ) তুমি অদ্যাবধি আমার রাজমহিষী-পদে অভিষিক্তা হলে।”^{৯০}

রাণী দেবযানী কিছুকাল পরে এই ঘটনা জানতে পারেন। এখান থেকেই কাহিনিতে শুরু হল সপত্নী বিরোধ। তখন তাঁর দুই পুত্র জন্ম নিয়েছে, আর শর্মিষ্ঠার তিনটি পুত্র। দেবযানী শর্মিষ্ঠার প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষবশত এবং রাজা যযাতির প্রতি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিষ্ঠানপুরী ত্যাগ করে দৈত্যরাজ্যে পিতা শুক্রাচার্যের কাছে যাওয়ার জন্য পথে বার হন। পথেই পিতার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, পিতাকে সমস্ত বিবরণ জানান এবং পিতাকে বাধ্য করেন যযাতিকে জরাগ্রস্ত করার অভিশাপ দিতে। পিতা শুক্রাচার্য কন্যাকে কথা দেন এবং পুনরায় রাজবাড়িতে ফিরে যেতে বলেন। সখী দেবীকা যখন শর্মিষ্ঠার কাছে এই অন্যায় কাজের জন্য দেবযানীকে নিন্দা করেন, তখন শর্মিষ্ঠা বুদ্ধিমতী নারীর মতো তাঁকে বলেন-

“তবে সখি, দেবযানীকে কি তোমার ভর্সনা করা উচিত? পতিপরায়ণা স্ত্রীর পতি অপেক্ষা আর প্রিয়তম অমূল্য রত্ন কি আছে বল দেখি?”^{৯১}

রাজা যযাতি শুক্রাচার্যের অভিশাপে জরাগ্রস্ত হওয়ার পর নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র যদুকে ডেকে বলেন —

“হে পুত্র, মহামুনি শুক্রেণ অভিষাপে আমি জরাগ্রস্ত হয়ে অত্যন্ত ক্লেশ পাচ্ছি; তুমি আমার বংশের তিলক, তুমি আমার এই জরারোগ সহস্র বৎসরের নিমিত্তে গ্রহণ কর, তা হলে আমি এ পাপ হতে পরিত্রাণ পাই। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার এ সহস্র বৎসর স্রোতের ন্যায় অতি ত্বরায় গত হবে। হে প্রিয়তম! জরারোগ হতে পরিত্রাণ পেলে আমার পুনর্জন্ম হয়, তা তুমি আমাকে এই ভিক্ষা দাও, আমাকে এ পাপ হতে কিয়ৎকালের জন্য মুক্ত করো”^{৯২}

কিন্তু পুত্ররা কেউই তাঁর জরারোগ গ্রহণ করতে রাজি হন না। একমাত্র শর্মিষ্ঠার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার চরণে প্রণাম করে জানান—

“পিতঃ, আপনি কি আমাকে বালক দেখে ঘৃণা কল্যেন? আপনার এ জরারোগ আমি গ্রহণ কত্যা প্রস্তুত আছি, আপনি আমাতে এ রোগ সমর্পণ করে স্বচ্ছন্দে রাজ্যভোগ করুন। আপনি আমার জীবনদাতা, - আপনি এ অতি সামান্য কর্ম্মে যদি পরিতৃপ্ত হন, তবে এ অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি আছে?”^{৯৩}

পিতার জন্য পুত্রের এই আত্মত্যাগ চিরকাল মানুষ মনে রাখবে। এই কাজের জন্য গুরু শুক্ৰাচার্য পুরুকে চন্দ্রবংশের প্রধান হওয়ার আশীর্ব্বাদ করেন এবং শর্মিষ্ঠাকে শাপমুক্ত করেন। রাজা যযাতি জরামুক্ত হলেন। এইভাবে শর্মিষ্ঠা নাটকটির পরিণতিতে মহামিলনের কীর্তিপতাকা উড্ডীন হল। এর ফলে নাটকটি একালের জীবনচেতনায় অভিনব আখ্যানরূপে পুনর্নির্মিত হল।

‘শর্মিষ্ঠা’ নাটকের চরিত্রগুলি মহাভারতের আদিপর্ব থেকে নাট্যকার মধুসূদন গ্রহণ করলেও চরিত্রগুলিকে একবারও সেকালের বলে মনে হয় না। শর্মিষ্ঠা, দেবযানী, দেবিকা, পূর্ণিকা- প্রতিটি নারী একালের। তাঁদের ভাবনা, সহনশীলতা, সহজাত নারী ঈর্ষার সংঘাত এবং সপত্নী বিরোধ- সমস্ত কিছুই যেন আধুনিক মানুষের চিন্তা-চেতনা থেকে উদ্ভূত, একেবারে নতুন। শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করেছিলেন, তা মূলত উন্মত্ত যৌবনের ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে। পরবর্তী সময় তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন। তাই অনুশোচনা না করে বরং নিজেই প্রায়শ্চিত্তের পথ ধরেন। দৈত্যগুরু শুক্ৰাচার্যের আদেশমত রাজবাড়ি ত্যাগ করে অরণ্য পরিবেশকে আপন করে নেন। দেবযানীর দাসী হয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দেন। এই প্রায়শ্চিত্ত সাধারণ কোন

নারীর নয়, দৃঢ় সংকল্পে প্রতিষ্ঠিত মহীয়সী এক নারীর। শর্মিষ্ঠা তার সখী দেবিকাকে বলেছেন এই ঘটনার জন্য অন্য কেউ দায়ী নন, তিনি এর জন্যে নিজেই দায়ী-

“তবে তুমি বিধাতাকে আমার জন্যে দোষ দেও কেন? বিধাতার এ বিষয়ে দোষ কি? গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত আমার বিবাদ-বিসম্বাদ না হলে ত’ আমাকে এ দুর্গতি ভোগ করতে হতো না! দেখ, পিতা আমার দৈত্যরাজ; তিনি প্রতাপে আদিত্য, আর ঐশ্বর্যে ধনপতি; তার বিক্রমে দেবগণও সশঙ্কিত; আমি তাঁর প্রিয়তম কন্যা। আমি আপন দোষে এ দুর্দশায় পতিত হয়েছি- আমি আপনি মিষ্টান্নের সহিত বিষ মিশ্রিত করে ভক্ষণ করেছি, তায় অন্যের দোষ কি?”^{৯৪}

শর্মিষ্ঠার এই ভাবনায় তাঁর বিচক্ষণ, সুস্থ, স্বাভাবিক নারীর মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। শর্মিষ্ঠা এখানে যুক্তিবাদী আধুনিক নারী হয়ে উঠেছেন। আবার যযাতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং গন্ধর্ব মতে বিবাহ হওয়ার জন্য দেবযানীর ক্রোধের কারণটিও তিনি যুক্তি সঙ্গতভাবে মানেন। শর্মিষ্ঠা সে কথা সখী দেবিকাকে বলেছেন-

“সখি, তুমি কেন দেবযানীকে নিন্দা কর? তার এ বিষয়ে অপরাধ কি? যদিও আমি কোন মহামূল্য রত্নকে পরম যত্ন করি, আর যদি সে রত্নকে কেউ অপহরণ করে, তবে অপহর্তাকে কি আমি তিরস্কার করি না?”^{৯৫}

কোনরূপ অজানা শক্তিকে বা দেবতাকে শর্মিষ্ঠা নিজের ভাগ্যের জন্য দায়ী করতে চান না। শর্মিষ্ঠা প্রকৃত আধুনিক নারী। মধুসূদনও পুরাণের এই চরিত্রটিকে নাটকের অবয়বে নতুনভাবে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে নির্মাণ করেছেন এবং তাঁকেই কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদা দিয়েছেন। দেবযানী রূপবতী গুরুকন্যা। তাঁর মধ্যে রূপের মোহ আছে। তিনি যযাতিকে প্রথম দেখাতেই হৃদয় নিবেদন করেছেন। পরবর্তী সময় যযাতির সঙ্গে বিবাহও হয়েছে এবং তিনি প্রতিষ্ঠান পুরীতে রাণীর মর্যাদা লাভ করেছেন। অথচ তাঁর মধ্যে সাধারণ নারীর মতো ক্ষোভ দেখা গেছে। রাজা যযাতী যখন শর্মিষ্ঠাকে গন্ধর্ব মতে বিবাহ করেন, তখন দেবযানী প্রচণ্ড ক্ষোভে, দুঃখে রাজবাড়ী ত্যাগ করেছেন। পিতা শুক্রাচার্যকে দিয়ে জোর করিয়ে স্বামীকে অভিশাপগ্রস্ত করিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তী সময় তাঁর মধ্যে নিজের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ অনুভূত হয়েছে। তিনি সখী পূর্ণিকাকে অনুশোচনা করে বলেছেন-

“হায়! হায়! সখি, আমার মতন চণ্ডালিনী কি আর আছে? আমি আমার হৃদয়নিধি সাধ করে হারালেম, আমার জীবন-সর্বস্বধন হেলায় নষ্ট কল্যেম, পতিভক্তি হতেও কি আমার ক্রোধ বড় হলো? হায়! হায়! আমি

স্বেচ্ছাক্রমে আপনার মন্থথকে ভস্ম কল্যেমা! হে জগন্মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি আমার মতন পাপীয়সী স্ত্রীর ভার যে এখনও সহ্য কচ্যো?”^{৯৬}

রানী দেবযানী নিজেই স্বামীর শাপ মুক্তির পথ বার করেন এবং তাঁকে মুক্ত করেন। এইভাবেই দোষে-গুণে দেবযানী এক স্বতন্ত্র নারী হয়ে উঠেছেন। সমালোচক সুকুমার সেন ‘শর্মিষ্ঠা’ নাটক প্রসঙ্গে যে তুলনামূলক ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন, তা এখানে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। তিনি বলেছেন—

“মহাভারতের শর্মিষ্ঠা প্রগলভা তরুণী। নানারকম যুক্তি দেখাইয়া রাজাকে তাহার পাণিগ্রহণে স্বীকৃতি করিতে তাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। মধুসূদন সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য নাটকের ধারা অনুসরণে যযাতি-দেবযানীর এবং যযাতি-শর্মিষ্ঠার পূর্বরাগ যুগপৎ করিয়াছেন। নায়িকাদের ভূমিকা পরিকল্পনাতেও তিনি স্বাধীনতা দেখাইয়াছেন। মহাভারত-কাহিনীর নায়িকা দেবযানী। মধুসূদনের নাটকের নায়িকা শর্মিষ্ঠা, কিন্তু নাট্যরস জমিয়া উঠিয়াছে দেবযানীর আচরণে। মহাভারতে দেবযানী মহিমাময়ী তেজস্বিনী এবং আত্মপ্রতিষ্ঠাবতী আর শর্মিষ্ঠাই যেন ঈর্ষাকুলা ও কলহকারিণী। তুচ্ছ কারণে দেবযানীর সহিত কথা-কাটাকাটি হইতেই সে মর্মান্তিক রূঢ় উক্তি করিয়াছিল,

আদুষ্মস্ব বিদুষ্মস্ব দ্রুহ্য কুপাস্ব যাচকি।

অনায়ুধা সায়ুধায়া রিক্তা ক্ষুভ্যসি ভিক্ষুকি।

মধুসূদন দেবযানীকেই কোপনস্বভাব এবং ঈর্ষাপরায়ণ করিয়াছেন এবং শর্মিষ্ঠাকে শকুন্তলার ও বাঙ্গালী মেয়ের আদর্শে নায়িকা গড়িয়াছেন।”^{৯৭}

সমালোচক সুকুমার সেন খুবই সংগতভাবে এই দুই নারীর তুলনা করেছেন আধুনিক কালের দর্পণে। মহাভারতের শর্মিষ্ঠার কোনো দাসীর উল্লেখ নেই। কিন্তু মধুসূদন নাট্যকাহিনীর পরিমণ্ডলকে সুচারুরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শর্মিষ্ঠার সখী পূর্ণিকা নামের একটি চরিত্র অঙ্কন করেছেন। রাজা যযাতি, শুভ্রাচার্য- চরিত্র দুটি মহাভারতের পৃষ্ঠা থেকে অঙ্কিত হলেও মধুসূদন তাঁদেরকে স্নেহ-মমতায় আদর্শ বাঙালি করে তুলেছেন। ফলে তাঁদের পৌরাণিক গাম্ভীর্য কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলেও মধুসূদনের লেখনীতে আকর্ষণীয় হয়েছে। মহাভারতে যযাতির পূর্বরাগ নেই। বরং দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা উভয়েই উপযাচিকা হয়ে রাজার কাছে প্রণয় প্রার্থনা করেছিলেন। এমনকি উভয় নারী ভিন্ন কালপর্বে রাজা যযাতির সাক্ষাৎ পেয়ে ছলনার আশ্রয়ে তাঁর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। নাটকটির মধ্যে

মধুসূদন কালিদাসের ‘শকুন্তলা’ নাটকের ভাবনাকে অবলম্বন করেছেন বলেই মনে হয়। কালিদাস যেমন করে শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্যন্তের মিলন দেখিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবেই মধুসূদন যথাতির সঙ্গে শর্মিষ্ঠার মিলন ঘটিয়েছেন। এখানে মধুসূদন মহাভারতের কাহিনি আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করেননি। তবে পুরাণ ভাবনার এই পরিবর্তন আধুনিক পাঠক বা দর্শকের কাছে স্বাভাবিক বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। কাব্যভাবনায় মধুসূদন এই গদ্যনাট্য সংরূপে প্রকাশ করায় পাঠকের কাছে নাটকের ভাষা বা সংলাপ আর জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়েছে। কথাগুলির মধ্যে সংস্কৃত ভাব-গাম্ভীর্য তেমন ভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় পাঠক পরিচিত পরিমণ্ডল খুঁজে পেয়েছেন। কিছু কিছু বাক্যবন্ধ আজও সমাজ প্রচলিত প্রবাদ হয়ে আছে। যেমন- ‘স্ত্রী জাতি সর্বত্রই বিবাদের মূল’, ‘অরণ্যে রোদনে কি ফল?’, ‘তুমি সাক্ষাৎ রাজলক্ষ্মী!’ প্রভৃতি। প্রতিষ্ঠানপুরীর উদ্যান বর্ণনায় রাজা যযাতি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তা বাস্তবে কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের অলকাপুরীর বিবরণের অনুকরণ বলেই মনে হয়। যযাতি একান্তে বলেছেন—

“আহা! নিশাকরের নির্মল কিরণে এ উপবনের কি অপরূপ শোভা হয়েছে। যেমন কোন পরমাসুন্দরী নবযৌবনা কামিনী বিমল দর্পণে আপনার অনুপম লাবণ্য দর্শন করে পুলকিত হয়, অদ্য সেইরূপ প্রকৃতিও ঐ স্বচ্ছ সরোবরসলিলে নিজ শোভা প্রতিবিম্বিত দেখে প্রফুল্লিত হয়েছে। নানা শব্দপূর্ণা ধরণী এ সময়ে যেন তপোমগ্না তপস্বিনীর ন্যায় মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। শত শত খদ্যোতিকগণ উজ্জ্বল রত্নবাজির ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে পল্লব হতে পল্লবান্তরে শোভিত হচ্ছে। হে বিধাতাঃ, তোমার এই বিপুল সৃষ্টিতে মনুষ্যজাতি ভিন্ন আর সকলেই সুখী!”^{৯৮}

নাট্যমধ্যে কারো কারো সংলাপে একালের slang ভাষার কিন্তু পরিচয়ও ধরা পরেছে। যেমন বিদূষকের সংলাপ। রাজবাড়ীর এক পরিচারিকার উদ্দেশ্যে বিদূষক বলেছেন —

“দূর মাগী লক্ষ্মীছাড়া! তুই ত’ কেঁদেই গেলি, এতে আমি কি বুঝলেম? (চিন্তা করিয়া) রাজপুরে যে কোন বিপদ উপস্থিত হয়েছে, তার আর সংশয় নাই, কিন্তু—”^{৯৯}

এই সংলাপে বিদূষকের চরিত্রগত ত্রুটি-বিচ্যুতি পাঠকের কাছে ধরা পরে। আবার গুরু শুক্লাচার্য নাটকের যবনিকা পতনের আগে রাজা ও রানী দুজনের উদ্দেশ্যে শান্তির বাণী উচ্চারণ করেন এইভাবে -

“হে রাজন, এখন আশীর্বাদ করি যে, তোমারা সকলে দীর্ঘজীবী হয়ে
এইরূপ পরম সুখে কালযাপন কর এবং শর্মিষ্ঠার কীর্তিপতাকা ধরাতলে
চিরকাল উড্ডীয়মানা থাকুক।”^{১০০}

এই শুভ কামনায় সকল অন্ধকার, সকল অশুভ শক্তি দূরীভূত হয়ে প্রতিষ্ঠানপুরীতে
পুনরায় আনন্দ বিরাজিত হয়। এইভাবে পুঞ্জানুপুঞ্জরূপে মহাভারতীয় ভাবনা, চরিত্র,
কাহিনি, ভাষা, পরিবেশের আমূল পরিবর্তন করে নাট্যকার মধুসূদন দত্ত ‘শর্মিষ্ঠা’
নাটকটিকে মহাভারতের কাহিনির পুনর্নির্মাণ রূপে রচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২) ;

মহাভারতের কাহিনি অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘চিত্রাঙ্গদা’ নাটকটি রচনা
করেছিলেন ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে। এগারোটি দৃশ্যে বিভক্ত নাটকটি ‘রবীন্দ্র রচনাবলী’র পঞ্চম
খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ২৪ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১৫ সেন্টিমিটার চওড়া এই
নাটকটিতে প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (১), উৎসর্গপত্র (১), সূচনাপত্র (১), মূল নাটক (৩৩)
সহ মোট ৩৭টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকটির প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ -

“রবীন্দ্র-রচনাবলী/ পঞ্চম খণ্ড/ নাটক/ শ্রী রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুর/ পশ্চিমবঙ্গ সরকার”^{১০১}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ-

“চিত্রাঙ্গদা/ ১৮৯২”^{১০২}

নাটকের উৎসর্গপত্রে বলা হয়েছে-

“স্নেহাস্পদ শ্রীমান অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ পরমকল্যাণীয়েষু/ বৎস, / তুমি
আমাকে তোমার যত্নরচিত চিত্রগুলি/ উপহার দিয়াছ, আমি তোমাকে
আমার কাব্য এবং/ স্নেহ আশীর্বাদ দিলাম। ১৫ শ্রাবণ, ১২৯৯ /
মঙ্গলাকাক্ষী / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর”^{১০৩}

নাটকের ‘সূচনাপত্রে’ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

“অনেক বছর আগে রেলগাড়িতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে
কলকাতার দিকে। তখন বোধ করি চৈত্র মাস হবে। রেল লাইনের ধারে
ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র।
দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে আর কিছুকাল পরেই রৌদ্র

হবে প্রখর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে – তখন পল্লীপ্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরুপ্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রসসঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগলভ ফলসম্ভারে। সেই সঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তা হলে সে তার সুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চরিত্রশক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।

“এই ভাবটাকে নাট্য-আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তখনি মনে এল, সেইসঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনি। এই কাহিনিটি কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেক দিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে লেখবার আনন্দিত অবকাশ পাওয়া গেল উড়িষ্যার পাণ্ডুয়া বলে একটি নিভৃত পল্লীতে গিয়ে।”^{১০৪}

নাটকে উল্লিখিত পাত্র-পাত্রীরা হলেন– চিত্রাঙ্গদা, অর্জুন বা পার্থ, মদন, বসন্ত। নাটকটি সহ নাট্য রচনাবলীর মূল্য দুইশত টাকা।

‘চিত্রাঙ্গদা’ নাটকটিতে নারী ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিকতা ও আত্মপ্রকাশ ধরা পরেছে আধুনিক নারীবাদী ভাবনার আলোকে। এ নারী অন্য আর পাঁচজন সাধারণ নারীর মতো নন, এ যেন একই দেহে পুরুষের তেজ ও নারীর কোমল হৃদয়ের মেলবন্ধনে এক অভিনব সত্তায় ভূষিত। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ তার বিবরণ দিয়েছেন এইভাবে–

“পুরুষের বেশে নিত্য করি রাজকাজ যুবরাজরূপে ফিরি স্বেচ্ছামত; নাহি জানি লজ্জা ভয়, অন্তঃপুরবাস; নাহি জানি হাবভাব বিলাস-চাতুরী;”^{১০৫}

সেই চিত্রাঙ্গদা যখন গহন অরণ্যে বনবাসী অর্জুনের সাক্ষাৎ পেয়েছেন তখন তাঁর মিথ্যা অহংকার, পুরুষবেশ, অস্ত্রবিদ্যা এক নিমেষে খসে গেছে -

“শুধু ক্ষণিকের তরে চাহিলা আমার মুখপানে, রোষদৃষ্টি মিলাল পলকে, নাচিল অধরপ্রান্তে স্নিগ্ধ গুপ্ত কৌতুকের মৃদুহাস্যরেখা বুঝি সে বালক-মূর্তি হেরিয়া আমার। শিখে পুরুষের বিদ্যা, পরে পুরুষের বেশ, পুরুষের সাথে থেকে, এতদিন ভুলে ছিনু যাহা, সেই মুখে চেয়ে, সেই আপনাত-আপনি-অটল মূর্তি হেরি, সেই মুহূর্তেই জানিলাম মনে, নারী আমি। সেই মুহূর্তেই প্রথম দেখিনু সম্মুখে পুরুষ মোর”।^{১০৬}

এই সময় প্রথমবার চিত্রাঙ্গদার মনে নারীসত্তার জাগরণ ঘটে। মনে মনে চিত্রাঙ্গদা নারী হতে চান; চান পুরুষের হৃদয় হরণ করতে। অস্ত্রবিদ্যায় অর্জুনকে পরাজিত করতে না পারলেও চিত্রাঙ্গদা মদন ও বসন্তের সহায়তায় অর্জুনকে যৌবনের মদিরতা পান করিয়ে পরাস্ত করতে চান। অর্জুন চিত্রাঙ্গদার সেই মোহময় সৌন্দর্যে আপ্ত হন। চিত্রাঙ্গদা বলেন-

“নবনীনিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী অর্জুন দিয়াছে আসি ধরা, দুই হস্তে ছিন্ন করি সত্যের বন্ধন। কোথা গেল প্রেমের মর্যাদা! কোথায় রহিল পড়ে নারীর সম্মান! হায়, আমারে করিল অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা, মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ ক্ষণস্থায়ী! এতক্ষণে পারিনু জানিতে মিথ্যা খ্যাতি, বীরত্ব তোমার।”^{১০৭}

অর্জুনকে কাছে পাওয়ার পর এবং তাঁর হৃদয় জয় করে নেওয়ার পর চিত্রাঙ্গদা প্রেমের ছদ্মবেশ আর ধরে রাখতে চাননি। অর্জুনের কাছে আপন নারী সত্তার পরিচয় তুলে ধরতে চেয়েছেন। এইসময় চিত্রাঙ্গদার মধ্যে ব্যক্তিত্বময়ী নারীসত্তা বড় হয়ে উঠেছে। নিজের নারী রূপ ও পরিচয়ের গৌরব তুলে ধরে তিনি বলেছেন-

“আমি চিত্রাঙ্গদা। রাজেন্দ্রনন্দিনী। হয়তো পড়িবে মনে, সেই একদিন সেই সরোবরতীরে শিবালয়ে দেখা দিয়েছিল এক নারী, বহু আভরণে ভারাক্রান্ত করি তার রূপহীন তনু। কী জানি কী বলেছিল নির্লজ্জ মুখরা, পুরুষেরে করেছিল পুরুষ-প্রথায় আরাধনা; প্রত্যাখ্যান করেছিলে তারে। ভালোই করেছ। সামান্য সে নারীরূপে গ্রহণ করিতে যদি তারে, অনুতাপ বিধিত তাহার বুকে আমরণ কাল। প্রভু, আমি সেই নারী। তবু আমি সেই নারী নহি; সে আমার হীন ছদ্মবেশ। তার পরে পেয়েছিনু বসন্তের

বরে বর্ষকাল অপরূপ রূপ। দিয়েছি শান্ত করি বীরের হৃদয়, ছলনার ভারে। সেও আমি নহি। আমি চিত্রাঙ্গদা। দেবী নহি, নহি আমি সামান্য রমণী। পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে, যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী, আমার পাইবে তবে পরিচয়।”^{১০৮}

অর্জুন চিত্রাঙ্গদার এই অকপট সত্যবাক্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন এবং চিত্রাঙ্গদাকে প্রকৃত প্রেমিকা নারীর মর্যাদা দিয়ে হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন। একালের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নারীর প্রতিনিধি চিত্রাঙ্গদা। তিনি প্রেমের জন্য বা তাঁর কাজিত লক্ষ্যকে চরিতার্থ করার জন্যে অন্যের সহায়তা নিলেও চিরকাল মিথ্যার আশ্রয় নেননি। একসময় তিনি সাহসের সঙ্গে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন এবং অর্জুনকে সত্য কথা বলেছেন। মধ্যযুগীয় নারী ভাবনার প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে চিত্রাঙ্গদা চরিত্রটিকে আধুনিক যুক্তিবাদী নারীর রূপ দিয়ে গড়েছেন, তা অসাধারণ। এরফলে ‘চিত্রাঙ্গদা’ নাটকটি পৌরাণিক ভাবনার জারিত হয়ে একালের পুনর্নির্মিত নাটক হয়ে উঠেছে।

‘চিত্রাঙ্গদা’ নাটকের কেন্দ্রীয় ভাবনায় আছে চিত্রাঙ্গদা চরিত্রটি। একালের নারীবাদের প্রতীকী ভাবনা রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদার মধ্যে আরোপ করেছেন। মহাভারতীয় কাহিনিতে অর্জুনের খ্যাতি, পৌরুষদীপ্ত শরীরের কাছে পুরুষবেশী চিত্রাঙ্গদা পরাজিত হলেও নিজের অধিকারবোধ এবং অর্জুনকে জয় করার তীব্র ইচ্ছায় তিনি বদ্ধ পরিকর। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে চিত্রাঙ্গদা দৃষ্ট কণ্ঠে বলেছেন—

“আমি চিত্রাঙ্গদা। মণিপুর-রাজকন্যা।/ মোর পিতৃবংশে কভু পুত্রী জন্মিবে না--/ দিয়াছিলা হেন বর দেব উমাপতি/ তপে তুষ্ট হয়ে। আমি সেই মহাবর/ ব্যর্থ করিয়াছি। অমোঘ দেবতা-বাক্য/ মাতৃগর্ভে পশি দুর্বল প্রারম্ভ মোর/ পারিল না পুরুষ করিতে শৈব তেজে/ এমনি কঠিন নারী আমি।”^{১০৯}

মণিপুর রাজের কন্যা হওয়া সত্ত্বেও উমাপতির অভিশাপকে খণ্ডন করে পুরুষ বেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন চিত্রাঙ্গদা। তাঁর এই প্রতিবাদ যেন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তা সম্ভব হয়েছে চিত্রাঙ্গদার মনের জোরের জন্য। দ্বিতীয় প্রতিবাদ অর্জুনের খ্যাতি, ক্ষমতা ও অন্যের প্রতি তুচ্ছজ্ঞানের বিরুদ্ধে।

অর্জুনকে বাহুবলে হারানোর ইচ্ছা চিত্রাঙ্গদার মনে দির্ঘদিন সুপ্ত ছিল। কিন্তু অর্জুনের সাক্ষাৎতে চিত্রাঙ্গদার সেই ইচ্ছা আকস্মিক ধূলিসাৎ হয়ে গেল। চিত্রাঙ্গদা বলেছেন- ‘এই পার্থ? আজন্মের বিস্ময় আমার!’ অর্জুনকে বাহুবলে পরাজয় করতে না পারলেও চিত্রাঙ্গদা নারীরূপে তাঁকে জয় করেছেন। বসন্ত ও মদনের সহায়তায় অপরূপ লাভ লাভ করে অর্জুনকে আত্মগত করেছেন, যদিও তাঁর মনে শান্তি মেলেনি। কারণ এই পাওয়ায় তাঁর সবটা যেন পাওয়া হল না। ছলনার জালে অন্যকে বাঁধার মধ্যে আনন্দ নেই। তাই তিনি অর্জুনকে একসময় অকপটে সত্য কথা বলতে পেরেছেন—

“প্রভু, আমি সেই নারী। তবু আমি সেই/ নারী নহি; সে আমার হীন
ছদ্মবেশ।/ তার পরে পেয়েছি বসন্তের বরে/ বর্ষকাল অপরূপ রূপ।
দিয়েছি/ শ্রান্ত করি বীরের হৃদয়, ছলনার/ ভারে। সেও আমি নহি।/
আমি চিত্রাঙ্গদা।/ দেবী নহি, নহি আমি সামান্য রমণী।”^{১০}

এইভাবে চিত্রাঙ্গদা নিজের অন্যায়কে স্বীকার করে নিয়েছেন নির্ভয়ে। তবে তিনি নিজের অধিকারবোধ সম্পর্কে সর্বদা সচেতন ছিলেন। অর্জুনকে তিনি যেভাবেই হোক জয় করেছেন। এইভাবে রবীন্দ্রভাবনায় চিত্রাঙ্গদা আত্ম মর্যাদায় পরিপূর্ণ এক আধুনিক নারী হয়ে উঠেছেন। চিত্রাঙ্গদা যখন তাঁর গর্ভের সন্তানের কথা জানিয়েছে প্রিয়তম অর্জুনকে, তখন অর্জুন তাঁকে নারীত্বের প্রকৃত মর্যাদা দিয়েছেন এবং নিজেকে ধন্য বলে মনে করেছেন। অর্জুনের এই রূপ আচার-আচরণে তিনি প্রকৃত একালের নারীবাদকে সমর্থন করার একজন যোগ্য যুক্তিবাদী পুরুষ হয়ে উঠেছেন। নাটকটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংযোজন করেছেন, তা সত্যিই দুর্লভ। এমনকি চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুন যে ভাষায় প্রেমালাপ করেছেন, তাও অভূতপূর্ব। অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে বলেছেন—

“বলো বলো। শ্রবণলালসা/ ক্রমশ বাড়িছে মোর। হৃদয় তাহার/
করিতেছি অনুভব হৃদয়ের মাঝে।/ যেন পান্থ আমি, প্রবেশ করেছি গিয়া/
কোন্ অপরূপ দেশে অর্ধরজনীতে।/ নদীগিরিবনভূমি সুপ্তিনিমগন, /
শুভ্রসৌধকিরীটিনী উদার নগরী/ ছায়াসম অর্ধস্ফুট দেখা যায়, শূন্য।/ যায়
সাগরগর্জন; প্রভাতপ্রকাশে/ বিচিত্র বিস্ময়ে যেন ফুটিবে চৌদিক;/
প্রতীক্ষা করিয়া আছি উৎসুক হৃদয়ে/ তারি তরে। বলো বলো, শুনি তার
কথা।”^{১১}

সংলাপ যেহেতু নাটকের প্রাণ, তাই রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষামূলকভাবে এই নাটকের মধ্যে সংলাপকে কখনো গদ্যের ভঙ্গীতে, কখনো কবিতাকারে, কখনো প্রশ্ন-উত্তরের মধ্য দিয়ে

প্রকাশ করেছেন। ফলে নাটকের আকর্ষণ বেড়েছে। মহাভারতের কাহিনির কাব্যিক রূপটি আধুনিক নাট্য-সংরূপে ‘চিত্রাঙ্গদা’ নামে পরিচিতি পেয়েছে। তাই ‘চিত্রাঙ্গদা’ নাটকটি কাহিনি ভাবনা, চরিত্র পরিকল্পনা এবং গঠনগত দিকে থেকে পুনর্নির্মিত নাটক হয়ে উঠেছে।

বুদ্ধদেব বসু - তপস্বী ও তরঙ্গিনী (১৯৬৬);

মহাভারতের কাহিনি অবলম্বন করে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন চার অঙ্কের কাব্যনাট্য ‘তপস্বী ও তরঙ্গিনী’। ২১ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১৪ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটিতে প্রচ্ছদপত্র (১), প্রস্তাবনা পত্র (১), পাত্র-পাত্রী (১) সহ মূল নাটক (৮০) সহ মোট ৮৩ টি পৃষ্ঠা আছে।

নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ-

“চার অঙ্কের নাটক/ তপস্বী ও তরঙ্গিনী/ বুদ্ধদেব বসু।”^{১২}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ-

“সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত/ তপস্বী ও তরঙ্গিনী/ চার অঙ্কের নাটক/
বুদ্ধদেব বসু/ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড/ কলকাতা-৯”^{১৩}

প্রচ্ছদপত্রে হলুদ ও কালো রঙের সমাহারে অঙ্কিত নারী-পুরুষের চুম্বনের ছবি আছে। নাটকের পাত্র-পাত্রীরা হলেন ঋষ্যশৃঙ্গ, বিভান্দক, তরঙ্গিনী, লোলাপাঙ্গী, শান্তা, রাজমন্ত্রী, অংশুমান, চন্দ্রকেতু, রাজপুরোহিত, দুই রাজদূত, গাঁয়ের মেয়েরা, এক ঘোষক, তরঙ্গিনীর সখীরা। নাটকটি প্রকাশিত হয় আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯ থেকে। নাটকটির মূল্য কুড়ি টাকা। নাট্য অঙ্কের সময়-কাল নির্ধারিত হয়েছে এইভাবে -

“প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যে একদিন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের মধ্যে এক বৎসর ব্যবধান। তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কের ঘটনাকাল একই দিন।”^{১৪}

বুদ্ধদেব বসুর ‘তপস্বী ও তরঙ্গিনী’ নাটকটি ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের পুরাণকেন্দ্রিক নাটক। বলাবাহুল্য ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিসমূহের একটি প্রাচীনতম পুরাণ। তবে এই পুরাণ কাহিনিকে নাট্যকার আধুনিক কালের মতো করে দর্শক বা পাঠক মহলের কাছে পরিবেশন করেছেন। ‘নাট্য প্রস্তাবনা পত্রে’ বুদ্ধদেব বসু সে কথা নিজেই বলেছেন। তিনি বলেছেন—

“তপস্বী ও তরঙ্গিনী” ‘দেশ’ পত্রিকার এপ্রিল, ১৯৬৬-র পাঁচটি সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে ঈষৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছি।

“দেশ”-এ প্রকাশের পরে একাধিক পাঠক একটি আপত্তি জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। তাঁদের মতে ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান ত্রেতা যুগের, আর সত্যবতী, কুন্তী ও দ্রৌপদীর কাল পরবর্তী দ্বাপর যুগ; অতএব অংশুমান ও রাজপুরোহিতদের মুখে সত্যবতী ইত্যাদির উল্লেখ বসিয়ে আমি ভুল করেছি। ‘ত্রেতা’ ও ‘দ্বাপর’ যুগের ঐতিহাসিক যথার্থ্য কতখানি, সে-বিষয়ে আলোচনা বাহুল্য; তবে পণ্ডিতমহলে এ-কথা স্বীকৃত যে ঋষ্যশৃঙ্গ-উপাখ্যান ইন্দোয়োরোপীয় জাতিসমূহের একটি প্রাচীনতম পুরাণ; তাই আমার মানতে বাধে না যে তথ্যের দিক থেকে পূর্বোক্ত পত্রলেখকেরা ভ্রান্ত নন। আমার বক্তব্য এই –আর হয়তো বা বহু পাঠকের পক্ষে তা সহজেই অনুমেয়-যে আমি এই কালভঙ্গ ঘটিয়েছি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে, তার আন্তরিক প্রয়োজন ছিলো বলে। পৌরাণিক ভারতে একজন পতিপরিত্যক্তা রাজপুত্রীর দ্বিতীয় বিবাহ কি-ভাবে সিদ্ধ হতে পারে, এই প্রশ্নটা তুচ্ছ নয়; চতুর্থ অঙ্কের শেষের দিকে রাজমন্ত্রী তা নিয়ে স্বভাবতই চিন্তিত; ঘটনাটাকে বিশ্বাস্য করে তোলার জন্যই সত্যবতী, কুন্তী ও দ্রৌপদীর নজির আমি ব্যবহার করেছি। কোনটা আগে কোনটা পরে সে-কথা এখানে অবান্তর; আসলে আমি দেখাতে চেয়েছি যে, প্রাচীন হিন্দু সংস্কার অনুসারে দেবতা বা ঋষির বরে নারীর কৌমার্য যেহেতু প্রত্যর্পণীয়, তাই অংশুমানের সঙ্গে শান্তার বিবাহ প্রথাবিরোধী নয়, আর সেইজন্যই রাজপুরোহিত এই দ্বিতীয় পরিণয় অনুমোদন করলেন। সর্বোপরি স্মর্তব্য, এই নাটকের অনেকখানি অংশ আমার কল্পিত, এবং রচনাটিও শিল্পিত—অর্থাৎ, একটি পুরাণ কাহিনিকে আমি নিজের মনোমতো করে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চর করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা। বলা বাহুল্য, এ-ধরনের রচনায় অন্ধভাবে পুরাণের অনুসরণ চলে না; কোথাও-কোথাও ব্যতিক্রম ঘটলে তাকে ভুল বলাটাই ভুল। আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনী পুরাকালের অধিবাসী হয়েও মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন; এটা যদি গ্রাহ্য হয়,

তাহলে ‘দ্রোণ’ যুগের চরিত্রের মুখে ‘দ্বাপর’ যুগের উল্লেখ থাকলেও কোনো মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।”^{১৫}

অর্থাৎ নাট্যকার মহাভারতের কাহিনিকে নতুনভাবে ভেবেছেন। নাটকের সূচনায় দেখানো হয়েছে লোমপাদের অঙ্গদেশ বৃষ্টির অভাবে চরম সংকটে পরেছে। গাঁয়ের মেয়েদের আলাপ-আলোচনায় তা ধরা পরেছে। অঙ্গদেশের আকাশ সূর্যের অটল আক্রোশে জ্বলছে, সূর্যের রক্ত চক্ষুতে মাটির বুক ফেটে গেছে, জলাশয় শুকনো, ধুঁকছে নির্বাক পশুরা, শস্যহীন মাঠ, সধবারা বক্ষ্যা, দিনের পর দিন বৃষ্টি নেই, রাজা লোমপাদ অঙ্গরাজ্য বাঁচানোর জন্য নানা উপায় খুঁজছেন। অনেক চেষ্টায় একটি উপায় পাওয়া গেছে। কিন্তু সেটি সম্ভব কিনা, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। রাজমন্ত্রী দূতদ্বয়কে বলেছেন –

“শতধিক বারাজ্ঞাকে বার্তা পাঠালাম, সকলেই সভয়ে শিউরে উঠলো। জানতাম না, এক বালক তপস্বীর প্রতাপ এত প্রবল। কিন্তু এখনো আশা আছে। এইমাত্র নগরপাল আমাকে জানালেন যে চম্পকনগরের গণিকাদের মধ্যমণি এখন তরঙ্গিনী। রূপে, লাস্যে, ছলনায় তার নাকি তুলনা নেই। আবাল্য তার মাতারই সে ছাত্রী, সর্বকলায় বিদগ্ধ। শোনা যায়, লোলাপাঙ্গীর কাছে শিক্ষা পেলে বিকৃতদংষ্ট্রী কুরুপাও বৃদ্ধের ধনক্ষয় ঘটাতে পারে, আর তরঙ্গিনী স্বভাবতই মোহিনী। তার হিল্লোলে গলমান হবে ঋষ্যশৃঙ্গ, যেমন মলয়স্পর্শে দ্রব হয় হিমাদ্রি। মদস্রাবী হস্তীর মতো তার পতন হবে ব্যাধরচিত লুঙ্কায়িত গহ্বরে, কামনার রজ্জুতে বেঁধে তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসবে বারাজ্ঞাড। অন্তঃপুরে রাজকন্যা শান্তা বরমাল্য নিয়ে অপেক্ষা করবেন। ভগবান, বলুন, আমাদের কার্যসিদ্ধি হবে তো?”^{১৬}

কাহিনিধারায় উঠে আসে তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের কথা। যাঁর তপস্যা ভঙ্গ করে অঙ্গদেশে আনতে পারলে একমাত্র বৃষ্টি সম্ভব এবং রাজ্যের মঙ্গল হবে সবদিক থেকে। সেই কার্যের ভার রাজ্যমন্ত্রী দিলেন বারাজ্ঞা তরঙ্গিনীকে। সুন্দরী কলাচতুর বাকপটু তরঙ্গিনী এ কাজে ভয় পায়; তার মা লোলাপাঙ্গীও ভয় পায় তার একমাত্র সন্তানকে হারানোর। লোলাপাঙ্গী রাজ মন্ত্রীকে অনুরোধের সঙ্গে বলে–

“প্রভু, ওকে মার্জনা করুন, ঋষ্যশৃঙ্গের নাম শুনে কে না প্রথমে ভয় পাবে? আমরা গণিকা, কিন্তু স্ত্রীলোক মাত্র– উর্বশী মেনকার মতো দেবতার বর পাইনি, আমাকে দেখেই বুঝতে পারছেন আমরা অনন্তযৌবনা নই। যদি অভিশাপ দেন ঋষিপুত্র? যদি বলেন, ‘তুই কুস্তীর

হা! আর তরঙ্গিনী - আমার চোখের মণি তরঙ্গিনী, বণিক ধনিক রাজন্যদের আদরিণী তরঙ্গিনী - সে যদি বিকট মকরমূর্তি নিয়ে ধীরে ধীরে গঙ্গার জলে মিলিয়ে যায়? পুরাণের কথা সত্য হলে কী না হতে পারে?’^{১১৭}

কিন্তু তরঙ্গিনী মনের অদম্য ইচ্ছায় সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে বলে-

“পারবো, প্রভু আমি পারবো! আমার দেহে-মনে অপূর্ব প্রেরণা জেগেছে! আমি সম্পূর্ণ দৃশ্যটি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আমি সঙ্গে নেবো আমার ষোলোটি সুন্দরী সখীকে, নেবো ফুল মালা মধু সুরা সুগন্ধ; নানা বর্ণ মণিকান্ত কন্দুক; ঘৃতপক্ক মাংস ও পায়সান্ন; দ্রাক্ষ্য ও রতিফল; বাঁশি, বীণা, মৃদঙ্গ। এই সব নিয়ে যাত্রা করবো কাল প্রত্যুষে। ফুল দিয়ে সাজানো হবে আমাদের তরণী, পাতা, লতা, গুল্ম ও তৃণ দিয়ে এক কৃত্রিম তপোবন তাতে রচিত থাকবে। সঙ্গে কোনো পুরুষ নেবো না - আমরাই হবো এই আশ্চর্য অভিযানের নাবিক। সমস্বরে পঞ্চম স্বরে গান গাইতে গাইতে আমরা উত্তীর্ণ হব ওপারে। তখন লোহিতবর্ণ সূর্যদেব উদীয়মান, জল উজ্জ্বল, আকাশে ফুটছে কনকপদ্ম, জবাকুসুম, রক্তকরবী। কুমার তখন আঙ্গিক সেরে কুটিরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন- স্নাত তিনি, বন্ধলধারী, দীর্ঘ ও কৃষ্ণ তাঁর কেশ, তরুণ বেণুর মতো কান্তি। আমরা সখীরা ঘিরে ফেলবো তাঁকে - যেমন সরোবরে নামে শ্রেণীবদ্ধ মরাল। তাঁকে ঘিরে ঘিরে ললিতভঙ্গে নৃত্য করবো আমরা, বাঁধবো তাঁকে সংগীতের মায়াজালে। তিনি যখন প্রায় সন্মোহিত, আমরা তখনই অন্তরালে চলে যাবো। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে, আমি একা দাঁড়াবো তাঁর মুখোমুখি। আমার মুখের উপর বিদ্ব হবে তাঁর দৃষ্টি - সরল, গভীর, উদার, বিস্ফারিত - যে চক্ষু আগে কখনো নারী দ্যাখেনি। আমি তাঁকে সম্ভাষণ করবো। তিনি বলবেন, ‘কে তুমি? আমি মোহন স্বরে কথা বলে বলে ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হবো। বাছ উত্তোলিত করে, তাঁকে দেবো আমার অঙ্গপরশ। কৃতাঞ্জলি হয়ে গ্রহণ করবো তাঁর করযুগ। তাঁর কাঁধে মাথা রেখে বলবো ‘আমার একটি ব্রত আছে, আপনি পুরোহিত না হলে তা উদযাপিত হবে না’। তাকিয়ে দেখবো, তার অধর স্ফুরিত, নয়নকোণ রক্তিম, কণ্ঠমণি স্পন্দমান। আর তারপর - তারপর - তারপর

(করতালিসমেত বিলোল হাস্য করে)- মা, আমাকে আশীর্বাদ করো- প্রভু, আমাকে পদধূলি দিন- কন্দর্প, অতনু, পঞ্চশর, আমার সহায় হও!”^{১১৮}

তরঙ্গিনীর এই বক্তব্যে একালের বাকচতুর নারীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বড়ো হয়ে উঠেছে। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনীর কথা প্রধান হয়ে ওঠে। তরঙ্গিনী ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখে মুগ্ধ কণ্ঠে বলে -

“তপোধন, আপনার কুশল তো? এই বনে ফলমূলের তো অভাব নেই? আপনার পিতার তো তেজোহ্রাস ঘটেনি? আপনি তো সুখে কালাতিপাত করছেন? আমি সম্প্রতি আপনারই দর্শনলালসায় এখানে এসেছি।”^{১১৯}

প্রত্যুত্তরে ঋষ্যশৃঙ্গ তরঙ্গিনীকে বলেন -

“ধীমান, আমি আপনাকে কী-দান দিতে পারি ? আমার মনে হচ্ছে আপনি চিন্ময় জ্যোতিঃপুঞ্জ, প্রতিভার দিব্যমূর্তি। যে মনস্বীরা তিমিরের পারে আলোকময়কে দেখেছিলেন, আপনি যেন তাঁদেরই একজন। সুন্দর আপনার আনন, আপনার দেহ যেন নির্ধূম হোমানল, আপনার বাহু, গ্রীবা ও কটি যেন ঋক্ছন্দে আন্দোলিত। আনন্দ আপনার নয়নে, আনন্দ আপনার চরণে, আপনার ওষ্ঠাধরে বিশ্বকরণার বিকিরণ। আপনি মুহূর্তকাল অপেক্ষা করুন, আমি আপনার জন্য পাদ্য অর্ঘ্য নিয়ে আসি।”^{১২০}

এরপর শুরু হয় তরঙ্গিনীর কলা-কৌশল এবং ঋষ্যশৃঙ্গের তপস্যা ভঙ্গের পালা। সেই প্রসঙ্গে দু’জনের কথোপকথন মুহূর্ত -

“তরঙ্গিনীঃ তবে আরম্ভ হোক অনুষ্ঠান। (তরঙ্গিনীর ইঙ্গিত অনুসারে নেপথ্যে মৃদু যন্ত্রসংগীত) জাগ্রত হোক সুপ্তেরা। সুপ্ত হোক যারা জাগ্রত। গলিত হোক শিলা। মুক্ত হোক প্রবাহ। ব্যাপ্ত হোক গতি। পূর্ণ হোক বৃত্ত। জয়ী হোক প্রাণ, জয়ী হোক মৃত্যু। ক্ষেত্রে বীজ, ক্ষেত্রে হল; গর্ভে বীজ, গর্ভে জল। বীজ, বৃক্ষ, ফুল, ফল, বীজ, বৃক্ষ। মৃত্যুকে দীর্ঘ করে বীজ, প্রাণ তাই জয়ী। ফলকে উৎপাটন করে মৃত্যু, তাই মৃত্যু জয়ী। এসো সুপ্তি, এসো জাগরণ, এসো পতন, এসো উদ্ধার। (যন্ত্রসংগীত নীরব হলো)- ভগবন্দ, আপনি স্থির

হয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন, আমি বিধিবদ্ধ উপায়ে আপনার অর্চনা করি।।

[তরঙ্গিনী ঋষ্যশৃঙ্গের আরো কাছে এসে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো]

এই মালা আপনি গ্রহণ করুন। (মালা পরিয়ে দিয়ে) এই আমার ব্রতের প্রথম অঙ্গ।

ঋষ্যশৃঙ্গঃ সুগন্ধি মালা। সুগন্ধি দেহ। সুগন্ধি নিশ্বাস।

তরঙ্গিনীঃ আমি কিন্তু পূজ্যজনকে প্রণাম করি না, আলিঙ্গন করি।

ঋষ্যশৃঙ্গঃ আলিঙ্গন? লতা যেমন বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে ?

তরঙ্গিনীঃ তেমনি (আলিঙ্গনের ভঙ্গি করে) এই আমার ব্রতের দ্বিতীয় অঙ্গ। এবার আপনার মুখচুম্বন আমারকর্তব্য।।

ঋষ্যশৃঙ্গঃ চুম্বন ? অলি যেমন মধুপুষ্প চুম্বন করে ?

তরঙ্গিনীঃ তেমনি (চুম্বনের ভঙ্গি করে) এই আমার ব্রতের তৃতীয় অঙ্গ। তপোধন, আমি আমার ধর্ম অনুসারে যে-অর্থ্য এনেছি, এবারে আপনাকে তা অর্পণ করি। এই ফল আপনার সেবার জন্য। এই ব্যঞ্জন আপনার সেবার জন্য। এই সলিল আপনার সেবার জন্য। গ্রহণ করুন, ভোগ করুন, পান করুন।

[তরঙ্গিনীর হাত থেকে ঋষ্যশৃঙ্গ ফল, ব্যঞ্জন ও পাণীয় গ্রহণ করলেন।]

ঋষ্যশৃঙ্গঃ স্বাদু ফল, স্বাদু ব্যঞ্জন, স্বাদু সলিল।

তরঙ্গিনীঃ এবার আমাকে আপনার প্রসাদ দিন। আমি যাঁর সেবা করি, তার উচ্ছিষ্ট ভিন্ন আহার করি না। এই ফল আপনার প্রসাদ হোক।

[ঋষ্যশৃঙ্গের অধরে স্পর্শ করিয়ে একটি ফল ভক্ষণ করলো।]

এই ব্যঞ্জন আপনার প্রসাদ হোক।

[ঋষ্যশৃঙ্গের অধরে স্পর্শ করিয়ে নিজে আহার করলো ।]

এই সলিল আপনার প্রসাদ হোক ।

[ঋষ্যশৃঙ্গের অধরে স্পর্শ করিয়ে নিজে পান করলো ।]

প্রভু, আপনি তৃপ্ত?

ঋষ্যশৃঙ্গঃ মধু জল, মধু অন্ন, মধু বাক্, মধু কান্তি ।।

তরঙ্গিনীঃ মধু দৃষ্টি, মধু গন্ধ, মধু স্পর্শ, মধু স্মৃতি ।”^{১১১}

ঋষ্যশৃঙ্গ জন্ম থেকে পিতার সান্নিধ্যে কঠোর ব্রত-তপস্যা, হোমযজ্ঞের মধ্যে বড়ো হয়েছেন। তিনি অরণ্যে কোনদিন কোন নারীকে দেখেননি। নারী সম্পর্কে কোন ধারণা তাঁর মধ্যে গড়ে ওঠেনি। তাই তরঙ্গিনীর সান্নিধ্য পেয়ে তিনি এক নতুন তপস্যার স্বাদ পান এবং পুরাতন শাস্ত্রব্রত তাঁর কাছে ভালো লাগে না। পিতা বিভ্রমকের কঠোর নিয়মতন্ত্রের ব্রত তাঁর আর ভালো লাগে না। পিতা বিভ্রমকের অনুপস্থিতিতে ঋষ্যশৃঙ্গ পদচারণা করতে করতে মনে মনে ভাবেন—

“নারী। --- নারী নারী। নূতন নাম, নূতন রূপ, নূতন ভাষা। নূতন এক জগৎ। --- মোহিনী, মায়াবিনী, উর্বশী। নূতন জপমন্ত্র আমার।।... আমার মাতা এক কিরাতরমণী। আমার পিতা তাকে অরণ্যে গ্রহণ করেছিলেন। আমার ব্রহ্মচারী পিতা।--- তুমি তবে নারী? তপস্বী নও, কোনো পুরুষ নও - নারী? তুমি নারী, আমি পুরুষ।--- আমার পিতা কি জেনেছিলেন এই পুলক, আমার মাতা কি ছিলেন তোমারই মতো মনোরমা?--- আমি অস্নাত থাকবো, তোমার স্পর্শের শিহরণ যাতে জাগ্রত থাকে। আমি অভুক্ত থাকবো, তোমার চুম্বনের অনুভূতি যাতে লুপ্ত না হয়। আমি অনিদ্র থেকে ধ্যান করবো তোমাকে।--- তুমি কোথায়? এখানে— এখানে— এখানে— এইমাত্র ছিলে, এখন কেন নেই? আমি তোমার বিরহে কাতর, আমি তোমার অদর্শনে সন্তপ্ত। তুমি এসো, তুমি ফিরে এসো।”^{১১২}

এরপর ঋষ্যশৃঙ্গ পিতার অনুমতি ছাড়াই তরঙ্গিনীর সঙ্গে উপস্থিত হন লোমপাদের রাজ্যে। তরঙ্গিনীর অন্তর, মন, মানসিকতার পরিবর্তন হয়। সে আর বারাজ্ঞাবৃত্তি করতে চায় না। সর্বক্ষণ ঋষ্যশৃঙ্গের কথা ভাবে। চন্দ্রকেতু তাকে পত্নীরূপে পেতে চাইলে তরঙ্গিনী স্পষ্ট ভাবে বলে—

“আমি যা চাই তা কি তুমি দিতে পারবে? আমি চাই আনন্দ – প্রতি মুহূর্তে আনন্দ। আমি চাই রোমাঞ্চ – প্রতি মুহূর্তে রোমাঞ্চ। আমি চাই সেই দৃষ্টি, যার আলোয় আমি নিজেকে দেখতে পাবো। দেখতে পাবো আমার অন্য মুখ, যা কেউ দ্যাখেনি, অন্য কেউ দ্যাখেনি। (যেন তন্দ্রা থেকে জেগে উঠে, ক্ষণকাল পরে) আমাকে মার্জনা করো।”^{১২৩}

মনে মনে ঋষ্যশৃঙ্গকে অনুসরণ করে বলে –

“প্রিয়, আমার প্রিয়, আমার প্রিয়তম, কেন আমি তোমাকে নিয়ে চলে যাইনি– দূরে, বহু দূরে– যেখানে শান্তা নেই, লোলাপাঙ্গী নেই, চন্দ্রকেতু নেই– যেখানে তোমার নামে কেউ জয়কার দেয় না?-- কিন্তু আমি পারি – এখনো পারি – এখনো আমি তরঙ্গিনী।”^{১২৪}

চতুর্থ অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গের রাজকীয় জীবনের পরিচয় মেলে। মুক্ত তপস্যা রাজবাড়িতে বন্দী। রাজ্যে বৃষ্টি এসেছে, ধন-ধান্যে-পরিপূর্ণ হয়েছে অঙ্গদেশ। কিন্তু তপস্যার মনে আনন্দ বিন্দুমাত্র নেই –

“বিস্বাদ– বিস্বাদ এই রাজপুরী, বিস্বাদ জনতা, আমার মন্ত্রপূত বিবাহ বিস্বাদ, বিবর্ণ দিন, তিক্ত কাম, উৎপীড়িত রাত্রি। আমি যেন পিঞ্জরিত জন্তু, জীবনের বলাৎকারে বন্দী। ওরা জানে না, কেউ জানে না – আমি দেখি অন্য এক স্বপ্ন।”^{১২৫}

রাজকন্যা শান্তার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে রাজা লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গকে আটকে রাখতে চেয়েছেন চিরতরে। ঋষ্যশৃঙ্গের সামনে রাজমন্ত্রীর পুত্র অংশুমান ও শান্তার পূর্ব প্রণয় উদ্ভাসিত হয়। তপস্যা ফিরিয়ে দেন শান্তার কুমারীত্ব। কিন্তু শান্তার গর্ভে রয়ে যায় ঋষ্যশৃঙ্গের সন্তান। এরপর বিচ্ছেদ পর্ব। শান্তাকে ঋষ্যশৃঙ্গ ত্যাগ করেন এবং পূর্বপ্রেমিক অংশুমানের কাছে ফিরিয়ে দেয়। তরঙ্গিনীর সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের পুনরায় দেখা হয়। তপস্বী সকলের সামনে তরঙ্গিনীর গুরুত্ব স্বীকার করে বলেন–

“আমি ঘুমন্ত ছিলাম, সে আমাকে জাগিয়েছিলো। আবার আমি ঘুমিয়ে পড়ছিলাম, আবার আমাকে জাগিয়ে দিয়ে গেলো সে। সে-ই আমার বন্ধন, সে-ই আমার মুক্তি। আমার সর্বস্ব।”^{১২৬}

তরঙ্গিনী তাঁর সঙ্গে সাধনার জগতে পাড়ি দিতে চায়। তরঙ্গিনী ঋষ্যশৃঙ্গকে অনুরোধ করে বলে –

“আমাকে তোমার সঙ্গে নাও। আমি নদী থেকে জল নিয়ে আসবো, কুড়িয়ে আনবো সমিধকাষ্ঠ, অগ্নিহোত্র অনির্বাণ রাখবো। আমি আর কিছু চাই না, শুধু দিনান্তে একবার – একবার তোমাকে চোখে দেখতে চাই। সেই আমার তপস্যা। সেই আমার স্বর্গ।”^{১২৭}

ঋষ্যশৃঙ্গ পিতা, তরঙ্গিনী, শান্তা, সমাজ-সংসার, বনভূমির আশ্রম- সমস্ত বাধা অতিক্রম করে চলে যান আর এক অজানা অন্ধকার জগতে। সেখানে তিনি খুঁজে পেতে চান নিজের জগতকে, খুঁজে পেতে চান আপন প্রকৃত সত্তাকে। নাটকের চরিত্রগুলি পুরাণের হলেও কাহিনি বিস্তারে, মনস্তত্ত্বের জটিলতায়, বাস্তবের চিন্তা-ভাবনায় এবং সংলাপের বিচারে নাটকটি সম্পূর্ণরূপে নবনির্মিত। এই নাট্যকাব্য যেন পুরাণের নব রূপায়ণ।

‘তপস্বী ও তরঙ্গিনী’ নাটকের বিশেষত্ব চরিত্র পরিকল্পনার অভিনবত্ব। এখানে নাট্যকার প্রতিটি চরিত্রকে আধুনিক ভাবনায় উন্মোচিত করেছেন। প্রধান-অপ্রধান প্রতিটি চরিত্রকে বুদ্ধদেব বসু আমাদের সমাজের বাসিন্দা করে তুলেছেন। কাহিনির সুত্রপাত ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে হলেও ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনীর হাত ধরে তা একালে কালে ত্রসে পৌঁছেছে। চার অঙ্কের এই নাটকটির মধ্য দিয়ে নাট্যকার প্রতিটি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। ঋষ্যশৃঙ্গ পিতা বিভ্রমের কঠোর অনুশাসনে অরণ্যে লালিত-পালিত হলেও তরঙ্গিনীর উপস্থিতি এবং সংস্পর্শ তাঁর হৃদয়ের সুগুণ আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছে। ঠিক একইভাবে তরঙ্গিনী বারবনিতা হলেও নিষ্পাপ পুরুষ ঋষ্যশৃঙ্গের সংস্পর্শে এসে তার মনের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। পিতা বিভ্রমক যখন তরঙ্গিনীর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন, তখন ঋষ্যশৃঙ্গ পিতাকে বুঝিয়েছেন তরঙ্গিনীর নতুন ব্রত ও ব্রতকারীর নিষ্কলুষতা সম্বন্ধে। ঋষ্যশৃঙ্গ বলেন—

“পিতা, আমি জানি না আপনার মনে কেন আশঙ্কার উদয় হচ্ছে। সেই অতিথির প্রতি গভীর ছিলো আমার অভিনিবেশ, কিন্তু আমি কোথাও তিলপরিমাণ কলঙ্ক খুঁজে পাইনি। নিশ্চয়ই তাঁর সাধনমার্গ অতি উন্নত, নয়তো তাঁকে দেখামাত্র আমার মন কেন প্রীত হলো, কেন অভিনব স্পন্দন জাগলো হৃদয়ে? তাত, তিনি যখন আমাকে সম্ভাষণ করলেন, আমার অন্তরাত্মা নন্দিত হলো; যেন নারদের বীণা তাঁর কণ্ঠে, তাঁর বাণী যেন সামগান।”^{১২৮}

ঋষ্যশৃঙ্গের চরিত্রটিকে নাট্যকার উপন্যাসের মতো কতোগুলি পর্বে বিবর্তনশীল করে তুলেছেন। প্রথম পর্বে নিষ্ঠার সঙ্গে পিতার কঠোর যাগ-যজ্ঞের ব্রতী হওয়া, দ্বিতীয় পর্বে তরঙ্গিনীর নতুনব্রত গ্রহণ এবং তার সঙ্গে লোমপাদের রাজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা; তৃতীয় পর্বে রাজকন্যা শান্তার সঙ্গে বিবাহ ও পুত্রের জন্ম। চতুর্থ পর্বে পুনরায় মুক্তির পথ অন্বেষণ। সমগ্র কাহিনির মধ্যে টান টান নাট্যঘটনা ঋষ্যশৃঙ্গ চরিত্রটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। পাশাপাশি আসে বারবনিতা তরঙ্গিনীর কথা। সে ঋষ্যশৃঙ্গকে ছলা-কলায় ভুলিয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই কাজের পেছনে ব্যক্তিস্বার্থের কোন লক্ষ্য তার ছিল না, ছিল লোমপাদের রাজ্যের হাজার হাজার মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার ইচ্ছা। লোমপাদের অঙ্গরাজ্যে ঋষ্যশৃঙ্গের আগমনে বৃষ্টির সুত্রপাত হয় এবং রাজ্য পুনরায় ধন-সম্পদে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এই কাজ সম্ভব হয়েছে তরঙ্গিনীর মতো উদার এক নারীর জন্যে। তরঙ্গিনী চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে ঋষ্যশৃঙ্গের সংস্পর্শে। সে আর বারবনিতা পেশায় থাকতে চায় না। ঋষ্যশৃঙ্গের ধ্যানে নিজেকে সমাহিত করতে চায়। তরঙ্গিনী আপন মনে বলেন-

“তাপস, তুমি কে? কোনো স্বর্গের দূত? কোনো ছদ্মবেশী দেবতা? এই মুখ, এই দেহ, এই বসন, এই অলংকার। তুমি কি আমাকেই দেখেছিলে? এই আমাকে? ‘আনন্দ তোমার নয়নে, আনন্দ তোমার চরণে’। কজ্জল, অলঙ্কর, লোধ্বরেণু—আমি কি তোদের কাছে ঋণী? বসন, ভূষণ, মালা, চন্দন—তোদের কাছে? কিন্তু এ তো তুমি দেখেছিলে—এই ত্বক, মাংস, মেদ, কান্তি—এই শরীর! আর কেন দৃষ্টিপাত করো না? আমি স্বপ্নে দেখি তোমার দৃষ্টি—জাগরণে দেখি তোমার দৃষ্টি।”^{১২৯}

একসময় তরঙ্গিনী ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে তপস্যায় অংশ নিতে চেয়েছে, কিন্তু সেই সুযোগ সে আর পায়নি। এই নাটকে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনীর প্রেম একালের নর-নারীর মনস্তত্ত্ব ভাবনায় আন্দোলিত হয়েছে। তাদের কথাবার্তা, চিন্তা ভাবনা, কাজকর্ম সমস্ত কিছুই আধুনিক কালের মানুষের মতো; সেখানে পৌরাণিক ভাবনা বিন্দুমাত্র জায়গা পায়নি। রাজকন্যা শান্তা নাটকে সামান্য অংশ জুড়ে থাকলেও তার গুরুত্ব কম নয়। কেননা তার সঙ্গেই বিবাহ হয়েছিল ঋষ্যশৃঙ্গের। প্রেমিকপুরুষ রাজমন্ত্রীর পুত্র অংশুমানের সঙ্গে শান্তার ভালোবাসার সম্পর্ক থাকলেও ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে দেশ ও দশের কথা ভেবে সে নীরবে ঋষ্যশৃঙ্গকে গ্রহণ করেছে। এখানে ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা বিভ্রঙ্ক, তরঙ্গিনীর মা লোলাপাঙ্গী—সন্তান হারানোর বেদনায় ব্যাকুল পিতা ও মাতার চরিত্ররূপে চিত্রিত হয়েছে। কাহিনির গতি নিয়ন্ত্রণে তাদের ভূমিকা কম নয়। এছাড়াও রাজমন্ত্রী, চন্দ্রকেতু,

রাজপুরোহিত, দুই রাজদূত, গাঁয়ের মেয়েরা, ঘোষক, তরঙ্গিনীর সখীরা- নাট্য পরিবেশ সৃজনে যথাযথ ভূমিকা পালন করেছে। চরিত্রগুলির সংলাপ মহাভারতীয় কালের সীমা অতিক্রম করে আধুনিক মানবচেতনায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ঋষ্যশৃঙ্গের সংলাপে কাব্যিকতা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর কাব্যিক সংলাপ এইরূপ -

“তিনি এক আশ্চর্য ব্রহ্মচারী। দীর্ঘকায় নন, খর্বকার নন, দেবতার মতো কান্তিমায়। কনকতুল্য তাঁর বর্ণ, দেহ সুঠাম, ও সংকেতময়; তাঁর মস্তকে নীল নির্মল সংহত জটাভার। শঙ্খের মতো গ্রীবা; দুই কর্ণ যেন উজ্জ্বল কমণ্ডলু। নয়ন তাঁর আয়ত ও স্নিগ্ধ; আনন যেন উদ্ভাসিত উষা; বালার্কের মতো অরুণবর্ণ তাঁর কপোল। তাঁর বাহু, বক্ষ ও পদযুগ নির্লোম; বক্ষে দুটি মনোহর মাংসপিণ্ড নৈবেদ্যের মতো বর্তুল। তিনি যে বক্কল ধারণ করেছিলেন তা স্বচ্ছ ও বর্ণাঢ্য; তাঁর তক্ষমালায় রৌদ্রকণার মতো রশ্মি ; তাঁর যজ্ঞোপবীত আমাদের মতো নয়।”^{১৩০}

এইভাবে চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে নাট্যকার বুদ্ধদেব বসুর ‘তপস্বী ও তরঙ্গিনী’ নাটকটিকে মহাভারতের আধুনিক নাট্য আখ্যান বলতে অসুবিধা হয় না। এই কাজটি সম্ভব হয়েছে নাট্য কাহিনি ও চরিত্রগুলির পুনর্নির্মাণ জন্যই।

অনুপ চক্রবর্তী - দ্রৌপদী ডট কম (১৯৮৭);

মহাভারতের কাহিনি অবলম্বন করে অনুপ চক্রবর্তী ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ‘দ্রৌপদী ডট কম’ নামের একটি নাটক রচনা করেন। মননশীল নাট্য বিষয়ক পত্রিকা ‘থিয়েটার প্রয়াগ’ থেকে এই নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি একটি মজার একাক্ষ নাটক। ২২ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১৪ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ -

“শারদীয়া ১৪২২/ থিয়েটার প্রয়াগ/ উৎপল দত্তের নাট্যমূল্যায়নঃ পুনরুদ্ধার/ এবং ১২টি মজার একাক্ষ।”^{১৩১}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ-

“মননশীল নাট্যবিষয়ক পত্রিকা/ থিয়েটার প্রয়াগ/ উৎপল দত্তের নাট্যমূল্যায়নঃ পুনরুদ্ধার/ এবং ১২-টি মজার একাক্ষ/ এবং/ ১-টি অন্য ধারার একাক্ষ / সম্পাদকঃ স্বপন দাস/ শারদীয়া-১৪২২ ”^{১৩২}

চরিত্রলিপিতে উল্লিখিত চরিত্রগুলি হল- জাস্টিস অম্বরীশ সেন, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, শকুনি, দ্রৌপদী। স্বত্বাধিকারী স্বপন দাস কর্তৃক রবীন্দ্র সরণী, ব্লক-৪, ফ্ল্যাট-৯, কোলকাতা- ৭০০০৪৯ থেকে নাট্য পত্রিকাটি প্রকাশিত। নাটকটি সহ নাট্যপত্রিকাটির মূল্য একশত সত্তর টাকা।

‘দ্রৌপদী ডট কম’ নাটকটি মহাভারতের ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক নাটক। একালের সঙ্গে দ্বাপর যুগের এক অভিনব মেলবন্ধনে নাট্য পটভূমি তৈরি করা হয়েছে। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জাস্টিস অম্বরীশ সেন তাঁর ড্রইংরুমে বসে মহাভারত পড়ছেন। হঠাৎ মোবাইল বেজে ওঠে, বসন্ত নামের এক পরিচিত নাট্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর কথা শুরু হয়। এইরকম একটি মুহূর্তে নাটকের সূচনা-

“মহাভারতের কোন ডিসপুট যদি আমাকে বিচার করতে হয়? দেখ বসন্ত, আমি এযুগের একজন বিচারক। এযুগের জুরিসপ্রুডেন্স পড়েছি। মহাভারতের কোন ঝামেলার বিচার করতে গেলে তো সেই পৌরাণিক যুগের জ্ঞান টান লাগবে।”^{১৩৩}

এরপরেই নাট্য-প্রেক্ষাপট পাল্টে যায়। অম্বরীশ ঘুমিয়েছেন, কিন্তু তাঁরই ড্রইংরুমে বিচারের জন্য উপস্থিত হন পঞ্চপান্ডব ও দ্রৌপদী। একালের বিচারকের কাছে মহাভারতের দ্রৌপদী ও পঞ্চপান্ডব বিচার চেয়েছেন। ফলে কাহিনির মধ্যে এসে পরে নতুনত্ব। হঠাৎ ঘুম ভেঙে অম্বরীশ চমকে উঠে প্রশ্ন করেন -

“কে? কে? কে? একি! কারা আপনারা? যাত্রার মতো ড্রেস পরে? মেকআপ নিয়ে ? কারা আপনারা ?”^{১৩৪}

যুধিষ্ঠির উত্তর দেন-

“বলছি, বলছি। ব্যস্ত হবেন না। উত্তেজিত হবেন না। ভয় পাবেন না। আমরা হলাম মহাভারতের পঞ্চপান্ডব।”^{১৩৫}

তাঁদের কথাবার্তা শুনে অম্বরীশ সেন অবাক হন। ভীম বলেন -“শুনুন বিচারক মশাই, আমাদের ফ্যামিলিতে বহুত লাফড়া চলছে। দ্রৌপদী ডিভোর্স চাইছে।” যুধিষ্ঠির বলেন- “হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাই আমরা আপনার শরণাপন্ন হয়েছি জাস্টিস সেন। আপনি আমাদের কৃপা করুন।” একদিকে পঞ্চপান্ডব দ্রৌপদীকে ডিভোর্স দিতে চান না, অন্যদিকে দ্রৌপদী ডিভোর্স নিয়েই ছাড়বে। এই হল নাটকের মূল climax। একের পর এক দ্রৌপদী তাঁর

পঞ্চস্বামীর বিরুদ্ধে নানা অন্যায় আচরণের কথা জাস্টিসের সামনে তুলে ধরতে থাকেন। দ্রৌপদী জানান-

“ইওর অনার! আমার প্রথম অভিযোগ হল এটাই যে আমার বিয়ের গোড়াতেই আমাকে ফাঁসানো হয়েছে।... উনি না হয় না দেখেই বলেছেন। কিন্তু তোমরা কী ? আমি কি মাল? গাছের ফল? বনের পশু? যে ভাগ করে নেবে? ধর্মান্তার এটা কি অসম্মানজনক নয়, একজন মেয়ের কাছে?”^{১৩৬}

দ্রৌপদী এখানে গৃহবধূ নন, একেবারে প্রতিবাদী ব্যক্তি-স্বাভাবিক নারী। তিনি একে একে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব- প্রত্যেকের অন্যায়কে বিস্তারিতভাবে একালের মৌখিক ভাষায় তুলে ধরেছেন। তাঁর সবচেয়ে বেশি অভিযোগ অর্জুনের প্রতি, যিনি তাঁকে বিবাহ করেছিল। বিচারকের কাছে দ্রৌপদীর দ্বিতীয় অভিযোগ কৌরব দরবারে পাশাখেলায় নারীকে সম্পদ হিসেবে লাগানোর জন্যে -

“তারপর- আমার আরো অনেক অনেক অপমান-দুর্যোধন উরু দেখাল-দুঃশাসন চুলের মুঠি ধরল- আমার কাপড় খুলে দিল- আ- আ-আ-”^{১৩৭}

পঞ্চপান্ডবের বিরুদ্ধে দ্রৌপদীর তৃতীয় অভিযোগ বারো বছর ধরে বনে বনে ঘোরানো। চতুর্থ অভিযোগ অজ্ঞাতবাসের সময় অপমানিত হওয়া। পঞ্চম অভিযোগ -

“তারপর আমার পাঁচটা ছেলেরই মুণ্ডু কেটে নিল ঐ জানোয়ার অশ্বখামা, ওরা বাঁচাতে পারল ? (চিৎকার করে) পারল ? (যুধিষ্ঠিরকে) পারলে তোমরা ?”^{১৩৮}

পাণ্ডবরা তাঁর প্রতিটি কথার প্রতিপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন জাস্টিসকে। যুধিষ্ঠির এবার দ্রৌপদীকে অভিযোগ করে বলেন-

“আমরা পাঁচজনই তোমার স্বামী, কিন্তু সবসময় অর্জুনকে প্রেফার করতে, বেশি ভালবাসতে, তা কি অস্বীকার করতে পার? একটু আগে তা পরোক্ষে স্বীকারও করেছ।”^{১৩৯}

অর্জুন দ্রৌপদীকে অভিযোগ করে বলেন-

“কৃষ্ণের সঙ্গে তুমি ফ্লার্ট করতে, পাঞ্চালী। এটাও আর একটা পক্ষপাতিত্ব।”^{১৪০}

এইসব বাদ-প্রতিবাদের পরেও যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে ছাড়তে নারাজ। কারণ-

“কেন দেব কেন? ও আমাদের গালমন্দ করে বটে, তবে মারধর ছোঁড়াছুঁড়ি করে না। চেল্লামেল্লি, খিস্তি করে বটে। তবে চরিত্রদোষ নেই। খুব দজ্জাল। তবে রান্না-বান্না ভাল করে। মানুষ ভাল।”^{১৪১}

জাস্টিস অম্বরীশ সেন তাঁদের উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শুনে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন না। তাই দশ লাখ টাকা জরিমানা করেন এবং তা দ্রৌপদীকে দেওয়ার জন্য হুকুম দেন পঞ্চপাণ্ডবকে। দ্রৌপদী অম্বরীশের রায় মানতে চান না; বরং তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নেন পাত্র শকুনিকে। যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভাইরা প্রতিবাদ জানায়। বিচারক অম্বরীশ সেন দ্রৌপদীকে বলেন -

“শুনুন। আপনি আর একটা বিয়ে করতে পারেন। কিন্তু ডিভোর্স করতে কিছুতেই পারবেন না। ডিভোর্স করলে কিন্তু আদালত অবমাননার জন্যে আপনাকে শাস্তি পেতে হবে। মনে রাখবেন।”^{১৪২}

দ্রৌপদী এবার বিচারকের সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নেন এবং বলেন -

“আমি তো ওদের ডিভোর্স করছি না। তাহলে আদালত অবমাননা তো হচ্ছে না, মাইলড। আপনি তো ঠিকই বলেছেন, ডার্লিং শকুনি হবে আমার ছ নম্বর স্বামী, আসলে ভারচুয়ালী একটাই স্বামী। ওর সঙ্গেই তো ঘর করব এবার।”^{১৪৩}

দ্রৌপদী তাঁর ভাবী স্বামী শকুনির সঙ্গে সংসার পাতার স্বপ্ন দেখে এবং তাঁদের সন্তানদের অতি আধুনিক নাম রাখার পরিকল্পনা করেন-

“যেমন সফটওয়্যার, ইন্টারনেট, ওয়াইফাই, ডাউনলোড, হ্যাকিং... আর আমার ওয়েব সাইট হবে ডাব্লু ডাব্লু ডাব্লু ডট দ্রৌপদী ডট কম। হা হা হা হা”^{১৪৪}

এতসব কাণ্ডের পর যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর এইসব আচার-আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালে জজসাহেব বলেন-

“কিছু করার নেই। উনি একজন স্বাধীন মানুষ। এটা নারীবাদের যুগ। উনি যা ইচ্ছে করতে পারেন। আমার ফাইনাল ভারডিকট

হল এইযে দ্রোপদীর ডিভোর্স হচ্ছে না এবং উনি নতুন বিয়েও করতে পারেন। দ্যা কেস ইস ক্লোসড।”^{১৪৫}

নাটকটিতে মূলত আধুনিক কালের নারীবাদের প্রকৃত রূপ সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে একালের নারী চেতনার পরিচয়টি যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি মহাভারতের চরিত্রগুলিরও পুনর্নির্মাণ ঘটেছে। Slang ভাষার আধিপত্য নাট্যমোদী দর্শকদের কাছে নাটকটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। দ্রোপদী যখন তাঁর স্বামীদের প্রতি ‘মিথ্যেবাদী’, ‘নর রান্সস’, ‘রান্সেলের দল’, ‘চ্যাংড়া’ প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন, তখন দর্শক বা পাঠক হাসির খোরাক খুঁজে পায় পেয়েছেন। ইংরাজী-বাংলা শব্দের মিশ্রণে দ্রোপদী বলেছেন- “হ্যাঁ, ডিভোর্স। আমি ডিভোর্স চাইছি। ইমিডিইয়েটলি।” তখন পাঠক দ্রোপদীর মুখে আধুনিক ভাষার ব্যবহার দেখে মজা পেয়েছেন নিঃসন্দেহে। শুধু বিবাদ-বিসম্বাদ নয়, নাটকটিতে আছে অনুরাগের ভাষাও। যুধিষ্ঠির দ্রোপদীকে বলেছেন-

“ওকে! মাইলড। শুরু করছি। (যাত্রার ঢঙে) ওগো প্রিয়ে পাঞ্চালী!
ওগো হৃদয়েশ্বরী! প্রাণেশ্বরী!...তুমি বিনা আমার ভুবন অন্ধকার।
তুমি আমার হৃদ আকাশের চন্দ্রিমা!”^{১৪৬}

এই নাটকটিতে জীবনান্দের কবিতার পঙক্তি সংযুক্তির ফলে কাব্যিকতা এসেছে। নকুল বলেন- ‘কে বলে তুমি সুন্দরী নও? চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।’ পঞ্চপাণ্ডবদের অসহায় অবস্থা বেদনাদায়ক হলেও মজাদার। সব মিলিয়ে নাটকটি পৌরাণিক হয়েও আধুনিক চেতনা সম্পন্ন পুনর্নির্মিত নাটক হয়ে উঠেছে।

মনোজ মিত্র - যা নেই ভারতে (২০০৫) ;

মহাভারতের কাহিনি অবলম্বন করে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে মনোজ মিত্র লিখেছিলেন ‘যা নেই ভারতে’ নামের একটি নাটক। এই নাটকটি অন্ধে নয়, পর্ব ও দৃশ্যে বিভাজিত। ২১ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১৪ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকের প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (১), চরিত্রলিপি (১) ও মূলনাটক (৪০) সহ মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ-

“কলাভূৎ পাবলিশার্স/ মনোজ মিত্র/ যা নেই ভারতে/
পুঁটিরামায়ণ/আত্মগোপন/ তিনটি পূর্ণাঙ্গ নাট্য সংকলন”^{১৪৭}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ-

“যা নেই ভারতে/ পুঁটিরামায়ণ/
আত্মগোপন/তিন- টি পূর্ণাঙ্গ নাট্য সংকলন/
মনোজ মিত্র/ কলাভূৎ পাবলিশার্স”^{১৪৮}

নাটকটি প্রথম পর্বে পাঁচটি দৃশ্য আছে, দ্বিতীয় পর্বে চারটি দৃশ্য আছে। নাটকে উল্লিখিত পাত্র-পাত্রীরা হলেন- কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদূর, কচুকী, সুবলরাজা, শকুনি, পুরোহিত, অম্বিকা, গান্ধারী, ইরা, পাতকিনী এবং রাজপুরীর কয়েকজন। নাটকটি প্রকাশিত হয় মনোজ মিত্রের সম্পাদনায় ‘কলাভূৎ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭০০০০৭ থেকে। নাটকটির মূল্য একশত পঞ্চাশ টাকা।

‘যা নেই ভারতে’ নাটকে মনোজ মিত্র মহাভারতের লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘটে যাওয়া কাহিনির সংযোগ সাধন করেছেন আধুনিক জীবনভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে। ফলে নাটকের চরিত্রগুলি ও কাহিনি নতুনভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। প্রকাশ পেয়েছে নবনির্মিত আধুনিক নাটক রূপে। ভারতের অতীত ইতিহাসের রাজ-রাজাদের টান-টান জীবনকথার মধ্যে প্রধানভাবে জায়গা করে নিয়েছে ভীষ্মের উত্তরাধিকারি পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। প্রথম পর্বে আমরা কঞ্চুকী, ভীষ্মের ও রাজ পুরোহিতের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাট্যভূমিতে প্রবেশ করি-

“শকুনি- কী করে হবে। লুটপাট করত এই কৌরবেরা....তাদের ঘরেই আপনি কন্যা সম্প্রদান করেছেন। আপনি নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করেছেন।”^{১৪৯}

প্রসঙ্গত এসেছে কঞ্চুকীর মন্তব্য। সে একরকম ব্যঙ্গ কৌতুকে কৌরব শ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে একরকম দায়ী করে বলেছেন -

“শোন ঠাকুর ভ্রাতার অবর্তমানে বধূরা চিরদিনই ভাসুর দেবরের সম্পত্তি। দ্বিতীয়ত, ভীষ্মের বিবাহ না করার প্রতিজ্ঞা। তাতে সন্তানোৎপাদন আটকায় কীসে! (ভীষ্মকে) বিশেষত সে সন্তান তো তোমায় পিতা বলেও পরিচয় দেবে না.....সে হবে রাজপুত্র.....অর্থাৎ তোমারই ভ্রাতুষপুত্র। অর্থাৎ বিধিমতো তুমি তার পিতা হয়েও হচ্ছে না! অর্থাৎ তোমার প্রতিজ্ঞাও রক্ষা পাচ্ছে! তাহলে আর বাধা কোথায় হে ঠাকুর ? হেঁ হেঁ-

বুঝতে পারছ ভীষ্ম, তোমার অত সাধের প্রতিজ্ঞার মধ্যে এতটুকু একটা রক্ত রয়ে গিয়েছে। তুমি যদি সেই সুযোগটা নিতে পারো....।”^{১৫০}

এ সকল ভাবনা সত্ত্বেও ভীষ্ম যখন রাজি হন না, তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাস সেই দায়িত্ব পালন করেন। রাণী অম্বিকা কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাসকে তৃপ্ত করতে না পারায় তার গর্ভে জন্ম নেয় অন্ধ সন্তান ধৃতরাষ্ট্র। আর ব্যাসদেবের ঔরসে অম্বালিকার গর্ভে জন্ম নেয় ছোট পুত্র পাণ্ডু। নাট্যকাহিনির চতুর্থ দৃশ্যে আসে রাজ-সিংহাসনের অধিকার নিয়ে লড়াই। কুরু প্রধান ভীষ্ম যখন পাণ্ডুর নাম হস্তিনাপুরের রাজ সিংহাসনের জন্য প্রস্তাব করেন, তখন রাজমাতা অম্বিকা প্রতিবাদ করেছেন ভীষ্মের সিদ্ধান্তের এবং নিজের অন্ধ সন্তানের অধিকার দাবি করেন। সেই প্রসঙ্গের কথোপকথনের একটি নাট্যদৃশ্য -

“অম্বিকাঃ অভয় পেলাম যদি বলি, পাণ্ডু কেন ? প্রজাপালনের সে কী বোঝে? চপল চটুল পাণ্ডুর কোনও গভীরতা আছে কী, কিংবা হৃদয়ের সেই প্রসারতা? মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী হবে পাণ্ডু। হস্তিনাপুরীর সিংহাসনে কী অযোগ্যরাই বসবে চিরকাল।

ভীষ্মঃ কিন্তু পাণ্ডু চক্ষুশ্রম! ধৃতরাষ্ট্র কী পারবে সেনাবাহিনী পরিচালনা করতে? হস্তিনার রাজা- যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাতে পারবে না, দাঁড়াতেই পারবে না, এর চেয়ে হাস্যকর আর কী হতে পারে!

অম্বিকাঃ রাজপদ পেতে গেলে বুঝি যুদ্ধ, পররাজ্য লুণ্ঠন, অপহরণ অনিবার্য? তাই যদি হয়, আমার তো মনে হয় ভারতের যেখানে যত রাজা আছেন, রাজপুরুষ আছেন.... তাদের শুধু চোখ নয়, সেই সঙ্গে হাত-পা কোনওটাই অটুট রাখা উচিত নয়। সবাইকে ধরে ধরে নখ দাঁত উপড়ে দেওয়া হোক!

ভীষ্মঃ বুঝতে পারছি, ধৃতরাষ্ট্রের মতো সপত্নীপুত্রের সৌভাগ্যে তুমি হিংসাপরায়ণা। নইলে পাণ্ডুর বীরত্বে কে না গর্ব করে?”^{১৫১}

নাটকের দ্বিতীয় পর্বের প্রথম দৃশ্যের সূত্রপাত শকুনি ও সুবল রাজার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। সেখানেই আসে গান্ধারীর সঙ্গে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহের কথা। শকুনি পিতা সুবল রাজাকে দায়ী করেছেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার জন্য। একসময় পিতাও কন্যা গান্ধারীর সর্বনাশ বুঝতে পেরেছে। তাই গান্ধারীর কাছে অনুশোচনা করে পিতা সুবলরাজ বলেছেন –

“না মা গান্ধারী, শকুনি ঠিকই বলে। আমি বহু ক্ষেত্রে দেখেছি, ও আমার চেয়ে বেশি বুদ্ধি ধরে। তোর বিবাহের পরে এরা আমার সঙ্গে ভিক্ষুকের মতো ব্যবহার করছে। ওহোহো অর্থের লোভে আমি তোর সর্বনাশ করেছি মা। একটা জন্মান্বের হাতে তাকে সম্প্রদান করলাম! (অশ্রুপাত করে) লোভে পড়ে একী করলাম শকুনি!”^{১৫২}

গান্ধারী যখন নিজের চোখ বস্ত্রখণ্ডে সারা জীবনের জন্য বাঁধেন এবং রাজপুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর মনের অবস্থা অনুভব করেছেন। তাঁর এই ত্যাগ যে আনন্দের নয়, সে কথা বুঝতে পেরে ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন–

“শুনেছি, শুনেছি। অনেকবার একথা শুনেছি তোমার মুখে। অতুলনীয় তোমার পতিপ্রেম। তবু কেন যে মনে হয়, বস্ত্রখণ্ডের আড়ালে তুমি লুকিয়ে পড়েছ। অন্ধের মুখ দেখবে না বলেই মুখ ঢেকেছ লজ্জায়, হতাশায়! খোল, খোল গান্ধারী....”^{১৫৩}

একসময় পাণ্ডু নিজের পুরুষত্বহীনতায় মর্মান্বিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে দায়ী করেছেন। অন্ধ ভাইকে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন –

“শোনো হে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডুর রানিদের কথা শোনো! পুরুষত্বহীন রাজার রানিদের দুর্দশার কথা শোনো... (ধৃতরাষ্ট্র বিম্ব ধরে বসে আছে) দেখো, দেখো বিদূর নীরবতা লক্ষ্য করো। কি ভাবছে, কিছু বোঝার উপায় নেই! মানুষের মনোভাব নাকি ফুটে ওঠে চোখে। ওর কী সুবিধা বলো। ও কী ঘুমে, নাকি জাগরণে- কী বুঝবে? (ধৃতরাষ্ট্রকে ঝাঁকুনি দেয়) এই যে! এই যে!... এই যে, এই যে নীরব কর্মী, নীরব কত বড় দাঁওটা মারলে দাদা! এই পাণ্ডু ত্রিভুবন লুণ্ঠন করে হস্তিনার ভাণ্ডার পূর্ণ করে গেল, আর তোমার পুত্রপৌত্র পরমসুখে সব ভোগ করে যাবে! ওই যে রমণী রত্নটি ভোগ করো, সে কার লুণ্ঠন? বাঃ বারে মজা ! ওরে অচল, ওরে মৌনী,

ওরে গিরিরাজ..তোমায় অতিক্রম করা যায় না। ললাটে জয়পত্র তোমার।
পাণ্ডুর নয়..... পাণ্ডুর নয়.....”^{১৫৪}

এরপর পাণ্ডু রাজবাড়ি ত্যাগ করে দুই পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে অরণ্যে আশ্রয় নেন। কিছুদিন পর পাণ্ডুর মৃত্যু হয়। পিতামহ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে হস্তিনাপুরের রাজ সিংহাসনে বসাতে চান। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র বসতে চায় না। তিনি নিজের অন্ধত্বের অক্ষমতা প্রকাশ করে বলেন-

“হ্যাঁ জেঠামশাই, যে রাজা নিজে কখনও রণসাজ পরবে না, কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াবে না.... কোন লজ্জায় অপরের সন্তানকে সে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে! না, যুদ্ধ নয়-লুণ্ঠন নয়! অন্য দেশকেও আমাদের এবার বোঝাতে হবে-”^{১৫৫}

অন্য কোন পথ না থাকায় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত কৌরব রাজ-সিংহাসনের অধিকারী হন। গান্ধারীর সন্তান উৎপাদনে অক্ষমতার কারণ জানিয়ে ধৃতরাষ্ট্র শকুনিকে বলেছেন -

“দেবদ্বিজ সবাইকে কৃপা করে তোমার ভগ্নীকে কেন করছে না গুনবে শকুনি? উনি স্বেচ্ছায় স্বহস্তে নিজের জরায়ুটিকে বিনষ্ট করেছেন। অন্ধ স্বামীর মুখদর্শন করবেন না বলেই —”^{১৫৬}

ধৃতরাষ্ট্রের এই কথায় রয়েছে যুক্তিপূর্ণ ভাবনা, যাতে একালের ন্যায়পরায়ণ মানুষের পরিচয় ফুটে উঠে। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর কুন্তির ব্যাকুল ক্রন্দনে স্বর্গের চার দেবতা তাঁকে পঞ্চপুত্র দান করেন। একথা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস জানালে ধৃতরাষ্ট্র মানতে চান না। বরং প্রশ্ন করেন -

“একটাই খটকা। দেবতারা যদি ক্রন্দনে সাড়াই দিলেন তাহলে পাণ্ডুর ক্রন্দনে সাড়া দিয়ে তার পুত্র উৎপাদনের অক্ষমতাই তো দূর করতে পারতেন। সেটাই হত দেবতার পক্ষে শোভনসুন্দর। তা না করে নিজেরাই সন্তান দান করতে গেলেন কেন...? দেবতাদের কেমন যেন সুযোগসন্ধানী আর চতুর লাগছে না পিতা?”^{১৫৭}

কিন্তু পিতামহ ভীষ্ম নিজের লক্ষ্য পূরণে অটুট। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর সন্তান বলে পঞ্চপাণ্ডবকে স্বীকৃতি দিতে না চাইলেও ভীষ্ম তাঁদের উত্তরাধিকারী রূপে গ্রহণ করেন। পিতামহ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন -

“শোনো ধৃতরাষ্ট্র, শোন বিদূর, আমি আছি পঞ্চপাণ্ডবের পাশে। হস্তিনার সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরূপে তোমরা যদি তাদের স্বীকৃতি না দাও,

তারাই তা কেড়ে নেবে। মহর্ষি ব্যাসের সাক্ষাতে আমার প্রতিজ্ঞা-
শরীরের শেষ রক্তবিন্দু ঢেলে দেব আমার লক্ষ্যপূরণে! চলুন মহর্ষি...”^{১৫৮}

শকুনি গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দেয় কুন্তির সন্তানদের যোগ্য প্রতিপক্ষ পূর্ব থেকেই
প্রস্তুত করার। সেই প্রসঙ্গে শকুনি বলেন -

“শোনো গান্ধারী। যদি হত সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদ, এ
বিবাদ এতদূর গড়াত না। তা যে নয় গান্ধারী। এ বিবাদ দুটি পরস্পর
বিরোধী নীতির.... দুটি বিরোধী দর্শনের। একদিকে দেশব্যাপী অবাধ
লুণ্ঠনের রাজকীয় অধিকার ফিরিয়ে আনা আর একদিকে তোমার স্বামীর
প্রতিরোধ সংকল্প। (ধৃতরাষ্ট্রকে) রাজা ধৃতরাষ্ট্র, মীমাংসা যদি চাও,
তোমাকেও অস্ত্র ধরতে হবে। তোমার বাহিনী চাই রাজা, প্রবল শক্তির
মোকাবিলা করতে প্রবলতর শক্তিধর বাহিনী চাই।”^{১৫৯}

একসময় বন্যরাজ্যে বড়ো হয়ে ওঠা অনাথ পাতকিনীর সন্তানেরাই হয়ে ওঠে গান্ধারী ও
ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র। কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর শুরু হয় কৌরব-পাণ্ডবদের
মহাসমর কুরুক্ষেত্রে অধিকার প্রাপ্তির লড়াই। পাণ্ডবরা যুদ্ধে জয়ী হলে, অন্ধ রাজা
ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র মৃত্যুবরণ করলে স্বজনহারা, রাজ্যহারা রাজারাণী ‘যুদ্ধোপাদ’ আখ্যা
নিয়ে বনবাস যাত্রা করেন। এটি মহাভারতের একটি গুপ্ত অধ্যায়ের আধুনিক নাট্য-
আখ্যান। মহাভারতীয় আখ্যান হলেও নাট্যকার তাকে পৌরাণিক পরিমণ্ডল থেকে বার
করে এনে আমাদের চেতনার জগতে উপস্থাপন ও পরিবেশন করেছেন। ফলে নাটকটি
পুরাণ কাহিনির পুনর্নির্মাণ ও নবনির্মাণ হয়েছে।

মহাভারতে নেই এমন কাহিনির বাস্তবায়ণ নাট্যকার মনোজ মিত্র ‘যা নেই
ভারতে’ নাটকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই কাজকে সম্পন্ন করার জন্য তিনি
মহাভারতের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রকে গ্রহণ করেছেন। পৌরাণিক পরিমণ্ডলটিকে
রক্ষা করার জন্য কৌরব-পাণ্ডবদের বিরুদ্ধপক্ষ বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। এখানে
আছে ভীষ্মের হস্তিনাপুরের জন্য আগামী প্রজন্ম পাওয়ার তীব্র ইচ্ছা, পাণ্ডুর বেদনাময়
জীবনের পরিচয় ও মৃত্যু, ধৃতরাষ্ট্রের নিজের অন্ধত্বের প্রতি ক্ষোভ, শকুনির চক্রান্ত,
অশ্বিকার অধিকারের দাবি, গান্ধারীর অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে পতিপ্রেমের পরিচয়,
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের হস্তিনাপুরের পরবর্তী বংশধর উৎপাদনের দায়িত্ব পালন— প্রভৃতি
ঘটনা মূল মহাভারতে তেমনভাবে নেই। পৌরাণিক মহাভারতে রাজ মহলের অন্তপুরের
ঘরোয়া জীবনচিত্র উপেক্ষিত হয়েছে। সেখানে অস্ত্রের ঝনঝনানি জীবনের কোমল

অনুভূতিগুলিকে চাপা দিয়েছে। ব্যাসদেবের মহাভারতে কৌরব-পাণ্ডবদের কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের কথাই মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। সেখানে কৃষ্ণের অনবদ্য ভূমিকা, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, কর্ণের জীবন পর্বের সমাপ্তি, দুর্যোধনের পরাজয়, অর্জুনের শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হয়ে উঠা, দ্রৌপদীর সতীত্বের অবমাননা প্রভৃতি অজস্র ছোট-বড়ো ঘটনার টান-টান আকর্ষণ পাঠককে আকৃষ্ট করলেও হস্তিনাপুরের রাজবাড়ীর অভ্যন্তরের গুপ্তকাহিনির সূত্র অশেষণে খুব একটা কেউ খেয়াল দেননি। একালের নাট্যকার মনোজ মিত্র ‘যা নেই ভারতে’ নাটকে সেই সব গুপ্ত ঘটনার প্রতি আলোকপাত করে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন। পৌরাণিক চরিত্রগুলির মুখে যুক্তিসঙ্গতভাবে সংলাপ বসিয়ে সেকালের ভাবনাকে আধুনিককালের মানস-দর্পনে প্রতিফলিত করেছেন। প্রতিটি চরিত্র নিজস্ব ভাবনার দ্বারা চালিত। শকুনি চরিত্রটি এখানে যতটা কুটিল, তারচেয়েও বেশী যুক্তিপূর্ণ ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত। ভগ্নী গান্ধারীর সারা জীবনের দুঃখের জন্য এবং অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী হওয়ার জন্য তিনি পিতা সুবলরাজাকেই দায়ী করেছে। শকুনি পিতাকে আভিযোগ করে বলেন—

“ধ্বংস করে দিয়েছেন! আপনার উদ্যানের সবচেয়ে সুন্দর ফুলটিকে এমন দেবতার পায়ে রেখেছেন, যে কোনওদিন চোখ মেলে একবার দেখবে না! পিতা, দেখার মানুষ না থাকলে লক্ষ সহস্র ঐশ্বর্য নিয়ে ধরিত্রীকেও হাহাকার করতে হত...আমার ওই বোনটির মতো সেও বুঝি কৃষ্ণ বস্ত্রে মুখ ঢাকতো!”^{১৬০}

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর এই স্বার্থত্যাগকে গ্রহণ করতে পারেনি। এমনকি গান্ধারীর জন্য মনে মনে দুঃখ পেয়েছে। গান্ধারীকে একসময় ধৃতরাষ্ট্র অনুশোচনা করে বলেন—

“কেন, আমায় কেন? মালা দিলে তুমি গান্ধারী? এই ভারতে কত নৃপতি আছেন... যোদ্ধা মহাযোদ্ধা রথী-মহারথী... কুরুবংশেই রয়েছে রূপবান পাণ্ডু... সবাইকে ছেড়ে আমায় কেন...”^{১৬১}

রাজা হওয়ার পর ধৃতরাষ্ট্র রাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন চেয়েছে। তিনি অন্যের রাজ্য লুণ্ঠন বা অন্যের সন্তানকে যুদ্ধে মারতে চাননি। এমনকি ভীষ্মের কথামতো অশ্বমেধ যজ্ঞের মধ্য দিয়ে অন্য রাজ্য লুণ্ঠন করতে চাননি। ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মকে যুক্তি দিয়ে বলেছেন —

“অশ্বমেধ কোনও যজ্ঞই নয়। ওটা অবাধ লুণ্ঠনের একটি শাস্ত্রীয় পন্থা মাত্র।”^{১৬২}

এখানে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র অন্য এক মানুষ। ভীষ্ম নিজ পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর একটি উজ্জ্বল চরিত্র। তাঁর মধ্যে পৌরাণিক মহাভারতীয় তেজ অপেক্ষা আধুনিক মানুষের দীপ্ত-বুদ্ধির পরিচয় মেলে। নিজে হস্তিনাপুরের রাজ সিংহাসনে কোনদিন না বসলেও রাজ্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর ভীষ্ম সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে রাজা করে নিজে রাজত্ব চালিয়েছেন। এমনকি অম্বিকা যখন ভীষ্মের কাছে সন্তান চেয়ে প্রার্থনা জানায়, তখন অম্বিকাকে ভীষ্ম বুঝিয়ে শান্ত করেছে। গান্ধারীর আত্মত্যাগকে ভীষ্ম সম্মান জানান। এইভাবে ভীষ্ম চরিত্র হস্তিনাপুরের অন্তর-বাহিরে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই নাট্যকাহিনি থেকেই আমরা জানতে পারি যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের ঔরসজাত সন্তান রাণী অম্বিকার গর্ভে জন্ম নেয় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র এবং রাণী অম্বালিকার গর্ভে জন্ম নেয় পাণ্ডু। হস্তিনাপুরের রাজবংশের উত্তরাধিকারির জন্মবৃত্তান্ত এইভাবেই নাট্য কাহিনিতে উন্মোচিত হয়েছে। সেই সঙ্গে আছে আর একটি ঐতিহাসিক পরিচয়, সেটি হল নিয়োগ প্রথায় সন্তান উৎপাদন। পাতকিনী চরিত্রটি এখানে কাল্পনিক ও সংযোজিত চরিত্র। সে অনাথ শিশুর মা হিসেবে পরিচিত। এখানে আর একটি গুপ্ত অধ্যায়ের দ্বার উন্মোচিত হয়। দুর্যোধন গান্ধারীর সন্তান নয়— সে অনাথ বালক। কারণ গান্ধারীকে সন্তান উৎপাদনে অক্ষম দেখানো হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর হস্তিনাপুরের রাজ সিংহাসন পঞ্চপাণ্ডবের অধিকারে আসে। এইভাবে প্রতিটি চরিত্র যেন না বলা মহাভারতের আখ্যান উন্মোচনে তৎপর। নাটকের প্রতিটি চরিত্রের সংলাপ তাঁদের অন্তর জগতের ভাবনাকে ও মানসিক দ্বন্দ্বকে উদঘাটন করেছে। নাটকের অন্তিমে ধৃতরাষ্ট্র শত শিশুর উদ্দেশ্যে ধৃতরাষ্ট্রের সেই রকম একটি সংলাপ আছে—

“পুত্রগণ, আমরা বড় অসহায়, বড় একা নিরাপত্তাবিহীন। ওই দেবতা সাধু আর যোদ্ধাদের মিলিত চক্র আমার ধ্বংসে এগিয়ে আসে!... অস্ত্রের ঝংকার উঠেছে!...রক্ষা করো—বন্য হিংস্রতা নিয়ে, ক্রুরতা নিয়ে, বর্বরতা নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ো!... আক্রমণ করো...ন্যায়নীতি ধর্মশাস্ত্র সব অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করো...ধ্বংস করো! জয় চাই... যে কোনও মূল্যে জয় চাই। পাতকিনীর সন্তানেরা তোদের কোনও পাপ নেই। তোদের পাপ হয় না।”^{১৬৩}

শুধু তা নয় নাটকটির নারী চরিত্রের ভাষাতেও আছে অধিকারবোধের বাস্তব যুক্তি, যাতে একালের নারীবাদী ভাবনার প্রকাশ হয়। অম্বিকা ভীষ্মের কাছে নিজের অধিকার দাবি করে বলেছেন—

“ওঃ! ভীষ্ম তার সঙ্কল্প ত্যাগ করতে পারে না, ত্যাগ যা করার করতে হবে অম্বিকাকে! যত দায় দায়িত্ব পালন করতে হবে নারীকে! তার বেলা পক্ষে পতন নয়! স্বপ্ন সাধ পূরণের প্রত্যাশী সে হতে পারে না! যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিতে হবে তাকে?”^{৬৪}

এইভাবে ধীরে ধীরে মহাভারতের চরিত্রগুলি একালের প্রেক্ষাপটে পুনর্নির্মিত হয়ে নাটকটিকে সার্থক করে তুলেছে।

সৌমিত্র বসু - একলব্য (২০০৯);

মহাভারতের কাহিনি নিয়ে নাট্যকার সৌমিত্র বসুর ‘একলব্য’ নামে একটি একাঙ্ক নাটক লিখেছিলেন। নাটকটি ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১২ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকের প্রচ্ছেদপত্র (১), উৎসর্গপত্র (১), প্রস্তাবনা (১), চরিত্রলিপি (১), মূল নাটক(১৩) সহ মোট ১৭টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ -

“কলাভূৎ পাবলিশার্স/ সৌমিত্র বসু/ মঞ্চের অপেক্ষায়/
ছোট নাটকের সংকলন।”^{৬৫}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ-

“মঞ্চের অপেক্ষায়/ ছোট নাটকের সংকলন/ সৌমিত্র
বসু/ কলাভূৎ পাবলিশার্স।”^{৬৬}

চরিত্রলিপিতে উল্লিখিত পাত্র-পাত্রীরা হলেন ভীম, একলব্য, হিরণ্যধনু, অর্জুন, দ্রোণাচার্য, বাসন্তী। উৎসর্গ-পত্রটি এইরূপ —

“শহর মফস্বল গ্রামের সেই সব নাট্যকর্মীদের/ ছোট নাটক নিয়ে যাঁরা
মঞ্চে লড়ে যাচ্ছেন।” ^{৬৭}

নাট্য প্রস্তাবনা অংশে নাট্যকার বলেছেন -

“নিজের নানা ভাবনা চিন্তা, নিজের ভেতরে গুটিয়ে থাকা নানা রকম
ইচ্ছে স্বপ্ন আদর্শ বিশ্বাস জায়গা করে নিয়েছে লেখাগুলোর ভেতরে,
আমার নিজের মুখ যেন দেখতে পাচ্ছি সেখানে।”^{৬৮}

অর্থাৎ মহাভারতের ভাবনা এখানে থাকলেও আধুনিক নাট্যকারের মননচিন্তা নাটকটিতে প্রধানভাবে স্থান লাভ করেছে। নাটকটি প্রকাশিত হয় সৌমিত্র বসুর তত্ত্বাবধানে নবগ্রন্থ কুটির, ৫৪/৬ এ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩ থেকে। নাটকটির মূল্য আশি টাকা।

‘একলব্য’ নাটকটির সূত্রপাত হয়েছে অরণ্যভূমির নিষাদ রাজ হিরণ্যধনু ও বাসন্তীর কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে -

“[ভোর হয়নি এখনো। ঘোর জঙ্গলের মাঝখানে দ্রোণাচার্যের একটি মাটির মূর্তি। প্রবেশ করেন নিষাদরাজ হিরণ্যধনু, সঙ্গে বাসন্তী। ক্লান্ত পায়ে দুজনে এসে দাঁড়ান সেই মূর্তির সামনে।]

হিরণ্যধনু - এখনো আসেনি। ভোরের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে তো তার চলে আসার কথা।

বাসন্তী - (চারদিকে দেখে) ভোর তো হয় নি এখনো।”^{১৬৯}

তাদের কথাতে উঠে আসে পাণ্ডব গুরু দ্রোণাচার্যের প্রসঙ্গ। হিরণ্যধনু দ্রোণাচার্যকে দায়ী করে বলেন-

“এই আমার সবচেয়ে বড় শত্রুর মূর্তি। আমার ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন হয়ে আসে এই মুখ, আমাদের ছেলেকে বুক থেকে কেড়ে নিয়েছে, আর তোর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে তোর ...”^{১৭০}

ক্রমে নাট্যকাহিনিতে প্রবেশ করে একলব্য। প্রেমিকা বাসন্তী ও পিতা হিরণ্যধনুকে দেখে একলব্য বলে - “একি, বাবা! বাসন্তী! তোমরা? কেন এসেছ?” হিরণ্যধনু পুত্র একলব্যকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু একলব্য যেতে চায় না, সে নিজের লক্ষ্যে একনিষ্ঠ থাকে। সে দৃঢ়ভাবে পিতাকে জানায় -

“সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে গুরুর আশীর্বাদ না পাওয়া পর্যন্ত আমার জীবনে কোন পরব নেই, কোন ছুটি নেই আমার।... গুরু হে, জোর দাও, মনে জোর এনে দাও। সব ভুলে যেতে দাও। শুনেছি অর্জুন আর সব ভুলে গিয়ে শুধু পাখির চোখ দেখেছিল। আমিও যেন তেমনি শুধু তোমার দুটি পায়ের দিকে মন সঁপে রাখতে পারি। শুধু তোমার দুটি পা।”^{১৭১}

ইতিমধ্যে নাট্য প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয়, অরণ্যে উপস্থিত হন গুরু দ্রোণাচার্য, অর্জুন ও ভীম এবং একটি শিকারি কুকুর। কুকুরটি একলব্যকে দেখে ডাকতে শুরু করে। একলব্য চিনতে পারে পাণ্ডবদের কুকুরটিকে, তির দিয়ে সে কুকুরটির মুখ বন্ধ করে

দেয়। রক্তহীন, ক্ষতহীনভাবে কুকুরটির মুখ বন্ধ অবস্থায় দেখে অর্জুন আশ্চর্য হয়ে বলে উঠে- “এই অদ্বিতীয় ধনুর্ধরটি কে?” ভীম জানায় একলব্য। সেই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাট্য সংলাপের মুহূর্ত-

“ভীম - একলব্য, একলব্য... নামটা খুব... মনে পড়ছে, নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র। আমাদের অস্ত্রশিক্ষার মণ্ডপে এসেছিল আচার্যদেবের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করবে বলে। অস্পৃশ্য নিষাদ।

দ্রোণাচার্য - আমি তো সেই স্পর্ধার সমুচিত ফল দিয়েছিলাম অর্জুন। কুকুরের মত তাকে মণ্ডপ থেকে বিতাড়িত করেছিলাম।

অর্জুন - জানি। মনে আছে। আর এও মনে আছে সেই পাপিষ্ঠ হীনজন্মা এই অপমানেও নিরস্ত হয় নি। যাবার সময় সে বলে গিয়েছিল

একলব্য - বেশ, আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে একটা কথা বলে যাই। আপনি আমায় শিষ্য বলে গ্রহণ করুন বা না করুন, এই মণ্ডপে দাঁড়িয়ে সকলের সামনে আমি চিৎকার করে বলব, আপনি আমার গুরু। আপনি ছাড়া আর কেউ নন। আমি দেশে ফিরে যাচ্ছি, সেখানে গিয়ে আপনার মূর্তি গড়ব, তারপরে সেই মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে শুরু হবে আমার অস্ত্রশিক্ষা। প্রণাম গুরুদেব, প্রণাম।”^{১৭২}

গুরু দ্রোণাচার্য অনুভব করেন অর্জুনের সমগোত্রীয় এই একলব্য। তাই তিনি মানসিক দোলাচলতার মধ্যে পরেন। অর্জুন একথা বুঝতে পারে। সে গুরুদেবকে লক্ষ্য করে বলে-

“আমি বলতে চাই আমার বা তোমার সঙ্গে একলব্যের কোন ভেদ নেই। একই গুরুর শিষ্য আমরা তিন বীর।”^{১৭৩}

অর্জুনের কথা শুনে একলব্য মানসিক শান্তি পায়। সে আনন্দিত হয়ে বলে -

“আমি ধন্য। এ সম্মান লাভে আমি ধন্য। আঃ, মনে হচ্ছে দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর বুঝি আমার তীর্থে পৌঁছোতে পারলাম। এবার আমি মুক্ত, আমার প্রতিজ্ঞা থেকে মুক্ত। আমার অপমানের জ্বালা থেকে মুক্ত।

আপনাদের বিদায় দিয়ে আমি আবার রোজকার জীবনে ফিরে যেতে পারব। বন্ধুদের সঙ্গে নাচব পরবের আনন্দে.....।”^{১৭৪}

এরপর আসে নাটকের climax পর্ব এবং অর্জুনের চক্রান্ত ও হৃদয়হীনতার প্রসঙ্গ। আর অন্যদিকে আসে একলব্যের একনিষ্ঠ গুরুভক্তির কথা। অর্জুন যখন গুরুদক্ষিণার কথা বলে একলব্যকে, তখন একলব্য প্রাণ দিতেও রাজি হয়ে যায়। অর্জুন একলব্যকে বলে- “ডান হাতের বুড়ো আঙুল কেটে গুরুর চরণে অর্পণ করো একলব্য, এই তোমার গুরুদক্ষিণা।” কিন্তু গুরুদেব তা চান না; তিনি মনে মনে মর্মাহত হন। দ্রোণাচার্য অর্জুনকে বলেন- “আপন বীরত্বের খ্যাতি নিষ্কণ্টক করবার জন্য তুমি....।” অর্জুন বলে -

“না, শুধু আমার নিজের জন্য নয় আচার্য, আমাদের সকলের জন্যে, আর্য জাতির মঙ্গলের জন্য আপনাকে এই গুরুদক্ষিণা চাইতে হবে।”^{১৭৫}

অর্জুন গুরুদেবকে বাধ্য করে একলব্যের ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি কেটে নেওয়ার জন্য। তাতে একলব্য রাজি হয়ে যায় -

“ইতিহাসে সে চিরকালের জন্য কলঙ্কের অঙ্করে লেখা হয়ে থাকবে আর্য রাজপুত্র অর্জুনের নাম। যে এক নিষাদপুত্রকে ছলনা করে প্রতিহত করেছিল।... ওর চেয়ে বড় বীর যদি নিষাদ বংশ থেকে উঠে আসে তবে আর্য প্রভুত্বের অবসান ঘটে যাবে।.... আজ থেকে আমার এই গুরুদক্ষিণার স্মৃতি ক্ষতচিহ্নের মত লেগে থাকবে প্রতিটি নিষাদ যুবক-যুবতীর মনে। আমি দূরবর্তী কোন আদর্শ হতে চাই না বাসন্তী, আমি স্মৃতি হতে চাই, অত্যাচারের স্মৃতি, সে স্মৃতি থেকে ভয়ঙ্কর ক্ষোভ জেগে ওঠে।”^{১৭৬}

নাট্যপরিণতিতে একলব্যের কাছে গুরু দ্রোণাচার্য নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন এবং তার উপর যে অন্যায় হয়েছে তার জন্য দুঃখ করেছেন। দ্রোণাচার্য বলেছেন -

“না একলব্য, আমাকে আর ওই সম্বোধন করো না। আমি আর ওই সম্বোধনের যোগ্য নই। শুধু একটা কথা তোমাকে বলে যাই। যে অপরাধ আজ অর্জুন করল, পাণ্ডবদের শিক্ষাগুরু বলে নিরুপায় হয়ে অপরাধ আমাকে করতে হল, একদিন তার বিচার হবে। একদিন আমাদের

পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে একলব্য। আমি তুমি সেদিন থাকব না, কিন্তু আসবে সেইদিন। আসবেই।”^{১৭৭}

এইভাবে পৌরাণিক চরিত্রগুলি আধুনিক মানুষের চিন্তা-চেতনায় অতি আধুনিক হয়ে উঠেছে। ফলে নাটকটি পৌরাণিক আবরণ ভেদ করে একালের নাট্যপ্রেমী দর্শকের কাছে সমাদ্রিত হয়েছে।

সৌমিত্র বসুর ‘একলব্য’ নাটকের প্রধান চরিত্র একলব্য। সে নিষ্ঠার প্রতীকীভাবনায় আলোকিত। সে নিজস্ব লক্ষ্যে অবিচল, অটুট। পাণ্ডবদের শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্যের কাছে ধনুর্বিদ্যা শিখতে গিয়ে অপমানিত হয়েছে নিষাদ সন্তান বলে। গুরুদেব তাকে কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু একলব্য তার নিষ্ঠার পথে অবিচল থেকেছে। সে গুরুদেবের কাছে সরাসরি অস্ত্র বিদ্যা শিখতে না পারলেও আপন মনের দৃঢ়তায় সেই কাজে সিদ্ধিলাভ করেছে। এ একলব্য পরাজয় মানতে জানে না, হারতে জানে না—নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে কোন কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারে। পিতা নিষাদরাজ হিরণ্যধনু তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে, একলব্য পিতাকে নির্দিধায় জানিয়ে দেয়—

“আমার সাধনা শেষ না করে আমি ঘরে ফিরব না।”^{১৭৮}

আবার গুরু দ্রোণাচার্য যখন অর্জুনের কথায় প্রভাবিত হয়ে অন্যায়ভাবে গুরুদক্ষিণার জন্য তার বুড়ো আঙুলটি দাবি করেন, তখন একলব্য বিন্দুমাত্র ভয় পায়নি। গুরুর প্রতি ভক্তির অবিচল নিষ্ঠার গণ্ডিতে দাঁড়িয়ে বুড়ো আঙুলটি কেটে গুরুর চরণে অর্পণ করেছে। এটি সমগ্র মহাভারতের প্রেক্ষাপটে একটি স্বতন্ত্র ঘটনা, যা মহাভারতের আর একটি অধ্যায়ের সূচনা করে। একদিকে অর্জুনের শ্রেষ্ঠ বীরের খ্যাতি, অন্যদিকে একলব্যের উপর চরম অন্যায়—মহাভারতের এই রকম একটি বিরলতম ঘটনাকে এই নাটকের বিষয় করা হয়েছে। এখানে গুরুচরিত্র হিসেবে দ্রোণাচার্য কলঙ্কিত। যাকে তিনি অস্ত্র শিক্ষা দেননি, তার কাছ থেকে গুরুদক্ষিণা নেওয়া অন্যায়। আথচ দ্রোণাচার্য নিয়েছেন। অন্যদিকে একলব্য দ্রোণাচার্যকে মনে-প্রাণে গুরু হিসেবে মানে বলে গুরুর কাছে শিষ্যের স্বীকৃতি পেয়ে মনে মনে খুশি হয়েছে। তাই সে গুরুদক্ষিণা দিতে অস্বীকার করেনি। সে অর্জুনকে বলেছে ‘আচার্য দ্রোণের জন্য যদি প্রাণ দিতে হয়, তাতেও আমি বিমুখ হব না’। অর্জুনের চক্রান্তের শিকার হয়েছেন স্বয়ং গুরুদেব দ্রোণাচার্য, কিন্তু তাঁর অন্তরে শিষ্য একলব্যের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতির প্রকাশ তাঁকে যথার্থ গুরুর মর্যাদা দান করেছে। দ্রোণাচার্য একলব্যের প্রেমিকা বাসন্তীকে বলেছেন -

“আমার ওপর রাগ করো না কন্যা, আমি এক হতভাগ্য, যার নিয়তি অনুশোচনার আগুনে নিজেই নিজেকে পোড়ানো...সমস্ত জীবন। যে হাতে একলব্যের রক্ত লেগে আছে, সেই হাত চোখের সামনে তুলে দেখব, আর নিজেকে বারবার, বারবার তীক্ষ্ণশলা ঘৃণা দিয়ে বিদ্ধ করতে থাকব সমস্ত জীবন। হা ঈশ্বর!”^{১৭৯}

একলব্য বুঝতে পেরেছে অর্জুনের স্বার্থপরতার দিকটি এবং গুরু দ্রোণাচার্যের অসহায় অবস্থার কথা। তাই অর্জুনকে একলব্য আক্রমণ করে তার অসং উদ্দেশ্যটি পরিষ্কার করে দিয়েছে। অর্জুনের নামে কলঙ্কের ইতিহাস রচিত হবে বলে সে ধিক্কার জানিয়েছে। এ একলব্য যেন মহাভারতের একলব্য নয়, সে এক ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। এই নাটকে অর্জুন কুচক্রি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছে। তার সমকক্ষ তীরন্দাজ যাতে কেউ হতে না পারে, সেই ভয়েই অর্জুন কৌশল করে নিষাদ রাজের পুত্র একলব্যের বুড়ো আঙ্গুলটি কেটে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছে। এমনকি অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যকেও ভুল পথে চালিত করেছে। নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করাই অর্জুনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সে যে পথে অবলম্বন করেছে তাতে তার বীরত্বের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। একলব্যের প্রমিকা বাসন্তীও অর্জুনের চক্রান্তের কথা কথা বুঝতে পেরেছে। সে একলব্যকে নির্দিধায় বলেছে—

“কেন, এই অন্যায় প্রতিজ্ঞা তোমাকে পালন করতেই হবে কেন? তুমি তো বুঝতে পারছ এ তোমার গুরুর দাবি নয়, তুমি তো বুঝতে পারছ অর্জুন তার পথের কাঁটা তুলে ফেলবার জন্যে এই কৌশল করেছে?”^{১৮০}

বাসন্তীর কোনো কথাতেই একলব্য তার লক্ষ্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয় নি। ভীম চরিত্রটি এখানে কাহিনির পরিবেশ সংযোজনে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। নাট্যকার সৌমিত্র বসু ছটি চরিত্রের সংঘাতময় কথোপকথনে এবং আধুনিক ভাষার ব্যবহারে এমনভাবে নাট্যপরিবেশ রচনা করেছেন, তাতে পুরাতন মহাভারতের কাহিনি পুনর্নির্মিত হয়েছে আধুনিক জীবন ভাষ্যে। একালের দর্শক এই নাট্যকাহিনিতে একলব্য চরিত্রটিকে ভিন্নভাবে উপলব্ধি করেন। নাটকটি অন্ত্যজ বা নিষাদ মানুষের উপস্থিতি থাকলেও কোথাও তাদের উপজাতিগত ভাষার ব্যবহার করা হয়নি। তবে নাটকের একটি বিশেষ দিক হল আবেগপূর্ণ সমাজ ভাষার পরিচয়। হিরণ্যধনুর সংলাপে এই ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়-

“তুই... তুই আমাকে (নিজেকে সামলে) নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর দিকে তির উঠিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ নিস্তার পায় নি একলব্য। এই প্রথম। তোর

মায়ের কথা, বাসন্তীর কথা, আজকের পরবের দিনটার কথা ভেবে। আর তোর কথাও ভেবে একলব্য। সাধনার শেষে তো তোকে জিজ্ঞেস করতে হবে, নিজের ভালোবাসার মানুষকে দূরে সরিয়ে দিয়ে এত কিছু যে করলি, কী পেলি তার বদলে ? একথা কিন্তু তোকে জিজ্ঞেস করব, আমি, তোর মা, বাসন্তী সব্বাই। বাপের ওপর যে তির তুললি, সে তির তোকে কোথায়, কোন মোক্ষে পৌঁছে দিল জানতে তো হবেই। তা যাই। তোর সিদ্ধি হোক। আয় বাসন্তী, চলে আয়।”^{১৮১}

এইভাবে প্রতিটি চরিত্রের ভাষা আধুনিক মানুষের মুখের ভাষা হয়ে উঠেছে। মহাভারতের কাহিনি, চরিত্র, ঘটনার পুনর্নির্মাণ হলেও নাট্যকার নাটকটির মধ্যে একলব্যের সততা, নিষ্ঠা, শিক্ষার পারদর্শিতা যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি অর্জনের শঠতা, হীন চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, কাপুরত্ব প্রকাশ করেছেন। ঘটনা, চরিত্র, পরিবেশ নতুনভাবে সৃজন করে নাট্যকার নাটকটির পুনর্নির্মাণ করেছেন।

অঙ্কুর মজুমদার – উলটপুরাণ (২০০৯);

মহাভারতের কাহিনি অবলম্বন করে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে অঙ্কুর মজুমদার লিখেছেন ‘উলটপুরাণ’ নামের একটি নাটক। ২১ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১৩ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটিতে প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র(১), চরিত্রলিপি(১), মূল নাটক(৫২) সহ মোট ৫৫টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ-

“নাট্য সংকলন -২/ সম্পাদনা ইন্দ্রজিৎ পাল/ অন্তিকা চ্যাটার্জি”^{১৮২}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ-

“উলটপুরাণ/ অঙ্কুর মজুমদার/ চরিত্রলিপি।” ^{১৮৩}

নাটকে উল্লিখিত চরিত্রগুলি হল- সূত্রধার, কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, শকুনি, দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, কর্ণ, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, হনুমান, নারদ, ইন্দ্রজিৎ, বালী, বাল্মীকি, কৃষ্ণ। নাট্য অভিনেতাসহ চরিত্র লিপিটি এইরূপ -

“চরিত্র লিপি”

“সূত্রধার/ কানু, কুন্তী/ দেবিকা, গান্ধারী/ জয়তী, দ্রৌপদী/ টুম্পা,

শকুনি/ জগা, দুর্যোধন/বাপ্পা, যুধিষ্ঠির/ শ্যাম, অর্জুন/ বিশ্ কৰ্ণ/ অংশু,
রাম/ বিজয়, লক্ষ্মণ/ তরুণ, সীতা/ তপতী, হনুমান/ জয়ন্ত

এবং নারদ,/ ইন্দ্রজিৎ, বালী,/ বাল্মীকি,/ কৃষ্ণ।”^{১৮৪}

নাটকটি প্রকাশিত হয় ইন্দ্রজিৎ পাল ও অন্তিকা চ্যাটার্জীর সম্পাদনায় নাট্যসৃজনী, ২৮৩
পূর্ব সিঁথি বাই লেন, দমদম, কলকাতা- ৭০০০৩০ থেকে। প্রচ্ছদপত্রে অস্ত্র হাতে
একটি নারীর ছবি আছে। নাটকটিসহ নাট্য পত্রিকাটির মূল্য একশত পঞ্চাশ টাকা।

‘উলটপুরাণ’ নাটকটি পুরোপুরি আধুনিক। এখানে রামায়ণ ও মহাভারতের
কাহিনি এবং চরিত্রগুলিকে মিলিয়ে নাট্যকার এক অভিনব নাট্যকাহিনি তৈরী করেছেন।
এখানে রাম, রাবণ, দুর্যোধন, অর্জুন, বাল্মীকি, কৃষ্ণ একে অপরের অতি পরিচিত জন।
তেমনি সীতা, দ্রৌপদী, গান্ধারী, কুন্তী একালের নারীদের মতো যুক্তিবাদী, নিজেদের
অধিকার রক্ষার ভাবনায় তৎপর। ভারতীয় পুরাণভাবনা এখানে নাট্যকারের চিন্তা-
চেতনায় পুনর্নির্মিত হয়ে পাঠকের কাছে ভিন্নতর মাত্রা পেয়েছে। নাটকের সূত্রধর
চরিত্রটি সেইরকম বার্তা দিয়েছে এখানে -

“আসলে আপনারা মানে উত্তরাধিকারীরা পকেটের কানাকড়ি খরচা করে
যথারীতি হাজির- অবশ্য অন্য কোন উপায় বোধ হয় নেই। আই.পি.এল.
থেকে পুলিৎজার অর্থাৎ আস্তাবলের পবিত্রাতা- বাদদিন কারণ ক্র্যাশকোর্স
ভর্তি হয়ে গতানুগতিক আলাপচারিতা মানে শুভ নববর্ষ শিখেছি, অবশ্য
দিনক্ষণ গুলিয়ে ফেলি।... মানে কপিরাইট উঠে যাবার ফলে এবং
রিমিক্সের দৌলতে সব চরিত্রের আধুনিকতা দর্শক মনে গ্রহণযোগ্য...
দর্শক বন্ধুরা আপনারা দয়া করে ঘাবড়াবেন না কারণ এরা জীবন্ত
জীবাস্ম কিংবা প্রযুক্তিগত ক্রটি কিংবা ম্যানেকুইন নয়, আসলে কালের
করাল গর্ভ থেকে উঠে আসা সেই সব মহান চরিত্র এরা, কত হাজার
বছর মানে ঠিক কত হাজার বছর জানি না তবুও সেইসব মহান চরিত্ররা
যদি আজকের সমাজে ভুলবশত মানে যদি সময়সারণিতে সিকিউরিটি
চেকিং না থাকে-ধৃষ্টতা ক্ষমা করে দেবেন কারণ সত্যি ভীষণভাবে জানতে
ইচ্ছে করে দেখতে ইচ্ছে করে, ভাবতে ইচ্ছে করে যে ত্রেতা- দ্বাপর
যুগের সেইসব অমর চরিত্রগুলো আজকের ঘোর কলিকালের রুম্ম-ক্ষত
বাস্তবভূমিতে কি করতেন? তারা কি পারতেন আজকের এই সময়ের
ঝড়-ঝাপটা সামলাতে? নূতন কোন পথের দিশা কি দেখাতে পারতেন?

বয়সের সঠিক কোন পরিচয়পত্র না থাকবার জন্যে এবং বাজেট কম থাকবার জন্যে চরিত্র অনুযায়ী ড্রেস বা মেকআপ থাকবে না অবশ্য তার প্রয়োজনীয়তা আশা করি সীমিত।”^{১৮৫}

কাহিনিকথনের ধারাবাহিকতায় একে একে আসে কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, শকুনি, দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, কর্ণ প্রভৃতি চরিত্রগুলি। তাঁরা নিজেরাই নিজেদের পরিচয় দেন এইভাবে -

- “(ক) দ্রৌপদী “আমি দ্রুপদকন্যা প্রাথমিক বিদ্যালয় মানে মন্টেশরি টিচার”
- (খ) শকুনি “নমস্কার আমার নাম শকুনি। আমি ইন্দ্রপ্রস্থ নাইট ক্লাব-ক্যাসিনোর মালিক।”
- (গ) দুর্যোধন “আমি দ্বৈপায়ন এক্সিকিউটিভ ভ্যালি রিসর্টের মালিক।”
- (ঘ) যুধিষ্ঠির “নমস্কার আমি জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, আমি একটি বহুজাতিক সংস্থায় চাকুরিরত।”
- (ঙ) অর্জুন “আমি মধ্যম পাণ্ডব, আমি লাইসেন্স সহ গোলাবারুদ সাপ্লায়ার।”
- (চ) কর্ণ “আমি এখন ট্রান্সপোর্ট আর কুরিয়ারের ব্যবসা করি।”^{১৮৬}

এইভাবেই রামায়ণ ও মহাভারতের চরিত্রগুলি একালের ভাবনায় জারিত হয়ে আধুনিক মানুষের প্রতীকী চরিত্র হয়ে উঠেছেন। সীতার উক্তির মধ্যে রামায়ণ- মহাভারতের মেলবন্ধন আরো বেশি করে ধরা পরেছে। সীতা যখন প্রসঙ্গত বলেন-

“সামান্য এই ব্যাপার নিয়ে না আমার, না সরমার, না মন্দোদরী বৌদির কোন মাথাব্যথা আছে।”^{১৮৭}

কাহিনির মধ্যে উপস্থিত হন হনুমান চরিত্র। তাঁর কথাতে পাই ইংরেজি শব্দ, যা একেবারেই রামায়ণ বা মহাভারতের কালের ভাষা নয়। হনুমান দুঃখ করে বলেন-

“আনন্দ, আরে মশাই কিসের আনন্দ? মধ্যযুগের দাসপ্রথা কেসে চার্জশিট বেরোবার পর থেকেই বেকার-মশাই আমার মাসোহারা বন্ধ, আরে বাবা বিড়িও ধার করে খাই।”^{১৮৮}

এখানে ‘চার্জশিট’ ইংরেজি শব্দ, যা একালের। ফলে পুরাতন চরিত্রের মুখে একালের ভাষা ব্যবহার হওয়ায় ভাষাগত পুনর্নির্মাণ ঘটেছে। নাটকটির মধ্যে আছে খাদ্য সংকটের কথা, উপার্জন সংকটের কথা। হনুমান সূত্রধরকে বলেছেন –

“সার্কাসে ঢোকবার জন্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসেছিলাম, কিন্তু
কি এক দুর্বোধ্য কারণে পেলাম না”^{১৮৯}

একালের আদালতে সেকালের নারী দ্রৌপদীর ন্যায় বিচারের প্রসঙ্গ এসেছে। সেখানে রায় হয় ‘একজন নারীর একজন স্বামী- এটাই সামাজিক রীতি’। পঞ্চপাণ্ডবদের সঙ্গে পাঞ্চালীর সম্পর্ক সঙ্গত নয়। দ্রৌপদী চান অর্জুনকে স্বামী হিসেবে পেতে। একসময় কুন্তী একথা মেনে নেন এবং অন্য সব ছেলেদের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে পাত্রী খোঁজার চেষ্টা করেন। কুন্তী কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়াকে প্রাধান্য দেন। নাটকের এই ভাবনাটিও একালের। ফলে নাট্যভাবনারও পুনর্নির্মাণ চলেছে ক্রমান্বয়ে। রামাচন্দ্র সীতার পাতাল প্রবেশের কারণ দেখিয়ে বিবাহ করতে চান, এমনকি ঘর জামাই থাকতেও রাজি হন। সীতা এ প্রস্তাব মানতে চাননা। যুক্তি দেখান-

“বাবা রাজি নয়, কারণ তুমি আমার নামে প্রচুর কুৎসা রটিয়েছ।
তুমি ভুলে গেলেও আমার পরিবারের কেউ তা ভোলেনি।”^{১৯০}

দুর্যোধন রামকে ‘লিভ-টুগেদার’ করার পরামর্শ দেন। সীতা প্রতিবাদ করেন, সহবাসের মামলা করার হুমকি দেন। একালে নারীদের বিশেষ কোন আয় নেই। তিনি বলেছেন-

“আমি এখন সত্যিই পরিশ্রম করি এবং হয়ত বাংলা ব্যাঙ্কে যোগ
দেব।”^{১৯১}

নাট্য কাহিনিতে কর্ণ দ্রৌপদীকে সিনেমায় নিয়ে যেতে চেয়েছেন, কিন্তু দ্রৌপদী যেতে চাননা। তিনি সীতাকে বলেন-

“না না অসম্ভব, কারণ ওই লম্পটের সঙ্গে সিনেমা দেখা আমার
পক্ষে সম্ভব নয়।”^{১৯২}

এই পেঙ্কাপটে উঠে আসে একালের নারী সমিতির প্রসঙ্গ। রামায়ণের ভরত এখানে কেন্দ্রীয় জল সম্পদ দপ্তরে চাকুরিরত, শত্রুঘ্ন প্রোমোটর। রামায়ণ-মহাভারতের প্রায় প্রতিটি চরিত্র এখানে নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে একালের ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মতো করে।

আলোচ্য নাটকের বিষয়বস্তুতে আনা হয়েছে রামের বিরুদ্ধে পরিবেশ সংক্রান্ত একাধিক মামলার প্রসঙ্গ। একসময় বিশাল বানরবাহিনী নিয়ে রামচন্দ্র সমুদ্র বন্ধনের নাম করে নুড়ি পাথর দিয়ে সমুদ্র বোজাবার চেষ্টা করেছিলেন, সেটি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তাঁর দ্বিতীয় অপরাধ অভয়ারণ্যে ঘর বাঁধা। বালী সেই অভিযোগটি জানিয়ে বলেছেন-

“দণ্ডকারণ্য অভয়ারণ্য-অভয়ারণ্যে অন্যায়ভাবে ঘর তৈরি করে বসবাস। বীরাপ্পন নামক এক মৃত দস্যুর সঙ্গে গোপনে কাঠ পাচার, উপজাতিদের ওপর হামলা- গ্লোবাল ওয়ার্মিং- ইত্যাদি ইত্যাদি-।”^{১৯৩}

নাটকে আঁকা হয়েছে বাল্মীকির মতো চরিত্রের নবভাবনা। রাম, লক্ষ্মণ বাল্মীকিকে রামায়ণের নতুন এডিশন লিখতে বলেছেন এবং তাতে চরিত্রবদলের দাবি জানিয়েছেন। তখন বাল্মীকি বলেন-

“বেদ-পুরাণ-কথকথা-সভ্যতার ইতিহাস বদলে দেব?”^{১৯৪}

লক্ষ্মণ প্রত্যুত্তরে বলেছেন-

“আজকের যুগে ওগুলোর অবস্থা অনেকটা আলুর খোসার মতন। আপনি না বদলালে কোন উঠতি লেখক বদলে দেবে। তথ্য প্রমাণ বাদ দিন তখন রয়ালটির জন্যেও কান্নাকাটি করে লাভ হবে না।”^{১৯৫}

এই নাটকে সীতা পতিব্রতা নারী নন, একালের প্রতিবাদী নারী। তিনি রামচন্দ্রকে স্পষ্ট করে বলেন-

“তোমার ভুলভাল আদর্শের পাঙ্কায় পড়ে আমার যৌবনের মূল্যবান চোদ্দটা বছর- আমার স্বপ্ন-”^{১৯৬}

কৃষ্ণ চরিত্রের উপস্থিতি নাটকে আর একটি মাত্রা এনে দিয়েছে। একালের সন্ত্রাসবাদ, গণতন্ত্র ও অন্যায় রাজনীতির প্রসঙ্গে কৃষ্ণ বলেছেন-

“কোথায় নতুন জোয়ার- সেই বঞ্চনার গল্ল, অতীতের কুমিরছানা আজকের বাজারে সন্ত্রাস-বিরোধিতা করব বলেই বিরোধিতা - গণতন্ত্রের উপহাসমাত্র।”^{১৯৭}

এখানে কৃষ্ণচরিত্রের নানাবিধ অন্যায়ের তালিকা প্রকাশ করেছেন প্রতিপক্ষ কর্ণ, এমনকি মামলার হুমকি দিয়েছেন কৃষ্ণকে -

“সুদর্শন চক্র সন্তাসবাদী বেআইনি অস্ত্র, শিশুপাল হত্যা মামলা, গোদের ওপর বিষফোঁড়া জুভেনাইল ক্রাইম।”^{১৯৮}

এই সব অপরাধের থেকেও বড় অপরাধ আছে কৃষ্ণের। কর্ণের মতে -

“বাচ্চা বয়সের অপকর্ম- অবলা নারীর সঙ্গে লাঞ্ছনা মানে ইভটিজিং, মাখন চুরি- তাছাড়া যুদ্ধে প্ররোচনা দেওয়া-”^{১৯৯}

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে নিজেদের কথোপকথনের মাধ্যমে পৌরাণিক চরিত্রগুলি একে একে একালের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। তার একটি দৃষ্টান্ত-

“যুধিষ্ঠির - আধুনিক বাঙালি বিধানসভা ভাঙচুর করে।

রাম - আধুনিক বাঙালি প্রকাশ্যে ধূমপান করতে লজ্জিত হয় না।

কুন্তী - আধুনিক বাঙালি ভাষার শালীনতা বজায় রাখে না।

দুর্যোধন- আধুনিক বাঙালি প্রকল্প রূপায়নে বাধা দেয়।

শকুনি- আধুনিক বাঙালি দেশকে বিক্রি করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না।

দ্রৌপদী- আধুনিক বাঙালি শিশুশ্রম রোধ করতে সচেতন হয় না।”^{২০০}

প্রতিটি চরিত্রের উক্তি বা বক্তব্য অতি মূল্যবান। ফলে চরিত্রভাবনায় এবং তাঁদের মানসিক যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশে চরিত্রগুলি অভিনব হয়ে উঠেছেন। সূত্রধর চরিত্রটি রামায়ণ-মহাভারতের না হলেও তার ভূমিকাও নাটকে কম নয়। এখানে সূত্রধর দুটি মহাকাব্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে আধুনিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে -

“রামায়ণ হল নারীর প্রতি অন্যায় অবমাননা- অত্যাচার, আর মহাভারত হল ত্রিকোণ প্রেমের অভিঘাত।”^{২০১}

নাট্যকাহিনীতে ফুটে উঠে সিনেমা তৈরি করার জন্য রাম, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, লক্ষ্মণ, কর্ণ, শকুনির আগ্রহ ও ভাবনাচিন্তা। অন্যদিকে রয়েছে দুঃশলার বিবাহ নিয়ে গান্ধারী, সীতা, অর্জুন, কুন্তী, দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির কথোপকথন। এদিকে রাবণ রামের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে বলেন-

“আমার বিরুদ্ধে প্রচার চলছে, যে আমি নাকি নারীপাচার চক্রের পাণ্ডা। এছাড়াও ধর্ষণ, অপহরণ ইত্যাদি ইত্যাদি- তবে কোন মাথার কাণ্ড তা জানা সম্ভব নয়।”^{২০২}

রাবণ রামের নামেই অভিযোগ করে অপবাদ দেওয়ার জন্য। কিন্তু সীতা রাবণের প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু রাম একালের রাবণকে ধিক্কার জানিয়ে বলেছেন-

“তোর লজ্জা-শরম বরাবরই কম। আমার বউটাকে যখন হাতাতে চেয়েছিলি তখন তো ঝামা ঘষে দিয়েছিলাম।”^{২০৩}

এইভাবে ‘উলটপুরাণ’ নাটকের কাহিনি ও চরিত্রবিন্যাসে রামায়ণ-মহাভারতের চরিত্রকথা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। একালের নাট্যপাঠক বা দর্শক নিজেদের ভাবনা এখানে খুঁজে পান। তাই নাট্য পরিণতির অন্তিম লগ্নে সূত্রধর আধুনিক পাঠককে একটি জিজ্ঞাসার সম্মুখীন করেন-

“যুগে যুগে দেশে দেশে ভালবাসা নির্মল, ভালবাসা অমলিন, ভালবাসা নিষ্পাপ। উপস্থিত দর্শকবন্ধুরা আমরা সবাই আজকের সমাজে উলুখাগড়া-কিন্তু কেন আমাদের জন্মভূমি আমাদের রক্তে রাঙা হবে? আমরা কি হাতে হাত ধরে সুন্দর, সমাজবদ্ধ, মানবিক পরিশিলীতসমাজ গড়তে পারি না- যেখানে মানুষ- মানুষের বন্ধু।”^{২০৪}

নতুন সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার আশা নিয়ে নাটকটির পরিসমাপ্তি হয়। নাটকটি শুধু রামায়ণ - মহাভারতের চরিত্রগুলির পুনর্নির্মাণ নয়, আধুনিক জীবন ভাবনায় চরিত্রগুলির নবনির্মাণও বটে। সেই সঙ্গে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দিভাষা চরিত্রগুলির মুখে অবলীলায় ব্যবহার করে নাট্যকার নাটকটিকে আধুনিক করে তুলেছেন। দ্রৌপদী বলেছেন-

“আমি সত্যই বলতে পারব না- আসলে কালের করালচক্র আমার পুর জীবনটাকে তছনছ করে দিয়েছে।”^{২০৫}

তেমনি সামাজিক অধিকারবোধের পরিচয় কর্ণের সংলাপে ধরা পরেছে -

“সম্পত্তি আমি কোনদিনই চাই নি, আমি চেয়েছিলাম সামাজিক স্বীকৃতি। আমি আমার অধিকার অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছি।”^{২০৬}

এইভাবে নাটকটির বিষয় ভাবনা, চরিত্র বিন্যাস এবং ভাষার অভিনবত্ব সৃষ্টি করে এবং দুটি মহাকাব্যের মেল বন্ধন ঘটিয়ে নাট্যকার এক অপূর্ব নবনাটক আমাদের উপহার দিলেন, যা তৈরি করা সম্ভব হল পুনর্নির্মাণ ও বিনির্মাণের পথে।

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় - আর এক দ্রোণাচার্য (২০১০);

২০১০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মহাভারতকেন্দ্রিক নাটক ‘আর এক দ্রোণাচার্য’। নাটকটি পৌরাণিক কাহিনি ও চরিত্রকেন্দ্রিক হলেও বাস্তবে তা আধুনিক নাটক। ১৯ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১৩ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটিতে প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (১), চরিত্রলিপি(১) সহ মোট ২০টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ-

“কলাভূৎ পাবলিশর্স / বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় / ষোলকলা / শ্রুতি
নাটকের সংকলন।”^{২০৭}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ-

“ষোলকলা/ ষোল-টি শ্রুতি নাটকের সংকলন/
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়/ কলাভূৎ পাবলিশর্স”^{২০৮}

নাটকে উল্লিখিত পাত্র-পাত্রীরা হলেন- দ্রোণাচার্য , দুর্যোধন, কৃপ, কৃপী। একটি অঙ্কে বিস্তৃত এই নাটকটি প্রকাশিত হয় কলাভূৎ পাবলিশর্স, ৫৪/৫-এ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩ থেকে। নাটকটির মূল্য একশত টাকা।

আলোচ্য নাটকের মধ্যে কৌরব-পাণ্ডবদের গুরু দ্রোণাচার্যের স্বতন্ত্র রূপের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। নাটকটি শুরু হয়েছে এইভাবে -

“এইমাত্র অবহার ঘোষিত হল। শেষ হল কুরুক্ষেত্রের চতুর্দশ দিন।
সসৈন্যে নিজ নিজ শিবিরে ফিরে গেল কৌরব-পাণ্ডব। রুধিরজ্ঞ,
শোকমগ্ন। বয়োভারে ক্লান্ত আমি, অবসন্ন চিন্তার সঙ্কটে। তবু দুর্যোধন
আমাকে বিশ্রাম দেবেনা। হা দ্রোণাচার্য, দৈব তোমাকে ভরদ্বাজ ঋষির
আশ্রম থেকে কুরুক্ষেত্রের রক্তক্ষয়ী মহাসমরের মাঝখানে এনে দাঁড়
করিয়ে দিয়েছে। আর তোমার ফেরার পথ নেই।..... এসো দুর্যোধন!”^{২০৯}

এরপরেই দ্রোণাচার্যের শিবিরে এসে উপস্থিত হয়েছেন কৌরব রাজ দুর্যোধন। তিনি
আচার্য গুরুদেবকে অভিযোগ করেছেন পরোক্ষে পাণ্ডবদের সমর্থন করার জন্যে।
দুর্যোধন গুরুদেবকে বলেছেন—

“আপনি যদি পথ ছেড়ে না দিতেন তবে অর্জুন কি ব্যুহ ভেদ করতে
পারত? অর্জুন আপনার স্নেহভাজন, তার নিরাপদ দীর্ঘজীবন আপনি
কামনা করেন- তাই বিনাযুদ্ধে তাকে ব্যুহে প্রবেশ করতে দিয়েছেন

আপনি, কৌরবদের বিশ্বাস ছিল যে আপনি যতক্ষণ জীবিত, অর্জুন আপনাকে কিছুতেই অতিক্রম করতে পারবে না। আচার্য, আমি জানি আপনি পাণ্ডবদের হিতেই রত আছেন।”^{২১০}

একথা শুনে দ্রোণাচার্য আত্মধিকারে জর্জরিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন –

“হায় দ্রোণাচার্য! এই তোমার পুরস্কার! তবু তুমি ভস্ম হয়ে গেলে না দুর্যোধন – ভরদ্বাজ ঋষির পুত্র তপঃসিদ্ধ দ্রোণাচার্যের সে তেজ নেই। আমি ভ্রষ্ট হয়েছি। তপস্যার বলের চেয়ে অস্ত্রশক্তিকে বড় করে দেখেছি। দারিদ্রকে ভূষণ করে নিতে পারিনি, তাই তপোবনের প্রশান্তি ছেড়ে ধনভিক্ষা করতে ধাবিত হয়েছি মহেন্দ্র পর্বতে-ভৃগুনন্দন পরশুরামের কাছে, বন্ধুত্ব আকাজ্জা করেছি পাণ্ডুলরাজ দ্রুপদের। বিভবাসনা আমাকে পতিত করেছে, দুর্যোধন। আরো কঠিন বাক্য বল পুত্র, আমার দূষিত অন্তরাত্মাকে শেলবিদ্ধ কর। এ আমার প্রাপ্য।”^{২১১}

এখানে দ্রোণাচার্য একালের আত্মসমালোচক একজন যুক্তিবাদী মানুষ। দ্রোণপত্নী কৃপীর কুরংক্ষেত্র রণে রাত্রিকালে আবির্ভাব নাট্য প্রেক্ষাপটকে বদলে দিয়েছে। কৃপী স্বামী দ্রোণাচার্য ও ভাই কৃপকে বলেছেন—

“কৃপাচার্য, ভাই, তোমরা বীর, বৃহৎ বহির্জগতের মানুষ, আত্মপর বিচারের রীতি তোমাদের স্বতন্ত্র; আমি নারী - আমি মা - আমার ক্ষুদ্র অন্তঃপুরে তোমাদের স্বার্থমগ্ন রীতিপ্রকরণ যে এখনও পৌঁছায়নি সে আমাদের গৌরব। এই দুঃসময়ে যদি দ্রৌপদী-সুভদ্রার পাশে গিয়ে না দাঁড়াই তবে আমার মাতৃত্বে দিক, দিক আমার নারীগৌরবে। দুর্যোধনপত্নীর মত সুভদ্রা-দ্রৌপদীও কি আমাকে গুরুমাতা বলে প্রণাম করেনি? একই স্নেহ সম্ভাষণে আমি তাদের আশীর্বাদ করিনি?”^{২১২}

পত্নী কৃপীর কথায় গুরু দ্রোণাচার্যের মনে সত্যের আলো উদ্ভাসিত হয়েছে। একসময় তাঁদের সংসারে চরম দারিদ্র্যতা ছিল। কিন্তু তখন তাদের জীবনে কোনো আঘাত ছিল না, কোনো অপমান ছিল না। কিন্তু পিতা হিসেবে শিশুর কথা চিন্তা করে সেই দারিদ্র্যতাকে মেনে নিতে রাজি ছিলেন না দ্রোণাচার্য। অতীতের কষ্টের কথা মনে করে দ্রোণাচার্য পত্নীকে বলেছেন—

“বালক অশ্বখামাকে এক ফোঁটা দুধ খাওয়াতে পারিনি, প্রতিবেশী বালকেরা ওকে দুধ বলে পিটুলি গোলা খাইয়ে দিয়েছে, তাতেই দুধপানের আনন্দে নৃত্য করেছে অশ্বখামা। প্রতিবেশীরা বলেছে, যে দরিদ্র দ্রোণ একমাত্র পুত্রকে একটু দুধ খাওয়াতে পারে না তার ব্রাহ্মণত্বে দ্বিধা, তার শাস্ত্রজ্ঞানে দ্বিধা! পিতা হিসেবে এর চেয়ে বড় অপমান আর কী হতে পারে? পিতার আজ্ঞায় তোমাকে বিবাহ করলাম – শাস্ত্রকথা বলে তোমার স্বাভাবিক ভোগস্পৃহাকে দমন করে রেখেছি। নববিবাহিতা তোমার বস্ত্রের আকাঙ্ক্ষা, অলঙ্কারের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করার সামান্য উপায়ও আমার ছিল না।”^{২১৩}

এখানে দ্রোণাচার্য একালের এক সাধারণ দরিদ্র মানুষের পরিচয় বহন করেছেন। যিনি নিজের স্ত্রী ও সন্তানের ভালো মন্দ চিন্তায় ও দায়িত্ব পালনে তৎপর। কৃপীর কথায় একালের প্রতিবাদী নারীর যুক্তি ও ভাবনা-চিন্তা ধরা পরেছে। যখন কৃপী স্বামীকে বলেন

-

“কোনটা নয় আর্যপুত্র? রাজসভার দ্যুতপণে বন্দিদ্রোণী রজস্বলা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করল পাপী দুঃশাসন, মহা মহা জ্ঞানীশ্রী রথীরা উপস্থিত সে সভায়। তুমিও ছিলে। একবার প্রতিবাদ করেছ যে এ প্রকাশ্য বধূনিগ্রহ অন্যায়। করনি। জয়দ্রথও অপরাপর শিষ্যের মত তোমার শিষ্য। তুমি তাকে কথা দিয়েছিলে, তাকে রক্ষা করবে? সে কথা তুমি রাখনি। আবার তোমারই পরামর্শে অভিমন্যুবধ সম্ভব হয়েছে।”^{২১৪}

ক্রমে ক্রমে নাট্যপরিণতিতে যুদ্ধের নির্মমতা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছে, যা প্রতিটি কালের সভ্যতার ক্ষেত্রে এক কলঙ্কিত অধ্যায়। কৃপীর বক্তব্যে তার বিবরণ উঠে এসেছে এইভাবে -

“তবু এ নিমিত্তের ভাগী কেন হলে আচার্য? কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য! ওঘবতী নদীতীরে ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান। কুরুক্ষেত্র শ্মশান। বালক অভিমন্যুর মৃতদেহের ওপর পড়ে বিরাট-দুহিতা উত্তরা বিলাপ করছে। কী করুণা! মিলনের মাত্র ছ-মাসের মধ্যে স্বামীহারা হল উত্তরা। মৎস্যরাজের কুলস্বতীরা অভাগিনী উত্তরাকে সরিয়ে নিয়ে গেল। সুভদ্রার বুকের মধ্যে কেমন করছে তা কি তোমরা কোনদিন বুঝবে? তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য ও প্রজ্ঞাও যে কোন মন্ত্রবলে রণোন্মাদ রাজশক্তির পদলেহন ও

চাটুকারিতা করে, - আমিও তো ব্রাহ্মণকন্যা, - কোনদিন তা বুঝলাম না।”^{২১৫}

মৃত্যুর চেয়ে জীবনের মূল্য যে অনেক বড় কৃপীর এই কথায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দ্রোণাচার্য-পত্নী কৃপী যখন নিজের সন্তান অশ্বথামাকে যুদ্ধ থেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন, তখন দ্রোণাচার্য বুঝতে পেরেছেন মাতৃহৃদয়ের সন্তান স্নেহের দিকটি। দ্রোণাচার্য নিজের ব্যর্থতাকে ঢাকা না দিয়ে অকপটে স্বীকার করে বলেছেন-

“আমি প্রেমের দীক্ষা দিতে পারিনি শিষ্যদের। মন আর সময়ের গতি ঘুরিয়ে দিতে পারিনি সত্যের দিকে, শান্তির দিকে। কৃপী- প্রেম চাই, প্রেম- পিতৃহৃদয়ে, মাতৃজঠরে। আজ আমাদের সন্তান সন্ততির কাছে নতজানু হবার দিন। স্বীকার করার লগ্ন উপস্থিত।”^{২১৬}

একজন রাজগুরুর কণ্ঠে এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বময় সংলাপ ভালো না শোনালেও এ যেন জীবনের চিরসত্য বাণী। উত্তর প্রজন্মকে চালিত করার জন্য পূর্ববর্তী প্রজন্মের দায়বদ্ধতা যেন প্রকাশিত হয়েছে উক্ত উক্তিতে। তাই দ্রোণাচার্য পত্নীর কাছে স্বীকার করে নিয়েছেন চিরন্তন জীবন সত্যকে -

“স্বীকার করতে হবে আমাদের দ্বিচারিতার কথা। বলতে হবে, আমরা তোমাদের জন্মদাতারা তোমাদের বিপদগামিতার জন্য দায়ী।”^{২১৭}

এইভাবে নাটকটিতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব জর্জরিত হয়ে উঠেছেন দ্রোণাচার্য। কাহিনি বিস্তারের মধ্য দিয়ে নাটকটি আধুনিক জীবন সত্যের সন্ধান দিয়েছে।

আলোচ্য নাটকে দ্রোণাচার্য ব্যক্তিগত সমালোচনায় অধীর এক পুরুষ চরিত্র। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমাপ্তিতে তাঁর মনে হয়েছে তিনি একজন ব্যর্থ শিক্ষাগুরু। কৌরব ও পাণ্ডবদের তিনি শুধু অস্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন, প্রকৃত মানব কল্যাণের শিক্ষা দিতে পারেননি। তাই দ্রোণাচার্যের অন্তরে বেদনা, ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে। নিজের একমাত্র পুত্র অশ্বথামাকে বলি হতে হয়েছে কুরুক্ষেত্রে, পিতা হয়ে তাকে রক্ষা করতে পারেননি। যুদ্ধে দ্রোণাচার্যের অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু হয়েছে কেকয়- রাজগণের জ্যেষ্ঠ বৃহৎক্ষেত্র, শিশুপাল পুত্র ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ক্ষত্রধর্ম, ঘটোটকচের মতো যোদ্ধারা। তাঁরা প্রত্যেকে দ্রোণাচার্যের অতি পরিচিত ও প্রিয়জন ছিলেন। তাঁদের মৃত্যুতে দ্রোণাচার্যের অন্তর ব্যথিত। জীবনের অন্তিম পর্যায়ে এসে দ্রোণাচার্য বুঝতে পেরেছেন প্রকৃত জীবনের সত্যকে। একসময় তাঁর কাছে মনে হয়েছে তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য ও দরিদ্র অবস্থা

মেনে নেওয়ার চেয়ে ভালো রাজশক্তির স্মরণাপন্ন এবং অস্ত্রচালনা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দু'পক্ষের মৃত্যুর বীভৎসতা তাঁর অন্তরকে পরিবর্তন করে দেয়। তাই এই যুদ্ধে প্রত্যেকটি মৃত মানুষের প্রতি শান্তি কামনায় তিনি যেমন পিছুপা হননি, তেমনি আগামী প্রজন্মের কাছে নতজানু হয়ে বিপথগামিতার জন্য দায় স্বীকার করে নিতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। চিরপ্রচলিত মহাভারতের পাণ্ডব-কৌরবদের অস্ত্রশিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্যকে এই নাটকে আমরা নতুনভাবে পেলাম। তাঁর মধ্যে অহংকারের আধিপত্য একেবারে নেই বললেই চলে। বরং দুর্যোধনের মতো আক্রমণপিপাসু, প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষকেও বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর ভুল সিদ্ধান্তের দিকগুলি। দুর্যোধন যখন দ্রোণাচার্যকে নানাভাবে দায়ী করেছেন, তখন দ্রোণাচার্য প্রতিবাদী কণ্ঠে বলেছেন—

“তুমি আবাল্য কটুভাষী, পরশ্রীকাতর, বিদ্রোহী, সন্দেহপরায়ণ। আমি যদি পাণ্ডবদের হিতেই রত থাকব তাহলে তোমার দেহে কাঞ্চনময় কবচ বেঁধে দিয়েছিলাম কেন? কৃষ্ণ অর্জুন বা অন্য কোন যোদ্ধা সে কবচ ভেদ করতে পারবে না। ঐ কবচের মহিমা তুমি জান? বৃত্রবধের পূর্বে ঐ কবচ মহাদেব দিয়েছিলেন ইন্দ্রকে। ইন্দ্রের কাছ থেকে যথাক্রমে অঙ্গিরা, তৎপুত্র বৃহস্পতি, অগ্নিবিশ্য ঋষি এবং পরিশেষে আমি সে কবচ পেয়েছি।”^{২১৮}

কৌরবদের পক্ষে থেকেও দ্রোণাচার্য প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে সমর্থন করেছেন। পাণ্ডবদের জয় কামনা করেছেন। এ দ্রোণাচার্য একালের একজন আদর্শ শিক্ষক। জয়-পরাজয়ের ঊর্ধ্বে উঠে একজন ভালো মানুষ। তাঁর অন্তরে দুঃখ আছে, ক্ষোভ আছে, আছে অন্যের প্রতি সমবেদনাও। একমাত্র পুত্র অশ্বথামাকে হারানোর যন্ত্রণায় যখন পত্নী কৃপী ব্যথিত হয়েছেন এবং স্বামী দ্রোণাচার্যকে দায়ী করেছেন, তখন ব্যক্তি মানুষ হিসেবে দ্রোণাচার্য নিজের দায় স্বীকার করে নিয়েছেন। দ্রোণাচার্য পত্নী কৃপীকে বলেছেন—

“ভিতরে রক্তক্ষরণ হয়েছে আমার, কেউ তা দেখতে পায়নি। কৃপী, ভালো করে চেয়ে দ্যাখো আমার মুখের দিকে। আমি কি সেই মানুষ যাকে তুমি প্রথম জীবনে দেখেছিলে?”^{২১৯}

সমগ্র নাটকে দ্রোণাচার্য আত্ম বিশ্লেষণে মুখর এক স্বতন্ত্র চরিত্র। দ্রোণাচার্যের পত্নী কৃপী এখানে প্রতিবাদী নারী। কৃপী খুব কঠোরভাবে স্বামীসহ সমগ্র পুরুষজাতির অন্যায় কার্যকলাপের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে বলেছেন—

“সে তোমাদের রাজনৈতিক অভিসন্ধির জন্যে। মাতৃজঠরে শিশু নিষ্ঠুরতা শেখে না—মাতৃকোড়ে হিংসা ঘেষের পাঠ নেয় না কেউ। কোনদেশে কোন মা ঘুমপাড়ানি গানে মানববিদ্বেষের মন্ত্র দেয় না শিশুর কানে। তবু অশ্বখামারা দুর্যোধনের অনুগত হয় কেমন করে? যেখানে আমরা নারীরা নেই, তোমরা পুরুষেরাই যে জগতের একেশ্বর— সেইখানেই আকাশবাতাস স্বার্থের বিষে জর্জর হয়ে আছে। সংঘাত আর হানাহানিকে তত্ত্বকথা দিয়ে এমন রঙিন করে রাখছ তোমরা, যে তরুণ মন তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে যৌবনকে চরিতার্থ জ্ঞান করেছে। উগ্রপন্থার সঙ্গে ধর্মোবধ যুক্ত করে তরুণ মনে মায়ের দেওয়া প্রেমের অবশেষটুকু নিংড়ে নিয়েছ তোমরা।”^{২২০}

দ্রোণাচার্য ও পত্নী কৃপীর কথোপকথনে সমগ্র নাটকটি আধুনিক মানব জীবনের দ্বন্দ্ব-সংশয়ের আবর্তে আলোড়িত হয়ে উঠেছে। এখানে কৃপী চরিত্রটি নাট্যকাহিনির সংযোগ সাধনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও জীবন্ত মানুষের দৈনন্দিন ভাষা ব্যবহার করে নাট্যকার নাটকের আকর্ষণ বাড়িয়েছেন। কৃপীর সংলাপে তার পরিচয় মেলে। তিনি স্বামীর কাছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মৃত্যুর ভয়ঙ্কর চিত্র তুলে ধরেছেন এইভাবে -

“সেই ধর্মক্ষেত্রে প্রাণের কী দৃঃসহ অপচয়। গৃধ্র ও শৃগালের নৈশভোজ হয়েছে সিন্ধুসৌবীররাজ জয়দ্রথের প্রাণহীন দেহ। আমি স্বচক্ষে দেখেছি আচার্য, দুঃশলা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। গান্ধারীর পুত্রপৌত্রবধূরা পতিপুত্রশোকে পাগলের মতো আলুলায়িত কেশে রণক্ষেত্রে ধাবিত হচ্ছে। মস্তকহীন দেহ আর দেহহীন মস্তকের স্তূপ দেখে কত বধু মুচ্ছিত হয়ে পড়ছে। তুমি বাকসিদ্ধ ব্রাহ্মণ, আমাকে স্পর্শ করে বলো- আমার এ ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্য সহিতে হবে না। তোমাদের খ্যাতি-অখ্যাতির কুরুক্ষেত্র আমার অশ্বখামাকে ফিরিয়ে দেবে। কথা দাও।”^{২২১}

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় পৌরাণিক দ্রোণাচার্যের কাহিনিকে এমনভাবে এই নাটকে সাজালেন যে সেটি মহাভারতের আর এক স্বতন্ত্র অধ্যায় হয়ে উঠেছে। তিনি এই নাটকে আধুনিক নাট্যভাষা সংযোজন করেছেন পুরাতন ভাবনা ও চরিত্রকে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য। এইভাবে মহাভারতের চরিত্র, যুদ্ধের পরিবেশ, মৃত মানুষের প্রতি সমবেদনা, পুত্রশোক নাটকটিকে নতুন কলেবর দান করেছে। পৌরাণিক দ্রোণাচার্যকে

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল করে তাঁর মধ্যে আধুনিক যুদ্ধবিরোধী মন, মানসিকতা, স্নেহ, প্রেম, মায়া এবং সর্বোপরি বিচক্ষণশীলতার প্রকাশ ঘটিয়ে চরিত্রটিকে আধুনিক করে তোলা হয়েছে। মহাভারতের দ্রোণাচার্যের স্ত্রী কৃপী এই নাটকে অভিনব ভূমিকা পালন করেছে। সব মিলিয়ে নাটকটি যে সার্থক পুনর্নির্মাণের রূপ লাভ করেছে, সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই।

মহুয়া চৌধুরী—পঞ্চকন্যার কথা (২০১৯);

মহাভারত এবং রামায়ণের গুটিকয়েক নারী চরিত্র অবলম্বন করে মহুয়া চৌধুরী ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে লিখেছেন ‘পঞ্চকন্যার কথা’ নামের একটি নাটক। ১৯.৫ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১৫ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটির প্রচ্ছদ পত্র (১), নামপত্র (১), উৎসর্গ পত্র (১), সূচিপত্র (১), মূল নাটক (১০) সহ মোট ১৪ টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকের প্রচ্ছদপত্র এইরূপ -

“দশে দিক / দশটি শ্রুতি নাটকের সংকলন / মহুয়া চৌধুরী।”^{২২২}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ-

“দশে দিক / দশটি শ্রুতি নাটকের সংকলন / মহুয়া চৌধুরী/রত্না প্রকাশন, ২/৭৩, বিবেক নগর, কলকাতা- ৭৫”^{২২৩}

নাটকটির উৎসর্গপত্রটি এইরূপ -

“আমার দুই বন্ধু বেনু আর নির্মলকে

যাদের উৎসাহ এই বই প্রকাশিত হল।”^{২২৪}

নাটকটি প্রকাশিত হয় রত্না প্রকাশন, ২/৭৩, বিবেক নগর, কলকাতা- ৭৫ থেকে। নাটকটির মূল্য একশত পঞ্চাশ টাকা।

রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে ‘পঞ্চকন্যার কথা’ নাটকটি লিখিত হলেও এখানে নাটকটির বিনির্মাণ করা হয়েছে। পঞ্চকন্যাদের মধ্যে আছেন দ্রৌপদী, কুন্তীর মতো মহাভারতের বিখ্যাত নারী চরিত্র। আর আছেন অহল্যা, তারাসুন্দরী এবং মন্দোদরী নামে রামায়ণের তিনজন নারী। তাঁরা একে অপরের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে তাঁদের জীবনে ঘটে যাওয়া নানা অন্যায়ে প্রতি সোচ্চার হয়েছেন। তাঁরা পুরুষ শাসিত সমাজের প্রতি ধিক্কার জানিয়েছেন। তাঁদের কথায় একালের নারীবাদ ও

নারী জাগরণের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। অনেক জায়গায় তাঁরা নিজেদের কৃত ভুলের জন্য দ্বিধাশ্রিত এবং লজ্জিত হয়েছেন। কোথাও-বা প্রায়শ্চিত্তের পথ ধরতে চেয়েছেন তাঁরা। নাটকটি পুরোপুরি নারীদের সংলাপের মধ্য দিয়ে লেখা হয়েছে। যদিও নেপথ্য থেকে কয়েকবার পুরুষকণ্ঠের কথা শোনা গেছে। নাট্য কাহিনির সূচনায় দ্রৌপদী পঞ্চকন্যার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

“আমি দ্রৌপদী, যজ্ঞগ্নিসম্ভবা দ্রুপদ রাজকন্যা। আমার দক্ষিণে আর্যা কুন্তী। পাণ্ডব জননী। তাঁর পাশে সুন্দরী তারা। প্রাগাৰ্য জনজাতির কন্যা। আর বামে দেবী অহল্যা, অভিশপ্তা সেই ঋষি বধূ। আর তাঁরও বামে সুবর্ণ লঙ্কার রানী মন্দোদরী। আজ আমরা ফিরে এসেছি আবার সময়ের ভিন্ন ভিন্ন সব স্তর থেকে।”^{২২৫}

কুন্তী কুমারী অবস্থায় গর্ভ ধারণ করেছিলেন নিজের ভুলের জন্য। আজও সেই ভুলের জন্য অনুশোচনা শোনা গেল তাঁর উক্তি—

“না সময় মুছে ফেলতে পারে না সব কিছু। যেমন অনুতাপ। অনুতাপ হোল পুড়ে শেষ হয়ে যাওয়া মৃতদেহের ঐ নাভিটা। আজও রয়ে গেছে যেমনকার তেমনি। আমার প্রথম ভালবাসা। কুমারী বেলায়, সূর্যের, মত এক উজ্জ্বল পুরুষের সঙ্গে আমি জেনেছিলাম জীবনের রহস্য। কিন্তু কয়েকটা মাত্র আনন্দের মুহূর্ত যে কী ভীষণ সব অনুতাপের জন্ম দেয়। একটা বোকা মেয়ে ভুল করেছিল, আর--।”^{২২৬}

কুন্তির এই অনুশোচনার আর একটি বড়ো কারণ অসহায় অবুঝ শিশুটিকে অজানা নদীগর্ভে ভাসিয়ে দেওয়া, সদ্যজাত ফুলের মতো শিশুকে এক প্রকার মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া। এই কাজ কুন্তির অন্তর্জগতকে সর্বদা ক্ষত-বিক্ষত করেছে। তিনি অনুতপ্ত হয়ে বলেছেন—

“আচ্ছা তোমরা বল তো আমি কি তবে পশুরও অধম? অমন নিষ্পাপ শিশুমুখ দেখেও কিনা আমি ভয়ে বিবর্ণ হয়ে শুধু ভাবলাম কি করে এই মাংসের দলাটাকে দূরে সরিয়ে ফেলতে পারি। কেমন করে ভাবতে পারলাম—আর কোনও অনুভূতি জাগল না তো—।”^{২২৭}

তাই কুন্তি নিজের অতীত জীবনের অন্যায় কাজের জন্য আজ নির্দিধায় বলতে পারেন-

“চিরদিন ওর জন্য রয়ে গেল হতাশা, অপমান আর হেরে যাওয়া।”^{২২৮}

এ এক ধরনের প্রায়শ্চিত্ত। আধুনিক নারী তাঁর শিক্ষা-দীক্ষায় যেভাবে জোরের সঙ্গে বলতে পারেন নিজের ভুল-ভ্রান্তির কথা, কুন্তিও ঠিক সেই রকমভাবেই বলেছেন নিজের ভুলের কথা। এরপর কাহিনিকথনে উঠে আসে দ্রৌপদীর গোপন জন্ম রহস্যের কথা— দ্রৌপদী দ্রুপদ রাজের কন্যা হলেও তার মা ছিল শবরী। নাট্যকাহিনিতে উঠে আসে লঙ্কেশ্বর রাবণের দশ মুন্ডের গল্প। যেটি আসলে লোককে বোকা বানানো বা ভয় দেখানোর জন্যই করা হয়েছে বলে কুন্তীর অভিমত। কুন্তী মন্দোদরীকে বলেন—

“অমন বোল না মন্দোদরী। কেন লঙ্কেশ রাবণের ঐ দশ মুণ্ড কুড়ি হাতের গল্প? ও সব সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানোর জন্যই তো প্রচার করা। সকল রাজবাড়িতেই নানা গল্প আছে। আর এইভাবেই আমরা রাজপরিবারের লোকজন মানুষের স্মৃতিতে ক্রমশ অতিমানব হয়ে উঠতে থাকি।”^{২২৯}

পুরুষশাসিত সমাজে নারী রাজ অন্তঃপুরচারিণী। সেখানে পুরুষের কথাই বড়ো করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। একসময় তারা মন্দোদরীকে আক্রমণ করে বলেন—

“হ্যাঁ মন্দোদরী সত্যিই ঘৃণ্য তুমি। ঘৃণ্য, ঘৃণ্য! বল বল মন্দোদরী নারীর প্রাণ কোথায় থাকে? জান না নারীর প্রাণ থাকে সন্তানের হৃৎপিণ্ডে। সেই হৃৎপিণ্ড যখন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ঘাতকের ছুরিতে, তখনও তুমি ছিঃ—ইন্দ্রজিৎ সেই বীরযুবক, দশ মাস গর্ভে ধারণ করেছিলে যাকে? তোমার চোখের সামনে তিল তিল করে যে বেড়ে উঠেছিল এক মহীরুহের মতো- তখনও রয়ে গেল তোমার শরীরের ক্ষিদে আর রাণী সাজার লোভ ? তারপরেও?”^{২৩০}

প্রত্যুত্তরে মন্দোদরী প্রতিবাদ করে নিজের সেইসময়কার অসহায়তার কথা ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে —

“দ্রৌপদী সেই রক্তাক্ত মুহূর্তে কেউ ছিল না আমার। পতি নয়, পুত্র নয়, কেউ কেউ নয়---শুধু মরুভূমির মত এক খাঁ খাঁ শূন্যতা

আর ঐ আত্মজনের চিতাগুলোরই মত দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা জান্তব ক্রোধ। সেই সাপের মত মানুষটা, ধর্মের কত ভান, আর ভিতরে ভিতরে সিংহাসনের লোভে, মেয়েমানুষের মাংসের লোভে যার লালা ঝরে। যথার্থই বিভীষণ। হ্যাঁ আমি বিবাহ করেছিলাম তাকে। আমি একাকিনী অসহায়া, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে আর কীই বা করতে পারতাম বল? শুধু তার প্রতিটি রাত, প্রতিটি দিন বিষাক্ত করে তুলেছি। চার দেওয়ালের মধ্যে, নারী যে কি নিষ্ঠুর হতে পারে, তার উদাসীনতা, তার নীরাবতা, তার মুখরতা দিয়ে, পুরুষকে, বিশেষত অমন মেরুদণ্ডহীন পুরুষকে কী ভয়ানক যন্ত্রণা দিতে পারে, সে কথা তোমরা পরিশীলিত আর্থনারীরা হয়তো জাননা।”^{২৩১}

কুন্তী তারাকে অন্যায়কারী স্বার্থপর বলে অপবাদ দেন। কারণ বালী বধের পর বালীর হত্যাকারী সুগ্রীবের অন্তঃপুরেই তারা রাত কাটান। তারা কুন্তীর কথায় অপমানিত হন। কুন্তীকে বালীপত্নী তারা নিজের অসহায় অবস্থা ও ছোট সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার কঠিন পরিস্থিতির কথা ব্যাখ্যা করে বলেন-

“আমি কোন প্রাণে মৃত্যুকে ডাকব বল? আমাকে দাঁড়াতে হয়েছিল বাস্তবের কঠিন মাটিতে। আমার অঙ্গদ, পিতৃহারা হোল যে একই সঙ্গে মাতৃহারাও করব তাকে কোন প্রাণে? ঐ শঠ সুগ্রীব বাঁচতে দিত তাকে? তাই আমি আমার ভীষণ যন্ত্রণাকে বুকে চেপে ছলনার হাসি হাসতে হাসতে উন্মাদ করে তুলেছিলাম ঐ কামুকটাকে। আমাকে যে বাঁচিয়ে রাখতে হবে আমার সন্তানকে, তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর তোমরা কিছুই না জেনে, না বুঝে বল কিনা--।”^{২৩২}

তারা সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিজের অপমানকে চোখ বুজে সহ্য করেছেন। এদিকে ইন্দ্রের সঙ্গে গোপন সম্পর্কের জন্য অহল্যাকে ঋষি গৌতম অভিশাপ দিয়ে জড়পাথর করে দিয়েছিলেন। স্বামী গৌতমের কঠিন দাম্পত্য অনুশাসন অহল্যার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল। তাই একদিনের ইন্দ্রের ভালোবাসা, তাঁর মনকে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। আধুনিক নারীর মতো অহল্যা সকলের কাছে স্বীকার করে নিয়েছেন যে ঐ

দিনটি ছিল তাঁর কাছে সত্যকারের বাঁচার মতো বাঁচা। মহাভারতের দ্রৌপদী পুরুষ শাসিত সমাজকে দায়ী করে বলেছেন—

“আমরা শুনি পুরুষ কি সগর্বে বলে থাকে যে একটি নারীতে নাকি মেটে না তার শরীর ও মননের ক্ষুধা। অর্জুন কেমন সহজে ভ্রমণ করেছেন সেই বিপুল রমণী ভুবনে। উলুপী থেকে চিত্রাঙ্গদা, চিত্রাঙ্গদা থেকে সুভদ্রা, আর সখা কৃষ্ণের কথা তো যত কম বলা যায় ততই ভাল। আমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল পঞ্চপতিত্বের ভার, আমার সিদ্ধান্ত ছিল না তা, আমি চেয়েছিলাম শুধু অর্জুনকেই।”^{২৩৩}

পঞ্চ পাণ্ডবকে গ্রহণ করায় দ্রৌপদীর কপালে জুটেছে ‘বেশ্যা’ নামের স্বীকৃতি। এর জন্য পাণ্ডবলী কুন্তীকে দায়ী করেছেন। মহাভারতে কুন্তীর এই দায়ের স্বীকারোক্তি না থাকলেও ‘পঞ্চকন্যার কথা’তে তা আছে। কুন্তী বলেছেন—

“কৃষ্ণা তোমার অলৌকিক রূপ দেখে আমি যে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছি। শ্যামল ত্বকের পটভূমিতে অমন অপরূপ শ্রী, কালো মুক্তার মত দুটি চোখের তারা, উজ্জ্বল লাল ঠোঁট, দেহের ঐ অনবদ্য গঠন আমি আগে কখনও দেখিনি। আর আমার সতর্ক দৃষ্টি গিয়ে পড়েছিল সন্তানদের মুখগুলোতে। তোমাকে দেখে সে কি মুগ্ধতা! আতুর হয়ে উঠেছিল তাদের চোখের চাহনি। হ্যাঁ হ্যাঁ মা হয়েও বলছি এ কথা। আমি ভয় পেয়েছিলাম কৃষ্ণা। ভেবেছিলাম তোমাকে উপলক্ষ্য করে যদি আদিম রিপু আগুন জ্বালিয়ে দেয় ভাইয়েদের মধ্যে, তবে যে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে আমার এত যত্নের, এত কষ্টের সংসার। তাই আমি সেদিন---”^{২৩৪}

দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিতে কুন্তী নিজের বিগত জীবনের স্বামী রাজা পাণ্ডুর অক্ষমতা এবং নিয়োগ প্রথায় সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রণার কথা জানিয়েছেন—

“কী বলব? আমি তো তাঁর মুখ দেখিনি। ঘরে ক্ষীণ দীপ জ্বলত। বাইরে থেকে ভেসে আসত দ্বারে অপেক্ষা করা পাণ্ডুর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ আর পুরু করে মাখা ঘি আর মধুর প্রলেপের ফাঁক দিয়ে জ্বলজ্বল করত তাঁদের চোখগুলো। সে যে কী বীভৎস---আমি

উৎকট ঘৃণায় তটস্থ হয়ে থাকতাম। এমনই আমার
অভিজ্ঞতা।”^{২৩৫}

প্রত্যেকটি নারী একে অপরের বাদ-প্রতিবাদে তাঁদের জীবনের অন্ধকারময় দিনগুলির
কথা তুলে ধরেছেন, যা রামায়ণ বা মহাভারতের কাহিনিতে তেমনভাবে নেই বললেই
চলে। ‘পঞ্চকন্যার কথা’ নাটকটিতে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি বেষ্টনে গড়ে উঠেছে
নারী চরিত্রকেন্দ্রিক একটি আধুনিক নারীভাবনার আলেখ্য। সেইসব নারীদের সংলাপে
রয়েছে একালের ভাষার পরিচয়। কোথাও কোথাও কাব্যিক ভঙ্গিতে নাট্যভাষায়
প্রকাশও আছে। অবিবাহিতা নারীর সন্তান বিসর্জনের জন্য হৃদয় যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত
হয়েছে কুন্তীর সংলাপে এইভাবে -

“বোঝোনি বোঝোনি অহল্যা। প্রাসাদের গোপন ঘরে ভয়ানক যন্ত্রণায়
ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছিলাম আমি। প্রথম গর্ভ যন্ত্রণা। মনে হচ্ছিল আর বাঁচব
না...। আমার ধাত্রী শক্ত হাতে চেপে রেখেছিল আমার মুখ। যাতে ঐ
আর্তনাদ বাইরে না বেরোতে পারে। যদি প্রকাশ হয়ে যায় রাজকুমারীর
গুপ্ত শরীরখেলার কথা। তারপর যন্ত্রণার শেষ হল এক সময়। আর
শুনতে পেলাম এক ক্ষীণ কান্নার শব্দ। দেখলাম সে অমল শিশু মুখ।
আমি প্রথম মা হলাম। আর তারপর কি করলাম বল তো? সমস্ত লজ্জা
গ্লানিকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে, আবার তাজা ফুলটি হয়ে গিয়ে, দিবি
নিজেকে সাজিয়ে রাখলাম রাজপুরীর দামি ফুলদানীতে।”^{২৩৬}

এইভাবে ‘পঞ্চকন্যার কথা’ নাটকটি কাহিনিভাবনায় ও চরিত্রের আত্মবিশ্লেষণে অভিনবত্ব
লাভ করেছে। রামায়ণ-মহাভারতের বিখ্যাত নারীদের কল্পিত শোক-দুঃখ-অন্তরের জ্বালা
প্রকাশ করে নাটকটি অভিনব হয়ে উঠেছে। চরিত্রগুলি কোথাও পুনর্নির্মিত, কোথাও-বা
কাহিনি বিনির্মিত হয়ে উঠেছে এই নাটকে।

রতন কুমার ঘোষ - শিখন্ডী (২০১৯) :

২০১৯ খ্রিস্টাব্দে রতনকুমার ঘোষ মহাভারতের কাহিনি অবলম্বন করে লিখেছেন
‘শিখন্ডী’ নামের একটি নাটক। এটি একটি চরিত্র প্রধান নাটক। ২১ সেন্টিমিটার লম্বা
এবং ১৪ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকের প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (১), ভূমিকাপত্র (১),
সূচীপত্র (১), চরিত্রলিপি (১), মূল নাটক (১১) সহ মোট ১৬ টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকের
প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ -

“শ্রুতি বিচিত্রা/ রতন কুমার ঘোষ”^{২৩৭}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ-

“শ্রুতি বিচিত্রা/ রতন কুমার ঘোষ/ রত্না প্রকাশন/
২/৭৩, বিবেকনগর, / কলকাতা- ৭৫”^{২৩৮}

নাটকটিতে স্বতন্ত্র অঙ্ক বিভাজন নেই, কতগুলো ‘দৃশ্যান্তরের’ মধ্য দিয়ে কাহিনির বিন্যাস ঘটেছে। নাট্যোল্লিখিত চরিত্রগুলি হল ভীম, সত্যবতী, অম্বা, পরশুরাম, দ্রুপদ, রানী, শ্বুনকর্ণ। নাটকটিতে মোট পাঁচটি দৃশ্য আছে। নাটকটির ভূমিকা লিখেছেন কবি ও অধ্যাপক কৃষ্ণা বসু। রতনকুমার ঘোষের তত্ত্বাবধানে এবং প্রকাশক শ্রেয়সী গোস্বামীর দায়িত্বে রত্না প্রকাশন, ২/৭৩, বিবেকনগর, কলকাতা- ৭৫ থেকে নাটকটি প্রকাশিত। নাটকটির মূল্য একশত পঞ্চাশ টাকা।

নাটকের শুরুতে মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আবহাওয়া রয়েছে। তারই মধ্যে আছে যুদ্ধবিজয়ের উল্লাস। যুবরাজ দেবব্রত (ভীষ্ম) কাশীরাজের তিন দুহিতাকে স্বয়ংবর সভা থেকে জয় করে নিয়ে এসেছেন হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে মাতা সত্যবতীর কাছে। দেবব্রতের এই নারীবিজয় নিজের জন্য নয়, কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার জন্যে। মাতা সত্যবতী যখন কাশীরাজ কন্যাদের কাছে জানাতে চান—

“হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে তোমরা স্বাগত কল্যাণী। স্বয়ংবর সভায় তোমাদের পাণিপ্রার্থী বহু রাজপুত্র, বহু যোদ্ধা নিশ্চয় উপস্থিত ছিলেন, তাদের পরাজিত করে আমার পুত্র দেবব্রত তোমাদের এই হস্তিনাপুরে নিয়ে এসেছেন। এনেছেন তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের সাথে তোমাদের বিবাহের জন্য। এতে তোমাদের নিজেদের কোনো আপত্তি নেই তো?”^{২৩৯}

তখন বড়ো কন্যা অম্বা তার আপত্তির কথা জানিয়েছেন এবং বলেছেন —

“মহারানী! ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। কিন্তু আমি পূর্ব হতেই শাল্বরাজের বাগদত্তা। শাল্বরাজ আমার প্রেমিক। আমি তাকেই বরমাল্য পরাবো বলে স্বয়ংবর সভায় গিয়েছিলাম। তাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করা আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে হ’বে। রাজপুত্র বিচিত্রবীর্য আমার ভগ্নীদের প্রেয় হ’তে পারেন। আমার নয়।”^{২৪০}

একথা জানার পর ভীষ্ম অম্বাকে শাল্বরাজের কাছে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু শাল্বরাজ অম্বাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে চাননি। তখন অম্বা পরশুরামকে ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছেন—

“না মহর্ষি। সে স্পষ্ট জানিয়ে দিল হস্তিনাপুরের যুবরাজ আমাকে স্পর্শ করেছে। এখন আর সে আমাকে গ্রহণ করতে পারে না।”^{২৪১}

এই বিড়ম্বনার জন্য অম্বা ভীষ্মকেই দায়ী করেছেন এবং তাঁকেই বিয়ে করার জন্যে দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু ভীষ্ম নিজের প্রতিজ্ঞার জন্য তাঁকে গ্রহণ করতে পারেননি। এই অন্যায় অম্বা মেনে নেননি। পরশুরামকে অম্বা বলেছেন—

“জানি না প্রভু। কিন্তু দেবব্রত নিজেও তো আমাকে গ্রহণ করলেন না। শাল্ব প্রত্যাখ্যান করলে তাঁকেই বিবাহ প্রস্তাব দিয়েছিলাম। তার জন্যই তো আমার যত বিড়ম্বনা।”^{২৪২}

এরপরেই অম্বা ভীষ্মের পতনের জন্য মহাদেবের উদ্দেশ্যে কঠোর সাধনা শুরু করেছেন। মহাদেবের কাছ থেকে অম্বা জানতে পেরেছেন—

“স্ত্রীরূপে নয়—অন্য যে কোনও রূপে আমায় নতুন জন্ম নিতে হ’বে। জন্মান্তরেও আমার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকবে দেবব্রতের মৃত্যু। আমার হাতেই হ’বে তার নিধন।”^{২৪৩}

পরবর্তী সময় অম্বা অগ্নিদেবের কাছে আত্মাহুতি দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন এবং পরজন্মে রাজা দ্রুপদের কন্যারূপে শিখন্ডিনী নামে জন্মগ্রহণ করেন। দ্রুপদ রাজা কন্যাকে পুত্রবৎ পালন করেন। রাজ্যের সকলেই তাঁকে পুত্র শিখন্ডি বলে জানেন। একসময় তাঁর সঙ্গে বিবাহ হয় দর্শনপতি হিরণ্যবর্মার কন্যার। দ্রুপদ রানীর মনে ভয় জাগে—‘মহারাজ রাজা হিরণ্যবর্মার কাছে আমরা প্রতারক প্রতিপন্ন হ’ব না তো?’ এরপরেই দ্রুপদ পরিবারের অপমানের সুত্রপাত হয়। শিখন্ডিনী বলেন—

“কী লজ্জা, কী লজ্জা! আমার জন্যে আমার পিতামাতাকেও অপদস্থ হ’তে হচ্ছে। রাজা হিরণ্যবর্মা জেনে গেছেন যে তার কন্যার স্বামী প্রকৃতপক্ষে পুরুষ নয়। সন্তান হয়ে তাদের সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করতে না পারলে আমার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়।”^{২৪৪}

মনের দুঃখে শিখন্ডিনী একসময় মৃত্যুকে শ্রেয় জ্ঞান করেন এবং তিনি গভীর বনে প্রবেশ করেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় যক্ষ স্থূর্নকর্ণের। শিখন্ডিনী তাঁকে নিজের সমস্যা কথায় বলেন—

“হ্যাঁ আমি রাজকন্যা শিখন্ডিনী। পিতা মাতা আমাকে বাল্যাবস্থা থেকে সকলের কাছে পুত্রের পরিচয়ে লালন করে আসছেন। প্রকাশ্যে আমার নাম শিখন্ডী। ক্ষত্রিয় পুরুষের যাবতীয় শিক্ষা আমি গ্রহণ করেছি।... দশার্ণ অধিপতি হিরণ্যবর্মার কন্যার সাথে আমার বিবাহ হয়। অনতিবিলম্বে রাজকন্যা আমার প্রকৃত পরিচয় জেনে যায়।”^{২৪৫}

শিখন্ডিনী স্থূর্নকর্ণকে জানিয়েছেন যে রাজা হিরণ্যবর্মা তাঁর পিতা যজ্ঞসেনের প্রতি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়েছেন প্রতারিত হওয়ার জন্য। রাজা হিরণ্যবর্মা তাঁদের রাজ্য আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই অবস্থায় পিতাকে বা রাজ্যকে রক্ষা করবার কোন উপায় নেই। আত্মহত্যা ছাড়া তাঁর আর কোনো পথ নেই। স্থূর্নকর্ণ একথা জানার পর তাঁকে একটি উপায় দেন এবং বলেন—

“দেখুন যক্ষ হ'বার কারণে আমরা লিঙ্গ পরিবর্তন করবার উপায় জানি। এই বনেই আমরা যদি পরস্পরের লিঙ্গ পরিবর্তন করে নিই, তবে আপনি সম্পূর্ণ পুরুষ রূপে রাজ্যে ফিরে যেতে পারবেন।”^{২৪৬}

স্থূর্নকর্ণের এই প্রস্তাবে রাজি হন শিখন্ডী। লিঙ্গ পরিবর্তনে তাঁর একসঙ্গে তিনটি লাভ হয়। প্রথম লাভ, পিতা-মাতার রাজ্যের উপর আক্রমণ বন্ধ হওয়া। দ্বিতীয়ত লাভ, দশার্ণ অধিপতি হিরণ্যবর্মা ও তাঁর কন্যার কাছে পুরুষরূপে স্বীকৃতি পাওয়া। তৃতীয়ত লাভ, এই পরিবর্তনে তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেবে, যার নাম হবে ক্ষত্রদেব। এসব কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যায় শিখন্ডী বাহন। তবে স্থূর্নকর্ণ তাঁকে একটি শর্ত প্রদান করে বলেন—

“অবশ্যই। আর আজ থেকে শিখন্ডিনী নয় শিখন্ডী নামেই পিতার কাছে ফিরে যাবেন আপনি। আপনার কাছে একটাই অনুরোধ—কার্যসিদ্ধির পর আমাকে আমার লিঙ্গ ফিরিয়ে দেবেন। জানিনা ইতিমধ্যে কুবের আমায় স্ত্রী অবস্থায় দেখে কি প্রতিক্রিয়া জানাবেন।”^{২৪৭}

নাটকের এই পর্বে স্থূর্নকর্ণ শিখণ্ডীকে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর ইঙ্গিত দেন—

“আমি কল্পক্ষে দেখতে পাচ্ছি শিখণ্ডী, আপনার কনিষ্ঠা ভগ্নী দ্রৌপদী হস্তিনাপুরের কুলবধূ হবে। দ্রৌপদীর কারণে এক মহাযুদ্ধ হ’বে, আর কৌরব বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা আপনার হাতে নিহত হবেন।”^{২৪৮}

একথায় নিশ্চিত হয় যে শিখণ্ডীর হাতেই ভীষ্মের মৃত্যু অবধারিত। একদিকে অম্মার প্রতিশোধ গ্রহণের সফলতার পূর্ব ইঙ্গিত, অন্যদিকে মহাভারতের মহাযুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে কৌরব বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ভীষ্মের মৃত্যু- নাট্যকাহিনির ভাবনাকে কাল থেকে কালান্তরে নিয়ে গেছে। মানুষের হৃদয়ে চিরকালের জন্য অম্মারূপী শিখণ্ডী নিজের জায়গা করে নিয়েছেন। নাটকটি একালের প্রেক্ষাপটে রচিত হওয়ায় এবং একালের ভাষাকে ব্যবহার করায় আধুনিক হয়ে উঠেছে। অম্মা যখন পরশুরামকে ভীষ্মের নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পিছুপা হননি, তখন তাঁর ভাষাতে অন্তরের জ্বালাময় রূপটি প্রকাশ হয়েছে। তাঁর উক্তি-

“তবে মহাদেবের নির্দেশই পালন করব। জ্বলে উঠুক আগুন। গ্রাস করুক আমার শরীরকে। দেবরতের মৃত্যু কামনা নিয়ে শেষ হোক এ জীবন। এসো অগ্নিদেব। গ্রহণ কর এই অতৃপ্ত রাজকন্যা অম্মাকে।”^{২৪৯}

এইরকম আকর্ষণীয় শব্দ ও বাক্য ব্যবহার দর্শক মহলে নাটকটির জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছে। কাহিনি, চরিত্র, ভাষা, আচার-আচরণ ইত্যাদি অভিনবভাবে পুনর্নির্মিত হয়েছে এই নাটকটিতে।

গ) ভাগবতের কাহিনি অবলম্বনে রচিত নাটক;

আমরা আগেই দেখিয়েছি যে, রামায়ণ এবং মহাভারতের কাহিনি নিয়ে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে অনেক নাট্য পুনর্নির্মাণ লিখিত হয়েছে। সেখানে কোথাও রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি, কোথাও চরিত্র, কোথাও তৎকালীন সমাজ-বাস্তবতা ও পরিবেশের যেমন পুনর্নির্মাণ করেছেন নাট্যকারগণ, তেমনি আবার সেই সমস্ত নাটকে একালের ভাব-ভাষা-কল্পনাকে বিস্তৃতভাবে স্থান দিয়ে নাটকগুলিকে সার্থক পুনর্নির্মাণ রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শুধু রামায়ণ-মহাভারত নয়, ভাগবত নিয়েও একইভাবে বহু নাট্য পুনর্নির্মাণ আমরা লক্ষ্য করেছি। বক্ষ্যমাণ উপাধ্যায়ে ভাগবত নিয়ে রচিত সেই রূপ নাটকের বিশ্লেষণ করাই আমাদের এই গবেষণা মুখ্য উদ্দেশ্য।

মন্মথ রায় – কারাগার (১৯৩০) ;

ভাগবতের কাহিনি নিয়ে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মন্মথ রায় লিখেছেন পৌরাণিক নাটক ‘কারাগার’। ২৩ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১৫ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটিতে প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (১), চরিত্রলিপি (১), প্রস্তাবনা (১), মূলনাটক (৩৮) সহ মোট ৪২টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ -

“বাংলা/ নাট্য সংকলন/ প্রথম খণ্ড/ পশ্চিমবঙ্গ নাট্য
আকাদেমি”^{২৫০}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ-

“কারাগার/ মন্মথ রায়/ প্রণীত/ প্রথম প্রকাশঃ ১৯৩০”^{২৫১}

নাটকটি প্রথম প্রকাশের পর সংকলিত হয় ‘বাংলা নাট্য সংকলন’ গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড)। নাটকটি প্রকাশিত হয় পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা- ২০ থেকে। নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় মনোমোহন থিয়েটারে ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩০ সালে। নাটকটিসহ নাট্য সংকলনের মূল্য তিনশত টাকা।

পরাদীন ভারতবাসীর উপর ইংরেজ শাসকদের অত্যাচার এবং পরাদীনতার যন্ত্রণা যে কি নিদারুণ হয়েছিল, তার নাট্যরূপ ‘কারাগার’ নাটকে মন্মথ রায় প্রকাশ করেছেন। এখানে ভারতবর্ষ পুরাণের কংসের কারাগারের প্রতীক রূপে অঙ্কিত। পরাদীন দেশপ্রেমিক নেতারূপে দেখানো হয়েছে বসুদেব চরিত্রটিকে। কঙ্কণ ও কঙ্কা স্বাধীনতা কামনায় প্রতিবাদী যুবশক্তির প্রতীক। যাদবদল এখানে পরাদীন ভারতবাসী রূপে চিত্রিত। কংসের কারাগারে কৃষ্ণের জন্ম যেন ভারতবর্ষের বুকে মুক্তিদাতা জন নেতার আবির্ভাব। গান্ধীজীর মতো নেতার আবির্ভাব ও তাঁর প্রতিরোধ যেন তারই পরিচয়। ১৯৩১ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় নাটকটির সম্পর্কে লেখা হয়—

“এই হতভাগ্য পরশাসিত দেশে সবই সম্ভবপর। ‘কারাগার’ একখানি পৌরাণিক নাটক, দ্বাপরের অত্যাচারী মথুরার রাজা কংসের কাহিনী অবলম্বন করিয়া লিখিত। বাঙ্গালার গভর্নমেন্টের কর্তারা ইহার অভিনয়ে এমন কি আপত্তির কারণ দেখিতে পাইলেন? অথবা দ্বাপর যুগের ‘কারাগারে’র সঙ্গে এই কলিযুগের ‘কারাগারে’র সাদৃশ্য অনুভব করিয়াই কি তাহারা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন?”^{২৫২}

‘কারাগার’ নাটককে এক অর্থে পৌরাণিক নাটক, অন্যদিকে প্রতীকী নাটক বলা চলে। এই নাটক দেখার পর দর্শকদের মনে দেশপ্রেম যেমন জাগ্রত হয়েছে এবং তেমনি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব তৈরি হয়েছে। ১৯৩১ সালে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তৎকালীন সরকার একটি ফরমান জারি করেছিলেন এই নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ করার জন্যে। সেই ফরমানটি হল-

“The Government of Bengal

Political Department

Political Branch

No.1695 P.

ORDER

Calcutta, the 4th Feb. 1931

Whereas it appears to the Governor in council that the play entitled Karagar by Manmatha Ray, M.A printed by him at the Sree Gouranga Press at no. 71/1 , Mirzapur Street, Calcutta, and published at Barada Bhaban, Balurghat, (Dinajpur), which has been performed at Monomohon Theatre, Calcutta, is likely to excite feelings of disaffection towards the Government established by law in British India. Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Dramatic Performances Act, 1876- (XII of 1876), The Governor in council hereby prohibits the performance of the said play in any public place.

By order of the Governor in Council.

Sd/ R.N Reid.

Offg Chief Secretary to the Government of Bengal.”^{২৫৩}

কিন্তু পরবর্তীসময় সাধারণ নাট্যপ্রেমী মানুষ, অভিনেতা-অভিনেত্রী সকলেই এর প্রতিবাদ জানান। এই প্রতিবাদ বিদ্রোহের রূপ নেয়। শেষ পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হয় ইংরেজ সরকার। ‘কারাগার’ একাধারে পৌরাণিক নাটক হয়েও স্বদেশ প্রেমের নাটক। এখানে ভাগবত কাহিনির নাট্যবিনির্মাণ ঘটেছে।

নাট্য কাহিনির শুরুতে যাদবগণ বাসুদেবের কাছে এসে কংসের অত্যাচারের প্রতিকার চেয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন —

“সে ঘোষণা করিয়েছে রাজ্যের যত পূজা সব রাজার প্রাপ্য, দেবতার নয়। রাজ্যে রাজার পূজা ভিন্ন দেবতার পূজা নিষেধ।... আমাদের ঘরে ঘরে তার সশস্ত্র সৈন্য প্রহরী এল। তারাও যাদব। যাদব হয়েও তারা যদুকুলের আরাধ্য-দেবতা নারায়ণ-বিগ্রহ ধ্বংস করল! যে বাধা দিতে গেল, সে প্রাণ হারাল। যে বাধা দিল না, সে বেঁচে গেল। আরো অপমান আরো উৎপীড়ন—আরো অত্যাচার কপালে লেখা রয়েছে, তাই আমরা মরতে পারলাম না!...”^{২৫৪}

এমনকি কংসের পিতা উগ্রসেন এসে কংসের অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্য অনুরোধ জানান বাসুদেবকে—

“তোমার পিতার হাত হতে যেদিন রাজদণ্ড কেড়ে নিয়ে মথুরায় যাদব-রাজত্বের অবসান করি, সেদিন মনে আশা ছিল, সুশাসনে যাদবের মন হতে তাদের পরাজয়ের গ্লানি মুছে দেব। আশা ছিল—বিজয়ী ভোজবংশ এবং বিজিত যদুবংশ আমার সুশাসনে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখে কালাতিপাত করবে। আমার সে আশা সমূলে নির্মূল করেছে আমারই কুলঙ্গার পুত্র কংস....., তারই চক্রান্তে, ইঙ্গিতে, আদেশে, ভোজবংশ বিজয়ীর গর্ব নিয়ে বিজিত যদুবংশের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে, আমি বহু চেষ্টা করেও তা নিবারণ করতে সমর্থ হইনি।”^{২৫৫}

যাদবকুলের উপর অত্যাচার নিবারণের কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে বাসুদেব নারায়ণের কাছে প্রার্থনা করেন—

“নারায়ণ—! একটিবার চোখ মেল.... চেয়ে দেখ এ জগৎ হ’তে বেদ অন্তর্হিত, দর্শন অদৃশ্য, উপনিষদ লুপ্ত....! সংসারে আজ আচার নাই, আছে শুধু অত্যাচার, প্রীতি নাই, আছে শুধু দ্বেষ, প্রেম নাই, আছে শুধু হিংসা! ধরণী রক্তাক্ত! ধর্ম লুপ্ত!... ভগবান! নারায়ণ!... এখনো কি তুমি ঘুমিয়ে রইবে? এখনো কি তুমি জাগবে না—? জাগবে না?”^{২৫৬}

কংসের বিনা অনুমতিতেই যাদব কন্যা চন্দনাকে কংসের অনুচররা ধরে এনেছিলেন। কংস অনুচরদের শাস্তি দেবার কথা ভাবলেও চন্দনার রূপ-সৌন্দর্য দেখে তাদের ক্ষমা করেন। এখানে পুরাণের পরিচিত কংস কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছেন। তিনি প্রেমিক কংস রূপে চন্দনাকে কাছে পেতে চেয়েছেন। কিন্তু চন্দনা তা মানতে না চাইলে, তাকে যাদব পঙ্কীতে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কংসের যুক্তি—

“যে স্বেচ্ছায় আসে, সে ভালোবেসে আসে, কিন্তু যে তা আসে না, তাকে আমি ধরে রাখিনে। কিন্তু এ কথাও সত্য নরক, জীবনে এই প্রথম দেখলাম যে তৃষ্ণার্তকে দেখে নদী শুকিয়ে যায়, পিপাসায় যখন ছাতি ফেটে যায়, তখন সমুখের জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়—এই উত্তপ্ত ললাট যখন নিদারুণ জ্বালায় চন্দন-পরশ চায়....তখন...তখন ঐ চন্দনা—।”^{২৫৭}

এই অংশে কংস চরিত্রের আত্মসমালোচনার দিকটি অনেকটা বড়ো হয়ে উঠেছে। কংস উপলব্ধি করেছেন—

“আমার! শুনেছ আমি শয়তান, আমি দানব, আমি রাক্ষস...আরো কত কি! এও হয়তো শুনেছ...আমি বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে সিংহাসনে আরোহণ করেছি, আমি মাতার বুক থেকে সন্তান ছিনিয়ে নিয়ে পাথরের ওপর আছড়ে মেরেছি, আমি মানুষের তাজা রক্ত পান করি, আমি মদ খাই...আমি কিনা করতে পারি—হ্যাঁ, তোমাকেই বা আমি কি না করতে পারতাম!”^{২৫৮}

এদিকে চন্দনা যাদবপঙ্কীতে ফিরে আসলে যাদবগণ তাকে সমাজে গ্রহণ করতে চায় না। বরং তাকে ‘পতিতা’, ‘ধর্ষিতা’ বলে অপবাদ দেয়। তখন চন্দনা একালের যুক্তিবাদী নারীর মতো যাদবদের প্রতিবাদ করে বলেছে—

“সমাজ? সমাজ? কেমন সেই সমাজ—যে সমাজ তার—কুল-নারীকে রাক্ষসের গ্রাস হতে রক্ষা করতে একপদ অগ্রসর হয় না? আজ সমাজের ধ্বজা ধারণ করে আমার পর্ণকুটীরে যাবার পথটুকু রুদ্ধ করছ, কিন্তু কোথায় পালালে তখন...যখন দানব-দস্যুর করাল কবল হতে মুক্ত হবার জন্য সর্বচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে অবশেষে কাতর ক্রন্দনে তোমাদের সাহায্য ভিক্ষা চেয়ে আমার কর্ণের শেষ শক্তিটুকু নিঃশেষ করেও হতাশ হলেম?”^{২৫৯}

বসুদেব চন্দনার পক্ষ নেন। তিনি যাদবদের বোঝাতে চেষ্টা করেন এবং বলেন—

“তাহলে তোমরা?...তোমাদের তো শুধু স্পর্শদোষ হয়নি! তোমাদের পিঠে তারা পাদুকা প্রহার করেছে, সেই পাদুকাই আবার তখনি তাদের আদেশে তোমরা লেহন করতে বাধ্য হয়েছে! ধর্ষিতা হওনি....স্বেচ্ছাচারী অত্যাচারী দানব কি শুধু নারীকেই ধর্ষণ করেছে! তোমাদের করেছে না? তোমাদেরই চোখের সামনে কি তোমাদের পূজাধর্ম বারিত হয়নি? এই মন্দিরেই কি তোমাদের যুগযুগান্তরে শালগ্রাম শিলা চূর্ণীকৃত হয়নি?... সেও যাক্, কোথায় গেল তোমাদের গোলাভরা ধান...অঙ্গনভরা গোরু? ধর্ষিত হওনি? অসুর যখন তোমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তোমারই চোখের সামনে তোমারই মা...তোমারই বোনকে ধর্ষণ করে, সেকি শুধু নারী ধর্ষণ? পুরুষ কি তাতে ধর্ষিত নয়?”^{২৬০}

এক সময় চন্দনা কংসের প্রাসাদে স্বেচ্ছায় ফিরে যায়। কংস চন্দনাকে লাভ করে বলেন—

“আমি আজ ধন্য! আমি আজ ধন্য! আজ আমি জয়ী... পরমজয়ী...। দেবতাকে পরাজিত করে তার শ্রেষ্ঠ-সম্পদ আমি লাভ করেছি...সে তুমি!”^{২৬১}

কংস নিজের মৃত্যুর ভয় ভীত হয়ে দেবকী ও বাসুদেবকে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। এমনকি তিনি নিজের ভগ্নী ও ভগ্নীপতির উপর চরম অত্যাচার করেছেন। সেই কংসের সঙ্গে চন্দনার সম্পর্ক দেখে কঙ্কন হতবাক হয়েছে। সে চন্দনাকে ধিক্কার দিয়ে বলেছে—

“ছিঃ চন্দনা, যখন দুরাত্মা দানব আমাদের ওপর, দিনের পর দিন, নুতন হতে নতুনতর পৈশাচিক অত্যাচার করেছে...যখন আমাদের শালগ্রাম শিলা চূর্ণ বিচূর্ণীকৃত, যখন আমাদের বিগ্রহ মন্দির হতে লুপ্তিত... যখন আমাদের যাঁরা মধ্যমণি... সেই বসুদেব...দেবকী সানুচর কারারুদ্ধ, তখন... তখন কিনা তুমি... যাদব নন্দিনী হয়ে...কোথায় সেই অত্যাচারের প্রতিকার করবে...তা না করে—।”^{২৬২}

চন্দনা তার কথায় রাগ করে না। বরং তাকে বোঝাতে চায় যে সে কংসের প্রাসাদে থেকেই কংসের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা করবে। কঙ্কাকে চন্দনা বলেছে—

“শয়তানের সেবা করছি?... কেন করব না? তোমরা কি করেছ? তোমরা এই অত্যাচারের মাঝেও কি মধুপান করছ না? গ্রামে যখন আগুন লেগেছে, তখনও কি ঘরে বসেই শাস্ত্রচর্চা করছ না? বেনু-বীণা নিয়ে জ্যোৎস্না রাতে সঙ্গীত সেবা করছ না? সুকুমার কাব্যচর্চা হচ্ছে...কলা-লক্ষ্মীর কলাপূজা হচ্ছে...প্রেম হচ্ছে...বিবাহ হচ্ছে...। উৎসব...বিলাস..কি বন্ধ রয়েছে? আবার ওদিকে নারী যখন ধর্ষিতা হচ্ছে... সমাজপতিগণ সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ধর্ষিতা নারীর মনের বল পরীক্ষা করছেন! পতিতা বলে’ তাকে সমাজচ্যুত করে, সমাজ ধর্ম রক্ষা করতেও তাদের কিছুমাত্র ত্রুটি হচ্ছে না—কঙ্কণ আমি করছি দেশদ্রোহিতা, আর এঁরা করছেন দেশসেবা, না?”^{২৬৩}

নাট্যপরিণতিতে আসে দৈববাণীর প্রসঙ্গ এবং নারায়ণের আবির্ভাবের কথা। পরাধীন ভারতে যেভাবে ইংরেজ দস্যু সাধারণ প্রতিবাদী মানুষের উপর নির্যাতন চালিয়েছে, ঠিক সেইভাবে অত্যাচারি কংস কঙ্কার হাতের আঙ্গুল কেটে নিয়েছেন একের পর এক। অত্যাচারিত কঙ্ক -কঙ্কণ ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করে বলে—

“হে ভগবান...তুমি করুণাহীন, মমতাহীন মরুভূমিতে শঙ্খধ্বনি করে নেমে এস। চক্রে তোমার ধ্বংস কর নির্মম দানব। গদাঘাতে চূর্ণ কর এই লৌহ- কারাগার। তারপর পদ্ম-হস্তের স্পর্শ দাও...আলো দাও...মুক্তি দাও...শান্তি দাও—।”^{২৬৪}

নির্যাতিত যাদবগণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণের মর্ত্যে আবির্ভাব জন্য ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করেন। ইতিমধ্যে কংসের কারাগারে কৃষ্ণের জন্ম হয়। কংস কারাগারে উপস্থিত হয়েছেন দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কৃষ্ণের অনুসন্ধানে। কিন্তু সেখানে গিয়ে জানতে পারেন ভাগ্নের পরিবর্তে ভাগ্নী হয়েছে; তখন কংস মনে মনে আনন্দ পান। কিন্তু চন্দনার কথায় কৃষ্ণের আবির্ভাব স্পষ্ট। চন্দনা কংসকে বলেছে—

“কি হবে সহস্র দীপে। আজ সহস্র চাঁদ আমার চোখে লাগবে না...লক্ষ সূর্য্যও না। কেউ কি কখনো দেখেছে আকাশের বুক চিরে রূপ ঠিকরে বের হয়ে আসে? আমি দেখেছি। কেউ কি দেখেছে

রূপ দেখে আকাশ হল মাতাল, বাতাস হল পাগল? আমি দেখেছি। কেউ কি দেখেছ রূপ দেখে বনের অজগর এল ছুটে... চরণপদ্মের পরশ নিল... ধন্য হয়ে ফণা ধরল... ফণা ধরে তার জয়জাত্রায় জয়-ছত্র হল? আমি দেখে এলাম,... কোটি রূপ নয়, রূপের আগুন... কোটি পতঙ্গ সেই রূপের আগুনে ঝাঁপ দিতে ছুটেছে—আমিও আমিও—”^{২৬৫}

নাটকের মধ্যে কংস চরিত্রের মানবিক দিক দেখানোর চেষ্টা করেছেন নাট্যকার। হৃদয়বান মানুষের মতো বসুদেবকে বলেছেন—

“অভিনয় নয়—অভিনয় নয়। বিশ্বাস কর বসুদেব... আমি ঘুমুতেও পারিনা। চোখ বুঁজলেই দেখি তোমার সাত-সাত পুত্রের ছিন্নশিরের উচ্ছসিত রক্তধারা আমার চোখে-মুখে সর্বাস্থে ছিটকে এসে পড়েছে--! তাও যদি সহিতে পারি... কিন্তু কিছুতেই সহিতে পারিনা... যখন চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে—আমার ঐ আদরিণী ভগিনীর... শোক কাতরা বিষাদ-বিধূরা প্রতিমূর্তি। তাও যদি বা সহিতে পারি... কিছুতেই সহিতে পারিনা—জখন দেখি ভগিনী আমার শুধু নীরবে চোখের জলই ফেলে... প্রতিশোধ নিতে চায় না, অভিশাপ দেয় না।”^{২৬৬}

ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে কংস অত্যাচারী, নির্ধুর, দয়ামাহীন একটি চরিত্র। নাটকে তাঁর এই রূপ নিঃসন্দেহে মৌলিকতার দাবী করে। দেবকী কংসকে জানিয়েছেন—

“কারাগারে আজ ভগবান স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেছেন—কারাগার আজ পুণ্য- তীর্থ! কারাগার আজ স্বর্গ! তাই জগতের এই মহাতীর্থে ভগবানের এই স্বর্গে পাতকী তুমি...তোমার প্রবেশ নিষেধ; শয়তান তুমি বৃথা মাথা খুঁড়ে মরছ!...কিন্তু, কেনই বা এই চেষ্টা... আমাকে চাও? আমি নিজেই বাহিরে আসছি, ঐ লৌহ দ্বার আর আমার পথ-রোধ করতে পারবে না...আমি আজ...আমি আজ—তাঁর জননী যিনি দুষ্কৃতের দমনের জন্য সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে-যুগে জন্ম গ্রহণ করে থাকেন—আমার তপস্যায় এ যুগেও আমারই গর্ভে আজ জন্মগ্রহণ করেছেন।”^{২৬৭}

দেবকীর এই সত্য ভাষণে কংসের অত্যাচারী রূপ জেগে উঠেছে। তিনি দেবকীর কোল থেকে নারী সন্তানটিকে তুলে নিয়ে ভূতলে নিক্ষেপ করেন। আর তখন শোনা যায় সেই বিখ্যাত দৈববাণী— “তোমাদের বধিবে যে/ গোকুলে বাড়িছে সে।” -এই বাণী শুনে কংস ভীত হয়ে পরেছেন। বসুদেবের কাছে কৃষ্ণের আবির্ভাবের কথা শুনে ভয় পেলেও কংসের দাবি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের মূল কারণ তিনি নিজেই। তাঁর জন্য স্বয়ং ভগবান মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। কংস এখানে ভক্ত এবং আত্মসচেতন ভীত চরিত্রের প্রতীক। পৌরাণিক কংস-চরিত্রের যে তেজ ও গাম্ভীর্য ছিল, তা যেন এই নাটকে মেলে না। এ কংস নাট্যকারের হাতে অভিনব হয়ে উঠেছেন। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য -

“হ্যাঁ, আমি, এই দুর্বৃত্ত... এই নারকী! কত যুগ-যুগ ধরেই তো কত কোটি- কোটি লোক কত পূজা করেছে...কত তপস্যা করেছে...তাতে স্বর্গের আসন এক তিলও টলেনি। চোখ বুজে পড়ে থেকে সে শুধু পূজাই নিয়েছে... আমি তার এই স্পর্ধা সহিতে পারিনা...আমি তাই অত্যাচারে অত্যাচারে তাকে জর্জরিত করে স্বর্গ থেকে আমার এই মতেই টেনে এনেছি...”^{২৬৮}

কৃষ্ণের আবির্ভাবের মধ্যে দিয়ে যেমন মর্ত্যের অত্যাচার ও অত্যাচারিতের শাস্তি বিধান করা হয়েছে; তেমনি ইংরেজ শাসনের সমাপ্তির মধ্যে দিয়ে নতুন ভারতের স্বাধীনতা সূর্য ওঠার কামনা করা হয়েছে। এই কামনাই নাটকটিকে পৌরাণিক ভাবনা থেকে একালের ভাবনায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। বিদূরথের সংলাপে তৎকালীন সমাজের নিষ্ঠুরতার ছবি ধরা পরেছে। বিদূরথ যাদবদের উদ্দেশ্যে বলেছেন -

“আজ হতে এ মন্দিরে নারায়ণ পূজা নিষেধ। এ রাজ্যে পূজা পাবার অধিকার একমাত্র রাজার। এখন হতে প্রতি প্রজাকে ঘরে ঘরে কংস মহারাজার মূর্তি বা প্রতিকৃতি রক্ষা করতে হবে এবং নিয়মিতভাবে প্রতি প্রভাতে এবং প্রতি সন্ধ্যায় ধূপ দীপ আরতি সহকারে পূজা করতে হবে।”^{২৬৯}

এইভাবে কারাগার নাটকটি প্রতীকী চেতনার মধ্যে দিয়ে ভাগবত ভাবনাকেন্দ্রিক স্বদেশ প্রেমজাত পুনর্নির্মিত ও বিনির্মিত নাটক হয়ে উঠেছে। নাটকটি সকাল এবং একালে সমানভাবে জনপ্রিয় হয়ে আছে।

মহুয়া চৌধুরী- আত্মজ (২০১৯) ;

ভাগবতের কাহিনি নিয়ে মহুয়া চৌধুরী ‘আত্মজ’ নামের একটি নাটক লিখেছেন। নাটকটি ২০১৯ সালে প্রকাশিত হয়। ২১ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১৪ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটিতে প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (১), উৎসর্গপত্র (১), সূচিপত্র (১), মূল নাটক (৫) সহ ৯ টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকটির প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ-

“দশে দিক / দশটি শ্রুতি নাটকের সংকলন / মহুয়া চৌধুরী।”^{২৭০}

নাট্যকার মহুয়া চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে নাটকটি রত্না প্রকাশন, ২/৭৩ বিবেকনগর, কলকাতা- ৭৫ থেকে প্রকাশিত হয়। নাটকটির মূল্য একশত পঞ্চাশ টাকা। নাটকটির উৎসর্গপত্রে বলা হয়েছে—

“আমার এই বন্ধু বেনু আর নির্মলকে/ যাদের উৎসাহে এই বই প্রকাশিত হল।”^{২৭১}

নাটকে উল্লিখিত চরিত্রগুলি হল— সূত্রধর, শাস্ত্র, কৃষ্ণ, ধাত্রীমাতা, আচার্য প্রমুখ।

কৃষ্ণ ও তাঁর পুত্র শাস্ত্রের মধ্যে কথোপকথন এবং অন্তর দ্বন্দ্ব দিয়েই ‘আত্মজ’ নাটকের কাহিনির সূত্রপাত। সূত্রধরের কথায় নাটকের প্রেক্ষাপটটি রচিত হয়েছে এইভাবে -

“আমরা দেখছি ভারতভূমির প্রাণপুরুষ কৃষ্ণ আজ আমাদের সম্মুখে বিরাজমান। আপন পুত্র শাস্ত্রের সঙ্গে তিনি আলাপচারিতায় রত। কৃষ্ণ এখন মধ্যবয়সী। বড় বিষণ্ণ তিনি আজ। স্বাভাবিক। তাঁর পুত্র শাস্ত্র কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত। এ কালব্যধির নিদান অজানা, দ্বারকাপুরীর চিকিৎসকদের! কিন্তু কৃষ্ণের মুখে শুধুই কি বিষাদ! তাঁর দৃঢ় অথচ মধুর সেই ব্যক্তিত্ব, আজ যেন স্থলিত হয়েছে দেখছি। এই মুহূর্তে তিনি কুণ্ঠিত, অপ্রতিভ। কি এক গ্লানিতে আচ্ছন্ন!”^{২৭২}

কাহিনির অগ্রগতিতে জানা যায় যে কৃষ্ণের অভিশাপে শাস্ত্র কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। সেই কৃতকর্মের জন্য কৃষ্ণ প্রতি মুহূর্তে অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছেন। সেই রোগ থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাজবৈদ্যরা এই রোগ সারাতে অপারগ। কৃষ্ণ স্বয়ং পুত্র শাস্ত্রের রোগমুক্তির উপায় নির্ধারণ করেছেন। তিনি শাস্ত্রকে বলেছেন—

“তোমার এ রোগ জটিল বটে, কিন্তু নিরাময়যোগ্য। তাই বলেছেন বৈদ্যেরা।---হতাশ হোয়ো না বৎস---সুদূর পূর্ব সমুদ্রের তীরে---আছে

সূর্যক্ষেত্র---তুমি যাবে সেই স্থানে---সেখানকার জলবায়ু এ রোগ
নিরাময়ের পক্ষে অনুকূল---শুনেছি এমন কথা---হে আমার প্রিয় পুত্র-
দ্বারকানগরীর সবচেয়ে দ্রুতগামী অশ্বগুলি তোমার রথকে বহন করে
নিয়ে যাবে---সঙ্গে যাবে---বিশ্বস্ত সেবকগণ—”২৭৩

যে পিতাকে শাস্ত্র দেবতার মতো জেনেছেন ছোটবেলা থেকে, সেই পিতাই তাঁকে
অভিশাপ দিয়েছেন! এটি মন থেকে শাস্ত্র মানতে না পারলেও পিতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার
অভাব ছিল না। কিন্তু একসময় গুরুদেব সোমভদ্রের সঙ্গে কথোপকথনে শাস্ত্র পিতাকেই
তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর মতে -

“আমার মনপ্রাণ ছিল আপনার চরণে সদা প্রণত -সমস্ত স্মৃতি এক
লহমায় জেগে উঠেছিল আর আমি নিঃসংশয়ে বলেছিলাম মানব প্রগতির
শ্রেষ্ঠ দান পিতৃত্ব। পিতৃত্ব মানে আশ্রয়, নিরাপত্তা--”২৭৪

পিতার কাছ থেকেই শাস্ত্র প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, ন্যায়-
অন্যায়, দয়া, দান, ভিক্ষা, সংযমের। ফলে তাঁর চিন্তা ভাবনায় পিতার আধিপত্য আজো
বজায় আছে। অথচ বিনা কারণে পিতার নিষ্ঠুর অভিশাপকে শাস্ত্র কিছুতেই মেনে নিতে
পারেননি—

“আমার কি অপরাধ ছিল পিতা সেদিন? ঐ কুটিল মিথ্যা বাক্যে আমাকে
ডেকে এনেছিলেন আপনার সমীপে। আর ঐ চপলা রমণীগণ, যাঁরা
আমার মাতৃস্থানীয়া---নিজেদের সম্ভ্রম ভুলে যদি বিকারগ্রস্ত হন, তবে
তার দায়ভাগী আমাকে কেন হতে হল পিতা?”২৭৫

শাস্ত্রের এই প্রশ্ন যেন অন্যায়কারী প্রতিটি পিতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। পিতা কৃষ্ণ
নিজের সেই অন্যায়কে স্বীকার করে নিয়েছেন। নিজের ভুল স্বীকার করে শাস্ত্রকে
বলেছেন—

“আকস্মিক ক্রোধ যুক্তি মানে না বৎস। গ্লানিতে আমার হৃদয় আচ্ছন্ন!
তবু বলি এ এক ভয়ঙ্কর সমাপতন। তোমার এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার
নিশ্চয় কোনো বাস্তব কারণ আছে পুত্র। যে কারণ আজও চিকিৎসকদের
অজানা। কখনও তা আবিষ্কৃত হবে নিশ্চয়---এ কালব্যাপি আমার সেই
ক্ষণিক ক্রোধ থেকে উদ্ধৃত হয়নি।”২৭৬

কুষ্ঠরোগ পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মধ্যে ভাঙ্গন ধরিয়েছে। কৃষ্ণ নিজেও খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পরেছেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ নারদের মিথা বাণী শুনে শাস্ত্র অস্ত্রপুরে কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন যখন কৃষ্ণ প্রাসাদ সংলগ্ন জলাশয়ে পত্নীগণের সঙ্গে ‘জলকেলিতে’ ব্যস্ত ছিলেন। সুদর্শন-শাস্ত্রকে দেখে তাঁর পত্নীগণ আবেগ উন্মত্ত হয়ে উঠলে কৃষ্ণের পৌরুষে আঘাত লাগে। তখন কৃষ্ণ ক্রোধবশত শাস্ত্রকে অভিশাপ দেন —

“এ রূপ ধ্বংস হোক- ধ্বংস হোক- কুষ্ঠ রোগ আক্রমণ করুক তোমাকে।
আর সেই কালব্যাপিতে পচে গলে নষ্ট হয়ে যাক এ গর্বিত শরীর-”^{২৭৭}

মহাভারতের যে কৃষ্ণকে আমরা ঈশ্বর জেনে শ্রদ্ধা করি, সেই কৃষ্ণ পিতারূপে কেমন ছিলেন, তার পরিচয়টি এখানে স্পষ্ট হয়েছে। এটি কৃষ্ণের ব্যর্থতার একটি বড় দিক। কারণ কোন পিতা তাঁর পুত্রের সৌভাগ্য ও রূপে ঈর্ষান্বিত হতে পারেন, তা যেন বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই নাটকে ভাগবতের মহিমান্বিত পুরুষ কৃষ্ণ কলঙ্কিত পিতা হিসাবে চিত্রিত হয়েছেন। এখানে কৃষ্ণচরিত্র যেন ‘অনুতাপে দগ্ধ মানুষী মুখ’। একালের মানসদর্পণে কৃষ্ণ অপরাধী। ব্যক্তিগত অনুশোচনায় ক্ষত-বিক্ষত একটি চরিত্র। যিনি নিজের অন্যায় সম্পর্কে সচেতন। শাস্ত্রকে কৃষ্ণ বলেছেন -

“পুত্র---পুত্র আমার---আমার আত্মজ---সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল---আমি দেখছি
ঐ অনন্ত আকাশে, জ্বলন্ত নক্ষত্রের অক্ষরে অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে,
নীরব ভর্ৎসনা। এক পতিত মানুষ, ঈর্ষায় দুর্বল মানুষের উদ্দেশ্যে! যার
শোণিতে প্রবাহিনী আদিম হিংসা। দর্পণে আমি দেখেছি সেই গুহামানবের
ভয়াল মুখ! কে বলে গুহামানব মৃত! শুধু ঘুমিয়েছিল-- ঘুমিয়েছিল
কতকাল- তারপর ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিল আবার --মানবতার নিকটে
আমি অপরাধী বৎস-- হে অনন্ত নক্ষত্রবীথি, হে অসীম মহাকাশ--- হে
অণ্ডেয় পরমা শক্তি- ক্ষমা কর--ক্ষমা কর আজ আমাকে-।”^{২৭৮}

নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত কৃষ্ণের অকপট স্বীকারোক্তিতে এবং পুত্রের কাছে নিজ কর্মের জন্য মার্জনা চাওয়ায় কৃষ্ণ চরিত্রটি মানবিক, বিবেকবান এবং সহৃদয়বান চরিত্র হয়ে উঠেছেন। নাট্যকার কৃষ্ণ চরিত্রের অন্তর দ্বন্দ্ব দেখিয়ে চরিত্রটিকে মৌলিক করে তুলেছেন। শাস্ত্র কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছেন -

“তবে কেন আমাকে অভিসম্পাত করেছিলেন পিতা? আপনার সে
বিধ্বংসী ক্রোধ কি যথাযথ ছিল সেদিন?”^{২৭৯}

শাস্ত্রের এই উক্তিতে যেমন ন্যায়-অন্যায়বোধের প্রশ্ন আছে, তেমনি পিতার প্রতি পুত্রের অভিমানও আছে। পুত্রের এহেন অভিযোগে কাতর কৃষ্ণ অন্তরের জ্বালায় জ্বলেছেন। পুত্রকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা হারিয়েছেন। পুত্রক শাস্ত্রকে কৃষ্ণ বলেছেন-

“কেন? কেন পুত্র উচ্চারণ করছ এই সকল বাক্য? এই সব বর্বর গুহামানবেরা আজ মৃত... কালের প্রকোপে জীর্ণ হয়ে লুপ্ত আজ তাদের দেহের অস্থিগুলি পর্যন্ত। আজকের উন্নত মানবসম্প্রদায় সভ্যতার আলোকবর্তিকা ধরে ক্রমাগত চলেছে উত্তরণের পথে- পুত্র হল পিতার দেহ, মন, হৃদয় থেকে উদ্ভূত এক সত্ত্বা- তারই রক্ত মাংস মনন দ্বারা সৃজিত।”^{২৮০}

এইভাবে সংলাপ, বিষয়বস্তু, চরিত্রগত ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশ্লেষণ ও পরিবেশনে মহুয়া চৌধুরীর ‘আত্মজ’ নাটকটি আধুনিক মনস্তত্ত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এটি ভাগবত কাহিনি ও চরিত্রের একটি পুনর্নির্মাণ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মহুয়া চৌধুরী - দুর্গার পাঁচালী (২০১৯);

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত ‘পথের পাঁচালী’ ও ভাগবতের অনুষঙ্গে রচিত মহুয়া চৌধুরীর ‘দুর্গার পাঁচালী’ নাটকটি ২০১৯ সালে প্রকাশিত। ২১ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১৪ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটির প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (১), উৎসর্গপত্র (১), চরিত্রলিপি (১), মূল নাটক (৪) সহ মোট ৮ টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকটির প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ -

“দশে দিক/ দশটি শ্রুতি নাটকের সংকলন/ মহুয়া চৌধুরী।”^{২৮১}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ-

“দশে দিক/ দশটি শ্রুতি নাটকের সংকলন/ মহুয়া চৌধুরী/
রত্না প্রকাশন, ২/৭৩, বিবেকনগর, কলকাতা- ৭৫”^{২৮২}

নাটকটি মহুয়া চৌধুরী নিজ সম্পাদনায় ‘দশে দিক’ নামক একটি শ্রুতি নাটকের সংকলন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। নাটকটি প্রকাশিত হয় রত্না প্রকাশন, ২/৭৩, বিবেকনগর, কলকাতা- ৭৫ থেকে। নাটকটির মূল্য একশত পঞ্চাশ টাকা।

নাট্যোল্লিখিত চরিত্রগুলি হল- যশোদা ও সর্বজয়া, দুই দুর্গা, ধাত্রী, নন্দরাজ। উৎসর্গপত্রে নাট্যকার বলেছেন—

“আমার দুই বন্ধু বেনু আর নির্মলকে/ যাদের উৎসাহে এই বই প্রকাশিত হল।”^{২৮৩}

‘দুর্গার পাঁচালী’ নাটকটি পুরাণ ভাবনার নব্য ফসল। এখানে নাট্যকার ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের কাহিনি ও চরিত্রভাবনার সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম কৌশলে ভাগবতের কৃষ্ণের জন্মকথা যুক্ত করেছেন। ফলে অতীতের ঐতিহ্য এবং একালের জীবনচেতনা এক মেরুতে যুক্ত হয়ে একটি অভিনব ভাবনার দিক উন্মোচিত হয়েছে। সেই কাহিনির মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে একালের সমাজবাস্তবতায় নারী-পুরুষের বৈষম্যের দিকটি। এসেছে ভারতবর্ষের মাতৃত্বের চির পরিচিত প্রতীকী রূপটি। ‘পথের পাঁচালী’র আখ্যান দিয়ে নাটকটির সূচনা হয়েছে, যেখানে সর্বজয়া দেবী দুর্গার কাছে প্রার্থনা করে বলেছেন —

“আজ বিজয়া দশমী। বচ্ছরকার দিন। দুগ্গা মা গো, আমার বাছাকে ভালো রেখ মা। ঐ খুঁদকুড়োটুকুই আমার সম্বল। অপুকে ভাল রেখ। জন্মে জন্মে ওকেই যেন কোল ভরে পাই। আর কিছু চাই না মা গো—
..২৮৪

কন্যা দুর্গা মারা যাওয়ার পর তার সঙ্গে সর্বজয়ার সাক্ষাৎ হয় কল্পভাবনায়। মা সর্বজয়া অবাক হয়ে বলেন—

“দুগ্গা— তুই আমার দুগ্গা কিন্তু তুই তো মা কবেই নিশ্চিন্দিপুরে— সেই ভয়ানক বিষ্টির রাতে চিরকালের জন্যে আমার বুক খালি করে—।”^{২৮৫}

এখানে মায়ের প্রতি দুর্গার অভিমানমিশ্রিত ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। তাতেই উঠে আসে নারী ও পুরুষ সন্তানের সামাজিক বৈষম্যের কথা। দুর্গা মা সর্বজয়াকে বলেছেন—

“নিশ্চিন্দিপুরের পাট চুকিয়েছিলে তুমি, যাতে সংসারের একটু সুসার হয় – অপু যাতে দুটো ভাল খেতে পরতে পায় সেই আশায়— আসল কথা মা আমি ছিলাম তোমার সংসারের নেহাৎই এসে পড়া খানিকটা রক্ত-মাংসের ডেলা... হ্যাঁ ঐ রক্ত-মাংসের ডেলাটার ভাড়ে তুমি হাঁপিয়ে উঠেছিলে, তাই বলেছিলে আমায়, কোথেকে একটা আপদ বালাই এসে জুটেছে-মর মর মরেও না.... অভাব অনটনে মানুষের কাণ্ডজ্ঞান লোপ

পায় জানি- কিন্তু তোমার তো তা হয় নি মা। (হেসে) মনে করে দেখ তো, অপুকে কী অমন কথা বলেছিলে কখনও?”^{২৮৬}

মা সর্বজয়া দুর্গার কথায় কষ্ট পান। দুর্গা এই নাটকে আমাদের সমাজের সমস্ত অবহেলিত নারীর প্রতিনিধি। যে সকল মাতা-পিতা কন্যা সন্তানের প্রতি অবজ্ঞা করেন, তাঁদের প্রতি ধিক্কার জানিয়েছে দুর্গা। একসময় নাট্যকাহিনির পট পরিবর্তন হয়। ক্রমে ক্রমে উপন্যাসের কাহিনি পরিবর্তিত হয়ে যায় ভাগবতের কৃষ্ণের জন্ম কথায়। এখানে সর্বজয়া হয়ে উঠেন যশোদা, দুর্গা হয়ে উঠে দেবী দুর্গা বা মহামায়া। কন্যা দুর্গার কণ্ঠে সেই পরিবর্তনের কথা শোনা যায়-

“কত হাজার বছরের ঢাকনা সরে গেছে আজ আমার চোখের সামনে থেকে। তাই দেখতে পাচ্ছি সেদিনও ছিল এমনই তফাতের দিন। তুমি তখনও ছিলে। তখন তোমার নাম ছিল যশোদা-বৃন্দাবনের নন্দরানী। সে রাতটাও ছিল নিশ্চিন্দিপুরের মতোই ভয়ঙ্কর এক দুর্যোগের রাত - মনে পড়ে মা?”^{২৮৭}

ভাগবতে আমরা দেখেছি যে নন্দরানী যশোদা প্রসব করেন একটি কন্যা সন্তান, নন্দরাজা তা মেনে নিতে পারেননি। ধাত্রীর কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন নন্দরাজা। কংসের কারাগার থেকে কৃষ্ণকে নিয়ে বসুদেবের আগমন ঘটে নন্দরাজার ঘরে। নন্দরাজা কন্যা সন্তানটিকে বসুদেবের হাতে সমর্পণ করেন। পরিবর্তে নন্দরাজার গৃহ থেকে বসুদেব মহামায়াকে নিয়ে কংসের কারাগারে ফিরে যান। এ যেন কন্যা হওয়ারই অভিশাপ। নন্দ রাজার আচরণে সে কথারই প্রমাণ মেলে। নন্দরাজ পল্লীবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন—

“পল্লীবাসী শোন শোন - এক ভুল বার্তা পেয়েছিলে কাল। এখন এক আনন্দ সংবাদ দিই শোন - ওই বৃদ্ধা ধাত্রী - আজ বুঝেছি - সে ক্ষীণ দৃষ্টি ছিল নিশ্চয়। ভুল দেখেছিল সে। প্রকৃত প্রভাবে রানী যশোদার এক পরম সুন্দর পুত্র জন্মেছে। কন্যা নয়- কন্যা নয় পুত্র - ভুল সংবাদে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল কাল তোমাদের আনন্দ উৎসব। পল্লীবাসী প্রাণ ভরে আনন্দ কর আজ। আর হ্যাঁ ঐ দুর্বিণীতা ধাত্রী নিজের ভুল স্বীকার না করে তর্ক করছিল ক্রমাগত। তাই আমি নির্বাসন দণ্ড দিয়েছি তাকে- আনন্দ কর পল্লীবাসী - আনন্দ কর-।”^{২৮৮}

নন্দরাজের কন্যা দুর্গা জন্মানোর পর কংসের যে অত্যাচার সহ্য করেছিলেন এবং মৃত্যুকে বরণ করেছিল, তা অতি বাস্তব এবং নির্মম সত্য। ‘পথের পাঁচালী’ কন্যা দুর্গা মা সর্বজয়াকে বলেছেন-

“কংসের কারাগারের দ্বার খুলে যায় নি। শরীরের শৃঙ্খল খসে পড়েনি সে রাত্রে - বসুদেব উৎকোচের আশা দিয়ে বশীভূত করেছিলেন কারারক্ষীদের। দেবকীর গর্ভের পুত্রকে বাঁচানোর জন্য যমুনা পার হয়ে এসেছিলেন। ভাগ্য সহায় হয়েছিল দুজনেরই। তাঁরাও এবং কন্যাভারগ্ৰস্ত নন্দরাজেরেও। পুত্রের পরিবর্তে অবাঞ্ছিত কন্যাটিকেই তুলে দিয়েছিলেন বসুদেবের হাতে। কী নির্মম, কী বীভৎস সেই সন্তান বিনিময়। পরদিন যখন বৃন্দাবন নন্দোৎসবে মাতোয়ারা, ঠিক তখনই কংস সেই কচি শরীরটাকে আছড়ে ফেলেছিল পাথরে—থ্যাঁতলানো মাংসো আর কাঁচা রক্তে—অনেকখানি মাটি-।”^{২৮৯}

সর্বজয়া কন্যা-দুর্গার মধ্যে মা দুর্গার স্বরূপ খুঁজে পেতে চেয়েছেন। তখনই দুর্গা অভিমানের সুরে প্রকৃত সত্যের সম্মুখীন করেছে একইসঙ্গে মা সর্বজয়া ও যশোদাকে—

“হ্যাঁ মা, বিশ্বাস বড় শান্তি দেয় মানুষকে। নিশ্চিত হও। আর তোমার ঐ গহন বিশ্বাসের আঁধার জলে ডুবে যাক, আমাকে না চাওয়ার ক্ষীণ অপরাধবোধটুকু। মা এ ভারতভূমিতে চিরন্তন সত্য শুধু দুর্গা বিসর্জন- দুর্গা বিসর্জন- দুর্গা বিসর্জন।”^{২৯০}

এ দুর্গা আমাদের পরিচিত জগৎ জননী দুর্গা নন, এ দুর্গা ‘পথের পাঁচালী’র দুর্গা, আমাদের ঘরের মেয়ে দুর্গা। তার প্রতি অন্যায়, বৈষম্য আমাদের মনকে ব্যথিত করে। প্রতি বছর দুর্গা পূজার সময় যে দুর্গা আমাদের ঘরে আসেন, তাঁকে আমরা কেউ ভুলে থাকতে পারি না। কিন্তু আমাদের ঘরের মেয়ে দুর্গাদের আমরা অবজ্ঞা করি। ‘দুর্গার পাঁচালী’ এইভাবে সেই পুরাণভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত বিনির্মিত আধুনিক নাটক হয়ে উঠেছে।

মাত্র ছয়টি চরিত্র নিয়ে ‘দুর্গার পাঁচালী’ নাটকটি লেখা হয়েছে। বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’র দুটি চরিত্র সর্বজয়া ও কন্যা দুর্গা এবং ভাগবতের কৃষ্ণের জন্মকথার চারটি চরিত্র—যশোদা, নন্দরাজা, ধাত্রী এবং মহামায়াকে নিয়ে উপন্যাস ও ভাগবতের অপূর্ব মেলবন্ধনে রচিত হয়েছে এই নাটকটি। প্রাচীনকালের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত- প্রায় সমস্ত কালেই নারীদের অধিকার থেকে বঞ্চিত

করে রাখার একটি হীন মানসিকতা রয়েছে। সেই বৈষম্যমূলক আচরণে নিশ্চিন্দিপুরের কন্যা দুর্গার মৃত্যু হয়। নাটকে সেই মৃত দুর্গা ছায়াকল্প রূপে ফিরে আসে এবং মা সর্বজয়াকে প্রতিবাদী ভাষায় বলে—

“তাই বলেছিলে আমায়, কোথেকে একটা আপদ বালাই এসে জুটেছে – মর মর মরেও না।”^{২৯১}

মায়ের কাছে কন্যা হওয়ার জন্য যখন তাকে একথা শুনতে হয়, তখন তার মনে প্রশ্ন জাগে ভাই অপূর প্রতি মা এইরকম ব্যবহার করে না কেন? ছেলে হওয়ার সুবাদে অপূ মায়ের কাছে যে ভালোবাসা পায়, মেয়ে হওয়ার জন্য দুর্গা তা বিন্দুমাত্র পায়না। কেন এই বৈষম্য? সমাজের এই ভেদ-বিচারের জন্য তার মনে কষ্ট হয়। একসময় ঝড়বৃষ্টির রাতে অভিমানভরে মৃত্যুর কোলে দুর্গা আশ্রয় নেয়। আমাদের সমাজে এ রকম দুর্গা অনেক আছে, যারা নারী হয়ে জন্মানোর জন্য পরিবারের কাছে অবাস্থিতের মতো। ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের দুর্গার কাহিনির সঙ্গে মিলে যায় ভাগবতের মহামায়ারূপী দুর্গার জন্মকথাও। নন্দরাজা যশোদার কাছে পুত্র সন্তান চাইলেও তাঁর ঘরে কন্যা দুর্গা জন্ম নেন। এই কন্যা সন্তানকে বসুদেবের হাতে তুলে দিতে নন্দরাজা বিন্দুমাত্র দ্বিধান্বিত হননি। কংস সেই কন্যাকে আছড়ে মারেন পাথরের গায়ে, খেঁতলে যায় তার কচি শরীরটা। এখানেও সেই একইভাবে নারী হওয়ার জন্য মহামায়ারূপী দুর্গাকে অকালে মারা যেতে হয়। সেই কারণেই কন্যা-দুর্গা আমাদের সমাজকে প্রতিবাদের ভাষায় বলে উঠে- ‘দুর্গা বিসর্জন’— ‘দুর্গা বিসর্জন’। নাটকের প্রতিটি চরিত্র এই জীবন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। চরিত্রগুলির সংলাপে ধরা পরেছে একালের ভাষা। নাট্যকার অসাধারণ দক্ষতায় আধুনিক উপন্যাসের কাহিনির সঙ্গে ভাগবতের কাহিনির মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। শুধু একালে নয়, সেকালেও কন্যাসন্তান সমাজে কাম্য ছিল না, এই নাটকে সেকথাই নাট্য সংরূপে পুনর্নির্মিত ও বিনির্মিত হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা সহজে অনুমান করা যায় যে তুর্কী আক্রমণের পর সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই যেমন অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও তার চর্চা শুরু হয়েছিল, ঠিক তেমনি সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং লোকশিক্ষা দিতেই ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে এই অনুবাদ সাহিত্যের প্রধান তিনটি অনুবাদ গ্রন্থ রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের কাহিনি, উল্লেখযোগ্য চরিত্র এবং জনপ্রিয় ঘটনার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অনুষ্ণ নিয়ে একাধিক নাটক লেখা হয়েছে। বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ে আমরা যথাসম্ভব বাস্তবতায় এবং দৃষ্টান্তসহযোগে সেই নাট্য পুনর্নির্মাণের রূপরেখাটি উদ্ধার করার চেষ্টা

করেছি। আমাদের আলোচনার বাইরেও হয়তো কয়েকটি নাট্য পুনর্নির্মাণ থেকে যেতে পারে। তবে এই অধ্যায়ে আমরা অনুবাদসাহিত্য নিয়ে রচিত নাট্য পুনর্নির্মাণের রূপরেখাটিকে স্পষ্ট করার অভিপ্রায়ে একাধিক নাটকের বিশ্লেষণ করেছি। আমরা যথাযথভাবে রূপচিত্র বাস্তবায়িত করার জন্য নাটকগুলির প্রচ্ছদপত্র নামপত্র, চরিত্রলিপি, সংলাপ ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি গবেষণা অভিসন্দর্ভের পরিশিষ্টে। শিরোনামের অংশে সেগুলির চিত্র যথাসম্ভব উদ্ধার করে আমাদের গবেষণাকর্মের এবং অনুসন্ধানের সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণধর্মী মতামতগুলিকে আমরা নাটকের উদাহরণসহ এই অধ্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি। দেখিয়েছি রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের কাহিনি, চরিত্র, ভাষা, জীবন-দর্শন, সমাজ-পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত কেমন করে পুরাতন কাহিনি একালের সমাজজীবনের সঙ্গে মিলেমিশে আধুনিক হয়েছে, পুরাতন চরিত্র ও ভাষা একালের হয়েছে।

প্রসঙ্গনির্দেশ ও মন্তব্য : —

- ১। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, সীতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯২৪, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৪৮, পৃষ্ঠা- ৫১৬।
- ২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৪৯, পৃষ্ঠা- ৫১৭।
- ৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩।
- ৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫।
- ৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৭।
- ৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৯।
- ৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫২।
- ৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭১।
- ৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১০২।
- ১০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১১৬।

- ১১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১১৮-১১৯।
- ১২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১২৬।
- ১৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১০৬-১০৭।
- ১৪। মনোজ মিত্র, পুঁটি রামায়ণ, কলাভূৎ পাবলিশার্স, ২০১৫, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৫০, পৃষ্ঠা- ৫১৮।
- ১৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৫১, পৃষ্ঠা- ৫১৯।
- ১৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৫।
- ১৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৮।
- ১৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৮।
- ১৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৮।
- ২০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৯।
- ২১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৯।
- ২২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬০।
- ২৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬৩।
- ২৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬৭।
- ২৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১০২।
- ২৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৬।
- ২৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৯।
- ২৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৮১-৮২।
- ২৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৯১।
- ৩০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১০১।
- ৩১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১০৪-১০৭।
- ৩২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১০৮।

- ৩৩। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা -১০৯।
- ৩৪। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা -৮৩-৮৪।
- ৩৫। মনোজ মিত্র, ভেলায় ভাসে সীতা, কলাভূৎ পাবলিশার্স, ২০১৬, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দৃষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৫২, পৃষ্ঠা- ৫২০।
- ৩৬। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দৃষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ৫৩, পৃষ্ঠা- ৫২১।
- ৩৭। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৪৩।
- ৩৮। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৪৩।
- ৩৯। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৪৩।
- ৪০। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৪৭।
- ৪১। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৪৮।
- ৪২। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৫২।
- ৪৩। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৫৩।
- ৪৪। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৫৩।
- ৪৫। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৬৩।
- ৪৬। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৭৬।
- ৪৭। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৮১।
- ৪৮। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৮২।
- ৪৯। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৮৩।
- ৫০। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৮৩।
- ৫১। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৮৩।
- ৫২। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৬২।
- ৫৩। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ১৭৩।
- ৫৪। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৪৪।

- ৫৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৪২।
- ৫৬। সুকুমার রায়, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, কলাভূৎ পাবলিশার্স, ২০০৯, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ৫৪, পৃষ্ঠা- ৫২২।
- ৫৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ৫৫, পৃষ্ঠা- ৫২৩।
- ৫৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪২।
- ৫৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৫।
- ৬০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৯।
- ৬১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৯।
- ৬২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫১।
- ৬৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৮।
- ৬৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬০।
- ৬৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪২।
- ৬৬। মানিক মণ্ডল, রাম-রাবণের যুদ্ধ, কলাভূৎ পাবলিশার্স, নবগ্রন্থ কুটির, ২০১২, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ৫৬, পৃষ্ঠা- ৫২৪।
- ৬৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৫৭, পৃষ্ঠা-৫২৫।
- ৬৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৪৪।
- ৬৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১২৮।
- ৭০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৩৪।
- ৭১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৩৪।
- ৭২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৩৫।
- ৭৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৪২।
- ৭৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৪৩।

- ৭৫। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৪৩।
- ৭৬। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৪৪।
- ৭৭। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৩৫।
- ৭৮। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৪২।
- ৭৯। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৩৯।
- ৮০। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শর্মিষ্ঠা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৪১, প্রচ্ছদপত্রের
বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দৃষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৫৮, পৃষ্ঠা- ৫২৬।
- ৮১। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, ভূমিকা, আখ্যান-পত্রের অংশ (প্রথম সংস্করণ), পৃষ্ঠা -
৮৪।
- ৮২। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা -মঙ্গলাচরণ অংশ।
- ৮৩। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা -প্রস্তাবনা পত্র।
- ৮৪। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২।
- ৮৫। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা -২।
- ৮৬। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩।
- ৮৭। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬।
- ৮৮। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা -৯।
- ৮৯। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা -৯।
- ৯০। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩৩।
- ৯১। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা -৪৪।
- ৯২। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৩।
- ৯৩। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৪।
- ৯৪। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭।
- ৯৫। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৪।
- ৯৬। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫০।

- ৯৭। দ্রষ্টব্যঃ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৪৩, পৃষ্ঠা - ১১২।
- ৯৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৭।
- ৯৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫০।
- ১০০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৮।
- ১০১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্রাঙ্গদা, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, ১৮৯২, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ৫৯, পৃষ্ঠা- ৫২৭।
- ১০২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৬০, পৃষ্ঠা- ৫২৮।
- ১০৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - উৎসর্গ পত্র।
- ১০৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৩৯।
- ১০৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৪৪।
- ১০৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৪৪।
- ১০৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৫২।
- ১০৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৪৩।
- ১০৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৪৫।
- ১১০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৭১।
- ১১১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৬৬।
- ১১২। বুদ্ধদেব বসু, তপস্বী ও তরঙ্গিনী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৬, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ৬১, পৃষ্ঠা- ৫২৯।
- ১১৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ৬২, পৃষ্ঠা- ৫৩০।
- ১১৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - নাট্য অঙ্কের সময় কাল নির্ধারণ অংশ।
- ১১৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - নাট্যপ্রস্তাবনা অংশ।

- ১১৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৬।
- ১১৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৩।
- ১১৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৪।
- ১১৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৮।
- ১২০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৮।
- ১২১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩১।
- ১২২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩৮।
- ১২৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৩।
- ১২৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৫।
- ১২৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৭।
- ১২৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৪।
- ১২৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৪।
- ১২৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩৫।
- ১২৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৫।
- ১৩০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩৪।
- ১৩১। অনুপ চক্রবর্তী, দ্রৌপদী ডট কম, থিয়েটার প্রয়াগ, ১৮৯৭, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৬৩, পৃষ্ঠা- ৫৩১।
- ১৩২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৬৪, পৃষ্ঠা- ৫৩২।
- ১৩৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬৭।
- ১৩৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬৮।
- ১৩৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬৮।
- ১৩৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭২।
- ১৩৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৪।

- ১৩৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৬।
- ১৩৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৭।
- ১৪০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৭।
- ১৪১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৮।
- ১৪২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৮৬।
- ১৪৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৮৬।
- ১৪৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৮৯।
- ১৪৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৮৯।
- ১৪৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৯।
- ১৪৭। মনোজ মিত্র, যা নেই ভারতে, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০০৫,
প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৬৫,
পৃষ্ঠা-৫৩৩।
- ১৪৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ
পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৬৬, পৃষ্ঠা- ৫৩৪।
- ১৪৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৯।
- ১৫০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১১।
- ১৫১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৪।
- ১৫২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩০।
- ১৫৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩২।
- ১৫৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩৪।
- ১৫৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩৯।
- ১৫৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৬।
- ১৫৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৮।
- ১৫৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৮।
- ১৫৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৯।
- ১৬০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩১।

- ১৬১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩১।
- ১৬২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪০।
- ১৬৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫১।
- ১৬৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫১।
- ১৬৫। সৌমিত্র বসু, একলব্য, নব গ্রন্থ কুটির, ২০০৯, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৬৭, পৃষ্ঠা- ৫৩৫।
- ১৬৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৬৮, পৃষ্ঠা- ৫৩৬।
- ১৬৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - উৎসর্গ পত্র।
- ১৬৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - প্রস্তাবনা অংশ।
- ১৬৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬৬।
- ১৭০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬৭।
- ১৭১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬৮।
- ১৭২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭১।
- ১৭৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৩।
- ১৭৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৩।
- ১৭৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৫।
- ১৭৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৭-৭৮।
- ১৭৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৮।
- ১৭৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬৮।
- ১৭৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৮।
- ১৮০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৬।
- ১৮১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬৮।
- ১৮২। অক্ষুর মজুমদার, উলটপুরাণ, নাট্যসৃজনী, ২০০৯, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৬৯, পৃষ্ঠা- ৫৩৭।

- ১৮৩। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দৃষ্টব্যঃ
পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৭০, পৃষ্ঠা- ৫৩৮।
- ১৮৪। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, চরিত্রলিপির বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দৃষ্টব্যঃ
পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৭১, পৃষ্ঠা- ৫৩৯।
- ১৮৫। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১১০।
- ১৮৬। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১১০-১১১।
- ১৮৭। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১১৩।
- ১৮৮। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১১৩।
- ১৮৯। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১১৪।
- ১৯০। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১১৭।
- ১৯১। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১২০।
- ১৯২। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১২১।
- ১৯৩। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১২৫।
- ১৯৪। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১২৭।
- ১৯৫। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১২৭।
- ১৯৬। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১২৯।
- ১৯৭। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৩১।
- ১৯৮। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৩১।
- ১৯৯। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৩২।
- ২০০। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৪১।
- ২০১। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৪৪।
- ২০২। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৪৯।
- ২০৩। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৫১।
- ২০৪। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৬০।
- ২০৫। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১২২।
- ২০৬। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৫৫।

- ২০৭। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, আর এক দ্রোণাচার্য, নব গ্রন্থ কুটির, ২০১০ প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ৭২, পৃষ্ঠা- ৫৪০।
- ২০৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ৭৩, পৃষ্ঠা- ৫৪১।
- ২০৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৭।
- ২১০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২১।
- ২১১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২২।
- ২১২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৫।
- ২১৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৭।
- ২১৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৮।
- ২১৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৯।
- ২১৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩২।
- ২১৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩২।
- ২১৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২১।
- ২১৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩১।
- ২২০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩০।
- ২২১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৯।
- ২২২। মহুয়া চৌধুরী, পঞ্চকন্যার কথা, রত্না প্রকাশন, ২০১৯, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৭৪, পৃষ্ঠা- ৫৪২।
- ২২৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৭৫, পৃষ্ঠা- ৫৪৩।
- ২২৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, উৎসর্গ পত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৭৬, পৃষ্ঠা- ৫৪৪।
- ২২৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩৮।
- ২২৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩৯।
- ২২৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩৯।

- ২২৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪০।
- ২২৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪০।
- ২৩০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪১।
- ২৩১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৪।
- ২৩২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪২।
- ২৩৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৩।
- ২৩৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৩-৪৪।
- ২৩৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৪।
- ২৩৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩৯।
- ২৩৭। রতন কুমার ঘোষ, শিখণ্ডী, রত্না প্রকাশন, ২০১৯, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত
বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৭৭, পৃষ্ঠা- ৫৪৫।
- ২৩৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ
পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৭৮, পৃষ্ঠা- ৫৪৬।
- ২৩৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২।
- ২৪০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২।
- ২৪১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩।
- ২৪২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩।
- ২৪৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫।
- ২৪৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৮।
- ২৪৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৯।
- ২৪৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১০।
- ২৪৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১০।
- ২৪৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১০।
- ২৪৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫।
- ২৫০। মনুথ রায়, কারাগার, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ১৯৩০, নামপত্রের বিস্তারিত
বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ৭৯, পৃষ্ঠা- ৫৪৭।

- ২৫১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৮০, পৃষ্ঠা-৫৪৮।
- ২৫২। দ্রষ্টব্যঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯৩১ সাল।
- ২৫৩। জয়ন্তী ঘোষ, মন্থন রায়- জীবন ও সৃজন, পুস্তক বিপণী, ২০০০, পৃষ্ঠা - ৫৩।
- ২৫৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫২৯।
- ২৫৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৩০।
- ২৫৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৩১।
- ২৫৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৩৬।
- ২৫৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৩৬।
- ২৫৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৩৭।
- ২৬০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৪২।
- ২৬১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৪৫।
- ২৬২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৫০।
- ২৬৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৫০।
- ২৬৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৬১।
- ২৬৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৬৪।
- ২৬৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৬৫।
- ২৬৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৬৬।
- ২৬৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৬৬।
- ২৬৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৩৩।
- ২৭০। মহুয়া চৌধুরী, আত্মজ, রত্না প্রকাশন, ২০১৯, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৭৪ , পৃষ্ঠা-৫৪৩।
- ২৭১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, উৎসর্গপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৭৫, পৃষ্ঠা- ৫৪৪।
- ২৭২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৬।
- ২৭৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৬।

- ২৭৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৭।
- ২৭৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৯।
- ২৭৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৯।
- ২৭৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৯।
- ২৭৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫০।
- ২৭৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৯।
- ২৮০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৮-৪৯।
- ২৮১। মহুয়া চৌধুরী, দুর্গার পাঁচালী, রত্না প্রকাশন, ২০১৯ প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত
বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ৭৪, পৃষ্ঠা- ৫৪২।
- ২৮২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ
পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৭৫, পৃষ্ঠা- ৫৪৩।
- ২৮৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, উৎসর্গ পত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ
পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৭৫, পৃষ্ঠা-৫৪৪।
- ২৮৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৫।
- ২৮৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬৫।
- ২৮৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৬।
- ২৮৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬৬।
- ২৮৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬৭।
- ২৮৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬৮।
- ২৯০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬৮।
- ২৯১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬৬।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চৈতন্য জীবনীসাহিত্য অবলম্বনে রচিত নাটক: অনুসন্ধান ও তার বিশ্লেষণ

চৈতন্য মহাপ্রভুর (১৪৮৬-১৫৩৩) আবির্ভাব কেবল ধর্ম ও সাধারণ মানুষকে নয়, বাংলার সমাজ এবং সাহিত্যেকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। গোষ্ঠীগতভাবে প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষ সংযোগে প্রায় জাতীয় ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁরই প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্মের একদিকে যেমন তত্ত্ব ও তাৎপর্যের প্রতিষ্ঠা হয়, অন্যদিকে স্বয়ং বিষ্ণু আমাদের প্রাণনাথ হয়ে ওঠেন। এহেন সুদর্শন পণ্ডিত বাংলার সমাজ ও জনমানসে প্রভাব বিস্তার করবেন না, এমন হতে পারে না। তাঁর প্রভাবে তৎকালীন সমাজে উচ্চ-নীচের ভেদ ঘুচে গিয়েছিল। তাঁর “চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ” যেন বেদ মন্ত্রের মতো আজও উচ্চারিত হয়। তাঁর -

“ভৃগাদপি সুমীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদাহরিঃ।।”

উক্ত চরণ দুটি কেবল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জপমন্ত্র নয়, এ যেন সমাজ বিবর্তন ও মনুষ্য চরিত্র গঠনের মূল মন্ত্র হয়ে উঠেছে। তাঁর জীবদ্দশাতেই মহাপ্রভুর পুত্র চরিত্রের প্রভাবে সমাজ ও সাহিত্য পরিবর্তিত হতে থাকে। তাঁর তিরোধানের (আনুমানিক ১৫৩৩) পরেও তা সুদৃঢ় আকারে সমাজে বজায় ছিল। এর বড়ো প্রমাণ খেতুরীর মহোৎসব। মহাপ্রভুর তিরোধানের বেশ কয়েক বছর পর বৈষ্ণব ধর্মের হোতারা তাঁদের ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মত ও পথ ঠিক করার জন্য অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার খেতুরীতে এক মহাধর্ম-সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মহাপ্রভুর পুত্র চরিত্রের প্রভাব সমাজ ও সাহিত্যে বজায় রাখার জন্য মহাপ্রভুকেন্দ্রিক সাহিত্য রচনা করবেন। এই সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ এবং গৌরচন্দ্রিকা, চৈতন্যজীবনী সাহিত্যের জন্ম ঘটে। মহাপ্রভুর জীবদ্দশাতেই তাঁর জীবন নিয়ে সাহিত্যে লেখা হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে একে একে উঠে আসে চৈতন্য জীবনীসাহিত্য, চৈতন্য জীবনকেন্দ্রিক নাটক, মহাপ্রভুর জীবনকেন্দ্রিক কথাসাহিত্য। আমাদের বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ে আমরা মহাপ্রভুর জীবনকেন্দ্রিক তেমনই কতোগুলি বাংলা নাটকের আলোচনা করে দেখবো যে কেবল বৈষ্ণব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য নয়, ‘লোকশিক্ষে’ দিতেও মহাপ্রভুর জীবনকেন্দ্রিক বাংলা নাটক লেখা হয়েছে। কাজটি ঊনবিংশ ও বিংশ শতক থেকেই হয়ে আসছে। এই অধ্যায়ে আমরা মহাপ্রভুর জীবন নিয়ে রচিত সেই সব

বাংলা নাটকের আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আমরা আগেই স্বীকার করেছি, বাংলা ভাষায় প্রথম জীবনীসাহিত্যের জন্ম চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে। পরবর্তীকালে নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য প্রমুখের চরিত্র নিয়েও জীবনীকাব্য লেখা হয়েছে। তবে চৈতন্য মহাপ্রভুর পুত্র চরিত্র যাতে বৈষ্ণবদের শিক্ষণীয় বিষয় হয়, তাঁর পুণ্য জীবনের অনুসরণ যাতে তাঁদের নিত্য দিনের কর্ম হয়, সেজন্য জীবনী রচয়িতারা চৈতন্যের জীবনকাহিনী রচনায় বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন। কবি বৃন্দাবন দাস রচনা করেছিলেন ‘চৈতন্যভাগবত’, জয়ানন্দ লিখেছেন ‘চৈতন্যমঙ্গল’, লোচন দাস লিখেছেন ‘চৈতন্যমঙ্গল’, কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচনা করেছিলেন ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ প্রভৃতি গ্রন্থ। প্রতিটি গ্রন্থে মহাপ্রভুর জীবনকথা, তাঁর ধর্ম প্রচার, দিব্যোন্মাদ অবস্থা সুচারু রূপে প্রকাশিত হয়েছে। আর তাঁর জীবন ও জীবনের নানান স্মরণীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে একালেও নাট্য পুনর্নির্মাণ হয়েছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, হরচন্দ্র রায়, দিলীপকুমার রায়, শিবংকর চক্রবর্তী, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ চক্রবর্তী, সৌমেন পাল, আরণ্যক বসু প্রমুখ নাট্যকার চৈতন্য জীবনের নানা দিক অনুসরণ করে লিখেছেন ‘চৈতন্যলীলা’ (১৮৮৬), ‘নিমাই সন্ন্যাস’ (১৮৯২), ‘নদীয়া যুগল’ (১৯৩৪) ‘শ্রীচৈতন্য’ (১৯৫২), ‘নবজাগরণ’ (২০১৫), ‘নীলাচলে’ (২০১৫), ‘শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত’ (২০১৫), ‘মার্ক্স, চৈতন্য ও সুজাত’ (২০১৫), ‘দখলনামা’ (২০১৫), ‘চৈতন্য হোক’ (২০১৫) প্রভৃতি নাটক। এই সব নাটক রচনায় নাট্যকারদের প্রধান অবলম্বন ছিল ‘চৈতন্য জীবনীসাহিত্য’। আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা সেই চৈতন্য জীবনীসাহিত্য অবলম্বনে রচিত এই জাতীয় নাট্য পুনর্নির্মাণের আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ— ‘চৈতন্য-লীলা’ (১৮৮৬);

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে গিরিশচন্দ্র ঘোষ চৈতন্যজীবনী অবলম্বন করে লিখেছিলেন ‘চৈতন্যলীলা’ নামক একটি ভক্তিমূলক নাটক। ২২ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১৫ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটিতে প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (১), নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ (১), মূল নাটক (৩৬) সহ মোট ৩৯টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকটি ‘গিরিশ রচনাবলী’র দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নাটকের নামপত্রটি এইরূপ-

“চৈতন্য-লীলা/ ভক্তিমূলক নাটক/ (১৯ শে শ্রাবণ, ১২৯৯ সাল, স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)/ নাটকে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ/ পুরুষ চরিত্র/ জগন্নাথ মিশ্র, নিমাই, নিত্যানন্দ, গঙ্গাদাস, অদ্বৈত, শ্রীবাস, মুকুন্দ,

হরিদাস, জগাই, মাধাই, ষড়রিপু, কলি, বিবেক, বৈরাগ্য পণ্ডিত, মুনি, ঋষি, বিদ্যাধরগণ, দেবগণ, অতিথি, বালকগণ, ব্রাহ্মণগণ, গণক, সন্ন্যাসী, ভট্টাচার্য্যদ্বয়, প্রতিবেসীদ্বয়, বৈষ্ণবগণ ইত্যাদি।/ স্ত্রী চরিত্র/ শচীদেবী, লক্ষ্মীদেবী, বিষ্ণুপ্রিয়া, পাপ, ভক্তি, মালিনী ইত্যাদি।”^২

সাহিত্য সংসদ কর্তৃক ৩২ এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯ থেকে নাটকটি প্রকাশিত।

সমগ্র নাটকটিতে জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র চৈতন্যের অবতারের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে সেকালের সমাজভাবনার কথা, জগাই-মাধাইয়ের মতো পাষাণদ্বয়ের ধর্মীয়ভাবে পরিবর্তন হওয়ার কথা এবং চৈতন্যের মানবপ্রেম প্রচারের কথা। নাটকের শুরুতে পাপ ও ষড়রিপু কথোপকথনে এসেছে নদীয়ার ভক্তিভাব জাগরণের প্রসঙ্গ। কলির সঙ্গে পাপের কথোপকথনে সেই রকম একটি চমৎকার নাট্যমুহূর্ত তৈরি করা হয়েছে-

“কলি- বচন না যুয়ায় আমার,
চৈতন্য হলেন অবতার
মজিল মজিল অধিকার গেল তব!
পাপ- কেন, কি করিবে চৈতন্য আমার?
কলি- জনমে যাহার
হরিধ্বনি রটিল সংসারে,
ভেবে দেখ কি হবে তখন,
যবে প্রভু
সন্ন্যাসীর বেশে, ভ্রমি দেশে দেশে,
হরিনাম দিবেন সবারে।”^৩

নবদ্বীপের সাধারণ মানুষ যখন নানা পাপকর্মে লিপ্ত, তখন সেখানে ধর্ম বা বিবেকের কোনো জায়গা ছিল না। গোরার আবির্ভাবে সেই অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। ভক্তি বলেছেন-

“এল আনন্দের দিন,
চিন্তা কর দূর,
গোলকবিহারী হরি।
ধরায় উদয়।

হেরি জীবের দুর্গতি,
আপনি শ্রীপতি, নবভাবে অবতার;
একাধারে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা,
দ্রব হবে শিলা,
হরিনাম শুনি তাঁর মুখে।
রসের তুফান বহিবে উজান
বাহ্য-রাধা অন্তঃ-কৃষ্ণ অপূর্ব এ ভাব;
হেন ভাব হয় নাই কোন যুগে।”^৪

কাহিনিতে আছে নিমাইয়ের দুরন্তপনার কথা। তিনি অন্যান্য সঙ্গীদের নিয়ে গঙ্গাতীরে নৈবেদ্য কেড়ে খান। এমনকি নিজের বাড়িতে নিমাই অতিথি আপ্যায়নের সময় অতিথির ভাত উচ্ছিষ্ট করলেন, অতিথি প্রথমে বিরক্ত হন, কিন্তু পরে বুঝতে পারেন নিমাই তাঁর আরাধ্যদেবতা রূপ। তখন অতিথি বলেছেন —

“প্রভু! অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনি নারায়ণ বালকরূপে, আমি বুঝিতে পারি নি।”^৫

অতিথি পিতা জগন্নাথ মিশ্রকে বলেছেন —

“আমি পরিতুষ্ট হয়েছি। মিশ্র। তুমি বড় ভাগ্যবান, তোমার পুত্ররূপে ভগবান বিহার কচ্ছেন! আমি মহাপ্রসাদ ধারণ করেছি, আর আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই। তোমার পুত্রের চরণকূপায় জগৎ পবিত্র হবে, তোমার অতিথি সৎকারে চরিতার্থ হলেম। এখন এই দক্ষিণা দাও, তোমরা স্ত্রী-পুরুষে দাঁড়াও, আমি প্রণাম করে যাই।”^৬

কাহিনিতে আছে যবন হরিদাসের প্রসঙ্গ। যবন-হরিদাস কাজির শত অত্যাচার সহ্য করেন, তবু কৃষ্ণনাম ছাড়েন না। তখন নবদ্বীপের সমাজে হিন্দু প্রজা ও বৈষ্ণব ধর্মের ওপর মুসলমান রাজশক্তির অত্যাচার ছিল চরম। জাতধর্মের প্রাধান্য এবং উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ছিল কঠোরভাবে। জাত যাবার ভয়ে কোনো বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ নীচুজাতের মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা করতে রাজি হতেন না। কিন্তু নিমাই সকল বাধা-বন্ধনের উর্ধ্বে উঠে উঁচু-নীচু জাতের মহামিলন রচনা করেছেন। শচীমাতাকে নিমাই নিজের অবতার সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বলেছেন —

“শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী,

ভ্রান্ত জীব নেহার মুরারি,
হের, করজোড়ে ব্রহ্মা আদি করে স্তব।
যুগে যুগে হই অবতার,
দানবসংহার হেতু।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় আমাতেই হয়,
পূর্ণ আমি সর্ব্বঘটে বিদ্যমান।”^৭

নাটকের পরবর্তী কাহিনিতে নিমাই সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে গয়াতে চলে যান। নাটকটির অধিকাংশ জায়গা জুড়ে মহাপ্রভুর আধ্যাত্মিক ভাব-বিভোর রূপের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। সেইরকম একটি নাট্য প্রসঙ্গ এইরূপ -

“কৃষ্ণ সার,
কৃষ্ণ বিনা কিছু নাহি চাহি আর
কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ, বল গো আমায়;
জ্বলে মরি আর তাঁর বিরহ সহিতে নারি।
হায়, কোথা তুমি হরি,
লুকাইলে মন-প্রাণ হরি
প্রাণ যায়— দেখা দাও!”^৮

‘চৈতন্য-লীলা’ নাটকটির একটি আকর্ষণীয় বিষয় জগাই-মাধাইয়ের মতো পাষণ্ডের হৃদয়ে হরিনাম সংকীর্তনের জাগরণ এবং আত্ম-চৈতন্যের উদয়। জগাই প্রভু নিমাইকে অনুরোধ করে বলেছেন—

“হরি! যেমন তোমার নামের গুণ
-আমরা তেমনি পাপী; পতিতপাবন!
আমাদের তুল্য আর পতীত নাই।
প্রভু! যদি দয়া করে দিলে নাম,
দেহ শ্রীচরণে স্থান,
আজ্ঞা কর দাস হয়ে করি সেবা।
আর গৃহে নাহি যাব,
পদাশ্রয়ে সদা রব।”^৯

নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণের মধ্য দিয়ে নাট্য কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। শচীমাতা, দাদা নিতাই এবং সমস্ত হরিভক্তগণের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে নিমাই গৃহজীবন ত্যাগ করেন। যাবার আগে সকলের উদ্দেশ্যে নিমাই বলেছেন-

“শুন শুন হরিভক্তগণ,
করেছি মনন,
হরিনাম বিলাইব দেশে দেশে
ভবে এসে ভাসে জীব অকূল পাথারে;
দিব সবে হরি— পদতরি
মানবের দুর্গতি দেখিতে নারি।
কর সবে হরিগুণগান
কাঁদাইও না আর।
কোল দাও প্রফুল্লবদনে সবে
কর আশীর্বাদ
আশা পূর্ণ হয় মোর।
এস এস হে নিতাই,
হরি বলে চলে যাই গৃহ ত্যজি।”

এইভাবে “চৈতন্য-লীলা” নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে নিমাই। তিনি জগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতার পুত্র। এখানে আমরা নিমাইয়ের শৈশবরূপের পরিচয় আমরা বড়ো করেই পাই। শিশু সুলভ দূরন্তপনার মধ্যে তৎকালীন সমাজের মানুষের ধর্মের নামে ভেদাভেদ যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি চৈতন্যের আধ্যাত্মিক ভাবগভীরতাও ধরা পরেছে। এই নিরিখেই চৈতন্যলীলা ভক্তিমূলক নাটক হয়ে উঠেছে। সমাজে যখন সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার দুর্বিষহ হয়ে উঠে, তখন জগতে এক-একজন মানুষ জন্ম নেন, যিনি সেই কলুষিত সমাজ সংশোধন করে আবার সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। নবদ্বীপের নিমাই যেন সেই দায়িত্বই নিয়েছিলেন। জগাই- মাধাইয়ের মতো মদ্যপ নাস্তিক মানুষের হৃদয় পরিবর্তন করে তিনি যেন সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। জগাই একসময় নিমাইয়ের কাছে প্রার্থনা করে বলেছেন-

“প্রভু! তোমার পাদপদ্ম আমি কখন ছাড়বো না, আমরা দু ভাই মহাপাতকী, আমাদের উপায় করতে হবে, আমরা অশেষ দোষের আকর, আমরা বৈষ্ণব-হিংস্রক, প্রভু! আমাদের পায়ে রাখা!”

বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ের একাকিত্বের যন্ত্রণা, শচীমাতার হাহাকার- সমস্ত কিছুই অতিক্রম করে গেছে নিমাইয়ের কৃষ্ণসাধনা। তাঁর কাছে অনিশ্চিত জীবনের সত্য বড়ো হয়ে ধরা দিয়েছে। সন্ন্যাস গ্রহণের আগে শচীমাতাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিমাই বলেছেন -

“কেঁদ না মা, মায়া করো দূর- জেনো মাতা কৃষ্ণ মাত্র সার, কেবা আর কার -
কতবার পুত্রহারা হয়েছ জননি! বার বার যতই কাঁদিবে, মোহে মাতা, ততই
মজিবে, ততই মা, বাড়িবে রোদন; কাঁদ ‘কৃষ্ণ’ বলে আর না কাঁদিতে হবে। ধন্য
তুমি জননী আমার, পুত্র তব হরিণাম বিলাইবে, ভবে কেবা কবে হেন
গৌরবিনী?”^{১২}

নিমাই বুঝতে পেরেছেন সমাজ-সংসারের গণ্ডিতে বৈষ্ণবধর্ম আবদ্ধ রাখলে কৃষ্ণের
অপার মহিমা সাধারণের মধ্যে প্রচার করা সম্ভব নয়। তাই নিমাই ব্যক্তিগত জীবনের
সমস্ত মায়া-মমতাকে স্বেচ্ছায় অতিক্রম করে এগিয়ে গেছেন বৃহত্তর জীবন প্রেক্ষাপটে।
নিমাই জানতেন ধর্মই পারবে অহিংসভাবে মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ দূর করে এক
ভালোবাসার জগৎ তৈরি করতে। চৈতন্যের কৃষ্ণপ্রেমের প্রচার সেই পথেরই একমাত্র
দিশা। নাটকে চৈতন্য চরিত্রের কর্তব্য পালনের বিষয়টি বড়ো করে দেখানো হয়েছে।
কলি ও পাপ চরিত্র দুটি কাল্পনিক হলেও সেকালের নবদ্বীপের সামাজিক অবস্থা প্রকাশ
করতে তাঁরা বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছেন। পাপ বলেছেন -

“যত্নবান কর্মাধ্যক্ষ তোমরা আমার, মম অধিকার করেছ প্রচার; বিবেক,
বৈরাগ্য, ভক্তি নাই পায় স্থান, কোথা প্রস্থান করেছে তারা; কৈ, দেখি
নাই বহুদিন কার্যাধ্যক্ষ প্রবীণ সকলে, দেহ পরিচয়, কেবা কি কৌশলে
রাজ্য মম করহ বর্দ্ধন, যথাযোগ্য পুরস্কার দিব জনে জনে। কর কাম,
গুণগ্রাম ব্যাখ্যা তব।”^{১৩}

নবদ্বীপে কুকর্মের জন্য পাপকে কাম, ক্রোধ নানা ভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁরা
এখানে স্বতন্ত্র চরিত্র রূপে কল্পিত। ধর্মের সঙ্গে তাঁদের সংঘাত তাই অনিবার্য হয়েছে।
শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া আমাদের সমাজে বাঙালি ঘরের মা ও পত্নীর ভূমিকায় একেবারে
সার্থক চরিত্র হয়ে উঠেছে। অন্যান্য চৈতন্য নাটকে জগন্নাথ মিশ্রের পরিচয় তেমন না
থাকলেও আলোচ্য নাটকে বালক নিমাইয়ের দুরন্তপনায় পিতার ভূমিকা একেবারে
যথাযত ভাবে দেখানো হয়েছে। ব্রাহ্মণ অতিথির অন্নব্যঞ্জন উচ্ছিষ্ট করলে জগন্নাথ মিশ্র
পত্নীকে বলেছেন -

“গৃহিণি! গৃহিণি! দেখ সর্বনাশ! নিমাই অতিথির অন্ন আবার উচ্ছিষ্ট করেছে।”^{১৪}

এখানে পিতা জগন্নাথ মিশ্রের রাগ প্রকাশ পেয়েছে বালক নিমাইয়ের দুরন্তপনার জন্য। নিয়মের গণ্ডিতে নিমাই থাকতে না চাওয়ায় পিতার মধ্যে ভয় সঞ্চার হয়েছে। অদ্বৈত, শ্রীবাস, মুকুন্দ, পণ্ডিত, বিদ্যাধরগণ, সন্ন্যাসী, বৈষ্ণবগণ নাটকের পরিবেশ সৃজনে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছেন। ষোড়শ শতকের চৈতন্য-সংস্কৃতিকে একালের পাঠক বা দর্শকের দরবারে জনপ্রিয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নাট্যকার। চৈতন্য পরিকরদের নামসহ তাঁদের ভূমিকাও পরিবেশিত হয়েছে। মহাপ্রভুর জীবনকেন্দ্রিক ঘটনাবলীর সঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও প্রসারকেন্দ্রিক সংস্কৃতির চমৎকার পরিচয় আছে নাট্যকাহিনীতে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ অসাধারণ দক্ষতায় মহাপ্রভুর জীবনকেন্দ্রিক নাটক ‘চৈতন্য-লীলা’ রচনা ও অভিনয় করে লোকশিক্ষা দিয়েছেন। নাটকটি আসলে পুনর্নির্মিত। ঘটনা, চরিত্র, সমাজ বাস্তবতা, বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার এবং চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক পরিচয় তিনি দিয়েছেন চমৎকারভাবে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ - নিমাই সন্ন্যাস (১৮৯২);

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে গিরিশচন্দ্র ঘোষ চৈতন্য জীবনভাবনাকে অবলম্বন করে রচনা করেন ‘নিমাই সন্ন্যাস’ নাটক। এই নাটকটি ‘চৈতন্যলীলা’র দ্বিতীয় ভাগ হলেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নাটক। ২১.৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১৪ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটি ‘গিরিশ রচনাবলী’র প্রথম খণ্ডে স্থান লাভ করেছে। নাটকটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬। নাটকটির প্রচ্ছদপত্র এইরূপ-

“গিরিশ রচনাবলী/ সমগ্র রচনাবলী/ পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ/
প্রথম খণ্ড/ সাহিত্য সংসদ/ কলিকাতা-৯।”^{১৫}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ-

“নিমাই সন্ন্যাস/ (চৈতন্যলীলা’র দ্বিতীয় ভাগ)/ (৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৫
খ্রিস্টাব্দে স্টার থিয়েটারে এই নাটকটি প্রথম অভিনীত)/পুরুষ-চরিত্র/
নিমাই (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য)। নিতাই (অবধূত)। প্রতাপরুদ্র (উড়িয়াধিপতি)।
রায় রামানন্দ (জমিদার)। কেশব ভারতী (নিমাইয়ের দীক্ষাগুরু)।
সার্বভৌম (সভাপণ্ডিত)। অদ্বৈত, হরিদাস, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, গোপীনাথ

(ভক্তগণ)। বক্শেশ্বর (নিমাইয়ের ভৃত্য)। নট, জামাই, ব্রাহ্মণ, ধোপা, সভাসদগণ, প্রতিবাসিগণ, বৈষ্ণবগণ, বালকগণ, শিষ্যগণ, দেবগণ, রথযাত্রিগণ ইত্যাদি।/ স্ত্রী-চরিত্র/ শচী (নিমাইয়ের মা)। বিষ্ণুপ্রিয়া (নিমাইয়েরপত্নী)। নটী, মালিনী, ধোপানী, দেবীগণ, প্রতিবাসিনীগণ ইত্যাদি।”^{১৬}

‘গিরিশ রচনাবলী’র (প্রথম খণ্ড) অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর এই নাটকটির সম্পাদনা করেন রবীন্দ্রনাথ রায় ও দেবীপদ ভট্টাচার্য। প্রকাশক দেবজ্যোতি দত্তের তত্ত্বাবধানে সাহিত্য সংসদ, ৩২৭ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা- ৯ থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত। গ্রন্থটির মূল্য ছিল তিনশত টাকা।

‘নিমাই সন্ন্যাস’ নাটকে নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা মুখ্যবিষয় হলেও মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ রূপের মাধ্যমে কৃষ্ণের স্বরূপ অন্বেষণের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নিমাইয়ের হরিনাম সংকীর্তনের প্রচার সাধারণের মধ্যে ধর্মীয়ভাবে গ্লাবন এবং জগৎ-সংসারকে এক নতুন আধ্যাত্মিক মহিমা দান করেছে। নাটকের প্রথম অঙ্কে পুরীর মহারাজ প্রতাপরুদ্র রায় চৈতন্যের করুণা প্রার্থনা করে রামানন্দকে বলেছেন—

“রায় রামানন্দ! তুমি প্রভুর কৃপার পাত্র—তুমি আমায় কৃপা কর, প্রভু বৃন্দাবনে গিয়েছেন, প্রভুর বিরহে প্রাণ অতিশয় কাতর হয়েছে, আমার জীবন শূন্যজ্ঞান হচ্ছে—তুমি কোন উপায় কর।”^{১৭}

রামানন্দ মহারাজকে ধৈর্য ধরতে পরামর্শ দিয়েছেন। একসময় চৈতন্যের সাক্ষাৎ তিনি পাবেন বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন। রাজা মনে-প্রাণে চৈতন্যের ভক্ত হলেও তাঁরই সভাসদেরা অনেকেই ভেতরে ভেতরে মহাপ্রভুর বিরোধী। রাজসভার দ্বিতীয় সভাসদ, প্রথম সভাসদকে চৈতন্যের কার্যকলাপের নিন্দা করে বলেছে—

“আর তুমিও যেমন! ব্যাটা অতি নচ্ছার, বাগানে বেশ্যা নিয়ে দিব্যারাত্রির পড়ে আছে, কারুর গা ধুইয়ে দিচ্ছে, কারুর চুল বেঁধে দিচ্ছে, ব্যাটা ভক্তির সাগর, রাজাটা খেপেছে, খেপেছে, এমন জগন্নাথ প্রভু থাকতে কি না গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ;-বাবা! দশ অবতারের ভিতর তো গৌরাঙ্গ পেলেম না!”^{১৮}

এই কথোপকথনে সেকালের কুচক্রী, সনাতনপন্থী মানুষের চরিত্রের বাস্তব পরিচয়টি প্রকাশিত হয়েছে; যাঁরা অন্যের কাজকর্মের নিন্দা করেন, কারো ভালো দেখতে পারেন

না। চৈতন্যের মধ্যে যে উঁচু-নীচু জাতের ভেদাভেদ করেন না, তার প্রমাণ মেলে নট-নটীদের কথাতে। নট চৈতন্যের অভিনয় প্রসঙ্গে নাটকে বলেছেন—

“প্রিয়ে! গৌরঙ্গের মহিমা অপার, অতি নীচ অতি প্রিয় তাঁর, নির্ভয়ে কর
লো নাম গান, ভগবান অধিষ্ঠান হবেন হৃদয়ে, জয় জয় গৌরঙ্গের জয়,
দীননাথ দীনের ঠাকুর।”^{২০}

সন্ন্যাস গ্রহণের আগে বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গ শেখবারের মতো দেখা করতে যান নিমাই। রাত্রি
বেলায় শয়নকক্ষে নিমাই তাঁর কাছে অপরাধ স্বীকার করে বলেন—“প্রিয়ে আমি তোমার
কাছে অপরাধী”। বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণের দেবতাকে ছাড়তে চান না। অনেকটা প্রতিবাদ,
অনেকটা আক্ষেপের সুরে নিমাইকে তিনি বলেন—“আমায় বঞ্চিত করবে? তুমি দয়াময়,
কেবল কি আমার প্রতি নির্দয় হবে?” নিমাই পত্নীর এ কথার উত্তর খুঁজে পাননা।
কেবল নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। নিজের কাজ সম্পর্কে বিষ্ণুপ্রিয়াকে
অবগত করার জন্য বলেন—

“প্রিয়ে! ঋণী আমি রহিলাম তব প্রেমে, কি করিব সতি! হরিবারে জীবের
দুর্গতি যেতে হল ত্যজিয়ে তোমায়! ভেব না ভেব না, হৃদি মাঝে কর হে
ভাবনা, দেহ যাবে—তিলমাত্র প্রাণ নহে তোমা ছাড়া, মম প্রেমে জীব
অধিকারী। আর প্রিয়ে রহিতে না পারি, জেনো মনে—অবিচ্ছেদ তুমি
আমি চিরদিন।”^{২১}

নাট্যকার মহাপ্রভুর পারিবারিক দায়িত্ববোধের দিকটিকে বড়ো করে এঁকেছেন। কৃষ্ণ
সম্পর্কে যিনি জগত-সংসারকে চেতনা দান করবেন, সেই মহাপ্রভু পত্নীকে উপেক্ষা
করবেন, এমনটা হতে পারে না। পত্নীকে নানারূপ সাস্থনা বাক্যে আশ্বস্ত করার চেষ্টা
করেন, এতে মহাপ্রভুর চরিত্রের বিচক্ষণতার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। এরপর সকলের
অজান্তে নিমাইয়ের গৃহত্যাগ পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচী মাতার হৃদয়কে ব্যথিত করেছে।
শচীমাতা ব্যাকুলভাবে বলেছেন—

“নিমাই! নিমাই! কোথা আছ বাপধন? তোমা বিনে কে আছে আমার?
মার্কণ্ডের পেয়েছি প্রমাই, মোর মৃত্যু নাই, বাম বিধি, অঞ্চলের নিধি
কোথা গেল?”^{২২}

অন্যদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীকে হারিয়ে তীব্র বেদনায় কাতর হয়ে বলেছেন—

“আর নাহি ভয় বিচ্ছেদে তোমার, তোমারে স’পেছি প্রভু মোরে, মিলনে
করেছি তোরে ভয়, গেছে সে সময়, রহিল রে স্মরণ কেবল। হা নাথ! হা
জীবন-আধার! তোমা হারা এখনও জীবন ধরি। (মূর্ছা) মালিনী। হায়!
কি হলো, হায়! কি হলো?”^{২৩}

বিষ্ণুপ্রিয়ার কাতরোক্তিতে, তাঁর আচার-আচরণে নারীর হৃদয়যন্ত্রণার পরিচয়টি বড়ো
হয়ে দেখা দিয়েছে। চৈতন্যদেব এসেছেন কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাস
গ্রহণের জন্য। কেশব ভারতী তাঁকে দীক্ষা দান করেন এবং নিমাইয়ের নামকরণ করেন
‘শ্রীচৈতন্য’। এরপরেই চৈতন্যের মধ্যে রাধাভাবের উদয় হয়। যেভাবে রাধা কৃষ্ণকে
পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন, ঠিক সেইভাবে চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহে কাতর
হয়েছেন। নিতাইকে অনুসরণ করে নিমাই ব্যাকুলভাবে বলেছেন—

“আমার কৃষ্ণ এনেছ? কৈ, একবার দেখাও, জান তো আমি কৃষ্ণ
অদর্শনে রইতে পারি না, কৃষ্ণ কোথায় আছেন, বল? আহা! তুমিও কৃষ্ণ
অদর্শনে কাঁদচো? এস, তোমার গলা ধরে কাঁদি, আমিও কৃষ্ণ বিনা
অধীর। কৈ, কৃষ্ণ কৈ? একবার কৃষ্ণকে দেখাও, তোমার কৃষ্ণ তোমারই
থাকবে, আমি নেব না, একবারমাত্র দেখবো, আমি না দেখে বাঁচি না,
কৃষ্ণ কি রাগ করেছেন? কেন রাগ করেছেন? যাও, তাঁরে আন, আমার
উপর রাগ করা তাঁর সাজে না; আমি আর মান করবো না। হা কৃষ্ণ! হা
কৃষ্ণ! কে আমায় কৃষ্ণ এনে দেবে? তুনি জান, আমার কৃষ্ণ কোথায়?
তোমার পায়ে ধরি, আর আমাকে দুঃখ দিও না, আমার কৃষ্ণকে না দেখে
বাঁচবো না।”^{২৪}

চৈতন্য এগিয়ে চলেছেন বৃন্দাবনের পথে, যেখানে তাঁর প্রাণের দেবতা কৃষ্ণের সান্নিধ্য
আছে। সেই বৃন্দাবনের পথ, পথের ধূলা, মাঠ, মানুষ সবই যেন তাঁর আরাধনার বস্তু;
যেখান থেকে তিনি কৃষ্ণের অনুভব প্রতি মুহূর্তের করতে পারবেন। কিন্তু নিতাই যখন
তাঁর গতিপথ পরিবর্তন করে জাহ্নবী দেখিয়ে যমুনা বলে ভুল বুঝিয়ে ফিরিয়ে এনেছেন
নবদ্বীপে, তখন নিমাই দুঃখ করে বলেছেন—

“ভাই রে নিতাই, এত ছিল মনে তোর। জাহ্নবী দেখায়ে যমুনা বলিয়ে
ভুলায়ে আনিলে! কেন রে—কেন রে ব্রজে যেতে দিলি না আমারে; ব্রজে

গেছে প্রাণ মন, শূন্য দেহ লয়ে কিবা তব ফল, বল! হয় হয় ব্রজে
যাওয়া হ'ল না আমার, কৃষ্ণ বলে লুটাব ধূলায় বড় সাধ ছিল মনে—কেন
তাহে সাধিলে হে বাদ? ত্যজ ব্রজপুরী রহিতে কি পারি আমার সে
ব্রজধাম; ব্রজে গেছে সকলি আমার, তুমি ছলে রাখিলে ভুলায়ে।”^{২৫}

এদিকে নবদ্বীপে এসেছেন চৈতন্য- একথা সমস্ত রাষ্ট্র হয়ে গেলে, নবদ্বীপের একজন
প্রতিবেশী আর একজনকে খারাপভাবে বলেছেন—

“ঐ দেখ বাবা! ধ্বজা দেখা দিয়েছে বীর বলাই ফিরেছে, এই সব ফেরে
এই। আমি তো বলেছি, ব্যাটারা ফের নদেয় এসে জ্বালাবে, বলি
বলাইচাঁদ, টান কিসের বুঝতে পারচো না? মালপোর টান—ক্ষীর, সর,
নবনী ডোরে ঝুটকি বাঁধা, যাবে কোথা?”^{২৬}

প্রতিটি সমাজে ভালো-মন্দ মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়; একালেও যেমন আছে,
সেকালেও তেমন ছিল। নবদ্বীপের প্রতিবেশীগণ এখানে সেই খারাপ মানুষের ভূমিকাই
পালন করেছেন। ‘নিমাই সন্ন্যাস’ নাটকে শচীমাতার ব্যাকুলতাকে বড়ো করে দেখানো
হয়েছে। নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তিনি শান্তিপুরের জনগণের কাছে তাঁর মনের
দুঃখের কথা বলেছেন। নিমাইয়ের জন্য তিনি কেঁদে-কেঁদে বলেছেন—

“বল বল নিতাই আমায়; কোথা আছে অঞ্চলের ধন? দেখ রে দেখ রে,
কেঁদে কেঁদে অন্ধ দু'নয়ন, আছে প্রাণ পথ পানে চেয়ে। আহা! বাছা না
জানি কি করে, কে রাখে আদরে, শূন্য ঘরে রহিতে না পারি আর, কিছু
তো রে বলি নাই তারে, অভিমান করে তবে কেন ছেড়ে গেল মোরে?
মার প্রাণ বল কিসে বাঁচে, চাঁদমুখ আর কি দেখিব তার?”^{২৭}

তখন নাটকটির মধ্যে সর্বকালের সন্তান হারানো মায়ের বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। মাকে
সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য নিমাই একসময় যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলেছেন—

“মা! আমি তোমার কুসন্তান, আজীবন দুঃখ দিয়েছি, তুমি আমায়
মার্জনা কর। আমি সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করেছি, কিন্তু তুমি যেখানে
থাকতে বলবে, আমি সেইখানেই থাকবো। কেবল দেশে যাওয়া,
গৃহিণীর দর্শন সন্ন্যাসীর নিষেধ, -আর তোমার সকল আজ্ঞা
পালন করব। অবুঝ সন্তান বলে মনকে প্রবোধ দাও, তুমি

কাঁদলে আমার সন্ধ্যাস-ব্রত বিফল হবে; আমি কৃষ্ণ পাব না,
আমার কলঙ্ক রটবে; প্রসন্নময়ী জননি! আমায় প্রসন্না হও।”^{২৮}

নিমাইয়ের এ সব কথা শুনে শচীমাতা শত কষ্টের পরেও নিমাইয়ের পথের বাধা হতে পারেননি। নিজের বুকে পাষণ চাপা দিয়ে, নিমাইকে তার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে বলেছেন। পরবর্তী সময় বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখের কথা একজন সাধারণ নারী মহাপ্রভুকে জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন-

“প্রভু! তুমি অন্তর্যামী, সকলি জান; বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী আমায় পাঠিয়েছেন, তিনি আমায় বলতে বলেছেন যে, এ সংসারে তিনিই কি অপরাধিনী? জীবের দুঃখভার মোচন করতে যে আপনি গোলোক ত্যজে এসেছেন, তিনি কি জীব নন? তিনিই একমাত্র অভাগিনী, কেবল তাঁরে দুঃখ দেওয়াই কি আপনার সংকল্প? দয়াময়! তাঁর প্রতি এত নির্দয় কেন?”^{২৯}

মহাপ্রভু এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দেননি। সার্বভৌম পণ্ডিত যখন চৈতন্যকে নিজের গৃহে মহাশাস্ত্র উপনিষদের জ্ঞান দান করেন, তখন চৈতন্য তাঁকে জানান তিনি মূর্খ, এই সকল গুরুগম্ভীর তত্ত্বজ্ঞান তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করবে না। কারণ তাঁর অন্তর- বাহিরে একটি সত্তা বিরাজমান। সেটি হল কৃষ্ণসত্তা। কৃষ্ণের আরাধনা, কৃষ্ণের অন্বেষণ তাঁর মূল সংকল্প। এক সময় সার্বভৌম পণ্ডিত চৈতন্যের মধ্যে ষড়ভূজমূর্তি রূপ দর্শন করেন। তা দেখে তিনি আপন মনে হাতজোড় করে বলতে থাকেন—

“এ কি সত্য না স্বপ্ন! আমি কোথায়? গোলোকে না ধরায়? এই যে দেবতা আমার সম্মুখে, ধনুর্বাণ, মোহন মুরলী, দণ্ড, কমন্ডলু, সাক্ষাৎ ভগবান্ গোলোকপতি। প্রভু! ধন্য ধন্য মহিমা তোমার, লৌহপিণ্ড গলিল কৃপায়, প্রভু! প্রাণ মম কুতর্কে জড়িত, জ্ঞানগব্ব নরকে পতিত, হায় প্রভু! কি হ’তো আমার অপার করুণা বিনা? প্রেমভক্তি করিতে প্রচার অকপটে তব অবতার; শক্তি দেহ, করি স্তব স্তুতি, প্রেমহীন কঠিন হৃদয় কি দিব তোমায়, প্রেমময়, দেহ প্রেম মোরে।”^{৩০}

একসময় রাজা প্রতাপরুদ্র থেকে সাধারণ দরিদ্র মানুষ প্রত্যেকেই চৈতন্যের অপার লীলায় প্লাবিত হন। কৃষ্ণের আরাধনা, চৈতন্যের ভক্তি তাঁদের অন্তরে নব চেতনার বীজ

বপন করে। এইভাবে নাট্যকার চৈতন্যের কাহিনীকে নবনির্মিতরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

‘নিমাই সন্ন্যাস’ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র শচীমাতার পুত্র নিমাই। যিনি পরবর্তী কালে চৈতন্য নামে জনসমাজে অধিকতর পরিচিতি লাভ করেছিলেন। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে তিনি অতি সাধারণ মানুষের মধ্যে কৃষ্ণনাম বিলিয়েছেন। ‘চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ’ ছিল তার মূল মন্ত্র। তাঁর পুত্র চরিত্রের প্রভাব সমাজে উচ্চ-নীচের ভেদ ঘুচে গিয়েছিল। বৈষ্ণব ধর্ম একসময় সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করেছিল। মহাপ্রভু সকলের মধ্যে কৃষ্ণনাম বিলিয়েছেন। যে নাম করতে গেলে কোনো অর্থ লাগে না, কোনো উপাচারের প্রয়োজন হয় না, কোনো অনুষ্ঠানের দরকার নেই, শুধুমাত্র মনে-প্রাণে কৃষ্ণনাম জপ করলেই প্রাণের দেবতার অনুভব হয়। কৃষ্ণের জন্য মহাপ্রভুর হাহাকার সাধারণ মানুষকে সেকথাই উপলব্ধি করিয়েছে। কৃষ্ণপ্রেমের সেই ব্যাকুলতার কথা নাট্যকার মহাপ্রভুর কণ্ঠে দিয়েছেন এইভাবে -

“কৃষ্ণ, কৃষ্ণ! তুমি কোথায়? তুমি কি আমায় ভুলে গেছ? আমি জ্বলে মরি, আর সয় না, প্রাণধন! কোথায় তুমি? কৈ রে, আমার কৃষ্ণ কৈ রে, ওরে আমার কৃষ্ণ কোথায় গেল?”^{৩১}

মহাপ্রভুর এইরূপ কৃষ্ণপ্ৰীতি এবং কৃষ্ণাশ্বেষণের জোয়ারে নিত্যানন্দ, মুকুন্দ সকলেই নিমজ্জিত হয়েছেন। অদ্বৈতাচার্যের বাড়িতে হরিদাস, নিতাই, মুকুন্দ ও বৈষ্ণবগণের সামনে মহাপ্রভু ঘোষণা করেছেন-

“শুন শুন বিলম্ব নাহিক কিছু আর, ধরামাঝে কৃষ্ণপ্রেম করিব প্রচার, কৃষ্ণ-অনুরাগী, কৃষ্ণপ্রেমে যোগী দেখাইব ত্রিভুবনে, দ্বারে দ্বারে যাব, গৃহে গৃহে কব—কৃষ্ণ-প্রেম বিনা তুচ্ছ সকলি সংসার, এ হেতু সন্ন্যাস ব্রত মোর, তন্ত্র মন্ত্র যাগ যজ্ঞ সকলি বিফল, কৃষ্ণ প্রেম নাহি যাহে; সেই যোগী কৃষ্ণ-প্রেম অনুরাগী সেই—জ্ঞান মার্গ সার্থক তাহার—কৃষ্ণ-প্রেম যে ভেবেছে সার, কৃষ্ণ-ধ্যান, কৃষ্ণ-জ্ঞান, কৃষ্ণ তপ জপ, অসার সে শাস্ত্র যাহে কৃষ্ণভক্তি নাই।”^{৩২}

মহাপ্রভুর এইরূপ ঘোষণা আসলে তাঁর চরিত্রের কৃষ্ণভক্তির বাস্তবরূপ। আপামর জনসাধারণকে মহাপ্রভু যেন তাঁর আদর্শে আদর্শায়িত করতে চেয়েছেন। নাট্যকার

মহাপ্রভুর মুখে কৃষ্ণনাম প্রচারের বিষয়টি বড়ো করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। সন্তান বিরহে শচীমাতার ক্রন্দন চিরকালীন সন্তানহারা মায়ের কান্নার রূপ পরিগ্রহ করেছে। নিমাইয়ের গৃহত্যাগের পর শচীমাতা তাঁর দুঃখের কথা ব্যক্ত করেছেন এইভাবে-

“বাবা বিশ্বম্ভর! কোথায় তুমি? তোমার দুঃখিনী মা মরে, একবার দেখে যাও, আমার হারাধন অঞ্চলের নিধি! আমার কে আছে? তুমি আমায় কাতর দেখলে অস্থির হও, আমি মরি, তুমি কোথায় রইলে? কোথায় ভুলে আছ? বাবা, আমার কে আছে? এস বিশ্বম্ভর! এস, আমায় সান্ত্বনা করে যাও।”^{৩৩}

এই উক্তিতে শচীমাতার চরিত্রটি রক্ত-মাংসের জননীর রূপ লাভ করেছে। আবার বিষ্ণুপ্রিয়া স্নেহশীলতার পরিচয়টিও তুলে ধরেছেন নাট্যকার। তিনি শত কষ্ট সহ্য করেও স্বামীকে তাঁর লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যেতে দিয়েছেন। শাশুড়ীমাতা শচীদেবীকে বিষ্ণুপ্রিয়া বলেছেন—

“জননি! তুমি ভেবো না, আমার স্বামী আমায় সঙ্গিনী দিয়েছেন। এই মালা আমার সঙ্গিনী, আমার পতি সন্ন্যাসী, আমি চির-সন্ন্যাসিনী। মা! যাও, যার বিধাতা বিমুখ, তুমি কি করবে?”^{৩৪}

বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত্রের আত্মত্যাগ, কোমল স্বভাব, স্বামীপ্রেমকে নাট্যকার মহৎ করে তুলেছেন। নাটকের প্রতিটি চরিত্রের সংলাপ টানটান ও জীবন্ত হয়েছে, যা একালের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার পরিচয় বহন করে। আধ্যাত্মিক ভাব-গভীরতা থাকলেও, নাটকটিকে নাট্যকার বাস্তব করে তোলার চেষ্টা করেছেন। সমাজে যে ভালো-মন্দ দু ধরণের মানুষই থাকে নাটকে তার পরিচয় আছে। এই নাটকে আছে হিন্দী-বাংলা মিশ্রিত কৌতুকজনক ভাষার ব্যবহার। যেমন-

“ক্যান্ রে শালারা, তোম শালারা শিবোহং কর্ সেজ্ঞা আর হাম্ কর্ সেজ্ঞা নেই?”^{৩৫}

রাজা প্রতাপরুদ্রের মতো ধার্মিক, ভক্তিপ্রাণ মানুষের সাক্ষাৎ আমরা পাই এই নাটকে; যিনি চৈতন্য দর্শনের জন্য ব্যাকুলভাবে পথ চেয়ে আছেন। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ এইভাবেই ‘নিমাই সন্ন্যাস’ নাটকটিকে আধুনিক করে তুলেছেন। আধুনিক ভাষা ব্যবহারে, পরিবেশ সৃজনে এবং চরিত্রগত পুনর্নির্মাণে নাটকটি আধুনিক হয়ে উঠেছে।

হরচন্দ্র রায়- নদীয়া যুগল (১৯৩৪);

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে হরচন্দ্র রায় চৈতন্যচেতনা ও বৈষ্ণবীয় তত্ত্বভবনাকে অবলম্বন করে রচনা করেন ‘নদীয়া যুগল’ নামের একটি নাটক। ২৪ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১৫ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটির প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (১), মুদ্রণপত্র (১), উৎসর্গপত্র (১), ভূমিকা (২), সঙ্গীত, স্তব, প্রার্থনাপত্র (১), মূলনাটক (১৬৩) সহ নাটকটিতে মোট ১৭৩ টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকের প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ—

“নদীয়া যুগল/ হরচন্দ্র রায়”^{৩৬}

নাটকের নামপত্রটি এইরূপ—

“শ্রী শ্রী গৌর বিষ্ণু প্রিয়াত্যাং নমঃ/ নদীয়া যুগল/
(নাটক)/ শ্রী হরচন্দ্র রায় প্রণীত/ প্রথম সংস্করণ/ ১৩৪১
বাং।”^{৩৭}

উৎসর্গপত্রে বলা হয়েছে “শ্রীশ্রী গৌর ভক্ত বৃন্দের করকমলে” নাটকটি উৎসর্গ করা হয়েছে। ভূমিকা অংশে নাট্যকার-পুত্র ননীগোপাল রায় জানিয়েছেন যে, তাঁদের পরিবার পিতৃদেবের আশ্রয়ে দিন-রাত গৌরভক্ত মহাজনদের পবিত্র হরিনামে ও পদধূলায় ধন্য হতো। তাঁদের সুললিত কণ্ঠ নিঃশ্রিত প্রাণমাতানো “গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া” নামসংকীর্ণনে ঠাকুর গৃহসহ সমস্ত বাড়ি আনন্দে মুখরিত হতো। প্রতিদিন সাধু-সন্ন্যাসীদের সেবায় ও অভ্যর্থনায় দিন যাপিত হতো। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো জানিয়েছেন—

‘গৌর ভক্তবৃন্দসহ কীর্তনানন্দে বিভোর থেকে কখন যে পিতৃদেব কলম হাতে নিয়েছিলেন এবং কি পরিবেশের মাঝেই বা “নদীয়া যুগল” লিখেছিলেন সেকথা আজ আমার মনে আসে না। জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে একদিন পিতৃদেব আমার স্ত্রী (হাসি) ও আমাকে তাঁর পাশে ডেকে এনে বইটি ছাপাবার অন্তিম ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আজীবন আত্মপ্রচারে কুণ্ঠিত বলেই হয়ত পাণ্ডুলিপিটি ১৩৪১ বঙ্গাব্দে সম্পূর্ণ করেও তিনি সুদীর্ঘ ১৫ বৎসর কাল পর্যন্ত উহা স্বীয় তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত করার প্রয়াসী হন নাই। কিন্তু আমি এমনই হতভাগ্য সন্তান, পিতৃদেব স্বর্গীয় হবার পর দীর্ঘ ১২ বৎসরের মধ্যেও উহা ছাপাবার মত মানসিক প্রেরণা লাভে বঞ্চিত ছিলাম। আজ আমার এক মাত্র দুঃখ, পিতৃদেবের

জীবদ্দশায় যদি বইখানা ছাপিয়ে পিতৃদেবের সাধন-সঙ্গী সকল গৌর ভক্তদের করকমলে একখানা করে উৎসর্গ করতে সক্ষম হতেম তাহলে হয়ত পিতৃদেবের দীর্ঘকালে লালিত এক অব্যক্ত কামনার তৃপ্তি লাভ হত। পিতৃদেবের সেই অতৃপ্ত কামনা বাস্তবায়িত হতেই যেন নানা হাত ঘুরে এক অলৌকিক নির্দেশে শেষপর্যন্ত পাণ্ডুলিপিখানা ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া হতে এখানে এসে পৌঁছেছে।

“গ্রন্থটি প্রকাশনার পেছনে সর্বাগ্রে শ্রদ্ধেয় ভক্ত প্রবর স্বর্গীয় রজনীকান্ত ভৌমিক ও স্বর্গীয় অনঙ্গমোহন পোদ্দারের নাম উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ এঁদের উভয়ের নিরলস প্রচেষ্টা ও সক্রিয় প্রেরণা ব্যতীত একাজ কখনও আমার পক্ষে সম্ভব হত না। কিন্তু আমার এমনই দুর্ভাগ্য—মুদ্রিত বইটি এঁদের কেহই দেখে যেতে পারলেন না। দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে পাণ্ডুলিপিটির স্থানে স্থানে লেখা অস্পষ্ট এবং ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, যারফলে ছাপতে গিয়ে সম্পূর্ণ নির্ভুল উদ্ধৃতি হয়ত সম্ভব হয়নি। সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ও অক্ষমতার জন্য গৌর পদাশ্রিত সকল ভক্তবৃন্দের অপার স্নেহ করুণা মিশ্রিত মার্জনা ভিক্ষা করি।”^{৩৮}

নাটকটির সূচনায় প্রার্থনা অংশে বাগদেবী ও জ্ঞানদেবীর আরাধনা করা হয়েছে। নাটকে উল্লিখিত চরিত্রগুলি হলো- নিমাই, শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, সর্বজয়া, চন্দ্রশেখর, কাঞ্চনা, অমিতা, যোগনিদ্রা প্রমুখ। গৌরভক্তপদরাজ প্রার্থী ননীগোপাল রায়ের যত্নে ও তত্ত্বাবধানে নাটকটি প্রকাশিত হয় ভারতী প্রেস, উত্তরবনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে।

‘নদীয়াযুগল’ নাটকে মোট সাতটি অঙ্ক আছে। প্রতিটি অঙ্কে অনেকগুলি করে দৃশ্য আছে। প্রথম অঙ্কে নাটকটি শুরু হয়েছে এক জনৈক বৈষ্ণব পদকর্তার প্রার্থনা দিয়ে-

‘ধন্য নদীয়া ধন্য নদীয়া স্মরণে সকল মঙ্গল।/ ধন্য জাহ্নবী ধন্য জাহ্নবী দ্রব্যময়ী ধন্য তব জল।।/ ধন্য ফাল্গুনী পূর্ণমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনা আসিল।/ ধন্য সায়াহ্ন সময়ে রাহু, পূর্ণশশীকে গ্রাসিল।।/ হরি হরি ধ্বনি এ পুণ্য সময়ে,/ রাশি রাশি পাপ

নাশিল।/ ধন্য পুণ্যময় শচীগর্ভসিন্ধু/ গৌর পূর্ণ ইন্দু
প্রকাশিল।।”^{৩৯}

এইপদে নবদ্বীপে শচীমাতার গৃহে চৈতন্যের আবির্ভাবের এক অপূর্ব সন্ধিক্ষণের কথা বলা হয়েছে। শুক-শারী পাখির কথায় উঠে এসেছে ভগবান কৃষ্ণের জন্মান্তরের অপরূপ মহিমার কথা। শারীকে শুক বলেছে—

“গোলোক, নবদ্বীপ হয় সর্বধামসার/ নিত্যানন্দ ধাম নাম।/
শ্রীশ্রীলক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়াসহ সদা রস কেলি রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদের
হেথায়।/ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য যত আছে পূর্ণভাবে/ আছে আনন্দ প্রচুর
যত ধামের/ এই নদেধামে,/ আর আছে ঔদার্য্য মহান।/
সর্বধামের সর্বশক্তি লব্ধপরিকর/ মিলেছে আসিয়া হেথা।/ যথা
নদনদী, খরতর স্রোত বেগে/ ধাইয়া পড়িছে আসি মহাসাগরের
জলে।/ প্রেমের ভাণ্ডারী নিতাই/ প্রেমের বাদল করি/ করিছে
প্লাবন সদা এই চিন্তামণি ধাম।/ নিত্যরাস সংকীর্ণনে প্রেমিক
ভক্তগণে/ উদ্ভগু নর্তনে সদা প্রেমে পাগল পারা।/ প্রেম গলাগলি
আর প্রেমে কোলাকোলি/ প্রেমে হুড়াহুড়ি ধূলায় প্রেমে গড়াগড়ি/
মূর্ত্তিমন্ত প্রেম যেন ধূলায় বিলুপ্তিত।/ পুরুষ দেহে করে এই রাস
আস্বাদন/ভাবময় নারীদেহ হ’য়ে মূর্ত্তি মন্ত/ নাগরীদের সঙ্গে করে
প্রেমের সেবন/ ঔদার্য্য প্রাবল্যে সবে মহাকৃপাবান।...ভাগ্যবান
কলির জীব, ভাগ্যবান মোরা/ তাই- গোলোকের গুপ্ত সম্পদ
শ্রীগৌরাঙ্গ সে/ সহ সর্বপরিকর সহ ভক্তিশ্রী/ এসেছেন
ধরামাঝে, মানুষ সমাজে/ ত্রিলোক করিবে উদ্ধার শ্রীগৌরাঙ্গ
রায়,/ কলির জীবের ভাগ্যে হল উপায় চমৎকার।/ আমরা হই
পক্ষিজাতি, চল বসি হেরি/ চমৎকার গৌরলীলার চমৎকার
মাধুরী’।^{৪০}

গোলকের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপের ধরাধমে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং নবদ্বীপ থেকে নীলাচল পর্যন্ত তাঁর প্রেমের জোয়ার যে প্রবাহিত হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নাটকে নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণের আগের পারিবারিক ও মানসিক অবস্থার চিত্রটি নাট্যকার অতিসুন্দরভাবে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করে প্রকাশ করেছেন। নিমাই পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে মস্তিষ্কের

অসুখের বাহানা বানিয়েছেন; যার একমাত্র নিরাময়ের উপায় দেশান্তরে যাওয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া চিন্তিত হলেও স্বামীর কুশল কামনায় যে কোনো দুঃখ মেনে নিতে চেয়েছেন।
তিনি স্বামীকে বলেছেন—

“প্রাণেশ্বর! বলকি এমন অসুস্থ শরীর নিয়ে বিদেশে যাবে? মা
তোমায় ছেড়ে দিবেন কেন? আর আমিই-বা কি ক’রে থাকব?/
(গান সুর করিয়া)/ দিনন্তেও দেখি যদি এ চন্দ্র বয়াণ।/ সর্ব
সন্তাপ দূর হয়ে শীতল জয় পরাণ।।”^{৪১}

বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামী নিমাইকে নিজের প্রাণের চেয়ে ভালোবাসেন। সেই আবেগে তিনি স্বামী
নিমাইকে বলেছেন—

“প্রাণনাথ।/ কি আর বলিব আমি হে নাথ কি আর বলিব আমি।/ আমি
কুলবালা অতিশয় সরলা/ ভালমন্দ কিছুই জানি/ যাহা হয় উচিত যাতে
হয় হিত/ ত্বরা কর প্রাণ, হে নাথ ত্বরা কর প্রাণ ক্ষামি/ (নাথ আমায়
মনে রেখহে) (তোমার শ্রীচরণে দাসী বলে নাথ আমায় মনে রেখহে)/
যেখানেই জাও এ অভগাগিনীর কথা মনে রেখো।”^{৪২}

নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণের আগে বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিজের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন
এইভাবে -

“জীবের লাগিয়া মোর এই অবতার/ ঘরে ঘরে নাম প্রেম করিমু
প্রচার/ সরলা অবলা বালা বিদায় দিল মোরে/ কেমনে শুধাই
মাকে ভাবিয়ে অন্তরে।”^{৪৩}

নাট্যকার এখানে নিমাইয়ের কৃষ্ণাবতার রূপটিকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন এবং
রাধারূপে কৃষ্ণাখ্যানে বিভোর চৈতন্যের আধ্যাত্মিক ভাবরূপটি বড় করে তুলেছেন। মা
শচীরাণীর সঙ্গে নিমাইয়ের কথোপকথনে উঠে এসেছে নিমাইয়ের শৈশবের দুরন্তপনার
কথা। শচীমাতা যখন একে একে নিমাইকে সেই অতীতের শিশুসুলভ দুরন্তপনার কথা
বলেছেন, তখন নিমাই তাঁর মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন সুখের নানা অনুভূতি। মা ও সন্তানের
কথাবার্তার মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে জাগতিক জীবনের নানা আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা। পথের
একটি কুকুরছানাকে নিয়ে নিমাই ছোটবেলায় খেলাধূলা করতেন বলে শচীমাতা তাঁকে
বাধা দিতেন। কিন্তু ছোট নিমাই মার কথা শুনতেন না। এখন নিমাই মাকে তার উত্তর
দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

“সর্বজীবে সম্মান দিবে জানি ইষ্ট অধিষ্ঠান। ইহাইত হয় মাগো
সর্বশাস্ত্রের প্রমাণ।।/ মা! সকলের মাধ্যেই শ্রীভগবান
পরমাত্মারূপে বিরাজমান আছেন না! একজন আর একজনকে
হিংসা অথবা ঘৃণা/ করলে পক্ষান্তরে তার ইষ্টবস্তুকেই হিংসা
অথবা ঘৃণা করা হইল। আরো দেখ মা! কুকুর বড় প্রভুভক্ত।
জীব যদি কুকুরের অনুকরণে ভগবদভক্ত হতে পারে তবে এই/
ভুলোক গোলোক হয়ে যেত।।”^{৪৪}

নিমাইয়ের কথায় প্রকাশ পেয়েছে যে প্রতিটি জীবের প্রতি আমাদের ভালবাসা থাকা
উচিত। আসলে কোনো মানুষ বা প্রাণী কারো থেকে কেউ ছোট নয়। পৃথিবীর প্রতিটি
জীবকে ভালোবাসা দিতে হবে। তাতেই সমাজের বন্ধন তৈরী হবে। একবার শৈশবে
নিমাই মাটি খেয়েছিলেন বলে শচীমাতা তাঁর ওপর রাগ করেছিলেন। মাটি খাওয়া
প্রসঙ্গে নিমাই মাকে বলেছেন-

“মাটির মতো খাঁটি নাইগো/ চারিদিকে যত দেখ মা মাটির মতো
খাঁটি নাই গো/ যত কিছু দেখ মাগো মাটি হতে হবে গো/ মাটিই
ত সর্ব প্রধান, দেহের যত আছে উপাদান / সোনা রূপা যত
দেখ মাটির বিকার গো/ মাটির মতো খাঁটি বস্তু কিছু নাই আর
গো।।”^{৪৫}

শ্রীকৃষ্ণের অপার মহিমা এই পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণায় বিদ্যমান। তাই মাটিই প্রকৃত
খাঁটি; তাকে গ্রহণ করার অর্থ তার প্রতি ভালোবাসা দান। গঙ্গার ঘাটে ব্রাহ্মণ ও
বালিকাদের সঙ্গে নিমাইয়ের নানা অশান্তির কথায় যেন কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার ননীচুরি
করে খাওয়া ও গোপবালিকাদের মাটির কলসি ভেঙে দেওয়ার সাদৃশ্য পাওয়া যায়।
পিতা জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর পর শচীমাতা যখন অনন্ত দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত হয়েছেন,
তখন নিমাই মাকে সাঙ্গুনা দিয়ে বলেছেন —

“মাগো তোমায় বলি অনিত্য সকলি।/ কর্মফলে মাগো
জীবের গতাগরি।।/ রোধিতে সে গতি কার আছে
শক্তি।/ যাওয়ার বেলা মাগো কেবা কার সাথী।।/ কেহ
কারো নয় শুধু পথের আলাপন।।”^{৪৬}

শচীমাতা নিমাইয়ের বিয়ে দিলেন প্রথমে লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে, পরে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে। সন্তানের প্রতি মায়ের এইরূপ অপার স্নেহ-মমতার কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয় গোকুলের কৃষ্ণমাতা যশোদার কথা। নিমাই মায়ের এই বাৎসল্য-স্নেহ লক্ষ্য করে মাতৃ ভক্তিতে বলেছেন—

“বাৎসল্যের মুরতি মাগো, তুমি মাগো ধন্য ধন্য/ ঐশ্বর্য্যেতে
ভুলিলে না, ভাবিলেনা পুত্রে অন্য।/ যুগে যুগে মা হয়েছ, তুমি মা
সর্ব্ব-বরণ্য/ গৌর ভক্তি মিলে না মা তোমার করুণা ভিন্ন।/
ক্ষান্ত হয়ে রলে কেন মা! আর কি আছে বল না মা!”^{৪৭}

নিমাইয়ের গয়াগমন তাঁর জীবনে কৃষ্ণানুরাগের জাগরণ ঘটায়। গয়াধামে বিষ্ণুপদচিহ্ন দেখে তাঁর মধ্যে কৃষ্ণ নামের বিকার ঘটে। তিনি শচীমাকে বলেছেন—

“যত কথা শুনি মাগো কৃষ্ণ কথা হয়ে।/ কানের ভিতর দিয়া মরমে
পশয়ে।।/ নাকের ভিতর মাগো যত গন্ধ আসে।/ সুবাসিত হয়ে আসে
কৃষ্ণের পরশে।।/ কৃষ্ণ মোর ধনপ্রাণ কৃষ্ণ মোর গতি।/ এই কৃপা কর
মাগো কৃষ্ণে রহে মতি।।”^{৪৮}

এই কথাগুলিতে আমরা প্রত্যক্ষভাবে খুঁজে পাই রাধার মতো চৈতন্যের কৃষ্ণের প্রতি পূর্বরাগের অনুভূতি। এ যেন সেই পরিচিত শ্লোক- “রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতম কৃষ্ণস্বরূপম”। শচীমাতার বড়ো ছেলে নিতাই সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করে এবং কিছুকাল পরে ফিরে আসলে নবদ্বীপে কৃষ্ণনামের জোয়ার আসে—

“নিতাইর আসার পর হতে নানা দিক দিগন্ত হতে ভক্তের স্রোত
পড়ল! বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বয়োবৃদ্ধ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও ভক্তদের সঙ্গে
যোগ দেওয়াতে আনন্দের তরঙ্গ আরও বেড়ে উঠল। চতুর্দিকে
হরিনামের ধ্বনিতে যেন নদে নেচে উঠল।”^{৪৯}

এই কৃষ্ণপ্রেমের জোয়ারে প্লাবন এলো নিমাইয়ের সংযোগে। তাতে নবদ্বীপের নানা সামাজিক পাপ দূরীভূত হল। জগাই-মাধাইয়ের মতো পাপী মানুষের আত্মার শুদ্ধিকরণ ঘটল। কাউকে না মেরে, কারো এক বিন্দু রক্তপাত না ঘটিয়ে, কাউকে আঘাত না করে চৈতন্য মানুষের অন্তরের শুদ্ধিকরণের যে রাস্তা নির্মাণ করলেন, তা সত্যিই সাম্যবাদের নবজাগরণ। নিমাই মাকে সমাজ-সাম্য প্রতিষ্ঠার বিষয়ে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন—

“যে পর্য্যন্ত সর্ব পুরুষের ভ্রাতৃ ভাবনা জাগিবে এবং সমস্ত নারীতে মাতৃ ভাব না জাগিবে সে পর্য্যন্ত ইহা দূরীভূত হইতে পারে না। মা! আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম এই পাঁচটিই সৃষ্টির মূল উপাদান। বসুন্দরা সকল জীবকে সমভাবে বাৎসল্যরসে ভালমন্দ বিচার না করিয়া বক্ষে ধারণ করিয়া বাঁচাইয়া রাখিতেছেন। জল সমভাবে সকলের তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া রক্ষা করিতেছে। সূর্য্য সকলকে সমভাবে তেজদান করিতেছেন। বায়ু সকলকে একইভাবে সুশীতল করিতেছে ও জীবন রক্ষা করিতেছে। এক আকাশের তলে সকল জীবই সমভাবে বসবাস ও বিচরণ করিতেছে। সকলই যেন কাঁহার আদেশে নিষ্কাম ভাবে জীবসেবা করিয়া যাইতেছে। কেহই কাহার নিকট প্রতিদানে কিছু চায় না। আরও মা দেখ! বৃক্ষরাজি সন্তপ্ত পথিকগণকে অবিচারেছায়া দান করিয়া সকলের তপ্ত দেহ জুড়াইতেছে। একই পাকপ্রণালীতে সকলের খাদ্যবস্তু পরিপাক হইয়া রক্তমাংস ইত্যাদিতে পরিণত হইয়া সকলের দেহই একই প্রণালীতে পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতেছে। অতএব মা! যদিকে চিন্তা কর এই বিশ্ব সৃষ্টির যদিকে তাকাও সেইদিকেই সৃষ্টি কর্তার সাম্যবাদই পরিলক্ষিত হইতেছে। এই চিন্তা করিয়াই আমি উৎসাহিত ও আশান্বিত হইয়া চাঁদকাজীর বাড়ীতে যাইতে সাহস করিয়া ছিলাম। তোমার শ্রীকৃষ্ণ আমার সঙ্গে ছিল। শ্রীকৃষ্ণ সে সময় এই ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া ছিলেন। প্রত্যেকে চতুর্ভুজ হইয়া ছিল। দুইহাতে করতাল একহাতে মশাল, একহাতে তৈল মা! আমি বিদ্বেষভাব নিয়া যাই নাই। এই ঐশ্বর্য্য দেখিয়া এবং আমার বিদ্বেষ শূন্যভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া কাজী সাহেব ও আমার প্রতি কোন বৈরী ভাব দেখায় নাই বরং সাদরে আমাকে গ্রহণ করিয়া ছিলেন এবং মৈত্রীভব স্থাপন করিয়া ছিলেন। শ্রী ভগবানের সাম্যনীতি তিনিও উপলব্ধি করিয়া ছিলেন।”^{৫০}

এইভাবে মায়ের সঙ্গে কথোপকথনে নিমাই জাগতিক জীবন সত্য, ঈশ্বরভক্তি, মনুষ্যপ্রেম ও সাধনার নানা পথের দিশা দিয়েছেন। নিমাই বুঝতে পেরেছিলেন কৃষ্ণভক্তিই পারবে মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ দূর করতে, মানুষের মধ্যে দুঃখের অবসান ঘটাতে, প্রকৃত আনন্দ দিতে। তাই তিনি আপন সমাজে ও দেশে-দেশান্তরে কৃষ্ণপ্রেমের জোয়ার আনার

জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু মা শচীরানী ও পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করার জন্য তাঁর মনে কষ্টবোধ জেগেছে। দাদা নিতাইকে সেই কথা স্বীকার করে নিমাই বলেছেন—

“দাদা! বলি হে তোমায়, আমি যাব চলিয়ে/ তুমি থাক গৌড় দেশে,
আমি যাব দেশ বিদেশে/ দুয়ারে দুয়ারে যাব ভাই, সন্ন্যাসী হইয়া,/ (আমি যাব চলিয়া)/
আমা হৈতে যা না হবে তুমি তাহা করতে পারবে /
অবিচারে নাম বিলাবে ভাই সদয় হৈয়া (আমি....)/
ঘরে রইল মা দুঃখিনী, বিষ্ণুপ্রিয়া অনাথিনী/ রক্ষা কর ভাইরে নিতাই, সান্ত্বনা দিয়া (আমি যাব)।”^{৫১}

নাটকের প্রতিটি অঙ্কে কৃষ্ণকথার তাত্ত্বিক মাহাত্ম্য নিমাই নানা প্রসঙ্গে ব্যক্ত করেছেন; যাতে বৈষ্ণব দর্শনের কৃষ্ণস্বরূপের আত্মিক রূপটি প্রকাশিত হয়েছে। মায়ের গভীর ভালোবাসার বন্ধন কাটানোর জন্য নিমাই শচীমাতাকে বলেছেন-

‘একদিন আসিবে মাগো তুমিও চলে যাবে / তোমার মতো কে
আর মাগো আমাকে দেখিবে?/ (তখন আমার উপায় কি হবে
গো) (কার হাতে আমায় দিয়ে যাবে)/ আর তুমি থেকেই বা মা
আমার সঙ্কটকালে কি করতে পেরেছ?/ সব সময়ইত মা
আমাকে শ্রীকৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করেছ।/ (তবে কেন আমায়
স’পে দেওনা) (নিত্য সত্য শ্রীকৃষ্ণের হাতে তবে কেন
মা.....)/ (চিরকালের তরে মাগো, তবে কেন আমায়.....)/
(তাইলে আর ভাবনা থাকবে না) (তোমার যাওয়ার কালে,
তোমার মাগো আর ভাবনা.....)/ (সুখে মাগো মরতে পারবে)
(কৃষ্ণরক্ষ নিমাই বলে, সুখে মাগো মরতে পারবে)।”^{৫২}

ঠিক একইভাবে নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করার আগে তাঁকে কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলেছেন-

“চিরদিন সমান না রয়।/ কালের কুটীলা গতি, কত কিছু
হয়।।/ ভেবে দেখ প্রিয়ে স্থির মনে/ আপন বলি যত আত্মীয়
স্বজনে/ কালের আবর্তে যায় দিনে দিনে/ যাবার বেলা কেহ
কারো কিছু নয়।।”^{৫৩}

মায়ার বন্ধনে এই পৃথিবীর জীবজগৎ আবদ্ধ। সেখানে সকলেই কিছু দিনের অতিথি মাত্র। কৃষ্ণভক্তিই আসল কথা। কালের নিয়মে সকলকেই একসময় জগত-সংসার ছেড়ে যেতে হবে। তাই ভালোকর্মের জন্য কোন কিছু থেকে পিছিয়ে আসা উচিত নয় বলে নিমাই মনে করেছেন। শত আঘাতের পরেও বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইকে তাঁর লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যেতে দিয়েছে। তিনি বলেছেন—

‘ও কাঙ্গালের বন্ধু/ তোমায় আর বাঁধা দিব নাহে।/ তুমি জীব তরাতে
তুরায় যাও হে, আর বাঁধা দিব নাহে।/ ও শোন শোন প্রাণনাথ মরম
বেদনা যত/ নিবেদিনু তব শ্রীচরণে/ কলির জীবের দশা শুনি বাহিরায়
মোর পরাণি/ ভাবিয়াছি তাই মনে মনে।।/ তোমার মলিন বদন হেরি
যায় পরাণ বিদরি/ আর তোমায় কত দিব দুঃখ/ যাতে তোমার সুখ হয়
কর ওহে দীন দয়াময়/ পাষাণে বাঁধিব মোর বুক।’^{৫৪}

এখানে তিনি প্রকৃত প্রেমিকা নারীর আদর্শ হয়ে উঠেছেন। একসময় নিমাই সকলের অজান্তে গৃহত্যাগ করেছেন। একদিকে সন্তান হারানো শচীমাতার ক্রন্দন, অন্যদিকে স্বামীহারা বিষ্ণুপ্রিয়ার ব্যাকুলতায় নাটকটি climax পর্বে পৌঁছে গেছে। বাঙালি ঘরের চিরন্তন ছবি আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর অদর্শনে কেঁদে কেঁদে বলেছেন—

“একি নাথ! প্রাণনাথ! প্রভো! কোন সাড়াশব্দ যে পাচ্ছিনে!
প্রাণবল্লভ! হৃদয়েশ্বর! কোথা গেলে?”^{৫৫}

শচীমাতা দুঃখ করে বলেন —

“হা আমি কি হতভাগিনী! এই সোনার প্রতিমাকে সাধ করে
ঘরে এনে কেন আঁধার করে দিলেম। মৃত্যু তুমি কোথায়?”^{৫৬}

শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃসহনীয় মানসিক অবস্থা নাটকের মধ্যে করুণ রসের ধারা প্রবাহিত করেছে। সেই ধারায় নবদ্বীপের প্রতিটি মানুষ, পশু-পাখি, এমনকি প্রকৃতিও বেদনাধারায় ভেসে গেছে। কৃষ্ণহারা হয়ে বৃন্দাবনের যেমন অবস্থা হয়েছিল, ঠিক তেমনি অবস্থা হয়েছে নিমাইহারা নদীয়ার। এ যেন চন্দ্র বিনা নবদ্বীপ অন্ধকার। নাট্যঅস্তিমে তাই জনৈক বৈষ্ণব পদকর্তার চৈতন্য বন্দনা দিয়ে যবনিকাপাত ঘটেছে—

“গৌর নাম লিখে দিও অঙ্গে/ তোমরা সকলে গৌর গৌর বলে,/
 সুরধনি তীরে নিয়ে যেও রঙ্গে।/ তুলসীর দল, যত্নে এনে তুলে/
 তার মালা গেঁথে পরাইও গলে,/ গৌর গৌর নাম, বল কর্ণমূলে/
 প্রাণ যেন যায় গৌর নামেরই সঙ্গে।।/ কফে রুদ্ধ কণ্ঠ না
 স্কুরিবে বুলি,/ বলিতে দিবে না গৌর গৌর বুলি।/ (আমার)
 সাথে বেঞ্চে দিও গৌর নামাবলী,/অন্তে যেন পাই শ্রীগৌরাজে।।/
 ওহে কৃপাময় শ্রীশচীনন্দন, নিজগুণে একবার দিও দরশন,/
 আমার অন্ত যাবে যখন, জীবন তপন,/ দেখা দিও বিষ্ণুপ্রিয়া
 সঙ্গে।।/ (মধুর যুগলরূপে) (বিষ্ণুপ্রিয়া বামে নিয়ে)/(রসরাজ
 মহাভাব দুই একরূপে)।”^{৫৭}

এইভাবে সমগ্র নাটকটিকে নাট্যকার তত্ত্ব ও জাগতিক সত্য ভাবনার আলোকে এবং
 অভিনব দৃষ্টি সংযোজনে সার্থক পুনর্নির্মাণ নাটক করে তুলেছেন।

‘নদীয়াযুগল’ নাটকের মূল ভাবনা চরিত্রগুলির চিন্তা-চেতনাকে অবলম্বন করে
 গড়ে উঠেছে। চৈতন্য যখন মায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন, শচীমাতা যখন নিমাইয়ের সঙ্গে
 অতীতের স্মৃতিচারণ করেছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া যখন নিমাইয়ের সঙ্গে কথা বলেছেন, তখন
 তাঁদের কথার মধ্য দিয়েই তৈরি হয়েছে নাট্য প্রেক্ষাপট। তবে তাঁদের কথোপকথনে
 যতোটা না ঘরোয়া জীবনের কথা ছিল, তার থেকেও বেশি ছিল আধ্যাত্মিক ভাবনার
 কথা। নাট্যকার আবেগধর্মী সংলাপ রচনার মধ্যে দিয়ে নবদ্বীপের চৈতন্য ও নিত্যানন্দের
 কৃষ্ণপ্রেমের প্রকৃত আদর্শকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। পাশাপাশি নবদ্বীপের মতো
 গৌড়বঙ্গের ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিকাঠামোটি তুলে ধরেছেন। শুক ও শারী চরিত্র
 দুটি অঙ্কন করে নাট্যকার কাহিনির সংযোগ সাধন করেছেন; কৃষ্ণ-তত্ত্বের মধুর রস
 আন্বাদন করাতে চেয়েছেন। শুক শারীকে চৈতন্যপ্রেমের মাহাত্ম্য বোঝাতে গিয়ে
 বলেছেন—

‘দেখ দেখ শারী,/ কিবা অপরূপ রূপগো।/ রূপের বলকে, হৃদয়
 চমকে/ রসনিদান রস ভূপগো।/ ত্রেতা দ্বাপর কলি তিনে একে
 মিলি/ ত্রিলোক তারিতে এলে মহিতলি/ (দেখ) সর্বকালের কাঁচা
 কাঞ্চন গৌর/ রামকৃষ্ণ মিলে তাহে গো।/ উর্দ্ধে দুই বাহু শ্যাম
 দুর্বাদল/ দুই বাহু মাঝে জলদ কাল/ নিম্নে দুটি বাহু কনক
 উজ্জ্বল/ মিলেছে তিন, একদেহেগো’।^{৫৮}

কৃষ্ণের অবতার রূপ যে চৈতন্য, সে কথা পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিমাই বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন-

“প্রেমই জীবের প্রয়োজন, কিন্তু আত্মসুখ বাঞ্ছা প্রিয়ে ধরে কাম নামগো, কৃষ্ণসুখ বাঞ্ছা প্রিয়ে ধরে প্রেম নামগো। প্রিয়ে! জীব আত্মসুখ বাঞ্ছা হেতু নিজের দারা সুত আত্মীয় স্বজনে এবং আত্মসুখের অন্যান্য আধারেই শুধু এই প্রেমটি নিবন্ধ করে রাখে। অতএবই এখানে প্রেম কাম হয়ে দাঁড়ায়। প্রাণ-প্রিয়ে! অহেতুকী অপ্রাকৃত ভালোবাসার নামই প্রেম। দেহাত্মবাদী স্বার্থান্ধ জীবের হৃদয় মায়াতে মলিন হেতু জীবে জীবে শুদ্ধ প্রেম সম্ভবে না। বিশ্বপতিতে এই প্রেম প্রথমতঃ উপজাত হলে পর বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুতেই সেই প্রেম ছড়িয়ে পড়ে। তাকে বিশ্বপ্রেম বলে।”^{৫৯}

এইভাবে নাট্যকার নিমাই চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজের যাবতীয় পঙ্কিলতার সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমের স্বতন্ত্র মাহাত্ম্যকে পৃথক করে প্রকাশ করেন। এই ধারাতেই এসেছে রাগাণুগা ভজনের কথা, সাধ্যসাধন তত্ত্বের কথা, নিতাই-তত্ত্ব, রাধাবিরহ-তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব, কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির স্বরূপ প্রভৃতি নানা তাত্ত্বিক বিষয়। নাটকের মধ্যে নানাসময় যুক্তির প্রয়োজনে এসেছে পৌরাণিক চরিত্রের প্রসঙ্গ। সতীসাদ্বী নারী বিষ্ণুপ্রিয়া যখন নিমাইয়ের কোন যুক্তিতেই সায় দিচ্ছেন না, তখন নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়ার কথোপকথনে রামায়ণের সীতা ও বৃন্দাবনের রাধার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। চরিত্র ও কাহিনির মধ্যে নাটকের অনেকগুলি গুঢ় তত্ত্বভাবনার বিশ্লেষণ প্রকাশিত হলেও ভাষার জটিলতা বা পাঠকের বোধগম্যতায় কোথাও বাধা পরেনি। যেখানেই তত্ত্ব এসেছে, সেখানেই সমাজ জীবন থেকে নানাবিধ উদাহরণ সংযোজিত হয়েছে। ফলে নাট্যপ্রেমী মানুষের কাছে ‘নদীয়াযুগল’ নাটকটি সুখপাঠ্য হয়েছে। প্রাকৃতিক জগতের নিরাকার ও সাকারের ভাবনা প্রকাশ করতে গিয়ে নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলেছেন —

“ফলমারো বৃক্ষ থাকে না থাকে আকার,/ বৃক্ষমারো ফল ফুল আছে কত প্রকার/ তেমনি অদৃশ্য হয়ে আছি যথাতথা/ ভক্তের ভাবেতে ফুটি না হয় অন্যথা।”^{৬০}

এই সংলাপের কোন অংশে ভাষার জটিলতা নেই। বরং অতি সহজ, সরল ভাষায় সুন্দরভাবে বিষয়টি পরিবেশিত হয়েছে। এ যেন কালোপযোগী নাট্যভাষার অভিনব

সংযোজন। নিমাইয়ের গৃহত্যাগ বিষ্ণুপ্রিয়াকে পাগলিনী করেছে। তাঁর ভাষাতে রয়েছে ভালোবাসার স্পর্শ। বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতিবেশী সখী কাঞ্চনাকে দুঃখের সঙ্গে বলেছেন —

“(বল বল সখি আবার বলগো) (এই অমিয় মাখা বন্ধুয়ার কথা)/
(বলে আমার প্রাণ বাঁচাগো) (বল বল সখি আবার বলগো)/
সখি! না জানি আমার কোন অপরাধে এমন হল।”^{৬১}

বিষ্ণুপ্রিয়ার ভাষায় আমাদের বাঙালি ঘরের চিরন্তন ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। এইভাবে নাট্যকার ‘নদীয়ায়ুগল’ নাটকে নবদ্বীপের গৌরাচাঁদের অপূর্ব ভাবমহিমাকে সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেছেন। ফলে নাটকটি পুনর্নির্মিত ও বিনির্মিত হয়ে একালের পাঠকের রসতৃষ্ণাকে তৃপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

দিলীপকুমার রায়—‘শ্রীচৈতন্য’ (১৯৫২);

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে দিলীপকুমার রায় ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্যজীবনী অবলম্বনে লিখেছেন ‘শ্রীচৈতন্য’ নামের একটি নাটক। ২১ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১৬ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটিতে প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (২), উৎসর্গপত্র (১), মূল নাটক (১৬২) সহ মোট ১৬৬টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকটির প্রচ্ছদপত্র এইরূপ—

“শ্রীচৈতন্য/ কাব্যনাট্য/ তিন অঙ্ক / ১৩৫২/ শ্রী দিলীপকুমার রায়/
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম/ পন্ডিচেরি”^{৬২}

নাটকের ‘নামপত্রে’ বলা হয়েছে যে নাটকটি তিন অঙ্কের কাব্য নাটক। নাটকটি প্রকাশিত হয় শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরি থেকে। সমগ্র নাটকটি চৈতন্যের প্রচারের উদ্দেশ্যে লিখিত একটি ভক্তিমূলক নাটক। নাটকে উল্লিখিত চরিত্রগুলি হল— শচীমাতা, শ্রীচৈতন্য, কেশবভারতী, মুরারি, রমা, বিষ্ণুপ্রিয়া। আলোচ্য নাটকের গঠনরীতির অভিনবত্ব হল প্রতিটি অঙ্কে একটি করে স্বতন্ত্র নামকরণ আছে। প্রথম অঙ্কের নাম ‘অভীক্ষা’, দ্বিতীয় অঙ্কের নাম ‘দ্বন্দ্ব’ এবং তৃতীয় অঙ্কের নাম ‘সিদ্ধি’। তবে কোনো গভীর্ণ বিভাজন নেই। দুই বা ততোধিক চরিত্রের কথোপকথনে নাটকটি পরিণতির পথে এগিয়ে গেছে। ‘উৎসর্গপত্রে’ লেখা আছে—

“বন্ধুবর/শ্রীবিধুভূষণমল্লিক-করকমলে/ নববর্ষ, ১৯৫২/ শ্রীঅরবিন্দআশ্রম/
পন্ডিচেরি/ দিলীপদা”^{৬৩}

নাটকের ‘ভূমিকা’য় নাট্যকার দিলীপকুমার রায় লিখেছেন যে নাটকটি আমি লিখি প্রথমে ইংরেজি অমিত্রাঙ্করে। আমার তিনটি উদ্দেশ্য ছিল;

প্রথম উদ্দেশ্য ছিল চৈতন্যদেব সম্বন্ধে আমার ভক্তিনিবেদন করা।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, চৈতন্য সম্বন্ধে আমার যে ধারণা তাকে সাধ্যমত রূপ দেওয়া।

তৃতীয়ত উদ্দেশ্য, অবাঙালিদের মধ্যে চৈতন্যের মহিমা-প্রচার করা।

নাট্যভূমিকায় দিলীপকুমার রায় আরো জানিয়েছেন যে ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চৈতন্যদেবের জন্মভূমি নবদ্বীপে গিয়েছিলেন কিছু কিছু তথ্য ও ভক্তি সংগ্রহ করার জন্য। সেখানে চৈতন্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও প্রেরণা তাঁকে এই নাটকটি লেখায় উৎসাহিত করে। কিন্তু নাটকটি লেখার সময় তিনি তথাকথিত ইতিহাসের উপর পুরোপুরি নির্ভর না করে কল্পনার উপরও নির্ভর করেছিলেন। তাঁর ‘শ্রীচৈতন্য’ নামের নাটকটি তাই ঐতিহাসিক তথ্য ও কাল্পনিক সত্যের উপর আধারিত। সীতা চরিত্র চিত্রণে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যেভাবে ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে নিজের কল্পনা ও দর্শনকে নাট্যরূপ দিয়েছেন, ঠিক একইভাবে চৈতন্যদেব সম্বন্ধেও তিনি একই পথ অবলম্বন করেছেন। নিজের কল্পনাকে নিরঙ্কুশ রাখার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন-

“চৈতন্যদেব সম্বন্ধে অবাঙালিরা বেশি কিছু জানেন না—দুই একজন পণ্ডিত ছাড়া। শঙ্করাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ—এঁদের কীর্তি-কলাপ বাংলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু চৈতন্যদেব অবতারকল্প মহাপুরুষ হওয়া সত্ত্বেও জগতে তাঁর প্রচার খুব বেশী হয়নি। আমি সাধ্যমত চেয়েছি তাঁর মহিমা অবাঙালিদের মধ্যেও খানিকটা বিজ্ঞপ্ত করতে। এ-জন্যেও আমি চৈতন্যদেব সম্বন্ধে অনেক কিছু রটনাকে বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি। এবিষয়ে আমি স্বামী বিবেকানন্দের মহৎ পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি। তিনি বলতেন ঠাকুরের সম্বন্ধে বিদেশে প্রচার করবার সময়ে এমন অনেক তথ্য চেপে যেতে হয় যা বিদেশে প্রচার করলে উল্টো উৎপত্তি হবারই সম্ভাবনা। তাঁর এ-কথাটি শুধু যে গ্রহণীয় তা নয়, শ্রদ্ধেও তথা আদরণীয়ও বটে। কাছ থেকে দেখা অনেক কিছুর পরিপ্রেক্ষিত বদলে যায় দূর থেকে দেখতে গেলে। মহাপুরুষদের চরিত্রের যেটা প্রাদেশিক দিক—তাঁদের যেসব আবেদন সার্বভৌম নয়,

যে-সব আবেদন ব্যক্তিগত তাঁদেরকে সর্বজনগোচর করতে গেলে তাদের মানবুদ্ধি না হয়ে মানহানিই হয়, একথা মহামনীষী বিবেকানন্দ বুঝতেন। তাঁকে নমস্কার।”^{৬৪}

‘শ্রীচৈতন্য’ নাটকটির কাহিনিগত কালপর্ব ধরা হয়েছে ১৫১০ খ্রীঃ। নাট্যকাহিনির সূচনায় দেখা যায় যে মহাপ্রভুর জননী শচীদেবী তাঁর ইষ্ট দেবতা বিষ্ণুর পূজা করছেন। বিষ্ণুর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে কীর্তন শুরু করেন—

“এসো এসো নাথ, অতিথি আমার হও প্রাণে আজ করুণা করি।/
হারাই-হারাই মনে হয় যার—লহ গৃহে তার পূজা শ্রীহরি! / ঝরায়ে
নয়ন-অশ্রু মোহন! / ধুয়ে দেব দুটি কমলচরণ, / হৃদয়-কমল করি
নিবেদন কুসুমকোমল শ্যামলে বরি.. / যা কিছু আমার গণি আপনার—
করো হে তোমার রিঙ করি।”^{৬৫}

এরপর শুরু হয় চোদ্দ বছর বয়সী চৈতন্যের সঙ্গে শচীমাতার কথোপকথন। এই সময় গোরা কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা। তিনি শচীমাতার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছেন। মার কাছে অনুমতি চেয়ে গোরা বলেছেন—

“তবে বলি কেন আমি এসেছি মা। আমি চাই আজ অনুমতি
সন্ন্যাসের। সব ছেড়ে আমি অবধূত ভিক্ষাজীবী হ’য়ে মাগো নামগান করিব
কৃষ্ণের।”^{৬৬}

পুত্রের কথা শুনে মা হতবাক হয়েছেন। গোরাকে শচীমাতা গভীর মনোদুঃখে বলেছেন—

“বুঝিতে চাই না কেন—শুধাস নিমাই? শোন তবে;/ নহি রে অবুঝ
আমি, নহি অন্ধ, শুধু মাতৃহিয়া/ স্বভাবদুর্বল কত—কী জানিবি তুই রে,
সন্তান?/ প্রসূতি অঙ্গজ মাঝে দেখে যে কেমনে আপনারি/ গূঢ়তম
আবির্ভাব—নবজন্ম লভি তারি বুকে,/ সে জন্মের সাথে তার অবিচ্ছেদ্য
কী রহস্যময়/ যোগসূত্র—জানে শুধু সে—দিয়েছে জন্ম যে শিশুর,/ এ নয়
রে অনুযোগ—জানি যবে, দোষ কারো নয়,/ দায়িক অদৃষ্ট শুধু-পরিহাস-
নাট্যলীলা সম/ গড়ে লীলাতরে যারে নিষ্করুণা নটিনী নিয়তি!”^{৬৭}

শচীমাতা গোরাকে নিজের বুকের কাছে টেনে নেন। গোরা মাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে এই ক্ষুদ্র জীবনের গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকে জীবন কাটানোর জন্য তাঁর আবির্ভাব নয়। তাঁর জন্ম হয়েছে জনে জনে কৃষ্ণনাম প্রচারের জন্যে।

নাটকটির দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের নাম ‘দ্বন্দ্ব’। নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটের একটি দৃশ্য। সেখানে কেশব পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, রমা নামে এক দরিদ্র বিধবা এবং চৈতন্যের উপস্থিতিতে নাট্য কাহিনি অগ্রসর হয়েছে। তাঁদের তর্কযুদ্ধে উঠে এসেছে তৎকালীন সমাজ জীবনের কথা, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম-দর্শনের নানা প্রসঙ্গ, পাণিনির ব্যাকরণের রীতি নিয়ম ইত্যাদি। উঠে এসেছে চৈতন্যের প্রতি কেশব পণ্ডিতের অবজ্ঞার কথা। কেশব পণ্ডিত অবজ্ঞাভরে চৈতন্য প্রসঙ্গে বলেছেন —

“জানি জানি—কলিযুগ-নষ্টচন্দ্র আজ পূর্ণকলা—দুগ্ধপোষা শিশু যবে পায়
‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি বিনা ন্যায় ব্যাকরণ দর্শনের লেশ-পরিচয়।”^{৬৮}

তখন রমা প্রতিবাদ করে কেশব পণ্ডিতকে বলেছেন যে গৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপের কুলীন সমাজে বিদ্যার গৌরবে পরিচিত হয়ে আছেন। ব্যাকরণ ও ন্যায় শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য আছে। কয়েক বছর আগে কাশ্মীরের এক দিগ্বিজয়ী সুপণ্ডিত এসেছিলেন নবদ্বীপে, তাঁকেও তিনি পরাজিত করেছিলেন নিজের বিদ্যার পারদর্শিতায়। রমার এই কথাগুলি কেশব ভারতী লোকপ্রচলিত মিথ্যা জনশ্রুতি বলে অস্বীকার করেন। নিমাইকে তিনি ‘অপোগণ্ড’ বলে ধিক্কার দিয়ে নিজের পাণ্ডিত্যের অহংকার প্রকাশ করেন। রমাকে ধিক্কার দিয়ে কেশব ভারতী বলেন—

“পাণিনির কী জানিবে অপোগণ্ড নিমাই তোদের? বৃথা কেন প্রগলভতা—
প্রশ্নছলে তর্কের ভঙ্গিমা? পাণিনি মনীষী, কবি, পরিভূ, সমমু—ত্রিলোকের
সর্বতত্ত্ববেত্তা—শুধু নির্বোধের সংসদেই তাঁর বৈয়াকরণিক নাম। গ্রন্থ তাঁর
বেদভাষ্য সম সার্বভৌম গুহ্যতত্ত্ব করেছে প্রাজ্ঞল। তাঁর প্রভা জীবন ও
নিয়তির ছায়া-মেঘ দীর্ণ করি—তার নেপথ্যে কী আছে তারে করেছে
মর্তলোকে। হেন পাণিনির তুই চাহিস করিতে অমর্যাদা?”^{৬৯}

একথা শুনে রমা দুঃখে কাঁদতে থাকেন। ঠিক তখন তটভূমির উপর থেকে চৈতন্য কৃষ্ণনাম করতে করতে এগিয়ে আসেন; রমা শ্রীচৈতন্যের চরণে পতিত হন। মুরারি চৈতন্যকে করজোড়ে প্রণাম জানান। কেশব ভারতী চৈতন্যের দিকে তাকিয়ে উপেক্ষাভরে মৃদুভাবে হাসেন। এরপরই কেশব পণ্ডিত চৈতন্যকে আক্রমণ করে বলেন—

“রমণীসুলভ এই উচ্ছ্বাস তোমার। ধরণীতে অবতীর্ণ হন নাই শুধু
গুল্মলতাগণে করিতে পবিত্র। নহে উদ্ধবের বৈষ্ণব ক্রন্দনে, পার্থসারথির

দিশাদাতার রূপেই ধনঞ্জয়ে দেখায়েছিলেন তিনি বিশ্বরূপ—মুক্তি দিতে তারে হৃদয়দৌবল্য হতে, জানো না কি তুমি?”^{৭০}

কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর কথার কোন উত্তর দিলেন না। তাঁর সমস্ত সত্তায় কৃষ্ণনাম যেভাবে জড়িয়ে আছে, তাতে কৃষ্ণই তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, জীবনের একমাত্র সাধনা। তিনি কেশব পণ্ডিতকে বলেন—

“সেদিন আমার কবে হবে প্রভু বলো, বলো, বলো—না থাক্—উচ্ছ্বাসী বলি হয়ত হাসিবে পুনরায়। কিন্তু বলো কী বলিব এ-প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে তব? কৃষ্ণ যদি ধরে মূর্তি নয়নে আমার কোনোদিন... সেদিন...সেদিন... কিছু চাহিবার থাকিবে কি আর? আমার তনুর প্রতি অণু যাঁর দর্শনের তরে আবাল্য আকুল—যাঁর ঘরছাড়া বাঁশি শুনি আজ প্রিয়জন ঘনমান ছেড়ে আমি যেতে চাই দূর বৃন্দাবনে সর্বহারা—সে-বল্লভ যদি আচম্বিতে আমারে সম্ভাষে—আমি কী চাহিব তাঁর পাশে- আমি আজিও কি জানি প্রভু? = না না, জানি জানি। শোনো আমি কী চাহিব- চাহে যদি দিতে বরদান প্রাণাধিপ।”^{৭১}

একসময় কেশব পণ্ডিত নিজের মিথ্যা বিদ্যার অহংকার থেকে বেড়িয়ে আসেন। বুঝতে পারেন বিদ্যা, কীর্তি, ধন, মান এসবের কোনো অর্থ নেই, একমাত্র কৃষ্ণনামই চিরন্তন সত্য। তাই নির্দিধায় তিনি মহাপ্রভুকে বলেন-

“এ-প্রথম আলাপে তোমার সাথে হৃদয়ে আমার উপজিল সত্য স্নেহ— দেখি তব প্রতিভার সাথে শালীনতা। মহাবংশে জন্ম তব স্বভাব -কুলীন তুমি, আছে বিকাশের সম্ভাবনা তোমার, সমাজে হবে তুমি মহনীয়— প্রতিপদে চলো যদি সুমতি-সঙ্কেতে মোহের উচ্ছ্বাস ছাড়ি। দেখিনাই তোমারে কখনো। মুখে তব রূপ, নেত্রে গভীরতা। শুনিয়া তোমার আচরণ লোকমুখে—করেছি তোমার প্রতি আমি অবিচার ভ্রান্তিবশে।”^{৭২}

কেশব পণ্ডিত জ্ঞানের দীক্ষা দিতে চেয়েছেন নিমাই পণ্ডিতকে। কিন্তু নিমাই জানান তাঁর কাছে সময় নেই। কারণ তিনি অতি শীঘ্র ত্যাগ করবেন নবদ্বীপ, সমাজ- সংসার, গ্রহণ করবেন সন্ন্যাস এবং যাত্রা করবেন বৃন্দাবন অভিমুখে; যেখানে তাঁর আরাধ্য দেবতা কৃষ্ণ অছেন। এইসময় মহাপ্রভু বলেন—

“শত্রুর নিন্দার তথা মিত্রের স্তবনে এ-জীবনে কিছু যায় আসে না পণ্ডিত। সবি দুদিনের খেলা, বুদ্ধদ রঙিন মেলা—এই আছে, এই নাই। শুধু কৃষ্ণের অনুমোদন তরে যাপে জীবন মানব। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর যবে করি চলত আপন অভিমানী স্বার্থবুদ্ধি—হারাই তখনি ধ্রুবদিশা। যে পেরেছে তাঁর অনুমোদন, প্রসাদ—তার কাছে বিশ্বের প্রশংসা নিন্দা সম-অর্থহীন—ছায়াময়।”^{৭৩}

মুরারি যখন চৈতন্যকে প্রশ্ন করেন যে তিনি কেন সন্ন্যাস নিয়ে নদীয়া ত্যাগ করে বৃন্দাবন যেতে চান, তখন চৈতন্য জানিয়েছেন যে কৃষ্ণের বাঁশীর ডাক তিনি শুনেছেন। এছাড়াও কৃষ্ণনাম সর্বজনে প্রচারের লক্ষ্যে তিনি বৃন্দাবনগামী হবেন। কৃষ্ণপ্রেমে চৈতন্যদেব আত্মহারা। তাঁর কাছে সমাজ, সংসার শূন্যময়। কেশব ভারতী একসময় তর্কযুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন কৃষ্ণপ্রাণ চৈতন্যের কাছে। শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশে সমাধিস্থ হওয়া দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে মুরারি তাঁকে প্রণাম করলেন, কেশব পণ্ডিত অশ্রুনেত্রে করজোড়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

নাটকের তৃতীয় অঙ্কের নামকরণ করা হয়েছে ‘সিদ্ধি’। এই অংশে কৃষ্ণভক্ত নিমাই পণ্ডিত কেশব ভারতীর কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম নিয়ে পরিব্রাজক রূপে ভারত ভ্রমণ শুরু করেন। এক বছর পরে তিনি নবদ্বীপে ফিরে আসেন শচীমাতা ও পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গে দেখা করার জন্যে। বিষ্ণুপ্রিয়া তখন সন্ধ্যা-আরতি করছেন এবং ইস্টদেবতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন একটিবার প্রাণপ্রিয় স্বামী চৈতন্যের সাক্ষাতের জন্য—

“ধীরে ধীরে নাথ, হয় বুঝি জানাশোনা যেপথে তোমার করুণার আনাগোনা। তবু কাঁদে প্রাণ—কোথা সে-বন্ধু—যার আঁখিপাত বিনা ভুবন অন্ধকার—যার তরে হিয়া যুগে যুগে বৈরাগী? বেলা যায়—ধ্রুবতারা। দেখা দিবে না কি?”^{৭৪}

এরপরেই অপ্রত্যাশিতভাবে জনকোলাহলের মাঝে চৈতন্যকে সাক্ষাৎ-দর্শন করেন বিষ্ণুপ্রিয়া। কাহিনিতে আসে জগাই- মাধাইয়ের মতো পাষাণের কথা, যাঁরা চৈতন্যের কৃষ্ণনাম সংকীর্তনকে ধাপ্লাবাজী এবং নিজ স্বার্থচরিতার্থের জন্য অবলম্বিত পথ বলেছেন। এমনকি চৈতন্যের কাজকর্মকে ভাঙামী বলে দাবী করেছেন। মাধাই বলেছেন—

“নিমাইটা ডুবে ডুবে জল খায় কি না- করে তাই সর্ব কর্ম পণ্ড হরি হরিনামে জেনে শুনে।...তবে কিবা বিনা বিনাশ্রমে চল ডাল পেলে কে বা করে উপার্জন?... তবে কিনা এখানে এ-নবদ্বীপে বেঁচে আছে দুর্দান্ত দুভাই।”^{৭৫}

জগাই নিমাইকে ভয় দেখান, সাবধান হতে বলেন। কিন্তু চৈতন্য মৃদু হেসে তাঁদের শান্তভাবে বুঝিয়ে দেন —

“চিন্তে যার আছে গ্লানি ভাই—মন মুখ নয় যার এক আজো। আমি পেয়ে অসঙ্গ অভয় কেন হব সাবধান বল? আমি বলি নি কি ওরে বধিব তোদের—কৃষ্ণপ্রেম স্নিগ্ধ কুসুমকোমল? কিন্তু লীলা বিচিত্র তাঁহার-- বৈষম্যের সে- সম্রাট বিন্দুকে রাখেন সিন্ধুরে। তাই সে কোমলতম প্রেম তাঁর প্রয়োজনে ধরি রূপ বর্ম সুকঠিন, করে রক্ষা ভঙে তাঁর অহর্নিশ- অম্বরীষে- যথা সুদর্শন চক্র—আছে ভাগবতে। এ নয় কাহিনী গাহিলেন যবে চিরভক্তাধীন তিনি ভাবে।”^{৭৬}

জগাই-মাধাইয়ের কাছে ধর্ম নয়, অর্থই প্রধান; পাপ-পুণ্য দুই সমান। মদ্যপ জগাই-মাধাই নেশার ঘোরে চৈতন্যকে কলসীর কানা দিয়ে কপালে আঘাত করেছেন। চৈতন্যের কপাল থেকে রক্ত ঝরে পরে। ভক্তরা প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠেন এবং তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পরে মারার জন্য। কিন্তু চৈতন্য তাঁদের বাধা দেন এবং জগাই মাধাইয়ের অপরাধ ক্ষমা করেন। জগাই-মাধাই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে চৈতন্যের কাছে অপরাধের জন্য ক্ষমা চান এবং বলেন — ‘নারকী আমরা প্রভু, তুমি ক্ষমা না করিলে হয়-’। প্রত্যুত্তরে চৈতন্য তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। জগাই- মাধাইসহ সকলে মিলে কৃষ্ণনাম শুরু করেন। নাটকটিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার নারী হৃদয়ের বিরহের যন্ত্রণাটিও ধরা পরেছে। চৈতন্যের কাছে যেরূপে কৃষ্ণ সাধনা প্রধান, ঠিক সেইভাবেই বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরের একমাত্র দেবতা স্বামী চৈতন্য। তাঁর অনুপস্থিতিতে নারী জীবনের রিক্ততা অনেকটা বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে।

দিলীপকুমার রায়ের ‘শ্রীচৈতন্য’ নাটকের প্রধান চরিত্র শ্রীচৈতন্য। বিদ্যা-দর্শন-ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ এবং আধ্যাত্মিক মহিমামণ্ডিত চৈতন্য দেবের চরিত্র সত্যিই মধুর। পূর্বে লিখিত চৈতন্য জীবনীকারদের চৈতন্যমহিমা এখানে সম্পূর্ণ রূপে বজায় আছে। তাঁদের ভাবনার সঙ্গে একালের ভাবনা যুক্ত করে নাট্যকার দিলীপকুমার রায় নাটকটিকে আধুনিক পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে শচীমাতার

কথোপকথন, নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা, মাতৃ হৃদয়ের ক্রন্দন, কেশব ভারতীর সঙ্গে তর্কযুদ্ধ, সন্ন্যাস গ্রহণ, জগাই- মাধাইয়ের মতো দুষ্টির দমন, বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাঁকে সান্তনা প্রদান- প্রতিটি ঘটনা একালের সমাজ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা হয়েছে। নাটকটির কোথাও চৈতন্যের আধ্যাত্মিক মহিমা এমনভাবে প্রচার করা হয়নি, যেখানে বাস্তব মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে খণ্ডন করে। চৈতন্যদেব যখন মার কাছে এসে মনের অভীষ্পা ব্যক্ত করেছেন, তখন মায়ের প্রতি তাঁর সন্তানতুল্য ভক্তি প্রকাশ পেয়েছে -

“করুণ নয়নে হেন চেয়ো না মা, নয়নে আমার। বুঝিতে পারো না কি মা—কী বেদনা বহি আমি আজ এসেছি তোমার কাছে সন্ন্যাসের তরে? জানো না কি ভগবান্ ডাকে যবে—রহিতে পাবে না ভক্ত ঘরে?”^{৭৭}

প্রত্যুত্তরে শচীমাতাও সর্বকালের মায়ের মতোই বলেছেন—

“যে পণ আমার গোরা, রাখিব রাখিব আমি আজ, করিব না ভয়—যদি তোর তরে কেঁদে কেঁদে ওরে, অন্ধ হয় দুনয়ন—যবে তুই যাবি দূরে চলে।”^{৭৮}

আবার কেশব ভারতীর সঙ্গে কথোপকথনের সময় চৈতন্যের প্রতিটি কথায় ধরা পরেছে একালের প্রকৃত ধার্মিক, সৎ মানুষের হৃদয়গত পরিচয়টি। যখন কেশব পণ্ডিত তাঁকে ন্যায়শাস্ত্র ও পাণিনির ব্যাকরণের কথা বলে নিজের বিদ্যার অহংকার জাহির করেছেন, তখন নিমাই পণ্ডিত তাঁকে বিনয়ের সঙ্গে জানিয়েছেন—

“তখন কেমনে আমি কোন্-সে স্পর্ধায় বলো চাই সে- দুরবগাহ মায়ামানবের পেতে প্রভু, পার? নহি তো তোমার তুল্য দুর্বর্ধ অজেয় তত্ত্ববিধ তোমার দুরদৃষ্টর স্বধর্মে করো হে অধিষ্ঠান, শ্রীকৃষ্ণের পারদর্শী। আমি দীন, শিবনেত্রহীন।”^{৭৯}

চৈতন্য সত্তায় কৃষ্ণই একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান। সেখানে বিদ্যা, অর্থ, কাম, মোহ— সমস্তই তাঁর কাছে অর্থহীন, নিরাকার। কেশবভারতী গুরুদেব চরিত্র। তিনি নিঃসন্দেহে নানা শাস্ত্রে, বিদ্যায়, বৈষ্ণব দর্শনে সুপণ্ডিত। কিন্তু তাঁর মধ্যে অহংকার ছিল। এক সময় তাঁর মধ্যে বিবেকের জাগরণ ঘটে। তিনি চৈতন্যকে নিজের করে পেতে চান। মিথ্যা বিদ্যার অহংকার ত্যাগ করেন। চৈতন্যকে নিজের বহুকষ্টে অর্জিত জ্ঞান দান করতে চান—

“অভিজ্ঞের উপদেশ তাই বৎস, পরম কাণ্ডারী। জ্ঞান লভ্য শুধু বহু সাধনায়। সেই জ্ঞানে আমি দিতে চাই দীক্ষা আজ তোমারে তোমারি শুভতরে।”^{৮০}

কেশব ভারতী একালের একজন প্রকৃত শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। চৈতন্যকে শিক্ষা দান করতে না পারলেও দীক্ষা দিয়েছেন। নাটকের অন্তিম লগ্নে একবছর পর নবদ্বীপে নিজের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছেন মহাপ্রভু। সেখানে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর কথোপকথনে বৈষ্ণব পরিবারের আপন দাম্পত্য সম্পর্কের ছবি ধরা পরেছে। এখানে চৈতন্যের সংসার বিমুখতা এবং বৈরাগ্যকে বিষ্ণুপ্রিয়া ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করলেও নিজের জীবনের রিক্ততা, অসহায়তাকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারেন নি। তাই স্বামী চৈতন্যের সাক্ষাৎ পেয়ে তাঁকে শান্তভাবে বলেছেন—

“শোনো তবে আজ আমি করিব প্রকাশ—এতদিন তোমারেও বলি নাই যাহা আমি—আশ্রয় তোমার লভিয়া করিনি তবু পরিপূর্ণ বিশ্বাস তোমারে。”^{৮১}

এখানে বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর প্রেম বঞ্চিত এক নীরব প্রতিবাদী নারী, যার মধ্যে ফুটে উঠেছে একালের নারীবাদের সুর। মহাপ্রভু তাঁকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেও তিনি নিজে অনুভব করেছেন স্বামী বঞ্চিত নারীর হৃদয়ের যন্ত্রণাকে। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য মনে মনে অনুশোচনা করেছেন। নাট্যকার চৈতন্যভাবনার সঙ্গে যুক্ত করেছেন জগাই-মাধাইয়ের প্রসঙ্গটি। তাঁদের মাধ্যমে নাট্যকার একালের মদ্যপ, নেশাখোর খারাপ মানুষের রূপচিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। চৈতন্যের উদার মানবপ্রেমের কাছে তাঁরা একসময় আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁদের ভাব-ভাষা, কথা বলার ভঙ্গী এবং নেশা করার রীতি নাটকটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে নিশ্চিতভাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে আছে নাট্যসংলাপের আধুনিকীকরণ। এইভাবে একালের ভাবনায় জারিত করে নাট্যকার দিলীপকুমার রায় ‘শ্রীচৈতন্য’ নাটকটিকে আধুনিক নাট্যভাবনার ফসল করে তুলেছেন। ফলে ষোড়শ শতকের চৈতন্য কথা একালে নতুনভাবে পুনর্নির্মিত হয়েছে।

শিবংকর চক্রবর্তী - নবজাগরণ (২০১৫);

২০১৫ খ্রিস্টাব্দে শিবংকর চক্রবর্তী চৈতন্য ভাবনাকে অবলম্বন করে লেখেন ‘নবজাগরণ’ নামের একটি নাটক। ২৪ সে.মি লম্বা ও ১৮ সে.মি চওড়া এই নাটকটি ‘অসময়ের নাট্য ভাবনায়’ নামে নাট্য পত্রিকায় প্রকাশিত। নাটকটির প্রচ্ছদপত্র (১),

নামপত্র (১), মূল নাটক (১৫) সহ মোট ১৭ পৃষ্ঠা আছে। নাটকটির প্রচ্ছদপত্রটি এইরূপ-

“গ্রাম বাংলার একমাত্র নাট্যমুখপত্র / অসময়ের/ নাট্য ভাবনা”^{৮২}

নাটকটির নামপত্রটি এইরূপ -

“সৃষ্টি ও সংগ্রামের ২২ বছর / গ্রাম বাংলার একমাত্র
নাট্যমুখপত্র/ অসময়ের নাট্য ভাবনা/ সম্পাদক- রঙ্গন দাশগুপ্ত/
বেঙ্গল লোকমত প্রিন্টার্স প্রা. লি. ১০বি ক্লিক লেন, কলকাতা
১৪।”^{৮৩}

নাটকের চরিত্রলিপিটি এইরূপ -

“চরিত্র/সেপাই, জমিদার, ভট্টাচার্য, নেদো, চক্রবর্তী,
বাচস্পতি, অদ্বৈতাচার্য, ভামিনী, কিরণ, নিমাই, এবং
ঈশ্বর।”^{৮৪}

নাটকটি রঙ্গন দাশগুপ্তের সম্পাদনায় বেঙ্গল লোকমত প্রিন্টার্স প্রা. লি. ১০বি ক্লিক লেন, কলকাতা ১৪ থেকে প্রকাশিত। বিষয়বস্তুতে রয়েছে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কাল। নবদ্বীপ-শান্তিপুর-রাঢ় বাংলার মুসলমান শাসকদের অত্যাচার এবং চৈতন্যের সমাজ-সংস্কার তথা মানবজাগরণের কথা। নাটকটির মূল্য একশত টাকা।

‘নবজাগরণ’ নাটকের শুরুতে চৈতন্য প্রসঙ্গে নেপথ্যে একটি ঘোষণা শোনা যায়। সেখানে

বলা হয়েছে —

“মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্ম ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে। তখন সুবে বাংলার রাজধানী গৌড়। সিংহাসনে জালালুদ্দিন ফতে শাহ। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের কর্ম এবং সাধনার সময় বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। ঠিক সেই সময় আমাদের অনুসন্ধানে নবদ্বীপ, শান্তিপুর এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল।”^{৮৫}

নাটকটিতে সেপাই ও জমিদারের কথোপকথনে তৎকালীন সমাজজীবনের অত্যাচারের কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে—

“সেপাই- পাঁচহাজার টাকা—কথা ছিল তুই জমা দিবি নবাবের খাজাঞ্চি খানায় দশদিন আগে। আজও টাকাটা জমা পড়ল না কেন? বল—বল—শুয়ার।

জমিদার- বলছি— বলছি— দোহাই তুমি তো জানো সেপাই— এ বাংলায় তোমাদের হাত থেকে আমাদের কারো রেহাই নেই। টাকা যখন চেয়েছো দিতেই হবে। দেবো বলেছিও তো—তবে কেন অস্ত্রটা বুকের কাছে ঠেকিয়ে ভয় দেখাও। ওটা সরান জনাব—”^{৮৬}

এই প্রসঙ্গে উঠে এসেছে হিন্দুধর্মের প্রতি ইসলামধর্মের মানুষের বিদ্বেষের পরিচয়টি। সেইরূপ একটি নাট্যমুহূর্ত —

“জমিদার- সোনাদানা ঘরে তো তেমন কিছু নেই হুজুর। যেটুকু আছে সবটাই আমার কুলদেবতা রাধামাধবের গায়ে। তার অঙ্গ খালিকরে— তাতে কি আপনাদের মঙ্গল হবে? হাজার হলেও হিন্দু হলেও তিনি তো দেবতা-আমার কুলদেবতা রাধামাধব।

সেপাই- তোর রাধামাধবের মুখে মুতি। টাকাটা কবে দিবি বল?... শোন— সাফ সাফ বলে যাচ্ছি— দশদিন সময় দিলাম। ঠিক দশদিন- তার মধ্যে টাকা খাজাঞ্চিতে না পৌঁছালে তোর রাধামাধবকে খাবো—তোর বৌ মেয়েকে খাবো—তাকে চিতেয় তুলবো।”^{৮৭}

শুধু জমিদার নয়, নেদোর মতো দিন মজুরও তাঁদের অত্যাচার থেকে রেহাই পান না। নেদো যখন বলেন—‘ঠাকুর—শরীলটা যে বইছে না। ঘরে চাল নেই। বৌটা ধুকছে- মেয়েটা।’ ভট্টাচার্য প্রতিবাদী ভাষায় বলেন—

“মরণাপন্ন-আর-আর কি শোনাবি?... আবার! দেনা করে করে নিজের জমি ঘর সব আমার জিম্মায় ঠেলে দিয়েছিস। টাকা শোধ দেওয়ার কোনও নামগন্ধ নেই— উপায়ও নেই। এখন আমার জমিতে বেগার খাটবি এই কড়ারে তোকে ধার দেওয়া। তা এখন সে সব যদি তুই ভুলতে চাস তবে তোর বন্ধকি তমসুক আমাকে সিন্দুক থেকে বার করতে হয়। ওরে পাঁঠা—বৌ-মেয়ের হাত ধরে গাছতলায় দাঁড়াবি? সেটা কি ভালো হবে?”^{৮৮}

ভট্টাচার্য নেদোর অসহতার সুযোগ নিয়ে বলেন—

“বৌ-মেয়ে নিয়ে চিন্তা কী? তারা এ ঘরেই থাকবে? আমার জিন্মায়। ভালো মতো দুধ-ঘি জোগাতে পারলে তোর ঐ বৌ মেয়েই তো রাধা - উরবসী হয়ে যাবে রে— যাবে না?”^{৮৯}

তখন কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজে একঘরে হওয়ার প্রবণতা যে কত প্রবল ছিল, তা বোঝা যায় ব্রাহ্মণ বাচস্পতির উপর অত্যাচারে। তার মেয়ে নিরুপমা স্বামীর মৃতদেহ সৎকারের সময় সহমরণে যেতে চায়নি; পালিয়ে গেছে নীচু জাতের চামার মজুরের সঙ্গে। তাই ব্রাহ্মণ সমাজপতি চক্রবর্তীমশাই বাচস্পতিকে নির্দেশ দিয়েছেন—

“তোমার মেয়ে কুলত্যাগী হয়েছে। শূদ্রের হাত ধরে ঘর ছেড়েছে। তাই...আজ থেকে তুমি আর ব্রাহ্মণ সমাজে ঠাই পাবে না। কোন পূজা পার্বণে তোমাকে আর কোনও যজমান ডাকবে না। শুধু তাই নয়— আজ থেকে তোমার টোলও আমরা বন্ধ করে দিলাম।... হিন্দু ধর্মে আমাদের ব্রাহ্মণত্বের পবিত্রতা রক্ষা করতে আজ থেকে তোমাকে আমাদের ব্রাহ্মণসমাজ থেকে বহিস্কার করলাম।”^{৯০}

এরপর নাটকে আসে অদ্বৈত এবং নিমাইয়ের প্রসঙ্গ। একজন অপরিচিত নারীকে নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাট থেকে উদ্ধার করেন নিমাই। তাকে নিয়ে তিনি উপস্থিত হন গুরুদেবের বাড়িতে। গুরুদেবকে নিমাই বলেন-

“এরপর কী করা উচিত- কীভাবে মেয়েটিকে বাঁচানো যায়— সেই সব ভেবেই মেয়েটিকে নিয়ে আপনার দ্বারস্থ হয়েছি গুরুদেব।”^{৯১}

মেয়েটির নাম কিরণ। মেয়েটি বাঁচতে চায়। কিরণ বলে —“আমি যে বাঁচতে চাই ঠাকুর”, নিমাই তখন স্বধর্মের বিরোধিতা করে বলেন—

“এটাই জীবনের ধর্ম— বেঁচে থাকার জন্যে তীব্র লড়াই করা। আর সেখানে কে চায়— কে চায় আপনারা বলুন তো শুধুমাত্র মৃত্যুর পর স্বর্গলাভের আশায়—স্বজ্ঞানে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিতে?”^{৯২}

ধর্মের নামে একদল মানুষ যেভাবে সতীদাহ প্রথার প্রচলন করে পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করেছেন, তা সংস্কারমুক্ত, উদার মনের মানুষ নিমাই কিছুতেই মেনে নিতে

পারেন নি। তাই তিনি প্রতিবাদ করেছেন। কিরণ তার বাবার ঘরেও জায়গা পায়নি। বাবার বাড়িতে গেলে সেখানে খারাপ ব্যবহার পেয়েছে। কিরণ বলে-

“গিয়েছিলাম। মা কথা বলে নি— শুধু মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কেঁদেছে। বাবা ঘরে ঢুকতে দেয়নি— দাদা বলেছে আবার ফিরে এলে নতুন করে চিতা বানিয়ে আমাকে পুড়িয়ে মারবে।”^{৯০}

একজন মুসলমান সিপাই যখন নারীটিকে লোভের শিকার বানাতে চায়, তখন নিমাই আধুনিক যুক্তিবাদী মানুষের মতো প্রতিবাদ জানান এবং তাকে ভয় দেখান। মেয়েটিকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেন। এরপর কাহিনিতে আসে নিমাইয়ের আধ্যাত্মিক সাধনার পর্ব। গুরুদেব অদ্বৈতাচার্য নিমাইকে দীক্ষা দেওয়ার প্রসঙ্গে বলেছেন-

“তোমাকে দীক্ষা দেবার অধিকার আমার নেই নিমাই। তোমাকে দীক্ষা নিতে হবে ঈশ্বরপুরীর কাছে। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ এখন गयाতে অবস্থান করছেন। তুমি তার কাছে যাও—দীক্ষা নাও—এই পতিত দ্বিধাবিভক্ত হিন্দু সমাজকে তুমি একসূত্রে বাঁধো নিমাই। এটাই তোমার কাজ। ঈশ্বরের নির্দেশে এটাই তোমার লক্ষ্য নিমাই— এক বর্ণহীন শ্রেণীহীন হিন্দু সমাজের প্রতিষ্ঠা— সেটাই তোমার প্রতি আজ নির্দেশ নিমাই।”^{৯১}

গুরু ঈশ্বরপুরীর কাছে উপস্থিত হয়ে নিমাই বলেছেন—

“আমাকে দীক্ষা দিন গুরুদেব। আমি মানুষের দুঃখ মোচন করতে চাই। আমি হিন্দু জাতির মধ্যে এত বিভেদ ঘোচাতে চাই। আমি ধর্মের চেয়ে মানুষ অনেক বড় একথা সবাইকে বলতে চাই। আমাকে আপনি দীক্ষা দিন গুরুদেব।”^{৯২}

অদ্বৈত এবং ঈশ্বরপুরী দুজনেই বুঝতে পেরেছেন, একমাত্র নিমাই পারবে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করতে তথা বৈষ্ণব সমাজ ও বাঙালি সমাজকে শুধরে দিতে। নিমাই যখন ঈশ্বরপুরীকে তাঁর সাধনার পথ নির্দেশ করার জন্য অনুরোধ করেন, তখন গুরুদেব জানান —

“শুধু হরিনাম সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে। হ্যাঁ বৎস হরিনাম-কৃষ্ণনামই আজ এই সময়ে হিন্দুধর্মকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র উপায়।”^{৯৩}

সমগ্র নাটকে নিমাই চরিত্রটিকে একজন উদার সমাজ সংস্কারক মহামিলনের প্রতীক রূপে অঙ্কন করা হয়েছে। এই নাটকটিতে আধুনিক চিন্তা-চেতনার সঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভুর চরিত্রের মহিমা যুক্ত করে নাট্যকার নাটকটির নব নির্মাণ ঘটিয়েছেন।

‘নবজাগরণ’ নাটকের চরিত্রগুলি একালের সমাজ বাস্তবতায় অঙ্কিত হয়েছে। তখন বাংলায় নবাবী শাসনকাল। নবদ্বীপ এবং শান্তিপুর সংলগ্ন অঞ্চলের জমিদারেরা নিদারুণ আর্থিক অনটনে দিন কাটাচ্ছেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষজনের হাতে অত্যাচারিত হয়েছেন বৈষ্ণবধর্ম তথা হিন্দুধর্মের লোকজনেরা। ধর্মান্তরিত করার চেষ্টাও রয়েছে গোপনে গোপনে। সাধারণ মানুষ কাজীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন। এইরকম এক জটিল আবর্তে নাটকের প্রতিটি চরিত্র জীবন্তরূপে প্রকাশ করেছেন। এই প্রেক্ষাপটে কৃষ্ণভক্ত নিমাইয়ের সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা এবং মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা, বৈষ্ণব ধর্মের প্রচায় ও প্রসার তার প্রমাণ। কৃষ্ণনাম সংকীর্তন প্রচার একাধারে বাঙালি জীবনে নবজাগরণ ঘটিয়েছে। এই নবজাগরণ যতটা সমাজ ও মানুষের জীবনভাবনার বাহ্যিকতার সঙ্গে যুক্ত, তার চেয়েও অনেক গভীর আভ্যন্তরীণ হৃদয় সংস্কারের দিকটি। তাই নাটকের সূচনাতে জমিদারের অত্যাচারের প্রসঙ্গ দেখানো হয়েছে। জমিদার চরিত্রটি এখানে সেকালের সমাজ ব্যবস্থার অন্যায়ের দিকটি তুলে ধরতে সহায়তা করেছে। জমিদার যখন সেপাইকে অনুরোধ করে বলেছেন—

“জনাব দয়া করুন। আর কটা দিন সময় দিন। আমি কথা দিচ্ছি—
আপনার নবাবের টাকা আমি ঠিক পৌঁছে দেব।”^{৯৭}

তখন কাজির সেপাই তাঁর মুখে থুতু দিয়েছে। অসহায়তার সুযোগ নিয়ে সেকালে ক্ষমতাবান মানুষ যেভাবে অত্যাচার ও অপমান করতো, এই ঘটনাটি যেন তারই নিদর্শন। এমনকি নেদোর মতো খেটে খাওয়া মানুষ ভট্টাচার্যের মতো ব্রাহ্মণের দ্বারা অত্যাচারিত হয়। ভট্টাচার্য নেদোকে হুমকি দিয়ে বলেছেন—

“তোরা পরিবার বাঁচানোর দায় কি আমার? শোন শালা চামার—কাল
সকালে যদি জমির আলে দেখতে না পাই, তবে কালই তোকে ভিটেমাটি
ছাড়া করবো।”^{৯৮}

নেদোর মতো সাধারণ মানুষের অনুরোধ এ সমাজের উচ্চ-শ্রেণীর মানুষের কাছে কোন মূল্য পায় না। চক্রবর্তীর মতো সাধারণ দীন ব্রাহ্মণের মেয়ে যখন নিচুজাতের ছেলের সঙ্গে গৃহত্যাগী হয়, তখন চক্রবর্তীর মতো সৎ, নিরীহ মানুষকেও সমাজচ্যুত হতে হয়।

এমনকি তাঁর টোল বন্ধ করে দেওয়া হয়, যজমানী বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাঁকে জানে-প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয়। এইভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রাঢ় বাংলার অবক্ষয়িত সামাজের ইতিহাস উঠে আসে নাটকটির নানা চরিত্রের কথোপকথনে। এইরকম সমাজ বাস্তবতায় আমরা পাই যুবক নিমাইকে, যিনি সমাজ কল্যাণকারী এক মানুষ। একসময় অদ্বৈতাচার্যের কথাতে উঠে আসে বৈষ্ণব ধর্মের উপর কঠোর বিধি-নিষেধের প্রসঙ্গটি। স্ত্রী ভামিনীকে অদ্বৈতাচার্য স্কোভের সঙ্গে বলেছেন —

“জানি না—আর কত দিন নামগান চালাতে পারবো। হয় রে পোড়া বাংলা—ঘরে বসে নিজের মতো একটু শাস্ত্র অধ্যয়ন করবো—একটু ধর্মমতে কৃষ্ণের নামগান করবো—সেই স্বাধীনতাটুকুও নেই।”^{৯৯}

অদ্বৈতাচার্য বুঝতে পেরেছেন আসন্ন সমাজ সংকটের কথা, ভারতবর্ষের হিন্দুধর্মের উপর মুসলমান ধর্মের আঘাতের কথা। একদিকে মুসলমান শাসকের পীড়ন, অন্যদিকে ব্রাহ্মণদের দৌরাভ্য—এই দু’য়ের সংঘাতে হাজার হাজার নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষ বাধ্য হচ্ছেন ধর্মান্তরিত হতে। তাঁর দুঃখ নবদ্বীপ-শান্তিপুুরের মতো হিন্দু সংস্কৃতির পীঠস্থানগুলি আজ নরককুণ্ডে পরিণত হচ্ছে। নবদ্বীপের নিমাই ধর্মে বৈষ্ণব হলেও সমাজ-সংসারের সমস্ত বাধা বন্ধন সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। তাই তিনি সহমরণের চিতা থেকে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পরা একটি মেয়েকে বাঁচাতে কোনো দ্বিধা করেন নি। নিমাই অন্যায়কারী জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হন, সেপাইয়ের নারীলোভকে ভয় দেখিয়ে প্রতিহত করেন। নিমাই সেপাইকে বলেন—

“আমি তো জানি বাংলার রাজধানী গৌড়ের সিংহাসনে এখন যে নবাব বসে আছেন তার নাম আলাউদ্দিন হুসেন শাহ। এবং তিনি জানেন হিন্দুধর্মকে চটিয়ে এই বাংলায় রাজত্ব করা যাবে না। আর তাই হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের তিনি সম্মান করেন। কারণে অকারণে রাজদরবারে তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করেন। তাঁর কাছে অদ্বৈতাচার্য বা নিমাই পণ্ডিত এদের নাম অজানা নয়। এবার তুমি জোর করলে তাঁর কাছে খবর পাঠাই—তোমার সম্বন্ধে—এখুনি। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের নিরাশ করবেন না।”^{১০০}

কাজির সেপাই নিমাইয়ের কথায় ভয় পেয়েছেন এবং নিমাইকে অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন —

“ওরে বাবা—নবাব হুসেন শাহ—তিনি আবার এর মধ্যে কেন? না—না—কাজ নেই ম্যালা কাজিয়ায় গিয়ে—মেয়েছেলে আমি অনেক পাবো—কিন্তু আগে তো চাকরি—নবাবের খিদমত খাটা সে কি সহজ কাজ? ছেড়ে দিন হুজুর। আপনি এ মাগিটাকে ভোগ করুন। আমি দেখি আবার কোথায় কী জোটে—শুধু একটা অনুরোধ করে যাই—আমার নামে কোনও নালিশ নবাবের কাছে জানাবেন না—দোহাই। সালাম জনাব।”^{১০১}

এইসব টুকরো টুকরো ঘটনা যুক্ত করে নাট্যকার নিমাইয়ের সমাজ-সংস্কারকের পরিচয়টি তুলে ধরেছেন। গুরুদেব অদ্বৈতাচার্য নিমাইয়ের সাহসিকতা লক্ষ্য করে এবং অদমনীয় মনোবলের প্রমাণ পেয়ে বুঝতে পেরেছেন যে নিমাই-ই পারবে এই হিন্দুধর্ম এবং সমাজের নবজাগরণ ঘটাতে। তাই তিনি নিমাইকে বলেছেন—

“সে দায়-দায়িত্ব নিতে হবে তোমাকে—হ্যাঁ নিমাই তোমাকে। তুমিই হবে আজকের বহুধা বিভক্ত হিন্দুধর্মের নিয়ামক। তুমি আবার সব হিন্দু-মুসলমানকে, সমস্ত বাঙালিকে এক সূত্রে এক মালায় গাঁথবে।”^{১০২}

নিমাইও তাই চান; কিন্তু পথ খুঁজে পাননা। তাঁকে সেই পথ দেখান গুরু ঈশ্বরপুরী। তিনি নিমাইকে বৈষ্ণবধর্ম তথা হিন্দুধর্ম বাঁচানোর জন্য কৃষ্ণনাম প্রচার করতে বলেন জনে জনে। নিমাইয়ের অনুগামী হন হরিদাস, জমিদার, অদ্বৈত, বাচস্পতি, নেদো, ভামিনী, কিরণের মতো অতি সাধারণ বৈষ্ণব ভক্তরা। ‘নবজাগরণ’ নাটকে নিমাইয়ের আধ্যাত্মিক ভাবের প্রকাশ নেই বললেই চলে। সেখানে তাঁর সমাজ-সংস্কারকের রূপটি বড় করে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি সত্যই ষোড়শ শতকের বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত। এই নাটকের আর একটি আকর্ষণীয় দিক আধুনিক ভাষা ব্যবহার এবং যুক্তিসঙ্গত কাহিনি(র) বিশ্লেষণ, যা পাঠক বা দর্শকের কাছে নাটকটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছে। অত্যাচারী সেপাই ও উচ্চ-ক্ষমতাবান মানুষের প্রতিনিধি চরিত্রগুলি অশালীন শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করেছেন। দরিদ্র জমিদারকে একসময় কাজির সেপাই বলেছে—‘তোর রাধামাধবের মুখে মুতি’। অন্যত্র নিমাইকে লক্ষ্য করে উচ্চকণ্ঠে সেপাই বলেছে —‘কচু কাটা করে ছাড়বো। আমার মালে হাত। মাগিটাকে পটিয়ে পটিয়ে ঘরে তুলতে যাচ্ছিলাম’ ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে নাট্যকার একাধিক টুকরো টুকরো ঘটনার বাস্তবচিত্র এবং সংলাপ তুলে ধরে সেকালের সমাজ বাস্তবতার পরিচয়টি রেখেছেন।

ষোড়শ শতকের চৈতন্যের জীবনভাবনাকে একালের ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করে নাট্যকার পরিবেশন করেছেন। ফলে নাটকটি কালচেতনার নিরিখে এবং বিষয়ভাবনায় আধুনিক হয়ে উঠেছে। নাটকটির চরিত্র পরিকল্পনা, ভাষা ব্যবহার, পরিবেশ সৃজন ও তার বিশ্লেষণ যথাযথ হয়েছে। চৈতন্যের সমাজ সংস্কারকের ভূমিকাটিও নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে আলোকিত হয়ে হয়েছে। সব মিলিয়ে নাটকটি সাবলীলভাবে পুনর্নির্মিত হতে পেরেছে।

উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়—‘নীলাচলে (২০১৫) :

২০১৫ খ্রিস্টাব্দে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় চৈতন্য জীবনকে অবলম্বন করে ‘নীলাচলে’ নামের একটি নাটক লিখেছিলেন। ২৪ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১৮ সেন্টিমিটার চওড়া সেই নাটকটিতে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮। নাটকটির প্রচ্ছদপত্র এইরূপ -

“গ্রাম বাংলার একমাত্র নাট্যমুখপত্র/ অসময়ের/ নাট্য
ভাবনা ”^{১০৩}

নাটকের নামপত্র ও চরিত্রলিপিটি এইরূপ-

“নীলাচলে/ উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়/ চরিত্র/ জগেন্দ্র,
মাধবেন্দ্র, নিমাই, বিষ্ণুপ্রিয়া এবং গায়ক।”^{১০৪}

রঙ্গন দাশগুপ্তের সম্পাদনায় ‘অসময়ের নাট্য ভাবনা’য় নাটকটি প্রকাশিত এবং বেঙ্গল লোকমত প্রিন্টার্স প্রা. লি. কলকাতা-১৪ থেকে নাটকসহ নাট্য পত্রিকাটি মুদ্রিত। নাট্য প্রচ্ছদে কৃষ্ণের চরণযুগলের চিত্র অঙ্কিত আছে। নাটকটি তথা নাট্য পত্রিকাটির মূল্য একশত টাকা।

নাটকের বিষয়বস্তুতে রয়েছে আধুনিক নারীর অবমাননা এবং মধ্যযুগীয় মহান পুরুষ চৈতন্যের সমাজ সংস্কারের পরিচয়। জগাই-মাধাই দুইভাই এখানে সুপারি কিলারের ভূমিকা নিয়েছেন। একজন অপরিচিত নারী বিষ্ণুপ্রিয়াকে বেলাভূমি রিসর্ট থেকে সমুদ্র সৈকতে রাতের নির্জনে ধরে এনেছেন। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য মেয়েটিকে হত্যা করে সমুদ্রের নোনাজলে ফেলে রাখা। যখন তাঁরা বিষ্ণুপ্রিয়া নামে অপরিচিত মেয়েটিকে ধরে এনেছেন, তখন মেয়েটি বলেছেন-

“ছেড়ে দাও আমাকে প্লিজ।...

আমাকে ছাড়বি কি না!...

আঃ—চুলটা ছাড়ো না—লাগছে তো—”^{১০৫}

তাদের পরিকল্পনা রয়েছে বিষ্ণুপ্রিয়াকে শুধু মারবে না, তাঁর শরীরের রক্ত শিশি করে নিয়ে যাবে প্রমাণ হিসেবে। মাধবেন্দ্র বলেছেন -

“ওটা ও একটু আলগা রাখ। গলায় ফাঁস লাগিয়ে মারার তো কথা নয়। রক্তপাত হতে হবে। সেই রক্ত শিশি করে নিয়ে যেতে হবে। ক্লায়েন্ট সেই রক্ত পরীক্ষা করে দেখবেন যে এই রক্ত এই মেয়েটির রক্তই কি না। তারপর বাকি টাকা পাব।”^{১০৬}

কিন্তু মেয়েটিকে দেখে জগেন্দ্রর মনে গোপন ইচ্ছা জেগে উঠেছে। তিনি মাধবকে বলেছেন -

“বুঝলে মেয়ে, লোক আমি ভালো। দেখছ না এত টসটসে মাগী দেখেও অসভ্যতা করার চেষ্টা করছি না, তাই না? মারার আগে একবার বলাৎকার করে নেব মাধাই?”^{১০৭}

প্রত্যুত্তরে মাধবেন্দ্র তাঁকে মানা করে বলেছেন—

“একদম না, মৃতদেহটি যেন অ-ধর্ষিতা থাকে, এইরকম নির্দেশ। যা বলছিলাম জগাই—মৃতদেহটি বালির উপরে সমুদ্রতীরে পড়ে থাকলে কী হবে। সকালে প্রচুর লোক স্নান করতে আসবে। এদিকে সমুদ্রের ঢেউ একবার দেহটা নিয়ে যাবে একবার ফিরিয়ে দিয়ে যাবে—অনবরত এইরকম চলতেই থাকবে। ফলে নুনজলে শরীরটা তাজা থাকবে, তারপর মিডিয়া, পুলিশ ইত্যাদি—এবং তার পরেই স্টার আনন্দের অনুষ্ঠান—সমুদ্রতীরে কে মারল প্রিয়াকে?”^{১০৮}

দুই ভাইয়ের কথোপকথনে এসেছে আধুনিক সভ্যতার অনুষঙ্গ। মৃত্যু আসন্ন বুঝতে পেরে বিষ্ণুপ্রিয়া বুদ্ধির পথ অবলম্বন করেছেন। তিনি তাঁদেরকে বোঝান—

“রক্ত মিলবেই না, আমি সে নই যার পিছনে আপনারা ঘুরছেন। দেখুন আপনারা ভাড়াটে খুনি, তাই তো—অর্থাৎ তেমন বিদ্যেবুদ্ধি নেই, আমি প্রচুর পড়াশোনা করেছি। ক্রিমিন্যাল সাইকলজি

আমার বেশ ভালোই জানা আছে। আমি বলছি যে আমাকে
মারার জন্য কেউ খুনি ভাড়া করবে না।’^{১০৯}

এইসময় সমুদ্রের ভেতর থেকে উঠে আসেন চৈতন্যদেব; পরনে সম্পূর্ণ নীল ধুতি, নীল
উত্তরীয়, মস্তক মুণ্ডিত। চৈতন্য নিজের পরিচয় দেন জগাই-মাধাইকে-

“আমি নিমাই পণ্ডিত। শচীমাতার পুত্র। প্রভাত সময়ে শচীর
আঙিনা মাঝে গৌরচাঁদ নাচিয়া বেড়ায় রে”—এই গান
শোননি?”^{১১০}

নিমাই ষোড়শ শতকের চৈতন্য মহাপ্রভুরূপে নিজের পরিচয় দিলেও কোন কাজ হয়নি।
তিনি এখানে ব্যর্থ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কারণ তিনি একালের জগাই-
মাধাইয়ের চৈতন্য জাগাতে পারেননি। তাঁর আক্ষেপ —

“এই চৈতন্যে আমার কোন অধিকার নাই। কারণ মানুষের চৈতন্য
পুনরুদ্ধারে আমি অসফল। জগাই-মাধাই চিনতে পারে না আজ
আমাকে।”^{১১১}

মহাপ্রভুর এই আক্ষেপোক্তিতেই তাঁর ব্যর্থতা ধরা পরেছে। এই নাটকে মহাপ্রভুর শুধু
চরিত্র পরিকল্পনায়তেই নয়, তাঁর পোষাকও অভিনবত্ব দেখিয়েছেন নাট্যকার। তবে
নাটকটিতে মধ্যযুগীয় অনুষ্ঙ্গ এসেছে গানে(+র) প্রয়োগ(+গে) —

“জপ গৌরাঙ্গ ভজ গৌরাঙ্গ লহ
গৌরাঙ্গের নাম রে
যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার
প্রাণ রে।
হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল
হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল।”^{১১২}

আধুনিক নারী বিষ্ণুপ্রিয়া একালে নিমাইকে ত্যাগ করেছেন, বয়ফ্রেন্ড জোগাড় করে
নিয়েছেন। এখানে গৌর গৌরাঙ্গ নয়, বিষ্ণুপ্রিয়ার বয়ফ্রেন্ড। তবে চৈতন্যদেব নবদ্বীপে
যে সমাজ-সংস্কারের প্লাবন এনেছিলেন, তাতে মানবতার পরিচয় ফুটে উঠেছে, তা
বিষ্ণুপ্রিয়ার কথায় ধরা পড়ে। বিষ্ণুপ্রিয়া বলেন -

“তুমি গেঁয়ো পণ্ডিত নদীযানগরে... হরির নামে জগৎ মাতিয়েছ, ব্রাহ্মণ
শূদ্র বৈশ্য সবাইকে একবারে বৈষ্ণব বানিয়েছ।”^{১১৩}

এ প্রিয়া আধুনিক শিক্ষিতা নারী, ইতিহাস তাঁর প্রিয় বিষয়। এমনকি মোবাইল ফোনের ব্যবহার তাঁর জানা। একালের চৈতন্য ইংরেজি ভাষায় কথা বলেন। মধ্যযুগীয় পুরুষ চৈতন্য হয়ে উঠেছেন আধুনিক কালের মানুষ। তিনি প্রিয়ার আসন্ন মৃত্যুর রহস্যের সমস্ত দ্বার উদ্ঘাটন করেছেন, জন্ম-জন্মান্তরের সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

“গৌরের সঙ্গে তোমার জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক বিষ্ণুপ্রিয়া। নদীয়ার গৌর তোমাকে পরিত্যাগ করল। রবিঠাকুরের গোরা সুচরিতাকে চিনতে পারল না, বৃথা জাত্যাভিমান তার শত্রু। শৈবাল মিত্রের গোরা উপন্যাসে গোরা সত্ত্বের নকশালপত্নী যুবক, আর কর্পোরেট গৌর খৈতান আজও বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমিক, খুন করতে চাইলেও সে প্রেমিক, হত্যার চেষ্টাই আজ ভালোবাসা বিষ্ণুপ্রিয়া। হত্যার ইচ্ছাই সর্বোচ্চ পোজেসিভনেস। আর সে রইল না, মানে সে আর কারো হবার সম্ভাবনাও রইল না। আর বিষ্ণুপ্রিয়া তোমার গলায় এই যে দাগ— দেখা যাচ্ছে— তা দড়ির দাগ। গৌর তোমাকে দুটো চড় মেরেছিল। তারপর তুমি আত্মহত্যা করেছিলে, আর আগে পুলিশে ডায়েরি করেছিলে যে গৌর তোমাকে খুন করতে পারে।”^{১১৪}

মধ্যযুগের চৈতন্য এবং তাঁর পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রসঙ্গ এনে নাট্যকার একালের ভাবনায় জারিত করে কাহিনির পুনর্নির্মাণ করেছেন। সেইদিক থেকে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের ‘নীলাচলে’ নাটকটি বিনির্মিত নাটক হয়ে উঠেছে। মূলভাবনার সঙ্গে চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে আছে। এমনকি নিমাই নিজেই এখানে মানব প্রেমের আলোকবর্তিকা নিয়ে উপস্থিত থাকলেও কাহিনির প্রেক্ষাপট পুরোপুরিভাবে একালের অপহরণের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। এখানে জগেন্দ্র ও মাধবেন্দ্র সুপারি কিলার। বিষ্ণুপ্রিয়াকে তাঁরা অপহরণ করেছেন অর্থের জন্য। এ বিষ্ণুপ্রিয়া নবদ্বীপের গোরাচাঁদের পত্নী নন, এ প্রিয়া কর্পোরেট গৌর খৈতানের প্রেমিকা। চৈতন্য এখানে একেবারে অসহায় মানুষের মতো। জগাই-মাধাই যেমন তাঁর কথায় গুরুত্ব দেননা, ঠিক তেমনি একালের বিষ্ণুপ্রিয়াও তাঁকে স্বামী বলে মানতে নারাজ। তিনি নিমাইকে সরাসরি জানিয়ে দেন—

“ইতিহাস আমার প্রিয় বিষয় ছিল নিমাই পণ্ডিত। তা তুমি কি এখনকার মোবাইল ফোনের ব্যবহার জান যে আমাকে ফোন করবে? আর তুমি

ফোন করলেও তো তুমি আমার সে গৌর নয়। আমার গৌর হল
ব্ল্যাকবার্ড কোম্পানির সি-ই-ও গৌর খৈতান।”^{১১৫}

নিমাইও নিজেকে পাণ্টে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। নিমাই
বিষ্ণুপ্রিয়াকে ‘ম্যাডাম’ বলে সম্বোধন করেছেন। এখানে তাঁর পৌরাণিক চরিত্র
পরিবর্তিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আদর্শ নয়। নিমাই একসময় বিষ্ণুপ্রিয়ার চক্রান্তের পর্দা
উন্মোচন করেছেন। জগাই, মাধাই এবং প্রিয়াকে তিনি বলেছেন-

“তোমার ডাক নাম প্রিয়া—এটা তো ঠিক? আর বেলভূমি রিসর্টে প্রিয়া
নামে একজনই ছিল গত চারদিন। গত চারদিন আগে তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া
সেনগুপ্ত নিজে পুরুষের গলা নকল করে জি. কে. নাম নিয়ে ফোন
করেছিলে জগাই-মাধাইকে। তোমার প্রেমিক গৌর খৈতানকে ফাঁসানোর
জন্য।”^{১১৬}

মানব চেতনার আন্তরণ ভেদ করে একসময় এই মহাবিশ্বের মধ্যে বিলীন হয়ে যান
নিমাই, জগাই, মাধাই এবং বিষ্ণুপ্রিয়া। চৈতন্যের দেওয়া আঘাত বুকে নিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া
কালে কালে জন্ম নিয়েছেন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে। নিজের জীবন ত্যাগ করেও
আঘাত দিতে চেয়েছেন গোরাচাঁদকে। বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইকে বলেছেন—

“নিমাই কেন ফেলে গেলে আমাকে? প্রতিটি সময়ের স্তরের মধ্যে আমি
তোমাকে ভীষণ আঘাত করবার ইচ্ছে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। গৌর আমাকে
আঘাত করেছে, আমার গৌরকে আমি আরো মারব, আরো জোরে মারব।
প্রত্যেক জন্মে আমার কাছে এসেছ তুমি— মানুষের শ্রীচৈতন্যদেব যখন ব্যর্থ
তখন সে বিষ্ণুপ্রিয়ার নিমাই হয়ে একবার ফিরে আসুক। এ কী! বালি গ্রাস
করছে আমাকে! নিমাই, নিমাই, ওগো নিমাই পণ্ডিত—”^{১১৭}

নাটকের পটভূমিতে রয়েছে আধুনিক বাস্তব জীবনচেতনার অনুসঙ্গ। কিন্তু কল্পচেতনায়
চৈতন্যের উপস্থিতি নাটকটিকে পৌরাণিক ভাবনাজাত করে তুলেছে। সেকালের
চৈতন্যভাবনা এইভাবে পরিবর্তিত হয়েছে আধুনিক সমাজভাবনায়। তবে চৈতন্যের
মানবপ্রেমের চেতনা বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি, শুধু পরিবর্তিত হয়েছে চরিত্রগুলির
কর্মজগত এবং আচার-আচরণ। জগাই- মাধাই সেকালে খারাপ মানুষের প্রতিনিধিত্ব
করেছেন, একালেও তাঁরা খুনির ভূমিকা নিয়েছেন। এখানে তাঁদের চরিত্রের শুদ্ধিকরণ
হয়নি। বিষ্ণুপ্রিয়া সেকালে স্বামীপ্রেম বঞ্চিত হয়েও নীরব থেকেছেন, কিন্তু একালে

গৌরকে মারার পরিকল্পনা করেছেন। ফলে চরিত্রটি বিবর্তিত হয়ে উঠেছে। চার পাঁচটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে অতি সুন্দরভাবে নাট্যকার উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় নতুনভাবে চৈতন্যকে আমাদের মনের দর্পণে উপস্থিত করেছেন। এর ফলে ‘নীলাচলে’ নাটকটি বিনির্মিত হয়ে উঠেছে।

সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়— ‘শ্রী গৌরাঙ্গ চরিত’ (২০১৫);

২০১৫ খ্রিস্টাব্দে সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে লিখেছেন ‘শ্রী গৌরাঙ্গ চরিত’ নামের একটি নাটক। ২৪ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১৮ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটির প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (১), নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ (১), মূল নাটক (৪০) সহ মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩। নাটকটির প্রচ্ছদপত্র এইরূপ -

“গ্রাম বাংলার একমাত্র নাট্যমুখপত্র/ অসময়ের/ নাট্য ভাবনা ”^{১১৮}

নাটকের নামপত্র ও চরিত্রলিপিটি এইরূপ-

“শ্রী গৌরাঙ্গ চরিত/ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়/ চরিত্র/ কথক ঠাকুর ও কোরাস, শচীদেবী, শ্রীবাস, গোরা, যবন হরিদাস, কাজি, পণ্ডিত, নর্তকী, লক্ষ্মীপ্রিয়া, শ্রীধর, অদ্বৈত আচার্য, জগন্নাথ ও মুজাভির, নিত্যানন্দ।”^{১১৯}

নাটকটি রঙ্গন দত্তগুপ্তের সম্পাদনায় বেঙ্গল লোকামত প্রিন্টার্স প্রা. লি., কলকাতা ১৪ থেকে মুদ্রিত। গ্রন্থের প্রচ্ছদে চৈতন্যদেবের চরণযুগলের চিত্র অঙ্কিত আছে। নাটকটিতে স্বতন্ত্র অঙ্ক বিভাজন নেই, কিন্তু কাহিনিধারার তীব্র আকর্ষণ আছে। নাট্য পত্রিকার মূল্য একশত টাকা।

নাট্যকার সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক ভাবনার আলোকে মহামানব চৈতন্যদেবের সামাজিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপের যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন আলোচ্য নাট্যকাহিনি পরিবেশনায়। নাটকটি শুরু হয়েছে একজন জনৈক ব্যক্তির গান দিয়ে—

“ওরে ছেড়ে দিলে সোনার গৌর
ক্ষাপা ছেড়ে দিলে সোনার গৌর
আমরা আর পাবো না।...”^{১২০}

পরমুহূর্তে কথকের কণ্ঠে শোনা যায় চৈতন্যের আবির্ভাবের কথা —

“চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপ অবতার।
সিংহবীর্যে ধ্বনিল সিংহের হুঙ্কার।।

অচলায়তন ভাঙার গান হল নাম
সংকীৰ্তন।
এক্ষণে সে গৌরাঙ্গ কথা কর হে
শ্রবণ।।”^{১২১}

গোরা যে ধনী সমাজের ‘অচলায়তন ভাঙার’ পথ বেছে নিয়েছেন, তাতে তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের মেকি জাত্যাভিমানের আঘাত লাগে। তাই তিনি অদ্বৈতাচার্যকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন –

“কুলাঙ্গার। বুঝলেন— এই ছেলে আমার বংশের কুলাঙ্গার। ওর জন্য আমার জাত-মান, সম্মান-মর্যাদা—সব ধুলিসাৎ হয়ে গেল।”^{১২২}

আসলে শচীমাতা জানেন গোরা সঙ্গী-সাথীরা বেশিরভাগই শূদ্র-চণ্ডাল। তাই তাঁর ধারণা ছেলেটা সঙ্গদোষেই উচ্ছিন্নে যাচ্ছে। গোরা অন্যায় ও দুরন্তপনার ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অদ্বৈতাচার্যের প্রসঙ্গ। অদ্বৈতাচার্য জগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতাকে ইন্ধন দিয়ে বলেছেন—

“তারুণ্যের এইসব চপলতা তবু না হয় সহ্য নেওয়া যায়। তা বলে মেথরপট্টিতে রাত্রিবাস, বেশ্যার অন্তঃসংগ, শূদ্রপাড়ায় নাচ-গান-হৈ-হুল্লোড় কোনমতেই বরদাস্ত করা যায় না। এরপর তো ছেলের জন্য তোমায় একঘরে হতে হবে। এবার এদিকে একটু নজর দাও জগন্নাথ।”^{১২৩}

অদ্বৈতাচার্যের কথায় জগন্নাথ মিশ্র ভয় পেয়ে যান এবং মনে মনে নিমাইয়ের প্রতি খুদ হন। অদ্বৈতের সঙ্গে গোরা যে তর্কযুদ্ধ হয় সেখানে প্রকাশ পায় গোরা কৃষ্ণপ্রেমের কথা। ধর্ম যখন প্রেমের আশ্রয় হয়ে উঠে তখন মানুষ তাকে আঁকড়ে ধরে একটি নতুন পথের সন্ধান পায়। তবে গোরা প্রতিটি কথায় রয়েছে আধুনিক যুক্তির পরিচয়। গোরা এই নতুন ধর্ম ব্যাখ্যার যুক্তিগুলি এইরূপ—

ক. “বংশীধারী কৃষ্ণ সংগীতপ্রেমী। তার সুরের ঝরনাধারায়, হৃদয়ের যে বার্তা ভেসে বেড়ায়, তা হল লৌকিক প্রেম-ভালবাসার অলৌকিক মহিমা। অথচ সেই মহিমার কোন প্রচার নেই।”^{১২৪}

খ. “ঐ আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ধর্মচর্চায় কাব্য চাই, সাহিত্য চাই, চাই সংগীত আর শিল্পসৌন্দর্যের দর্শন। যার ভিত্তি হল প্রেম-ভালোবাসা। রাধাকৃষ্ণ ত তারই প্রতীক। তাই ধর্ম যখন মানবিক

প্রেমকে আঁকড়ে ধরে মানুষের কাছে যায়, তখন গৌতম বুদ্ধ
বিষ্ণুরই অবতার হয়ে দাঁড়ায়।”^{১২৫}

গ. “কিন্তু গীতা বলে—অভ্যাসের চেয়ে জ্ঞান বড়, জ্ঞানের চেয়ে বড়
ধ্যান। ধ্যানের চেয়ে আরও বড় কর্মফলের পরিহার। আর সেই
ত্যাগেই পরমশান্তি।”^{১২৬}

ঘ. “শুধুমাত্র আত্মসুখে ভোগের ইচ্ছাই হল ভয়ংকর ভবরোগ। আর
সেই রোগে ‘সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে—’^{১২৭}

এইভাবে গোরা একসময় অদ্বৈত গুরুর কাছে নিজের ভাবনা প্রকাশ করেন এবং তাতে
অদ্বৈত মন্ত্রমুগ্ধ হন। তিনি গোরার কথায় ভাবিত ও প্লাবিত হন। নাট্যকাহিনীতে এসেছে
যবন হরিদাসের প্রসঙ্গ। জাতে মুসলমান হলেও বৈষ্ণবীয় হিন্দুধর্ম তথা কৃষ্ণনামের প্রতি
আকৃষ্ট হয়ে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। কাজি তাঁকে পথভ্রষ্ট করতে চেষ্টা করেন,
নর্তকীকে পাঠান, কিন্তু ব্যর্থ হন। উপরন্তু নর্তকী হরিদাসের সংস্পর্শে এসে কৃষ্ণনামে
প্লাবিত হন। সেই প্রসঙ্গে নর্তকী ও হরিদাসের একটি নাটকীয় উক্তি-প্রত্যুক্তি—

“নর্তকী- কিন্তু আমি যে এক অপবিত্র গণিকা।

হরিদাস - তাতে কী! সূর্য উঠলে অন্ধকার যেমন চলে যায়, তেমনই
কৃষ্ণ আরাধনায় প্রেমোদয় হলে আর পাপ থাকে না।

নর্তকী- (ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে) ঠাকুর! তোমার চরণে একটু ঠাঁই
দাও।

হরিদাস- হরি বলো।

নর্তকী- (অস্ফুটস্বরে) হরি, হরি।

হরিদাস- হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

নর্তকী- হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে...”^{১২৮}

গোরা চরিত্রের একটি বড়ো দিক সংস্কারমুক্ততা। তিনি জাত-পাতের উর্ধ্বে উঠে আসা
এক আধুনিক মানুষ। তাঁর যুক্তি হল—

“যাকে ঠাকুর বলছি—সেই ঠাকুরের মানেটা জানিস? ওরে সেই হচ্ছে
ঠাকুর—যার সংসর্গে পতিত উদ্ধার হয়। আর ঐ উদ্ধার কর্মই হল ঠাকুরের
ধর্ম।... সব মিথ্যা। শাস্ত্রমিথ্যা, মন্ত্র মিথ্যা, জাত-ধর্ম-বর্ণ— সব মিথ্যা।”^{১২৯}

গোরা হিন্দু সমাজের প্রকৃত প্রগতি চান। তাই নারী জাতীর প্রতি অবমাননা তাঁকে প্রতিবাদী করে তুলেছে। তিনি নারীকে সেবাধর্মের প্রতীক বলে আখ্যায়িত করেছেন —

“ঠিকই বলছি। বউকে যারা পায়ে নীচে কুটোর মতো রাখে—তারা সমাজে যতই মানী-গুণী হোক, মোটেই প্রেমিক নয়। তবুও তাদের গিন্নিরা সংসারটা বুক দিয়ে আগলে রাখে, সংসারকে ভালবেসেই। এই ভালবাসায় আছে সেবাধর্ম।”^{১৩০}

এমনকি সমাজ অন্যায় বিধান থেকে গোরা নিজের বিধবা মাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন। একাদশীর উপবাস, তাঁর কাছে হিন্দুধর্মের একধরনের ‘নষ্টামি’ বলে মনে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর যুক্তি হল—

“শোন মা! মানুষের হৃদয়ে করুণাময় কৃষ্ণের অধিষ্ঠান। এই হৃদয় যে শরীর ধারণ করে থাকে, সেই শরীরকে কষ্ট দিলে তিনিও কষ্ট পান।”

১৩১

কাহিনির স্রোতে এসেছে লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে গোরার বিবাহ, তাঁদের সাংসারিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, মুজাভির সঙ্গে ভেদাভেদের নানা যুক্তি ও মুক্তির উপায় এবং লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যুর কথা। লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু গোরার হৃদয়ে আরো এক পরিবর্তন সাধন করেছে; জীবন সত্যের একটি দীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে। গোরা বলেছেন -

“লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যুই আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল জীবন অনিত্য। সংসারে ধন-সম্পদ-প্রতিপত্তি সবই অনর্থ। যেন পদ্মপাতায় জল। এই শিক্ষায় আমার প্রাণের যিনি প্রাণ, তিনি আমার প্রেয়সী লক্ষ্মীপ্রিয়া— তাকে হারানোর শোক ভুলতে চাইছি। হ্যাঁ লক্ষ্মী! তুমি এখন আমার বোধিবৃক্ষে তমসায় আলোকবর্তিকা। (মিউজিকের স্পর্শ) কারণ, তোমার স্মৃতি আমাকে এক আদি অন্তহীন বিশাল জীবন-প্রবাহের শব্দ শোনায়।”^{১৩২}

এরপর গোরা বৃহত্তর জীবনবৃত্তে পা রেখেছেন এবং জীবন সম্পর্কে মহত্তর চেতনায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। নিম্নশ্রেণীর চোয়াড়দের নিয়ে গোরা ও নিত্যানন্দ অত্যাচারী কাজির বাড়ি আক্রমণ করেছেন। এই আক্রমণ তাঁকে মারা বা হত্যা করার জন্য নয়, কাজির অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করার জন্যে। এটি কাজি চরিত্রের শুদ্ধিকরণের একটি নব পথ। প্রথমে কাজি মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে পরেছেন, কিন্তু গোরা ও নিতাই যখন

কাজিকে আক্রমণ না করে এবং আলিঙ্গন করেছেন, তখন কাজি ভয়কে জয় করে বলেছেন—

“শুনেছি—নিমাই পণ্ডিতের উদার হৃদয়ে ঈশ্বরের মতো অফুরন্ত ভালোবাসা! আজ স্বচক্ষে তা দেখলাম।”^{১৩৩}

গোরাকে কাজি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন—

“কথা দিচ্ছি—তোমাদের ধর্মকাজে যে বাধা দেবে, যে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, তাকে আমি চরম দণ্ড দেব।”^{১৩৪}

এইভাবে কৃষ্ণপ্রেমের আদর্শ ও বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নেন গোরা নিজেই। নিত্যানন্দ নবদ্বীপে থেকে কৃষ্ণপ্রেমের মাহাত্ম্য প্রচার করেন, আর গোরা সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে বিশ্বের দরবারে কৃষ্ণপ্রেম তথা মানবপ্রেমের মহিমা প্রচার করেন। নাট্যকার ‘শ্রী গৌরাঙ্গ চরিত’ নাটককে এইভাবে কাহিনি বিশ্লেষণ করে পুনর্নির্মাণ করেছেন মধ্যযুগের চৈতন্যভাবনাকে।

‘শ্রী গৌরাঙ্গ চরিত’ নাটকের প্রধান চরিত্র নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ। তিনি এই নাটকের প্রতিবাদী চরিত্র। অন্ধ ধর্মীয় গোঁড়ামীর প্রতি তাঁর বিদ্বেষ-মানসিকতাই চরিত্রটিকে আলোকিত করেছে। তাঁর কাছে মানুষের সঙ্গে মানুষের কোন ভেদাভেদ নেই। শুদ্র, চণ্ডাল সকলেই ভাই ভাই। গোঁড়া হিন্দুধর্ম যে সমাজের অগ্রগতির পথে বাধা দান করছে, সেকথা গৌরাঙ্গ বুঝতে পেরেছিলেন। গুরুদেব অদ্বৈতাচার্যকে হিন্দুধর্মের খারাপ দিকটি নির্দেশ করে গোরা বলেছেন—

“বেশির ভাগ হিন্দুই ধর্মের নামে অধার্মিক আনুষ্ঠানিকতায় বিশ্বাসী। তারা শুধু দেখে কিছু ব্রাহ্মণ আর বৈদ্যদের সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি। তাই এদের মন জুড়ে রয়েছে বৈশ্যদের মতো বিলাসিতায় ডুবে থাকার আকাঙ্ক্ষা। এদের কাছে ধর্ম মানে অন্যকে আত্মত্যাগের উপদেশ দেওয়া এবং নিজের জন্য যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ-দখল করা। ঈশ্বর এদের কাছে পাওনা আদায়ের যন্ত্র, আখের রস নিংড়ে নেওয়ার মাড়াইকল।”^{১৩৫}

আসলে গোরা সকলকে বোঝাতে চেয়েছেন ধর্মের মধ্যে নিয়ম-নীতির কঠোরতা যতোটা প্রয়োজন, তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন মানবিক উদারতা ও পরোহিতব্রত। গোরা জানতো হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমাজের সকল মানুষকে সমানভাবে মর্যাদা দিতে হবে। সেখানে নারীর গুরুত্ব বিন্দুমাত্র কম নয়। কিন্তু যাঁরা নারীকে অবমাননা করে

পায়ের নীচে কুটোর মতো রাখার চেষ্টা করেন, তাঁরা সমাজের গুণী-মানী লোক হলেও প্রেমিক মানুষ নন। শ্রীধরকে এই প্রসঙ্গে গোরা প্রকৃত ঈশ্বরের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে বলেছেন—

“কাউকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা নয়। সব্বাইকে সম্মান দিতে হবে। কারণ, ভগবান হল সেই পরম গুণনিধি, যার কাছে সকলেরই সমান মর্যাদা।”^{১৩৬}

জীবন অনিত্য, মানুষ সেই সংসারে আসা এক আগন্তুক মাত্র। সংসারে ধন-সম্পদ-পতিপত্তি সবই অর্থহীন। সবাই যেন পদ্মপাতায় ভাসমান জলের মতো। গোরার এই নিষ্ঠুর জীবন অভিজ্ঞা তাঁকে প্রকৃত জীবন পথের দিশা দিয়েছে। এই নাটকে গোরা বাংলা ভাষা আন্দোলনের একজন অগ্রগামী দূত। তিনি বাংলা ভাষার স্বীকৃতির জন্য সুলতানের দরবারে আবেদন জানিয়েছেন। শ্রীবাসকে গোরা বাংলা ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝাতে গিয়ে বলেছেন—

“মানুষের মুখের ভাষা যদি মুক্তি পায়, তাহলে বাংলা বাঙালির সুর, গান বেশিদিন বন্ধ রাখা যাবে না। কারণ প্রেম যেখানে সত্য, সেখানে মানুষে মানুষে মিলন সম্প্রীতি সবচেয়ে বড় শক্তি। তাই কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণনাম ঐ সমাজসত্যি প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র।”^{১৩৭}

ষোড়শ শতকে বাংলা ভাষার আত্মমর্যাদা ও ব্যাপ্তি নিয়ে এইরকম ভাবনা চিন্তা আর কেউ করেন নি বলে আমাদের মনে হয়। এতে গোরা চরিত্রের আধুনিকতার আর একটি পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। কাজি জাতে মুসলমান হলেও তাঁর ভাষা বাংলা হওয়ায়, গোরা তাঁকে এক সুতোয় বাঁধার চেষ্টা করেছেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংলা ভাষাকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছেন। কাজি বৈষ্ণবদের কাজে নানা সময় বাধা দিয়েছেন, কিছু গোরার উদার হিন্দুধর্মের পরিচয় পেয়ে আবেগ- আত্মতৃপ্ত কণ্ঠে বলেছেন—

“তুমি প্রকৃতই উত্তম। তাই এত সহজে অধমকে আপন করতে পার। জানো—নিজেকে আজ বড়ো অপরাধী মনে হচ্ছে।”^{১৩৮}

এইভাবে গোরা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে এক মহামিলনের আলোক বর্তিকা জ্বালিয়ে দিয়েছেন। যবন হরিদাসের মতো মানুষ চৈতন্যের কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেছেন নিজের ধর্ম সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে। নাটকটির মধ্যে সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়ের

একটি চেষ্টা করা হয়েছে। সেখানে গোরা প্রধান ভূমিকা নিয়েছেন। প্রতিপক্ষ চরিত্ররূপে কাজিকে অঙ্কন করা হয়েছে। কিন্তু তিনিও একসময় মানবধর্মের প্রকৃত আদর্শের কাছে পরাজিত হয়েছেন। নাট্যকার সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে তুলে ধরতে চেয়েছেন প্রেমধর্মের মহিমাময় আদর্শকে; যা পারে সমস্ত মানুষ, সংসার, ধর্ম- যাবতীয় কিছুই পরিবর্তন করতে। শচীদেবী এখানে একজন আদর্শ মা চরিত্র। প্রতিটি মায়ের মতো শচীমাতাও গোরাকে ঘরের আগুিনায় সংসার জীবনে আটকে রাখতে চেয়েছেন, কিন্তু পারেননি। লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যুর পর গোরার মধ্যে যে বৈরাগ্য এসেছিল, তা দূর করার জন্য শচীমাতা দ্বিতীয়বার বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে গোরার বিবাহ দেন। কিন্তু সংসারের গভীতে ধরে রাখতে পারেনি তাঁকে। কৃষ্ণপ্রেম গোরার কাছে সংসারপ্রেম থেকেও অনেকটা বড়ো। শ্রীবাস, পণ্ডিত, শ্রীধর, অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ প্রভৃতি চরিত্রগুলি নাটকের যোগসূত্র সাধনে এবং পরিবেশ রচনায় নানা ভাবে সহায়তা করেছে, এখানে তাঁদের গুরুত্ব কম নয়। এছাড়াও নাটকের ভাব সেকালের হলেও ভাষা একাবারে আধুনিক। এইভাবে নাট্যকারের ভাবনায় ‘শ্রী গৌরঙ্গ চরিত’ নাটকটি নবনির্মিত হয়ে উঠেছে।

অনুপ চক্রবর্তী— মার্ক্স, চৈতন্য ও সুজাত (২০১৫);

২০১৫ খ্রিস্টাব্দে অনুপ চক্রবর্তী চৈতন্য ভাবনাকে অবলম্বন করে লিখেছেন ‘মার্ক্স, চৈতন্য ও সুজাত’ নামের একটি নাটক। ২৪ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১৮ সেন্টিমিটার চওড়া। এই নাটকটির প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (১), মূল নাটক (১৫) সহ মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭। নাটকটির প্রচ্ছদপত্র এইরূপ -

“গ্রাম বাংলার একমাত্র নাট্যমুখপত্র/ অসময়ের/ নাট্য ভাবনা”^{১৩৯}

নাটকের নামপত্র ও চরিত্রলিপিটি এইরূপ -

“মার্ক্স, চৈতন্য ও সুজাত/ অনুপ চক্রবর্তী/ চরিত্র/ মার্ক্স, চৈতন্য, সুজাত, জেলার অ্যান্টনি।”^{১৪০}

নাটকটিতে অঙ্ক বিভাজন নেই। উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে নাট্যকাহিনি পরিণতিতে পৌঁছে গেছে। নাট্য পত্রিকার মূল্য একশত টাকা।

নাট্যকার অনুপ চক্রবর্তী নাট্যশুরুতে দেখিয়েছেন ফাঁসির সেলে অপেক্ষমান আসামি সুজাত। সেই সেলের জেলার হলেন তাঁর বন্ধু প্রসাদ অ্যান্টনি। তাঁদের উভয়ের মধ্যে দেখা হয় এবং অতীত-বর্তমান জীবনের নানা প্রসঙ্গ উঠে আসে। সেই রকম একটি নাট্যমুহূর্ত—

“অ্যান্টনি।। সুজাত!

সুজাত।।(নিষ্পৃহ স্বরে) বলো।

অ্যান্টনি।। আর ঠিক বারো ঘণ্টা পরেই তোমার ফাঁসি হবে।

(নীরবতা)”^{১৪১}

তাঁদের কথার মাঝেই এসেছে মার্ক্স ও চৈতন্যের প্রসঙ্গ। মৃত্যুর পূর্বে সুজাতের বিভ্রান্ত মানসিক ভাবনাতে এসেছেন মানবপ্রেমের মূর্ত প্রতীক চৈতন্য এবং কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ নেতা মার্ক্স। বন্ধু অ্যান্টনিকে সুজাত বলেছেন—

“কেন দেখছি ওদেরকে? কেন দেখছি মার্ক্সকে? কেন চৈতন্যকে? দুই বিপরীত মেরুর মানুষকে? ফাঁসির ঠিক আগে? অ্যান্টনি! একি নিদারুণ ভ্রান্তি আমার! একি নিদারুণ যন্ত্রণা আমার! আমার কেন সব এভাবে গুলিয়ে যাচ্ছে! কেন আমি এভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলছি। কেন আমার ভেতরটা প্রচণ্ড ঝড়ে চুরমার হয়ে যাচ্ছে! আমার বিশ্বাস- কমিটমেন্ট- ভাবনা—চেতনা—সব ঠিক না ভুল—ঠিক না ভুল—ঠিক না ভুল কোন্টা—কোন্টা—কোন্টা...”^{১৪২}

কার্ল মার্ক্সের কাছে সুজাত নিজের চেতনার কথা বলতে গিয়ে ভারতবর্ষের তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার কথা উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন—

“ছত্তিশগড়ের জঙ্গলের, দান্তেওয়াড়া, বস্তারের ভয়ানক দরিদ্র, নিরন্ন আদিবাসী মানুষ? যাদের খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই, স্বাস্থ্য নেই, চিকিৎসা নেই, ওষুধ নেই, শিক্ষা নেই, নিরাপত্তা নেই, নারীর সম্মান নেই, যাদের ক্রমাগত উচ্ছেদ করা হয়, ছিন্নমূল করা হয়, যারা বেঁচে থাকার ন্যূনতম দাবি জানালে গুলি করে মারা হয়, যাদের অধিকারের অরণ্য ক্রমাগত নিশ্চিহ্ন করা হয়, যাদের অধিকারের মিনারেলের পাহাড় কেটে লুণ্ঠ করে নেওয়া হয়, লুণ্ঠ করে নেয় দেশি ও বিদেশি কোম্পানিগুলো? না। সেইসব ক্ষুধার্ত, নিষ্পেষিত, শোষিত অরণ্যবাসী আদিবাসী মানুষদের চোখে

নয়। কিন্তু তারা সভ্য ভারতরাত্ত্রের সমগ্র জনসংখ্যার এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। তারা ছাড়া কোটি কোটি ভারতবাসীর চোখে আমি একজন বিপথগামী সন্ত্রাসবাদী মাত্র। আজ একটু পরেই আমার ফাঁসি হবে। কাল মিডিয়ায় এই খবর বেরোবে।”^{১৪৩}

এর পরেই তাঁর ভাবনায় দেখা দিয়েছেন চৈতন্য। সুজাতের তীব্র কান্নায় চৈতন্য ব্যাকুল হয়েছেন। তিনি সুজাতকে প্রেমের পথে হাঁটার কথা বলেছেন। কারণ সংগ্রাম বা হত্যা মানুষের মনে শান্তি এনে দিতে পারে না। সুজাত চৈতন্যকে বলেছেন-

“আপনি তো এই ভালবাসার কথাই বলেছেন পাঁচশ বছর আগে। কত আর্ত, দীন, দরিদ্র, অন্ত্যজ, দলিত, ঘৃণিত মানুষদের বুকে টেনে নিয়েছেন। আমরাও তো ছত্তিশগড়ে ঐরকম ক্ষুধার্ত, দরিদ্র, শোষিত, নির্যাতিত আদিবাসী মানুষদের বুকে টেনে নিয়েছি। যা কিছু করেছি, তাদের স্বার্থে করেছি তাহলে কেন কেন পরিতাপ আর গ্লানির বেদনায় শেষ হয়ে যাচ্ছি?”^{১৪৪}

প্রত্যুত্তরে চৈতন্য তাঁকে বোঝান —

“তুমি তো প্রেমের পথে হাঁটনি, ভাই। তোমরা তো প্রেমের পথ ধরনি। প্রেমের ধর্মের পথ থেকে যে অনেক দূরে চলে গেছ, ভাই। তাই তো তোমার এই দুঃখ, সন্তাপ, গ্লানি, বেদনা— (চৈতন্য গান করেন : হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে; হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে...)”^{১৪৫}

এক সময় নাট্যমধ্যে কার্ল মার্ক্স ও চৈতন্যের ভিন্ন আদর্শের দ্বন্দ্ব উঠে এসেছে। কার্ল মার্ক্স চৈতন্যকে বোঝাতে চেয়েছেন বাস্তবে সবসময় প্রেম-ভালোবাসা দিয়ে মানুষকে পথে আনা যায় না; শোষিত মানুষের অন্যায় রোখা যায় না। সেখানে প্রতিবাদ করা ছাড়া অন্য পথ নেই-

“কিন্তু সন্ন্যাসী, শুধু ভালবাসা দিয়ে কী করে মানুষের দুঃখের অবসান হবে? নির্যাতিত, শোষিত মানুষ যদি সংগ্রাম না করে কী করে তাদের মুক্তি হবে?”^{১৪৬}

কিন্তু চৈতন্য মার্ক্সের আদর্শ গ্রহণ করতে পারেননি। বরং তিনি তাঁকে বলেছেন—

“তাই দার্শনিক? তাই? আমিও দুমড়ে মুচড়ে যাই মানুষের ক্লেশে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বর্ণভেদ, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, জাতিচ্যুত, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা, মানুষের ওপর মানুষের নির্যাতন, মানুষের অশ্রু আমাকে পাগল করে দেয়, দার্শনিক। তাইতো বলি, ওহে মানুষ, মানুষকে ভালবাস। মানুষের মধ্যেই আছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব।”^{১৪৭}

তাঁদের দু’জনের যুক্তি-তর্কে অস্থির হয়ে সুজাত চিৎকার করে উঠেছেন। তিনি জানান আজও ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদীদের নেতৃত্বে হাজার হাজার মানুষ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অত্যাচারিত হচ্ছে। যেমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণে ইরাকে মৃত্যু ঘটেছে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের। মার্ক্স যখন বোঝাতে চান ঈশ্বর বলে এই বাস্তব জগতে কিছু নেই এবং নির্যাতিত মানুষের স্বার্থেই অত্যাচারীদের হত্যা করা প্রয়োজন, তখন চৈতন্য বলেছেন—

“ওঃ দার্শনিক! তোমার ঐ তত্ত্ব— হত্যার বদলে হত্যা— হিংসার বদলে হিংসা— এই আবহমান হত্যার তত্ত্বে তো মুক্তির কোন পথ আমি দেখতে পাই না— তাইতো আমি শুধু প্রেমের কথা বলি— বলি ঈশ্বরের অপার মহিমার কথা— বলি মানুষই ঈশ্বর— ঈশ্বরই মানুষ—”^{১৪৮}

এরপর বিভ্রান্ত সুজাতকে দু-হাত ধরে তোলেন মার্ক্স ও চৈতন্য। তাঁর মনের শান্তি কামনা করেন। তাঁদের উভয়ের সম্মিলিত কণ্ঠে শোনা যায় এক চিরন্তন শান্তির শাস্বত বাণী —

“আমরা ছিলাম তোমার সঙ্গে।

আমরা আছি তোমার সঙ্গে।

আমরা থাকব তোমার সঙ্গে।”^{১৪৯}

দুটি পৃথক আদর্শ সুজাতের চেতনা থেকে বেরিয়ে এসেছিল এবং এক সময় তা তাঁর অন্তর্চেতনায় বিলীন হয়ে গেছে। প্রকৃত দেশপ্রেমিক বিপ্লবীর যেমন মৃত্যু হয় না, তেমনি আদর্শেরও কোনো মৃত্যু নেই। কার্ল মার্ক্সের আদর্শ যেমন জনগণের মধ্যে চিরন্তন, তেমনি চৈতন্যের মানবপ্রেমের আদর্শ শাস্বত অমর। তাই প্রকৃত দেশপ্রেমিক সুজাত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও অভয়কণ্ঠে বলতে পারেন—

“দাঁড়াও। আমার শেষ কথা তুমি জানতে চাইছিলে, না? আমার শেষ কথা হল—মানুষের মুক্তি চাই। কিন্তু তার পথ জানি না। মহাকালের উত্তরের অপেক্ষায় থেকে যাব চিরকাল। যুগে যুগে আসব আমরা। উত্তর খুঁজে যাব। পথ খুঁজে যাব।”^{১৫০}

বিপ্লবী জীবনে সুজাত মার্ক্সের সংগ্রামের পথ নিলেও, পরিণতিতে চৈতন্যের মানবমুক্তির পথেই যাত্রা করেছেন। রাজনৈতিক তত্ত্ব-চেতনায় সমৃদ্ধ হলেও চৈতন্য ভাবনায় আলোকিত এই নাটকটি আধুনিক নাটক রূপে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

আলোচ্য নাটকে চারটি চরিত্রের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কথোপকথনে উঠে এসেছে চৈতন্য ভাবনা। নাটকটিতে রয়েছে একালের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা। কমিউনিস্ট বিপ্লবী সুজাত ফাঁসির সেলে বন্দী হয়ে আছেন, কিন্তু তাঁর চেতনায় মার্ক্স ও চৈতন্যের সাক্ষাৎ একটি নবভাবনার প্রেক্ষাপট রচনা করেছে। সুজাত এই নাটকের বাস্তব তথা কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাঁর কাছে সমাজ-প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ এইরকম গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষের কোন উপকার হয় না। জেলার বন্ধু প্রসাদ অ্যান্টনিকে সুজাত বলেছেন—

“সিস্টেম! সিস্টেম! তোমাদের সিস্টেমে আমি লাগি মারি। তোমাদের সিস্টেম! তোমাদের রাষ্ট্র! তোমাদের শাসকদের লুণ্ঠের সিস্টেম! পুঁজিপতিদের ভর্তুকি দেওয়ার সিস্টেম! অবাধ ঘুষ, চুরি, লুণ্ঠ, দুর্নীতির সিস্টেম! লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকায় সুইস ব্যাঙ্কে ঐশ্বর্যের পাহাড় গড়ে তোলার সিস্টেম! গণতন্ত্রের ভাঙতা দেওয়া সিস্টেম, যেখানে কারোর আয় ৫০ টাকা আর কারোর ৫০ লক্ষ টাকা, নিরন্ন আদিবাসীদের উচ্ছেদ করার সিস্টেম,... রুটির বদলে, ওষুধের বদলে, শিক্ষার বদলে অস্ত্র তৈরির সিস্টেম—আর—আর এই সিস্টেমকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে, লালন করার জন্যে তোমাদের সংবিধান, লেজিসলেটিভ, জুডিসিয়ারি, আইপিসি, ইউএপিএ, পুলিশ, মিলিটারি আর সাম্রাজ্যবাদের পদলেহন। তোমাদের পৃথিবীজোড়া সিস্টেমের সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠ। বিশ্বায়নের নামে বিশ্বজোড়া লুণ্ঠ।”^{১৫১}

এই রকম ভয়ানক দূষিত সমাজে সুজাত আর বাঁচতে চান না; মৃত্যু যেন তাঁর কাছে অনেক বেশি সত্যের। সুজাত ভেতরে ভেতরে অনুশোচনায় দগ্ধ হন। কারণ একসময় বিপ্লবী হয়ে শোষিত, নির্যাতিত মানুষের পক্ষ নিয়ে অন্যায়কারী মানুষকে হত্যা

করেছেন। সুজাতের পথ ছিল বিপ্লবের পথ, সেখানে ঘাত-প্রতিঘাতের অনিবার্যতা রয়েছে। চৈতন্য সুজাতকে বলেছেন—

“আমি যে প্রাণপণ অনুভব করেছি বেদান্তের মূলবাণী। আমি যে অনুভব করেছি যে জীবের আত্মা ঈশ্বরের এক একটি ভিন্ন অংশ। ঈশ্বরের প্রেমই চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন জীবনের। তাহলেই সব মানুষ বিনা সংকোচে ভালোবাসবে সব মানুষকে। কেউ কাউকে দুঃখ দেবে না, কষ্ট দেবে না, পীড়ন করবে না। মানুষের দুঃখে, কষ্টে যে আমার প্রাণ অহরহ ডুকরে কাঁদে, দার্শনিক।”^{১৫২}

কার্ল মার্ক্স চৈতন্যের প্রদর্শিত পথকে আদর্শ পথ বলে স্বীকার করলেও প্রতিবাদের পথকে অবজ্ঞা করতে পারেনি। তিনি সুজাতকে সমর্থন করেছেন। কারণ প্রতিবাদের পথ ছাড়া বুর্জোয়াদের অত্যাচার কখনো থামেনি, পুঁজিবাদের অভ্যুত্থান কখনো বন্ধ হয়নি, বিপ্লবের পথ ছাড়া, কমিউনিস্টদের আন্দোলন ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হবে না। সুজাতের উদ্দেশ্যে মার্ক্স বলেছেন—

“কমরেড! আমি উনিশ শতকের মানুষ। কোন বিশ্বযুদ্ধ দেখিনি। দেখিনি কমিউনিজামের নামে ভয়ানক গণহত্যা। এসব মানবতার সপক্ষে নয়। আমিও এর বিরুদ্ধে কমরেড, আবার বলছি, শ্রেণীহীন, শোষণহীন মুক্ত দুনিয়া গড়তে গেলে শোষকরা ভীষণভাবে হিংস্র আক্রমণ করবেই। যুগে যুগে তাই তারা করেছে। দাসতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র- সব তন্ত্রেই তাদের ভয়ংকর নির্যাতন আর হত্যালীলার ইতিহাস তো আর পাতা খুলে রেখেছে আমাদের সামনে। তাই তাদের সঙ্গে সংগ্রাম তো অনিবার্য-হিংসা অনিবার্য-হত্যা অনিবার্য—”^{১৫৩}

নাটকটির মধ্যে দু’টি পৃথক পথ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে— একদিকে চৈতন্যের প্রদর্শিত মানব আত্মার মুক্তির পথ, যা মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসার শুভ কামনায় ব্যাপ্ত। অন্যদিকে মার্ক্সের শ্রেণীশোষণ অবলুপ্তির জন্য সংগ্রামের পথ, যা অর্জিত শোষকের, পুঁজিবাদের রক্তে। এই দুই আদর্শের টানাপোড়নে সুজাত মৃত্যুর আগে আলোড়িত এবং উদভ্রান্ত হয়েছেন। যীশুর পথও চৈতন্যের প্রদর্শিত পথ। যীশু একই ভাবে নিজের জীবন দিয়ে মানব প্রেমের ধর্ম প্রচার করে গেছেন। কিন্তু কখনো অত্যাচার অন্যায়কে বড় করে দেখেননি; বরং অত্যাচারির পক্ষ নিয়ে তাঁদের হয়ে পরমাত্মার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। চৈতন্য-মার্ক্সের পথ একসময় মিলিত হয়েছে তাঁর চেতনার জগতে। যেন

সমস্ত পথই মিলিত হয়েছে মানব কল্যাণের আদর্শে। সেই পথেই সুজাত যাত্রা করেছেন। নাট্য-পরিণতিতে বন্ধু অ্যান্টনি নির্দিষ্টায় সুজাতকে বলতে পেরেছেন—

“সুজাত, আমি তোমার মতো রাজনীতি বুঝি না। কিন্তু মানুষের জন্যে তোমার আত্মত্যাগ বুঝতে পারি। আমি এক অত্যন্ত সাধারণ পরিবারে মানুষ। দারিদ্র্য, অন্যায, অত্যাচার, শোষণ আমি দেখেছি। ভিন্ন ধর্মের মানুষ হওয়ার কারণে লাঞ্চিতও হয়েছি। হয়ত মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী ছিলাম না। কিন্তু মানুষের সাম্যের অধিকারে আমি বিশ্বাস করি। কেননা আমি অন্ধ নই। মানুষের দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, বঞ্চনা আমি দেখেছি। কিন্তু কোনোদিন প্রতিবাদ করতে পারিনি। কেননা আমি তোমার মতো সাহসী কোনোদিন ছিলাম না। এক অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষমতা, সীমাবদ্ধ যোগ্যতা ও সীমাবদ্ধ সাহসের মানুষ আমি। আমি তোমাকে সেলাম জানাই বন্ধু এই জেলের সেলের মধ্যে এখন তোমার সামনে আমি একা। তাই নতমস্তকে সেলাম করে কাপুরুষের মতো সাহস সঞ্চয় করে বলছি তুমি মানুষের সপক্ষে দাঁড়ানো একজন বিপ্লবী, যার পথ হয়ত ভুল বা হয়ত ঠিক— কিন্তু একজন পূর্ণ মানুষ তুমি, সুজাত—(কেঁদে ফেলে)—আমার মতো অসম্পূর্ণ মানুষ নয়—”^{১৫৪}

সুজাতের এই সংলাপে ধরা পরেছে একজন প্রকৃত কমিউনিস্ট বিপ্লবীর আদর্শ। তিনি নিজের পরিবারের কথা, নিজের ভালোবাসার কথা, নিজের স্বপ্নের কথা ভুলে গিয়ে দেশসেবার পথকে জীবনের একমাত্র ধর্ম বলে মেনে নিয়েছেন। তাই তাঁর বন্ধুর চোখে অনেক উঁচুতে তাঁর অবস্থান। সুজাত এই কলুষিত সমাজের একজন আদর্শ মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছেন। নাটকটি রাজনৈতিক মতাদর্শে লেখা হলেও চৈতন্যের মানব কল্যাণ আদর্শে সীমায়িত হয়েছে। চৈতন্য প্রদর্শিত মানবধর্ম জীবনের একমাত্র পথ -এই আদর্শ নাটকটিকে একই সঙ্গে আধুনিক, পুনর্নির্মিত ও বিনির্মিত নাটক করে তুলেছে।

সৌমেন পাল— ‘দখলনামা’ (২০১৫);

নাট্যকার সৌমেন পাল চৈতন্যভাবনাকে অবলম্বন করে ২০১৫ সালে ‘দখলনামা’ নামের একটি নাটক লিখেছেন। ১৭ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১৫ সেন্টিমিটার চওড়া এই নাটকটিতে প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (১), মূল নাটক (২৬) সহ মোট ২৮টি পৃষ্ঠা আছে। নাটকটির প্রচ্ছদপত্র এইরূপ -

“গ্রাম বাংলার একমাত্র নাট্যমুখপত্র/ অসময়ের/ নাট্য ভাবনা ”^{১৫৪}

নাটকটির নামপত্র ও চরিত্রলিপি এইরূপ-

“দখলনামা”/ সৌমেন পাল/ চরিত্র/ কৃষ্ণলোচন, শ্যামলোচন,
চন্দ্রাবলী, অধর, ব্রজকিশোর ও নন্দদুলাল।”^{১৫৫}

নাটকটি প্রকাশিত হয় রঙ্গম দাশগুপ্তের সম্পাদনায় ‘বেঙ্গল লোকায়ত প্রিন্টার্স প্রা. লি. কলকাতা ১৪ থেকে। নাটকটির প্রচ্ছদে চৈতন্যের চরণ যুগলের চিত্র অঙ্কিত আছে। নাট্যপত্রিকাটির মূল্য একশত টাকা।

সমগ্র নাটকটিতে চৈতন্যের মাহাত্ম্য প্রচারের কথা থাকলেও মূল ভাবনাটিতে জায়গা করে নিয়েছে আধুনিক সভ্যতার ধর্ম নিয়ে ব্যবসার আগ্রাসী আধিপত্য। কৃষ্ণলোচন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ও চৈতন্যভক্ত। সংসারের দারিদ্র্য তাঁকে বিচলিত করতে না পারলেও স্ত্রী চন্দ্রাবলী এবং পুত্র শ্যামলোচন তাঁকে আহত করে। তাঁরা তাঁদের পূর্বপুরুষের কৃষ্ণ ও চৈতন্যের মন্দির, জমি ও বসতবাড়ি বিক্রয় করে স্বচ্ছল জীবনযাপন করতে চান। যদিও কৃষ্ণলোচন তাতে রাজি হননি। ফলে তাঁদের অন্তরে গোপন ক্ষোভ জমা হতে থাকে। কৃষ্ণলোচন তাঁর স্ত্রীকে জমি বিক্রির প্রসঙ্গে সরাসরি জানিয়েছেন -

“এই বসতবাড়ি শ্রীগৌরের স্মৃতি বিজড়িত। এই পবিত্র মন্দির তোমার কাছে শুধু জমি হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে আমার জীবন, আমার অস্তিত্ব। এই কেলি কদম্ব তলে শ্রীচৈতন্য ব্রজধাম যাত্রাকালে আমার পূর্বপুরুষ শ্রীধর গোস্বামীর হাত থেকে জল বাতাসা খেয়েছিলেন। পুণ্য এ ভূমি। আর তোমরা একে বিক্রি...”^{১৫৬}

একথা শোনার পর পুত্র শ্যামলোচন বাবার প্রতি বিরক্ত হয়ে বলেন—

“বেকার! বেকার! বেকার বাবার সঙ্গে এসব আলোচনা করছো। উনি দুঃখবিলাসী, দৈন্য ওনার অহংকার।”^{১৫৭}

কৃষ্ণলোচন পুত্রকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে কৃষ্ণ-চৈতন্যের সাধনা দৈন্যতা নয়, দারিদ্র্যের মধ্যেও ভোগবাদী আগ্রাসনকে রোখার অহংকার। ইতিমধ্যে কাহিনিকথায় এসেছেন নন্দকিশোর। তাঁর পরিচয় হল তিনি একজন এমসকন মন্দিরের ছদ্মবেশী এজেন্ট। তিনি এসেছেন মহাপ্রভুর স্মৃতিবিজড়িত এই দেবমন্দির সহ তার চারপাশের

জমি আত্মসাৎ করার জন্য। বাজার মূল্যের দশগুণ দাম দিতে চান তিনি, কিন্তু একসময় ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। তাঁদের আসল উদ্দেশ্য ছিল শ্রীচৈতন্যের নামে একটি মঠ গড়ে তোলা এবং ধর্মকে সামনে রেখে প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জন করা। কৃষ্ণলোচন এই প্রসঙ্গে তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত করে আধুনিক বুদ্ধিমান মানুষের চেতনাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য হল-

“দেশের ক্ষতি হচ্ছে। টাকা ও চাকরির লোভ দেখিয়ে সীমান্তের কাছাকাছি নদীবেষ্টিত একটা গোটা ব্লক দখল করে দুর্গ নির্মিত হচ্ছে। এলাকার মঠগুলোকে কোথাও সংস্কারের কোথাও অনুদানের অছিলায় নিজেদের আয়ত্তে এনে একচেটিয়া ধর্মীয় আধিপত্য কায়েম করার চেষ্টা করছে।”^{১৫৮}

নাট্যকাহিনির দ্বিতীয়াংশে লিটন ওরফে ব্রজকিশোর এসেছেন ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে। তিনি কৌশল হিসেবে বেছে নিয়েছেন ধর্মের ছদ্মবেশকে। যেহেতু কৃষ্ণলোচন ধার্মিক, তাই ব্রজকিশোর তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। যদিও কয়েকদিনের মধ্যেই কৃষ্ণলোচন ব্রজকিশোরের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছেন। ব্রজকিশোর আসলে কৃষ্ণলোচনকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন এইভাবে -

“Very simple। প্রথমে বিভিন্ন posture আর মানানসই costume-এ গুরুজীর ফটো তুলব। ওনার কীর্তন, বাণী ও আরতির ভিডিওগ্রাফি করব। টারগেট এরিয়াতে ফ্লেক্স ও ব্যানার টাঙাবো। গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা জল ও বাতাসা খাওয়ানোর বুথ বানিয়ে সিডি চালিয়ে রাখব আর লোকাল কেবলে ধারাবাহিকভাবে টেলিকাস্ট করব। দীর্ঘ প্রচারের পর শীতকালে বিশাল প্যাভেল করে ধর্মসভা করব। আর ঐ ধর্মসভাই হবে দীক্ষা সভা। তারপরই শুরু হবে organization তৈরির কাজ।”^{১৫৯}

উত্তরে কৃষ্ণলোচন বলেছেন—

“যে মন্দিরের অপাপস্পর্শ রূপ দেখে তুমি আকৃষ্ট হয়েছ বলে দাবি করছো, সেই মন্দিরেই বাজারের পাপ লাগাতে চাইছো। আর কখনো এরকম কুপ্রস্তাব নিয়ে আমার সামনে আসবে না। মনে রেখো, যে ব্যক্তি শিষ্যত্ব প্রদান করতে পারে, সে শিষ্যত্ব কেড়েও নিতে পারে।”^{১৬০}

ব্রজকিশোর যখন কিছুতেই কৃষ্ণলোচনকে বোঝাতে পারলেন না, তখন তিনি তাঁর পুত্র ও পত্নীকে অর্থলোভ দেখিয়ে বশ করেন। ব্রজকিশোর শ্যামলোচনকে বলেছেন —

“একের বদলে যদি পাঁচ লাখ শিষ্য হয়, রোজগার হবে পাঁচ কোটি। দশ লাখ হলে দশ কোটি। অর্থাৎ, মাসে এক কোটি। মা প্রতি মাসে প্লেনে করে তীর্থযাত্রায় যেতে পারবেন। (শ্যামকে) সব দেশের মেমেদের এখানে রেখে লীলাকীর্তন করাতে পারবে।”^{১৬১}

নাটকের চতুর্থ দৃশ্যে চৈতন্যভক্ত কৃষ্ণলোচনের মৃত্যু হয়েছে নিজের সন্তান এবং ছদ্মবেশী আততায়ীর চক্রান্তে। বর্ষায় বিধ্বস্ত হওয়ার আগে পুত্রের কাছে পিতার আবেদন খুবই মর্মান্তিক, যা আমাদের সমাজে কলঙ্কিত পুত্রের স্বরূপকে স্পষ্ট করে -

“সামান্য কটা মুদ্রার জন্য নিজের আত্মাকে শয়তানের কাছে বিক্রি করে দিলি, বাবা? (শ্রীগৌরঙ্গের বিগ্রহকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। দুহাত তুলে শ্রীগৌরের ভঙ্গিমায় দাঁড়ায়) আমি প্রস্তুত। তোমাদের বর্ষা বর্ষাধারার মতো আমার বক্ষে ঝরে পড়ুক। (চোখ বন্ধ করে) জয় গৌর নিতাই, জয় গৌর নিতাই...”^{১৬২}

পরবর্তী সময় শ্যামলোচন বুঝতে পারেন তিনিও তাঁদের চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। এই সময় শ্যামলোচন পুলিশের কাছে যেতে চেয়েছেন, কিন্তু ব্রজকিশোর তাঁকে পরিস্কারভাবে জানিয়ে দেন—

“যেও। তবে যাবার আগে আবার agreement-এর কথা মনে করিয়ে দিই। চুক্তিপত্রে লেখা আছে যে আপনি নব চৈতন্য ট্রাস্টের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আগামীকাল, অর্থাৎ বিশেষ আগস্ট নেবেন। এবং আজ উনিশে আগস্ট আপনার পিতা আততায়ীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হলেন। এর মানেটা কি হল, মহারাজ। (কিছুক্ষণ সকলে চুপ) কই যান। পুলিশের কাছে যাবেন না? শোন, এরপর তুমি যদি আত্মহত্যাও করিস তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। তারপর, তোর মা, বোন বা বউকে মাতাজী করে। এমনকি প্রয়োজন হলে তোর সদ্যজাত ভাগ্নেকে অবতার বানিয়ে নব চৈতন্য ট্রাস্ট চালিয়ে দেব।... দশ মিনিট সময় দিলাম। বাবাকে শেষ দেখা দেখে নে। তারপর বাড়ি ট্রাস্টি বোর্ড দখল নিয়ে কালকের procession-এর জন্য রেডি করবে।”^{১৬৩}

এই সময় শ্যামলোচনের আত্ম-অনুশোচনার আর সীমা রইল না। তিনি মৃত পিতার পায়ের কাছে হাতজোড় করে বলেন -

“বাবা, আমি সত্যিই আমার আত্মাকে শয়তানের কাছে বেচে দিয়েছি।
ভুল করেছি। আমায় মুক্তি দাও। মুক্তি দাও।”^{১৬৪}

নাটকটি চৈতন্য ভাবনায় জারিত হলেও এখানে ধর্মকে প্রাধান্য না দিয়ে নাট্যকার অভূতপূর্বভাবে আধুনিক মানুষের মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা-চেতনাকে নাটকের প্রধান বিষয় করে তুলেছেন। মহাপ্রভুর প্রসঙ্গ টেনে বর্তমানের আগ্রাসী মানুষের মনস্তত্ত্বকে বাস্তবে রূপায়িত করে নাটকটিকে পুনর্নির্মাণ করেছেন। আধুনিক মানুষের ধনতৃষ্ণা ও নিবুদ্ধিতা কেমন করে পরিবারকে ধ্বংস করে, পুরানো ঐতিহ্যকে নষ্ট করে, মানুষকে খুনি বানায়- নাটকটিতে তারই রূপায়ণ বাস্তবতা পেয়েছে। কৃষ্ণলোচন পত্নী ও পুত্রের লোভের স্বীকার হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পরেছেন। নাটকে কৃষ্ণলোচন চরিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতো চৈতন্য ভক্ত আমাদের সমাজের আদর্শ। বংশের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও পুত্র শ্যামলোচন ধার্মিক নয়। তিনি লোভী মানুষের প্রতিনিধি। নন্দদুলাল এবং ব্রজকিশোর এজলাসকন মন্দিরের এজেন্ট। তাঁদের কাজ ট্রাস্টির উদ্দেশ্য সাধন ও জীবিকা অর্জনের সহজ পথ অন্বেষণ। এই নাটকে কৃষ্ণলোচনের পত্নী চন্দ্রাবলী ন্যায়া- অন্যায়েয় উর্ধ্ব আধুনিক অর্থলোভী নারীর প্রতীক হয়ে উঠেছেন। কোটি কোটি টাকার প্রলোভন তাঁর জীবনকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। আমাদের সমাজে এমন অনেক চরিত্র আছে, যারা ভালোমানুষের ছদ্মবেশে সাধারণ মানুষকে ঠকায়। নন্দদুলাল, ব্রজকিশোর সেই ধরনের মানুষ। একসময় শ্যামলোচন ব্রজকিশোরের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে উত্তেজিত কণ্ঠে বলেছেন— ‘বেইমান, শয়তান। আমি তোদের ছাড়বো না’। কিন্তু শ্যামলোচনের এই রাগের আর কোনো অর্থ হয় না। কারণ ততক্ষণে আইনত পৈত্রিক সম্পত্তির সিংহভাগ চলে যায় ট্রাস্টির হাতে। নাটকে চৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব বা উপস্থিতি না থাকলেও পুরো নাটকটি চৈতন্য মন্দির ও কৃষ্ণলোচনের চৈতন্যভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ধর্মকে কেন্দ্র করে একদল অসাধু ব্যবসায়ী মানুষকে ঠকিয়ে কীভাবে অর্থ উপার্জন করে, এই নাটকে সেই চিত্রই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নাটকের সংলাপেও একালের চলিত গদ্যভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও কোথাও আধুনিক কালের শিক্ষিত মানুষের ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের ঝোঁক লক্ষ্য করা গেছে। যেমন ব্রজকিশোর শ্যামলোচনকে টাকার লোভ দেখাতে গিয়ে বলেছেন —

“অন্তত। মিনিমাম। আগামী চার বছরের মধ্যে আমাদের শিষ্যের সংখ্যা
দাঁড়াবে প্রায় এক লক্ষ। একজন শিষ্য গুরুর জন্য যদি অ্যাটলিস্ট
বছরে একশো টাকা খরচা করে তাহলে one lakh into one

hundred equals to? One crore, minimum. আর এর মধ্যে একটা বড় অংশ থাকবে যারা কম সে কম পাঁচশো টাকা cash বা kinds-এ দেবে। তাহলে অঙ্কটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো? এই যে আপনি বাসে করে মথুরা বৃন্দাবনে গিয়ে বিশাল বিশাল আশ্রম মন্দির দেখে এসেছেন—Italian marble centrally AC—এসব কার পয়সায়। সব শিষ্যদের আর Corporate house দেয়। যত চাকচিক্য তত ভক্ত। যত ভক্ত তত... তত... (টাকা গোনার ইঙ্গিত করে)।”^{১৬৫}

এইভাবে নাটকের শরীরে নানা প্রসঙ্গে বহু ইংরেজি শব্দের ব্যবহার আছে, যা আধুনিক নাট্য দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এছাড়াও এই নাটকে নবদ্বীপের ভৌগোলিক সীমারেখা পরিবর্তনের কথা এসেছে ব্রজকিশোরের বক্তব্যে, যা অনেকটাই ইতিহাস সম্মত সত্য বলে মনে হয়। ব্রজকিশোরের বলেছেন—

“সত্যি কথা বলতে কী, নবদ্বীপের ভূগোলটাই তো গোলমেলে। ১৭৪৭ থেকে ১৯১১-র মধ্যে নবদ্বীপে কমপক্ষে দশবার বিধ্বংসী বন্যা হয়েছে। ভাগীরথী নদীর ভাঙনে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে বহুবার। সেই সঙ্গে বহুবার পালটেছে শহরের মানচিত্র। শ্রীচৈতন্যদেবের কালে ভাগীরথী নবদ্বীপের পশ্চিমপ্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত হত, আর আজ হয় পূর্বপ্রান্ত দিয়ে। অর্থাৎ, সেই সময়ের যা বাস্তব তা আজ হয় ভূগর্ভে বা নদীগর্ভে। তাই আজ যা সত্য বলে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়, যেমন—জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ি, শ্রীচৈতন্যের আঁতুড়ঘর, নিমগাছ, পিসির বাড়ি, মামার বাড়ি ইত্যাদি—কতটা আসল কতটা নকল তার হিসাব মেলা ভার।”^{১৬৬}

আধুনিক মানুষের এইরূপ বিচার-বিশ্লেষণ ও তথ্যপূর্ণ ভৌগোলিক পরিস্থিতি ‘দখলনামা’ নাটকটিকে আধুনিক করে তুলেছে। চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণব পরিবারের লোভ ও ধ্বংসের বাস্তব চিত্র প্রকাশিত হওয়ায় নাটকটি চৈতন্যজীবনী সাহিত্যের নাট্য পুনর্নির্মাণ হয়ে উঠেছে।

আরণ্যক বসু— ‘চৈতন্য হোক’ (২০১৫) ;

২০১৫ খ্রিস্টাব্দে নাট্যকার আরণ্যক বসু লেখেন চৈতন্যচেতনার আলোকে উদ্ভাসিত ‘চৈতন্য হোক’ নামক নাটক। ২৪ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১৮ সেন্টিমিটার চওড়া

এই নাটকের প্রচ্ছদপত্র (১), নামপত্র (১), মূল নাটক (১৮) সহ মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা কুড়ি।
নাটকটির প্রচ্ছদপত্র এইরূপ-

“গ্রাম বাংলার একমাত্র নাট্যমুখপত্র/ অসময়ের/ নাট্য ভাবনা”^{১৬৭}

নাটকটির নামপত্র ও চরিত্রলিপি এইরূপ-

“চৈতন্য হোক/ আরণ্যক বসু/ চরিত্র/ নন্দিনী, মা
সারদা, নিবেদিতা, নিমাই, নিমাইয়ের মা, দ্রোণাচার্য,
শ্যামলিমা, সন্দীপ।”^{১৬৮}

নাটকটি প্রকাশিত হয় রঙ্গন দাশগুপ্তের সম্পাদনায় বেঙ্গল লোকামত প্রিন্টার্স প্রা. লি.
কলকাতা ১৪ থেকে। নাটকটির প্রচ্ছদে চৈতন্যের চরণ যুগলের চিত্র অঙ্কিত আছে।
নাট্য পত্রিকার মূল্য একশত টাকা।

নাট্যকার আরণ্যক বসু চৈতন্যের গণজাগরণের মাহাত্ম্যকে পুনরায় জনগণের মধ্যে
প্রচার করার লক্ষ্যে ‘চৈতন্যহোক’ নাটকটি রচনা করেন। এখানে তিনি ধর্মকে অবলম্বন
করেননি, চৈতন্যের সমাজচেতনাকে প্রধান করেছেন। কাহিনির সঙ্গে যুক্ত করেছেন
নন্দিনীর মতো কল্পিত সংস্কারমুক্ত ভাববাদী চরিত্র এবং মা সারদাদেবী ও সমাজসেবিকা
নিবেদিতার মতো নারী চরিত্র। নাটকের শুরুতে নন্দিনীকে বলতে শোনা যায়
মানবধর্মের আদর্শের কথা। নন্দিনী বলেছেন—

“এই বারবার জন্ম একটা মিশনের জন্য। একটা গণজাগরণের জন্য।
বহুবার আমি জন্ম নিয়েছি, যতবার মারা গিয়েছি। ততবার আমি আবার
এসেছি, যতবার আমি রক্তে ভেসেছি মরণ নদীর কূলে। আমার ঈশ্বর
নেই, ধর্ম নেই। আছে মানবধর্ম। The greatest musician of this
world। শ্রীকৃষ্ণই আমার আরাধ্য। ভগবান নন, মানুষ শ্রীকৃষ্ণ।”^{১৬৯}

প্রাসঙ্গিক ভাবে সেইসময় নেপথ্যে গানে গানে চৈতন্যভাবনা উঠে আসে—

“শোনো শোনো গো জগৎবাসী,
মেলে জ্ঞানের চোখ
শ্রীচৈতন্য ডাকে—
তোদের চৈতন্য হোক—”^{১৭০}

নাটকটিতে মা সারদা নিবেদিতার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে নারীজাতির উন্নতিতে শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন—

“তবে লেখাপড়াটা শিখতেই হবে মেয়েদের। মায়েরা শিক্ষিত হলে, ছেলে মেয়েও শিক্ষিত হবে। স্বামীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ধর্ম আর অত্যাচারের পাঁক থেকে উঠে আসবে ভবিষ্যতের নিবেদিতা, নন্দিনীরা—
,,১৭১

তাঁর কথায় আধুনিক নারী-জাগরণের প্রতিধ্বনি শোনা গেছে। এর পরেই কাহিনিধারায় এসেছে শচীমাতা এবং নিমাইয়ের প্রসঙ্গ। শচীমাতার কাছ থেকে নিমাই বিদায় চান গণচৈতন্য জাগরণের কাজ করার জন্য। তাঁর ধর্ম মানবপ্রেমের ধর্ম। সেই প্রেমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কৃষ্ণপ্রেমের অমৃতধারা। চৈতন্যের পথ ধরেই মধ্যযুগীয় ধর্মীয় ভাবনায় একটি প্লাবন আসে, যার প্রভাব আধুনিক কালেও বর্তমান। নিমাই বলেছেন —

“শচীরানি— আমি সন্ন্যাসেতে যাই—তুমি মনেরে বুঝাইয়া রেখো গো—
মাগো তোমার নিমাই নাই—(গান থামিয়ে) আনন্দ করো মা। একদিন
এই পৃথিবীতে শুধু একটাই সম্প্রদায় থাকবে—মানুষ। একটাই ধর্ম—
মানবধর্ম। মানুষ আর বলি দেবে না।”^{১৭২}

নাটকের পঞ্চম দৃশ্যে আধুনিক মানবপ্রেমের কথা প্রকাশ পেয়েছে শ্যামলিমা ও সন্দীপের কথোপকথনে। প্রেমিকা নারী শ্যামলিমা ঈশানজির দেশপ্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সন্দীপের ভালোবাসাকে অতিক্রম করে চলে গেছেন স্বদেশপ্রেমের আদর্শকে সামনে রেখে। তাঁদের কথোপকথনের একটি নাট্যমুহূর্ত সেকথারই প্রমাণ দেয়—

“সন্দীপ- দাঁড়াও। এভাবে তুমি চলে যেতে পারো না। বিয়ে করছো?
শ্যামলিমা- পাগল! তুমিই তো আমার জন্ম জন্মান্তরের বর গো।
সন্দীপ- ঠাট্টা নয়। কোথায় যাচ্ছে ?
শ্যামলিমা- একটা মিশনে। স্বামীজির ভাষায় বললাম। এর কোনো বাংলা প্রতিশব্দ হয় না তেমন জোরালো। কখনো কিছু অনুরোধ করলে রাখবার চেষ্টা করো। মোবাইল থাকবে না। চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলবে।
সন্দীপ- মানে! তুমি কি?

শ্যামলিমা- হ্যাঁ সন্দীপ, ঠিক তাই। আমি ঈশানজির ডাকে সাড়া দিয়ে চলে
যাচ্ছি জঙ্গলে। আর কোনো প্রশ্ন নয়। চলি।”^{১৭৩}

শুধু পুরুষ নয়, শ্যামলিমার মতো কত নারী সেদিন ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে দেশের
কাজ করতে এগিয়ে এসেছিলেন, শ্যামলিমা যেন তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নাটকটি
সত্যি আধুনিক নারী মুক্তির নাটক; তার প্রকৃত উত্তরণ গণচেতনার জাগরণে। ষোড়শ
শতাব্দীর একজন মানুষ কতটা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং আধুনিক ছিলেন, তার প্রমাণ এই
‘চৈতন্যহোক’ নাটকটি। শুধু তাই নয়, চৈতন্যের আদর্শ যে সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত
এবং একাল থেকে কালান্তরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সেকথা নাটকে বার বার বলার
চেষ্টা করা হয়েছে।

‘চৈতন্য হোক’ নাটকের প্রতিটি চরিত্র চৈতন্যের জীবনভাবনায় আধারিত, তবে
তাকে একালের মতো করে রপান্তরিত করা হয়েছে। এই নাটকে নিমাই, নিমাইয়ের মা,
দ্রোণাচার্য ছাড়া অন্য চরিত্রগুলি নাট্যকার পরবর্তীকালের প্রেক্ষাপট থেকে নিয়েছেন। মা
সারদা ও নিবেদিতা এখানে সমাজসেবিকা রূপে চিত্রিত। নন্দিনী, শ্যামলিমা, সন্দীপ-
এই তিনটি চরিত্র নাট্যকারের কল্পনা থেকে উদ্ভূত। মোট আটটি চরিত্রের কালোত্তীর্ণ
মেলবন্ধন ঘটিয়ে নাট্যকার আধুনিক জীবনদৃষ্টিতে চৈতন্য চেতনাকে অন্বেষণ করেছেন।
নাটকটিতে মানবধর্মের চৈতন্যজাগরণ মুখ্য ভাবনা হয়ে উঠেছে। নন্দিনীর কাছে ধর্ম
বলতে অজানা ঈশ্বর নন, বুদ্ধ, গান্ধী, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্যের মতো মানুষের
স্বাধীন বাণী ও চিন্তা প্রধান হয়েছে। নন্দিনীর প্রধান ক্ষোভ সমাজের অন্যায়কারি
মানুষের বিরুদ্ধে, যারা অসহায়তার সুযোগ নিয়ে নারীদের ধর্ষণ করে। একসময় মা
সারদাকে নন্দিনী বলেছেন—

“নিজেকে বাঁচাতে জানতে হবে। বেঁচে থাকতে হবে। আমিও পারিনি
শ্রীক্ষেত্রে সে সন্ধ্যায় নিজেকে বাঁচাতে। পাপীরা আমাকে বিষপানে বাধ্য
করলো। মহাকাশ থেকে কেউ যেন বলেছিল— এ পানপাত্র নিদারুণ
বিষে ভরা, দূরে ফেলে দাও, দূরে ফেলে দাও ত্বরা। বেঁচে থাকলে
অনেক কাজ করা যেত। শ্রীকৃষ্ণ নামের জোয়ারে গণ অভ্যুত্থান
চেয়েছিলাম। হল না। তবু বলি—তোদের চৈতন্য হোক—ওঠো, জাগো হে
বঙ্গনারী, ভুলে লজ্জা শোক, শ্রীচৈতন্য বলে তোদের চৈতন্য হোক।”^{১৭৪}

নাটকটির মধ্যে গণচৈতন্যের ডাক সবচেয়ে বড় জায়গা নিয়েছে। নিমাই এখানে গণজাগরণের প্রতীক। শচী মাতার সঙ্গে নিমাইয়ের আবেগাপ্লুত কথায় ধরা পড়েছে সমাজের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার কথা—

“রক্তের বন্যা বইছে হিন্দু-মুসলমানের হানাহানিতে। দুই পরস্পর বিরোধী সম্প্রদায়ের মিলিত শক্তিই পারে ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। সেই গণজাগরণের আমি নেতৃত্ব দেব। তবে ছায়াময় হয়ে। কায়াম আমার ঝরে গেছে শ্রীক্ষেত্রে। আমি যাই, প্রিয়াকে বোলো না আমি যে এসেছিলাম। ও কাঁদবে। ওর বয়স কম। ওকে লাখাপড়া শিখিও। সন্তানকে ও যেন মানুষ করে তোলে ও। ও যেন অকারণ বৈধব্য পরিহার করে।”^{১৭৫}

নিমাইয়ের এই কথায় দুটি বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। এক, সন্তানকে পড়াশুনা শিখিয়ে মানুষ করে তোলা, দুই, বিমুগ্ধপ্রিয়ার বৈধব্য ত্যাগ করা। একজন প্রকৃত সমাজ-সংস্কারকের মতো চৈতন্যমহাপ্রভু সমাজের নারী-পুরুষের অন্তর-বাহিরের সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেছেন। শ্যামলিমা একেবারে সাধারণ ঘরের মেয়ে। সন্দীপকে তিনি ভালোবাসে। কিন্তু দেশের জন্য, দেশের জন্য একসময় ভালোবাসাকে অতিক্রম করে গেছে তিনি। তাঁর কাছে আই. এ. এস. জনপ্রতিনিধিত্ব, চাকুরী কোন কিছুই গুরুত্ব পায়নি। তিনি ভেবেছেন দেশের অতি সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথা। তাই নিজের জীবনের ভালো-মন্দ বিচার না করে, এগিয়ে এগিয়ে গেছে বিপ্লবের পথে। শ্যামলিমা এই নাটকের একজন প্রকৃত দেশপ্রেমী নারীরূপে চিহ্নিত হয়েছেন। মা সারদা এবং নিবেদিতা সমাজ আদর্শের প্রতীক হয়ে উঠেছেন। ইংরেজ শাসনে নারীদের উপর অত্যাচার কতোটা ভয়ঙ্কর ছিল, তা প্রকাশ পেয়েছে মা সারদার কথায়। তিনি নন্দিনী ও নিবেদিতাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন —

“কলকাতা শহরের বাইরে এই ইংরেজ রাজত্বে কোনো আইনের শাসন নেই। নারীর সম্মান লুণ্ঠ করছে পুরুষ পশুরা সুযোগ পেলেই। মায়ের সামনেই ছিঁড়ে খাচ্ছে যুবতী মেয়েদের। বিবাহিত বা ছেলেমেয়েদের মা-ও বাদ যাচ্ছে না। বিলেটা থাকলে সব কটার জিভ ছিঁড়ে নিত। মিশনের সন্ন্যাসীদলকে চাই। সব কটার শান্তি চাই। কঠোর শান্তি। তবে ফাঁসি নয়। কোনো পাপই ক্ষমার অযোগ্য নয়। ওদেরও সুযোগ দিতে হবে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার। মনে রাখিস আমি পুণ্যাত্মার মা যেমন, তেমন

পাপীরও মা। ওদের চিহ্নিত করে সন্ন্যাস দলে, কর্মে জুরে দিতে হবে।
সমাজ সেবার আদর্শে একবার বুঁদ হয়ে গেলেই—”^{১৭৬}

মা সারদা ও নিবেদিতা বুঝতে পেরেছেন একসময় নারীদের জেগে উঠতেই হবে। একথা অনেক আগে চৈতন্য মহাপ্রভু বুঝেছিলেন, বুঝেছিলেন স্বামীবিবেকানন্দের মতো পথ প্রদর্শক মানুষেরা। ১৮৮৯ খ্রীঃ স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে নারী পরিচালিত প্যাভলিয়ান দেখে বুঝতে পেরেছিলেন নারী জাগরণের গুরুত্ব। সে কথা নিবেদিতা ব্যাখ্যা করেছেন মা সারদার কাছে। নিবেদিতা বলেছেন—

“কাদম্বরী দেবী বেঁচে থাকলে আমরা ঠাকুরবাড়িতে এক আশ্চর্য যুগলবন্দী দেখতাম। কাদম্বরীর অনুপ্রেরণাতেই রবিবাবু বিশ্বকবি হয়েছেন। কাদম্বরী মৃণালিনীকে সমাজের সামনের সারিতে আনতেন। আমাদের দুর্ভাগ্য—”^{১৭৭}

মা সারদা এ কথার সমর্থন করেছেন। বিধবা নারীর যন্ত্রণার দিন একসময় সমাপ্ত হবে বলে আশা করেছেন তিনি। মা সারদা, নিবেদিতা ও নন্দিনীর মতো সমাজ সচেতন নারীরা এগিয়ে গেছেন কলুষিত সমাজের সংস্কারণে; যে কাজ ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেব শুরু করেছেন এঁরা তাকেই পরিণতি দিতে চেয়েছেন। নাট্যকার চৈতন্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন কাব্যিক ভঙ্গিতে। প্রদীপ হাতে নিমাই সেই স্বরূপের কথা বলেছেন এইভাবে—

“পুণ্যের অধিক আমি পরিপূর্ণতা। সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে আমি সম্প্রীতি।
হৃদয়বৃত্তির মধ্যে আমি ক্ষমা। ভালোবাসার মধ্যে আমি বন্ধন। বন্ধনের
অন্তে আমি মুক্তির স্বাদ। মুক্তির অঙ্কুরে আমি জন্ম-স্বাধীনতা। স্বাধীনতার
মধ্যে আমি পিছুটান। সুনিদ্রায় আমি সুখস্বপ্ন। স্বপ্নের গভীরে আমি
চিরশান্তির গান। দীর্ঘমাটির লজ্জায় আমি অকপট সীতা। মা সীতার
সামনে আমি লজ্জানত অনুতপ্ত শ্রীরাম। রাম রাজত্বে আমি সার্বিক
উন্নয়ন। উন্নয়নের মধ্য দিয়ে আমি সকল দেশের রানী ভারতবর্ষ।
ভারতবর্ষের মধ্যে আমি মহাত্মার রক্তে ভেজা একমুঠো মৃত্তিকা। মৃত্তিকার
মধ্যে আমি বীজ ও মহাবিশ্বের স্বপ্ন। ভোরের আলোতে আমি নিষ্পাপ
মেয়েবেলা, অপাপবিক্ত ছেলেবেলা। জীবনের মধ্যে আমি গভীরতম
জীবনবোধ। নদীর গভীরে আমি লুপ্ত সভ্যতা। বিনাশের ভস্মশেষে আমি
চিরজীবী ডানামেলা ফিনিক্স পাখি। আমার সত্যিই বিনাশ নেই। মা,

তোমার নিমাই ফিরে এসেছে। তুমি প্রাণভরে ডাকো নিমাই, নি-মা-
ই।”^{১৭৮}

নাট্যকার আরণ্যক বসু চৈতন্য ভাবনাকে এখানে নানা চরিত্রের সঙ্গে, নানা পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত করে আধুনিক নাট্যভাবনায় ‘চৈতন্য হোক’ নাটকটিকে পুনর্নির্মাণ করেছেন। ফলে নাট্যদর্শকের দরবারে চৈতন্য জীবনের নতুন স্বাদ ও ভাবনা ফিরে এসেছে ‘চৈতন্য হোক’ নাটকে।

উপরিউক্ত নাটকগুলির বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, চৈতন্য জীবনী সাহিত্য অবলম্বনে একালে যেমন নাটক লেখা হয়েছিল, তেমন আজও তার চর্চা চলেছে। আধুনিক সাহিত্য-প্রকরণেরও তার পুনর্নির্মাণ বা কাহিনির বিনির্মাণ করা হচ্ছে বারবার। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা তারই রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

প্রসঙ্গনির্দেশও মন্তব্য —

- ১। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৯৭, একাদশ সংস্করণ, পৃ- ৩৬৭।
- ২। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, চৈতন্য-লীলা, গিরিশ রচনাবলী, (দ্বিতীয় খণ্ড) সাহিত্য সংসদ, ১৮৮৬, নামপত্র ও চরিত্রের প্রতিলিপির বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট,চিত্র সংখ্যা-৮১, পৃষ্ঠা- ৫৪৯।
- ৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩৭৭।
- ৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩৭৮।
- ৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩৮১।
- ৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩৮২।
- ৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩৯৪।
- ৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩৯৮।
- ৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৪০৭।

- ১০। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৪১০।
- ১১। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৪০৬।
- ১২। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৪০৯।
- ১৩। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩৭৫।
- ১৪। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩৮২।
- ১৫। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নিমাই সন্ন্যাস, গিরিশ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৯, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দৃষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৮২, পৃষ্ঠা- ৫৫০।
- ১৬। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্র ও চরিত্রলিপির বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দৃষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৮৩, পৃষ্ঠা- ৫৫১।
- ১৭। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - চরিত্রলিপি।
- ১৮। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩১৯।
- ১৯। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩২০।
- ২০। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩২১।
- ২১। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩২৩।
- ২২। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩২৪।
- ২৩। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩২৪।
- ২৪। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩৩১।
- ২৫। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩৩৫।
- ২৬। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩৩৭।
- ২৭। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩৩৯।
- ২৮। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩৪১।
- ২৯। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩৪২।

- ৩০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩৫১।
- ৩১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩৩১।
- ৩২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩৪০।
- ৩৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩২৫।
- ৩৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩৩৯।
- ৩৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩৩৯।
- ৩৬। হরচন্দ্র ঘোষ, নদীয়া যুগল, ভারতী প্রেস, আগরতলা, ত্রিপুরা, ১৯৩৪,
প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৮৪,
পৃষ্ঠা- ৫৫২ ।
- ৩৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ
পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৮৫, পৃষ্ঠা- ৫৫৩।
- ৩৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ভূমিকা অংশ।
- ৩৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১।
- ৪০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১১।
- ৪১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৩।
- ৪২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৪-১৫।
- ৪৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৫।
- ৪৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ২০।
- ৪৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ২১।
- ৪৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ২৫।
- ৪৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ২৭।
- ৪৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ২৯।
- ৪৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩১।

- ৫০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩৮।
- ৫১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৪৭।
- ৫২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৫৭।
- ৫৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৬৭।
- ৫৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৭৪।
- ৫৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৩৮।
- ৫৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৪৪।
- ৫৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৬৩।
- ৫৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১০৮।
- ৫৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৯০।
- ৬০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১১২।
- ৬১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৫৫।
- ৬২। দিলীপকুমার রায়, শ্রী চৈতন্য, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরি, ১৯৫২, প্রচ্ছদপত্রের
বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ৮৬, পৃষ্ঠা-৫৫৪।
- ৬৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, উৎসর্গপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ
পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৮৭, পৃষ্ঠা- ৫৫৫।
- ৬৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ভূমিকা অংশ।
- ৬৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩।
- ৬৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৩।
- ৬৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৮।
- ৬৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩৫।
- ৬৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৩৭।

- ৭০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৫৬।
- ৭১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৫৯।
- ৭২। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৬৭।
- ৭৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৬৯।
- ৭৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৯৩।
- ৭৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১০৪।
- ৭৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১০৪।
- ৭৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৭।
- ৭৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ২২।
- ৭৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৫৮।
- ৮০। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৬৮।
- ৮১। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৩২।
- ৮২। শিবংকর চক্রবর্তী, নবজাগরণ, অসময়ের নাট্য ভাবনা, ২০১৫, প্রচ্ছদপত্রের
বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ৮৮, পৃষ্ঠা- ৫৫৬।
- ৮৩। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ
পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ৮৯, পৃষ্ঠা- ৫৫৭।
- ৮৪। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, চরিত্রলিপির বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দ্রষ্টব্যঃ
পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ৯০, পৃষ্ঠা- ৫৫৮।
- ৮৫। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৪৯।
- ৮৬। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৪৯।
- ৮৭। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৫০।
- ৮৮। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৫০।
- ৮৯। দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৫১।

- ৯০। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৫২।
- ৯১। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৫৯।
- ৯২। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৬০।
- ৯৩। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৬০।
- ৯৪। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৬২।
- ৯৫। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৬২।
- ৯৬। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৬৩।
- ৯৭। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৫০।
- ৯৮। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৫১।
- ৯৯। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৫২।
- ১০০। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৬১।
- ১০১। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৬২।
- ১০২। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৬২।
- ১০৩। উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, নীলাচলে, অসমের নাট্য ভাবনা, ২০১৫, প্রচ্ছদপত্রের
বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দৃষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৮৮ , পৃষ্ঠা-৫৫৬।
- ১০৪। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্র ও চরিত্রলিপির বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি
দৃষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ৯১, পৃষ্ঠা-৫৫৯।
- ১০৫। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৬৭।
- ১০৬। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৬৮।
- ১০৭। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৬৮।
- ১০৮। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৬৮।
- ১০৯। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৬৯।

- ১১০। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৭০।
- ১১১। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৭০।
- ১১২। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৭১।
- ১১৩। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৭১।
- ১১৪। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৭৩।
- ১১৫। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৭২।
- ১১৬। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৭২।
- ১১৭। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৭৪।
- ১১৮। সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত, অসময়ের নাট্য ভাবনা, ২০১৫,
প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দৃষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৮৮,
পৃষ্ঠা- ৫৫৬।
- ১১৯। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্র ও চরিত্রলিপির বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি
দৃষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৯২, পৃষ্ঠা- ৫৬০।
- ১২০। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১০৯।
- ১২১। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১১০।
- ১২২। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১১০।
- ১২৩। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১১১।
- ১২৪। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১১২।
- ১২৫। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১১২।
- ১২৬। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১১৩।
- ১২৭। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১১৩।
- ১২৮। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১২০।
- ১২৯। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১২১।

- ১৩০। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১২১।
- ১৩১। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১২৯।
- ১৩২। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৩৭।
- ১৩৩। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৪৫।
- ১৩৪। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৪৬।
- ১৩৫। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১১৪।
- ১৩৬। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১২১।
- ১৩৭। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৩৯।
- ১৩৮। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৪৬।
- ১৩৯। অনুপ চক্রবর্তী, মার্ক্স চৈতন্য ও সুজাত, অসময়ের নাট্য ভাবনা, ২০১৫,
প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দৃষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৮৮,
পৃষ্ঠা- ৫৫৬।
- ১৪০। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্র ও চরিত্রলিপির বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি
দৃষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা- ৯৩, পৃষ্ঠা- ৫৬১।
- ১৪১। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৯৩
- ১৪২। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৯৫।
- ১৪৩। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৯৭।
- ১৪৪। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৯৯।
- ১৪৫। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৯৯।
- ১৪৬। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১০১।
- ১৪৭। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১০০।
- ১৪৮। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১০৭।
- ১৪৯। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১০৮।

- ১৫০। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৯৬।
- ১৫১। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১০০।
- ১৫২। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১০৫।
- ১৫৩। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১০৭।
- ১৫৪। সৌমেন পাল, দখলনামা, অসময়ের নাট্য ভাবনা, ২০১৫, প্রচ্ছদপত্রের বিস্তারিত
বিবরণসহ ফটোকপি দৃষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৮৮, পৃষ্ঠা-৫৫৬।
- ১৫৫। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্র ও চরিত্রলিপির বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি
দৃষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৯৪, পৃষ্ঠা- ৫৬২।
- ১৫৬। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৬৫।
- ১৫৭। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৬৫।
- ১৫৮। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৭০।
- ১৫৯। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৭৪।
- ১৬০। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৭৫।
- ১৬১। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৭৯।
- ১৬২। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৮৪।
- ১৬৩। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৮৬।
- ১৬৪। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৮৬।
- ১৬৫। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৭৬।
- ১৬৬। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ১৭৭।
- ১৬৭। আরণ্যক বসু, চৈতন্য হোক, অসময়ের নাট্য ভাবনা, ২০১৫, প্রচ্ছদপত্রের
বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি দৃষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৮৮, পৃষ্ঠা- ৫৫৬।
- ১৬৮। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, নামপত্র ও চরিত্রলিপির বিস্তারিত বিবরণসহ ফটোকপি
দৃষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র সংখ্যা-৯৫, পৃষ্ঠা-৫৬৩।

- ১৬৯। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৭৫।
- ১৭০। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৭৬।
- ১৭১। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৭৮।
- ১৭২। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৮৩।
- ১৭৩। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৮৯।
- ১৭৪। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৮০।
- ১৭৫। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৮৩।
- ১৭৬। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৭৭।
- ১৭৭। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৭৯।
- ১৭৮। দৃষ্টব্যঃ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ - ৮২।

সপ্তম অধ্যায়

একালে এই জাতীয় চর্চার প্রাসঙ্গিকতা বিচার

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বাগবাজারে এক সময়ের বিখ্যাত নট, নাট্যকার, মঞ্চ-পরিচালক ও সংগঠক গিরিশচন্দ্র ঘোষকে নাটক লেখার ও তার অভিনয় করার পরামর্শ দিয়েছিলেন; কারণ তাতে নাকি ‘লোকশিক্ষে’ হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্পষ্টই জানিয়েছিলেন নাটক অর্থাৎ যা অভিনয়ের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের চিন্তা-চেতনাকে জাগায়, তা বাস্তবে লোকশিক্ষার একটি বড়ো মাধ্যম। তাই নাটক লেখা, তার অভিনয় করা, নাটকের চর্চা ও তার অভিনীত রূপ দেখা- সবই প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। সেই প্রাসঙ্গিকতার প্রয়োজনে একালে তার অনুসন্ধান, চর্চা ও বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় আমাদের। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিষয় অবলম্বনে রচিত নাটকগুলির অনুসন্ধান ও তার বিশ্লেষণকে তাই আমরা যথাসম্ভব গুরুত্ব সহকারে পরিবেশন করে একালে তার চর্চার প্রয়োজনীয়তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ে।

অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়া সম্প্রদায়ের মানুষজন নিজেদের প্রয়োজনে তাঁদের সাধন মন্ত্রগুলিকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে পদগুলি লিখেছিলেন, সেগুলি বাস্তবে এক একটি কবিতা। তার মধ্যে তৎকালীন সমাজ ইতিহাস-অর্থনীতি-রাজনীতি-ধর্মনীতিসহ নানান বিষয়কে তাঁরা বুনে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কোনো এক ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধনমন্ত্র যে সাধারণ মানুষের উপভোগের বস্তু হতে পারে, চর্যাপদগুলির কাব্যসৌন্দর্য ও তার গীতিময়তাই সেকথা প্রমাণ করে। তার সেই গুরুত্বের কথা ভেবেই হয়তো আজও মানুষ চর্যাপদগুলির চর্চা, পাঠ, গান বা তার অভিনয় করে আসছে। বাস্তবে পদগুলি আর কোনো একটি বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধনমন্ত্রে আবদ্ধ নেই, তা যেন আপামর সাহিত্য-রস-পিপাসু পাঠকের আনন্দদানের একান্ত আপন বস্তু হয়ে উঠেছে। বোধহয় এই কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলা বিষয়ে পাঠরত ছাত্র সাইমন জাকারিয়া শ্রেণিকক্ষের পাঠ গ্রহণের সময়ই চর্যাপদগুলির গুরুত্ব ও তার চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। চর্যার বিভিন্ন পদগুলির মধ্যে কাহিনির ধারাবাহিকতাকে সংযোগ করে একালের শিল্পিত মাধ্যমে সেকালের সাধনমন্ত্রগুলিকে এককথায় ‘লোকশিক্ষে’ দিতে তিনি নাটকের আঙ্গিকে প্রকাশ করেছিলেন। লিখেছিলেন ‘ন নৈরামণি’, ‘প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক’^২ এবং ‘বোধিধ্রুৱ’^৩

নামের তিন তিনটি নাটক। সাম্প্রতিক কালের নাট্যকার শিবাশিষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ‘অসম্ভব গোলটেবিল’^৪ নামের নাটক। চর্যাপদের কাহিনি যে একালেও চর্চিত হওয়ার যোগ্য, সেকথা স্পষ্ট হয় বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য সাহিত্য-প্রকরণে ও তার কাহিনি-চরিত্র-ভাষার পুনর্নির্মাণে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী^৫, সেলিনা হোসেন^৬ থেকে শুরু করে বহু বিখ্যাত কবি^৭ সাহিত্যিক^৮ সমালোচক^৯ চর্যাপদ নিয়ে মৌলিক সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেছেন। লিখেছেন— ‘বেনের মেয়ে’^{১০}, ‘নীলময়ূরের যৌবন’^{১১}, ‘কাহ্ন’^{১২} নামের উপন্যাস, ‘চর্যাপদের হরিণী’^{১৩} নামের ছোটগল্প এবং অসংখ্য কবিতা।^{১৪} প্রতিটি ক্ষেত্রে সাহিত্যিকদের নতুন নতুন চিন্তা-চেতনা^{১৫} ও সাহিত্য আঙ্গিক^{১৬} যুক্ত হয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়াদের সাধনমন্ত্রকে নতুনভাবে দেখার, চেনার, চর্চা করার জন্য নতুন নতুন পথ ও দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী করেছেন। একালে গবেষকের দৃষ্টিতে সেই সব সৃষ্ট সাহিত্য অবশ্যই চর্চার দাবি রাখে। এই দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আমরা আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে চর্যাপদ অবলম্বনে রচিত নাট্য পুনর্নির্মাণগুলির স্বরূপ উদ্ধার ও তার বিচার বিশ্লেষণে আগ্রহী হয়েছি। আমরা নাটকগুলির মধ্যে অপার বিস্ময়ে সেকালের ভাব, ভাষা, সমাজ-বাস্তবতা, চরিত্র-ধর্ম-রাজনীতি এবং সর্বোপরি প্রেম-ভালোবাসার পুনর্নির্মাণ দেখে মুগ্ধ হয়েছি। সেই মুগ্ধতারই প্রকাশ আছে গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে। সেখানে নাটকগুলির স্বরূপ সন্ধান যেমন আমাদের আলোচনার বিষয় হয়েছে, তেমনি তার আভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণও আমাদের আগ্রহকে উজ্জীবিত করেছে। সেকালের মানুষের চিন্তা-ভাবনা, খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভালো-মন্দ লাগা, নাচ-গান- অভিনয়-ভাষা এমনকি তার মন আর মননের চর্চাকেও আমরা যথাসম্ভব উদ্ধার করে একালে সেইসব নাটকগুলির চর্চার প্রয়োজনীয়তার দিকটিকে স্পষ্ট করেছি। বাস্তবে যেটি এক বিশেষ সম্প্রদায়ের সাধনমন্ত্র ছিল, আকারে যা ছিল কবিতা, তা যে একালে দৃশ্যকাব্যের রূপ পরিগ্রহণ করতে পারে, তা দেখিয়েছি এবং সেই নাটকগুলির চর্চা ও তার বিশ্লেষণকে যথাসম্ভব বাস্তবায়িত করে চর্যাপদ চর্চার ক্ষেত্রে নাটকগুলির গুরুত্বের দিকটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছি।

রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-প্রণয়মূলক আখ্যানকাব্য লিখেছেন বড়ু চণ্ডীদাস চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে। রাধা-কৃষ্ণ-বড়াই তিনটি চরিত্রের উক্তি প্রত্যুত্তিমূলক লৌকিক প্রেমলীলাকে আখ্যান কাব্যে বাস্তবতা দানের সার্থক প্রয়াস করেছিলেন বড়ু চণ্ডীদাস। পরবর্তীকালে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে পদাবলীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন একাধিক বৈষ্ণব কবি^{১৭}। আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক কাব্য ও পদাবলী সাহিত্য অবলম্বনে রচিত বাংলা

নাটকের পরিচয় সন্ধানে মনোনিবেশ করে, উদ্ধার করেছি একাধিক নাট্য পুনর্নির্মাণ। এই কর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন- গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রলাল খান, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভুবনকৃষ্ণ মিত্র, অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রমুখ একাধিক ব্যক্তি। লিখেছেন যথাক্রমে ‘দোললীলা’^{১৮}, ‘ব্রজবিহার’^{১৯}, ‘মথুরা মিলন’^{২০}, ‘বৃন্দাবন বিলাস’^{২১}, ‘মান’^{২২}, ‘শ্রীকৃষ্ণ’^{২৩}, ‘নিকুঞ্জবিহার’^{২৪}, ‘মাথুর’^{২৫} প্রভৃতি নাটক। প্রতিটি নাটকে নাট্যকারগণ রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলাকে বাস্তবতা দানের প্রয়াস করেছেন। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্য’ এবং পরবর্তীকালে লিখিত বৈষ্ণব পদাবলী থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নাট্যকারগণ সাধারণ মানুষের কাছে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলা বিষয়ে জ্ঞান বিতরণ করার চেষ্টা করেছেন এবং সাধারণ মানুষের মনে ভক্তিভাব মিশ্রিত ভালোবাসা বা শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য নাট্য পুনর্নির্মাণগুলি লিখেছেন ও তার অভিনয় করে গ্রাম- গঞ্জে সাধারণ মানুষকে ‘শিক্ষে’ দেওয়ার কাজটিও করেছেন। ফলে নাটকগুলির প্রাসঙ্গিকতা আছে। নাট্যকারগণ কৃষ্ণ চরিত্রে দেবত্বভাব দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে কৃষ্ণের মহিমা যেমন প্রচার করেছেন, তেমনি রাধাকে কুলবধু করে এবং পরকীয়া সাধিকা করে, তাঁরা কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেমের নব রূপটিকে, তাঁর আত্মত্যাগের মহিমাটিকে প্রচার করে রাধাকে প্রেমিকা শ্রেষ্ঠা করে তোলার প্রয়াসী হয়েছেন। সাধারণ মানুষের কাছে রাধা-কৃষ্ণ যে দেবকল্প চরিত্র এবং আদর্শ প্রেমিক-প্রেমিকা হয়ে উঠেছেন, তার প্রধান অবলম্বন এই নাটকগুলি। বাস্তবে নাটকগুলির অভিনয় দেখে, সাধারণ দর্শকের মনে রাধা-কৃষ্ণ সম্পর্কে যে ধারণা তৈরী হয়েছে— তা এই জাতীয় পুনর্নির্মাণ থেকেই সংগ্রহ করেছেন তাঁরা। কারণ এই ধারণাগুলির সবই নাট্যকারগণের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কাব্য ও পদাবলী সাহিত্যের বিষয় অবলম্বনে রচিত নাট্য পুনর্নির্মাণগুলিতে আছে। তাই রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক ধারণা, জ্ঞান, তাঁদের প্রেম ও তাঁদের ব্যক্তি সম্পর্কের শিক্ষা দিতে আজও নাটকগুলির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে আছে মঙ্গলকাব্য^{২৬}। প্রায় চার-পাঁচশ বছর ধরে এই সাহিত্যধারা রচিত ও চর্চিত হয়েছে। বহু বিখ্যাত কবি নিজেদের অভিজ্ঞতার রসে জারিত করে একাধিক মঙ্গলকাব্য^{২৭} রচনা করেছেন। আধুনিককালে সেই সমস্ত মঙ্গলকাব্যের বিষয় অবলম্বনে অনেকগুলি নাটক^{২৮} লিখেছেন খ্যাত-অখ্যাত বহু নাট্যকার। গবেষণা অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা তার বিস্তৃত পরিচয় উদ্ধার করার চেষ্টা করেছি। এই অনুসন্ধানে নেমে আমরা বিস্মিত হয়েছি এ কথা জেনে যে, মঙ্গলকাব্যের কাহিনির গুরুত্বকে, একালের পাঠক-দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের বিষয় অবলম্বনে নাটক লেখা ও তার অভিনয়^{২৯} করে লোকশিক্ষা

দেওয়ার কাজটি করেছেন একাধিক ব্যক্তি। মীর মশারফ হোসেন, বিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক^{৩০} তিনিও মনসামঙ্গল কাব্য নিয়ে ‘বেহুলা গীতাভিনয়’^{৩১} নামের যে নাটকটি লিখেছিলেন, তাতে হিন্দুর দেবী মনসার প্রতি নাট্যকারের সহানুভূতি ও সমকালীন সমাজ-বাস্তবতাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করার অভীক্ষা দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। একালে এই জাতীয় বিষয় পাঠকের চোখের আড়ালে যাতে না থাকে, তার প্রকাশ ও চর্চা তাই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। চাঁদসওদাগরের চারিত্রিক দৃঢ়তা, তাঁর ওজস্বী এবং ধীরোদাত্ত স্বভাবের পরিচয়টি মীর মশারফ হোসেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করে, আমাদের বিস্ময়কে জাগরিত করেছেন। কেবল মীর মশারফ হোসেন নন, মনসামঙ্গল কাব্য নিয়ে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়,^{৩২} শম্ভু মিত্র^{৩৩} প্রমুখ আধুনিক নাট্যকারের লেখা নাটক ও তার আলোচনা যেমন আমরা উদ্ধার করেছি, তেমনি সাম্প্রতিক কালের নাট্যকার উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়^{৩৪} ও দেবেশ ঠাকুর^{৩৫} লিখিত নাট্য পুনর্নির্মাণেরও উদ্ধার এবং আলোচনা করেছি আমরা। একথা ঠিক যে, একাধিক দক্ষ এবং স্বল্পদক্ষ নাট্যকার নিজেদের ইচ্ছা, ভাবনা ও ক্ষমতা অনুযায়ী মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনী, চরিত্র, ভাষা, সমাজ-বাস্তবতাকে নাট্য-রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। নাটকগুলির অভিনয়ও হয়েছে। এইসব চর্চা কালের গহ্বরে যাতে তলিয়ে না যায়, তার জন্য আমরা প্রয়াসী হয়েছি। প্রতিটি নাটকের যথাযথ তথ্য উদ্ধার ও তার বিচার-বিশ্লেষণ করে, আমরা চাঁদ চরিত্রের চারিত্রিক দৃঢ়তাকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। কোথাও-বা নাটকের মধ্যে কাহিনি-চরিত্র-ভাষা-ঘটনার বিনির্মাণকে স্পষ্ট করে, নাট্যকারের দক্ষতার দিকটিকে জনসমক্ষে আনার চেষ্টা করেছি। নাটকগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তের হলেও যথাসম্ভব তাদের পরিচয় ও স্বরূপ উদ্ধার করে, প্রতিটি নাটকের প্রচ্ছদপত্র, নামপত্র ইত্যাদির (যেখানে যেটা প্রয়োজন) প্রতিলিপি পরিশিষ্টে যুক্ত করে, পাঠক-দর্শকের কাছে নাটকগুলির রূপ ও স্বরূপটিকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি। কারণ, তাতে একদিকে যেমন নাট্যকারের দক্ষতার পরিচয়টি পাঠক-দর্শকের কাছে স্পষ্ট হওয়ায় সুযোগ পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি নাটকগুলির আভ্যন্তরীণ স্বরূপের পরিচয়টিও পাঠক-দর্শকের আগ্রহকে তৃপ্ত করে তাদের চেতনা জগতকে আন্দোলিত করেছে। মীর মশারফ হোসেন তাঁর রচিত নাটকে রামায়ণ^{৩৬}-মহাভারতের^{৩৭} দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে লোকশিক্ষা দেওয়ার কাজটি করেছেন। নাটকে নল-দময়ন্তীর কথা ব্যবহার করে, কখনো-বা রামের প্রসঙ্গ তুলে, দর্শক সাধারণকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন; দুঃখ-কষ্ট বা জীবনযুদ্ধে হেরে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। সংসারে রমণীর গুরুত্ব বোঝানোর জন্য, বেহুলার জীবন-সংগ্রামকে বড় করে দেখিয়ে দর্শক সাধারণের মনে নারীর ভূমিকাটিকে প্রোথিত করতে চেয়েছেন।

আবার ‘চাঁদবণিকের পালা’ নাটকে চাঁদসওদাগরের চরিত্র নির্মাণে, শঙ্খ মিত্র অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে যে এপিক^{৪৬} বা মহাকাব্যের ব্যাপ্তি থাকতে পারে ‘চাঁদবণিকের পালা’ নাটকে শঙ্খ মিত্র তা দেখাতে চেষ্টা করেছেন। জীবনযুদ্ধে ‘পাড়ি’^{৪৭} দেওয়ার শিক্ষা আমরা শঙ্খ মিত্রের নাটকের নায়ক চাঁদ চরিত্রের কাছ থেকেই শিখেছি। একালে এই জাতীয় নাটকের চর্চা তাই অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। সে কথা সমালোচক অপূর্ব দে স্বীকার করে বলেছেন—

“মূল কাহিনির মধ্যে ভাঙচুর ঘটিয়ে দেশ-কাল সম্পর্কে নিজস্ব অভিজ্ঞতা, দর্শন, উপলব্ধি ও অনুভবের এক গভীরতম কাহিনি তিনি আমাদের গুণিয়েছেন ‘চাঁদবণিকের পালা’য়।”^{৪৮}

মনসামঙ্গল কাব্যের বিষয় নিয়ে যেমন নাটক লেখা হয়েছে, তেমনি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিষয় অবলম্বনেও ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে একাধিক নাট্যকার নাটক লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের সৃষ্ট নাটকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকাহিনির পুনর্নির্মাণ যেমন আছে, তেমনি কোনো কোনো দক্ষ নাট্যকারের হাতে চণ্ডীমঙ্গল কাহিনির বিনির্মাণও হয়েছে। আধুনিক ধনবাদী সভ্যতায় একদল লোভী মানুষ কেমন করে সাধারণ মানুষের সাতপুরুষের ভিটে থেকে উচ্ছেদ করে এবং জমি দখল করে, তা নাট্যকার দেখিয়েছিলেন কালকেতুর কাহিনিতে দেখিয়েছেন। অরণ্যে বসবাসকারি পশুদের কালকেতু হত্যা না করে তাদেরকে বাসস্থান থেকেই উৎখাত করে দিতে সক্ষম হয়েছেন। কারণ দেবীর পৃষ্ঠপোষকতায় কালকেতু মনুষ্যের প্রাণীদের বাসস্থান অরণ্য ভূমিকেই পরিষ্কার করে গুজরাট নামে নতুন রাজ্য স্থাপন করেছেন; সেই রাজ্যে প্রজা পত্তনের জন্য স্বয়ং দেবীচণ্ডী পাশের রাজ্য কলিঙ্গ থেকে ঝড়-বৃষ্টি করিয়ে কালকেতুর রাজ্যে প্রজা এনে দিয়েছেন। এই অনুশঙ্গে ‘ফুল্লকেতুর পালা’^{৪৯} নাটকে রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী দরিদ্র কৃষক প্রজার চাষের জমি থেকে উৎখাত করে শিল্প বা SEZ (Special Economix Zone) করার ঘটনাকে মিলিয়ে দিয়ে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-কাহিনির বিনির্মাণ ঘটালেন। এই রূপ প্রয়াস একালে কি চর্চার দাবি রাখে না? আমরা বুঝতে পারি দেবী তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষমতা ব্যবহার করে যেমন ব্যাধ কালকেতুকে অর্থ প্রদান করলেন, তাকে রাজা করলেন, ঠিক তেমনি তথাকথিত রাজনৈতিক নেতারা, ক্ষমতালোভী স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির ব্যবসায়ীদের मदত দিয়ে সাত পুরুষের জমি থেকে কৃষক প্রজাকে উৎখাত করছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাহিনি এইভাবে যেন একালের মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও লোভ-লালসার সঙ্গে মিশে গেল। ষোড়শ শতকের কাহিনি একবিংশ শতকের মানুষের জীবন ও বোধের সঙ্গে মিশে গিয়ে, নাটকটির চর্চাকে প্রাসঙ্গিক ও জরুরী করে তুলল। একইভাবে শিশিরকুমার দাশের ‘ভাঁড়দত্ত’^{৫০} নাটকটি

অসহায় মানুষের প্রতি ভাঁড়ু দত্তের শঠতা ও দুর্বুদ্ধিকে প্রকাশ করে, আমাদের কাছে বিশেষ জীবন অভিজ্ঞতার নাটক হয়ে উঠেছে। এই জাতীয় নাটকের চর্চা তাই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। ভাঁড়ু দত্তের জীবনবোধ ও তার আচার-আচরণকে লক্ষ্য করে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন—

“কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ভাঁড়ু দত্তের যে বর্ণনা আছে, সে বর্ণনায় মানুষের চরিত্রের যে একটা বড় দিক দেখানো হইয়াছে তাহা নহে; এই রকম চতুর স্বার্থপর এবং গায়ে পড়িয়া মোড়লি করিতে মজবুত লোক আমরা অনেক দেখিয়াছি।... ভাষার এমন একটা কৌতুকরস লইয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছে যে, সে শুধু কালকেতুর সভায় নয়, আমাদের হৃদয়ের দরকারে অনায়াসে স্থান পাইয়াছে।.....কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্ত তাহার সমস্ত অনাবশ্যক বহুল্য বর্জন করিয়া কেবল একটি সমগ্র রসের মূর্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে”^{৩৯}

অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ তাঁর ‘ভাঁড়ুদত্ত’ নাটকে ভাঁড়ু দত্ত চরিত্রটির সেই সামগ্রিক জীবনবোধ ও তার জাত্যাভিমানের সঙ্গে তার অসহায়তাকে বাঙময় করে তুলেছেন। ফলে নাটকটি শুধু চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-কাহিনির পুনর্নির্মাণ না হয়ে কাব্যের বিনির্মাণ হয়ে আমাদের আগ্রহকে পরিতৃপ্ত করে চলেছে। তাই এইসব নাটকের চর্চা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় না। ‘শিবায়ন’ ও ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যের জীবনবোধকে আজও আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। দাম্পত্য সম্পর্কের শিক্ষা আমরা পাই ‘শিবায়ন’ কাব্য থেকে আর ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্য আমাদের জ্ঞান ও বোধের সীমাকে দীর্ঘায়িত, সঞ্জীবিত, উজ্জীবিত করে। মঙ্গলকাব্য নিয়ে রচিত নাট্য পুনর্নির্মাণগুলি তাই আজও চর্চার দাবি রাখে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্যের মতো অনুবাদ সাহিত্য নিয়েও বহু নাট্য পুনর্নির্মাণ উদ্ধার ও তার পর্যালোচনা করেছি আমরা, আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে। একথা ঠিকই যে, বাঙালি জাতির কাছে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের গুরুত্ব এবং প্রভাব সুদূর প্রসারী। প্রথম কাব্যদুটি প্রাচীন মহাকাব্য। বাঙালি জীবনের সমস্ত দিকের, সমস্ত ক্ষণের, সমস্ত অনুভূতি ও সবরকম সম্পর্ক এবং অবস্থানের এমন অনুপুঙ্খ বর্ণনা আর কোনো কাব্যে সচরাচর পাওয়া যায় না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত আচার-আচরণ, সম্পর্ক, উপলব্ধি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, যুদ্ধনীতি, পরিবারনীতি— ইত্যাদির প্রকাশ করে রামায়ণ ও মহাভারত বহু আগে থেকেই আমাদের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দখল করে আছে। সেই জাতীয় কাব্যের নাট্য পুনর্নির্মাণ যে লোক-শিক্ষার কারণ

হবেনা তা বলি কী করে! মূলতঃ রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের জনপ্রিয় ও লোকশিক্ষামূলক কাহিনিগুলি নিয়েই নাট্যকারগণ নাট্য পুনর্নির্মাণগুলি লিখেছেন। তাই সেগুলি আমাদের জীবনে এবং মননে বহুকাল থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মানুষের লোভ ও ক্ষমতার দস্ত যে মানুষকে কেমন করে অসহায় করে তোলে, তারই বাস্তব প্রকাশ আছে মনোজ মিত্রের ‘পুঁটি রামায়ণ’^{৪০} নাটকে। এ আসলে রামায়ণের কোনো কাহিনি নয়, আমাদের লোভ-লালসা আর জীবন যন্ত্রণার বাস্তব কাহিনি, যা রামায়ণের গল্পের আড়ালে প্রকাশ করে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও শুভবুদ্ধিকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই জাতীয় লোকশিক্ষার মাধ্যম কি অচর্চার যোগ্য? উত্তর হবে নিঃসন্দেহে নয়। তাই গবেষণা অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে এই জাতীয় নাটকের বিশ্লেষণ করেছি আমরা। বিপদের সময় সুযোগ সন্ধানী মানুষই যে পাশে থাকে না, প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যায়, তারই হাস্যকর অথচ বাস্তব প্রকাশ আছে সুকুমার রায় রচিত ‘লক্ষণের শক্তিশেল’^{৪১} নাটকে। নাট্যকার আমাদের রামায়ণের কাহিনির অনুসঙ্গে জ্ঞান চক্ষু খুলে দিতে চেয়েছেন; প্রকৃত বন্ধু ও মানুষ চেনার কৌশলটি শিখিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ বিপদ থেকে রক্ষা করার শিক্ষা দিতে চেয়েছেন- তাই আজও এর প্রাসঙ্গিকতা আমরা স্বীকার করি।

পুরুষ শাষিত সমাজে নারীর অসহায়তা এবং রাম চরিত্রের প্রতি আমাদের আস্থা, বিশ্বাস ও ধারণার বাইরে বেরিয়ে মনোজ মিত্র ‘ভেলায় ভাসে সীতা’^{৪২} নাটকটি লিখেছেন। সীতাকে আয়ত্ব করতে না পেরে এবং মন্দোদরীর বারবার অনুরোধে ও প্রজা বিক্ষোভের ভয়ে এই নাটকে স্বয়ং বারণ সীতাকে ভেলায় ভাসিয়ে রামচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সীতাদেবী রামচন্দ্রের কাছে এলে, রামচন্দ্র তাঁকে গ্রহণ না করে জানানেন, রাবণের রাজ্যে ফিরে যেতে বলেন। কারণ তাঁকে উদ্ধারের নাম করে রাবণের রাজ্য দখল করতে পারবেন রাম, তাছাড়া বিনা যুদ্ধে সীতাদেবী ফিরে এলে রামচন্দ্রের পৌরুষে আঘাত লাগবে। তাই অসহায় সীতা না রাম না রাবণ কারো কাছেই ঠাঁই পেলেন না, ভেলায় ভাসতে লাগলেন। এই কাহিনির মধ্যে দিয়ে মনোজ মিত্র নারীর অসহায়তার সঙ্গে পৌরুষের মিথ্যা অহংকার ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসনের ভয়াবহতার দিকটিকে তুলে ধরে আমাদের আগ্রহ ও জ্ঞানকে বৃদ্ধি করতে চাইলেন। রাম বা রাবণ চরিত্র সম্পর্কে যে শাস্ত্রত ধারণা আমাদের আছে, সেই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করলেন। রামায়ণের কাহিনি নিয়ে রচিত হলেও ‘ভেলায় ভাসে সীতা’ বাস্তবে নারীর অসহায়তা ও পুরুষের পৌরুষের মিথ্যা অহংকার ও তার আগ্রাসনের বাস্তব দলিল। তাই

এই নাটকটি যেন আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে, আমাদের উপলব্ধিকে বৃদ্ধি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

আমরা জানি মধুসূদন দত্ত মহাভারতের কাহিনি নিয়েই ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ‘শর্মিষ্ঠা’^{৪৩} নামের একটি নাটক লিখেছেন। ক্ষমতা আর অহংকারের পরিণতি মানুষের জীবনে কেমন জটিল পরিস্থিতি তৈরী করে, সেই শিক্ষা আছে নাটকটির মধ্যে। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘চিত্রাঙ্গদা’^{৪৪} নামের যে কাব্যনাটক লিখেছেন, সেখানে তিনি মহাভারতের কাহিনিকে নতুন আঙ্গিকে ও ভাবনায় পরিবেশন করে আমাদের রসচেতনাকে উজ্জীবিত করেছেন। আবার একেবারে একালের সমাজ-বাস্তবতা এবং আঙ্গিকে, অনুপ চক্রবর্তী মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে লিখেছেন—‘দ্রৌপদী ডট কম’^{৪৫} নামের কৌতুকপূর্ণ মজার নাটক। দ্রৌপদী এখানে প্রগলভা প্রতিবাদী নারী চরিত্র। দ্রৌপদীর স্পষ্ট বক্তব্য যে পঞ্চপাণ্ডবের ঘরঘী হয়ে তাঁর সতীত্বের যে অপমান হয়েছে সেই অপমানের প্রতিশোধ তিনি নিতে চান শকুনিকে বিয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করে। আধুনিক বিচার সভায় বিচারকের কাছে দ্রৌপদীর আবেদন—

“ইওর অনার। আমার প্রথম অভিযোগ হল এটাই যে আমার বিয়ের গোড়াতেই আমাকে ফাঁসানো হয়েছে।... উনি না হয় না দেখেই বলেছেন। কিন্তু তোমরা কি? আমি কি মাল? গাছের ফল? বনের পশু? যে ভাগ করে নেবে? ধর্মান্বিতার এটা কি অসম্মানজনক নয়, এক জন মেয়ের কাছে?”^{৪৬}

আধুনিক নারীবাদী চিন্তা-চেতনায় দ্রৌপদীর এই অভিযোগের সত্যতা যে আছে, তা সহজেই বোঝা যায়। মহাভারতের কাহিনির এমন আধুনিক প্রকাশ সত্যই বিস্মিত করে আমাদেরকে। আমরা বিচারকের মতোই ভাবতে বাধ্য হই দ্রৌপদীর অভিযোগের সত্যতা আছে। দ্রৌপদী স্পষ্ট করে তাঁর মনের কথা ঘোষণা করেছেন এভাবে—

“ডার্লিং শকুনি হবে আমার ছ’নম্বর স্বামী, আসলে ভারচুয়াল একটাই স্বামী। ওর সঙ্গেই তো ঘর করব এবার।”^{৪৭}

মহাভারতের কাহিনি ও চরিত্রের এমন আধুনিক চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ সংবেদনশীল মানুষকে ভাবায়; আর সেই ভাবনার নিরিখেই নাটকটির চর্চা একালে প্রাসঙ্গিকতা পায়। একইভাবে আধুনিক চিন্তাচেতনা ও ভাবনাকে প্রকাশ করে সৌমিত্র বসুর ‘একলব্য’^{৪৮}, মন্মথ রায়ের ‘কারাগার’^{৪৯} প্রভৃতি নাটকের নাট্য পুনর্নির্মাণও একালে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাব তাঁর জীবদ্দশাতেই শুরু হয়েছিল, ক্রমে তা বাংলার বাইরেও বিস্তার লাভ করে এবং মহাপ্রভুর তিরোধানের পর সেই প্রভাব বৈষ্ণব ধর্ম, আন্দোলন এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। মহাপ্রভুর বাণী, চরিত্র, জীবন-দর্শন, ভাবনা, তাঁর দৈহিক রূপ এবং সর্বোপরি মহাপ্রভুর তিরোধানের পর তাঁর ভাবতন্ময় পূত চরিত্রকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে বহু সাহিত্য রচিত হয়েছিল। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ, গৌরচন্দ্রিকা, চৈতন্য বিষয়ক নাটক, পদাবলী, তত্ত্বগ্রন্থ তো ছিলই সেই সঙ্গে লেখা হয় জীবনীগ্রন্থও। মহাপ্রভুর জীবনকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবদ্দশাতেই জীবনীগ্রন্থ^{৫০} লেখা শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রামাণ্য তথ্য ও ভক্তি মিশ্রিত কল্পনাকে যুক্ত করে বৈষ্ণব ধর্ম, তার তত্ত্ব ও তাৎপর্যকে প্রচ্ছন্নভাবে গ্রন্থ বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করেও মহাপ্রভুর জীবনীগ্রন্থ রচনা করা হয়। সেই জীবনীগ্রন্থ অবলম্বনে পরবর্তীকালে লেখা হয় চৈতন্য জীবনকেন্দ্রিক নাটক, তাঁর লীলা কেন্দ্রিক নাটক, তাঁর ধর্ম প্রচার, তাঁর মানবিক ও দৈবিক রূপের প্রকাশ কেন্দ্রিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, শিবংকর চক্রবর্তী, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ চক্রবর্তী, সৌমেন পাল, আরণ্যক বসু- প্রমুখ ব্যক্তি লিখেছেন মহাপ্রভুর জীবনকেন্দ্রিক নাটক। চৈতন্য জীবনীগ্রন্থের উপাদানের সঙ্গে অন্যান্য প্রামাণ্য তথ্য ও কাল্পনিক সত্যের সংমিশ্রণে তাঁরা তৈরী করলেন ‘চৈতন্যলীলা’^{৫১}, ‘নিমাইসন্ন্যাস’^{৫২}, ‘শ্রীগৌরাঙ্গ’^{৫৩}, ‘শ্রীচৈতন্য’^{৫৪}, ‘নবজাগরণ’^{৫৫}, ‘শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত্র’^{৫৬}, ‘চৈতন্য ও সুজাত’^{৫৭}, ‘দখলনামা’^{৫৮} ও ‘চৈতন্যহোক’^{৫৯} প্রভৃতি নাটক। আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে যথাসম্ভব অনুসন্ধানে বিষয়টিকে স্পষ্ট করার প্রয়াস করেছি। নাটকগুলি যে প্রাসঙ্গিক সেকথা আগেই আমরা স্বীকার করেছি। মহাপ্রভু কেবল ধর্মগুরু ছিলেন না, তিনি ছিলেন সমাজ-সংস্কারক। উচ্চবর্ণ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষজনের যে একাধিপত্য নিম্নবর্ণের মানুষ বা চণ্ডাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উপর ছিল, মহাপ্রভু তা ভেঙে দিয়ে প্রচার করলেন “চণ্ডালোহোপি দ্বিজঃশ্রেষ্ঠ হরিভক্ত পরায়ণঃ”। তাঁর এই ভাবনা দিকে দিকে প্রচারিত হল। আর তাই মহাপ্রভু সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের, সর্ব জাতি সমন্বয়ের প্রধান নায়ক হয়ে রইলেন। তাঁরই জীবনকেন্দ্রিক নাটকের চর্চা যে একালে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হবে- তা কি হতে পারে? এই নিরিখেই নাটকগুলির অনুধাবন, নিরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেছি আমরা। গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাপ্রভুকে নিয়ে ‘চৈতন্যলীলা’^{৬০} নামের নাটকটি লিখেছিলেন এবং অভিনয়ের মাধ্যমে মহাপ্রভুর পূত চরিত্র এবং তাঁর সমাজ-বেত্তার ভূমিকাটি প্রচার করেছিলেন, তা আজও প্রাসঙ্গিক হয়ে আছে। সাধারণ মানুষ মহাপ্রভুর জীবনীগ্রন্থ পড়ে নয়, এই সমস্ত নাটক দেখেই

মহাপ্রভুকে চিনেছেন। তাই লোকশিক্ষা দিতে নাটকগুলির গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। গিরিশচন্দ্র সাধারণ মানুষের কাছে মহাপ্রভুর স্বরূপ এভাবে প্রকাশ করেছেন—

“এল আনন্দের দিন চিন্তা কর দূর/ গোলক বিহারী হরি/ ধরায় উদয়।/
হেরি জীবনের দুর্গতি,/ আপনি শ্রীপতি, নব ভাবে অবতার;/ একধারে
রাধা কৃষ্ণ প্রেমলীলা,/ দ্রব হয় শিলা,/ হরিনাম শুনি তার মুখে”^{৬০}

মহাপ্রভুর অবতার-তত্ত্বের এই ব্যাখ্যা, তাঁর হরিনাম সংকীর্তন প্রচার এবং তাঁর অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ ও বহিরঙ্গে রাধাভাব প্রকাশের প্রেমলীলা— সবই নাট্যকার নিয়েছেন চৈতন্য জীবনীগ্রন্থে প্রকাশিত তথ্য থেকে। বাস্তবে তথ্যগুলি নাট্যকারের মৌলিক সৃষ্টি না হলেও আপামর সাধারণ দর্শকের কাছে মহাপ্রভুকে চেনানোর জন্য এই তথ্য প্রদান করে নাট্যকারগণই লোকশিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিকারী হয়েছেন। ফলে নাটকগুলি আজও প্রাসঙ্গিক হয়ে আছে। নাট্যকার দিলীপ রায় তাঁর নাটকের ভূমিকায় স্পষ্ট করে উল্লেখ করলেন—

“চৈতন্যদেব সম্বন্ধে অবাঙালিরা বেশি কিছু জানেন না।...চৈতন্যদেব অবতারকল্প মহাপুরুষ হওয়া সত্ত্বেও জগতে তাঁর প্রচার খুব বেশী হয়নি। আমি সাধ্যমত চেয়েছি তাঁরই মহিমা অবাঙালিদের মধ্যেও খানিকটা বিস্তার করতে”^{৬১}

নাট্যকার দিলীপ রায়ের এই স্বীকারোক্তি থেকেই লোকশিক্ষার বিষয়টি একেবারে সামনে চলে আসে। আর সেই প্রেক্ষিতেই এই জাতীয় নাটকগুলির চর্চা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

দীর্ঘদিনের অনুসন্ধান, নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ভিন্ন ভিন্ন আধুনিক নাট্য পুনর্নির্মাণের অনুসন্ধান করেছি। প্রাপ্ত নাটকগুলির যথাসম্ভব বাস্তব পরিচয় উদ্ধার করার জন্য পরিশিষ্টে নাটকগুলির প্রচ্ছদপত্র, নামপত্র, চরিত্রলিপি, সংলাপ- ইত্যাদি গবেষণার প্রয়োজন অনুযায়ী আলোকচিত্র এবং প্রতিলিপি সংযোজন করে বিষয়টিকে বাস্তবতা দান করার চেষ্টা করেছি। আর গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রতিটি অধ্যায়ে প্রাপ্ত নাটকগুলির পর্যালোচনা করে নাটকগুলির বাস্তবতা, গ্রহণযোগ্যতা, সাহিত্যগুণ বিচার, নাট্যকারগণের দক্ষতা, চরিত্র সৃষ্টি কুশলতা, ভাষা ও সংলাপ রচনায় নাট্যকারগণের সিদ্ধি ও গ্রন্থগুলির গ্রহণযোগ্যতা বিচার করে আলোচনাগুলিকে যথাসম্ভব মৌলিক করার চেষ্টা করেছি। একালে এই জাতীয় চর্চা যে আজও গুরুত্বপূর্ণ সেকথা স্বীকার করি।

প্রসঙ্গনির্দেশ ও মন্তব্য : -

- ১) দ্র. সাইমন জাকারিয়াই প্রথম চর্যাপদ নিয়ে ‘ন নৈরামণি’ নাটকটি লেখেন। ২০০০ সালে ‘বঙ্গবসুন্ধরা’ পত্রিকায় নাটকটি প্রকাশিত হয়।
- ২) দ্র. ‘প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক’টি সাইমন জাকারিয়ার লেখা। বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা থেকে ২০০৭ সালে নাটকটি প্রকাশিত হয়।
- ৩) দ্র. চর্যাপদ নিয়ে ‘বোধিধ্রু’ নামে একটি নাটক লেখেন সাইমন জাকারিয়া। বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা থেকে ২০০৭ সালে নাটকটি প্রকাশিত হয়।
- ৪) দ্র. শিবশিস মুখোপাধ্যায় ‘অসম্ভব গোলটেবিল’ নামের নাটকটি লেখেন। ‘এবং মুশায়েরা’ থেকে ২০০২ খ্রিস্টাব্দে নাটকটি প্রকাশিত হয়।
- ৫) আমরা সকলেই জানি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপাল থেকে চর্যাপদের পুঁথি আবিষ্কার করেন এবং ১৯১৬ সালে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ’ থেকে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন। তিনিই প্রথম চর্যাপদের কাহিনি অবলম্বনে লিখেছিলেন ‘বেনের মেয়ে’ নামের উপন্যাসটি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ‘বেনের মেয়ে’, নাথ পাবলিশিং, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা- ৭০০০০৯। মূল্য একশত কুড়ি টাকা।
- ৬) সেলিনা হোসেন বাংলাদেশের বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক। চর্যাপদের কাহিনি নিয়ে ‘নীলময়ূরের যৌবন’ নামে একটি জনপ্রিয় উপন্যাস রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. সেলিনা হোসেন, ‘নীলময়ূরের যৌবন’, নয়া উদ্যোগ, সারদা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৭/১ গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন, কলকাতা- ৭০০০৬৭। মূল্য একশত পঁচিশ টাকা।
- ৭) চর্যাপদ নিয়ে সুকুমার সেন, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত কবি একালে চর্যাপদের কবিতা লিখেছেন। দ্র. সুমন গুণ সম্পাদিত ‘আচ্ছন্ন নৈঋত’, প্রতিভাস, ১৯৯৬।
- ৮) বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক চর্যাপদ নিয়ে নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প এবং কবিতা লিখেছেন। এঁদের মধ্যে সাইমন জাকারিয়া, শিবশিস মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সেলিনা হোসেন, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, প্রমুখের কথা স্মরণ করা যায়।

- ৯) চর্যাপদের সমালোচনা কর্মে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সুকুমার সেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বহু খ্যাত-অখ্যাত বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক যেমন আছেন, তেমনি আছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নীলরতন সেন, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, মনীন্দ্রমোহন বসু, নির্মল দাশ প্রমুখ একাধিক সমালোচক।
- ১০) ‘বেনের মেয়ে’ নামের উপন্যাসটি লিখেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০০৩ সালে নাথ পাবলিশিং, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা- ৭০০০০৯ থেকে। প্রকাশকালীন গ্রন্থটির মূল্য একশত কুড়ি টাকা।
- ১১) ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন ‘নীল ময়ূরের যৌবন’ নামে উপন্যাসটি লিখেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালে নয়া উদ্যোগ, সারদা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৭/১ গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন, কলকাতা- ৭০০০৬৭। মূল্য একশত পঁচিশ টাকা।
- ১২) শিবশিস মুখোপাধ্যায় ‘কাফু’ নামের উপন্যাসটি লিখেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০১০ সালে সপ্তর্ষী প্রকাশনী থেকে।
- ১৩) দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘চর্যাপদের হরিণী’ নামের ছোটগল্প লিখেছেন। গল্পটি প্রকাশিত হয় অনিশ্চয় চক্রবর্তী সম্পাদিত; গল্প সংগ্রহ; দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অফবিট পাবলিকেশন, ২০০২।
- ১৪) দ্রঃ সুমন গুণ সম্পাদিত ‘আচ্ছন্ন নৈঋত’, ১৯৯৬, প্রতিভাস, মূল্য ষাট টাকা।
- ১৫) যাঁরাই চর্যাপদের পুনর্নির্মাণ করেছেন, তাঁরাই তাঁদের ব্যক্তিগত ভাবনা থেকে চর্যাপদের মধ্যে থেকে নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প কিংবা কবিতার বিষয়বস্তু লক্ষ্য করে সেই সমস্ত আঙ্গিক নিয়ে চর্যাপদকে নতুনরূপে প্রকাশ করেছেন।
- ১৬) ‘সাহিত্য আঙ্গিক’ বলতে আমরা নাটক, কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প— ইত্যাদি সাহিত্য প্রকরণকে চিহ্নিত করতে চাইছি।
- ১৭) একাধিক বৈষ্ণব কবি রাধা-কৃষ্ণের লীলা অবলম্বন করে বৈষ্ণবপদ রচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন- চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, রায়শেখর প্রমুখ।
- ১৮) ‘দোল-লীলা’ নাটকটি রচনা করেছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। নাটকটি সাহিত্য সংসদ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

- ১৯) 'ব্রজবিহার' নাটকটি রচনা করেছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। সাহিত্য সংসদ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে নাটকটি প্রকাশিত হয়।
- ২০) রাজা মহেন্দ্রলাল খান 'মাথুরা মিলন' নামের একটি নাটক রচনা করেন ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে। বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী থেকে নাটকটি প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা।
- ২১) 'বৃন্দাবন বিলাস' ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের লেখা বৈষ্ণব পদাবলী অবলম্বন রচিত নাটক। নাটকটির প্রকাশ কাল হয় ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা।
- ২২) হরিপদ চট্টোপাধ্যায় 'মান' নাটকটি রচনা করেন ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে। ভট্টাচার্য এন্ড সন্স পুস্তকালয় থেকে নাটকটি প্রকাশিত হয়। নাটকটির মূল্য এক টাকা।
- ২৩) অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'শ্রীকৃষ্ণ' নামে একটি পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য রচনা করেছিলেন। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯২৬। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স থেকে নাটকটি প্রকাশিত।
- ২৪) ভুবনকৃষ্ণ মিত্র বৈষ্ণব পদাবলী অবলম্বন করে 'নিকুঞ্জবিহার' বা 'গোপিনীলীলা' নামক একটি নাট্য-গীতিকা রচনা করেছিলেন। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে।
- ২৫) ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ 'মাথুর' নাটক রচনা করেন। নিউ মদন প্রেস থেকে নাটকটি প্রকাশিত হয়।
- ২৬) মঙ্গলকাব্য বলতে আমরা আশুতোষ ভট্টাচার্য কথিত চতুর্দশ শতক থেকে আষ্টাদশ শতকে রচিত উচ্চবর্ণের দেব বা দেবীর সঙ্গে নিম্নবর্ণের দেব-দেবীর মেলবন্ধনে রচিত প্রধান-প্রধান আখ্যানকাব্যগুলির কথা বলছি।
- ২৭) একাধিক মঙ্গলকাব্য অর্থে আমরা এখানে মনসামঙ্গলকাব্য, চণ্ডীমঙ্গলকাব্য, ধর্মমঙ্গলকাব্য, শিবায়ন ও আল্লদামঙ্গলকাব্য- এই পাঁচটি প্রধান মঙ্গলকাব্যের কথা বলতে চেয়েছি।
- ২৮) মঙ্গলকাব্যের বিষয় অবলম্বনে অন্তত ত্রিশ-চল্লিশ জন নাট্যকারের নাম পাওয়া যায়, যদিও তাঁদের রচিত নাটকগুলির প্রতিটি উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি; তবে জীবনকৃষ্ণ সেন, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মীর মশাররফ হোসেন, শম্ভু মিত্র, শিশির দাশ, রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, শেখর দেবরায়, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়,

দেবেশ ঠাকুর প্রমুখের নাম এবিষয়ে উল্লেখ করাই যায়। যাঁদের নাটক আমরা আলোচনায় রেখেছি।

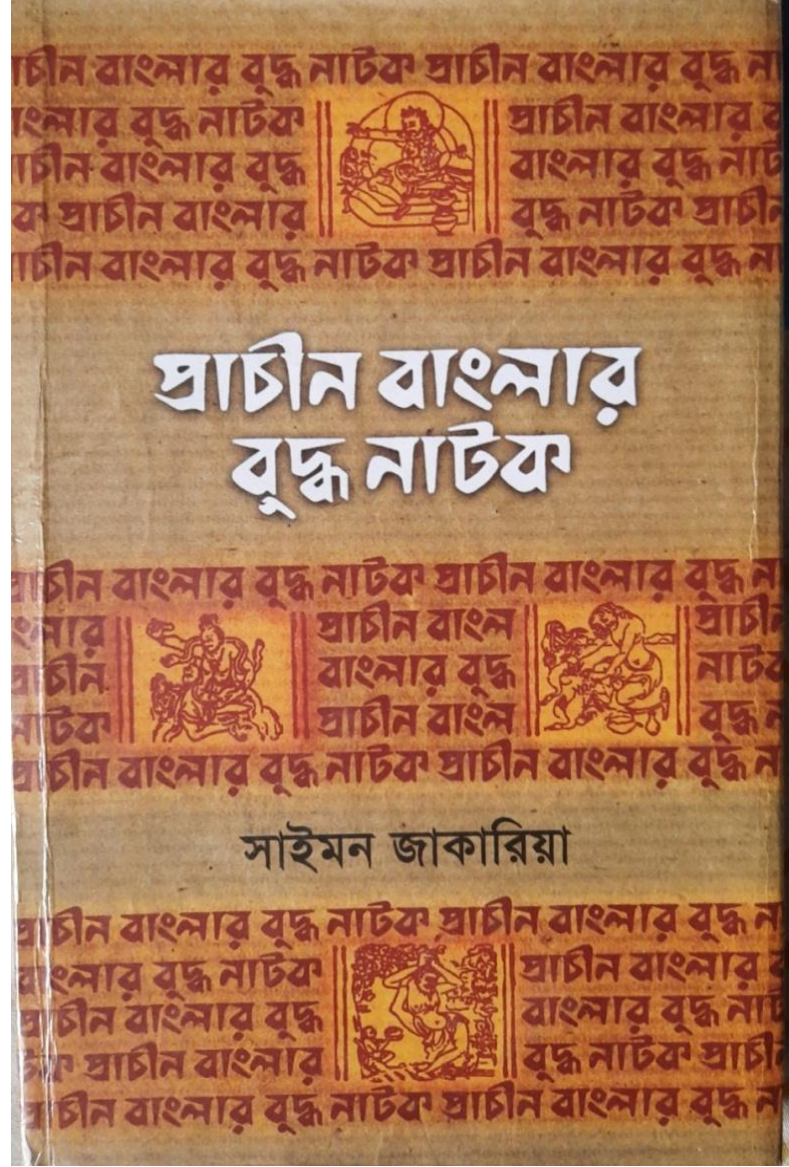
- ২৯) এইকর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন শম্ভু মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সন্তোষ কুমার দাস, খগেন্দ্রনাথ দাস, ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ একাধিক ব্যক্তির।
- ৩০) মীর মশাররফ হোসেন নামটি শুনতেই তাঁর ‘বিষাদ সিন্ধু’ উপন্যাসের কথা আমাদের মনে পড়ে। মূলত তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক। কিন্তু মনসামঙ্গল কাব্যের গীতিনাটক লিখেছিলেন।
- ৩১) ‘বেহুলা গীতাভিনয়’ নাটকটি মূলত মনসামঙ্গল কাব্য কাহিনির পুনর্নির্মাণ। এই গীতি নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৩, ঢাকা প্রেস থেকে। প্রকাশকালীন মূল্য ৮০ টাকা।
- ৩২) মনসামঙ্গল কাব্য নিয়ে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ‘সওদাগরের নৌকা’ নাটক। নাটকটি ১৯৬৯ সালে ভারতী বুক এজেন্সী, ৬৬/ ৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা- ৯ প্রকাশিত হয়।
- ৩৩) মনসামঙ্গল কাব্য নিয়ে শম্ভু মিত্র লিখেছেন ‘চাঁদবণিকের পালা’। নাটকটি ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয় এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাট্টোজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা – ৭৩ থেকে।
- ৩৪) মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনির পুনর্নির্মাণ করে ২০১৮ সালে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় ‘মনসামঙ্গল’ নামে একটি নাটক লিখেছেন। নাটকটি ধানসিড়ি কর্তৃক, ৬০ এফ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা – ৭০০০৫০ থেকে প্রকাশিত।
- ৩৫) দেবেশ ঠাকুর ‘বেহুলা’ নামে মনসামঙ্গল কাব্যের নাট্য পুনর্নির্মাণ করেছেন। যেটি প্রকাশিত হয় ২০১৮ সালে লালমাটি প্রকাশন, ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩ থেকে।
- ৩৬) বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রঃ অপূর্ব দে, চাঁদ বণিকের পালা, ২০০৩, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ‘শুধু উদ্দেশ্যটা জানি আমি’ অংশ।
- ৩৭) দ্রঃ রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, ফুল্লকেতুর পালা, বহরুপী, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা- ১৭৭।
- ৩৮) ‘ভাঁড়ু দত্ত’ নামের একটি নাটক শিশিরকুমার দাশ রচনা করেন। ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে বহরুপী, সংখ্যা-৪৮, নাটকটি প্রকাশিত হয়।

- ৩৯) দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য গ্রন্থের 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' প্রবন্ধ, ১৯০৭, পৃষ্ঠা-৮৮।
- ৪০) 'পুঁটি রামায়ণ' নাটকটি রচনা করেন মনোজ মিত্র। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে, কলাভূৎ পাবলিশার্স থেকে।
- ৪১) 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকটি রচনা করেন সুকুমার রায়। কলাভূৎ পাবলিশার্স থেকে ২০০৯ সালে নাটকটি প্রকাশিত হয়।
- ৪২) মনোজ মিত্র লেখেন 'ভেলায় ভাসে সীতা' নাটক। ২০১৬ সালে কলাভূৎ পাবলিশার্স থেকে এই নাটকটি প্রকাশিত হয়।
- ৪৩) মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'শর্মিষ্ঠা' নামের নাটকটি রচনা করেন। বাংলায় লেখা প্রথম সার্থক পৌরাণিক নাটক। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে।
- ৪৪) 'চিত্রাঙ্গদা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা নাট্যকাব্য। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে নাটকটি প্রথম প্রকাশ পায়। পরবর্তীকালে 'রবীন্দ্র রচনাবলী' পঞ্চম খণ্ডে নাটকটি অন্তর্ভুক্ত হয়।
- ৪৫) অনুপ চক্রবর্তী 'দ্রৌপদী ডট কম' নাটকটি লেখেন। এটি একটি মহাভারতের আধুনিক নাট্যরূপের সংযোজন। থিয়েটার প্রয়াগে ১৮৯৭ সালে নাটকটি প্রকাশিত হয়।
- ৪৬) দ্রঃ অনুপ চক্রবর্তী, দ্রৌপদী ডট কম, থিয়েটার প্রয়াগ, ১৮৯৭, পৃষ্ঠা- ৭২-৭৩।
- ৪৭) দ্রঃ অনুপ চক্রবর্তী, দ্রৌপদী ডট কম, থিয়েটার প্রয়াগ, ১৮৯৭, পৃষ্ঠা- ৮৬-৮৭।
- ৪৮) সৌমিত্র বসু 'একলব্য' নাটকটি লিখেছিলেন ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে। নাটকটি প্রকাশিত হয় নব গ্রন্থ কুটির, ৫৪/৬ এ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩ থেকে। নাটকটির মূল্য আশি টাকা।
- ৪৯) মনুথ রায় 'কারাগার' নাটকটি লেখেন ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে। নাটকটি প্রকাশিত হয় পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা- ২০ থেকে।
- ৫০) সংস্কৃতের কাল থেকে জীবনীসাহিত্য রচনার প্রবণতা আমরা দেখে আসছি। বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের জীবন অবলম্বন করে প্রথম বাংলায় জীবনীগ্রন্থ লেখা হয়।

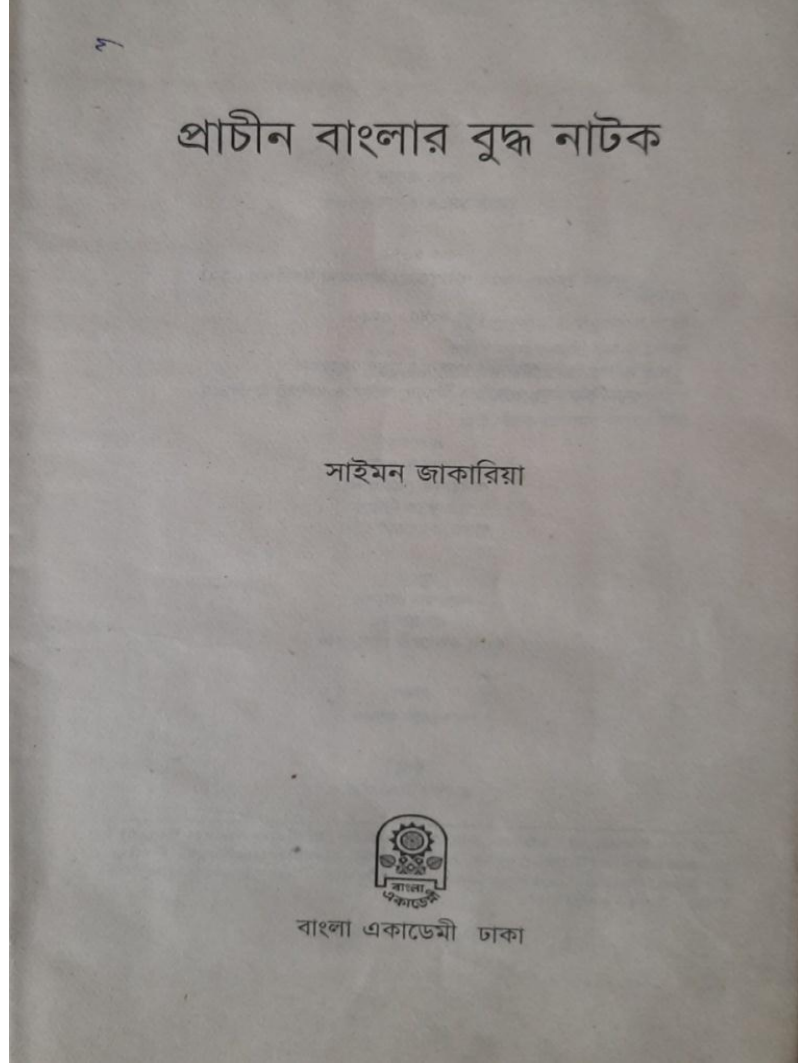
- ৫১) ১৮৮৬ প্রকাশিত 'চৈতন্যলীলা' নাটকটি লেখেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। নাটকটি 'গিরিশ রচনাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান লাভ করেছে। নাটকটি প্রকাশিত হয় সাহিত্য সংসদ কর্তৃক ৩২ এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯ থেকে।
- ৫২) ১৮৯২ প্রকাশিত 'নিমাই সন্ন্যাস' নামের নাটকটি লেখেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গিরিশ রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডে নাটকটি স্থান লাভ করেছে। নাটকটি প্রকাশিত হয় সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯ থেকে।
- ৫৩) 'শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত' নাটকটি লিখেছিলেন সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৫ সালে অসময়ের নাট্যভাবনা থেকে নাটকটি প্রকাশিত হয়।
- ৫৪) দিলীপকুমার রায় 'শ্রীচৈতন্য' নামের একটি নাটক রচনা করেন। ১৯৫২ সালে নাটকটি প্রকাশিত হয় শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরি থেকে।
- ৫৫) শিবংকর চক্রবর্তী রচনা করেন 'নবজাগরণ' নামের একটি চৈতন্য জীবনভাবনা কেন্দ্রিক নাটক। অসময়ের নাট্যভাবনা থেকে ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয়।
- ৫৬) সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত' নামের একটি নাটক রচনা করেন। অসময়ের নাট্যভাবনা থেকে ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয়।
- ৫৭) 'মার্ক্স, চৈতন্য ও সুজাত' নাটকটি অনুপ চক্রবর্তীর লেখা চৈতন্য জীবনকেন্দ্রিক নাটক। অসময়ের নাট্যভাবনা থেকে ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয়।
- ৫৮) সৌমেন পাল 'দখলনামা' নামের নাটকটি রচনা করেন। অসময়ের নাট্যভাবনা থেকে ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয়।
- ৫৯) আরণ্যক বসু 'চৈতন্য হোক' নামের একটি রচনা করেন। অসময়ের নাট্যভাবনা থেকে ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয়।
- ৬০) দ্রঃ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 'চৈতন্যলীলা', গিরিশ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ডে), ১৮৬৬, সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা- ৬১।
- ৬১) দ্রঃ নাট্যকার দিলীপকুমার রায়, 'শ্রীচৈতন্য', ১৯৫২, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরি, ভূমিকা অংশ।

পরিশিষ্ট

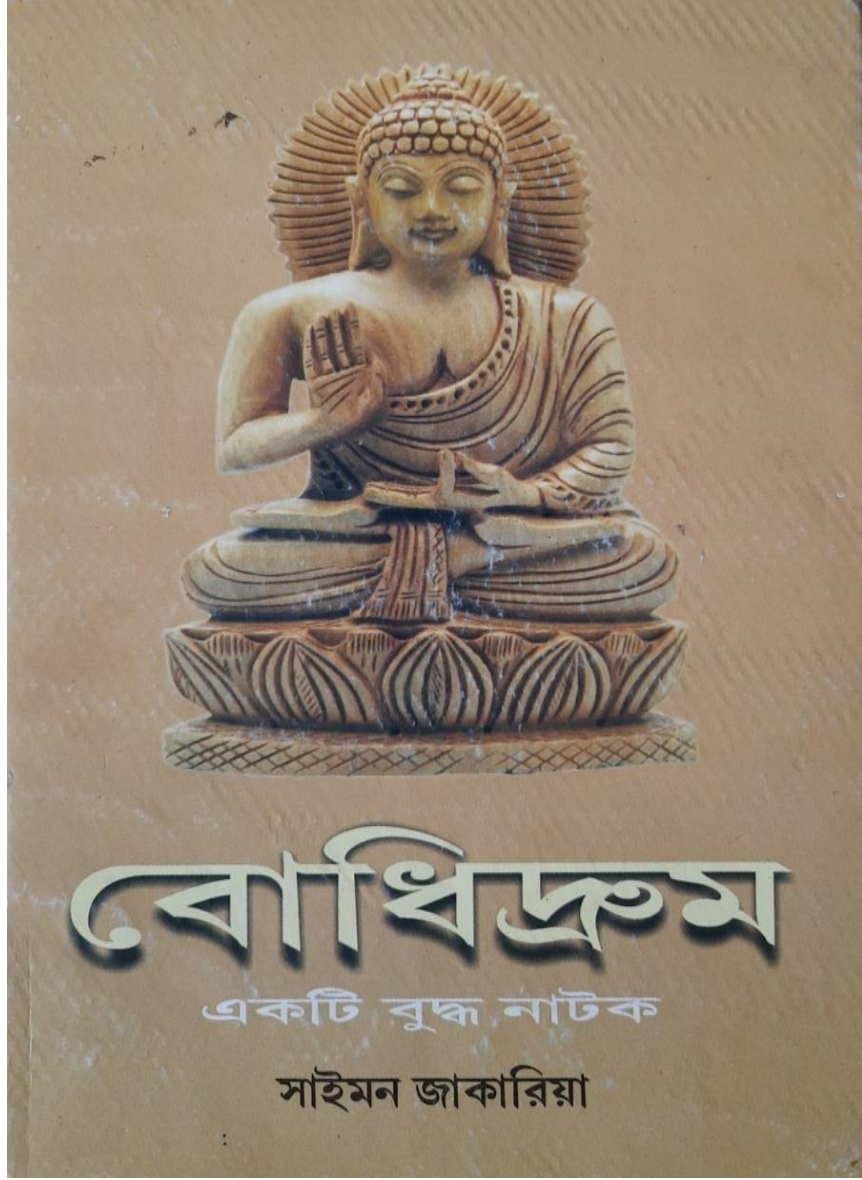
গবেষণা অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত বিভিন্ন গ্রন্থ ও তথ্যাবলীর প্রতিলিপি,
আলোকচিত্র, ফটোকপি ইত্যাদি।



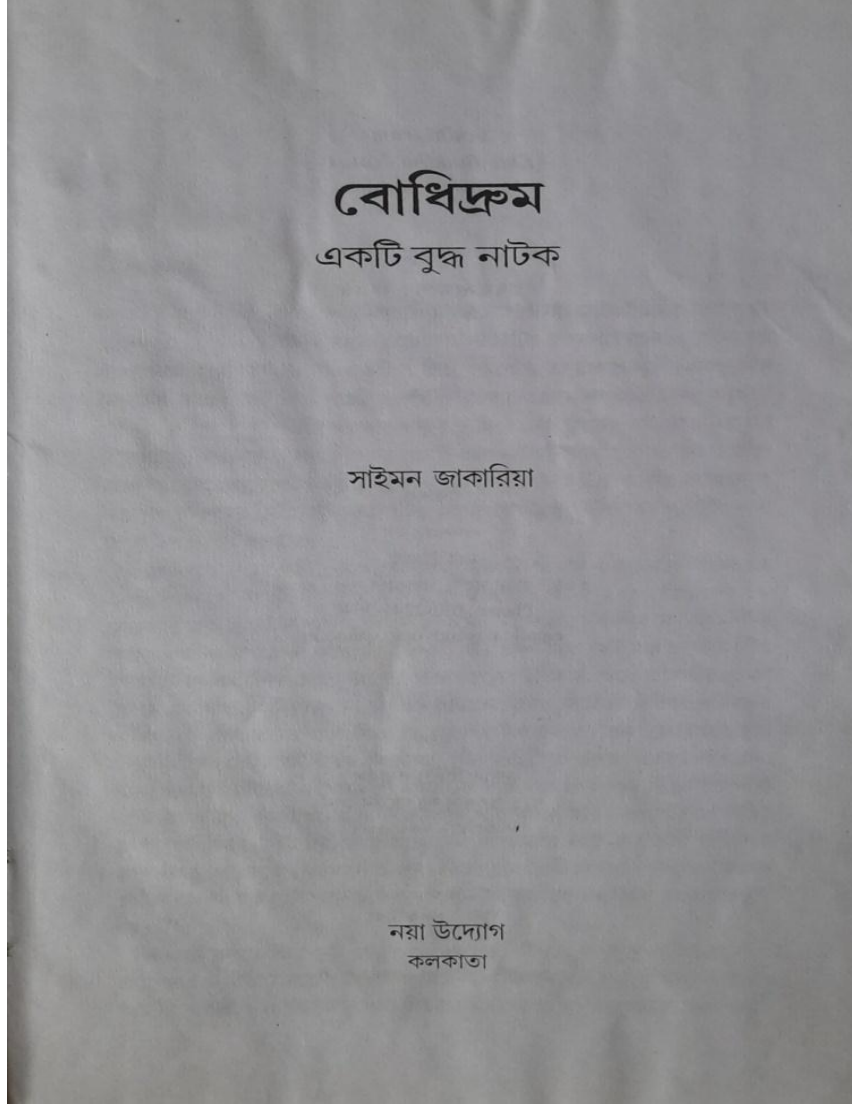
প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি সাইমন জাকারিয়া
রচিত “প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক” গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের
জন্য দ্রষ্টব্য: দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ৯, পৃষ্ঠা- ১৪।



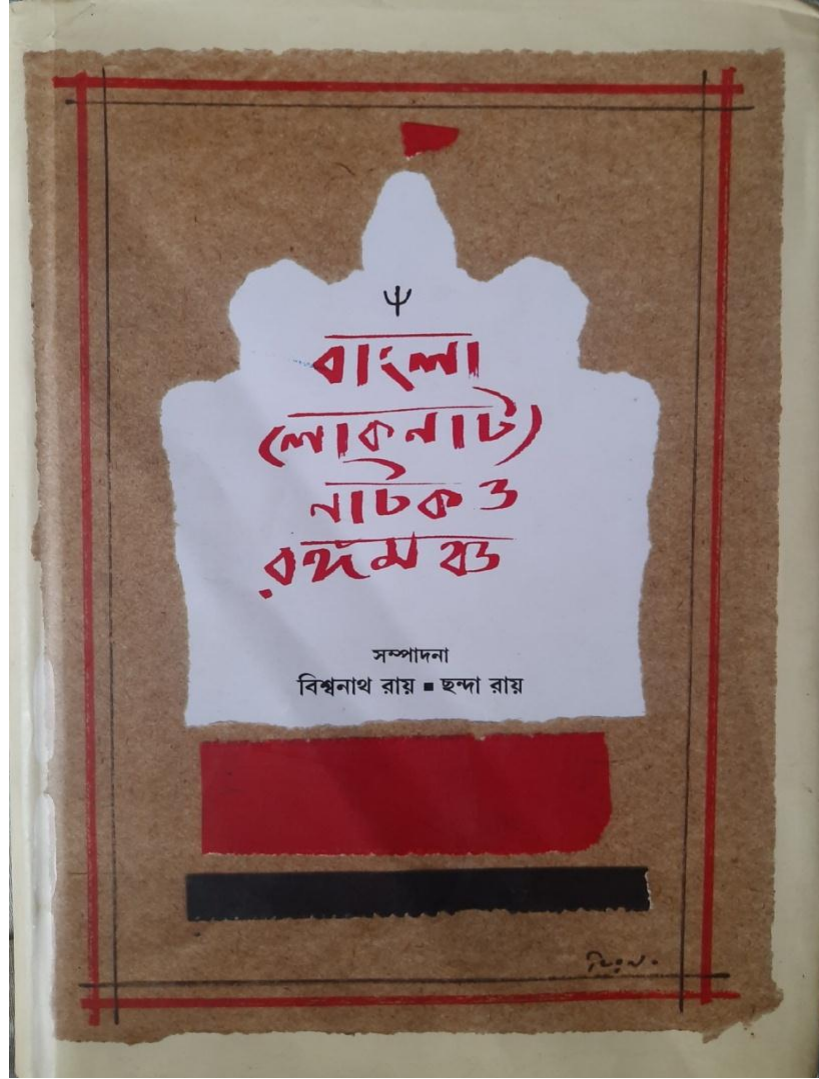
প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি সাইমন জাকারিয়া রচিত 'প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১১, পৃষ্ঠা-১৫।



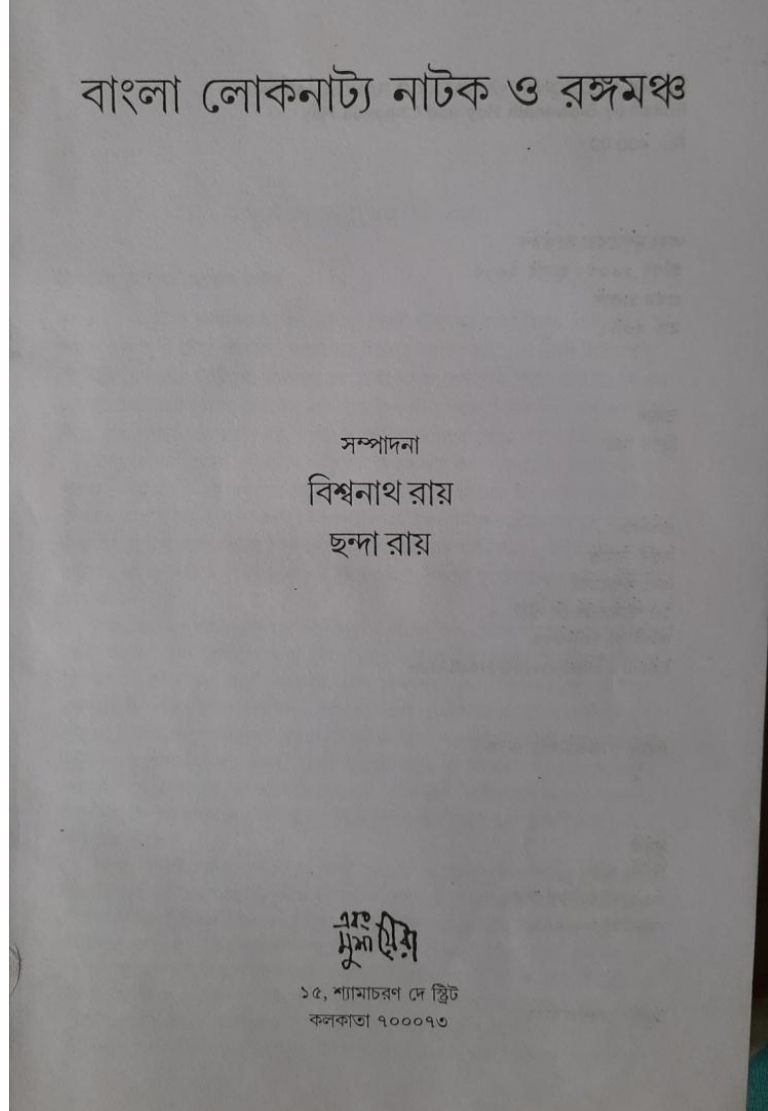
বোধিধ্রুম নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি সাইমন জাকারিয়া রচিত 'বোধিধ্রুম' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৪৯, পৃষ্ঠা -৩১।



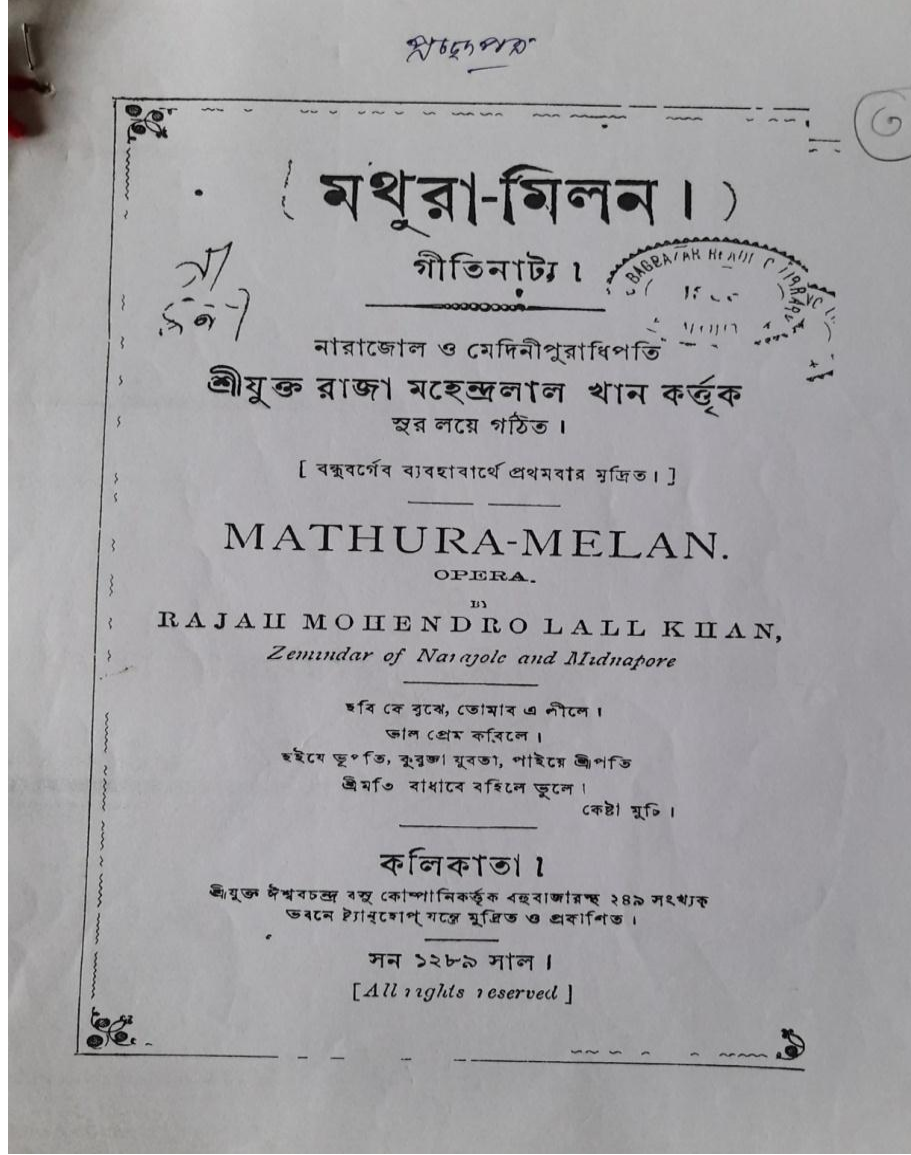
বোধিধর্ম নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি সাইমন জাকারিয়া রচিত ‘বোধিধর্ম’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৫০, পৃষ্ঠা-৩১।



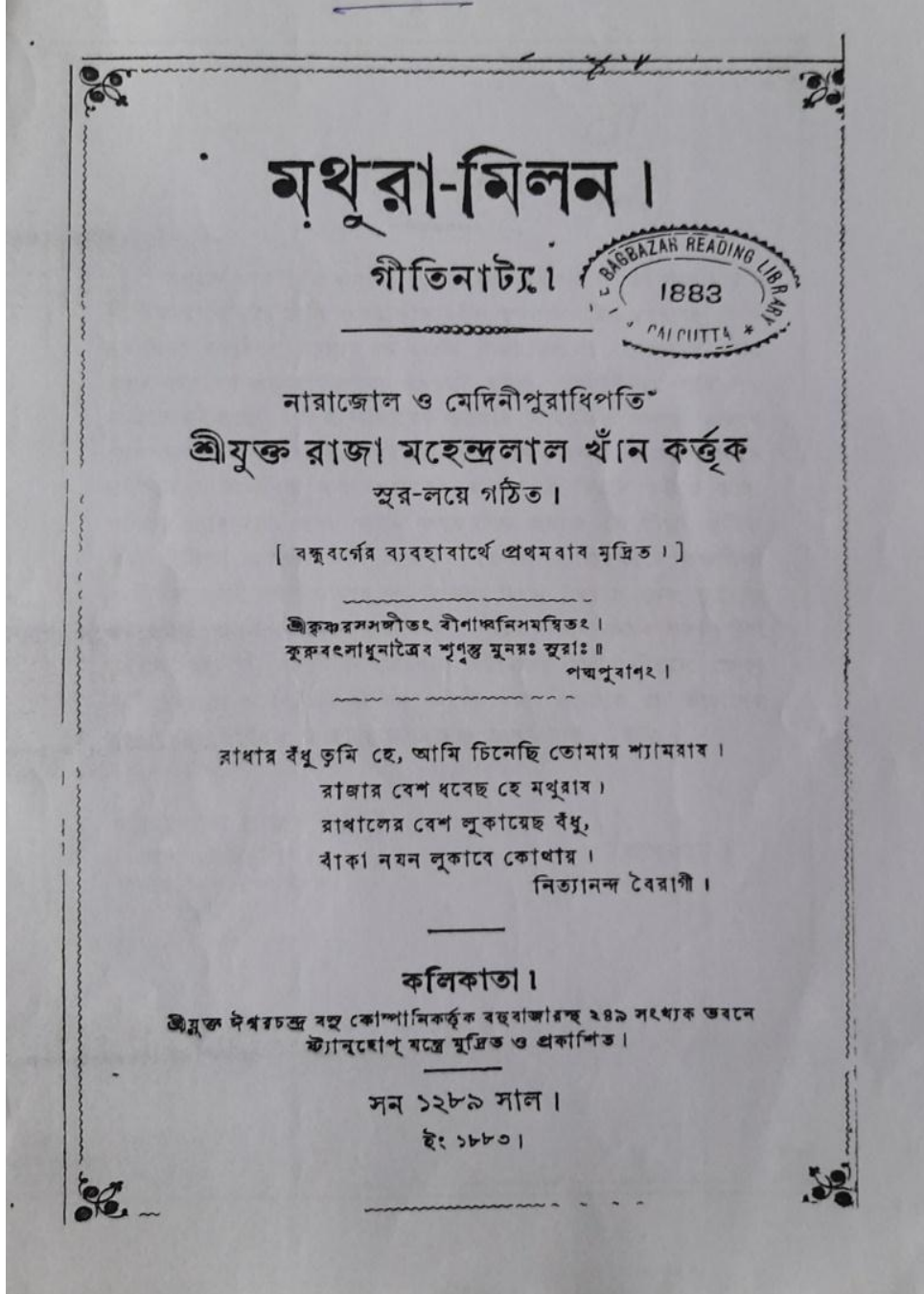
অসম্ভব গোলটেবিল নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি শিবাশিষ মুখোপাধ্যায় রচিত ‘অসম্ভব গোলটেবিল’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ৬৭, পৃষ্ঠা-৪১।



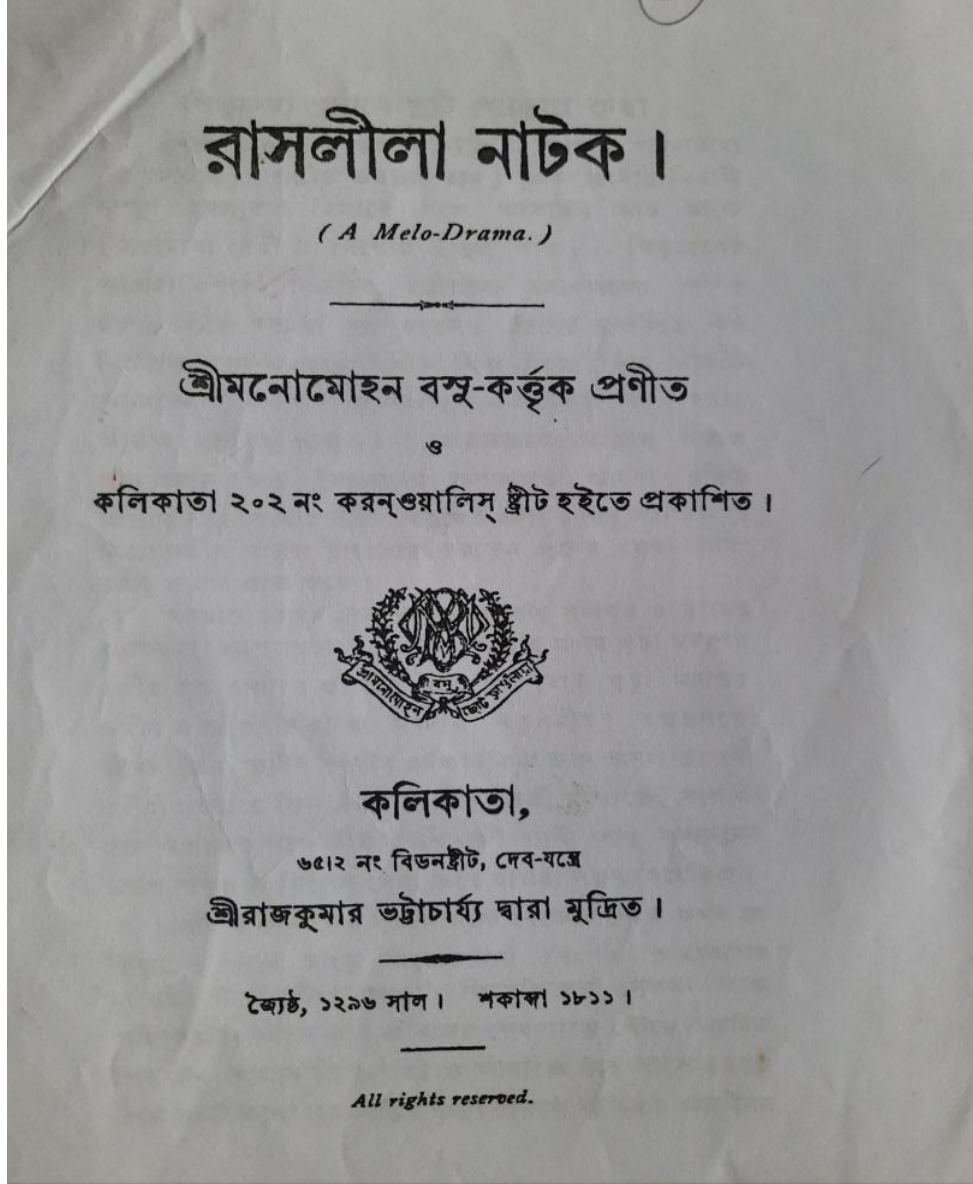
অসম্ভব গোলটেবিল নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি শিবাশিষ মুখোপাধ্যায় রচিত ‘অসম্ভব গোলটেবিল’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ৬৯, পৃষ্ঠা-৪২।



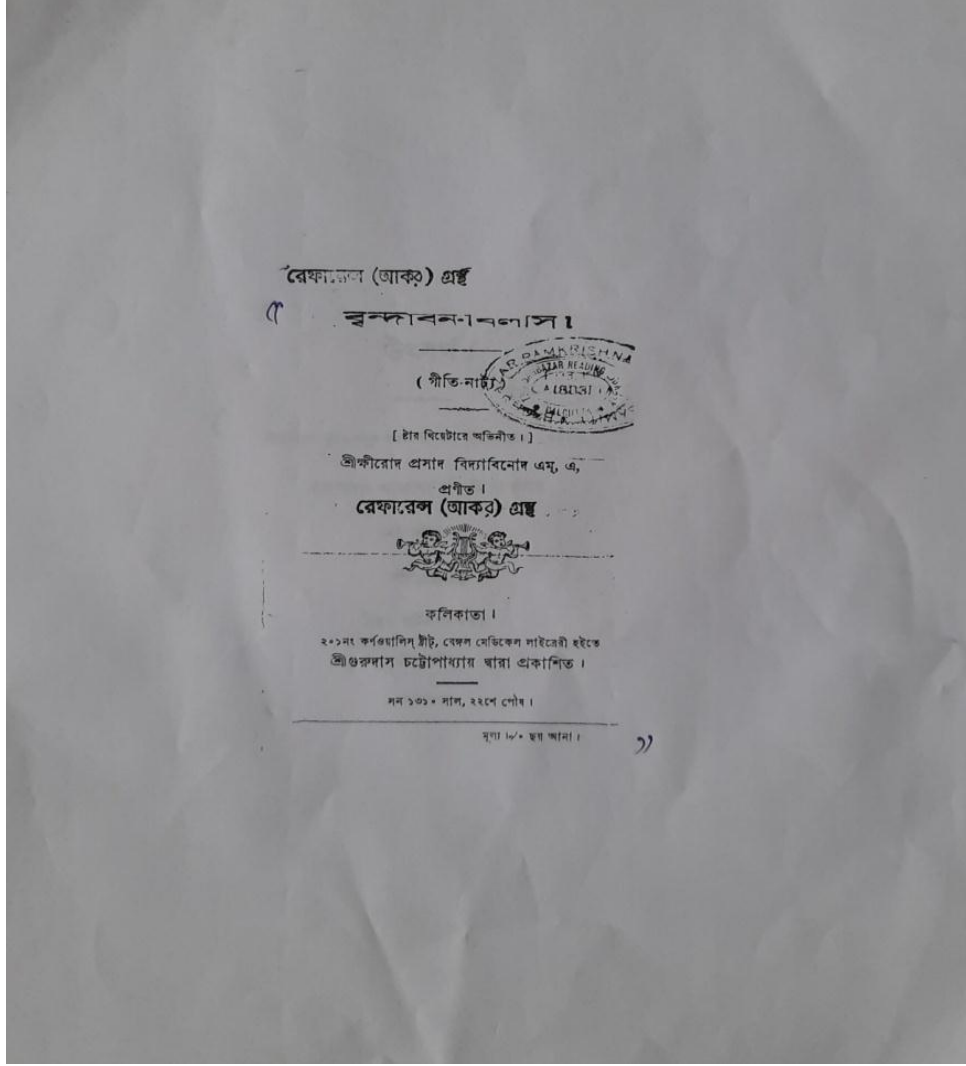
মথুরা-মিলন নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি রাজা মহেন্দ্রলাল খান রচিত 'মথুরা-মিলন' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ১৮, পৃষ্ঠা- ৬৩।



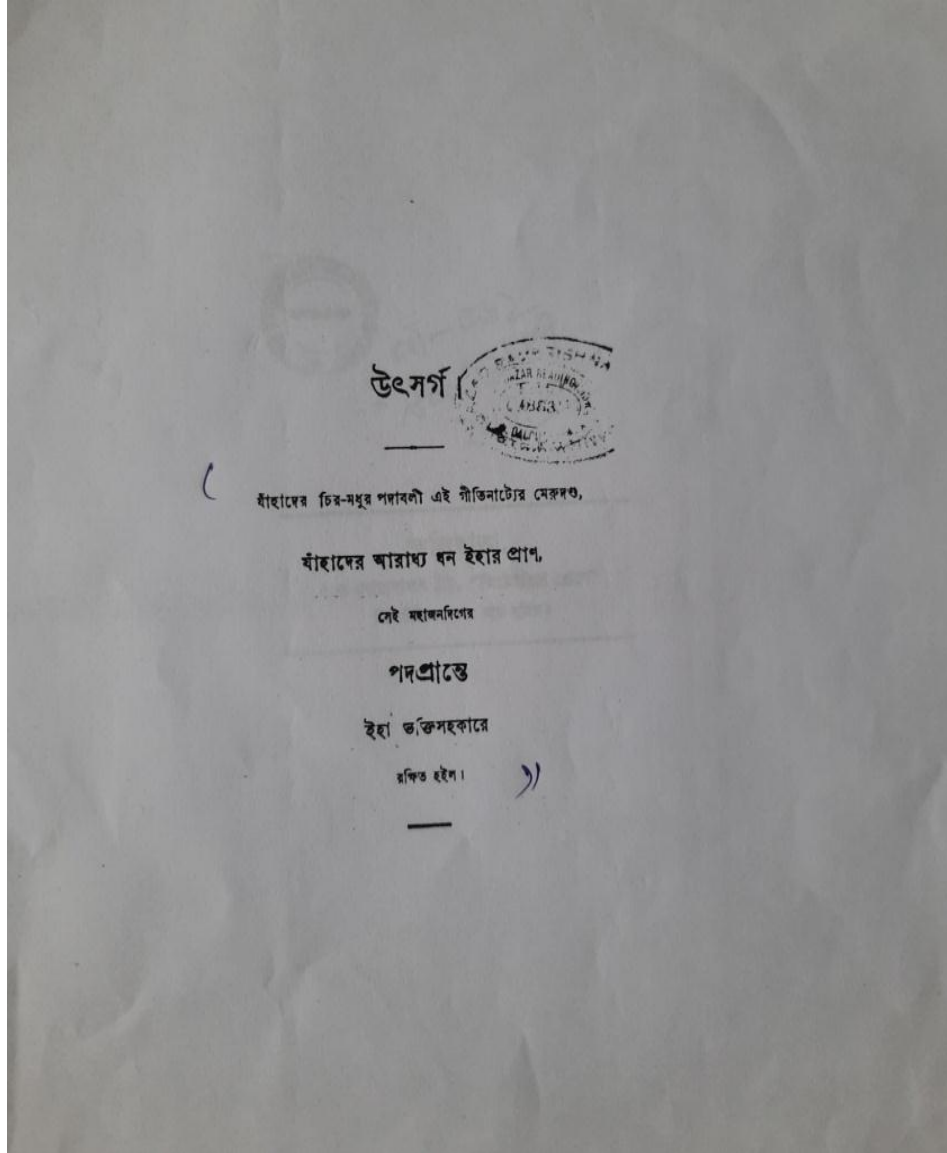
মথুরা-মিলন নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি । চিত্রটি রাজা মহেন্দ্রলাল খান রচিত ‘মথুরা-মিলন’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত । বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১৯ , পৃষ্ঠা- ৬৩ ।



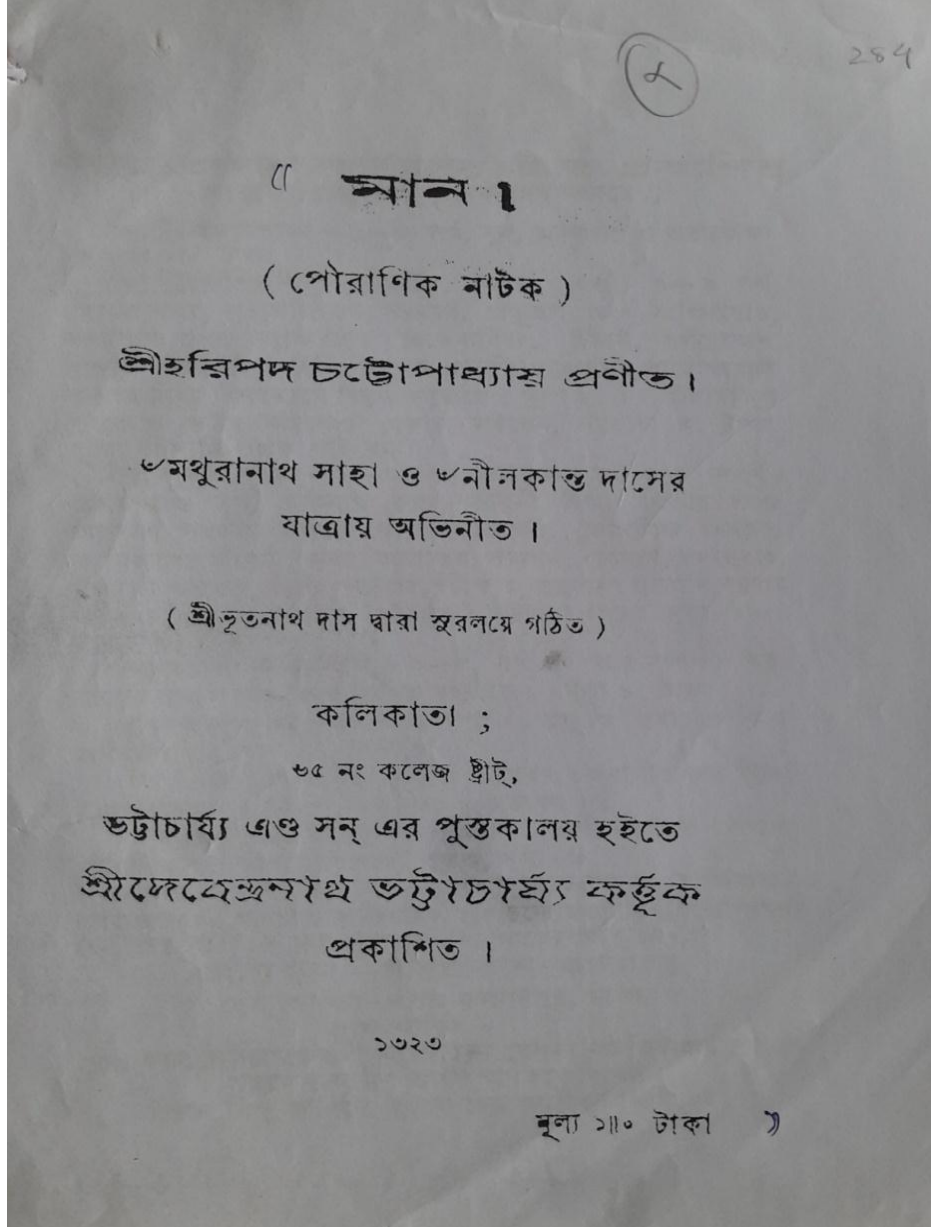
রাসলীলা নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি মনোমোহন বসু রচিত 'রাসলীলা' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৩৩, পৃষ্ঠা- ৬৯।



বৃন্দাবন-বিলাস নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত ‘বৃন্দাবন-বিলাস’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্যঃ তৃতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৫১, পৃষ্ঠা-৭৮।

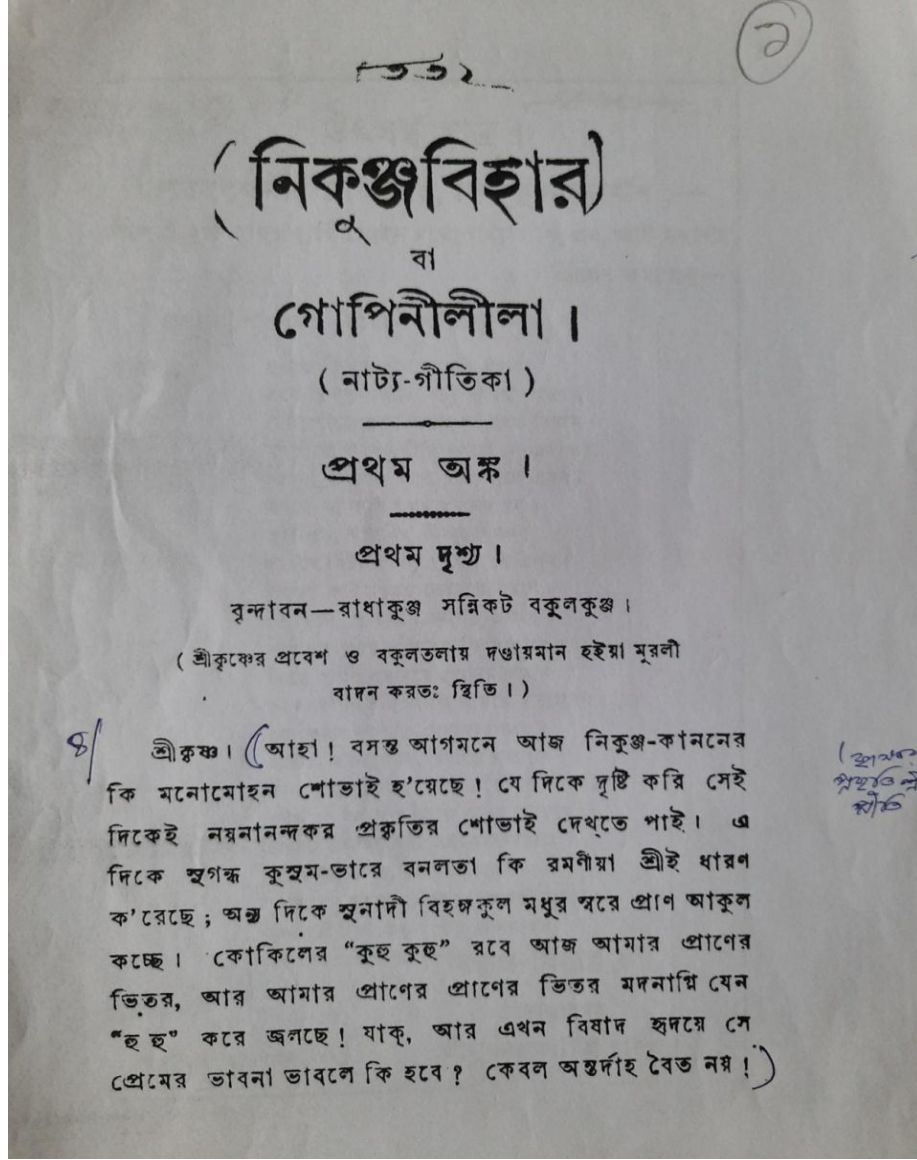


বৃন্দাবন-বিলাস নাটকের উৎসর্গপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত 'বৃন্দাবন-বিলাস' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্যঃ তৃতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ৫৩, পৃষ্ঠা- ৭৮।

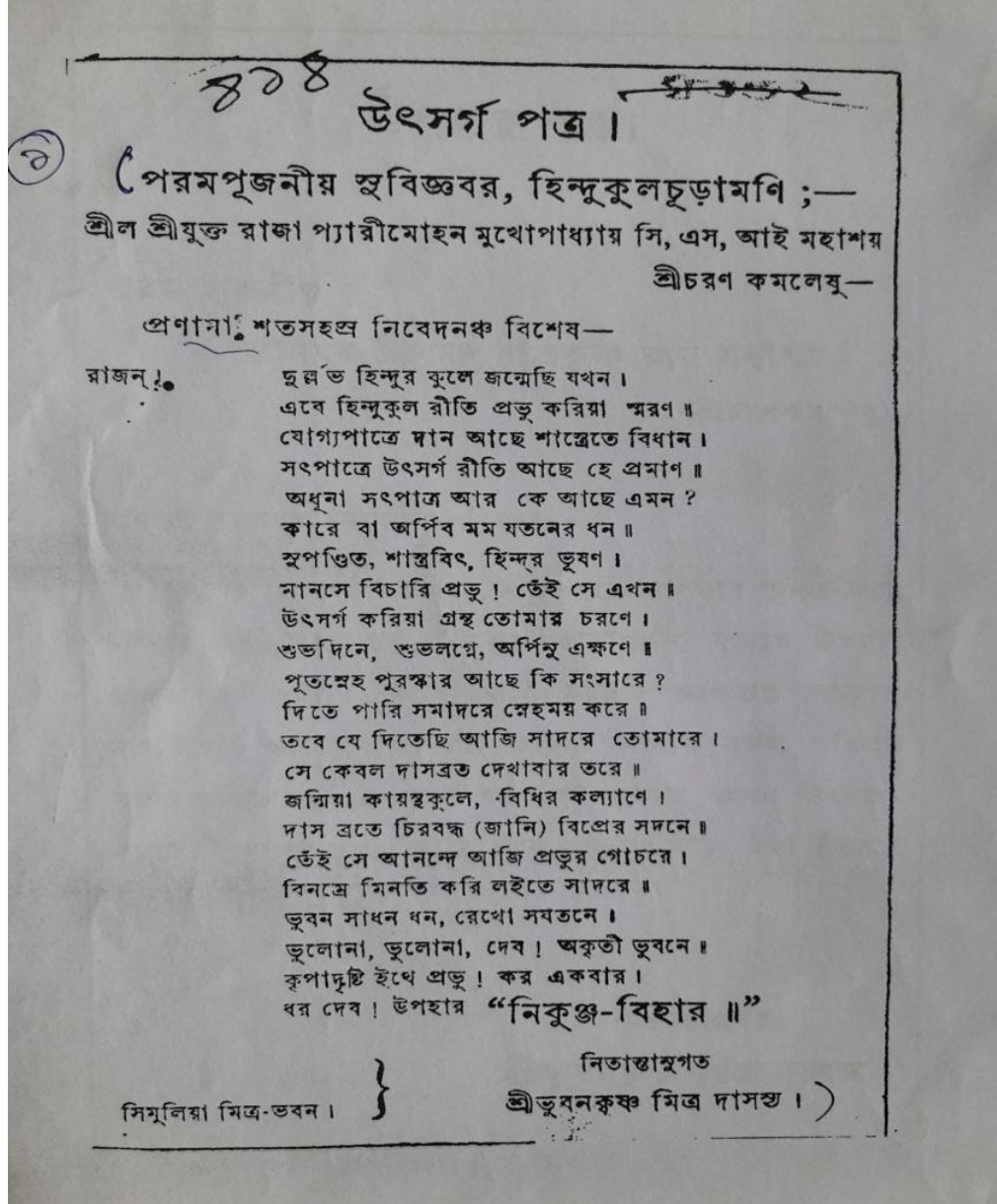


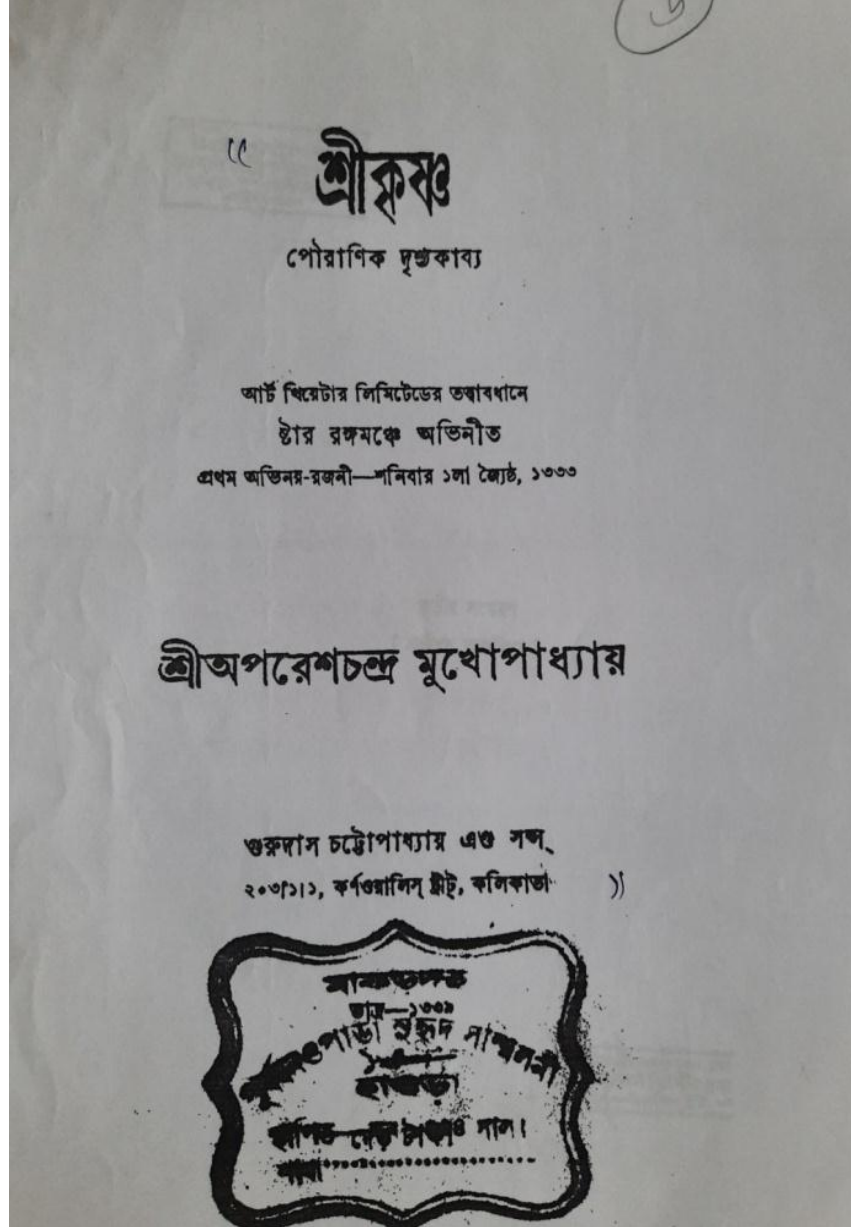
মান নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি হরিপদ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মান' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৬৮, পৃষ্ঠা-৮৩।



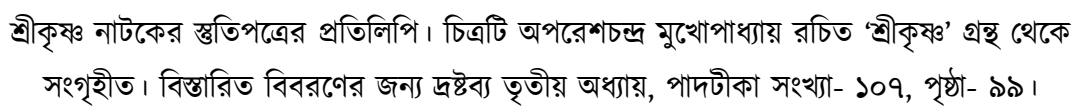
নিকুঞ্জবিহার নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি ভুবনকৃষ্ণ মিত্র রচিত 'নিকুঞ্জবিহার' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ৮৮, পৃষ্ঠা- ৯১।

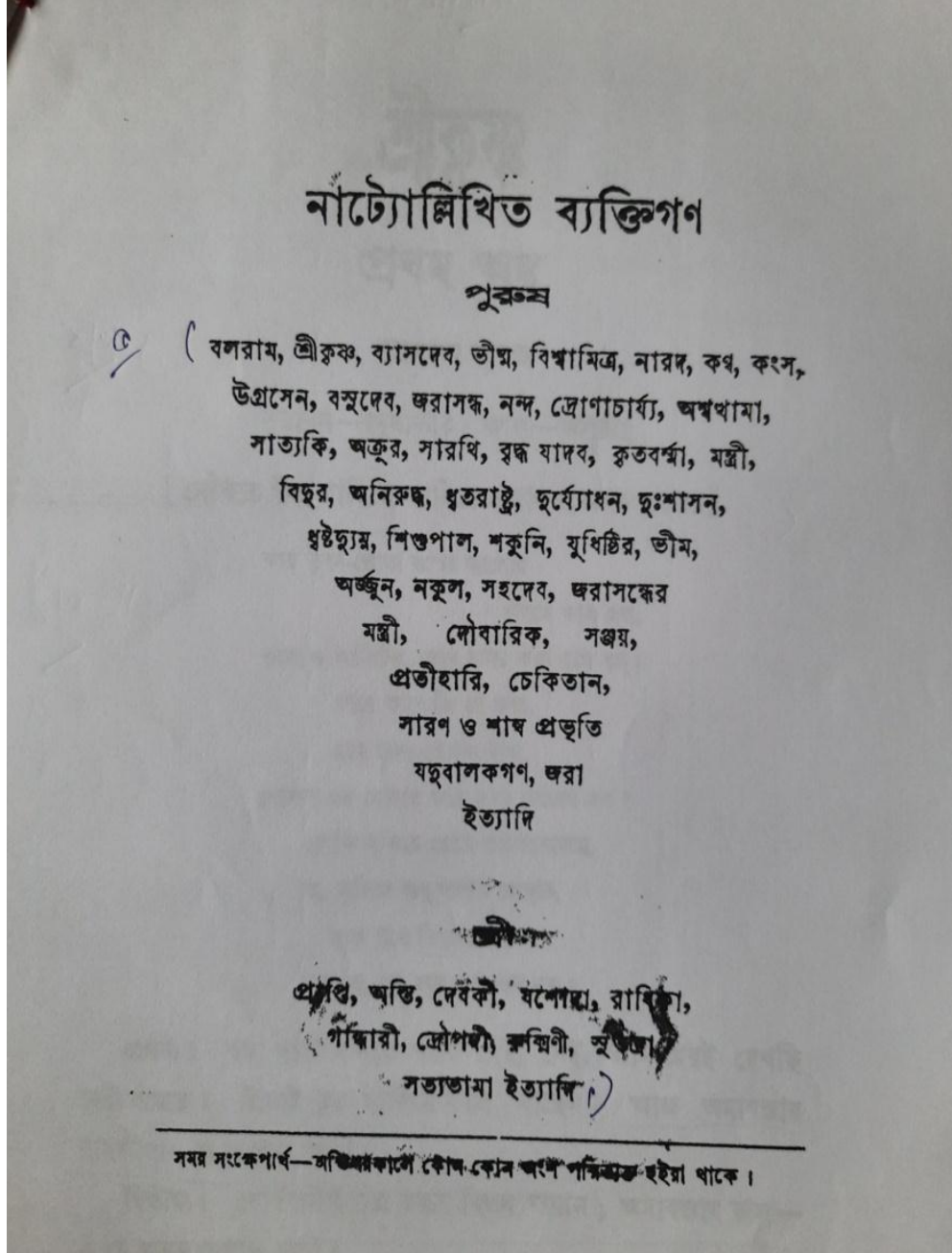




শ্রীকৃষ্ণ নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১০৫, পৃষ্ঠা- ৯৯।

२७-७४

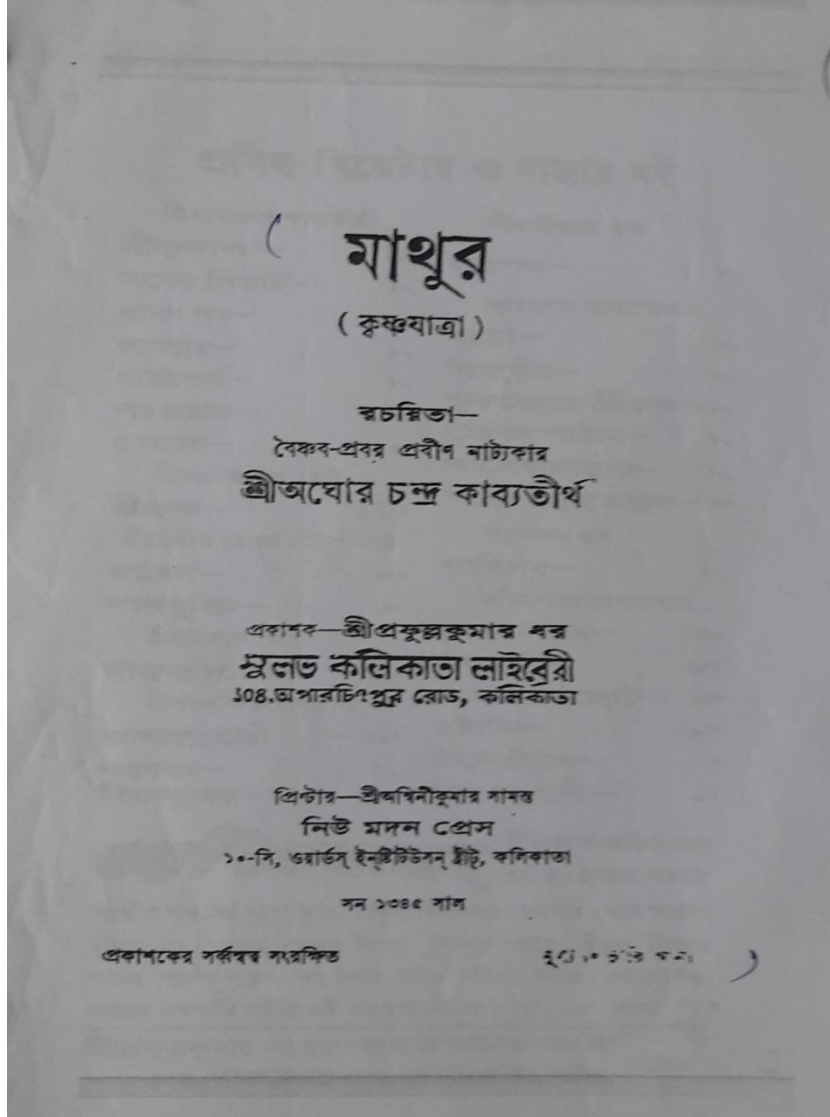




শ্রীকৃষ্ণ নাটকের চরিত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ১১০, পৃষ্ঠা- ৯৯।

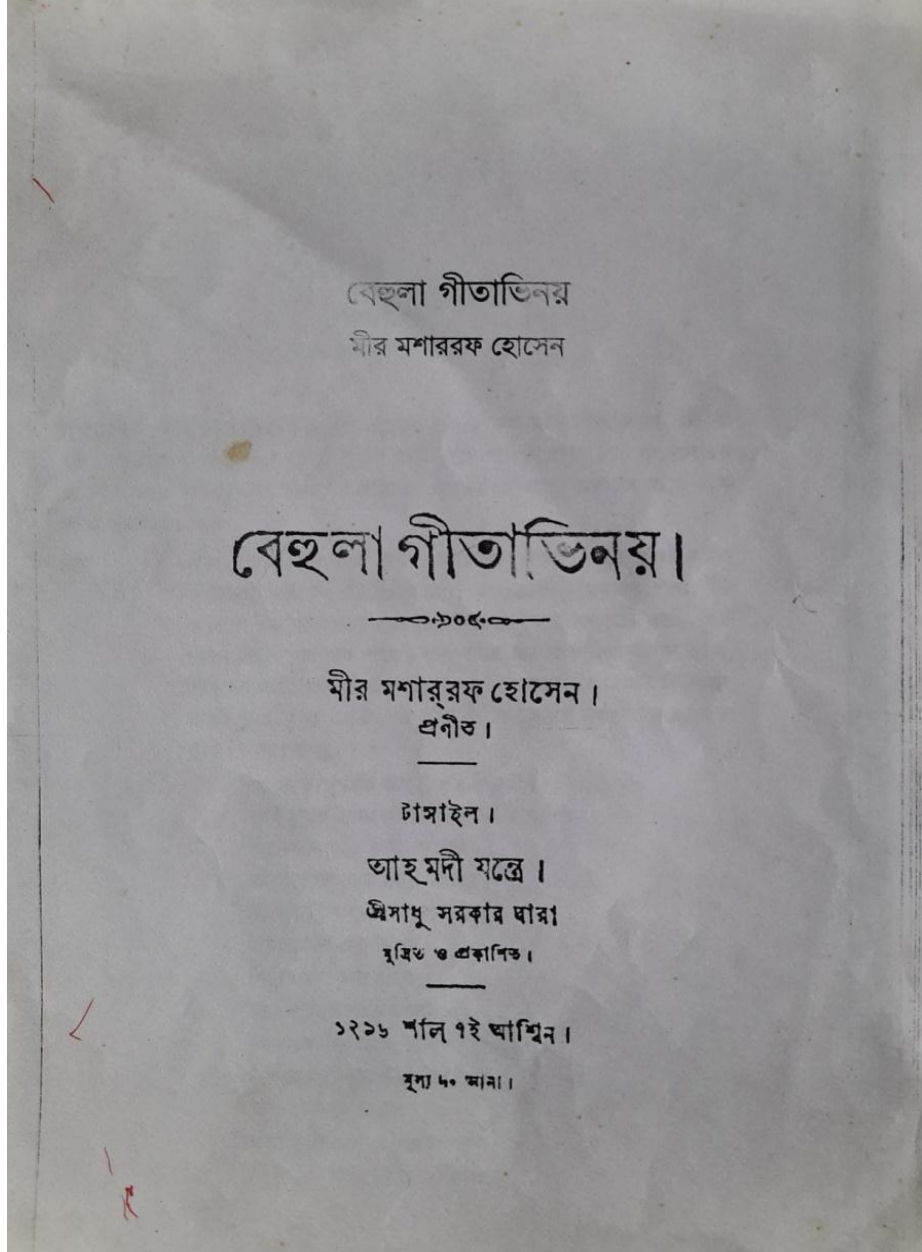


মাথুর নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ রচনিত ‘মাথুর’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১২১, পৃষ্ঠা- ১০৫।



মাথুর নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ রচি 'মাথুর' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

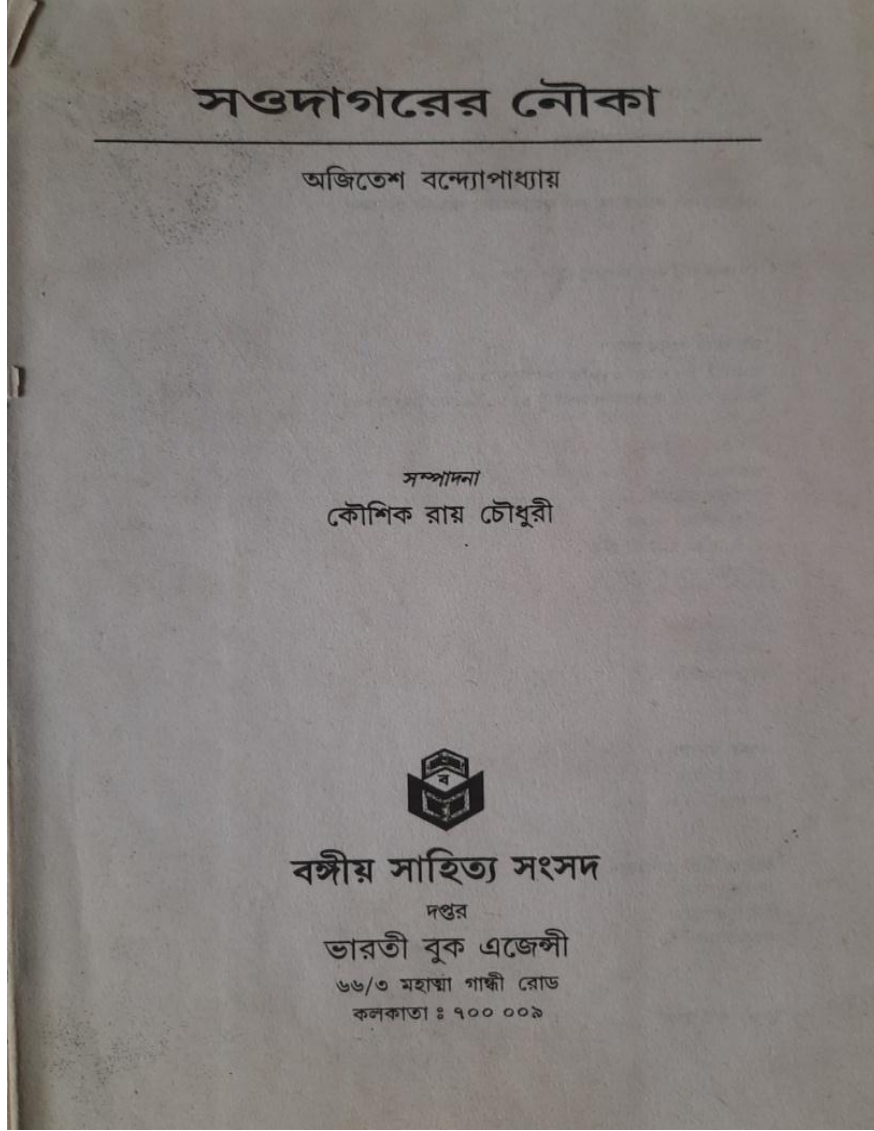
বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১২২, পৃষ্ঠা- ১০৫।



‘বেহুলা গীতাভিনয়’ নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি মীর মশাররফ হোসেন রচিত ‘বেহুলা গীতাভিনয়’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ১, পৃষ্ঠা -১১৮।

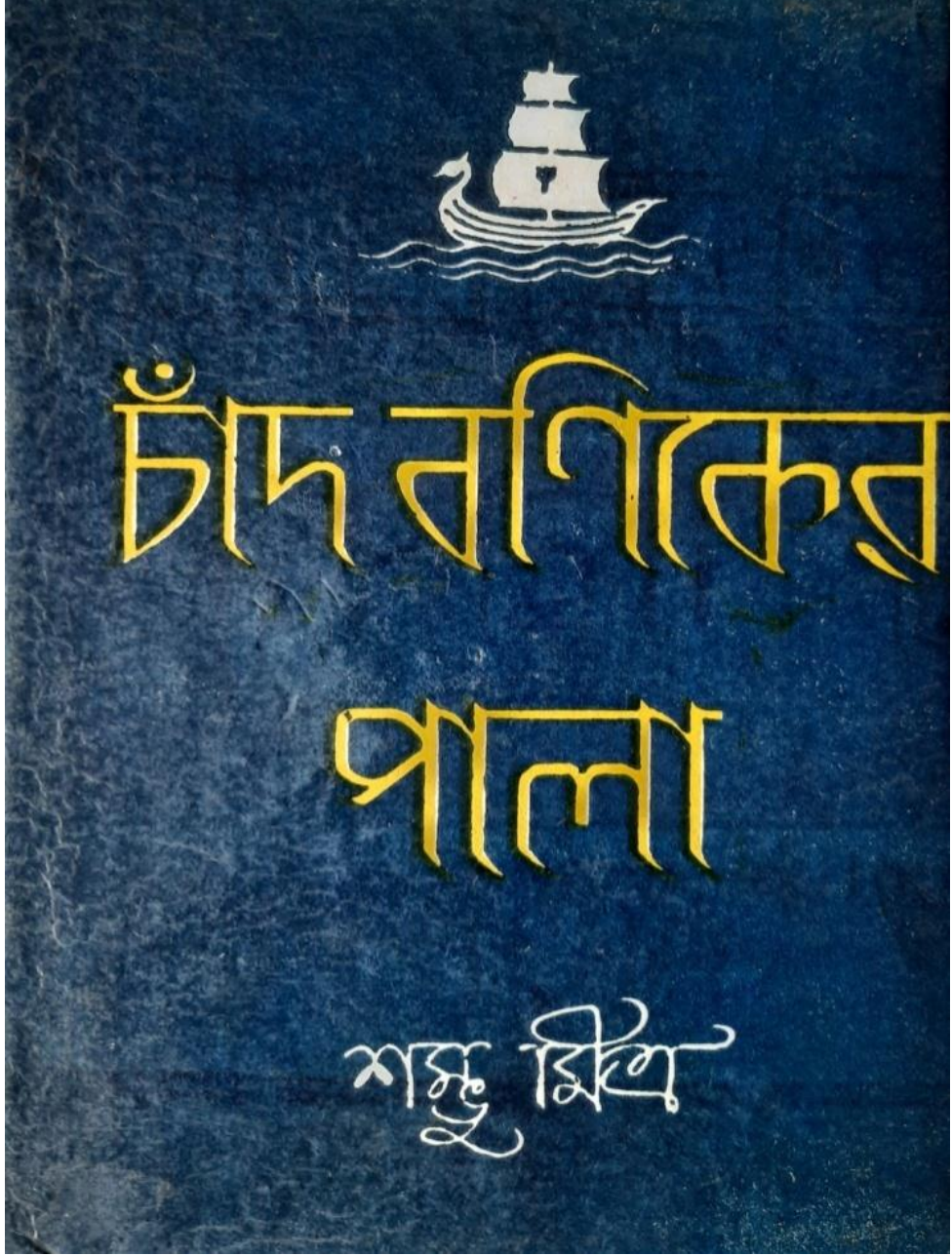


সওদাগরের নৌকা নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত
'সওদাগরের নৌকা' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা
সংখ্যা- ১৩, পৃষ্ঠা -১২৫।

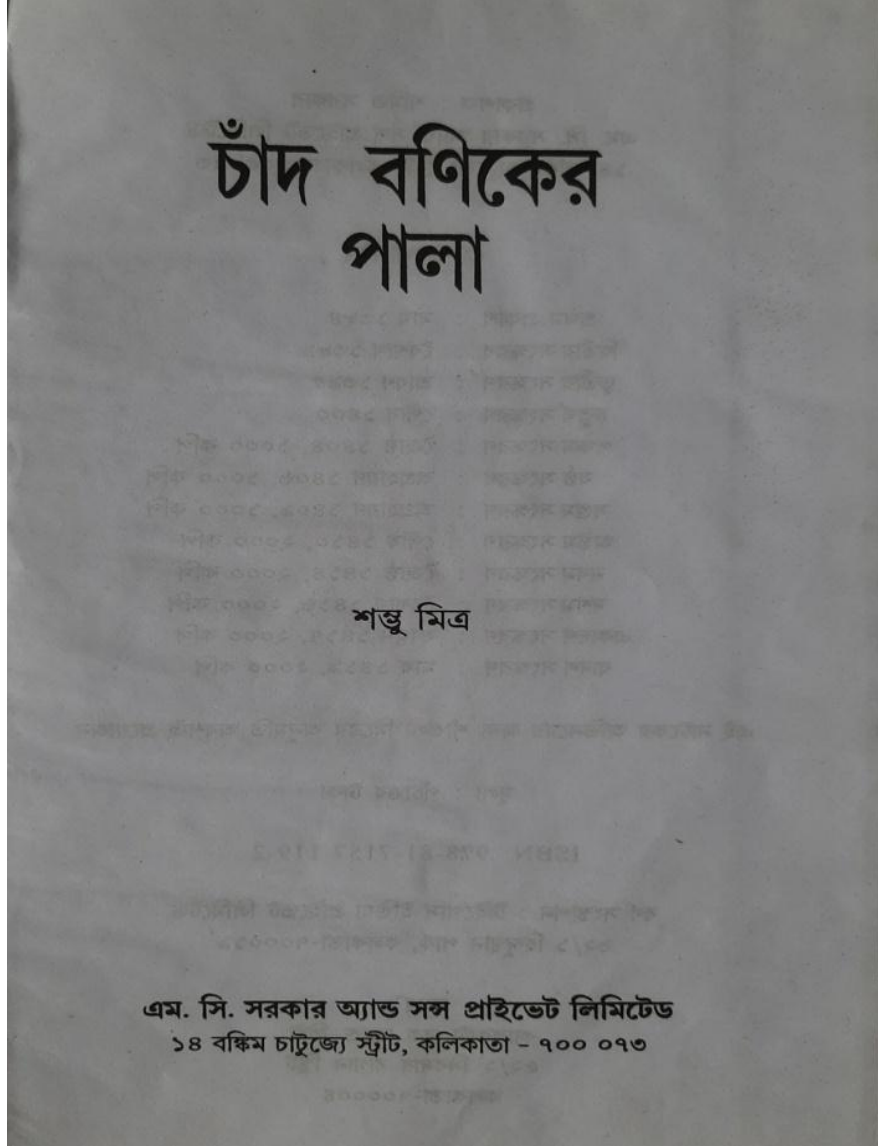


সওদাগরের নৌকা নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘সওদাগরের নৌকা’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১৪,

পৃষ্ঠা -১২৫।



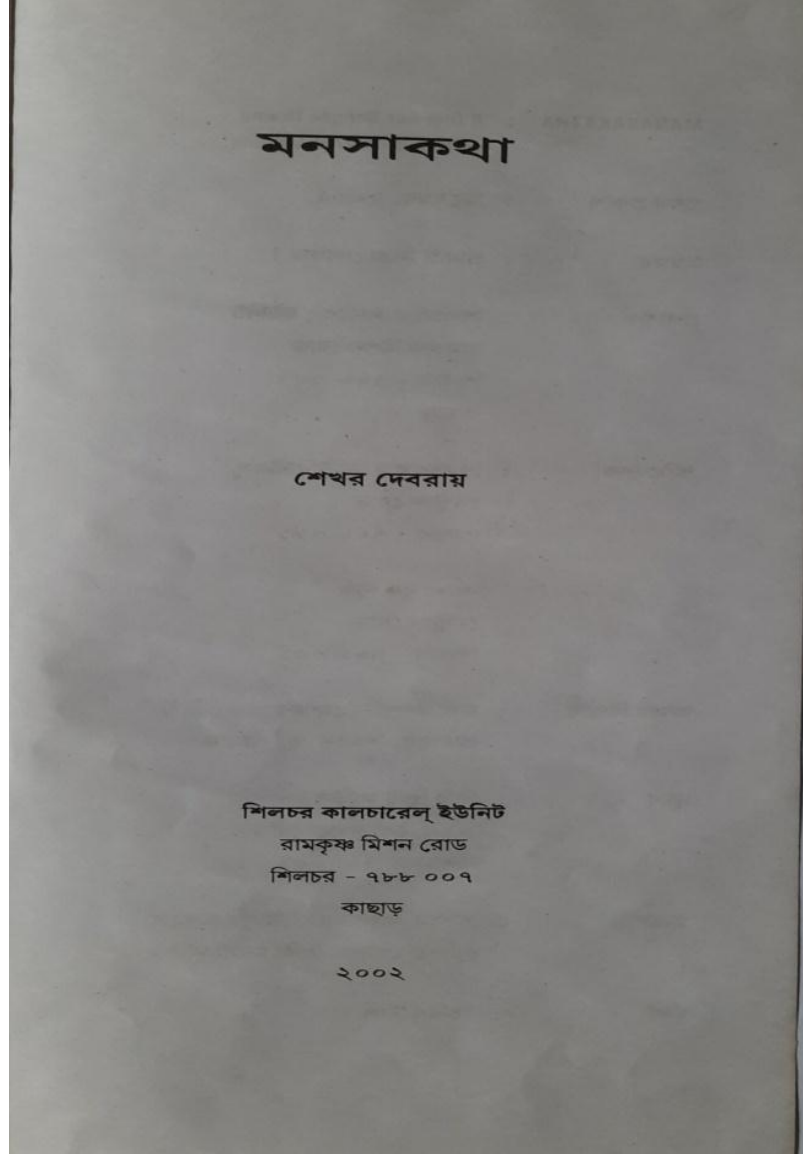
চাঁদ বণিকের পালা নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি শমু মিত্র রচিত ‘চাঁদ বণিকের পালা’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৩৩, পৃষ্ঠা -১৩৪।



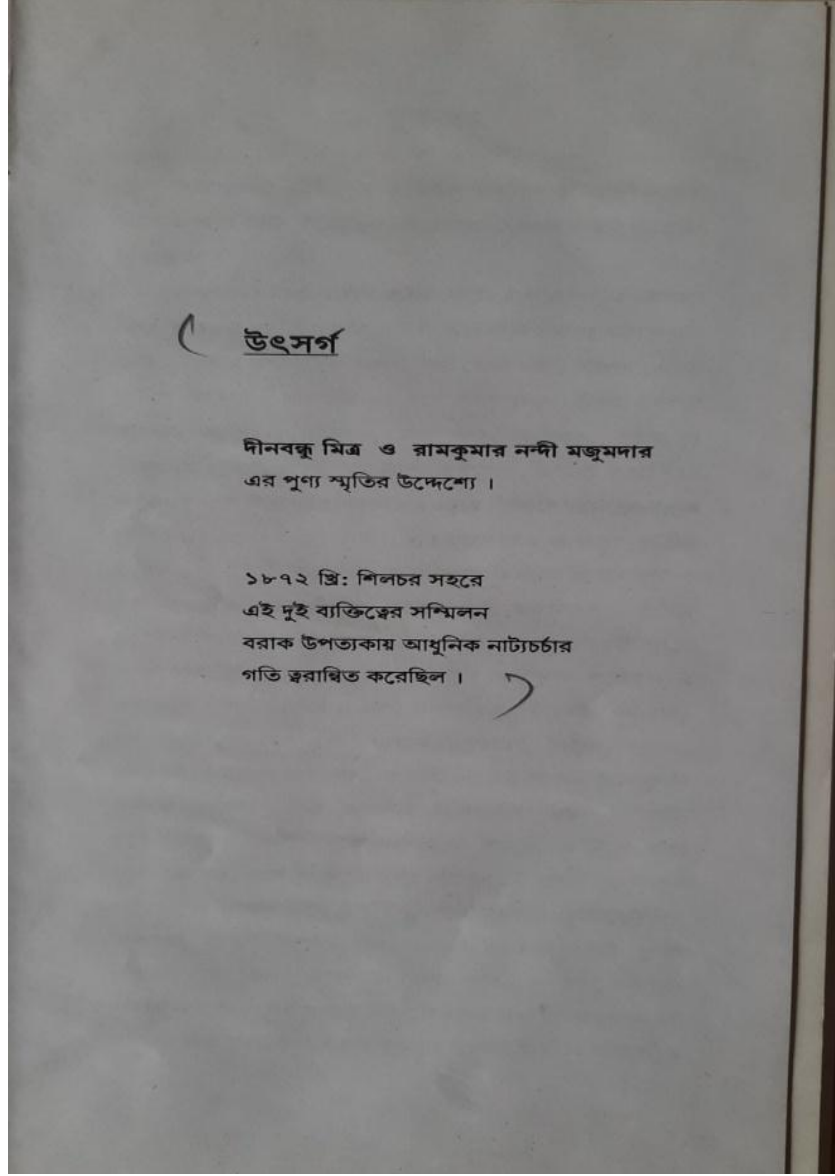
চাঁদ বণিকের পালা নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি শঙ্খু মিত্র রচিত ‘চাঁদ বণিকের পালা’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ৩৪, পৃষ্ঠা -১৩৪।



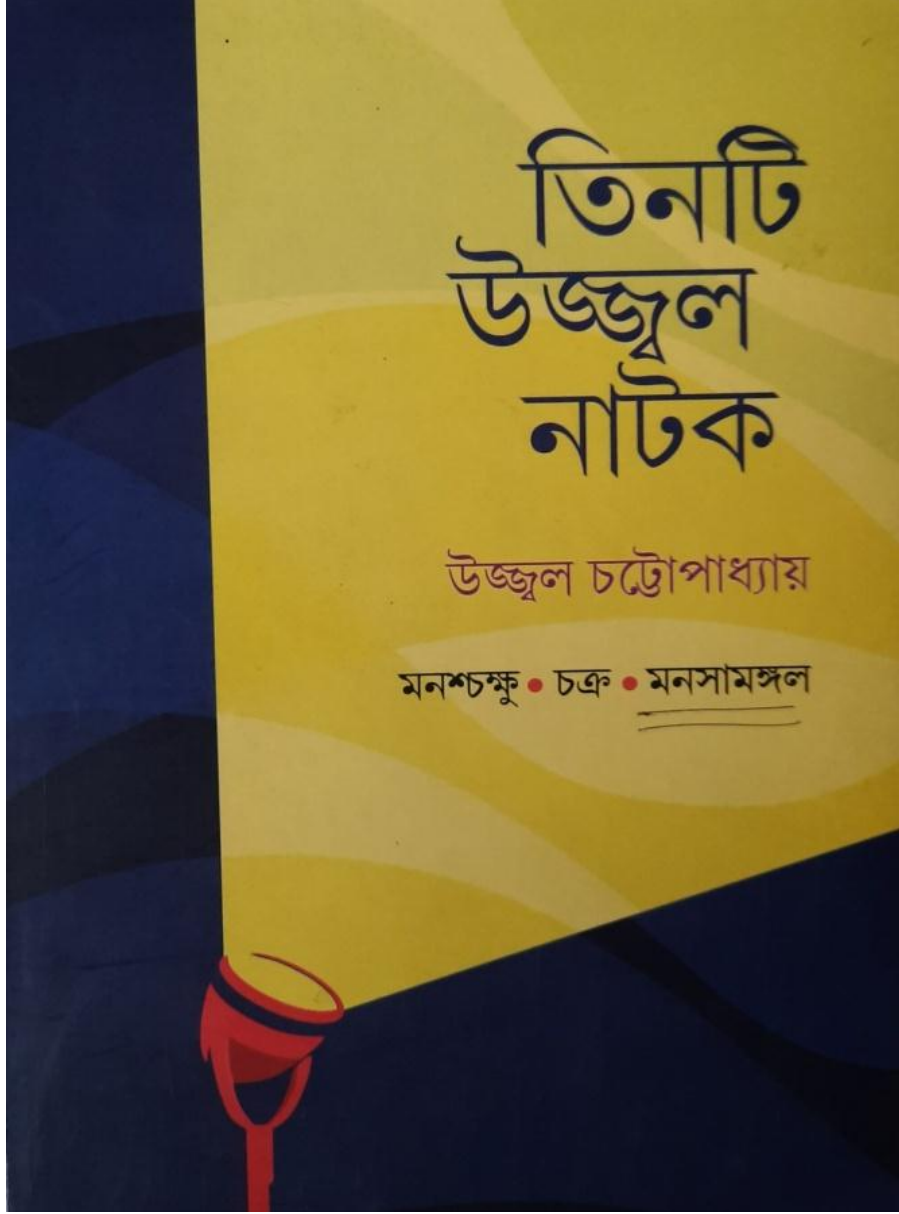
মনসাকথা নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি শেখর দেবরায় রচিত ‘মনসাকথা’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ৪৪, পৃষ্ঠা - ১৪০।



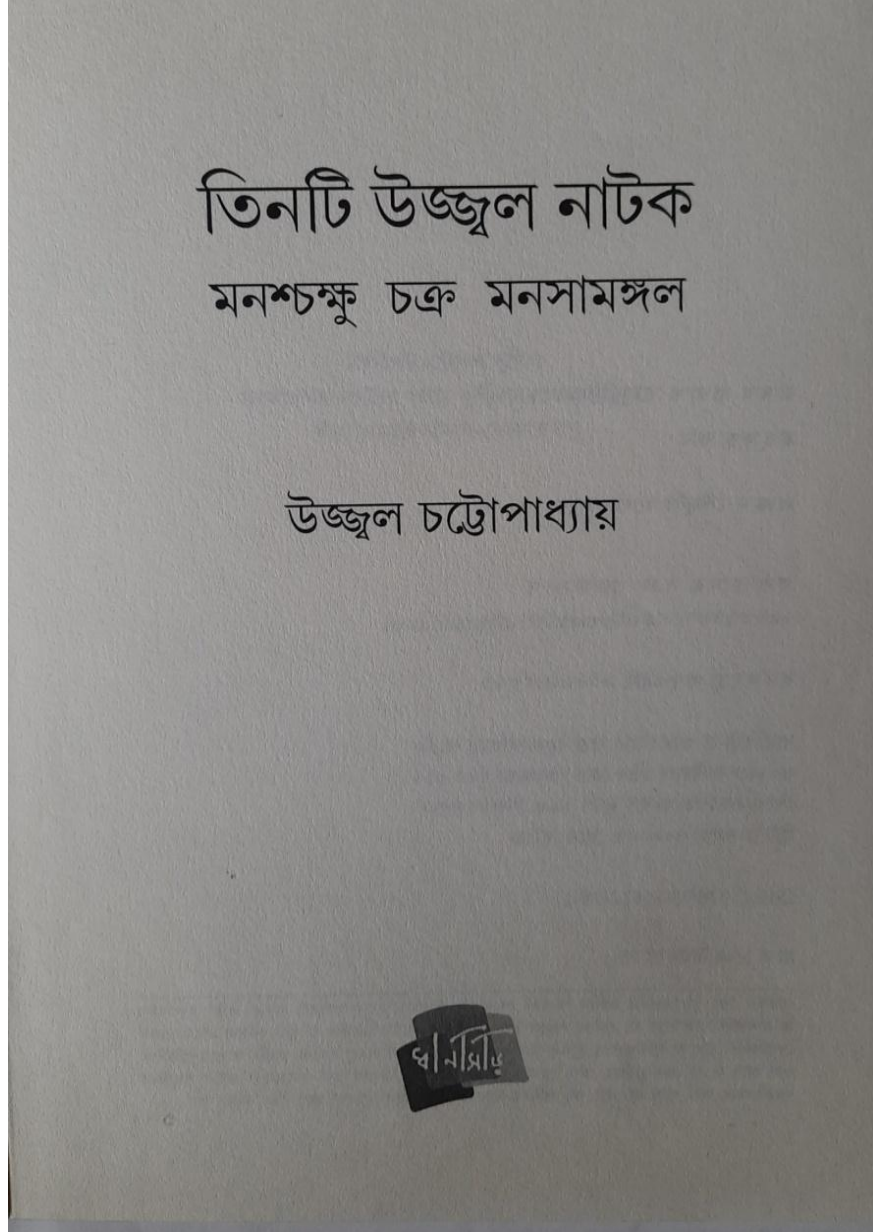
মনসাকথা নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি শেখর দেবরায় রচিত ‘মনসাকথা’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ৪৫, পৃষ্ঠা -১৪০।



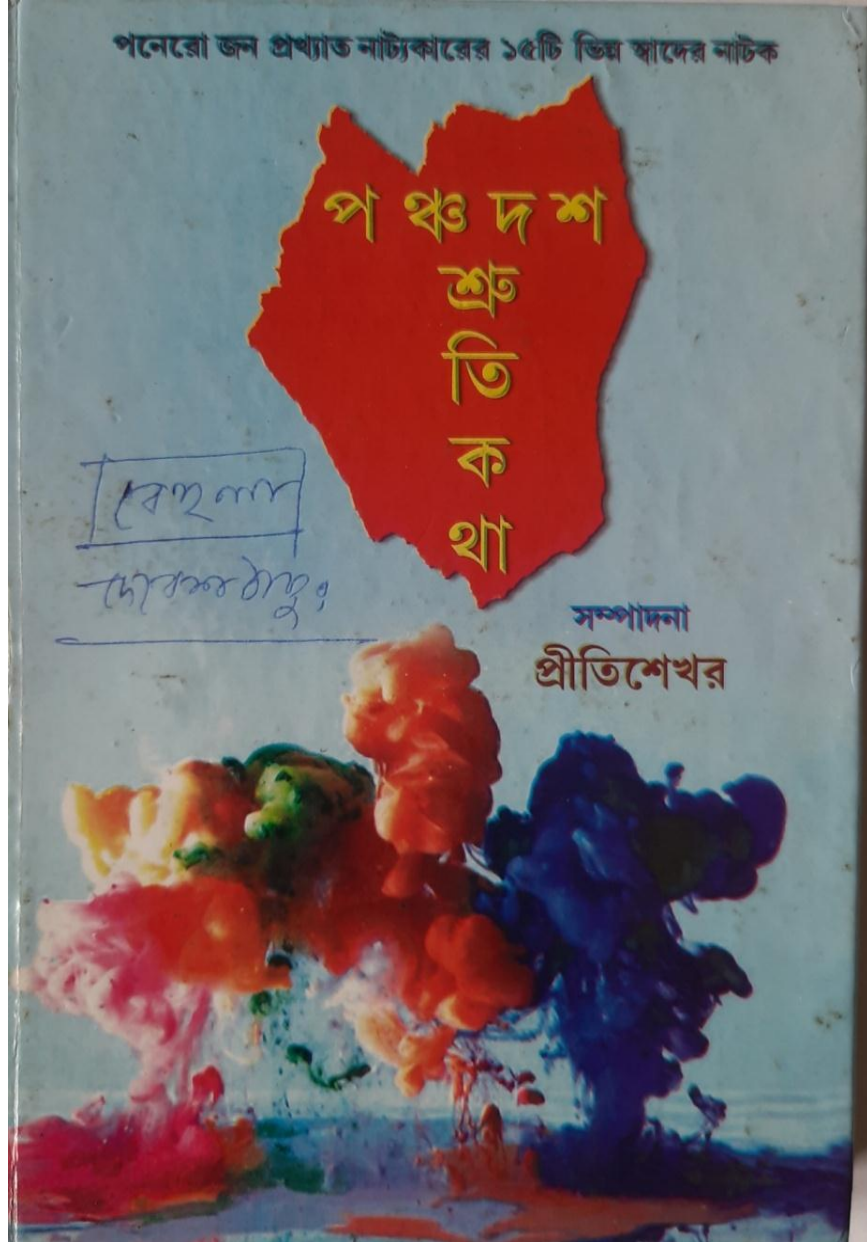
মনসাকথা নাটকের উৎসর্গপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি শেখর দেবরায় রচিত ‘মনসাকথা’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৪৬, পৃষ্ঠা -১৪০।



মনসামঙ্গল নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘মনসামঙ্গল’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিতবিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৬৮, পৃষ্ঠা -১৫১।

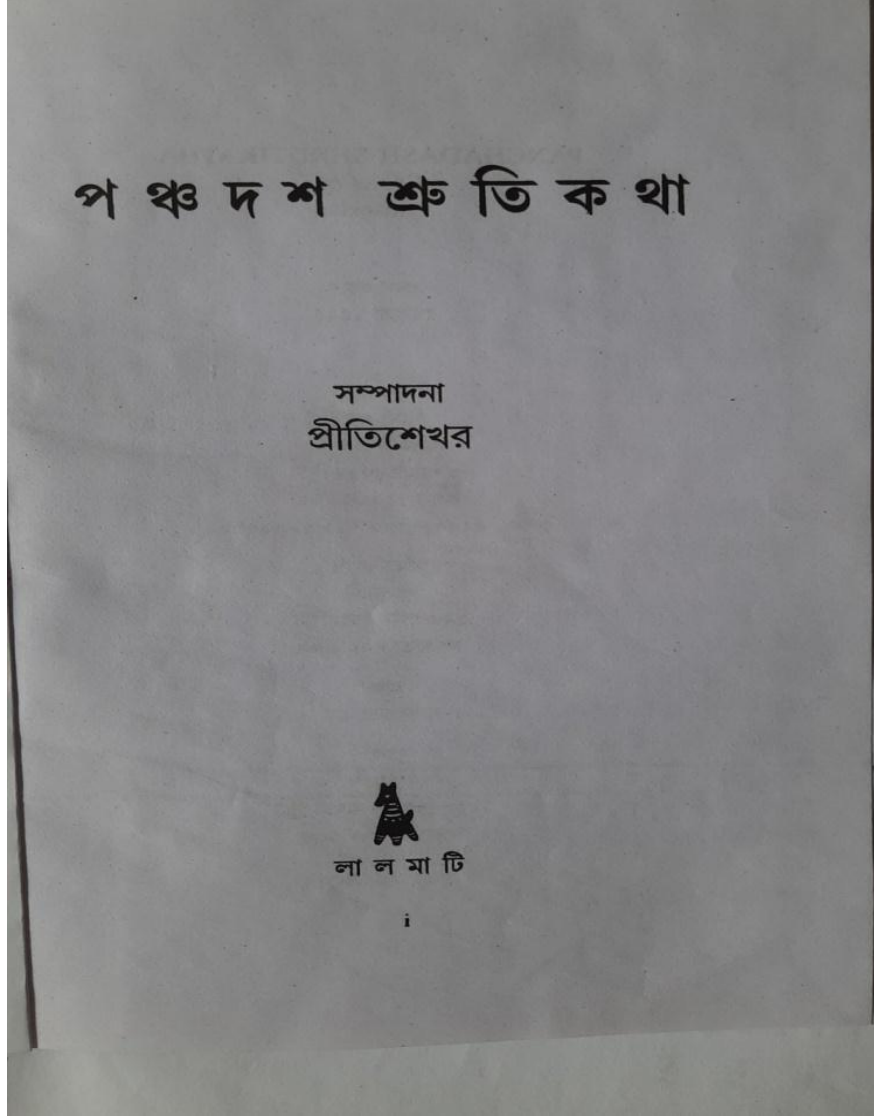


মনসামঙ্গল নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মনসামঙ্গল' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ৬৯, পৃষ্ঠা -১৫১।



বেহুলা নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি দেবশ ঠাকুর রচিত 'বেহুলা' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

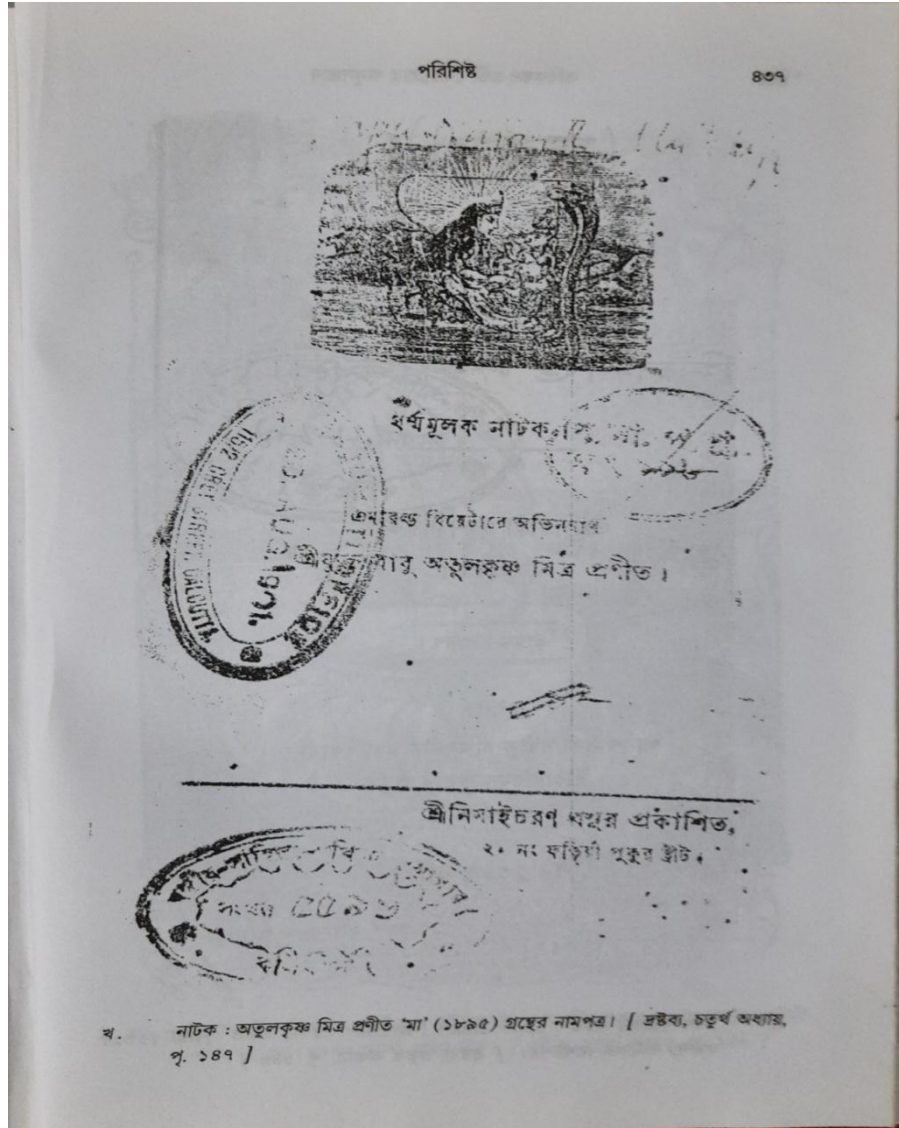
বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৮৮, পৃষ্ঠা - ১৫৮।



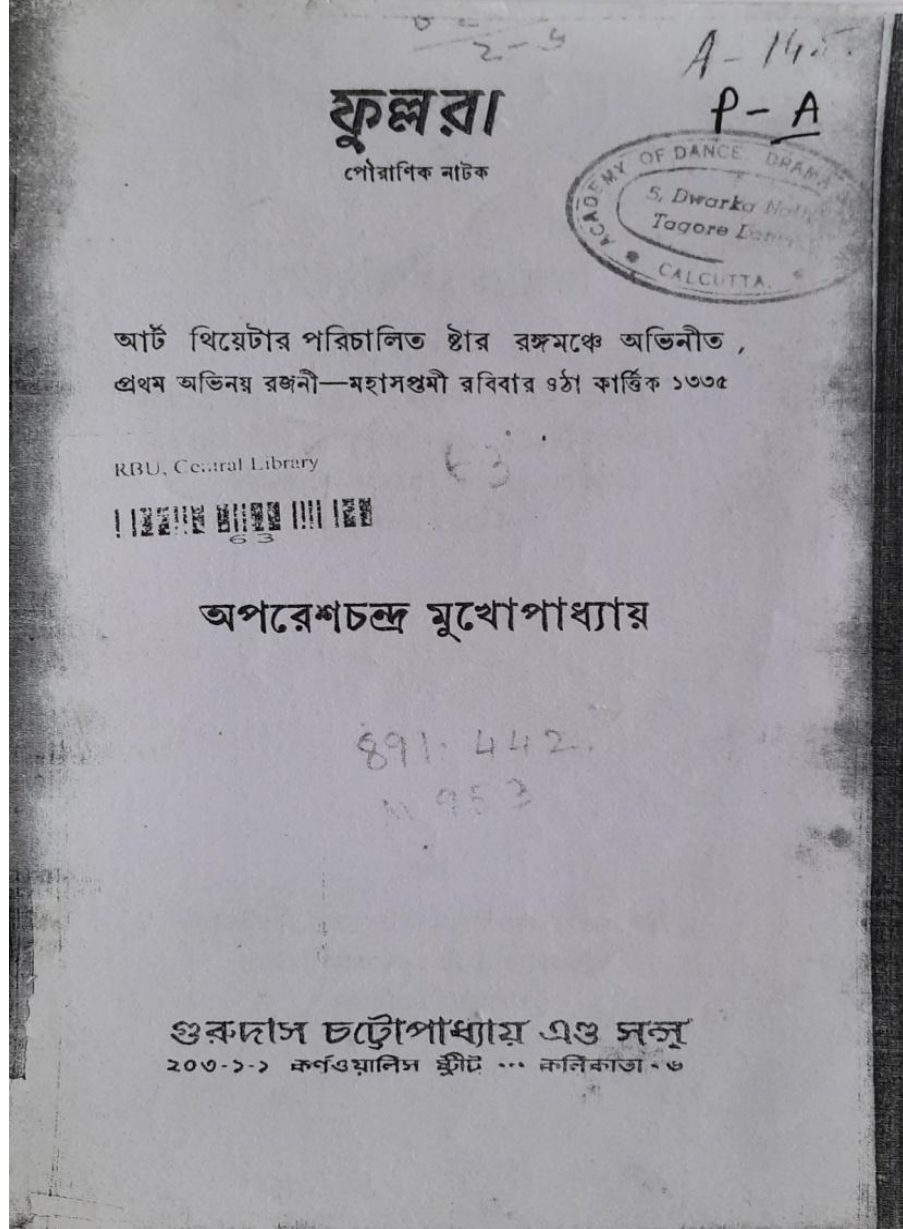
বেহুলা নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি দেবেশ ঠাকুর রচিত ‘বেহুলা’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ৮৯, পৃষ্ঠা - ১৫৯।

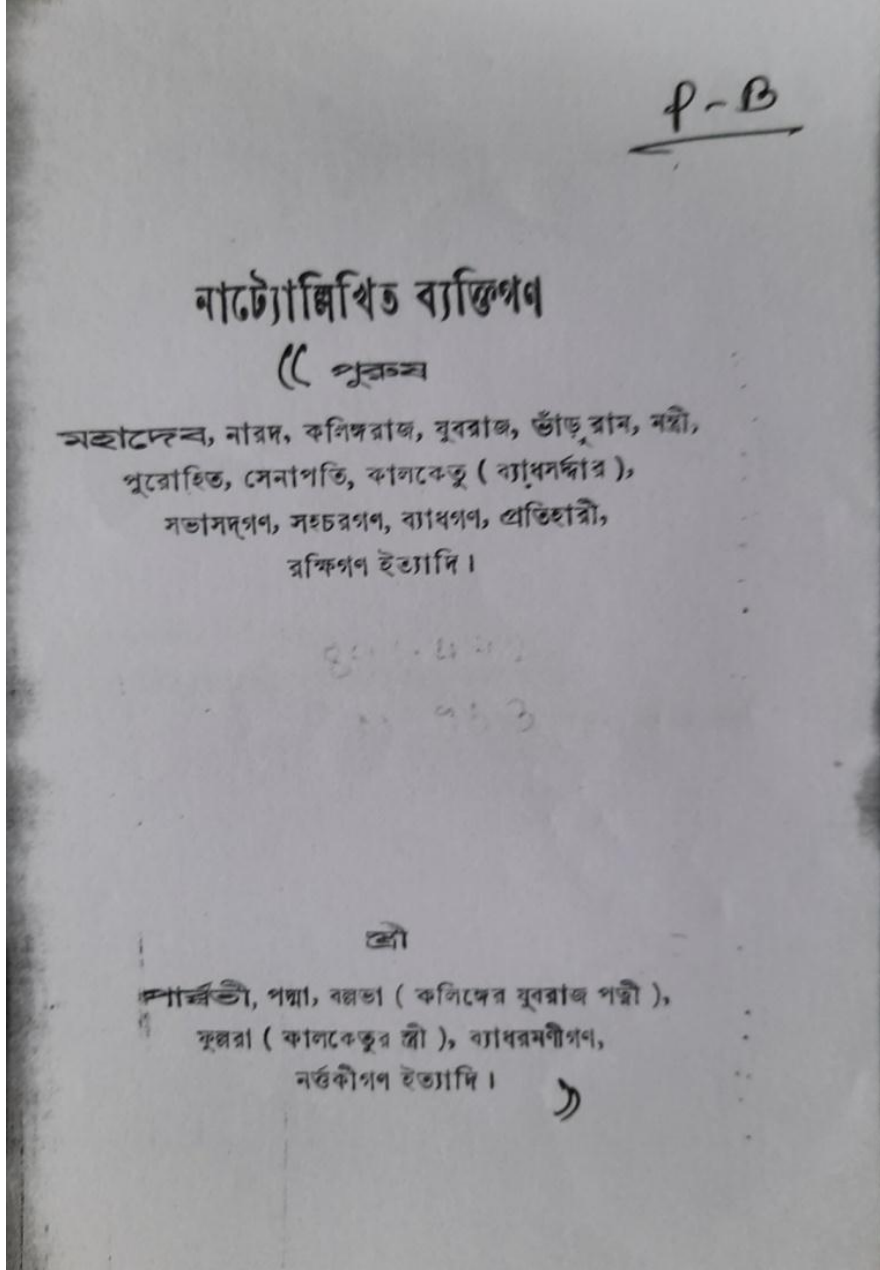
চিত্র সংখ্যা -৩২



মা নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি অতুলকৃষ্ণ মিত্র রচিত 'মা' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত
বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ৯৮, পৃষ্ঠা - ১৬৩।

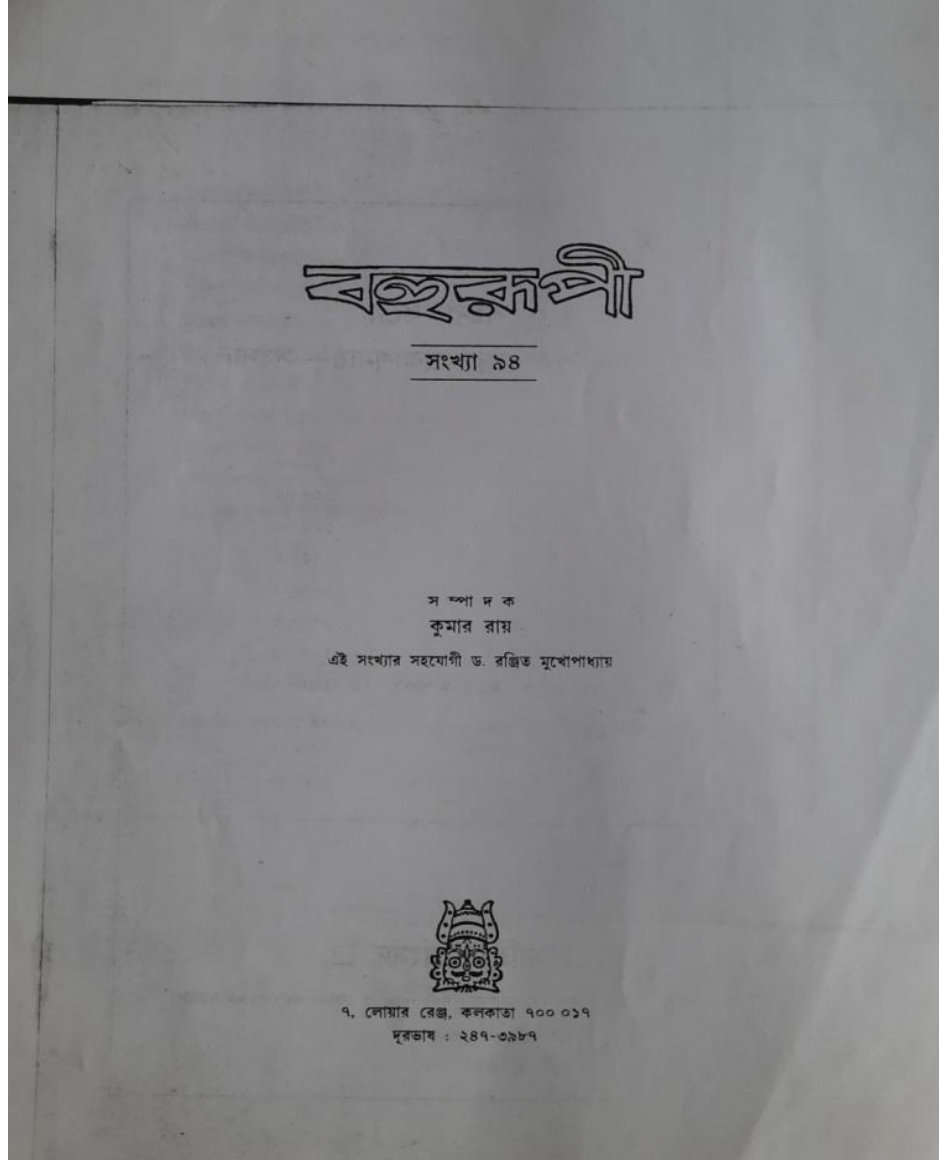


ফুল্লরা নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'ফুল্লরা' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১০০, পৃষ্ঠা - ১৬৫।



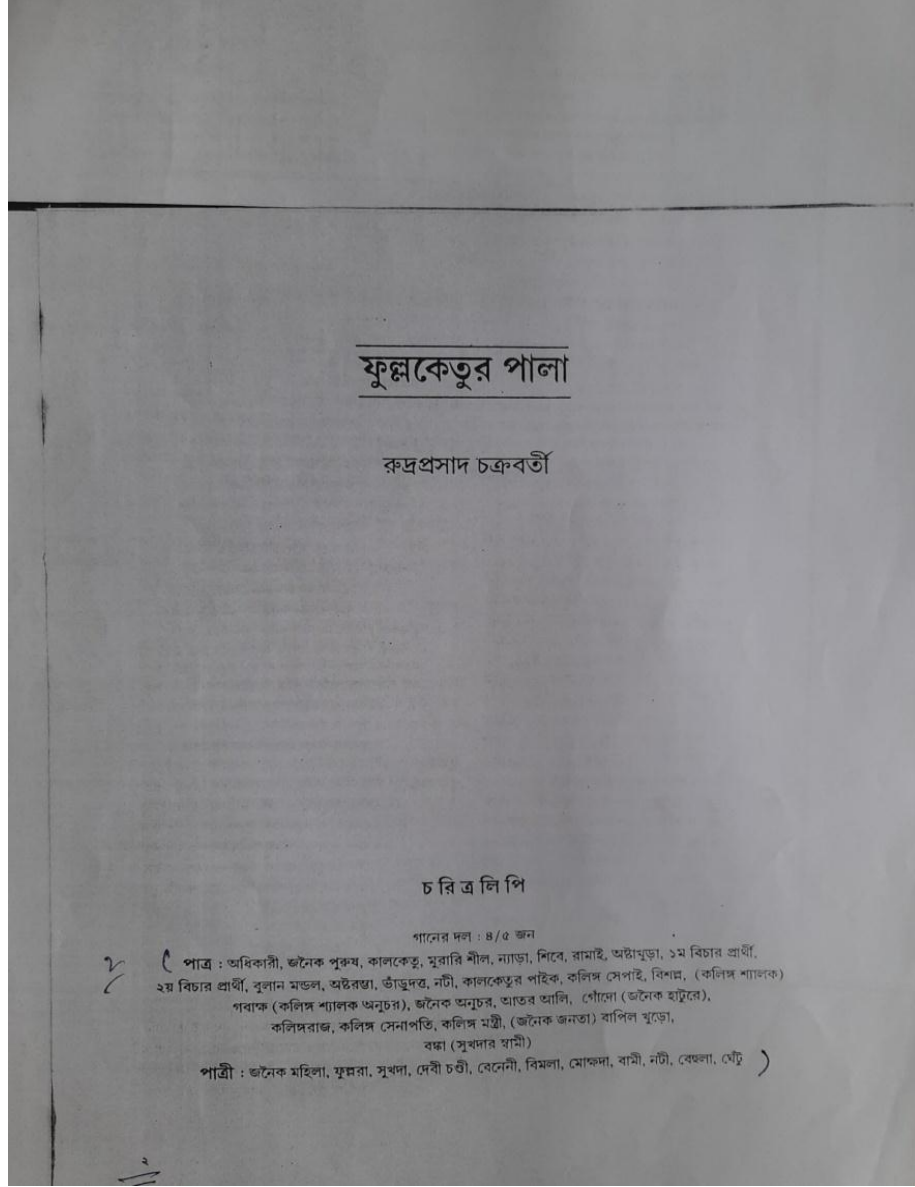
ফুল্লরা নাটকের চরিত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত ‘ফুল্লরা’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ১০১,

পৃষ্ঠা - ১৬৫।



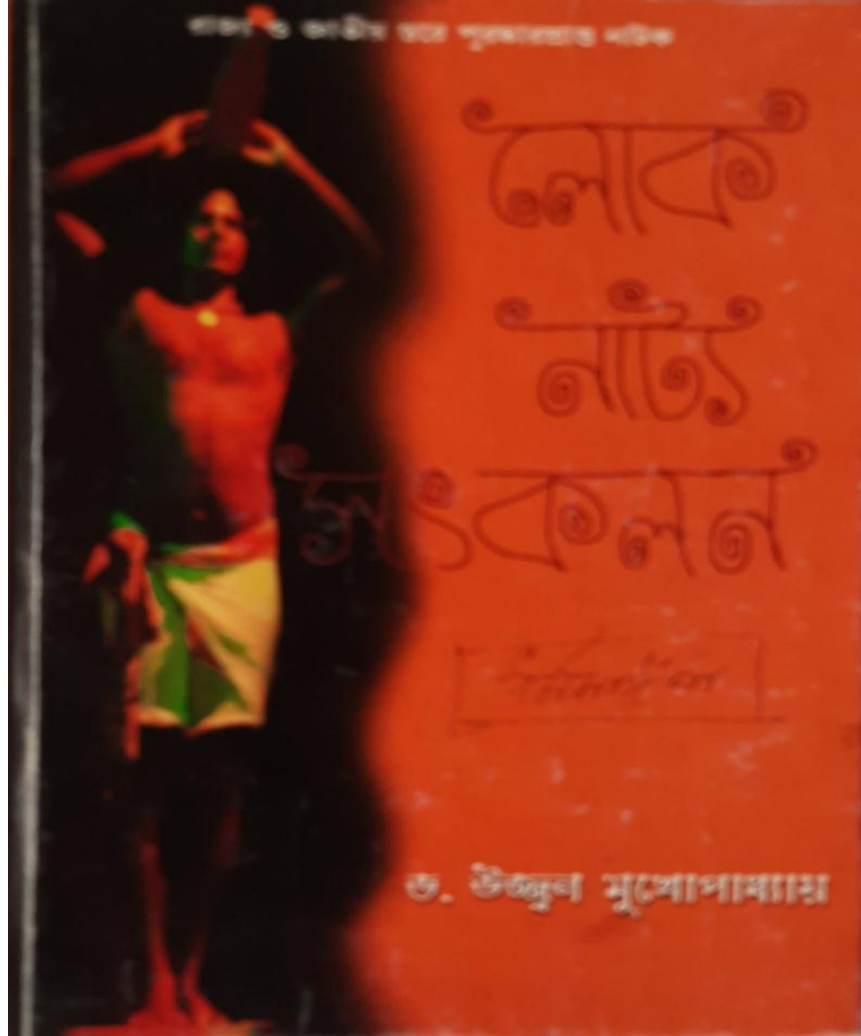
ফুল্লকেতুর পালা নাট্য-পত্রিকার প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি বহুরূপী নাট্য পত্রিকা থেকে সংগৃহীত।
বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ১৪৪, পৃষ্ঠা -১৮১।

চিত্র সংখ্যা -৩৬

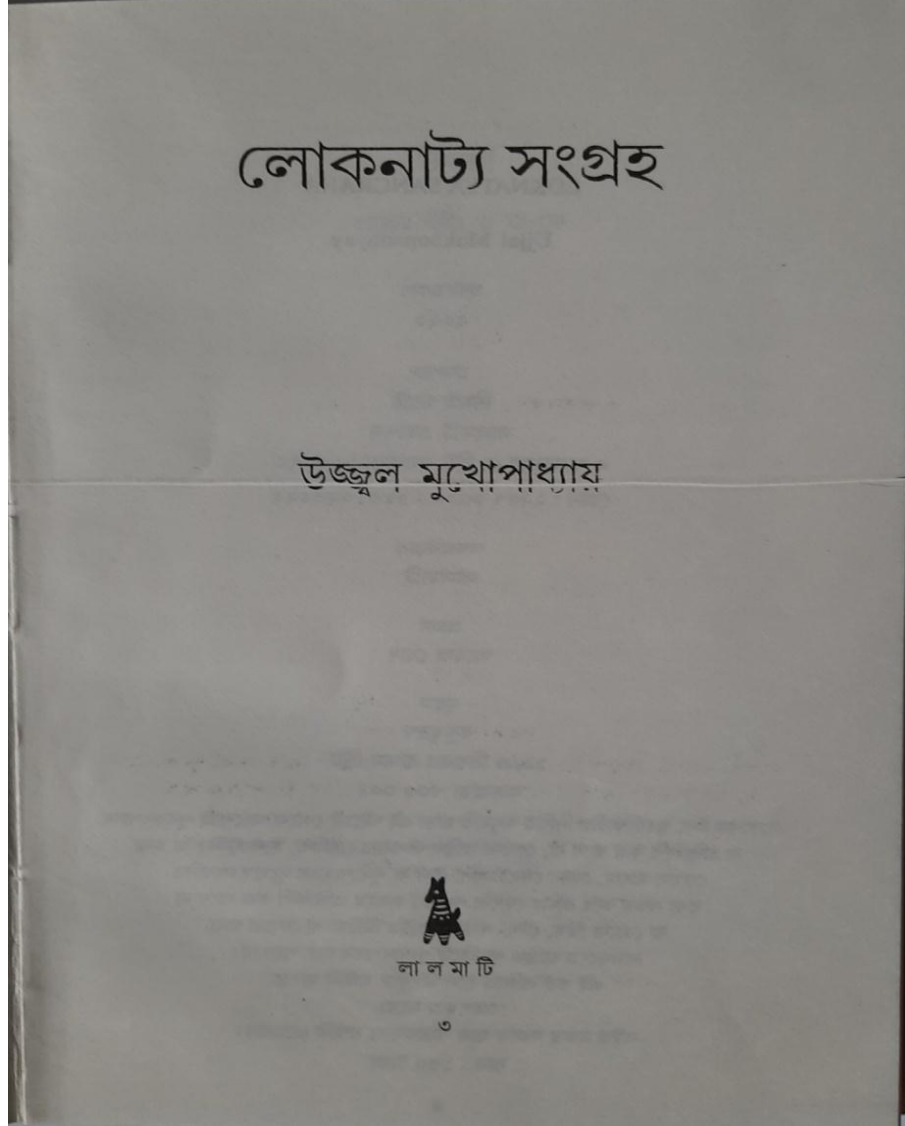


ফুল্লকেতুর পালা নাটকের নামপত্রও চরিত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি বহুরূপী নাট্য-পত্রিকা থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ১৪৫, পৃষ্ঠা - ১৮১।

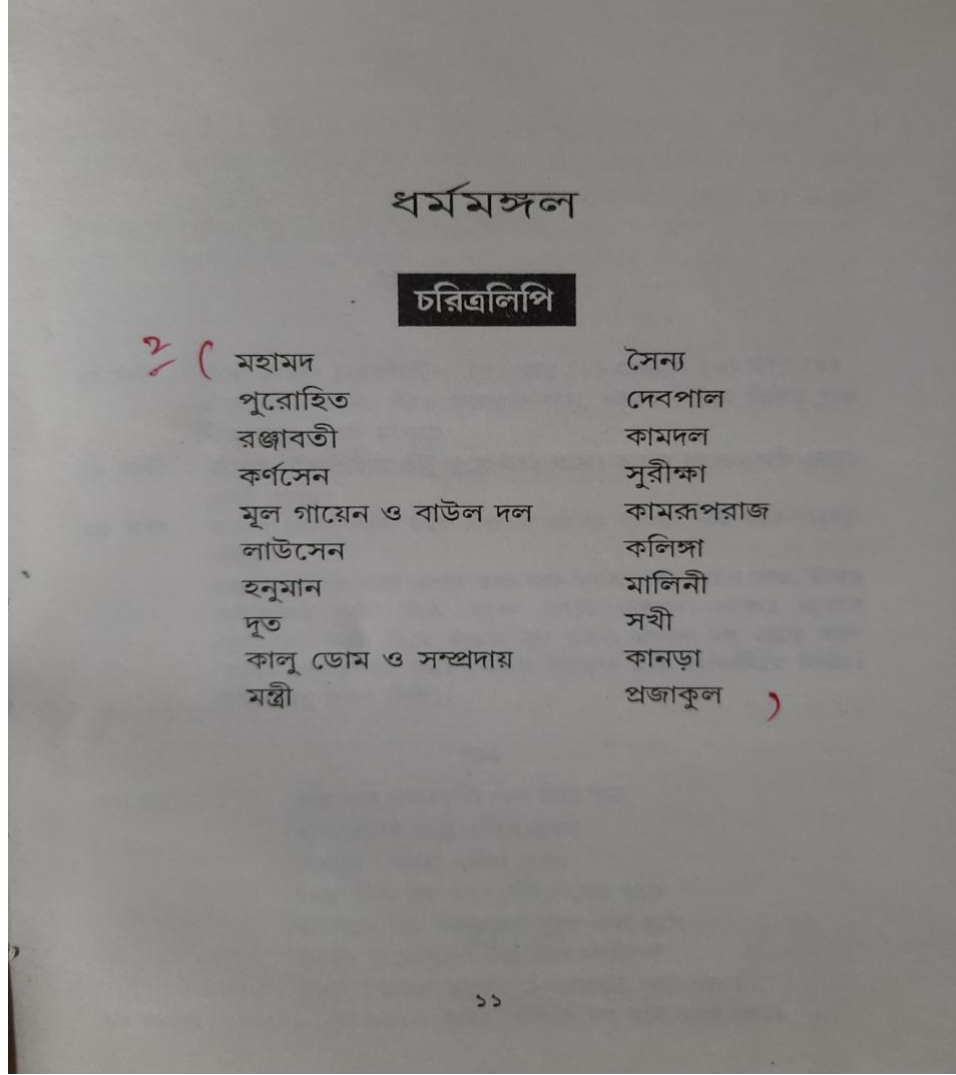
চিত্র সংখ্যা -৩৭



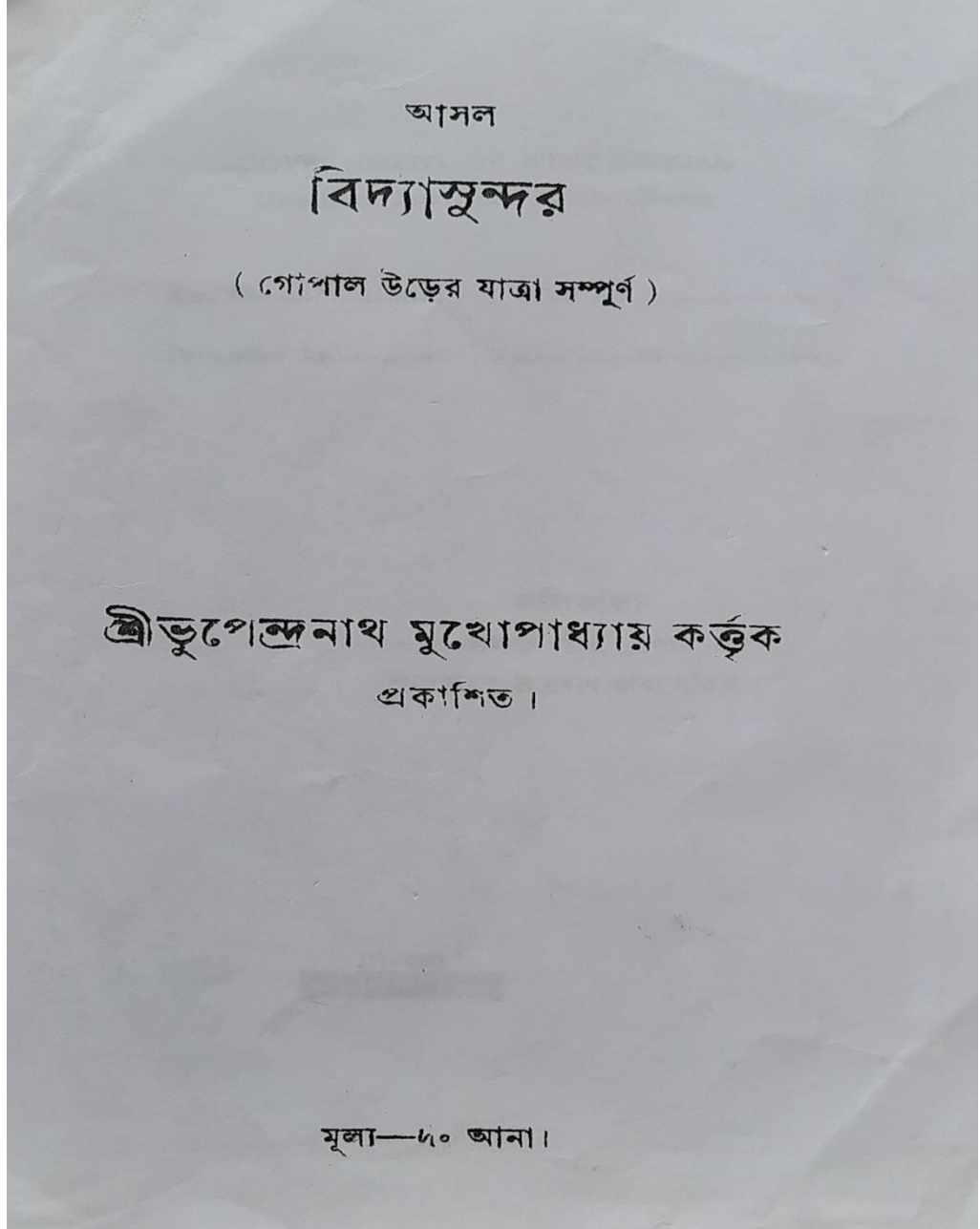
ধর্মমঙ্গল নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় রচিত ‘ধর্মমঙ্গল’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ১৬৫, পৃষ্ঠা - ১৮৯।



ধর্মমঙ্গল নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় রচিত ‘ধর্মমঙ্গল’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ১৬৬, পৃষ্ঠা - ১৮৯।



ধর্মঙ্গল নাটকের চরিত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় রচিত ‘ধর্মমঙ্গল’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১৬৮, পৃষ্ঠা - ১৮৯।



বিদ্যাসুন্দর নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১৯৪, পৃষ্ঠা - ১৯৭।

বিদ্যাসুন্দর ।

(সখীগণের প্রবেশ)

১ম । ওলো সহচরি !

তোরা কেউ জল আন্তে যাবি ?

২য় । ওলো সহচরি !

আমি তোমাদের সঙ্গে জল আন্তে যাব ।

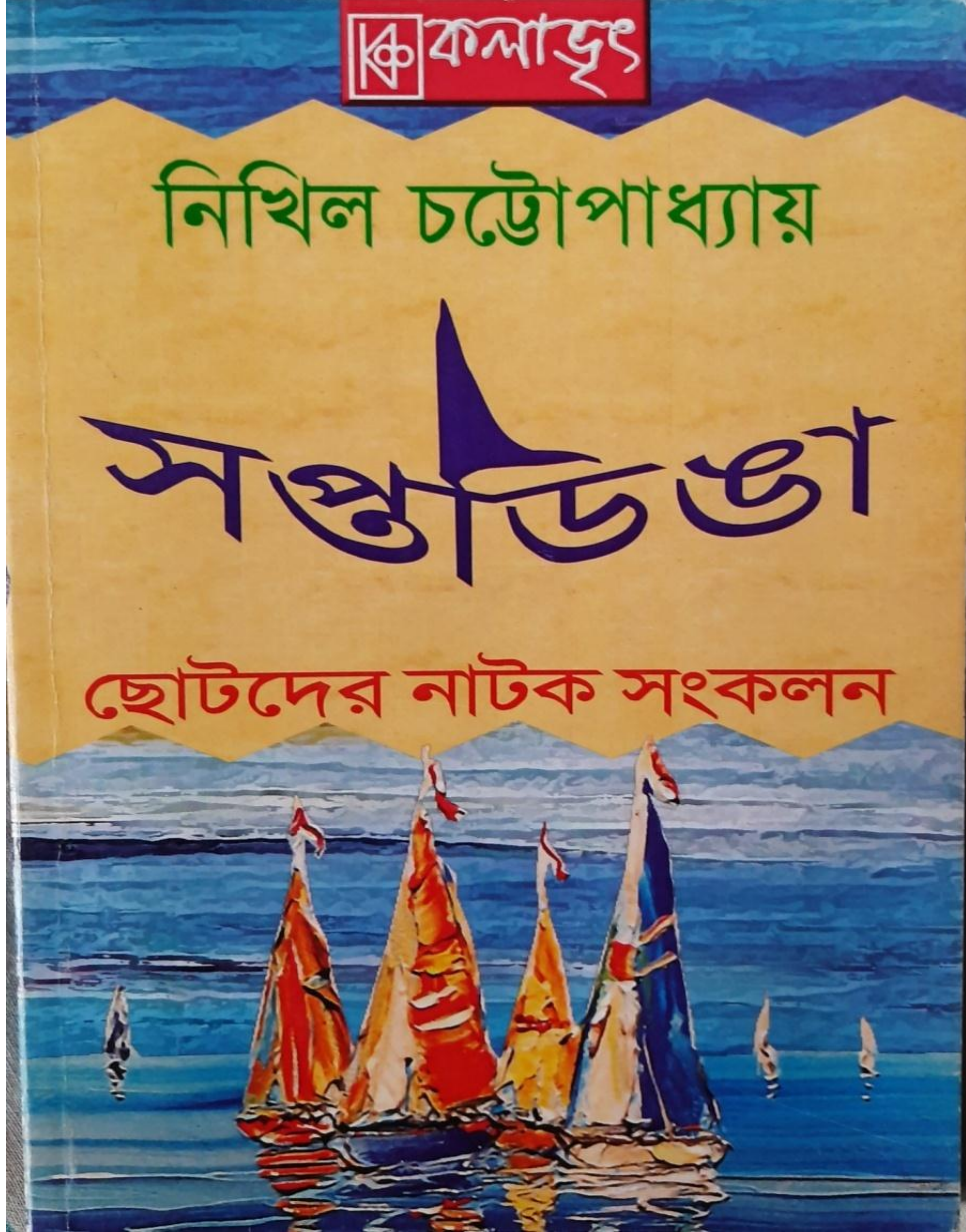
একটু বিলম্ব কর ।

আমার গৃহ ধর্মের কাজ সকলই হয়েছে আমি কলসী
নিয়ে আসি ।

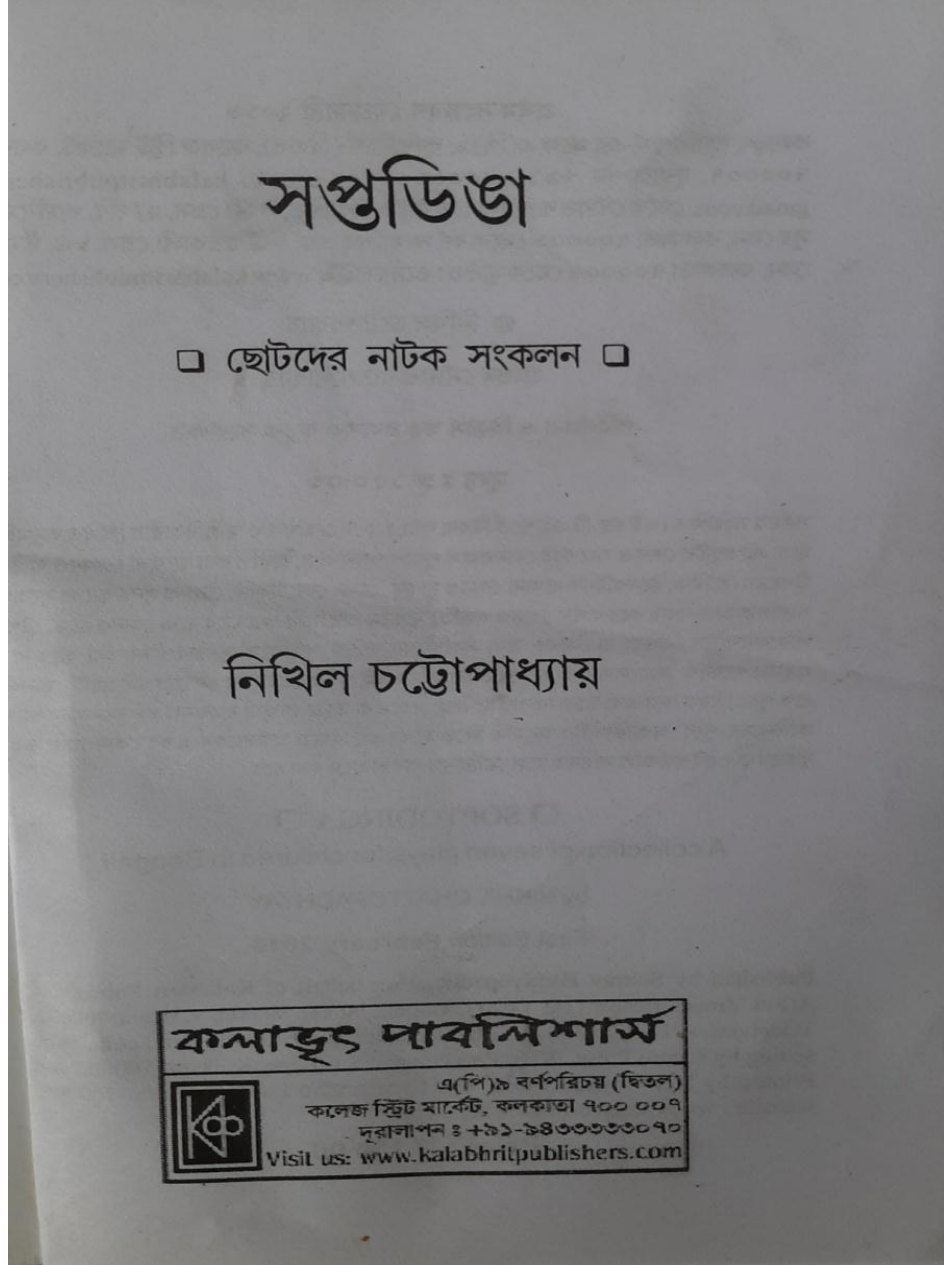
৩য় । ওলো অপরাহ্ন বেলা হ'ল, পাল গুটিয়ে যাব,

সন্ধ্যা হবে আস্তে ঘরে, গালাগালি খাব ।

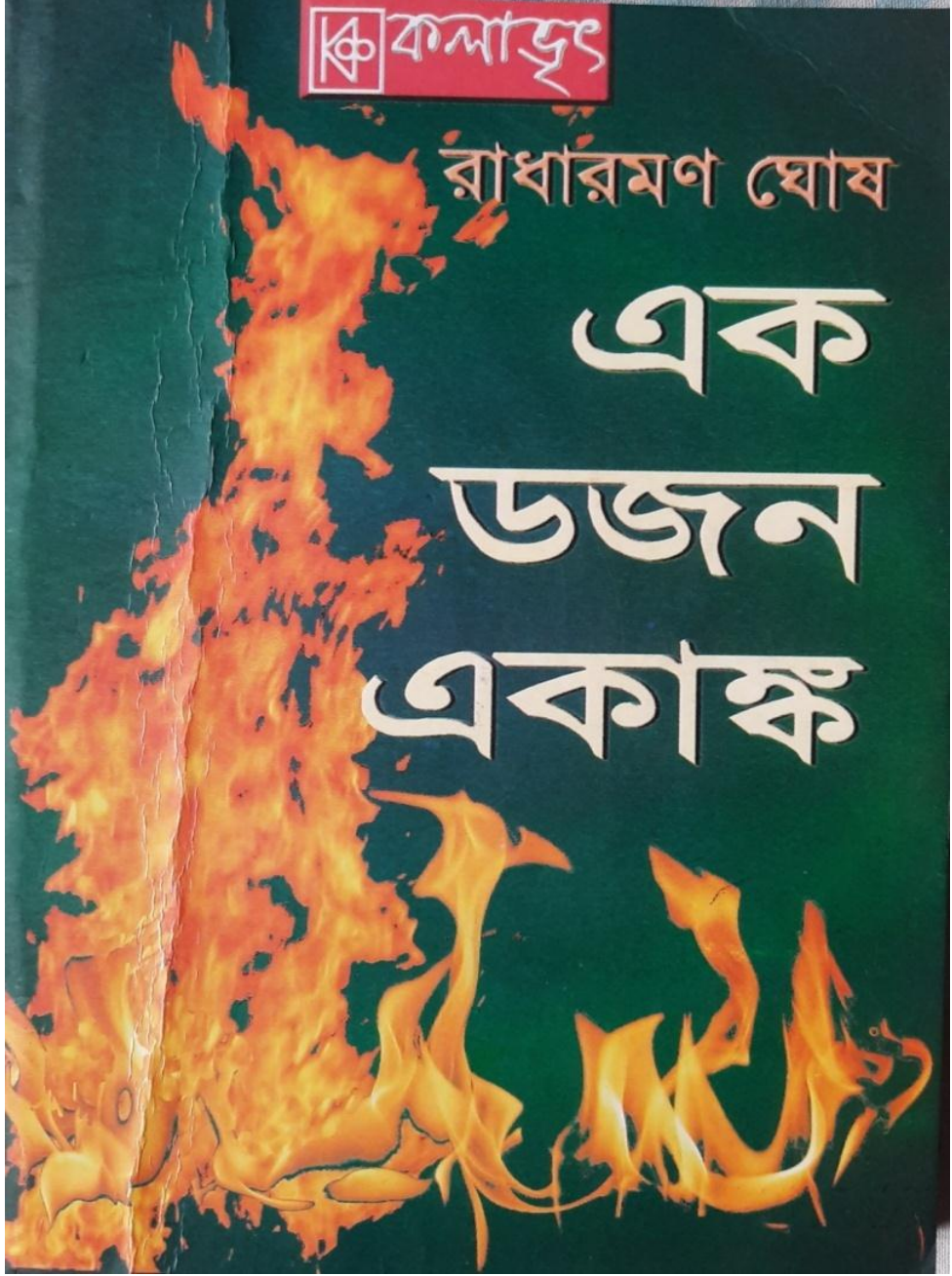
বিদ্যাসুন্দর নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি । চিত্রটি ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত । বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ১৯৫, পৃষ্ঠা -১৯৮ ।



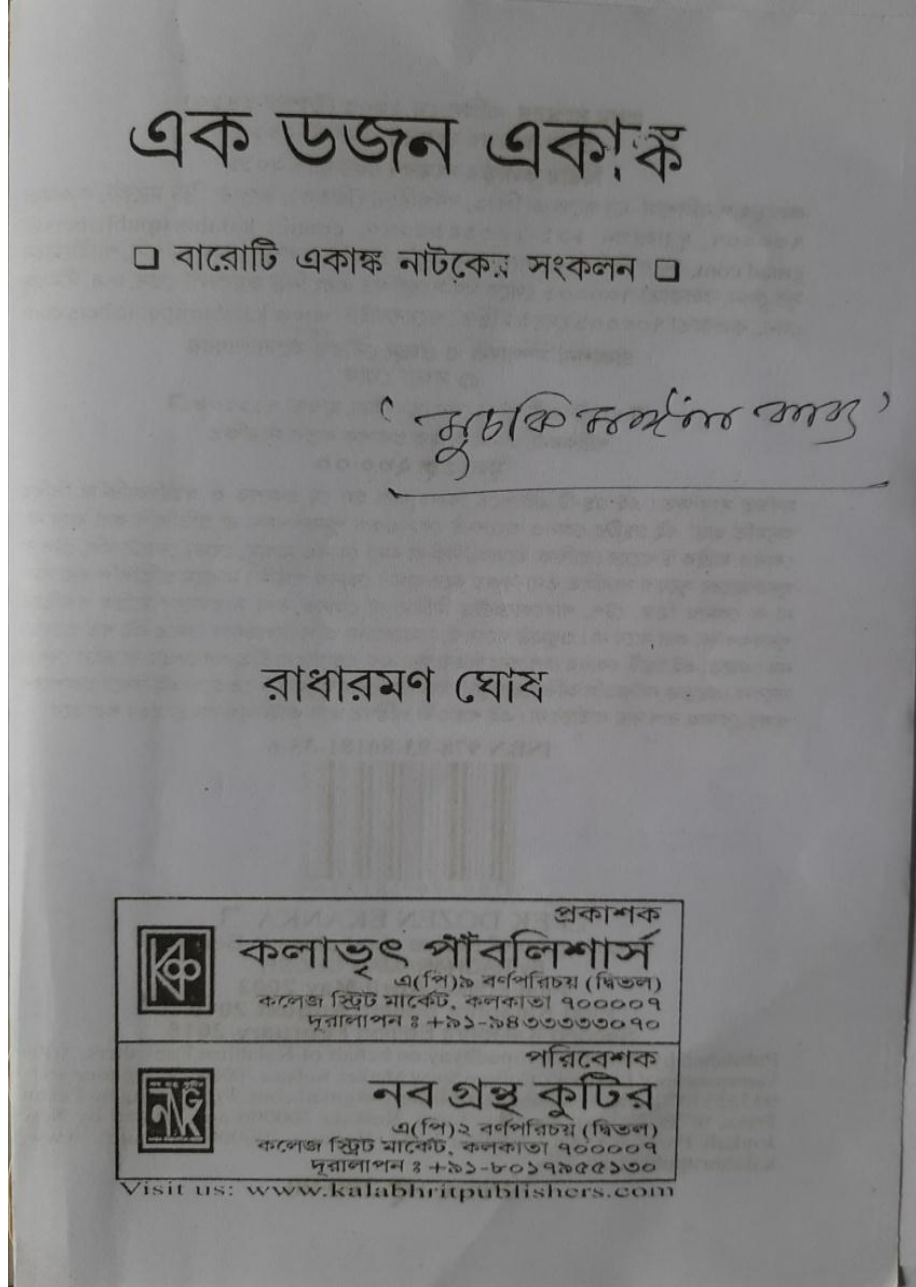
অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি নিখিল চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-২১৬, পৃষ্ঠা -২০৬।



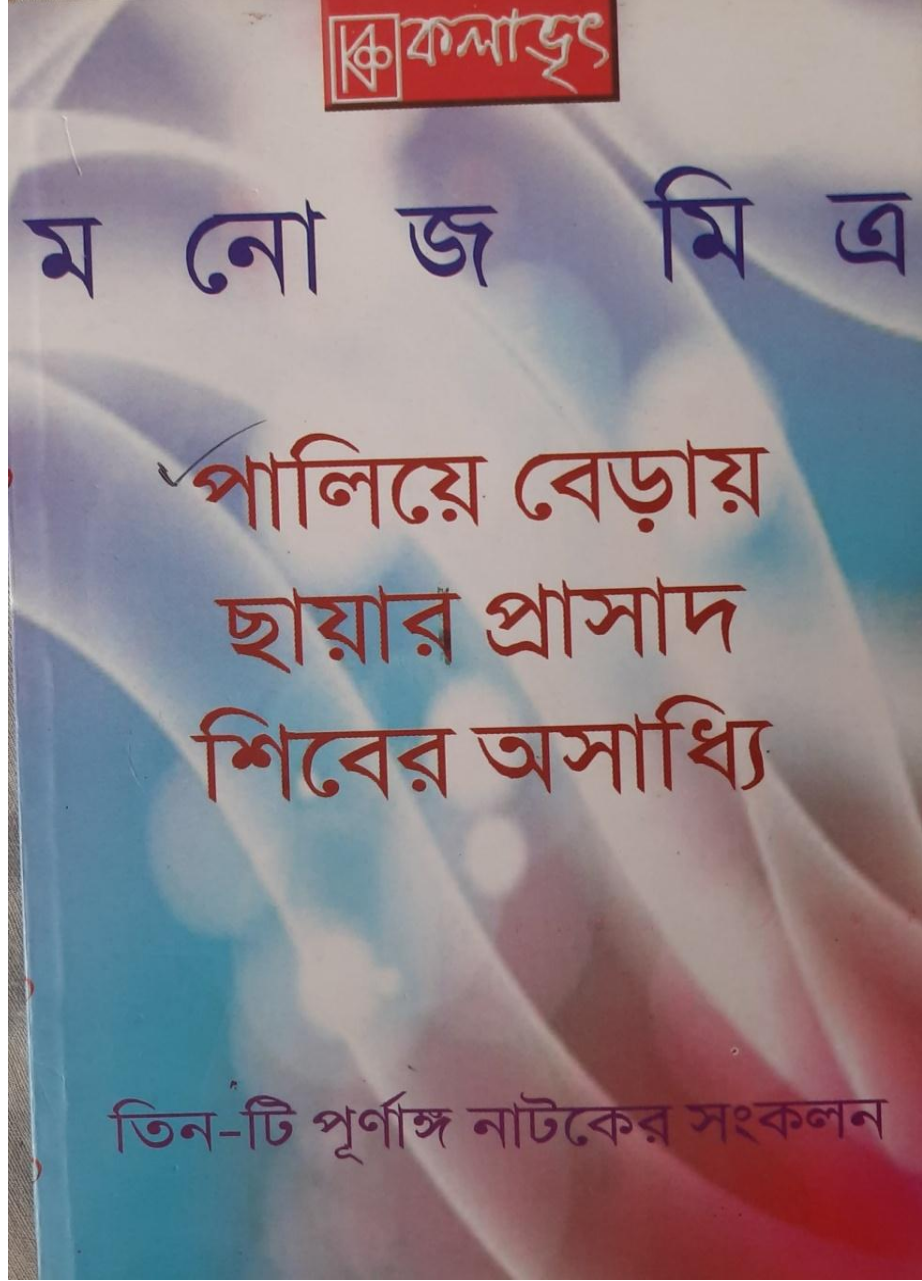
অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি নিখিল চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ২১৭, পৃষ্ঠা - ২০৬।



মুচকি মঙ্গল কাব্য নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি রাধারমণ ঘোষ রচিত 'মুচকি মঙ্গল কাব্য' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-২৩০, পৃষ্ঠা -২১১।

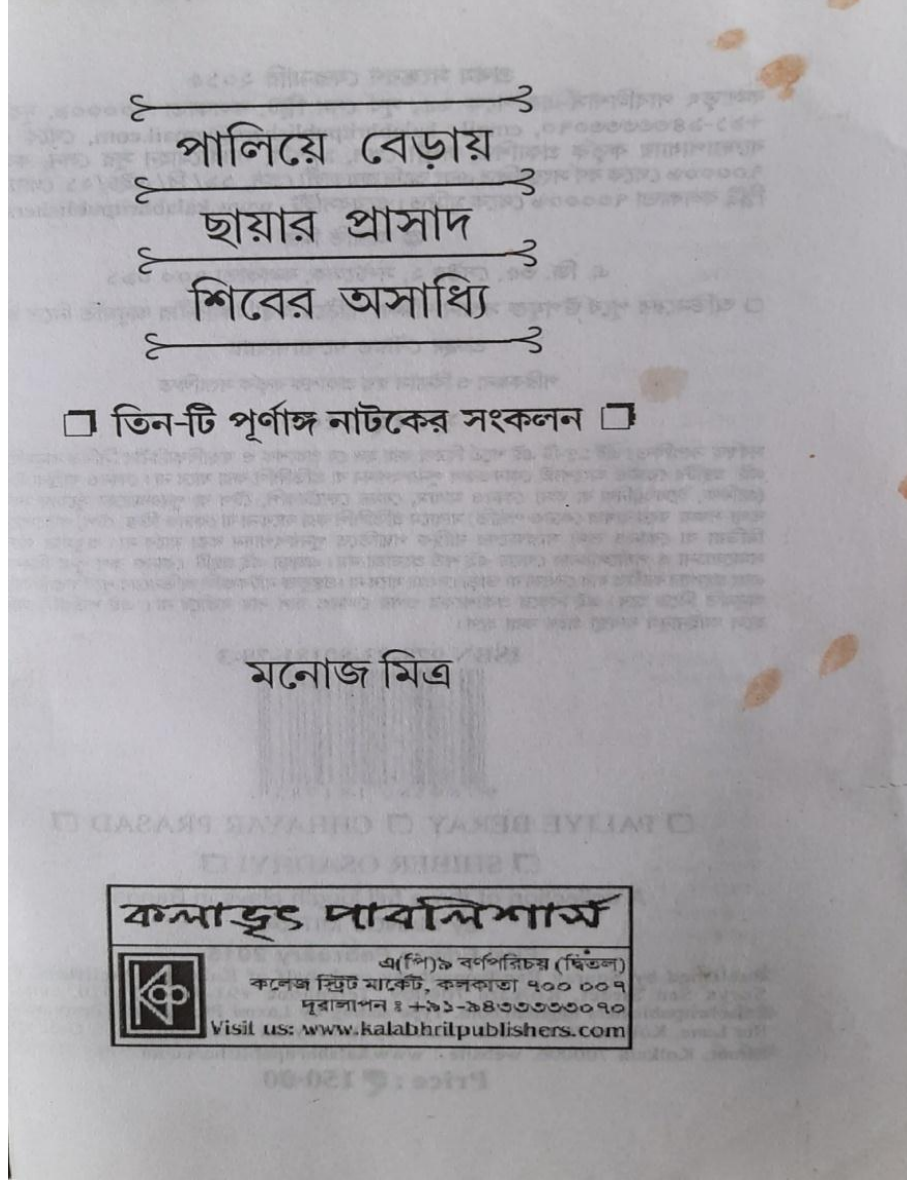


মুচকি মঙ্গল কাব্য নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি রাধারমণ ঘোষ রচিত ‘মুচকি মঙ্গল কাব্য’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-২৩১, পৃষ্ঠা -২১১।



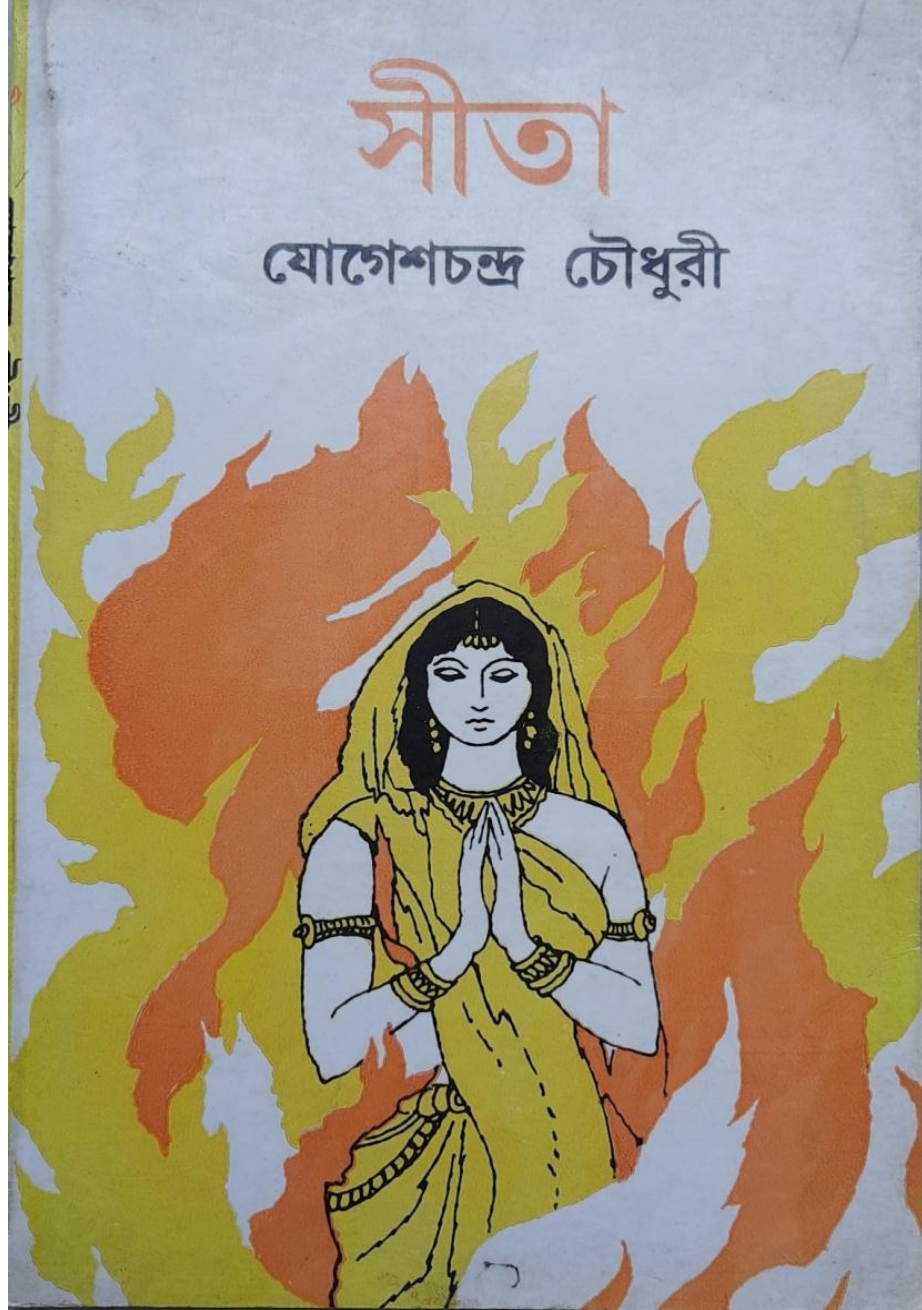
শিবের অসাধ্য নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি মনোজ মিত্র রচিত 'শিবের অসাধ্য' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-

২৫৯, পৃষ্ঠা -২২৩।



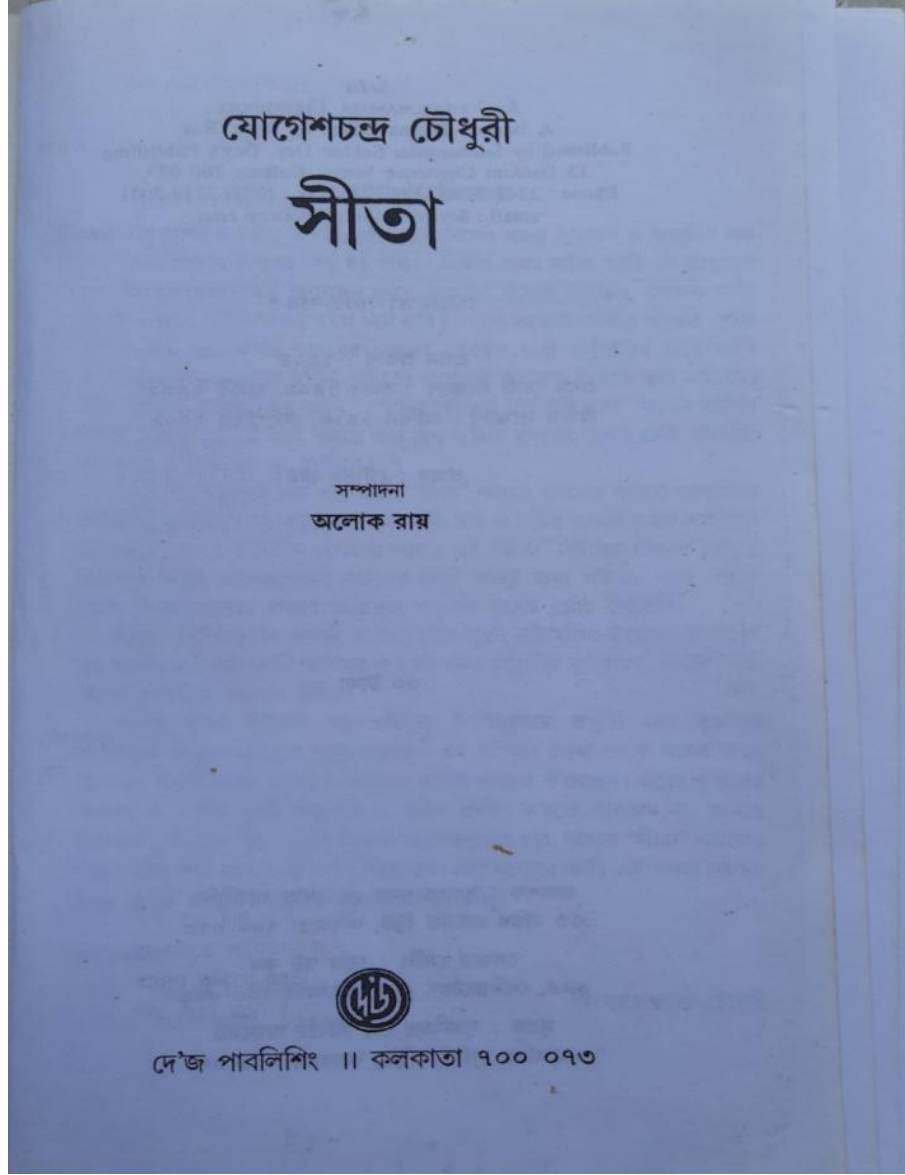
শিবের অসাধ্য নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি মনোজ মিত্র রচিত 'শিবের অসাধ্য' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চতুর্থ অধ্যায়, পাদটীকা

সংখ্যা-২৬০, পৃষ্ঠা -২২৩।

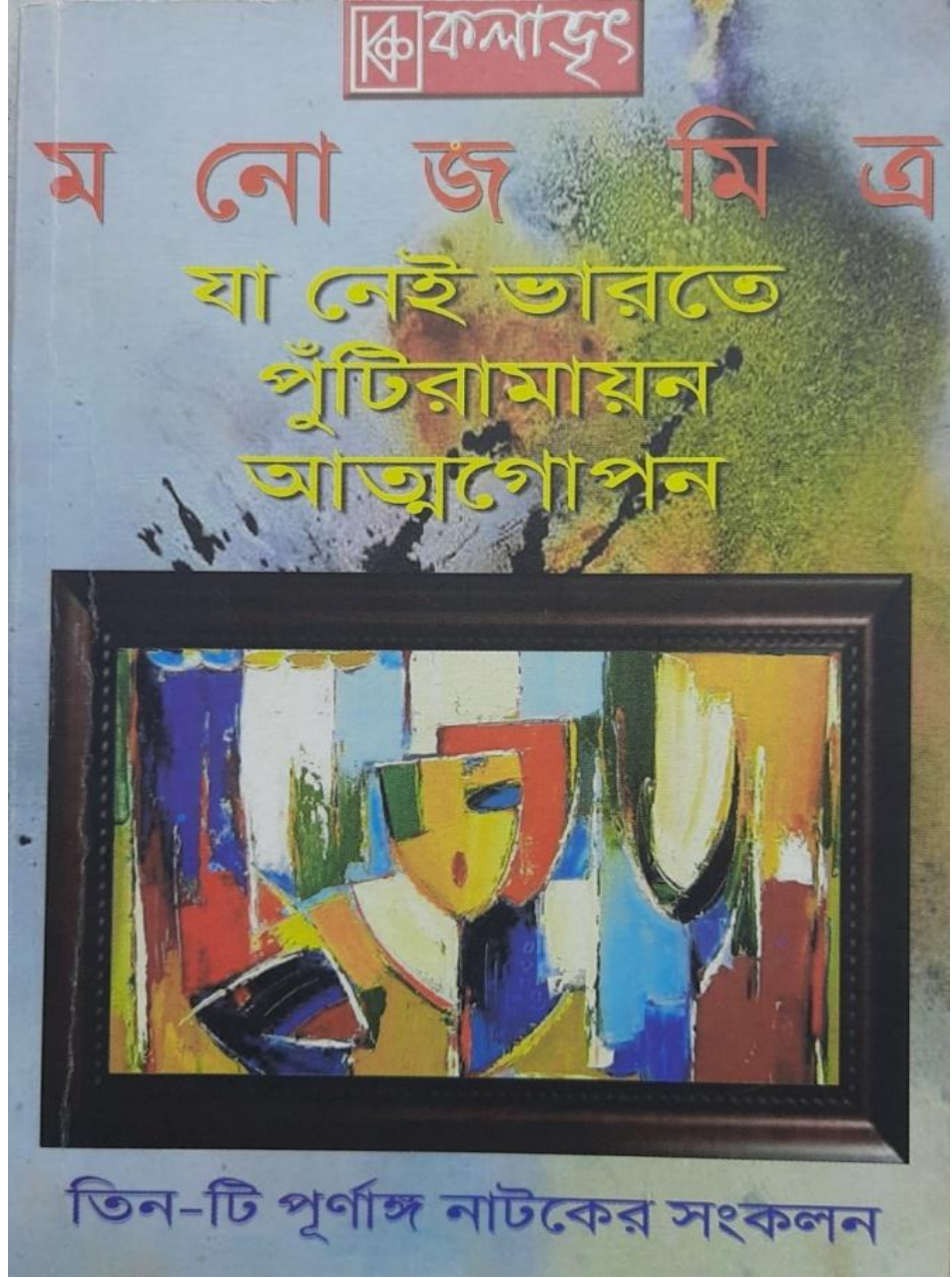


সীতা নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি যোগেশচন্দ্র চৌধুরী রচিত 'সীতা' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

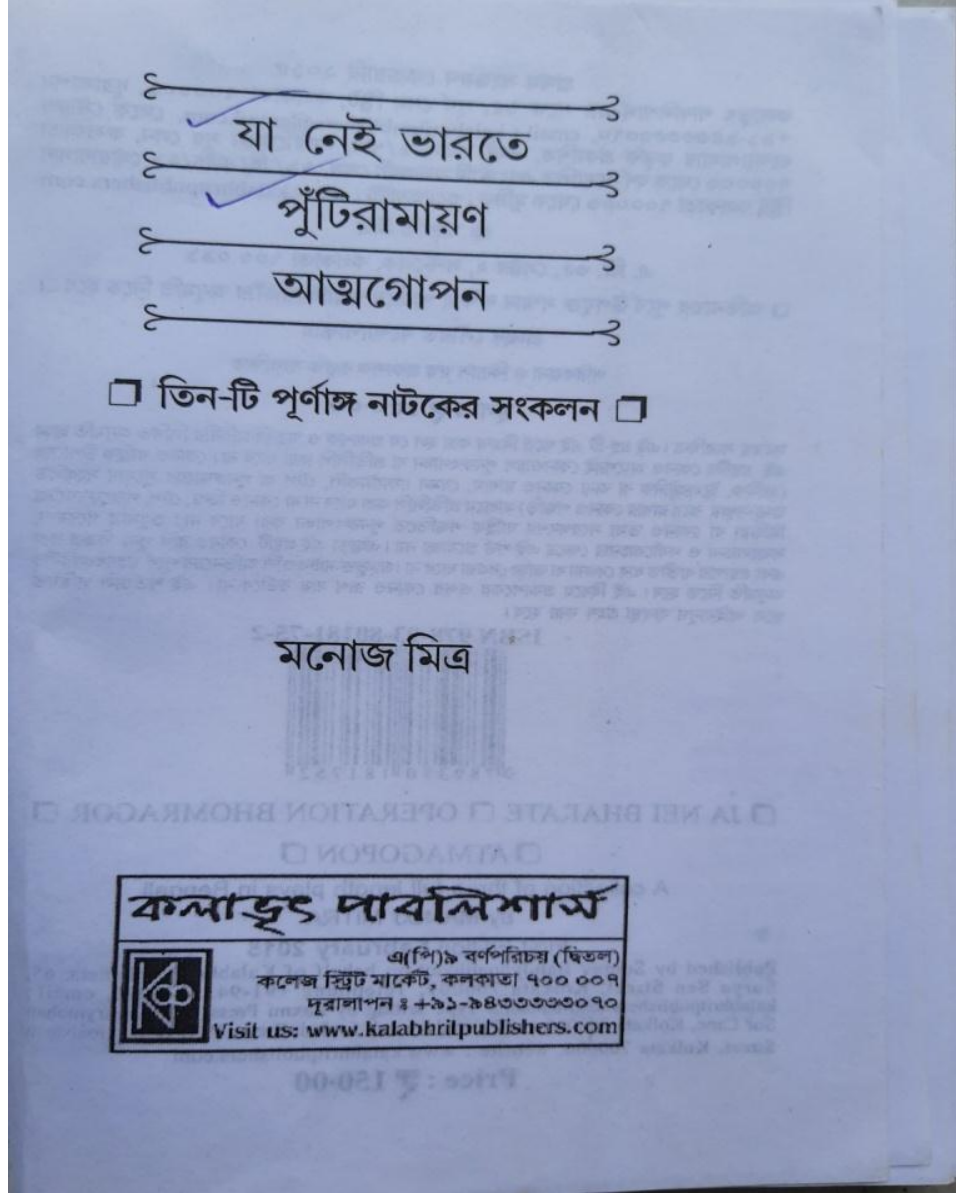
বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১, পৃষ্ঠা - ২৪৬।



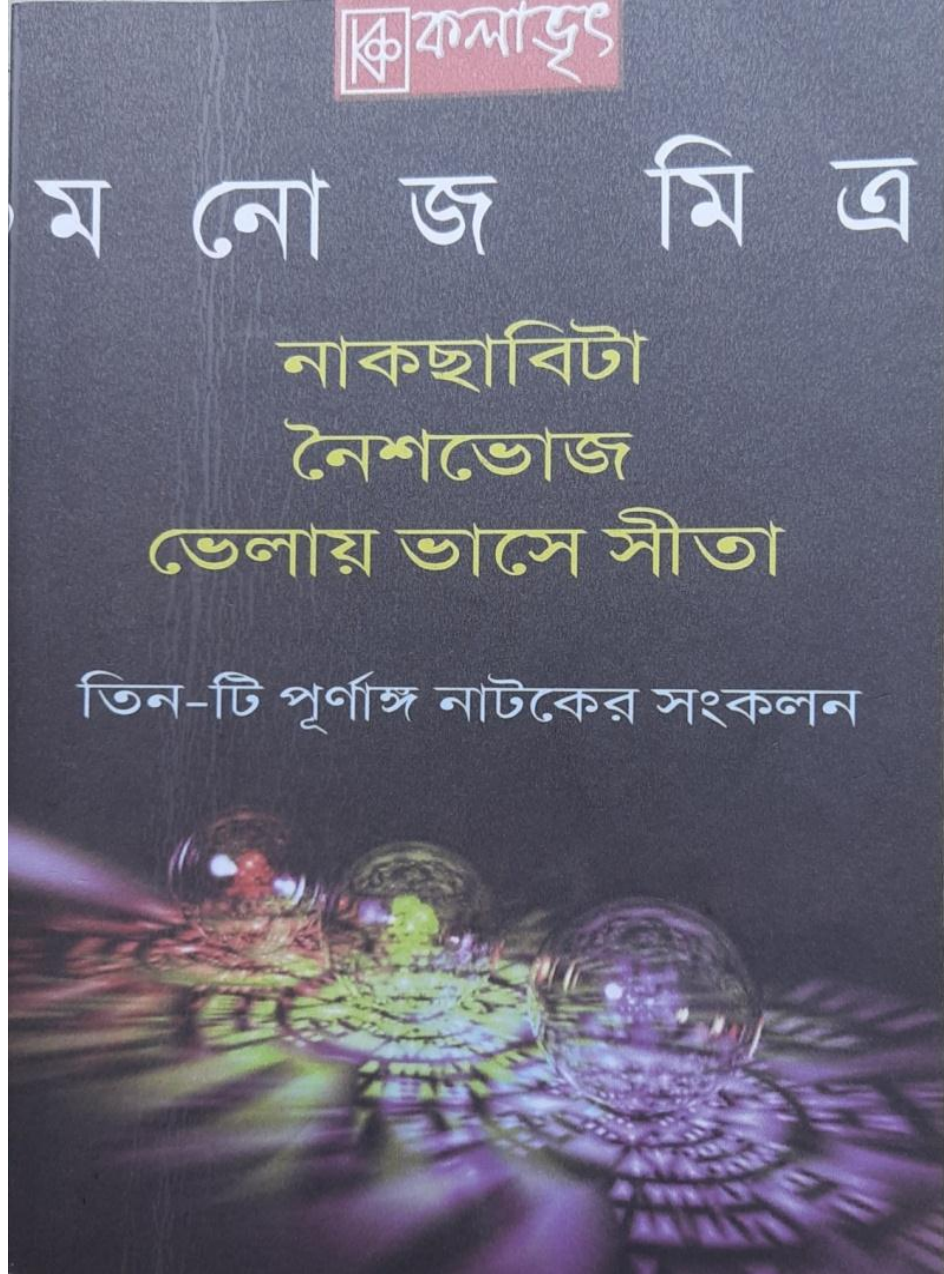
সীতা নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি যোগেশচন্দ্র চৌধুরী রচিত ‘সীতা’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।
বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-২, পৃষ্ঠা - ২৪৭।



পুঁটিরামায়ন নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি মনোজ মিত্র রচিত 'পুঁটিরামায়ন' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ১৪, পৃষ্ঠা - ২৫১।

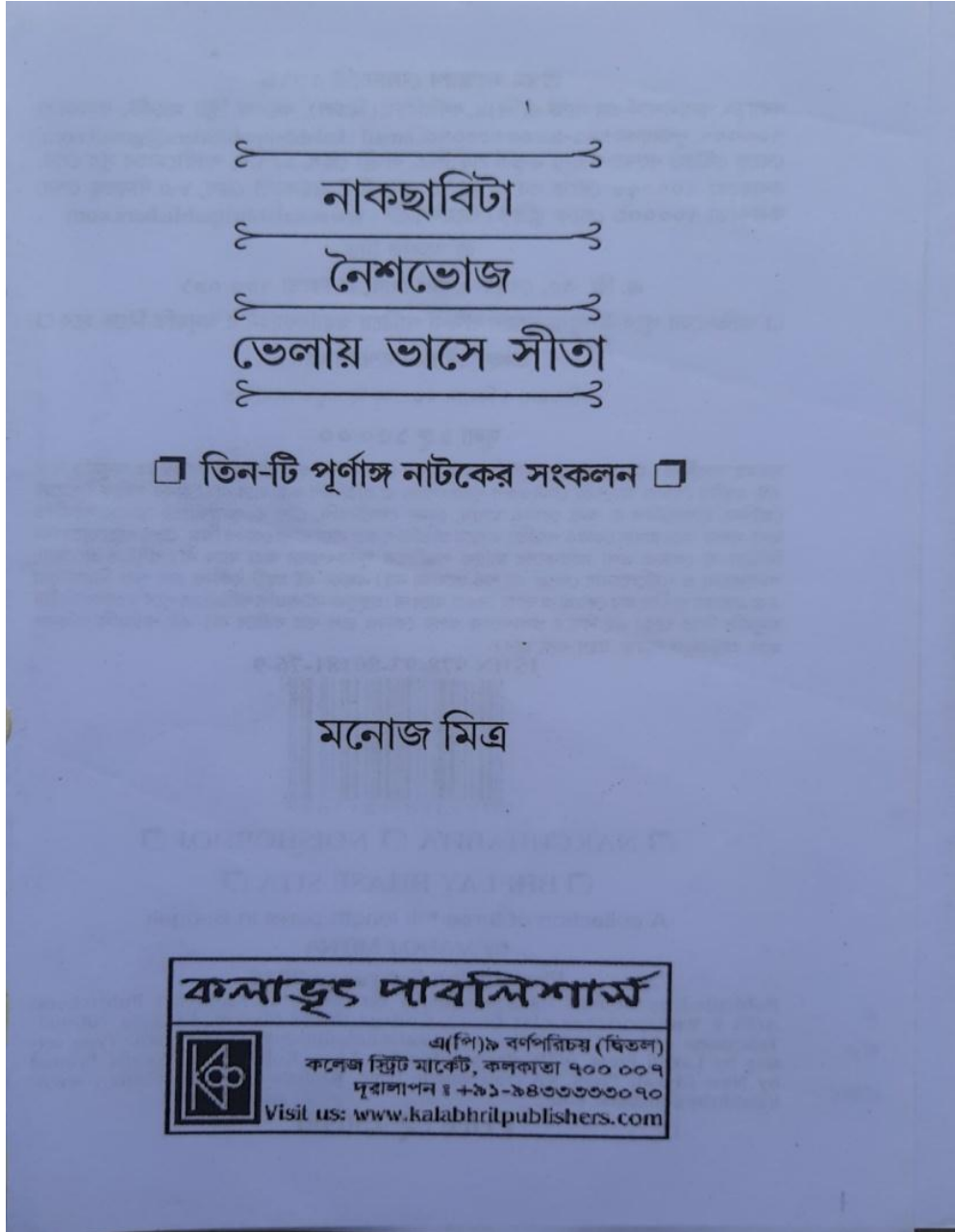


পুঁটিরামায়ণ নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি মনোজ মিত্র রচিত ‘পুঁটিরামায়ণ’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ১৫, পৃষ্ঠা - ২৫২।



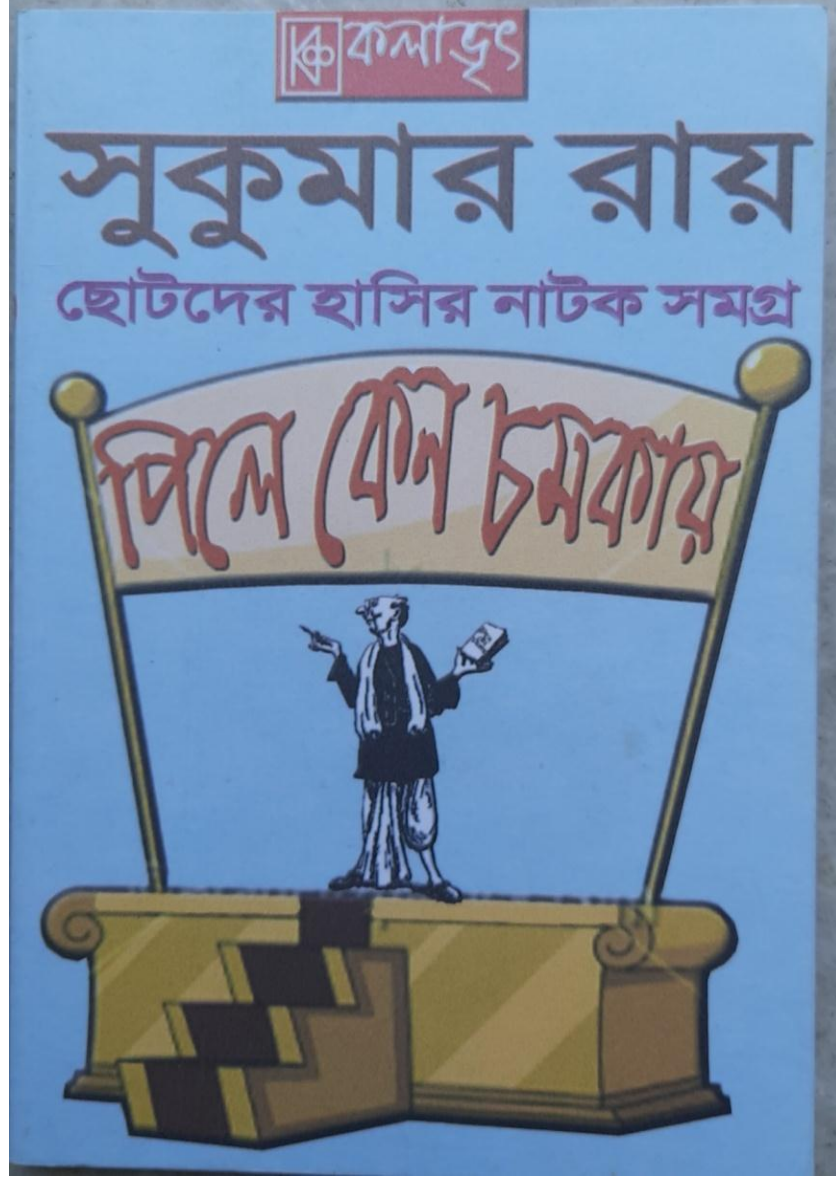
ভেলায় ভাসে সীতা নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি মনোজমিত্র রচিত ‘ভেলায় ভাসে সীতা’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ৩৫,

পৃষ্ঠা - ২৫৮ ।

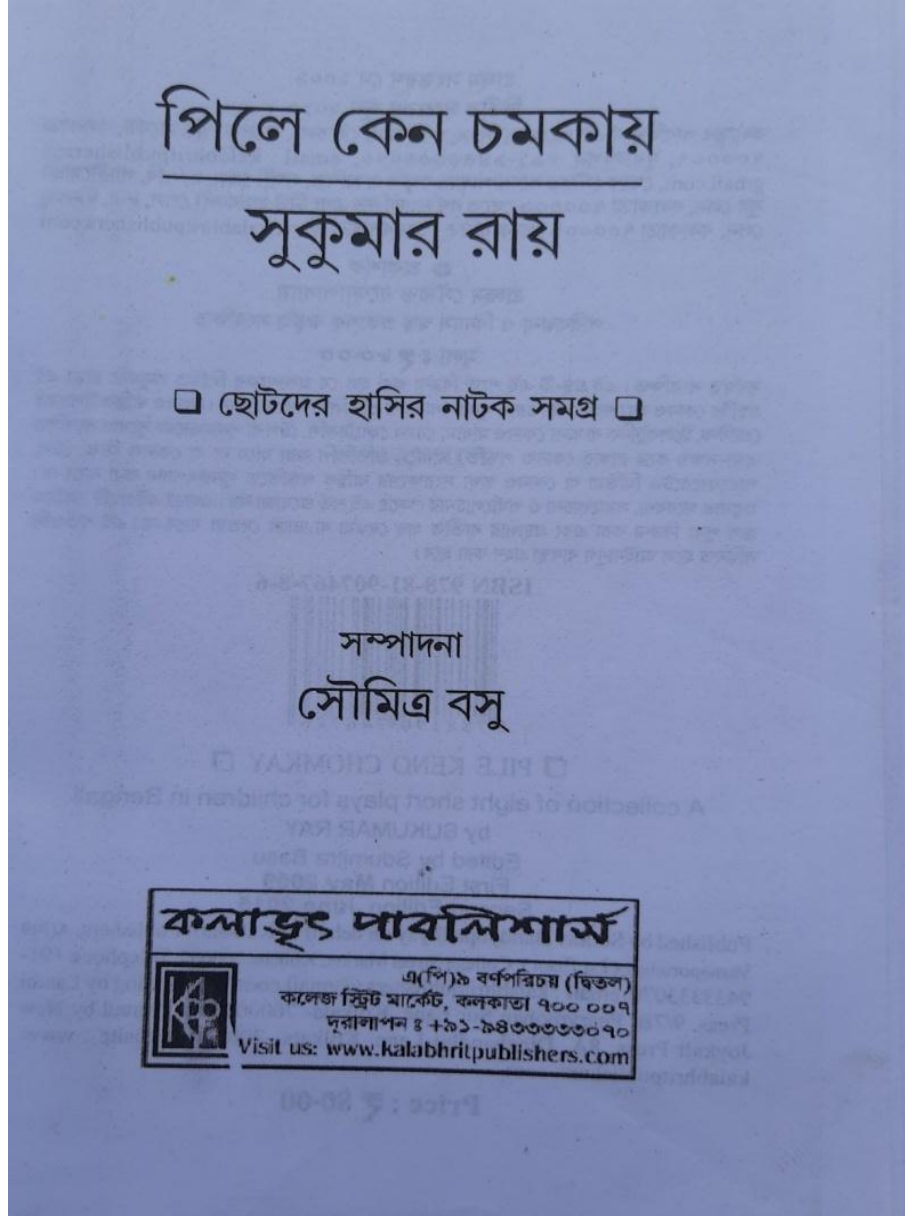


ভেলায় ভাসে সীতা নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি মনোজমিত্র রচিত ‘ভেলায় ভাসে সীতা’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৩৬,

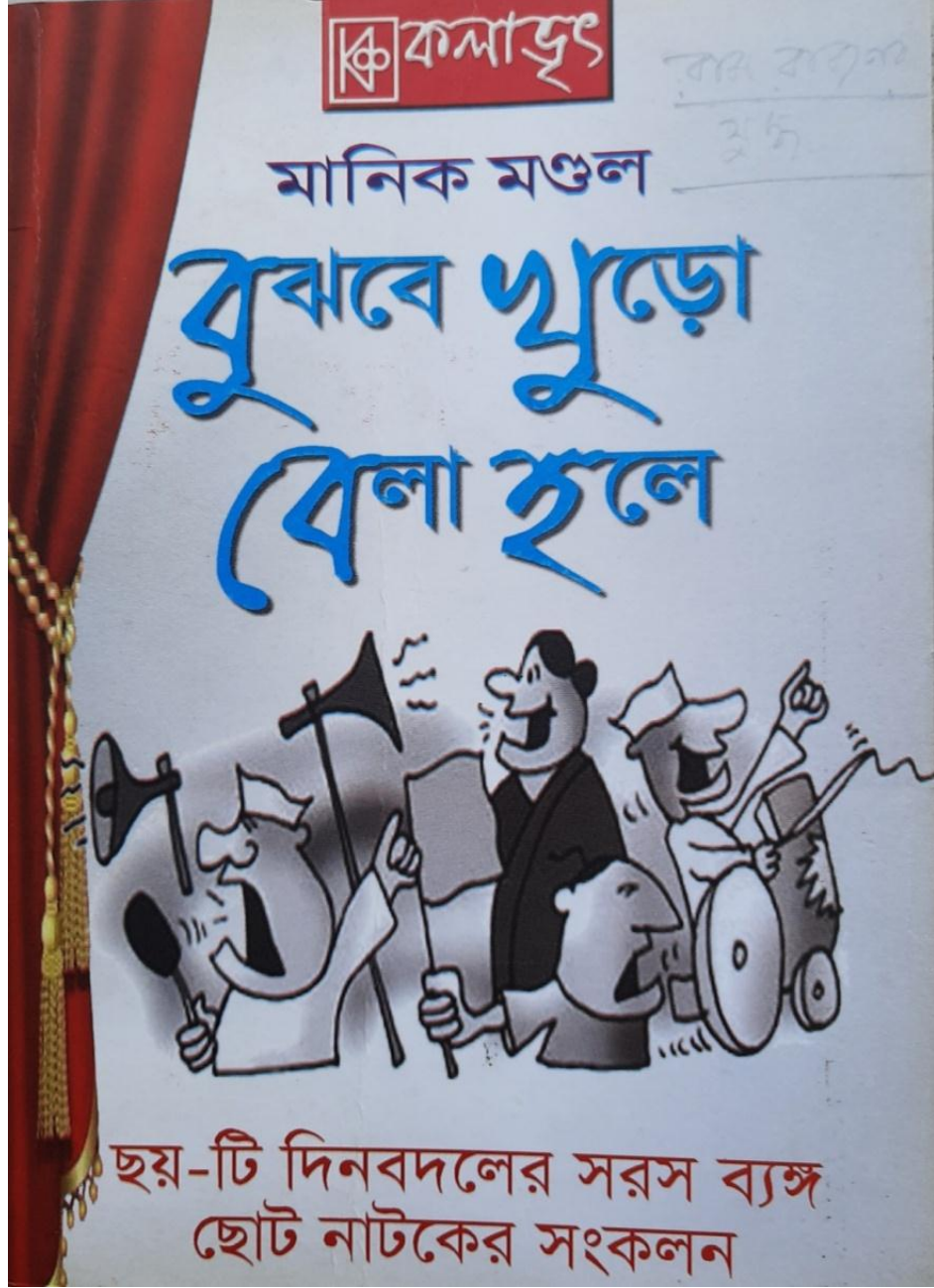
পৃষ্ঠা - ২৫৯।



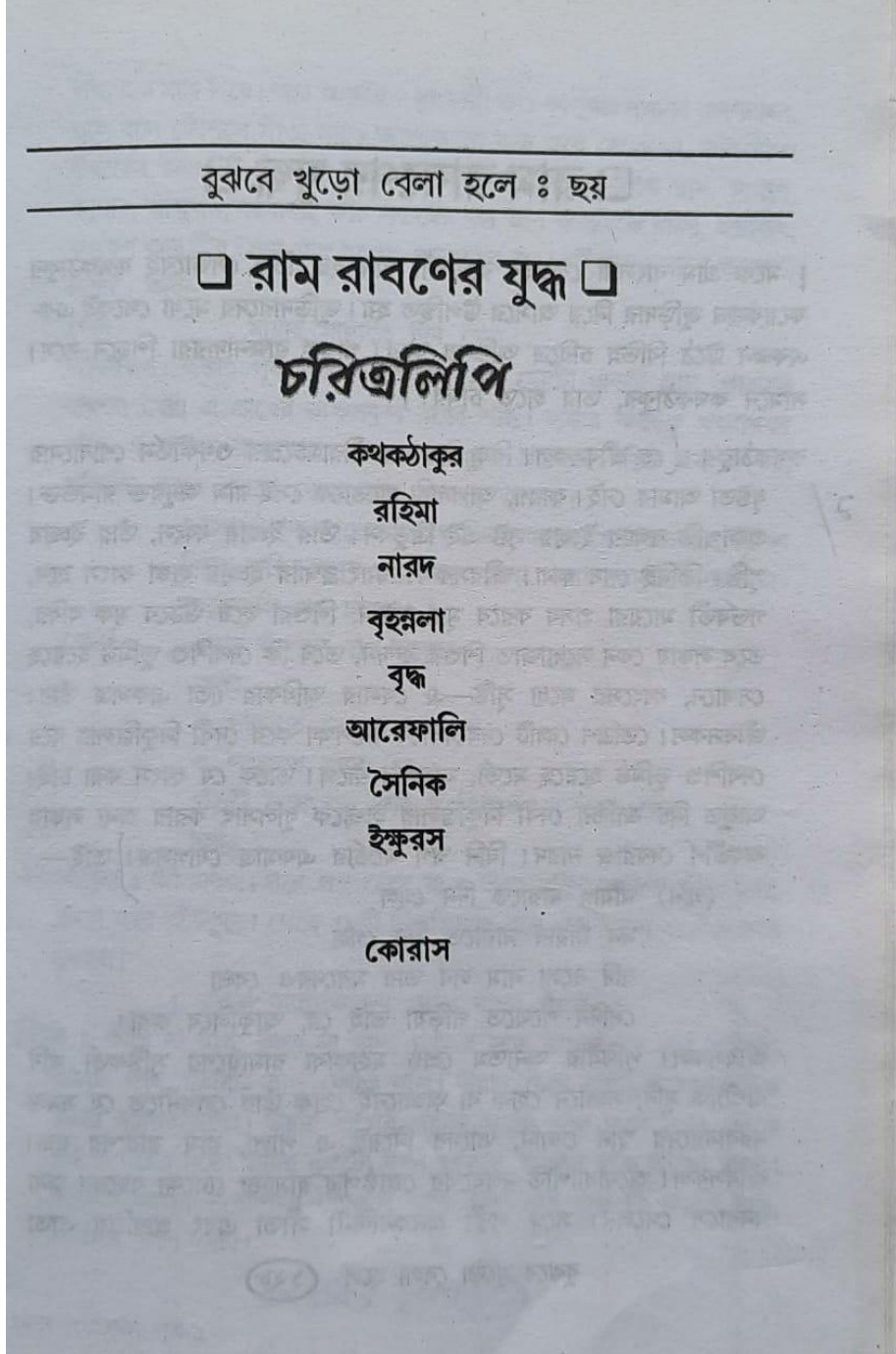
লক্ষ্যের শক্তিশেল নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি সুকুমার রায় রচিত ‘লক্ষ্যের শক্তিশেল’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৫৬, পৃষ্ঠা - ২৬৫।



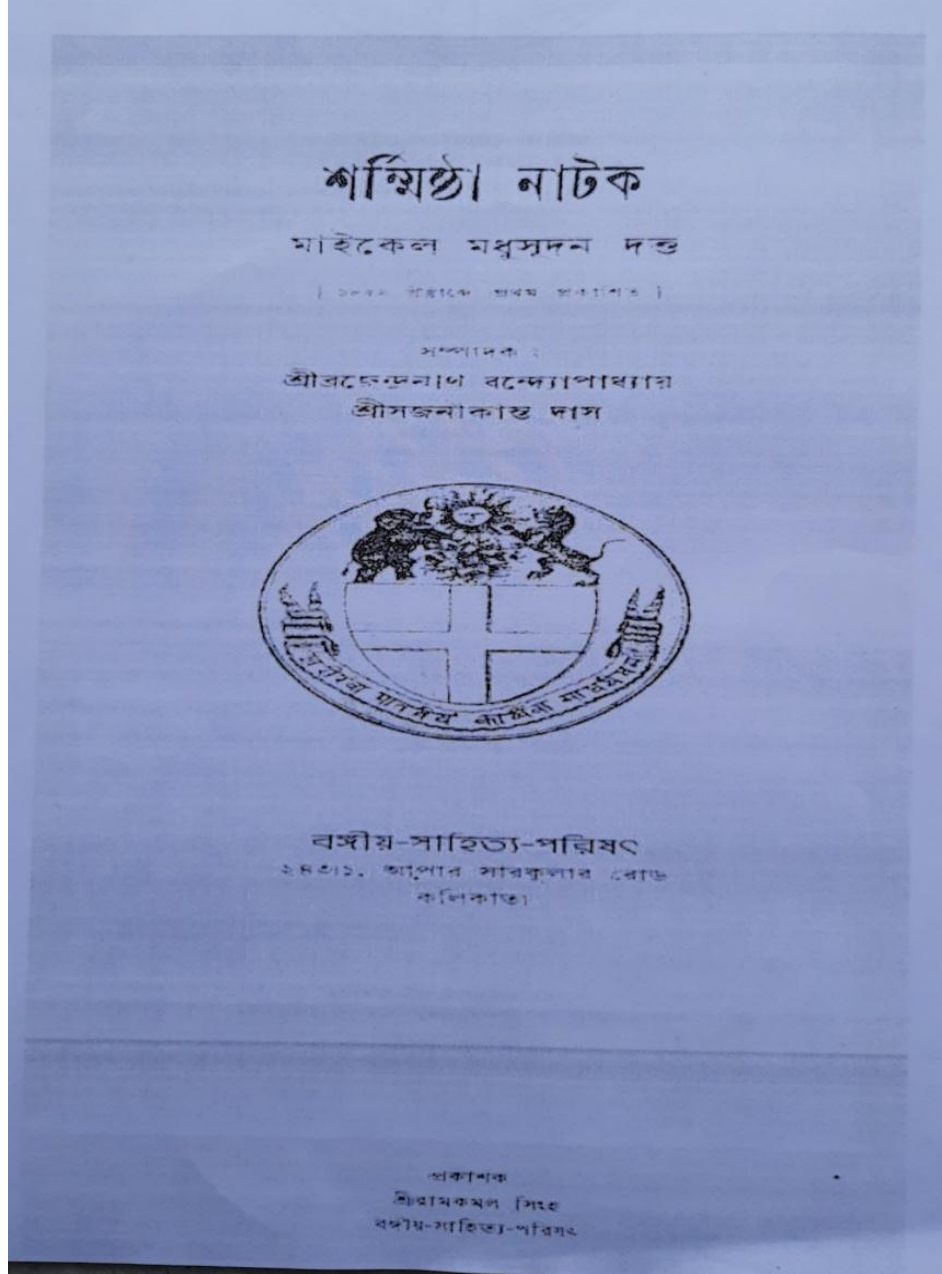
লক্ষ্মণের শক্তিশেল নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি সুকুমার রায় রচিত ‘লক্ষ্মণের শক্তিশেল’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা
সংখ্যা-৫৭, পৃষ্ঠা -২৬৬।



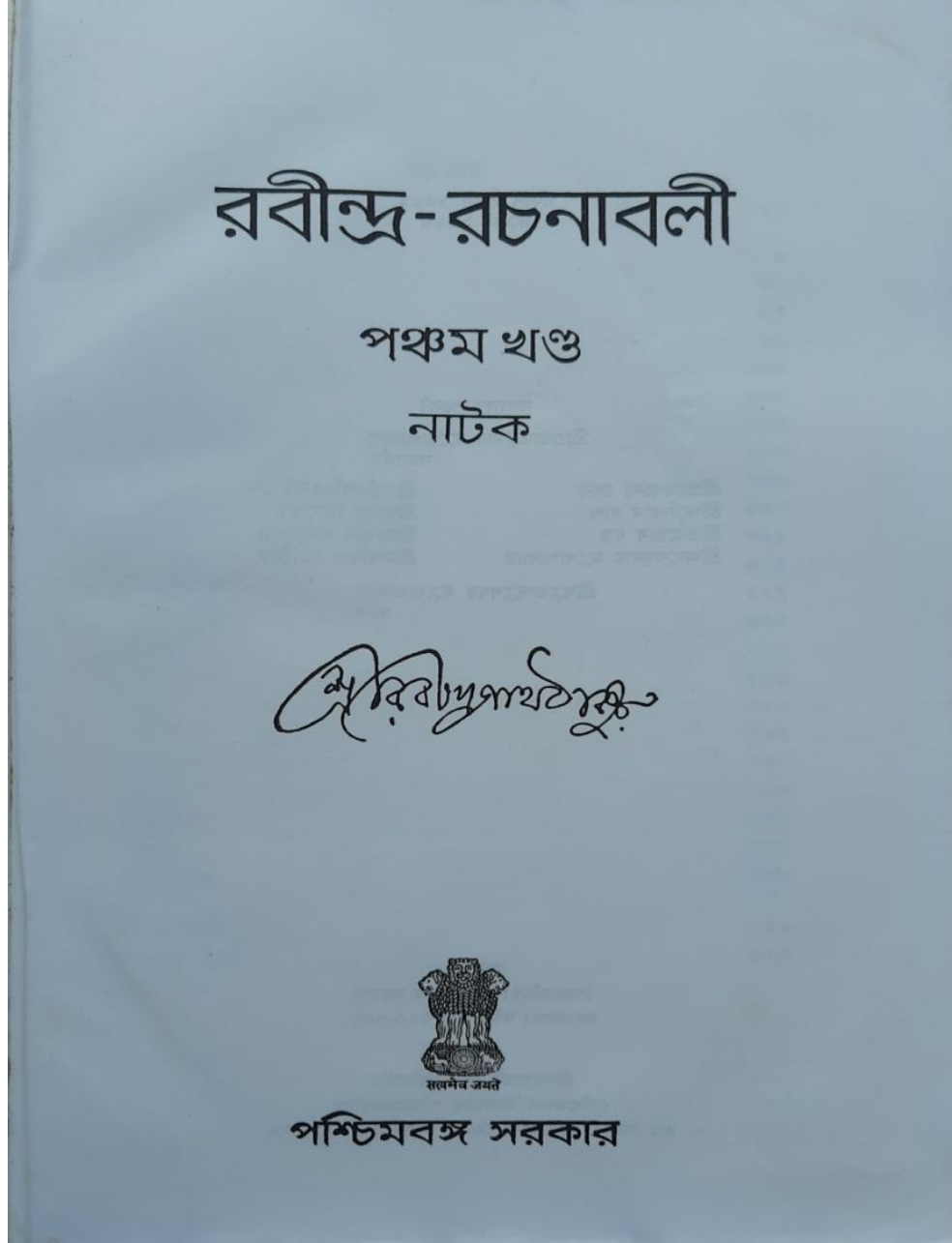
রাম-রাবণের যুদ্ধ নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি মানিক মণ্ডল রচিত 'রাম-রাবণের যুদ্ধ' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৬৬, পৃষ্ঠা - ২৭১।



রাম-রাবণের যুদ্ধ নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি মানিক মণ্ডল রচিত 'রাম-রাবণের যুদ্ধ' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৬৭, পৃষ্ঠা - ২৭২।

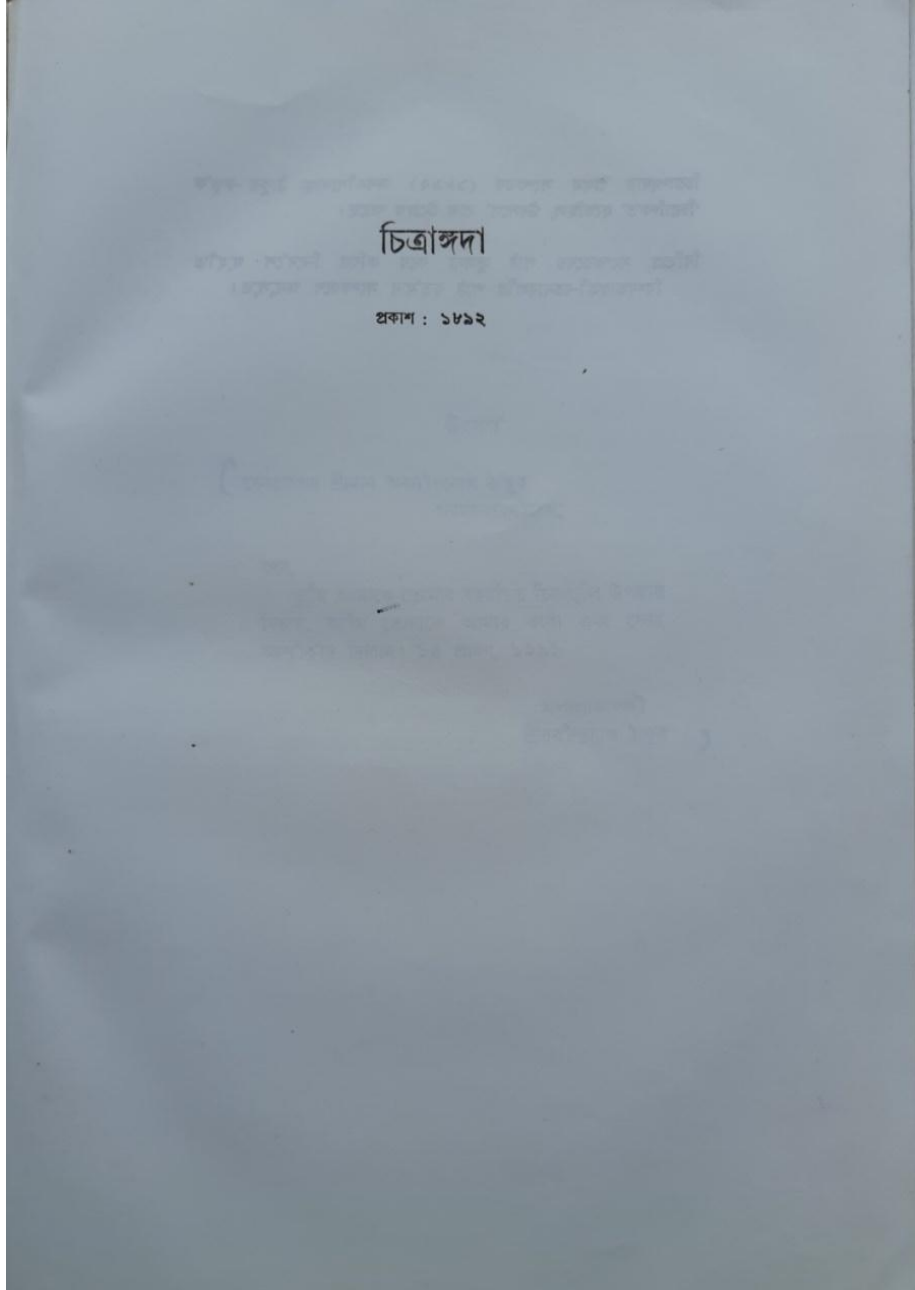


শর্মিষ্ঠা নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি মধুসূদন দত্ত রচিত ‘শর্মিষ্ঠা’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।
বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ৮০, পৃষ্ঠা - ২৭৭।

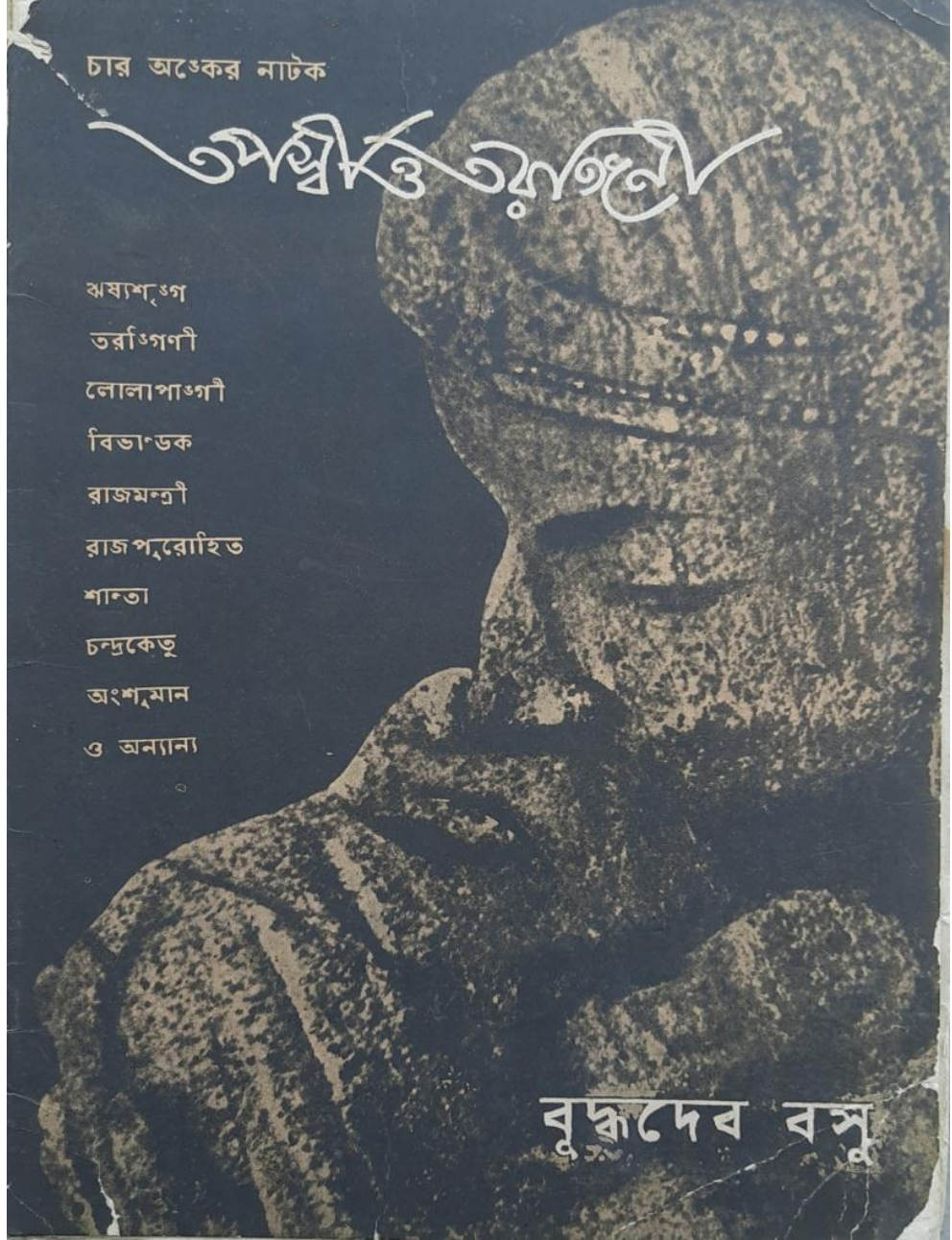


চিত্রাঙ্গদা নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি 'রবীন্দ্র রচনাবলী' থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত
বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১০১, পৃষ্ঠা -২৮৬।

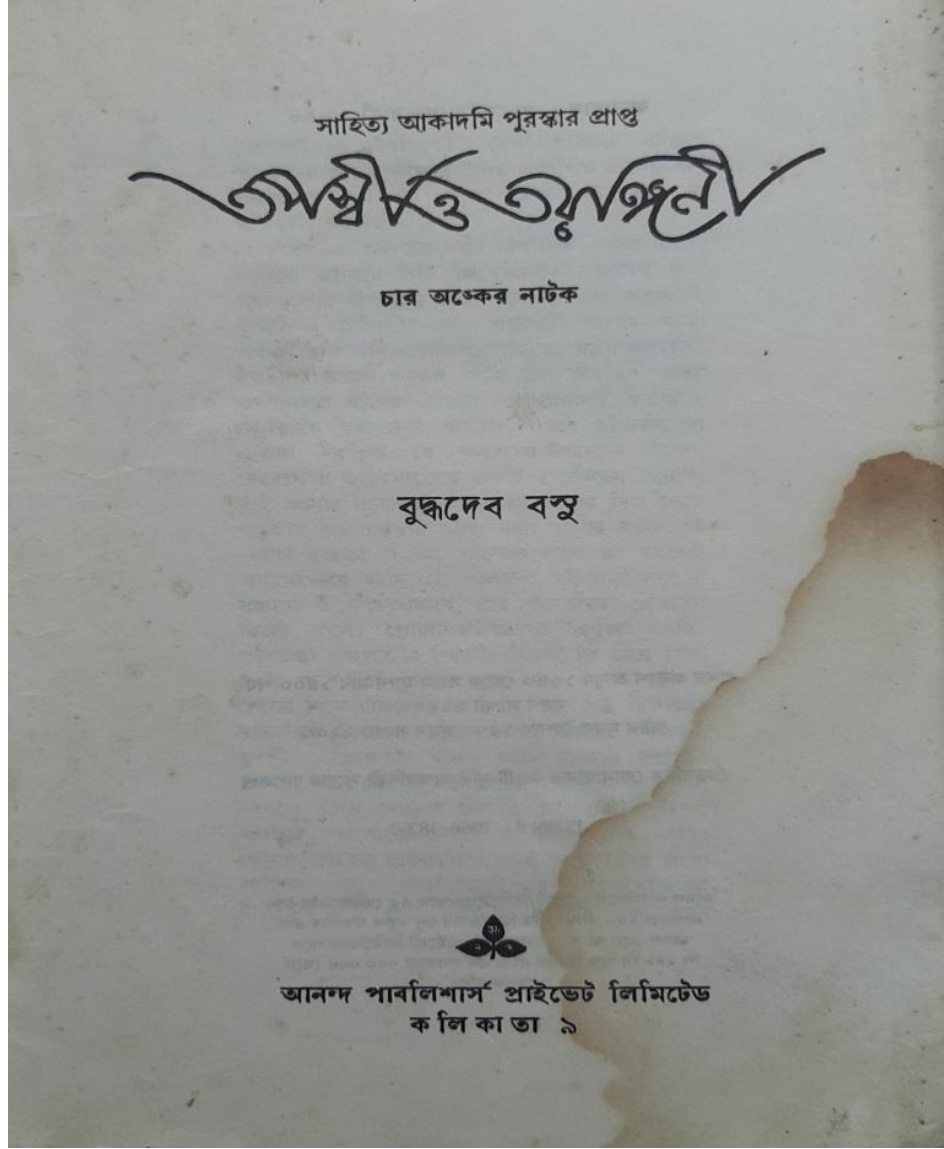
চিত্র সংখ্যা -৬০



চিত্রাঙ্গদা নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি 'রবীন্দ্র রচনাবলী' থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত
বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ১০২, পৃষ্ঠা - ২৮৬।

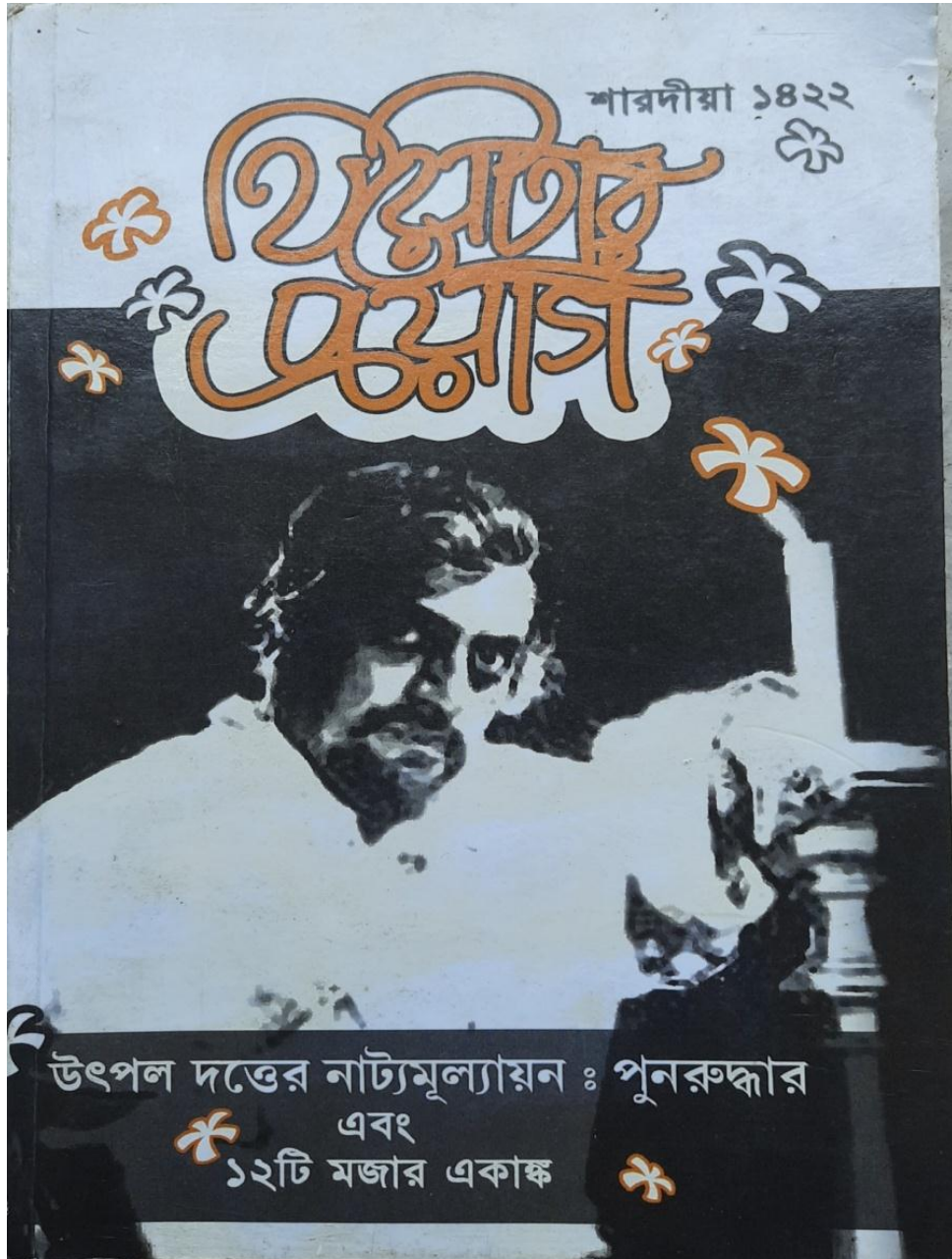


তপস্বী ও তরঙ্গিনী নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। বুদ্ধদেব বসু রচিত 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১১২, পৃষ্ঠা - ২৯১।

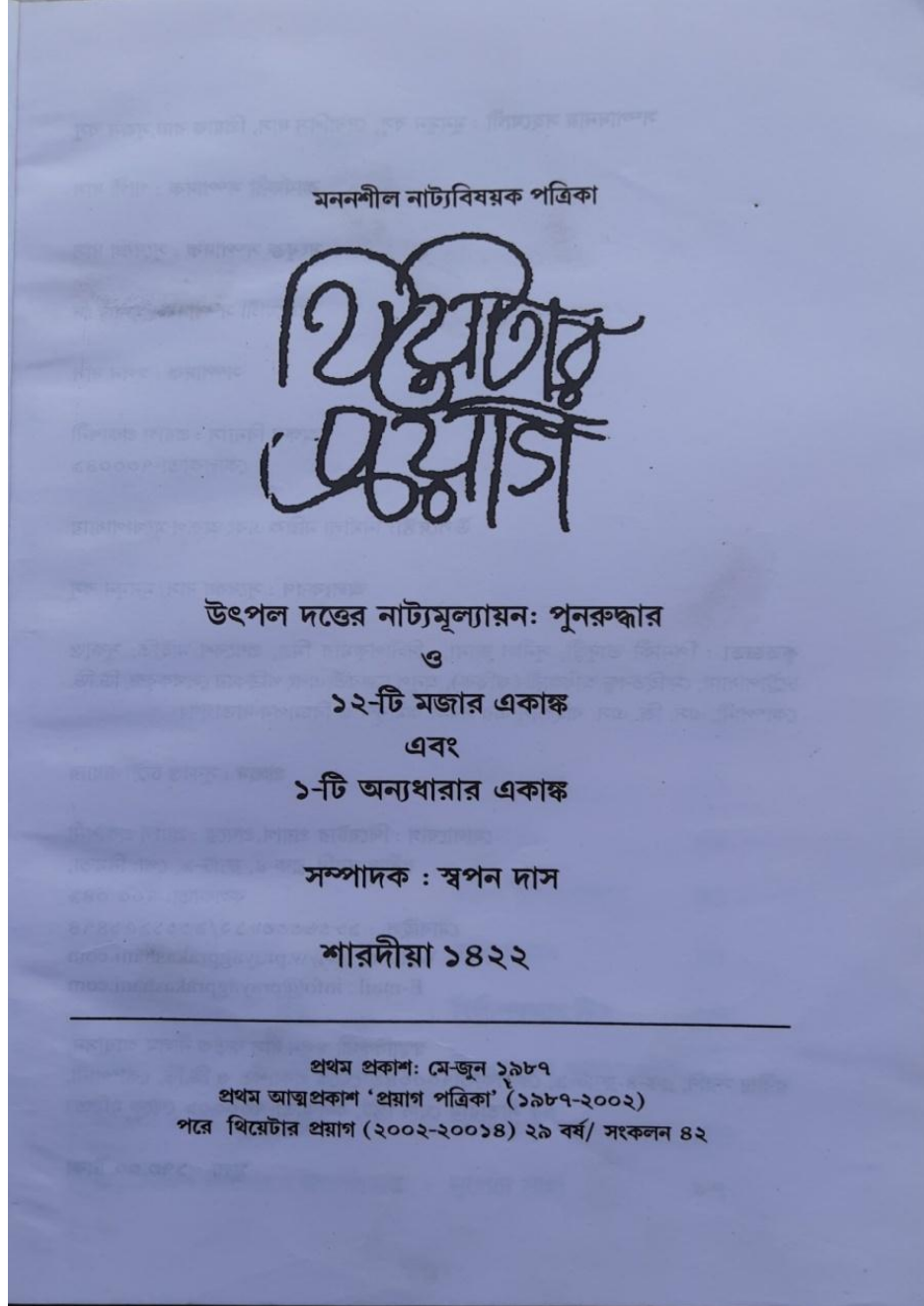


তপস্বী ও তরঙ্গিনী নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। বুদ্ধদেব বসু রচিত ‘তপস্বী ও তরঙ্গিনী’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১১৩,

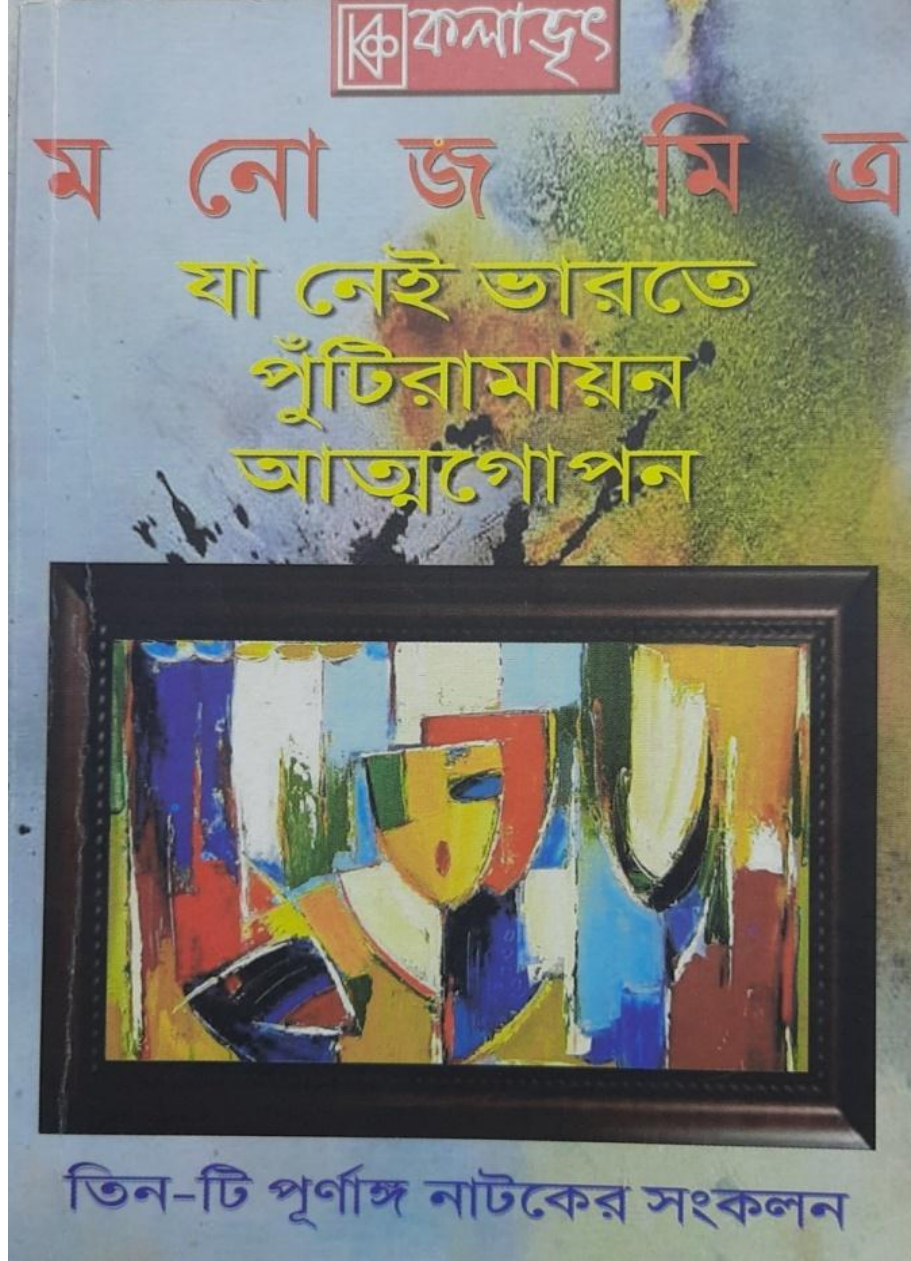
পৃষ্ঠা - ২৯১।



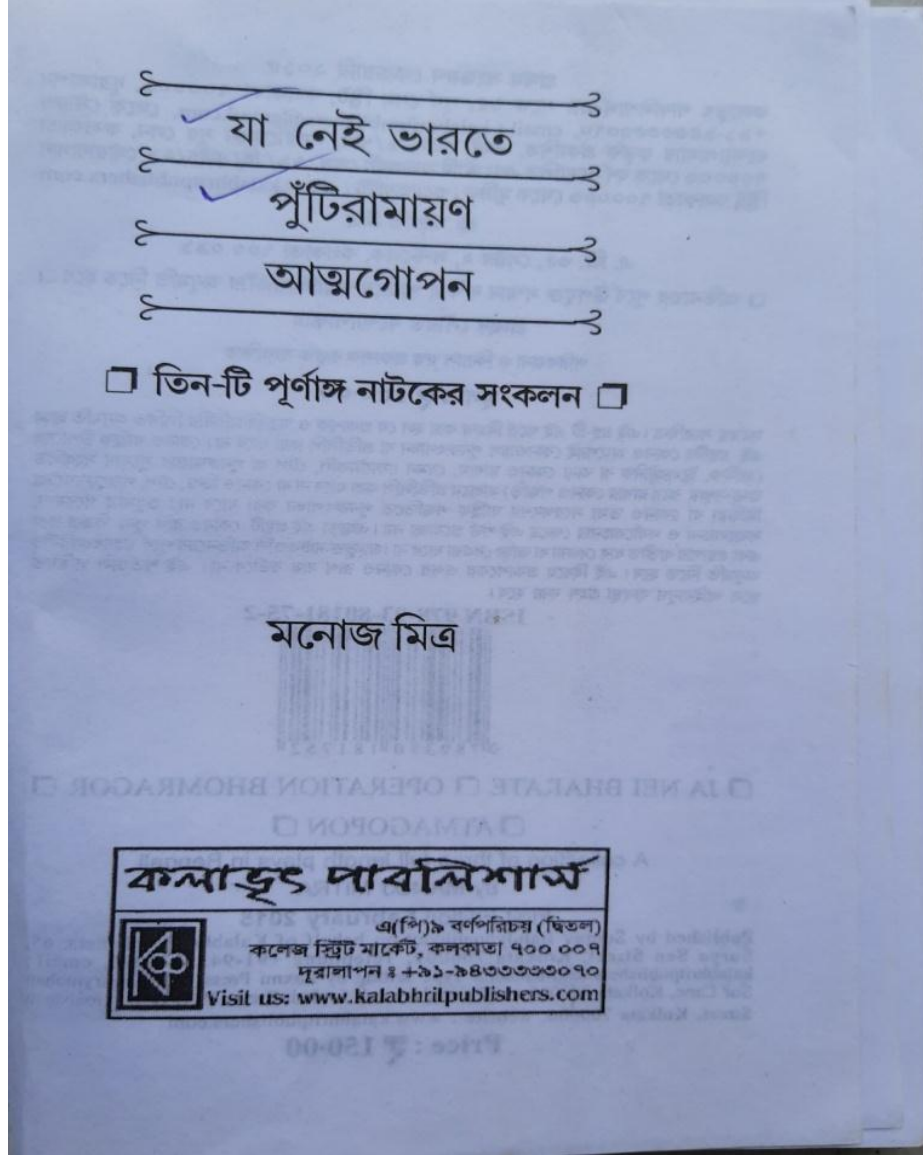
দ্রৌপদী ডট কম নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি 'থিয়েটার প্রয়াগ' নাট্য পত্রিকা থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১৩১, পৃষ্ঠা - ৩০১।



দ্রৌপদী ডট কম নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি 'থিয়েটার প্রয়াগ' নাট্য পত্রিকা থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১৩২, পৃষ্ঠা - ৩০২।

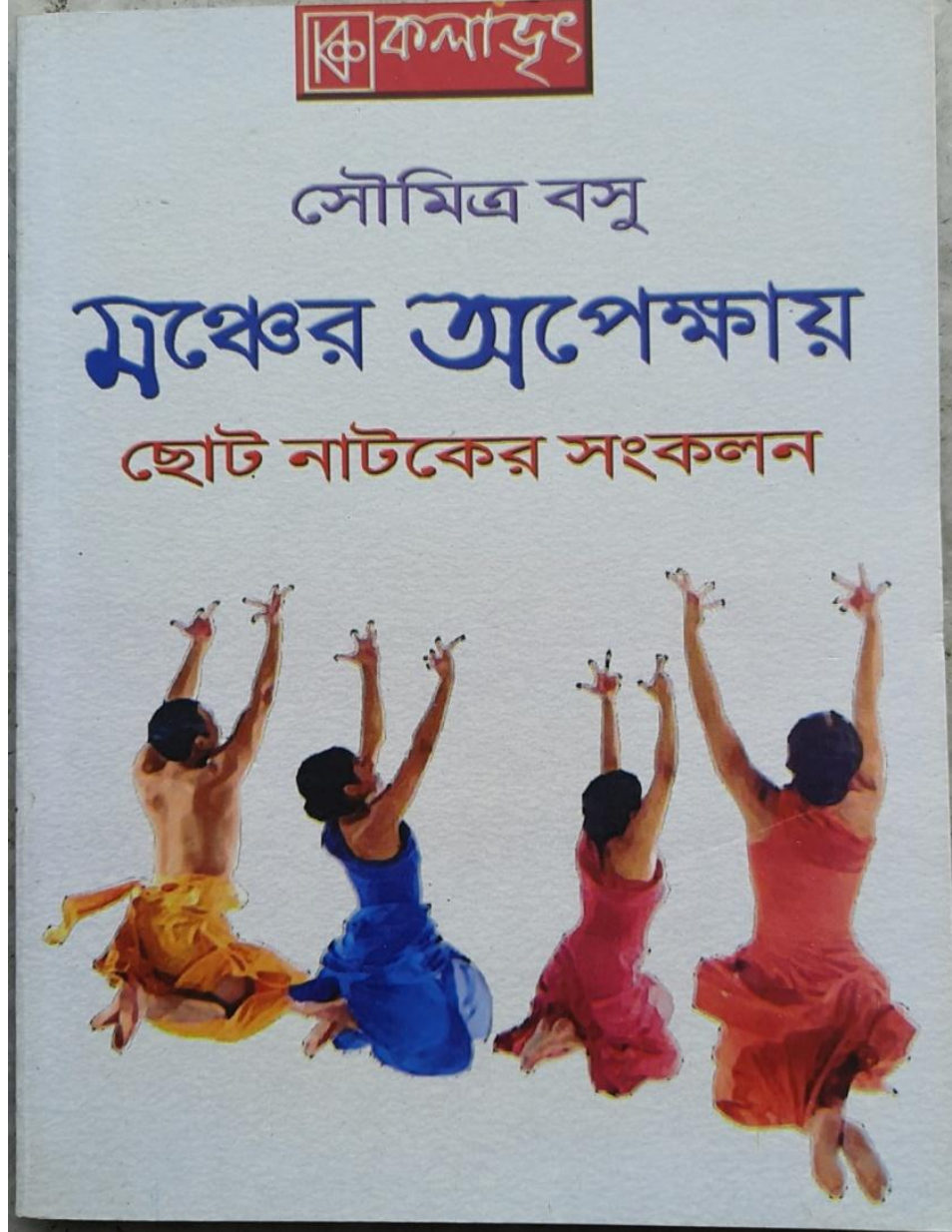


যা নেই ভারতে নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি মনোজ মিত্র রচিত 'যা নেই ভারতে' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১৪৭, পৃষ্ঠা -৩০৬।



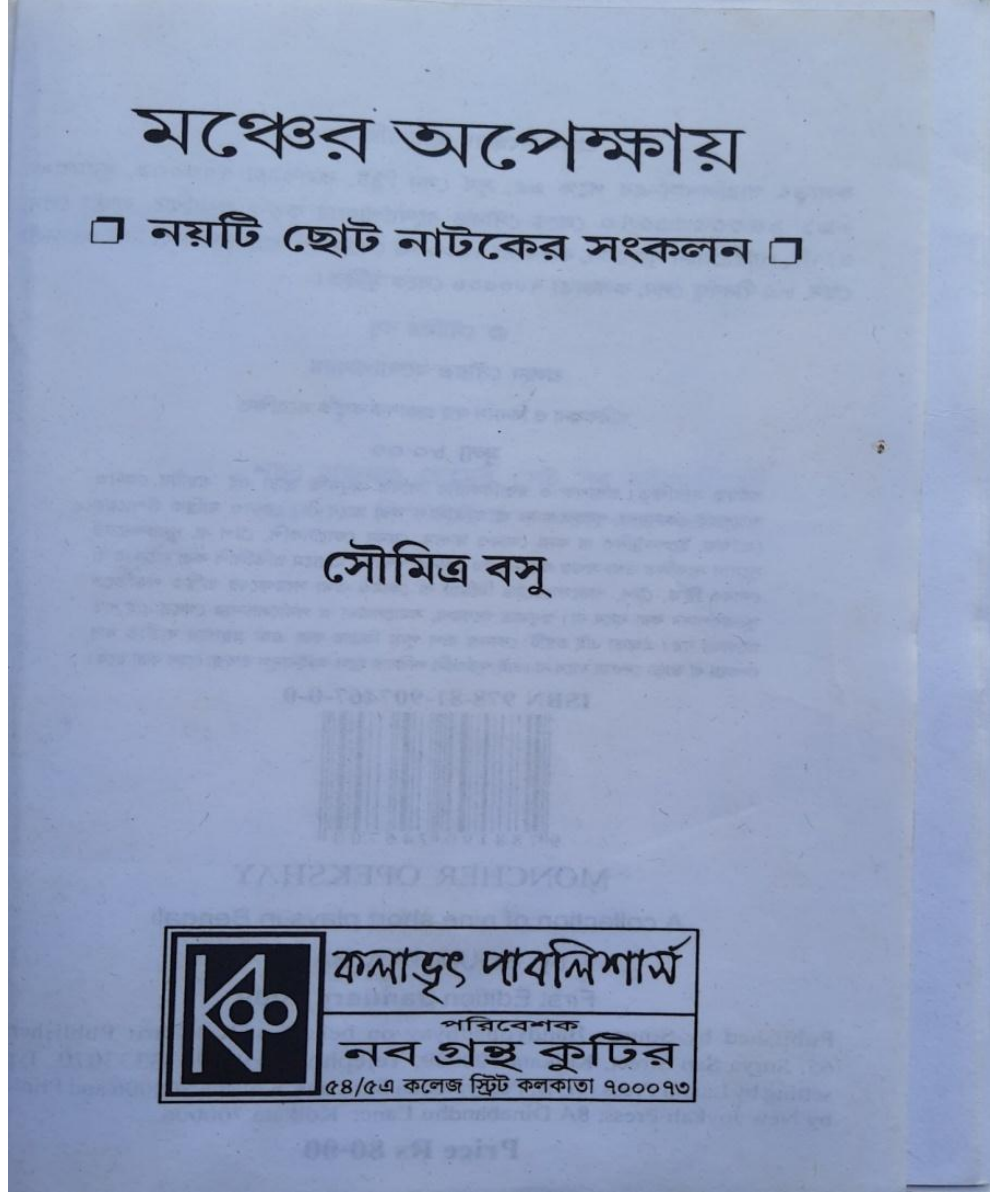
যা নেই ভারতে নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি মনোজ মিত্র রচিত 'যা নেই ভারতে' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ১৪৮,

পৃষ্ঠা -৩০৬।

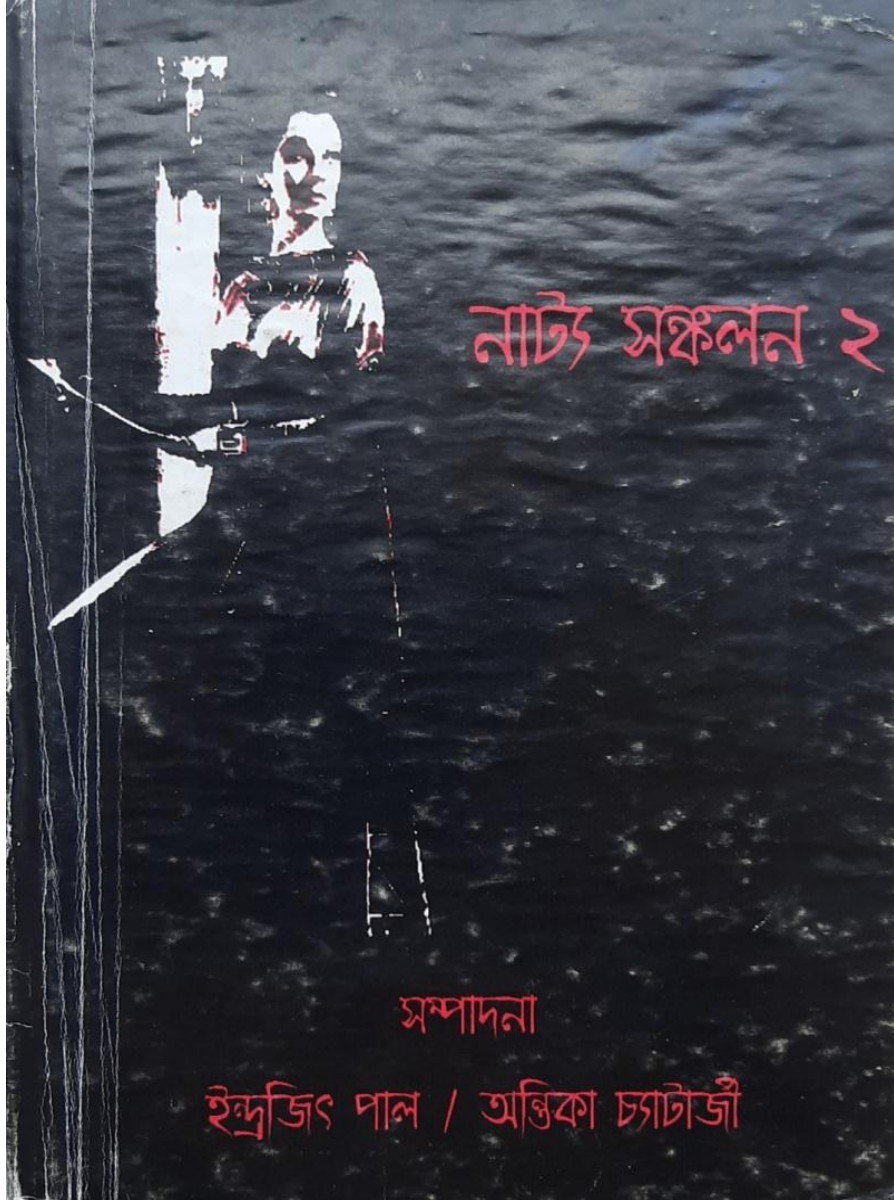


একলব্য নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি সৌমিত্র বসু রচিত 'একলব্য' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১৬৫, পৃষ্ঠা - ৩১৪।

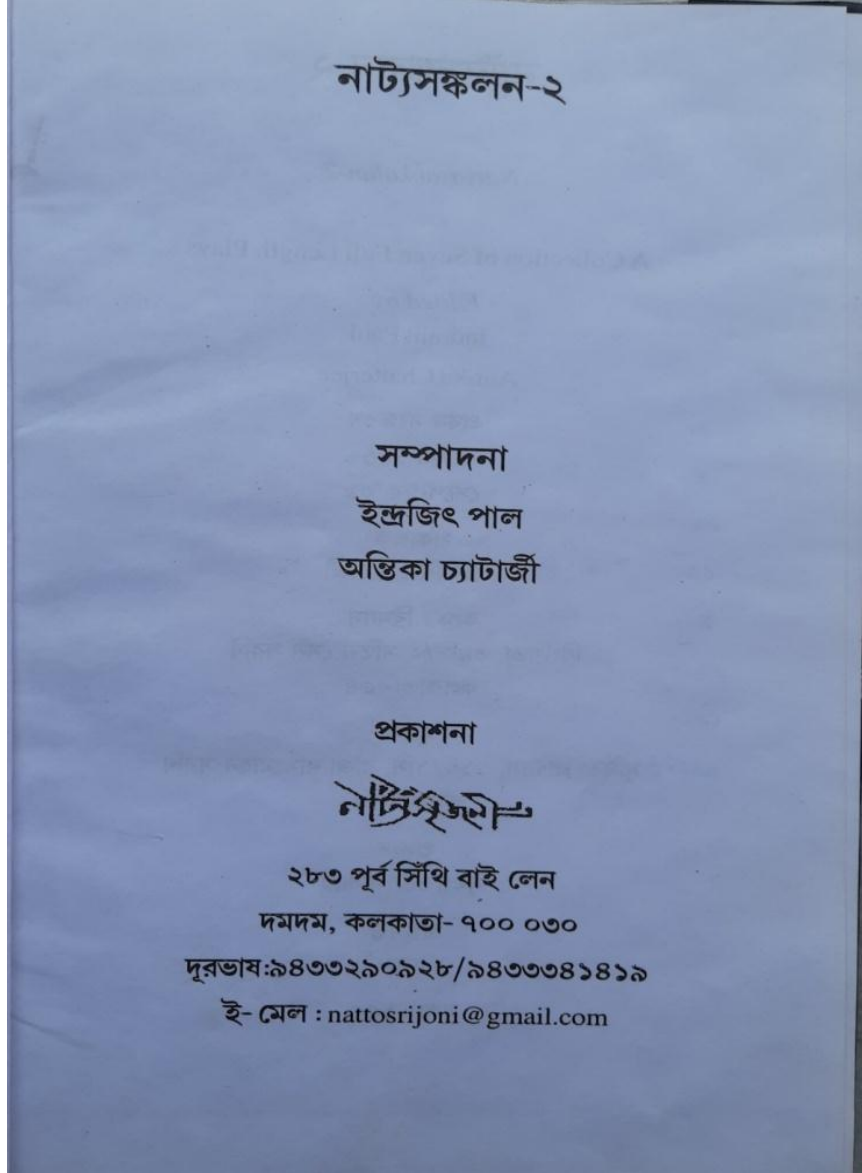


একলব্য নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি সৌমিত্র বসু রচিত 'একলব্য' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।
বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ১৬৬, পৃষ্ঠা - ৩১৪।

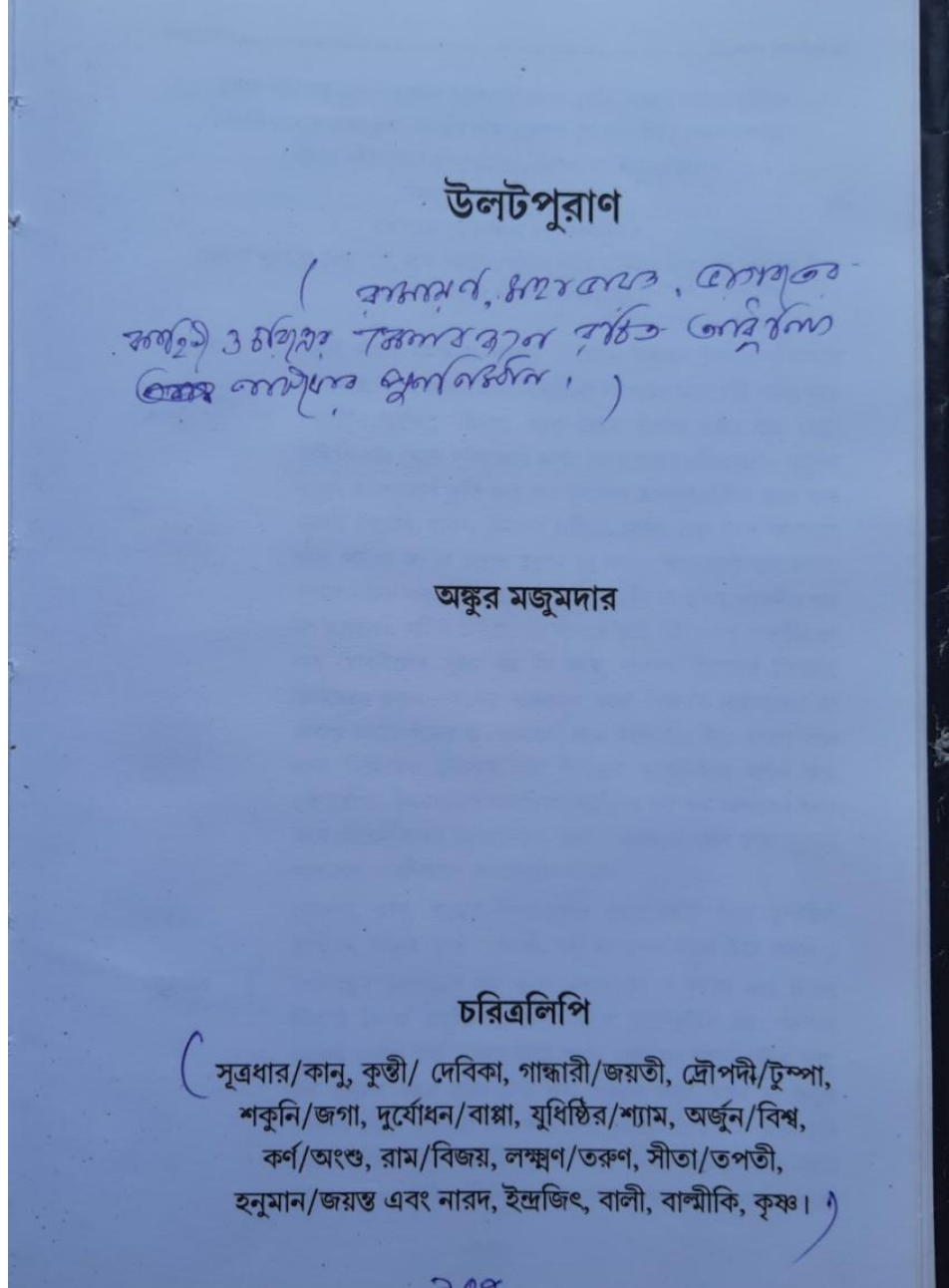


উলটপুরাণ নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি 'নাট্য সঙ্কলন ২' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত
বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১৮২, পৃষ্ঠা - ৩২০।

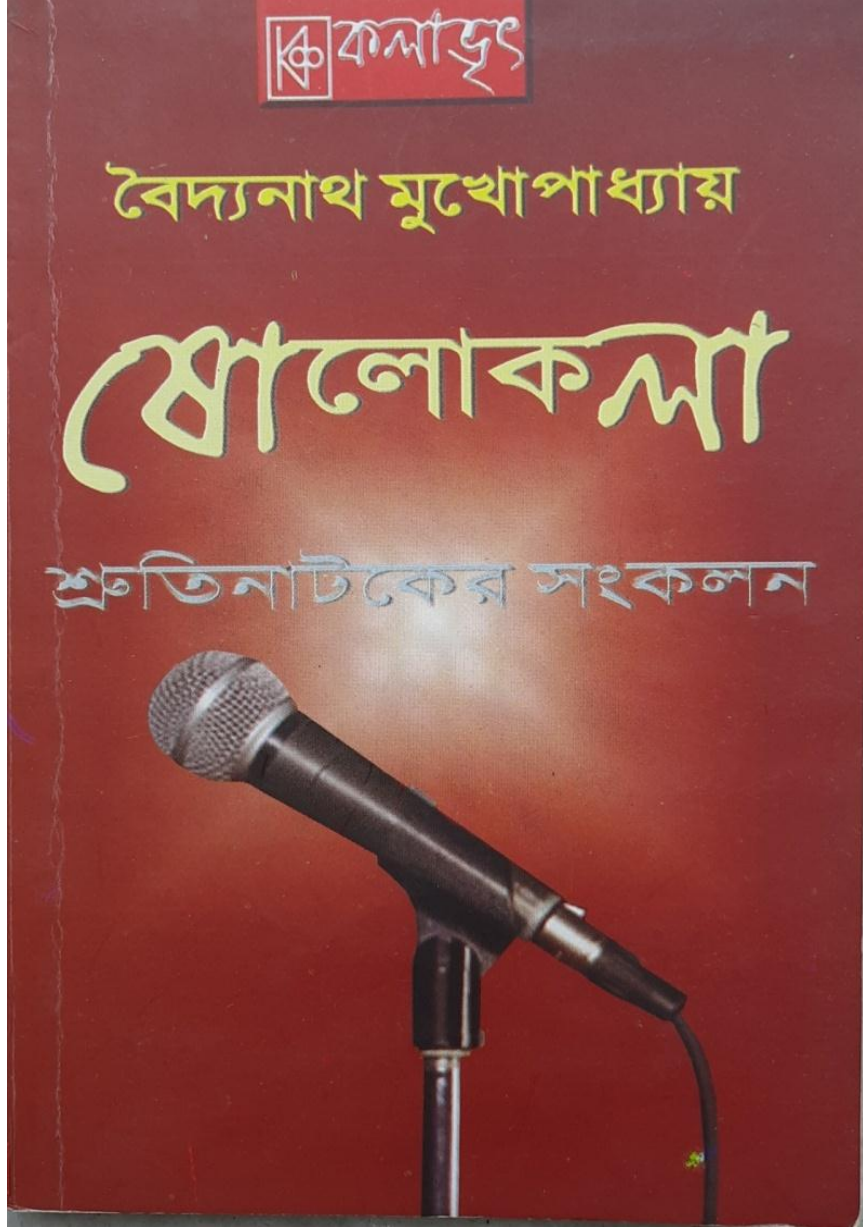
চিত্র সংখ্যা -৭০



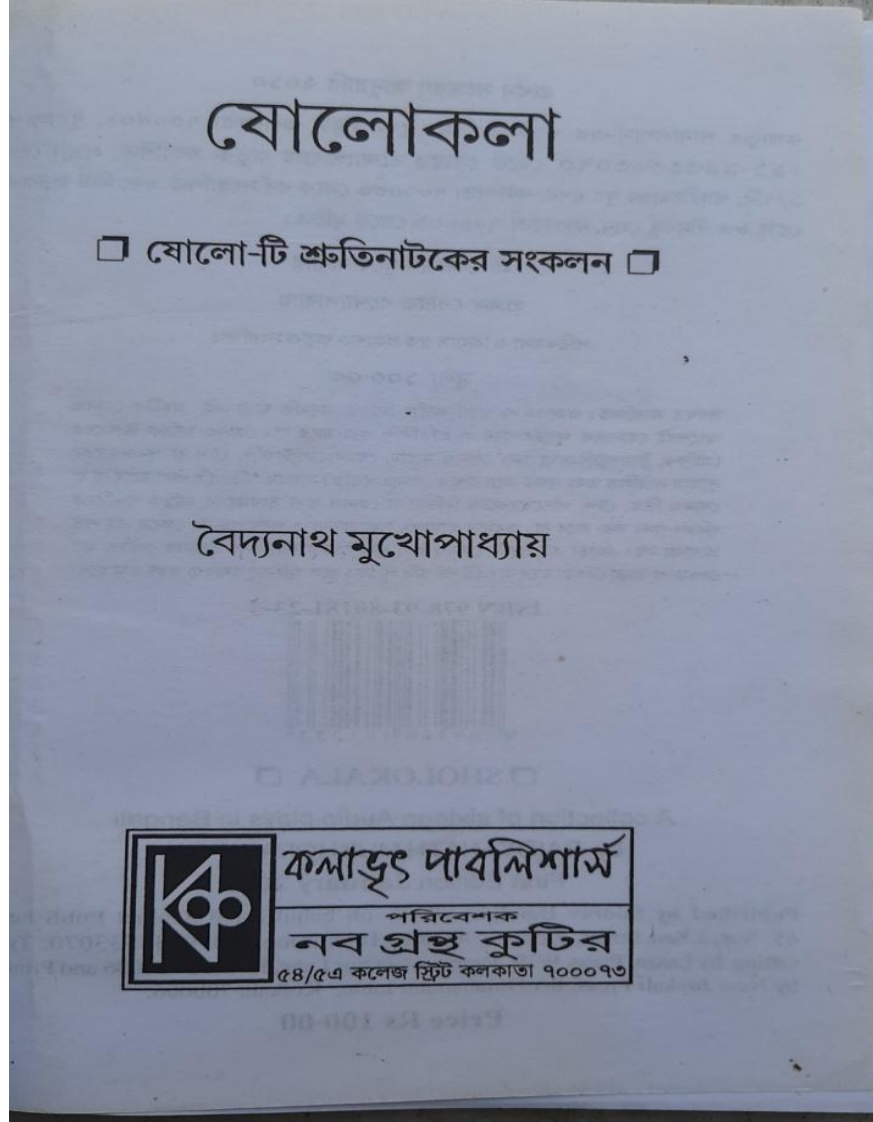
উলটপুরাণ নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি 'নাট্য সঙ্কলন ২' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত
বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ১৮৩,
পৃষ্ঠা - ৩২০।



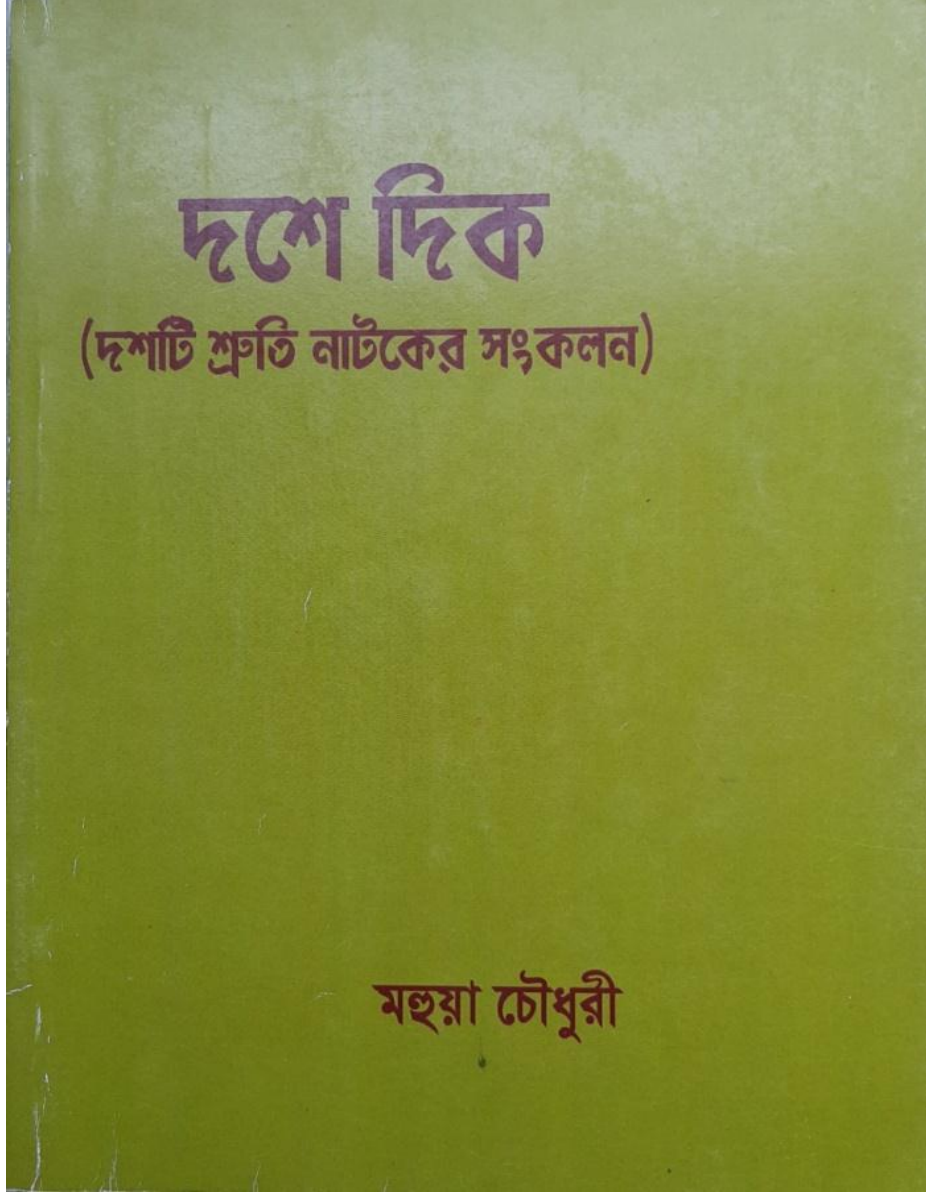
উলটপুরাণ নাটকের চরিত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি 'নাট্য সংকলন ২' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত
বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১৮৪, পৃষ্ঠা - ৩২০।



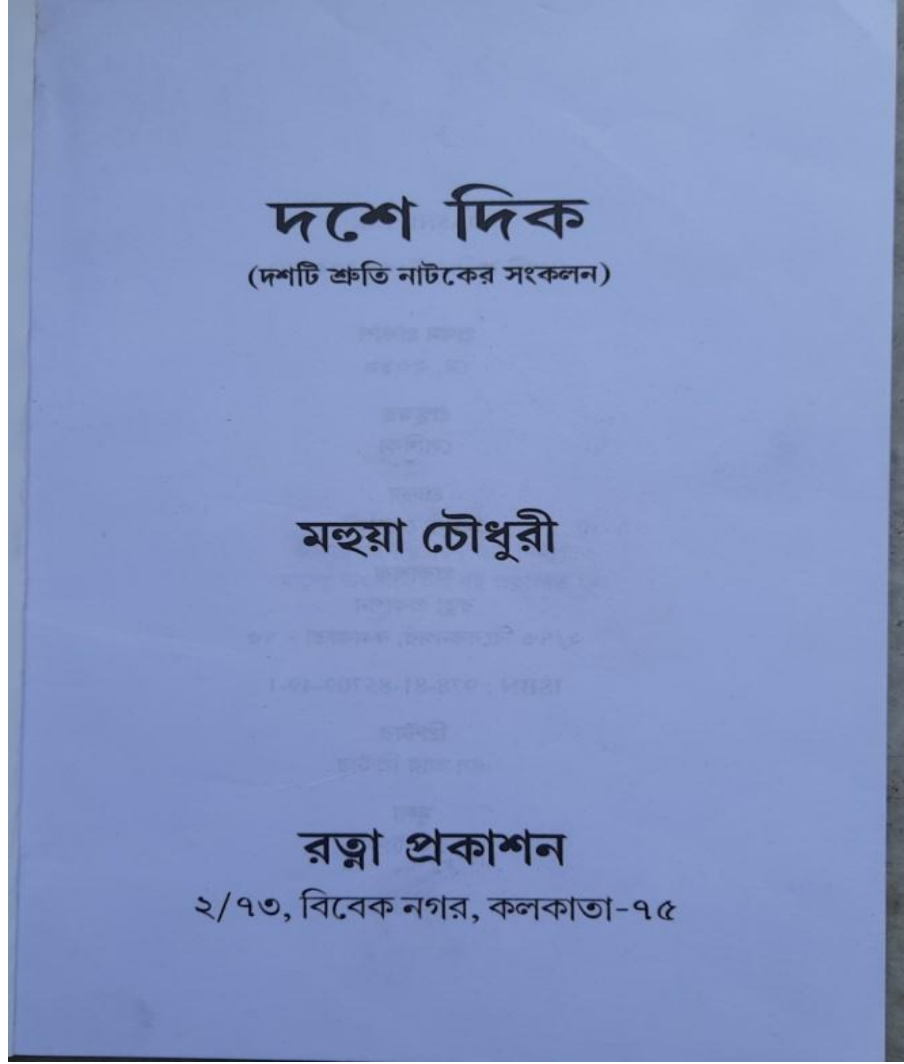
আর এক দ্রোণাচার্য নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত ‘আর এক দ্রোণাচার্য’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকাসংখ্যা-২০৭, পৃষ্ঠা - ৩২৬।



আর এক দ্রোণাচার্য নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'আর এক দ্রোণাচার্য' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ২০৮, পৃষ্ঠা - ৩২৭।



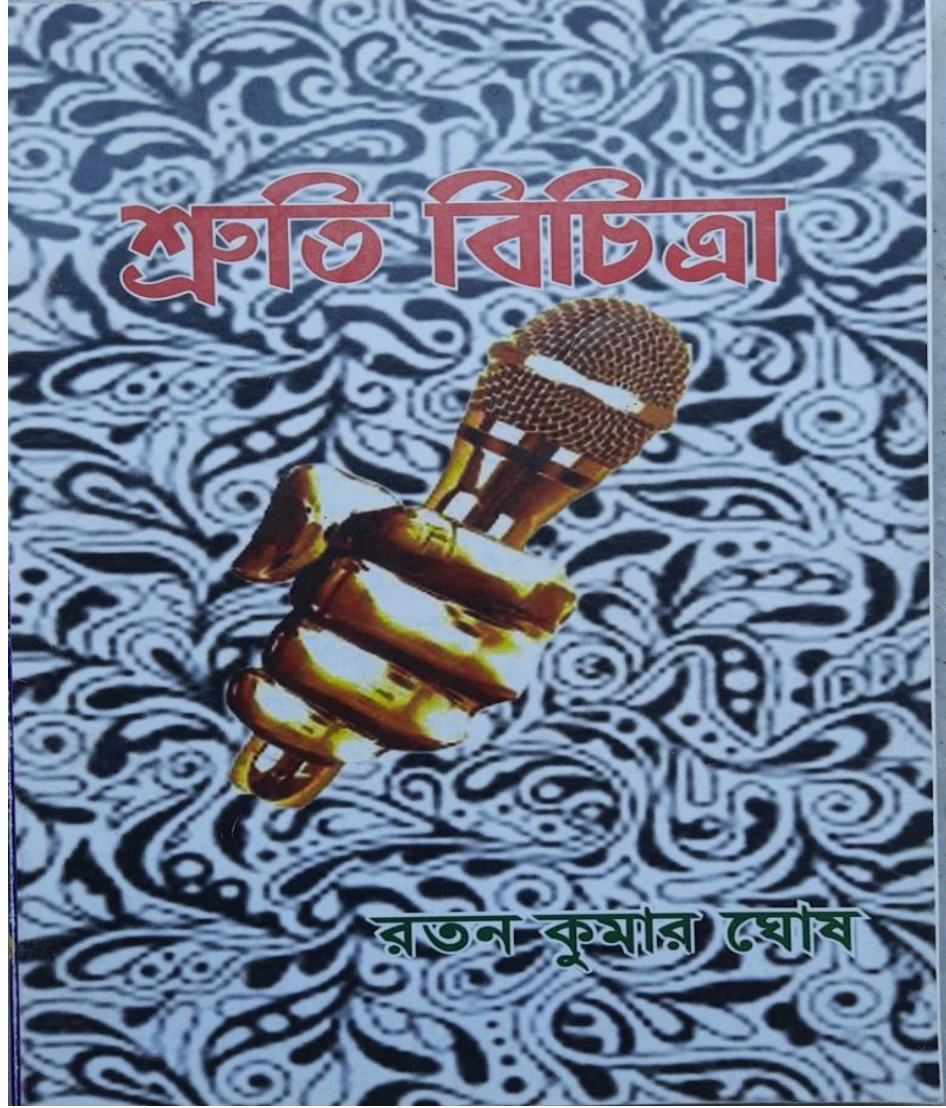
পঞ্চকন্যার কথা নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি মহুয়া চৌধুরী রচিত ‘পঞ্চকন্যার কথা’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-২২২, পৃষ্ঠা - ৩৩৩।



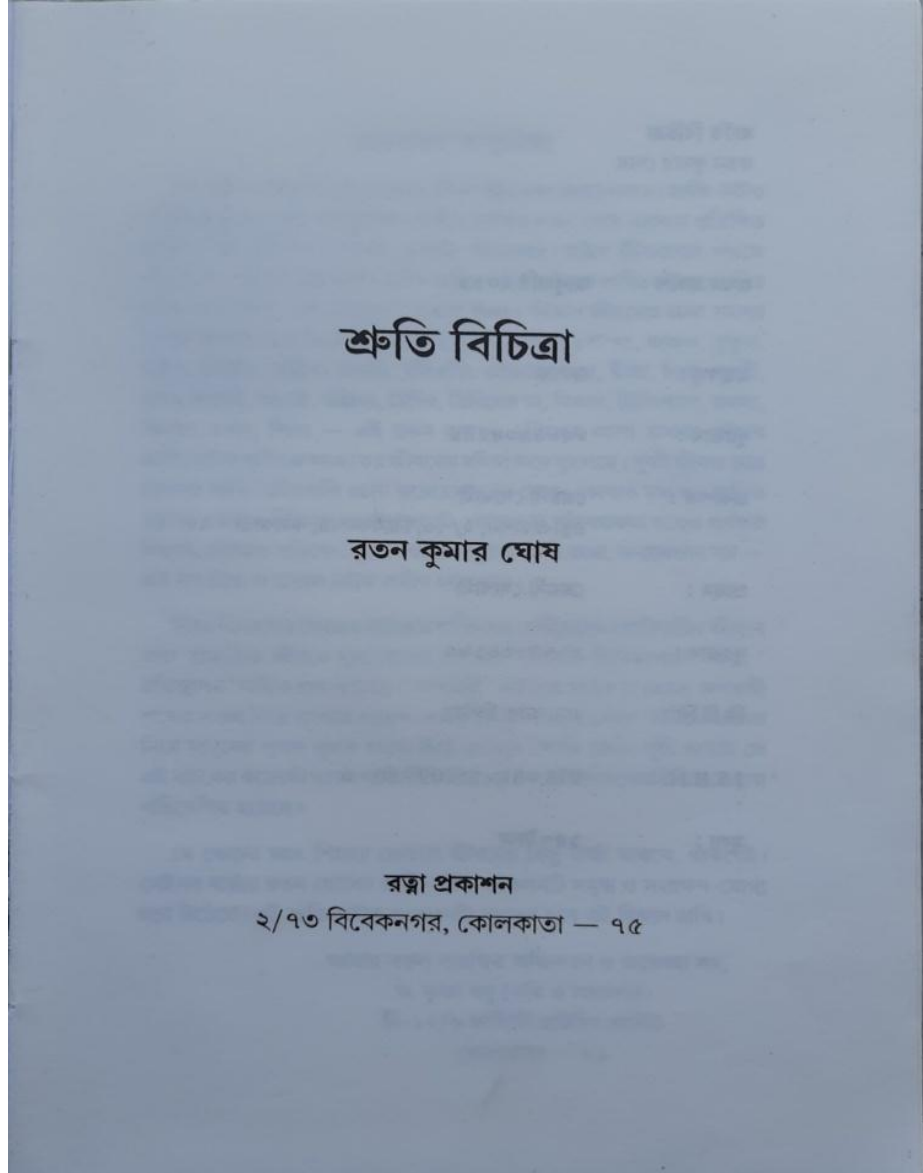
পঞ্চকন্যার কথা নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি মহুয়া চৌধুরী রচিত ‘পঞ্চকন্যার কথা’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ২২৩, পৃষ্ঠা - ৩৩৩।



পঞ্চকন্যার কথা নাটকের উৎসর্গপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি মহুয়া চৌধুরী রচিত ‘পঞ্চকন্যার কথা’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ২২৪, পৃষ্ঠা - ৩৩৩।



শিখন্ডী নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি রতন কুমার ঘোষ রচিত ‘শিখন্ডী’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ২৩৭, পৃষ্ঠা -৩৩৮।

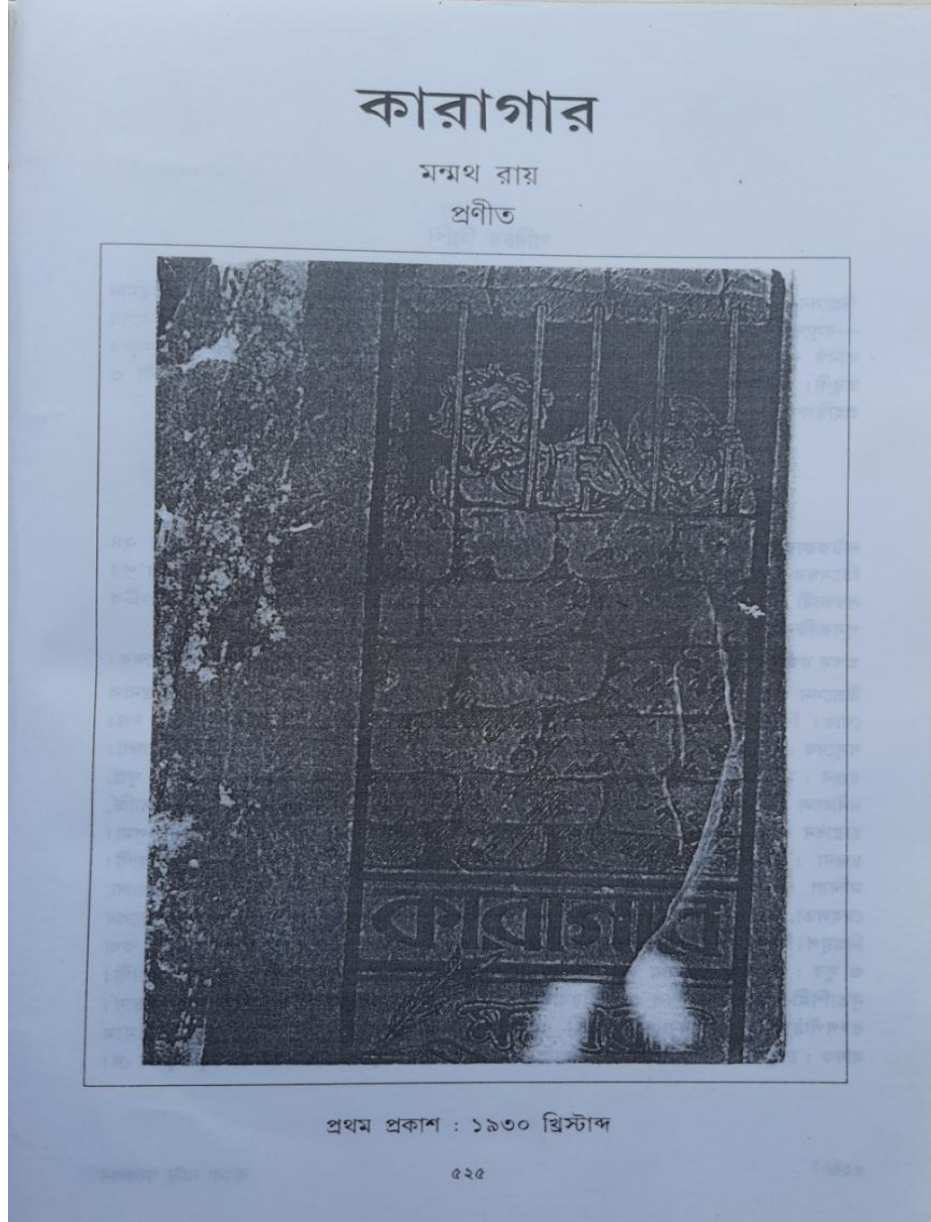


শিখন্ডী নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি রতন কুমার ঘোষ রচিত 'শিখন্ডী' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।
বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ২৩৮, পৃষ্ঠা - ৩৩৯।



করাগার নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি মন্মথ রায় রচিত 'করাগার' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ২৫০, পৃষ্ঠা - ৩৪৩।

চিত্র সংখ্যা -৮০



করাগার নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি মন্মথ রায় রচিত 'করাগার' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।
বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-২৫১, পৃষ্ঠা - ৩৪৩।

চৈতন্য-লীলা

[ভক্তিমূলক নাটক]

(১৯শে শ্রাবণ, ১২৯১ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পদার্থ-চরিত্র

জগন্নাথ মিশ্র (নদীয়া-নিবাসী ব্রাহ্মণ)। নিমাই (জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র, শ্রীশ্রীচৈতন্য অবতার)।
নিত্যানন্দ (অবধূত)। গঙ্গাদাস (অধ্যাপক)। অশ্বৈত, শ্রীবাস, মুকুন্দ (বৈষ্ণবগণ)। হরিদাস
(যবন-বৈষ্ণব)। জগাই, মাধাই (পাশ্চাত্যবয়)। যড়রিপদ (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও
মাৎস্যর্থা), কালি, বিবেক, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত, মুনী, ঋষি ও বিদ্যাধরগণ, দেবগণ, অতিথি, বালকগণ,
ব্রাহ্মণগণ, গণক, সম্যাসী, ভট্টাচার্যস্বয়, প্রতিবাসীস্বয়, বৈষ্ণবগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

শচীদেবী (জগন্নাথ মিশ্রের স্ত্রী)। লক্ষ্মীদেবী (নিমাইয়ের প্রথমা পত্নী)। বিষ্ণুপ্রিয়া (নিমাইয়ের
দ্বিতীয়া পত্নী)। পাপ, ভক্তি, বিদ্যাধরীগণ, নারীগণ, প্রতিবাসিনীগণ, দেবীগণ, মালিনী ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

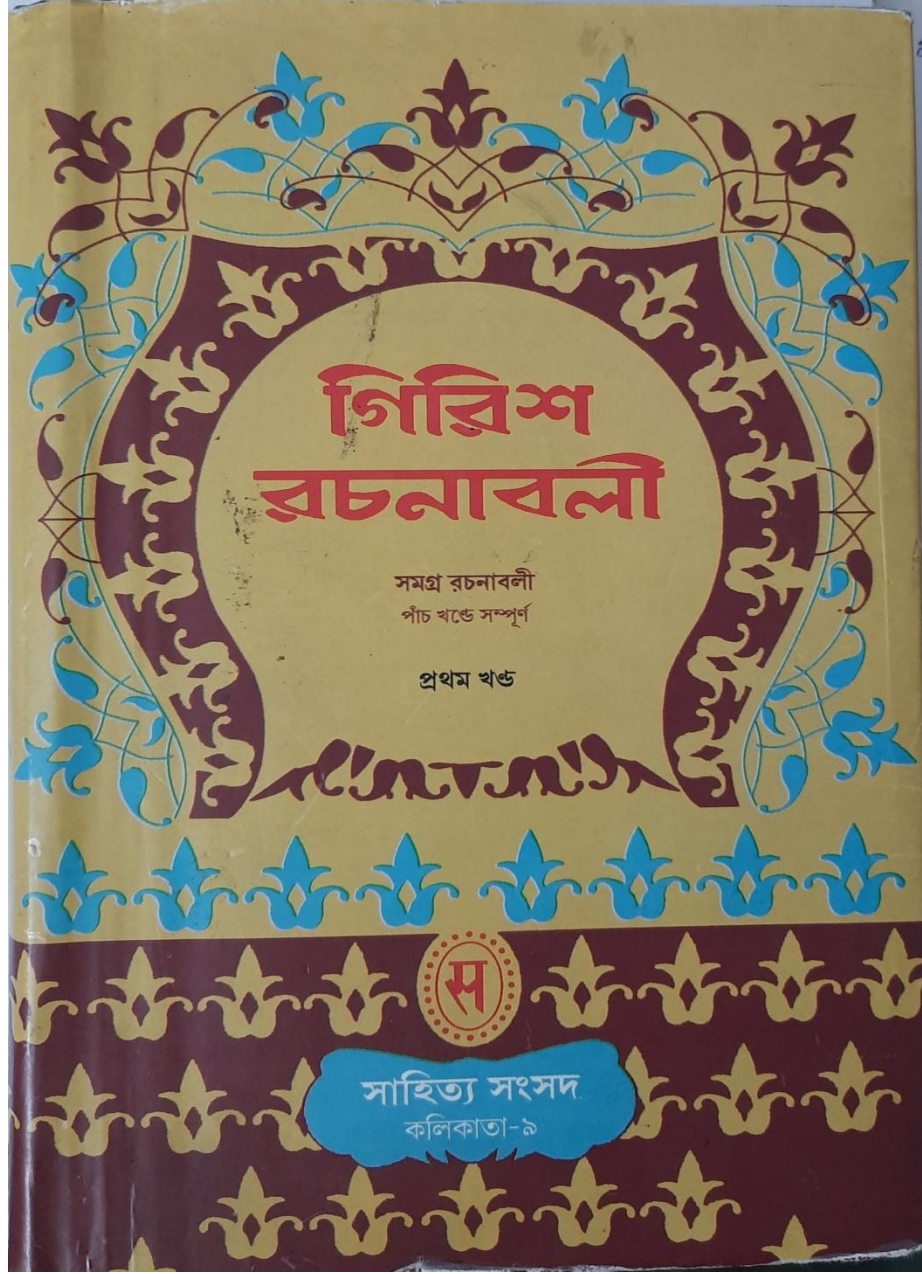
পাপের সভা

পাপ ও ছয় রিপদ

পাপ। যন্ত্রবান্ কর্ম্মাধ্যক্ষ তোমরা আমার,
মম অধিকার করেছ প্রচার;
বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি
নাহি পায় স্থান,
কোথা প্রস্থান করেছে তারা;
কৈ, দেখি নাই বহুদিন।
কর্ম্মাধ্যক্ষ প্রবীণ সকলে,
দেহ পরিচয়, কেবা কি কৌশলে
রাজ্য মম করহ বর্ধন,
যথাযোগ্য পুরস্কার দিব জনে জনে।
কর কাম, গুণগ্রাম ব্যাখ্যা তব।
কাম। কিবা নাহি জান মাতা—
মম শক্তি তোমার কুপায়।
কুৎসিত প্রকৃতিরূপা তুমি,
ব্যাপী আকাশ পাতালভূমি—
চিরদিন করহ বিহার,
মোহিনী তোমার
বর্ণিবারে কেবা পারে?

শুন মাতা, যথাসাধ্য করি তব কাজ।
বসে নারী বিলাস-ভবনে,
বিলোল-নয়নে—
দর্পণে অধর-রাগ হেরে;
কাকপক্ষ সম,
নিতম্ব-লুপ্তিত সূচিকণ কেশজাল,
যবে বামা সীমন্তে বিভাগ করে;
মনোলোভা ধবল সরল
প্রতিবিম্ব করি দরশন,
ফল্লমন;
সুগন্ধের ভার—কুসুমের হার
পরে গলে,
দোলে মালা পান-পয়োধরে;
ধীরে ধীরে কামিনীরে কহি,
“কেন লো কেন লো সুলোচনে,
একা হেথা বসি অযতনে,
যুব-মন করি আকর্ষণ
কেন নাহি রাখ বেঁধে?
যাও যাও, অলসে কি হেতু রও?
দম্ভ করে যুবগণে সহ বা কেমনে,
কেন না কাঁদাও,
চরণে না লুটাও সবারে?
দেখ লো নিবিড় কেশজাল,
যাহে যুব-মন ক্ষুদ্র মীন সম
শত শত রহিবে জড়িত;

চৈতন্য-লীলা নাটকের নামপত্র ও চরিত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি ‘গিরিশ রচনাবলী’র দ্বিতীয় খণ্ড থেকে
সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ষষ্ঠ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-২, পৃষ্ঠা - ৩৭৩।



নিমাই সন্ন্যাস নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত ‘নিমাই সন্ন্যাস’ নাটকটি গিরিশ রচনাবলী থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ষষ্ঠ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ১৫, পৃষ্ঠা -

৩৭৯।

নিমাই সন্ন্যাস

[চৈতন্যলীলা দ্বিতীয় ভাগ]

(৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

পদ্য-চরিত্র

নিমাই (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য)। নিতাই (অবতৃত)। প্রতাপরুদ্র (উড়িয়াধিপতি)। রায় রামানন্দ (জমিদার)। কেশব ভারতী (নিমাইয়ের দীক্ষাগুরু)। সার্বভৌম (সভাপতি)। অশ্বত্থ, হরিদাস, মৃৎসুন্দ, চন্দ্রশেখর, গোপীনাথ (ভক্তগণ)। বক্তৃকবর (নিমাইয়ের ভূতা)। নট, জামাই, ব্রাহ্মণ, ধোপা, সভাসদগণ, প্রতিবাসিনগণ, বৈষ্ণবগণ, বালকগণ, শিষ্যগণ, দেবগণ, রথযাত্রীগণ ইত্যাদি।

শ্রী-চরিত্র

শচী (নিমাইয়ের মাতা)। বিকুপ্ৰিয়া (নিমাইয়ের পত্নী)। নটী, মালিনী, ধোপানী, দেবীগণ, প্রতিবাসিনীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গভর্নাক

পদ্য—রাজসভা

প্রতাপরুদ্র, রায় রামানন্দ ও সভাসদগণ
প্রতাপ। (রায় রামানন্দ! তুমি প্রভুর কৃপার
পাত্র—তুমি আমার কৃপা কর, প্রভু বন্দাবনে
গিয়েছেন, প্রভুর বিরহে প্রাণ অতিশয় কাতর
হুয়েছে, আমার জীবন শূন্যজ্ঞান হচ্ছে—তুমি
কোন উপায় কর।)

রামা। মহারাজ! যে প্রভুর নিমিত্ত ব্যাকুল,
প্রভু তার নিমিত্ত ব্যাকুল; আপনি অচিরে তাঁর
দর্শন পাবেন।

প্রতাপ। আমি ভক্তবৃন্দের নিকট শুনোছি
যে, তুমি প্রভুকে নিয়ে আনন্দ কর, তোমার
দ্বারা নট-নটীরা শিক্ষিত হয়ে নিতাই গৌরাঙ্গ-
লীলা তোমার প্রদর্শন করে, কৃপা করে যদি
তুমি আমার সে অভিনয় দেখাও;—আর এক
আমার পরম খেদ, প্রভুর নাগর-মূর্তি দেখি
নাই, কি উপায়ে আমি সেই নটবর-মূর্তি
দেখতে পাবো?

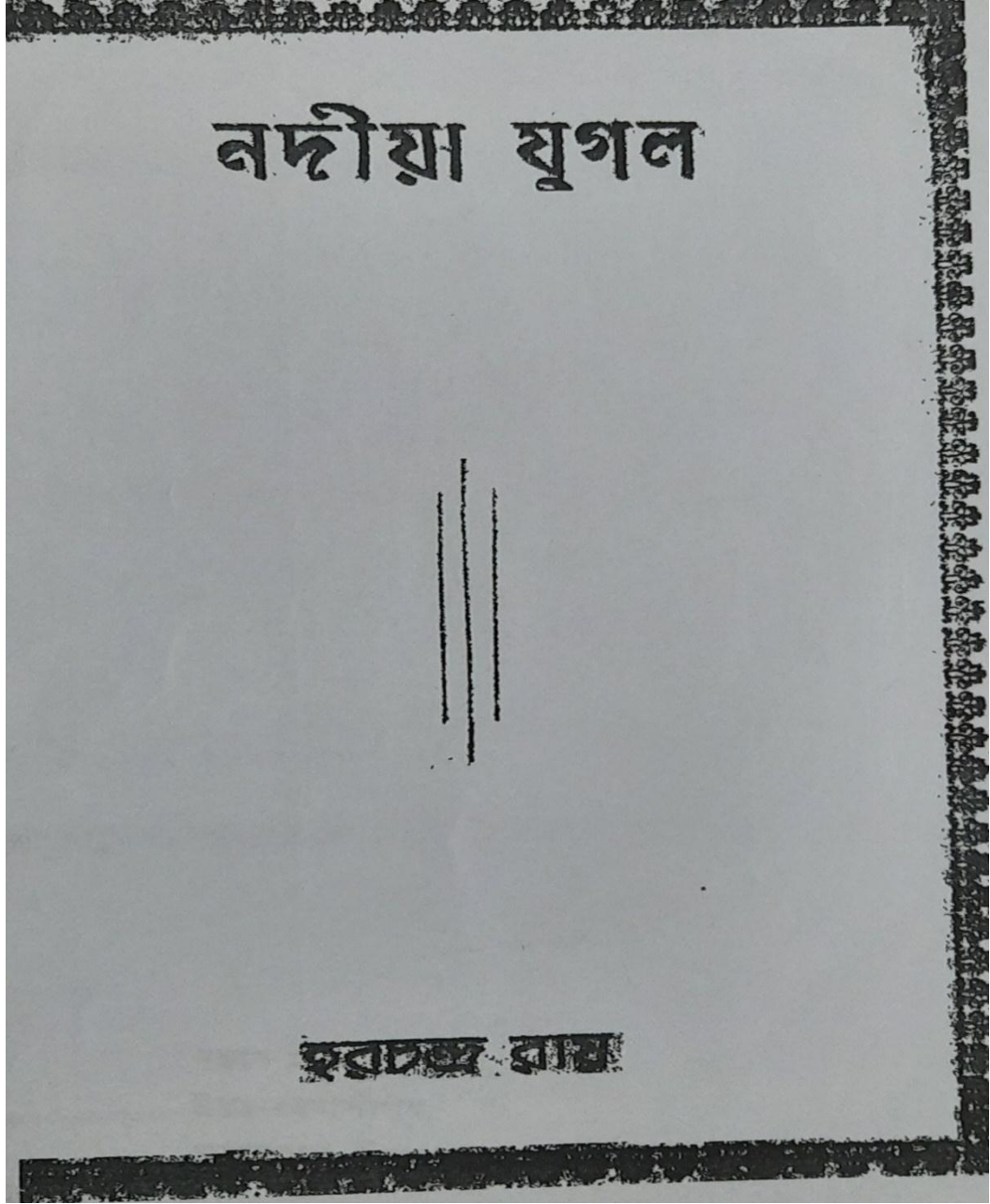
রামা। মহারাজ! ব্যাকুলতাই একমাত্র উপায়।

প্রতাপ। প্রভু যারে তারে বলেন, “আমার
দাসেরে মূর্তি দাও,” এরই বা কারণ কি?

রামা। বন্দাবনে কৃষ্ণ অদর্শনে শ্রীরাধা এত
ব্যাকুল হতেন যে, তাঁর শরীরে সম্পূর্ণ মৃত্যু-
লক্ষণ দৃষ্ট হতো—এই বিরহ-বিকার দর্শনে
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে বললেন, “রাধে! তোমার
প্রেমে আমি চির-কণী রইলেম;—কিসে
তোমার কণ পরিশোধ হবে?” শ্রীরাধা উত্তর
করলেন, “আমি দাসী, আমার নিকট কণ কি?”
শ্রীকৃষ্ণ বার বার কাতর হয়ে বললেন, “প্রিয়ে!
আমার কৃপা কর, কিসে তোমার কণ মুক্ত হবে
বল?” রাধা বললেন—“প্রাণেশ্বর! যদি দাসীকে
করুণা করলেন, তবে এই ভিক্ষা যে, অধম
জীব যেন তোমার কৃপালাভ করে।” ভগবান
তুষ্ট হয়ে বললেন, “তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ
হবে, আমি ম্বারে ম্বারে প্রেম বিতরণ করবো,
জীবকে উদ্ধার করে তোমার কণ হতে মুক্ত
হব।” বন্দা ব্যাঙ্গ করে বললেন যে, “কপট-
চাউমাণি! তোমার কথার প্রত্যয় কি? কং
লিখে দাও, তবেই মানি।” এ কথায় মুরলী-
মোহন তাঁর প্রেমের মহাজন শ্রীমতীকে দাসকং
লিখে দিলেন। সাক্ষীগণ যে খতে সাক্ষ্য, তাই
প্রভু গৌরবেশে ম্বারে ম্বারে হরিনাম বিতরণ
করছেন।

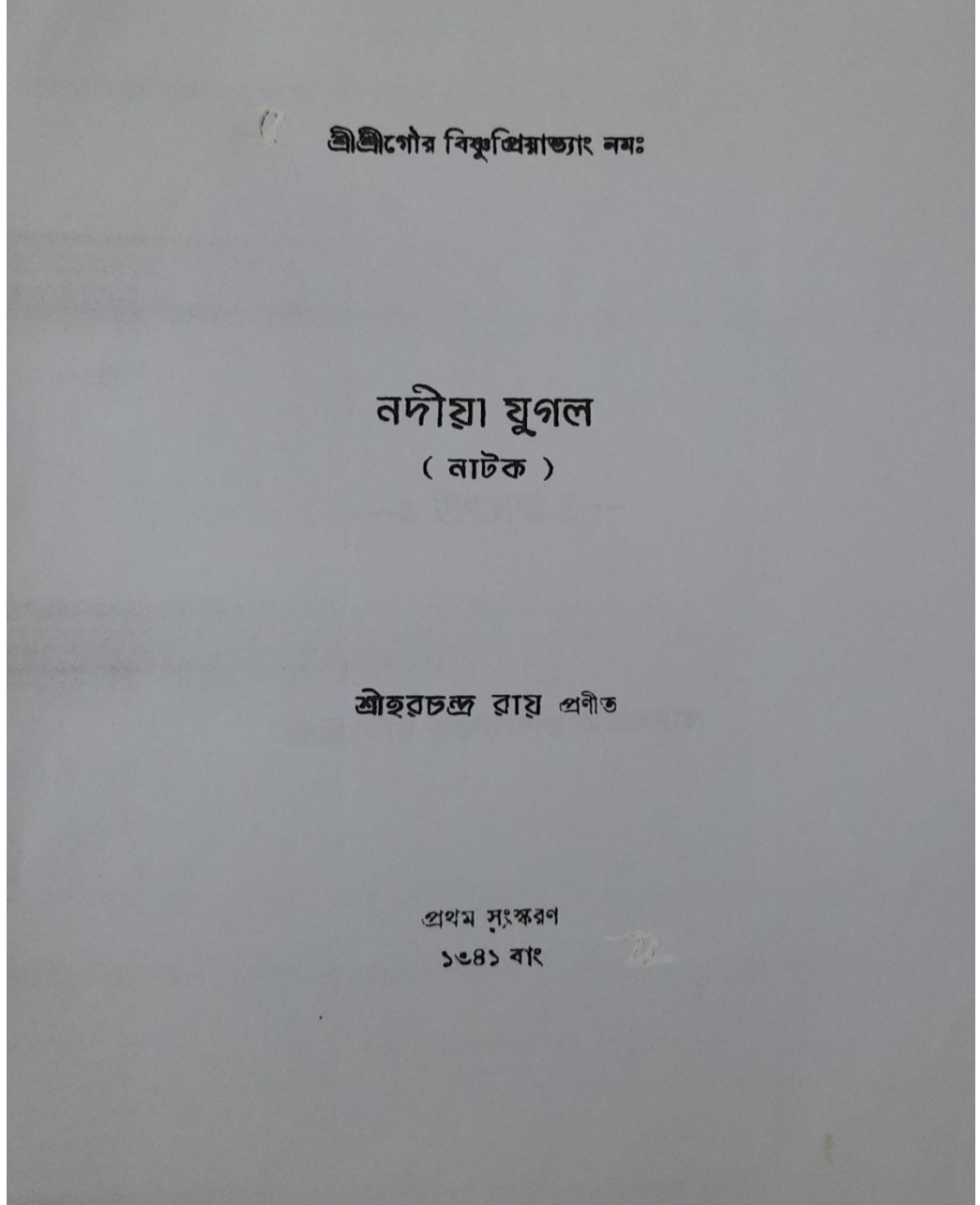
প্রতাপ। রায়! শ্যামসুন্দরের এ গৌরবেশ
কেন?

নিমাই সন্ন্যাস নাটকের নামপত্র ও চরিত্রের প্রতিলিপি। গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত ‘নিমাই সন্ন্যাস’
নাটকটি ‘গিরিশ রচনাবলী’ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ষষ্ঠ অধ্যায়, পাদটীকা
সংখ্যা-১৬, পৃষ্ঠা- ৩৭৯।



নদীয়া যুগল নাটকের প্রচ্ছেদপত্রের প্রতিলিপি। হরচন্দ্র রায় রচিত 'নদীয়া যুগল' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।
বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ষষ্ঠ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৩৬, পৃষ্ঠা - ৩৮৭।

চিত্র সংখ্যা -৮৫



নদীয়া যুগল নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। হরচন্দ্র রায় রচিত 'নদীয়া যুগল' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।
বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ষষ্ঠ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৩৭, পৃষ্ঠা - ৩৮৭।

চিত্র সংখ্যা -৮৬

শ্রী চৈতন্য

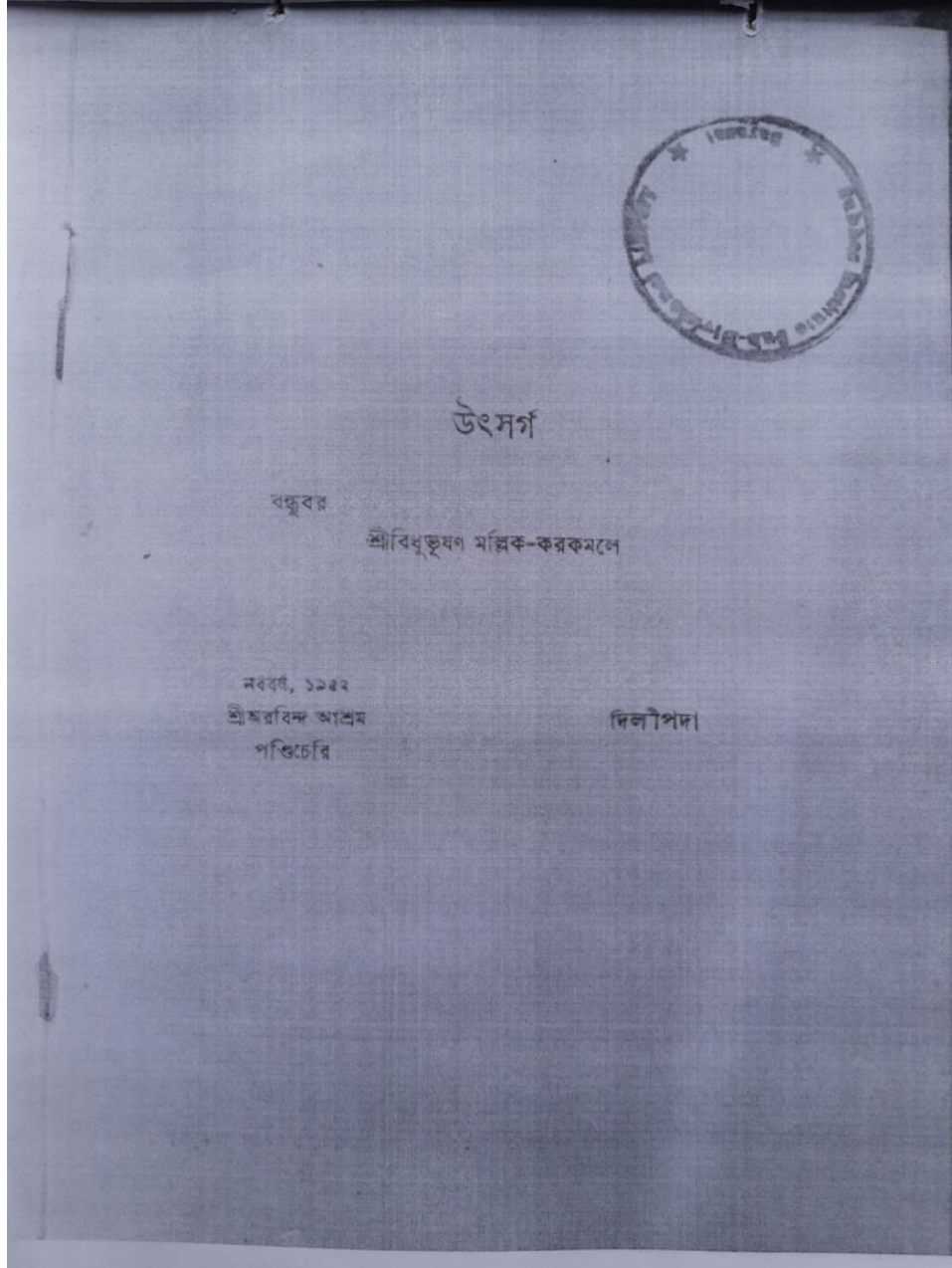
(কাব্যনাট্য)

তিন অঙ্ক

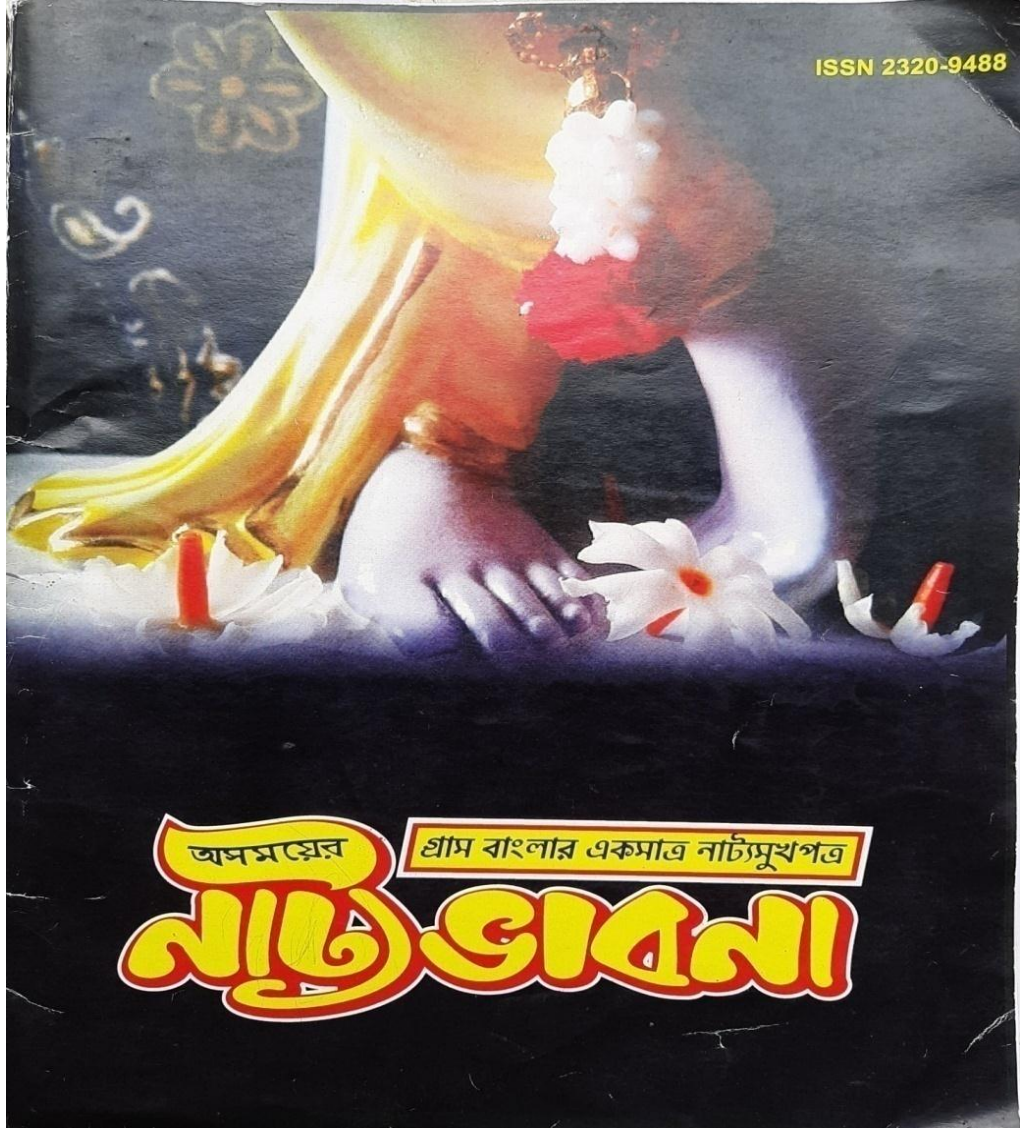
শ্রীদিলীপকুমার রায়

শ্রীচৈতন্য নাটকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। দিলীপকুমার রায় রচিত ‘শ্রীচৈতন্য’ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ষষ্ঠ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৬২, পৃষ্ঠা - ৩৯৯।

চিত্র সংখ্যা -৮৭



শ্রীচৈতন্য নাটকের উৎসর্গপত্রের প্রতিলিপি। দিলীপকুমার রায় রচিত 'শ্রীচৈতন্য' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।
বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ষষ্ঠ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ৬৩, পৃষ্ঠা- ৩৯৯।



নবজাগরণ, নীলাচলে, শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত, মার্ক্স চৈতন্য ও সুজাত, দখলনামা, চৈতন্য হোক নাটকগুলির
প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি 'অসময়ের নাট্যভাবনা' নাট্যপত্রিকা থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত
বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ষষ্ঠ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৮২, পৃষ্ঠা - ৪০৮।

চিত্র সংখ্যা -৮৯

বর্ষ ২২ সংখ্যা ২-৪

এপ্রিল-ডিসেম্বর ২০১৫

আমরা তৈয়াজ করি না, তর্ক তুলি



লক্ষ্যভেদী
থিয়েটার

সৃষ্টি ও সংগ্রামের ২২ বছর

অসময়ের

নাট্যভাবনা

গ্রাম বাংলার একমাত্র নাট্যসম্পদ

সম্পাদক ■ রঞ্জন দত্তগুপ্ত

সহযোগী ■ শম্পা ভট্টাচার্য। বাবলু চৌধুরী। সৌমেন পাল। সৌমেন দাস।
গোপাল জানা। সত্য জানা।

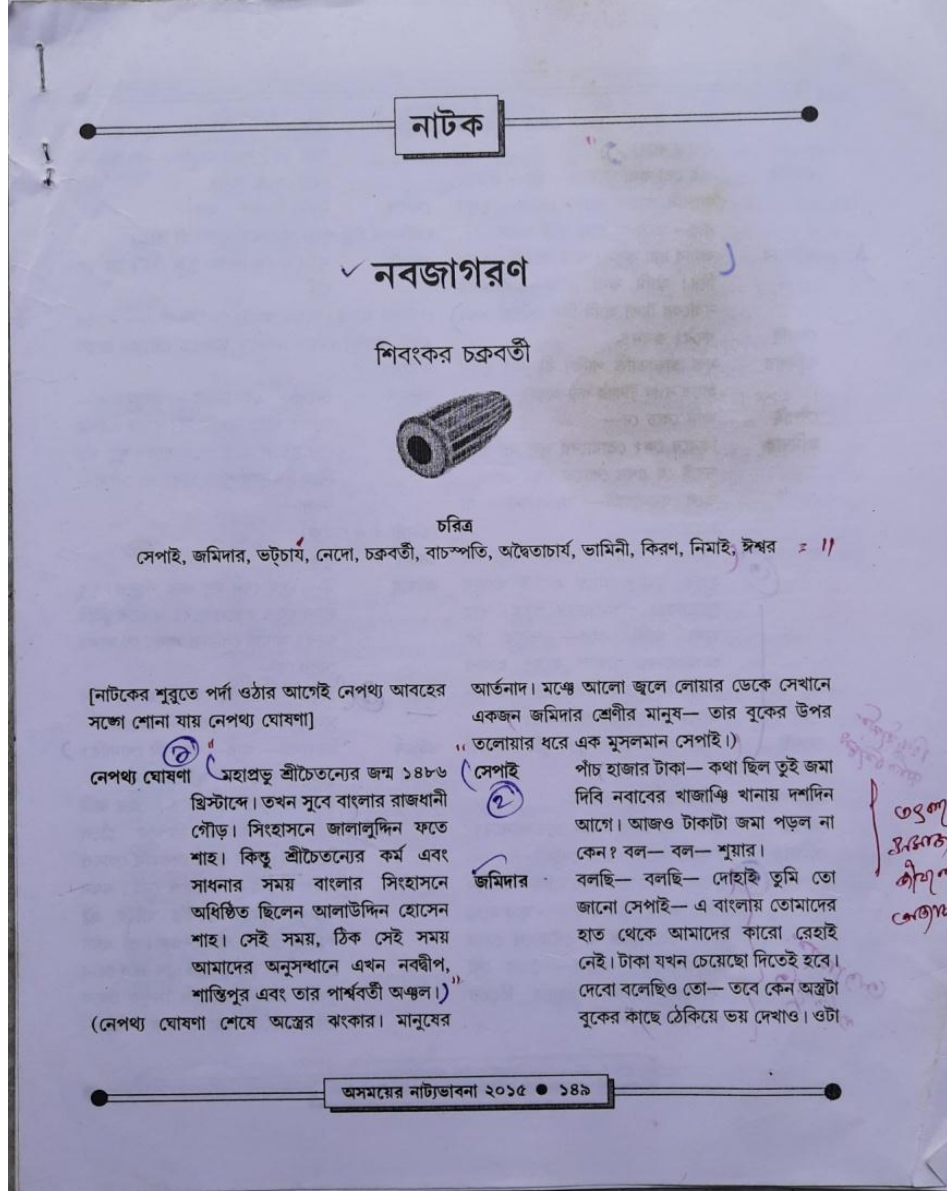
পৃষ্ঠপোষক ■ অনীত রায়। পরিতোষ রায়। রথীন চক্রবর্তী। তম্রা চক্রবর্তী।
শিবংকর চক্রবর্তী। সশ্রুটি মুখোপাধ্যায়। সব্যসাচী ভৌমিক। দেবাশিস সরকার

প্রচ্ছদ : সুচারু দাশ ■ অঙ্কর বিন্যাস : অমিতা ঘোষ ■ বিনিময় : ১০০ টাকা

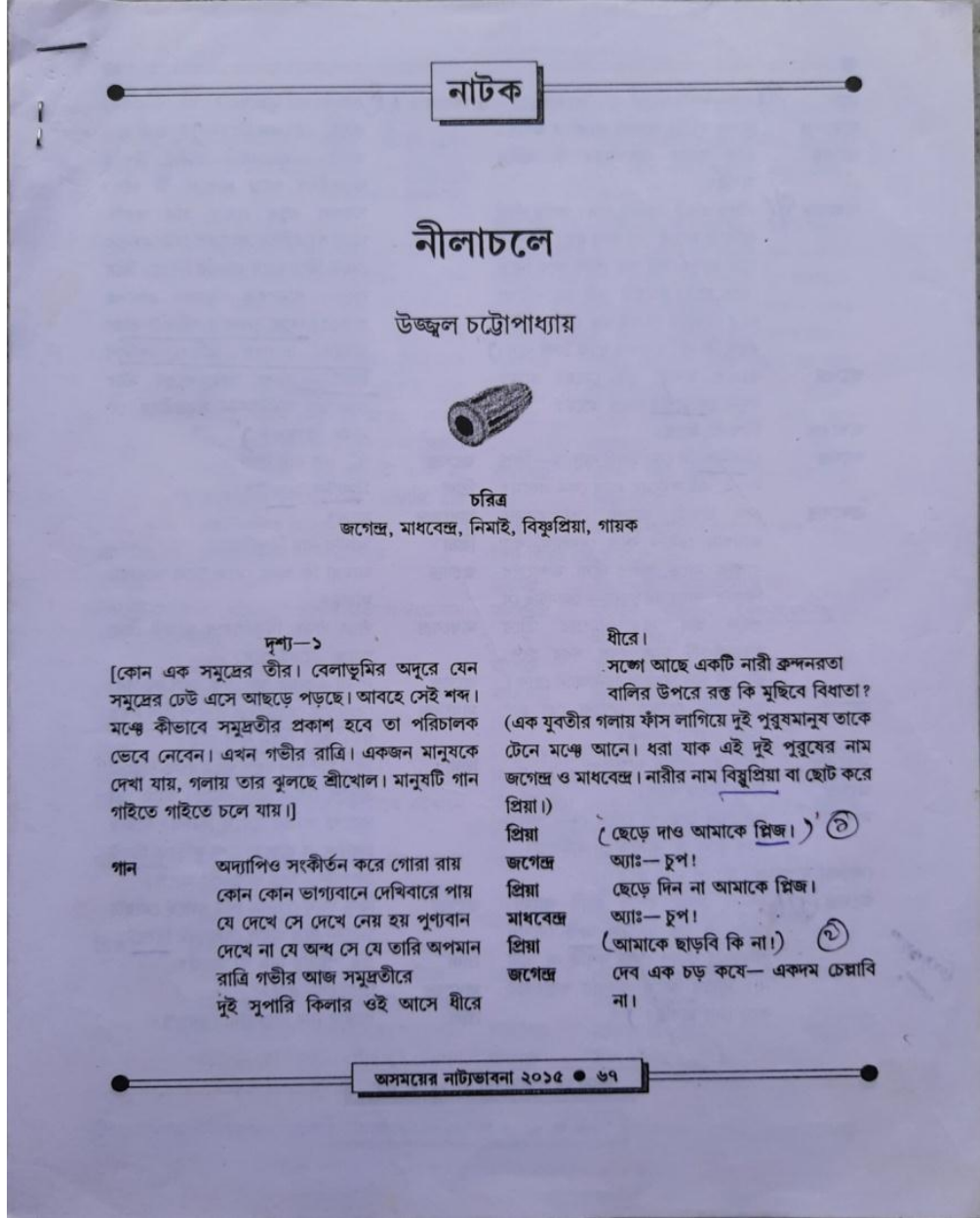
সম্পাদকীয় দপ্তর ও যাবতীয় পত্রালাপ :
২৮, নীলকমল কুণ্ডু লেন, শিবপুর, হাওড়া ৭১১ ১০২।
দূরভাষ : ৯৮৩০৩০৪২৭২ (মোবাইল)
e-mail : asamayer_natyabhabana@rediffmail.com
rangandg1962@gmail.com
মুদ্রক : বেঙ্গল লোকমত প্রিন্টার্স প্রা. লি.,
১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা ৭০০০১৪

রঞ্জন দত্তগুপ্ত কর্তৃক ২৮, নীলকমল কুণ্ডু লেন, শিবপুর, হাওড়া ৭১১ ১০২ থেকে সম্পাদিত, প্রকাশিত এবং
তৎকর্তৃক বেঙ্গল লোকমত প্রিন্টার্স প্রা. লি., ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৪ থেকে মুদ্রিত

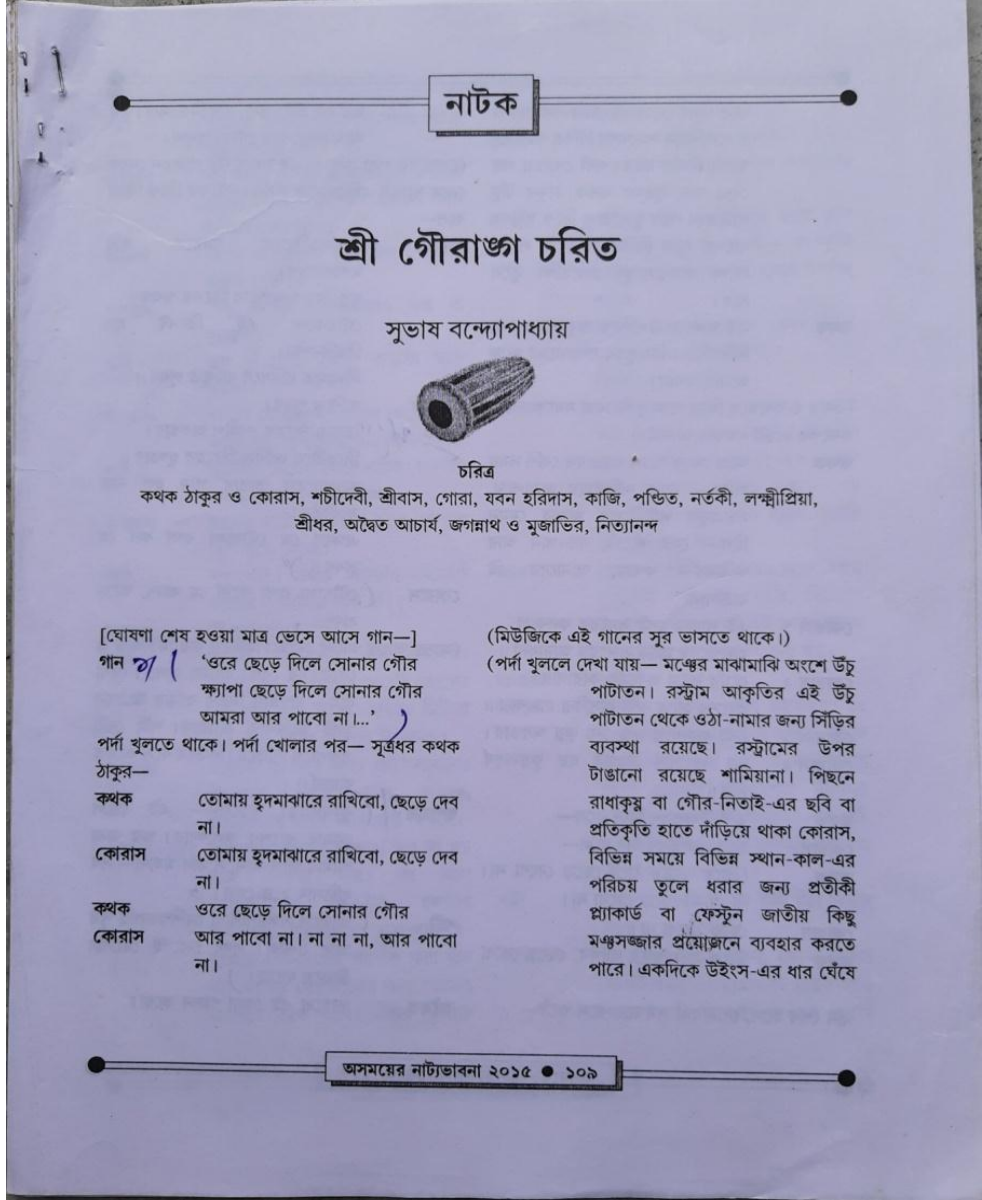
নবজাগরণ নাটকের নামপত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি ‘অসময়ের নাট্যভাবনা’ নাট্যপত্রিকা থেকে সংগৃহীত।
বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ষষ্ঠ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৮৩, পৃষ্ঠা - ৪০৮।



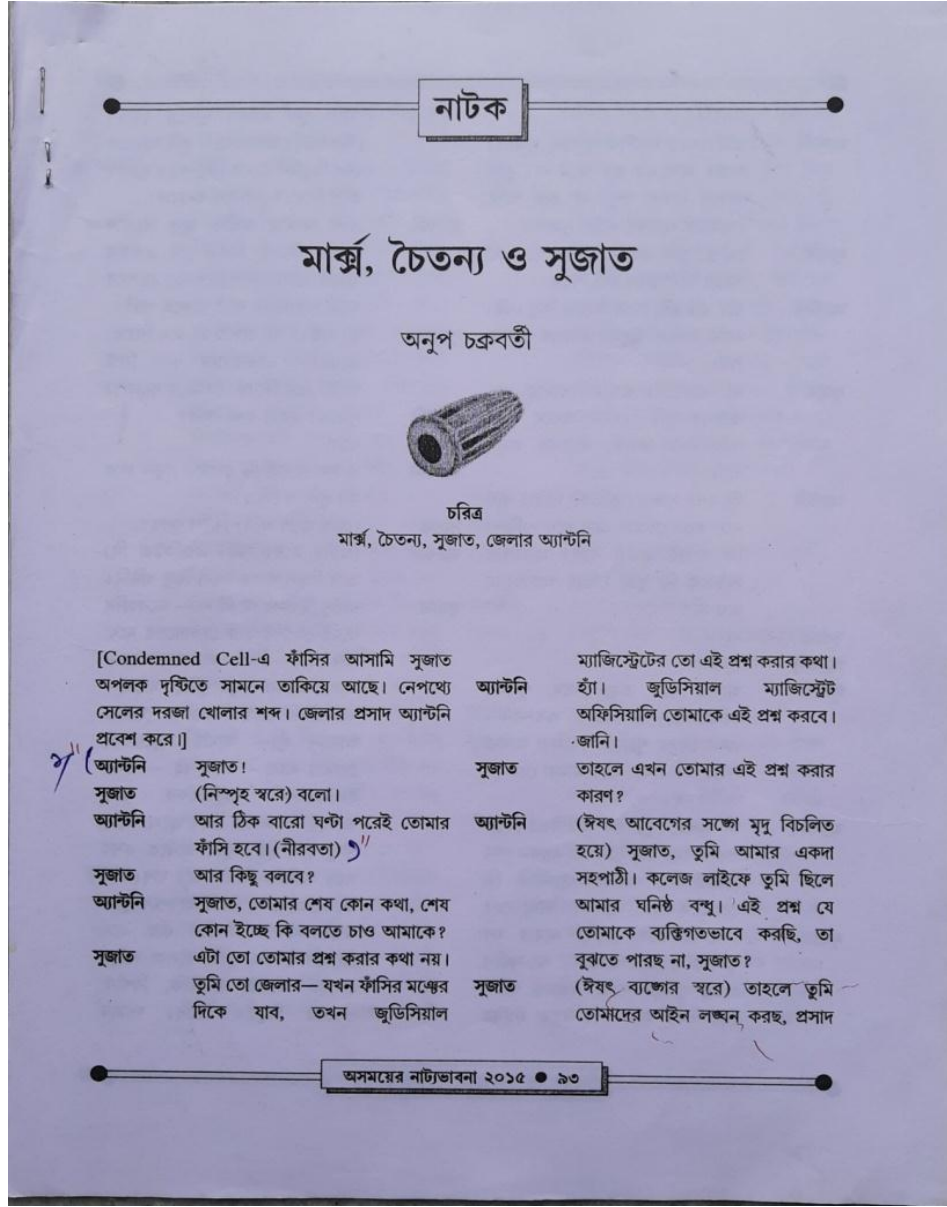
নবজাগরণ নাটকের চরিত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি 'অসময়ের নাট্যভাবনা' নাট্যপত্রিকার অন্তর্গত শিবংকর চক্রবর্তী রচিত 'নবজাগরণ' নাট্য অংশ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ষষ্ঠ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-৮৪, পৃষ্ঠা - ৪০৮।



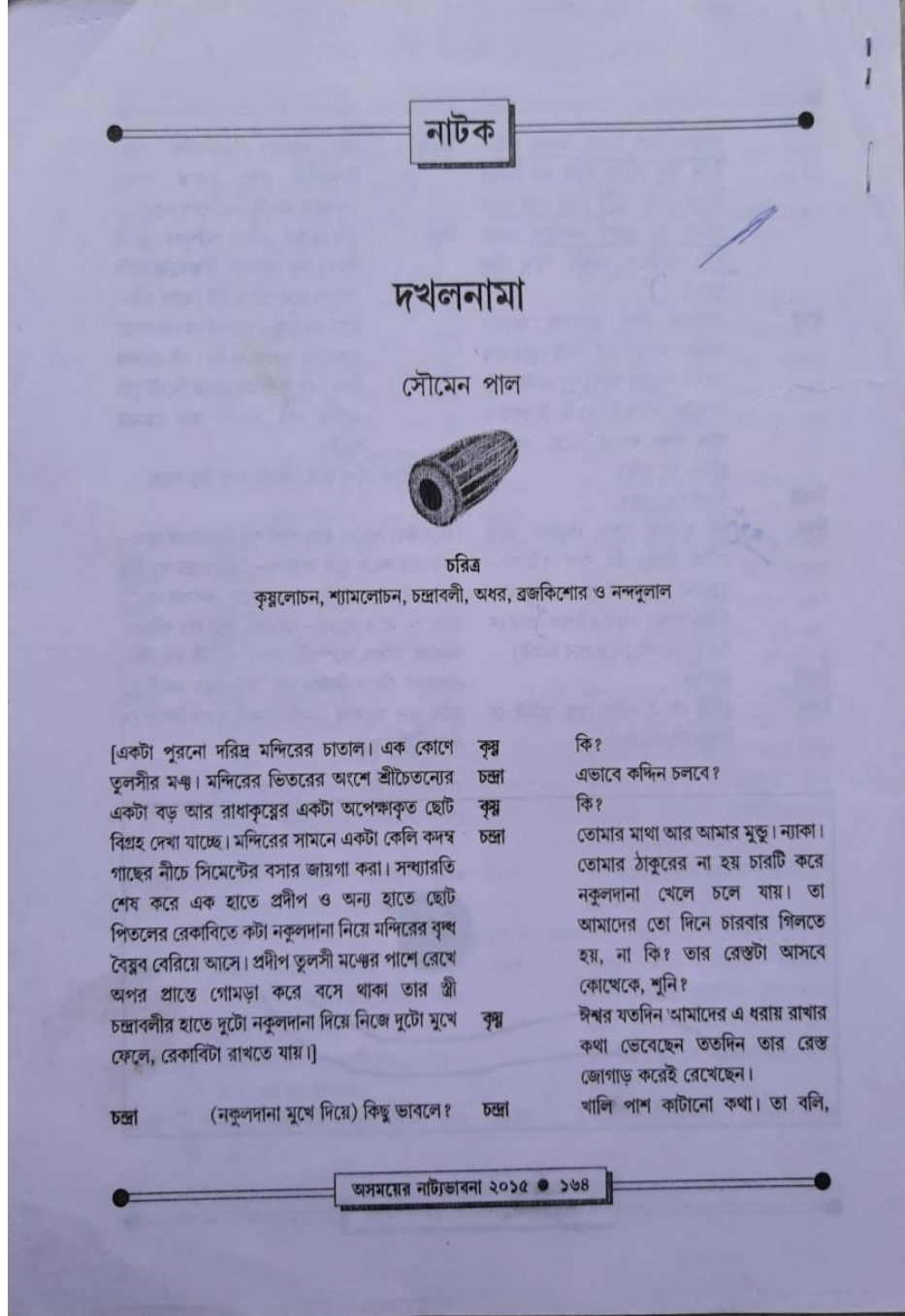
নীলাচলে নাটকের নামপত্র ও চরিত্রলিপির প্রতিলিপি। চিত্রটি 'অসময়ের নাট্যভাবনা' নাট্যপত্রিকার অন্তর্গত উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় রচিত 'নীলাচলে' অংশ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ষষ্ঠ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা- ১০৪, পৃষ্ঠা -৪১৫।



শ্রী গৌরাঙ্গ নাটকের নামপত্র ও চরিত্রের প্রতিলিপি চিত্রটি ‘অসময়ের নাট্যভাবনা’ নাট্যপত্রিকার অন্তর্গত সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘শ্রী গৌরাঙ্গ চরিত’ নাট্য অংশ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ষষ্ঠ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১১৯, পৃষ্ঠা - ৪২০।



মার্ক্স, চৈতন্য ও সুজাত নাটকের চরিত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি ‘অসময়ের নাট্য ভাবনা’ নাট্যপত্রিকার অন্তর্গত অনুপ চক্রবর্তী রচিত ‘মার্ক্স, চৈতন্য ও সুজাত’ নাট্য অংশ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ষষ্ঠ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১৪০, পৃষ্ঠা - ৪২৭।



দখলনামা নাটকের নামপত্র ও চরিত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি ‘অসময়ের নাট্য ভাবনা’ নাট্যপত্রিকার অন্তর্গত সৌমেন পাল রচিত ‘দখলনামা’ নাট্য অংশ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ষষ্ঠ অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১৫৫, পৃষ্ঠা - ৪৩৩।

নাটক

চৈতন্য হোক!

আরণ্যক বসু



চরিত্র

নন্দিনী, মা সারদা, নিবেদিতা, নিমাই, নিমাইয়ের মা, দ্রোণাচার্য, শ্যামলিমা, সন্দীপ।

দৃশ্য—১

[একটি যুবতী এগিয়ে আসে আবৃত্তি করতে করতে—]

হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগো রে
ধীরে... সাগরতীরে।

নমস্কার। আমার নাম নন্দিনী। একটাই
নাম— নন্দিনী। জন্মদিন? জন্মস্থান?—

কখনও নবদ্বীপে, কখনও
জোড়াসাঁকোয়, কখনও সিমলিপাড়ায়,
কখনও পোরবন্দরে, কখনও
সাগরদাঁড়িতে, কখনও ডেবরা,
গোপিবল্লাভপুরে, কখনও জঙ্গলমহলে,
বীরসিংহে, কখনও মজফ্ফরপুরে। না
না, আমি জন্মান্তরে বিশ্বাসী নই।
এগুলো আমার ধারণা। মনে হয় আমার

৪/১

এই বারবার জন্ম একটা মিশনের জন্য।
একটা গণজাগরণের জন্য। বহুবার
আমি জন্ম নিয়েছি, যতবার মারা
গিয়েছি। ততবার আমি আবার এসেছি,
যতবার আমি রক্তে ভেসেছি মরণ নদীর
কূলে। আমার ঈশ্বর নেই, ধর্ম নেই।
আছে মানবধর্ম। The greatest mu-
sician of this world. শ্রীকৃষ্ণই
আমার আরাধ্য। ভগবান নন, মানুষ
শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর বাঁশি, তাঁর হাসি, তাঁর
ত্রাতা বৃপই আমার আরাধ্য। যদিও তাঁর
মুখ নিঃসৃত গীতা আমার মর্মবাণী নয়।
আমি ভ্রাতৃঘাতী হত্যালীলায় বিশ্বাসী
নই। আমি অর্জুন হলে যুদ্ধই হত না।

অসময়ের নাট্যভাবনা ২০১৫ • ৭৫

চৈতন্য হোক নাটকের চরিত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি ‘অসময়ের নাট্য ভাবনা’ নাট্যপত্রিকার অন্তর্গত
আরণ্যক বসু রচিত ‘চৈতন্য হোক!’ নাট্য অংশ থেকে সংগৃহীত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ষষ্ঠ
অধ্যায়, পাদটীকা সংখ্যা-১৬৮, পৃষ্ঠা - ৪৩৯।

গ্রন্থপঞ্জী

ক) আকর গ্রন্থ (Main Text) :-

(বর্ণানুক্রমিক)

১. অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ, মাথুর, সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী, ১৯৩৮।
২. অক্ষুর মজুমদার, উলট পুরাণ, নাট্যসৃজনী, ২০০৯।
৩. অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সওদাগরের নৌকা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৯।
৪. অতুলকৃষ্ণ মিত্র, মা, এ্যাট দি নিউ ক্যালকাটা প্রেস, ১৮৯৫।
৫. অনুপ চক্রবর্তী, দ্রৌপদী ডট কম, থিয়েটার প্রয়াগ, ১৮৯৭।
৬. অনুপ চক্রবর্তী, মার্ক্স, চৈতন্য ও সুজাত, অসময়ের নাট্য ভাবনা, ২০১৫।
৭. অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ফুল্লরা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, ১৯২৮।
৮. অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, ১৯২৬।
৯. আরণ্যক বসু, চৈতন্য হোক, অসময়ের নাট্য ভাবনা, ২০১৫।
১০. উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, নীলাচলে, অসময়ের নাট্য ভাবনা, ২০১৫।
১১. উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, মনসামঙ্গল, ধানসিড়ি, ২০১৮।
১২. উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়, ধর্মমঙ্গল, লালমাটি, ২০২০।
১৩. ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, বৃন্দাবন-বিলাস, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ১৯০৩।
১৪. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, চৈতন্য-লীলা, গিরিশ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, ১৮৮৬।
১৫. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দোল-লীলা, গিরিশ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, ১৯০০।
১৬. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নিমাই সন্ন্যাস, গিরিশ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৯।
১৭. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ব্রজবিহার, গিরিশ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) সাহিত্য সংসদ, ১৯০০।
১৮. দিলিপকুমার রায়, শ্রীচৈতন্য, শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, ১৯৫২।
১৯. দেবেশ ঠাকুর, বেহুলা, লালমাটি, ২০১৮।
২০. নিখিল চট্টোপাধ্যায়, অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা, কলাভূৎ পাবলিশার্স, ২০১৬।

২১. বুদ্ধদেব বসু, তপস্বী ও তরঙ্গিনী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৬।
২২. বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, আর এক দ্রোণাচার্য, কলাভূৎ পাবলিশার্স, ২০১০।
২৩. ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাসুন্দর, ১৯১৩।
২৪. ভুবনকৃষ্ণ মিত্র, নিকুঞ্জবিহার বা গোপিনীলীলা, প্রকাশনী পাওয়া যায়নি, ১৯২৭।
২৫. মন্মথ রায়, কারাগার, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ১৯৩০।
২৬. মনোজ মিত্র, পুঁটি রামায়ণ, কলাভূৎ পাবলিশার্স, ২০১৫।
২৭. মনোজ মিত্র, ভেলায় ভাসে সীতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩।
২৮. মনোজ মিত্র, যা নেই ভারতে, কলাভূৎ পাবলিশার্স, ২০১৫।
২৯. মনোজ মিত্র, শিবের অসাধ্য, কলাভূৎ পাবলিশার্স, ২০১৫।
৩০. মনোমোহন বসু, রাসলীলা, কলিকাতা, ১৮১১।
৩১. মহুয়া চৌধুরী, আত্মজ, রত্না প্রকাশন, ২০১৯।
৩২. মহুয়া চৌধুরী, দুর্গার পাঁচালী, রত্না প্রকাশন, ২০১৯।
৩৩. মহুয়া চৌধুরী, পঞ্চকন্যার কথা, রত্না প্রকাশন, ২০১৯।
৩৪. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শর্মিষ্ঠা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৪১।
৩৫. মানিক মণ্ডল, রাম রাবণের যুদ্ধ, নবগ্রন্থ কুটির, ২০১২।
৩৬. মীর মশাররফ হোসেন, বেহুলা গীতাভিনয়, ঢাকা প্রেস, ১৮৮৯।
৩৭. যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, সীতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯২৪।
৩৮. রতন কুমার ঘোষ, শিখণ্ডী, রত্না প্রকাশন, ২০১৯।
৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্রাঙ্গদা, রবীন্দ্ররচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৪।
৪০. রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, আজকের দুর্গতিনাশিনী, রঙ্গপট, সপ্তম সংখ্যা, ২০১০।
৪১. রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, ফুল্লকেতুর পালা, বহুরূপী, ১৯৯৪।
৪২. রাজা মহেন্দ্রলাল খান, মাথুরা মিলন, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানি, ১৮৮৩।
৪৩. রাধারমণ ঘোষ, মুচকি মঙ্গল কাব্য, কলাভূৎ পাবলিশার্স, ২০১০।
৪৪. শম্ভু মিত্র, চাঁদ বণিকের পালা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৬।

৪৫. শেখর দেবরায়, মনসা কথা, শিলচর কালচারেল ইউনিট, ২০০২।
৪৬. শিবংকর চক্রবর্তী, নবজাগরণ, অসমের নাট্যভাবনা, ২০১৫।
৪৭. শিবশিস মুখোপাধ্যায়, অসম্ভব গোলটেবিল, এবং মুশায়েরা, ২০০২।
৪৮. শিশিরকুমার দাশ, ভাঁড়ু দত্ত, বহুরূপী (সাংখ্যা- ৪৮), কলকাতা, ১৯৭৭।
৪৯. সাইমন জাকারিয়া, ন নৈরামণি, বঙ্গবসুন্ধরা, ২০০০।
৫০. সাইমন জাকারিয়া, প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক, বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা, ২০০৭।
৫১. সাইমন জাকারিয়া, বোধিদ্রুম, নয়া উদ্যোগ, ২০১৪।
৫২. সুকুমার রায়, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, কলাভূৎ পাবলিশার্স, ২০০৯।
৫৩. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী গৌরাঙ্গ চরিত, অসময়ের নাট্যভাবনা, ২০১৫।
৫৪. সেলিনা হোসেন, নীল ময়ূরের যৌবন, নয়া উদ্যোগ, ২০০৯।
৫৫. সৌমিত্র বসু, একলব্য, কলাভূৎ পাবলিশার্স, ২০০৯।
৫৬. সৌমেন পাল, দখলনামা, অসময়ের নাট্যভাবনা, ২০১৫।
৫৭. হরচন্দ্র ঘোষ, নদীয়া যুগল, ভারতী প্রেস, ১৯৩৪।
৫৮. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বেনের মেয়ে, নাথ পাবলিশিং, ২০১৩।
৫৯. হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, মান, ভট্টাচার্য এন্ড সন্স এর পুস্তকালয়, ১৯১৬।

খ) সহায়ক গ্রন্থ (Reference) :-

(বর্ণানুক্রমিক)

১. অজিতকুমার ঘোষ, নাটকের কথা, সাহিত্যলোক, ১৯৮৬।
২. অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৯৮৫।
৩. অপূর্ব দে, চাঁদ বণিকের পালা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৩।
৪. আশোক মুখোপাধ্যায়, সংসদ বানান অভিধান (তৃতীয় সংস্করণ), সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৮।
৫. অশোক সেন, রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৬।
৬. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৬।
৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৫।
৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য ও ড. অজিতকুমার ঘোষ, শতবর্ষের নাট্যশালা, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৯৯।
৯. কুমার রায়, নট ও নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, শিলালিপি, ২০০৩।
১০. চিত্তরঞ্জন লাহা, বাংলা নাটকের টেকনিক, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৭।
১১. জগন্নাথ ঘোষ, বঙ্গ রঙ্গ মঞ্চের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯০।
১২. তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা (১ম খণ্ড), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৮।
১৩. তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, প্রতিভা প্রকাশন, ১৯৭৮।
১৪. ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্য, প্রফুল্ল কুমুদ লাইব্রেরী, ১৯৫৪।
১৫. দর্শন চৌধুরী, গণনাট্য আন্দোলন, পুস্তক বিপণী, ১৯৯০।
১৬. দর্শন চৌধুরী, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৫।

১৭. দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৪র্থ সংস্করণ), গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৯২১।
১৮. দীপক চন্দ্র, বাংলা নাটকের আধুনিকতা ও গণচেতনা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭০।
১৯. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, নাট্যতত্ত্ব বিচার, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪।
২০. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজসভার কবি ও কাব্য (২য় মুদ্রণ), পুস্তক বিপণি, ১৯৯৩।
২১. পবিত্র সরকার, নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪।
২২. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যবিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৯।
২৩. বিষ্ণু বসু, থিয়েটার ভাবনা, গণমন প্রকাশনা, ১৯৯৯।
২৪. বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বাংলা নাট্য অভিধান, সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৫।
২৫. মনোজ মিত্র, বাংলা নাট্য- হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ, সৃষ্টি প্রকাশনা, ২০০১।
২৬. মোহিনী মোহন সরদার, কবিকঙ্কণ চণ্ডী- বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান, কোডেক্স, ২০১০।
২৭. রণেন্দ্রনাথ দেব, প্রাচীন বাংলা কাব্য প্রদক্ষিণ, প্রবাল প্রকাশনী, ১৯৬৪।
২৮. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৮।
২৯. রাজনারায়ণ বসু, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, বঙ্গভাষা সমালোচনী সভা, ১৮৭৮।
৩০. রাজশেখর বসু, চলন্তিকা, এম,সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৯৮২।
৩১. শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বাংলা নাটক ও নাট্যশালা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৯৫৭।
৩২. শম্ভু মিত্র, কাকে বলে নাট্যকলা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩।
৩৩. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১৯৫৯।
৩৪. সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়, দৃশ্য কাব্য পরিচয়, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৭৯।
৩৫. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, নাটক লেখার মূল সূত্র, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮০।

৩৬. সাধন কুমার ভট্টাচার্য, নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৩।
৩৭. সাহিত্য সংসদ, সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, সাহিত্য সংসদ, ১৮৭৮।
৩৮. সুকুমার সেন, নট নাট্য নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৭২।
৩৯. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (প্রথম ও চতুর্থ খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৪০।
৪০. সুরেশ মৈত্র, বাংলা নাটকের বিবর্তন, রত্নাবলী, ১৯৭৩।
৪১. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, ৩য় সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২।
৪২. সুকুমার সেন, মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, বিশ্বভারতী, ১৯৪৫।
৪৩. সুখময় মুখোপাধ্যায়, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, এস. মুখার্জী, ১৯৫৮।
৪৪. সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম (৩য় সংস্করণ) ভারতী বুক স্টল, ১৯৯৩।
৪৫. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, বঙ্গ সাহিত্যাভিধান, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৮।
৪৬. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ধারা, সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯৯৪।
৪৭. হুমায়ূন আজাদ, বাংলা সাহিত্যে জীবনী (২য় সংস্করণ), আগামী প্রকাশনী, ১৩৯৮।
৪৮. হোসনে আরা জলী, বাংলা দেশের নাটক- বিষয় চেতনা, (১৯৪০ - ১৯৮২), অবসর, ২০১২।
৪৯. A. Nicoll, Theory of Drama, Doaba House, 1974.
৫০. Bankim Chandra Chatterjee, Bengali Literature, Bangiya Sahitya Parisad, Calcutta. 1940.
৫১. B. Gascoigne, Twentieth Century Drama, Hutchinson University, 1963।
৫২. Dinesh Chandra Sen, History of Bengali Language and Literature, Calcutta University, Culcutta. 1911.

৫৩. G.A. Grierson, Linguistic Survey of India, Vol- v, Part – 1, Govt. of India, Calcutta, Office of the Superintendent of government printing, India, 1928,
৫৪. Harold Ossorne, Aesthetics and Criticism, London, 1971.
৫৫. Aristotle Harold Osborne, Aesthetics and Criticism, London, 1971,
৫৬. Kumudnath Das, A History of Bengali Literature, Das Brothers, Calcutta, 1926,
৫৭. Michel Foucault, The Order Of Thing's, London, 1970.
৫৮. Michel Foucault, The Archaeology of knowledge, London, 1969,
৫৯. Nishikanta Chattopadhyay, The Yatras or The Popular Drama of Bengal, London, 1976.
৬০. Ramesh Cheandra Dutta, The Literature of Bengali, I.C Bose & co. Stanhope Press, Calcutta, 1877.
৬১. S.H. Butcher, Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art, (Translated), Third Edition, 1902.
৬২. Susil Kr. De, Bengali Literature in Nineteenth Century. Firma K .L. Mukhopadhyay, 1962.
৬৩. Sukumar Sen, History of Bengali Literature, Sahitya Academi, 1992.

গ) পত্র-পত্রিকা :-

(বর্ণানুক্রমিক)

১. অভিযাত্রী ফেরী, অচিন্ত্য বিশ্বাস, ২০১৮, (মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে লোক-প্রভাব)।
২. আকাদেমি পত্রিকা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১০ সংখ্যা, ১৯৯৭। -
৩. উদালক, সন্তোষ কুমার মণ্ডল, ২০০২।
৪. কারুভাস পত্রিকা, মানসী কীর্তিনিয়া, ২০১২, (নাট্যকার মন্মথ রায় সংখ্যা)।

৫. জলার্ক, মানব চক্রবর্তী, ২০১৬, (বইমেলা সংখ্যা)।
৬. তথ্যসূত্র, সুব্রত রায়চৌধুরী, ২০১৫, (নবনির্মাণে চর্যাপদ)।
৭. থিয়েটার প্রয়াগ নাট্যপত্রিকা, শারদীয়া, ১৪২২।
৮. দশমিক, পৃথ্বী বসু, ২০১৬।
৯. বলাকা, ধনঞ্জয় ঘোষাল, ২০১৬, (রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র)।
১০. বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৫ম সংখ্যা, ১৯৯৩।
১১. বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৮৫।
১২. ভাষানগর, সুবোধ সরকার, ২০১৭।
১৩. শিঞ্জন, শর্মিষ্ঠা আচার্য, ২০১৯।
১৪. ভাষানগর, সুবোধ সরকার, ২০১৭।
১৫. সংশ্লিষ্ট, উত্তম দাস, ২০১৬।